শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
স্মৃতি-রঞ্জিত

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র
মাসিকপত্র

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য,
এম্.এস্-সি

ঊনবিংশ বর্ষ (বৈশাখ—চৈত্র), ১৩৫৩
কার্য্যালয় :—১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫

সূচীপত্র

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	
অতীতের আশ্চর্য্য (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্.এ	২৫
অভিযান (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	...
অশিক্ষিত (ঐ)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	...
অষ্ট্রেলিয়ায় দ্বিতীয় টেষ্ট্ ম্যাচ্ (খেলাধূলা)	শ্রীঅমলকুমার মিত্র	...
অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেষ্ট্ ম্যাচ্ (ঐ)	শ্রীঅমলকুমার মিত্র	...
আচ্ছা জব্দ (গল্প)	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্.এ, বি টি	...
আমার দেশের মানুষ (ঐ)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৫
আমি যখন ছোট ছিলাম (জীবন-কাহিনী)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...
আলুমিনিয়ামের গল্প (বিজ্ঞান)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি	
ইতিহাস পড়া নিয়ে (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন, এম্.এ, বি.এল্	...
ইন্দোচীনের রাহুমুক্তি (ঐ)	শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী	...
ইংল্যাণ্ড ঃ অষ্ট্রেলিয়া (খেলাধূলা)	শ্রীঅমলকুমার মিত্র	...
উইলিয়াম্ কেরি (জীবন-কথা)	শ্রীসুনীল ঘোষ, এম্.এ	...
উলিয়ানা (গল্প)	শ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা	...
উষ্ট্র-চরিত (প্রবন্ধ)	শ্রীবেলা বসু, বি.এ	...
এক ছোকরা (গল্প)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	...
একজন যাদুকরের কথা (জীবন-কথা)	শ্রীরাধারাণী দেবী	...
একটি ছোট রকম হাতাহাতি ব্যাপার (ঐ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি	
একটি নূতন আবিষ্কার (বিজ্ঞান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	...
এক যে ছিল মজার শিশু (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ, বি.টি	...
একলব্য (নাটক)	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	২০, ৫৮, ৮০, ১১৩, ২০২, ২৫৫
এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেস (প্রবন্ধ)	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি.এস্-সি	...
এ মহারাত (কবিতা)	শ্রীদিলীপকুমার দৈ চৌধুরী	...
ওরা সৈনিক (ঐ)	শ্রীঅশোককুমার দে	...
কণা (ঐ)	শ্রীরেণুকণা কুমার	...
কবিতা-কণা (ঐ)	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্.এ, বি.টি	...
কবে (ঐ)	শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী	...

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
কাজ পাগল মানুষ (গল্প)	শ্রীনারায়ণ দত্ত	২৬৭
কুড়ান গল্প (গল্প)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি	৯৫
কুদৃষ্টি (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৩৭
কৃপণের সাজা (ঐ)	শ্রীকৌটিল্য	৩৬
কোনো এক হাসপাতালের গল্প (ঐ)	শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার	২৮৪
কোহিনূরের কথা (ইতিহাস)	শ্রীস্থলপদ্ম	১৯১
খালার তরে (কবিতা)	শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্.এ	৩৪
খেলাধূলা (খেলাধূলা)	শ্রীচন্দ্রচূড় চক্রবর্ত্তী প্রঃ	১২৪, ৩৭০
খোকা (কবিতা)	শ্রীঅরুণিমা সেন	১২৬
খোকার আদর (ঐ)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৫৬
গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ (ঐ)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩৪১
গাছপালার গল্প (বিজ্ঞান)	শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য,এম্.এস্-সি	২৪৮
গৌড় ভ্রমণ (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়	২১৯
চিঠিপত্র	৩৫, ১৮২, ২৪১, ২৭৫, ৩০৬, ৩৩৯,	৩৬৮
চিল্কা-ভ্রমণ (কবিতা)	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	৩০৯
চৌ-কৌ-টিনের গুপ্ত রহস্য (বিজ্ঞান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৩০০
ছড়া (ছড়া)	শ্রীশিপ্রারাণী ঘোষ	১৮২
ছাতা (বিজ্ঞান)	শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্ এস্-সি	৮
ছাত্রবন্ধু হেয়ার (জীবন-কথা)	শ্রীপ্রতীপ মুখোপাধ্যায়	২০৯
জমিদার বাড়ীর চাকর (নাটিকা)	শ্রীঅজয়কুমার দত্ত	৩৩৭
জেনারের দান (বিজ্ঞান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	১৭০
জেনে রাখ	শ্রীকল্যাণী দেবী	২৪০
ঝরণা (কবিতা)	শ্রীঅপরাজিতা বরা	৬৮
ঠাকুরদাদার আত্মকাহিনী (জীবন-কথা)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি.এ ৬১, ৭৪, ১০৬, ১৭৫,	১৯৫
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল (ঐ)	শ্রীগৌরী দেবী	১৭
ডিটেক্‌টিভের ডায়েরী (গল্প)	শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এস্-সি	১৬৭
তিমি ও তিমি-শিকার (প্রবন্ধ)	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি	৩৪৮
তুষারকন্যার কাহিনী (গল্প)	শ্রীকিশু মুখোপাধ্যায়	৩১৭
তৃতীয় টেষ্ট্ ম্যাচ্ (খেলাধূলা)	শ্রীঅমলকুমার মিত্র	৩২৬
দানবীর (কবিতা)	শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র	৮০
দুই বন্ধু (গল্প)	বন্দে আলি মিয়া	৮৫
দুঃখ জয়ের মন্ত্র (ঐ)	শ্রীসুকুমার দে সরকার ৭১,	১৮৯
দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়ে (প্রবন্ধ)	রঞ্জিৎ ভাই	১১০
দেশলাই-বিক্রেতা বালিকা (গল্প)	শ্রীদিলীপকুমার দে চৌধুরী	১২৪
ধান্য (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৬৯
ধাঁধা ও ধাঁধার উত্তর	৪০, ৬৮, ৯৭, ১২৭, ১৫৬, ১৮৩ ২১২, ২৪২, ২৭৬, ৩০৮, ৩৪০,	৩৭২

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
নতুন বই		৫০
নন্দ মিস্ত্রীর দোকান (গল্প)	শ্রীশামুক	১০৮
নবীন ছাত্র (গল্প)	শ্রীসুবোধ বসু, এম্.এ	১৬২
নানা প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	১৫৪, ৩৬৩
পটলার পটুতা (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩২৭
পড়ায় মন (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৩
পথভোলা (কবিতা)	শ্রীজয়ন্তকুমার দাশ	৩৭১
পথে-বিপথে (ভ্রমণ-কাহিনী)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি	৩৫৯
পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য (জীবন-কথা)	শ্রীগৌরী দেবী	২৬২
পুরস্কার-প্রতিযোগিতা	৬৮, ৯৬, ১৫৬, ১৮৩,	৩৭১
পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল	৬৬, ১২৭,	২৭৬
পুস্তক-পরিচয়		১২৭
পোকামাকড়ের চিড়িয়াখানা (প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	১৯৮
প্রজাপতির কেরামতি (গল্প)	শ্রীধরণী সেন, এম্.এস্-সি	১৯২
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৫৬
প্রশ্ন ও উত্তর (কবিতা)	শ্রীবিজলী ঘোষ	৩৭১
প্রাণকেষ্টর মোটর শিক্ষা (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	১৫৮
বড়দের জীবনের ছোটখাট ঘটনা (জীবন-কথা)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি	২৩৩
বড়দের জীবনের ছোটখাট ঘটনা (ঐ)	শ্রীকৌটিল্য	৩০৩
বরবুদুর (প্রবন্ধ)	শ্রীনমিতা চক্রবর্ত্তী	২১১
বল তো (কবিতা)	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	১১২
বাইরনের বাড়ীতে (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীঅমলশঙ্কর রায়	১০০
বাঙ্‌লা-মা (কবিতা)	মোগল এ. ছামাদ	২৯৯
বাজারের ফর্দ্দ (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৫৭
বাড়ী খুঁজতে ব'লো না (গল্প)	শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার	২১৪
বাদলা রাতের খোকনমণি (কবিতা)	শ্রীসীতা সরকার	২০৮
বাদুড়-চরিত (প্রবন্ধ)	শ্রীবেলা বসু, বি.এ	৩২১
বাবু, চিঠি (গল্প)	শ্রীশামুক	১৮৬
বালুচর (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায়চৌধুরী	৩৬৭
বাংলাকে চিনতে শেখ (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীহেমলতা দেবী	৩৭
বি-কোর্স (গল্প)	শ্রীসুবোধ বসু, এম্.এ	৫
বিচিত্র ধরণী (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্.এ	২, ৪৪, ৭০
বিচিত্র প্রসঙ্গ (ঐ)	শ্রীবেলা বসু, বি. এ	২০৯
বিজয়ী বীর (কবিতা)	শ্রীসুধীররঞ্জন ঘোষ, এম্. এ, বি. এল্	২২৭
বিদেশ (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৯
বিলাতের ক্রিকেট (খেলাধূলা)	শ্রীধীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ	৯৪

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
বীর পুরুষ (কবিতা)	শ্রীঅর্চ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	২৩৯
ব্ল্যাক্ বিউটীর ছেলেবেলা (গল্প)	শ্রীসুনীতকুমার ঘোষ	২৫৩
ভুল (গল্প)	শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত	৩৩৩
ভোলানাথ (ঐ)	শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার	১৪৮
মজার ম্যাজিক (ম্যাজিক)	যাদুকর এস্. কে. ভাদুড়ী	১৭৮
মঞ্চের ইন্দ্রজাল (ঐ)	ঐ	২৮৮
মানুষ (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৭৭
মীমাংসা (ঐ)	শ্রীপ্রভাত বসু	৮৬
মুর্শীদাবাদে একদিন (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ	১৪৫
ম্যাজিক দেখানো সহজ নয় (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৩৬৫
ম্যামথ্ (প্রবন্ধ)	শ্রীবেলা বসু, বি. এ	১৬৫
যদি হয় (কবিতা)	শ্রীসুধীরকুমার দাস	২৩২
যে জিনিষ করা সহজ (প্রবন্ধ)	...	৩৮
রাধামাধবের রত্নহার (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	২৩, ৫১, ৮৭, ১১৮, ১৫২, ২০৩, ২৩৭, ২৬৯, ২৯৩, ৩২৩, ৩৫৫
রামধনু (কবিতা)	শ্রীমীরা ঘোষ	১৮৩
রাম-লক্ষ্মণ (গল্প)	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	১৭২
রায় বাঘিনী (ইতিহাস)	শ্রীরাধারাণী দেবী	১৭৭
লড়াই ফেরৎ নন্দদুলাল (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীশামুক	২১৭, ২৪৪, ২৭৮, ৩১১, ৩৪২
শিশুসাহিত্য-পরিষদের প্রদর্শনী	...	৩৩৮
শিশুসাহিত্য-সংবাদ	...	৩৬, ৯৬, ১৫৬, ১৮০, ২০৮, ২৭৬
শোক-সংবাদ	...	৩০৮
সন্দেশ (সংবাদ)	...	৩৯, ৬৭, ৯৭, ১২৫, ১৫৫, ১৮১, ২০৬, ২৪০, ২৭৩, ৩০৫, ৩৩৬, ৩৬৯
সম্পাদক সুরেশ্বর (গল্প)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	২৯
সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা	...	৩০৭
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর	...	৩০৮
সুলতান, আপনি বীর (ইতিহাসের গল্প)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৬
সে এক পথিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	১১, ৪৬, ৯০, ১১৪, ১৩৮
সেক্সপিয়ার (জীবন-কথা)	শ্রীসুশীলকুমার সিদ্ধান্ত	৪২
হকি (খেলাধূলা)	শ্রীধীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ	৬৬
হর্ষবর্দ্ধনের কাব্য চর্চ্চা (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	২৫০
হাওয়াই দ্বীপের সাদা শয়তান (প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	২৩০
হারাধন বাবুর বাঘ শিকার (গল্প)	শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম্. এস্-সি	৬৩
হাসিতে যে যায় ঘুম (কবিতা)	শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার	৬৫
হিরোশিমার বিভীষিকা (গল্প)	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার	১০২
হেমন্তের ডাক (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৩

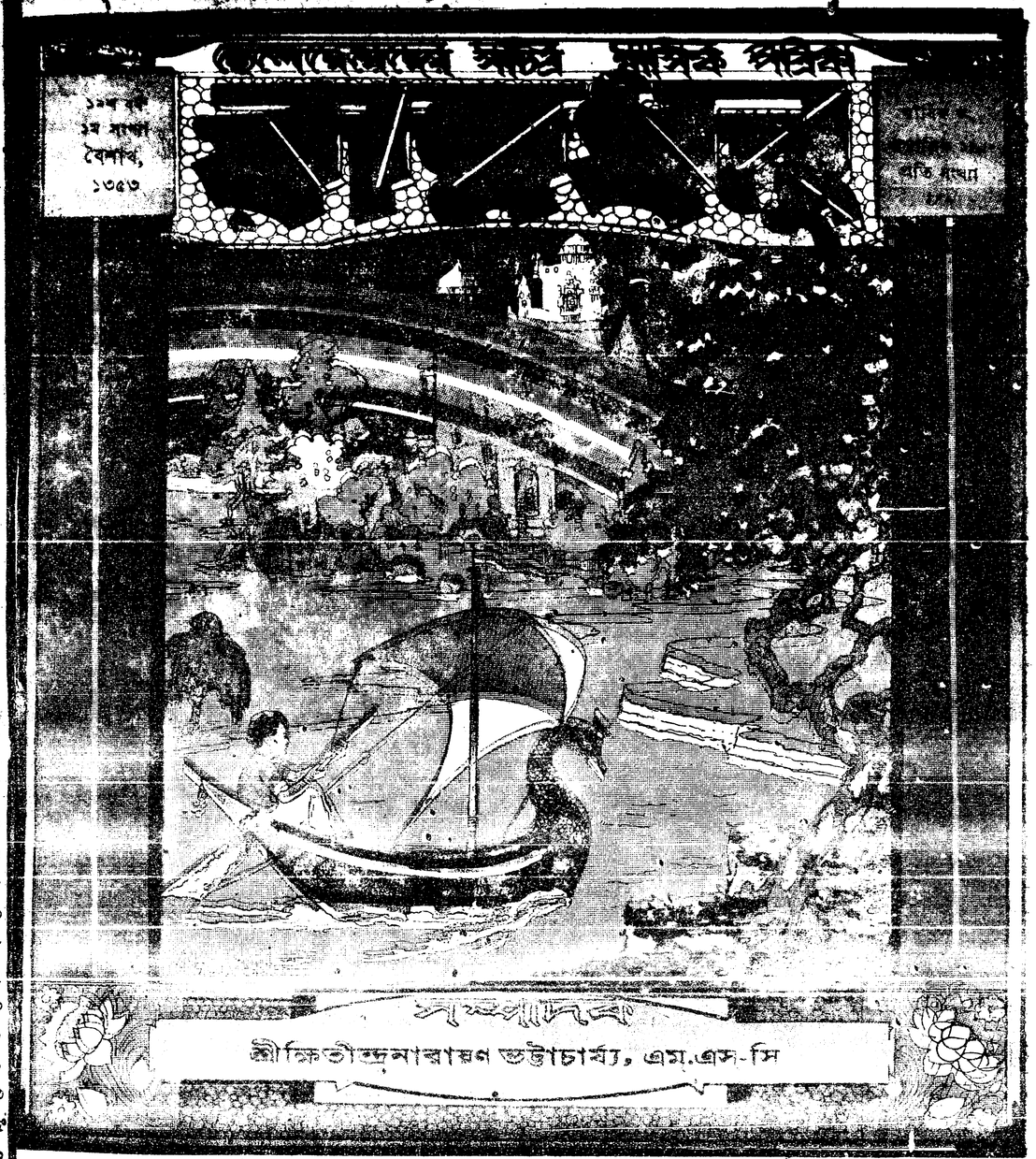

কার্য্যালয়: ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্: সাউথ্ ১২৬

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
বীর পুরুষ (কবিতা)	শ্রীঅর্চ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	২৩৯
ব্ল্যাক্ বিউটীর ছেলেবেলা (গল্প)	শ্রীসুনীতকুমার ঘোষ	২৫৩
ভূল (গল্প)	শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত	৩৩৩
ভোলানাথ (ঐ)	শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার	১৪৮
মজার ম্যাজিক (ম্যাজিক)	যাদুকর এস. কে. ভাদুড়ী	১৭৮
মঞ্চের ইন্দ্রজাল (ঐ)	ঐ	২৮৮
মানুষ (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৭৭
মীমাংসা (ঐ)	শ্রীপ্রভাত বসু	৮৬
মুর্শীদাবাদে একদিন (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ	১৪৫
ম্যাজিক দেখানো সহজ নয় (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৩৬৮
ম্যামথ (প্রবন্ধ)	শ্রীবেলা বসু, বি. এ	১৬৮
যদি হয় (কবিতা)	শ্রীসুধীরকুমার দাস	২০২
যে জিনিষ করা সহজ (প্রবন্ধ)	...	৩৮
রাধামাধবের রত্নহার (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	২৩, ৫১, ৮৭, ১১৮, ১৫২, ২০৩, ২৩৭, ২৬৯, ২৯৩, ৩২৩, ৩৫৫
রামধনু (কবিতা)	শ্রীমীরা ঘোষ	১৮৩
রাম-লক্ষ্মণ (গল্প)	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	১৭২
রায় বাঘিনী (ইতিহাস)	শ্রীরাধারাণী দেবী	১৭৭
লড়াই ফেরৎ নন্দদুলাল (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীশামুক	২১৭, ২৪৪, ২৭৮, ৩১১, ৩৬২
শিশুসাহিত্য পরিষদের প্রদর্শনী	...	৩৩৮
শিশুসাহিত্য-সংবাদ	...	৩৬, ৯৬, ১৫৬, ১৮০, ২০৮, ২৭৬
শোক-সংবাদ	...	৩০৮
সন্দেশ (সংবাদ)		৩৯, ৬৭, ৯৭, ১২৫, ১৫৫, ১৮১, ২০৬, ২৪০, ২৭৩, ৩০৫, ৩৩৬, ৩৬৯
সম্পাদক সুরেশ্বর (গল্প)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	২৯
সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা	...	৩০৭
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর	...	৩০৮
সুলতান আপনি বীর (ইতিহাসের গল্প)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৬
সে এক পথিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	১১, ৪৬, ৯০, ১১৪, ১৩৫
সেক্সপিয়ার (জীবন-কথা)	শ্রীসুশীলকুমার সিদ্ধান্ত	৪২
হকি (খেলাধুলা)	শ্রীধীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ	৩৬
হর্ষবর্দ্ধনের কাব্য চর্চ্চা (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	২১০
হাওয়াই দ্বীপের সাদা শয়তান (প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	২৩০
হারাধন বাবুর বাঘ শিকার (গল্প)	শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম্. এস্-সি	৬৩
হাসি সে যে যায় ঘুম (কবিতা)	শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার	৬৫
হিরোশিমার বিভীষিকা (গল্প)	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার	১০২
হেমন্তের ডাক (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৬

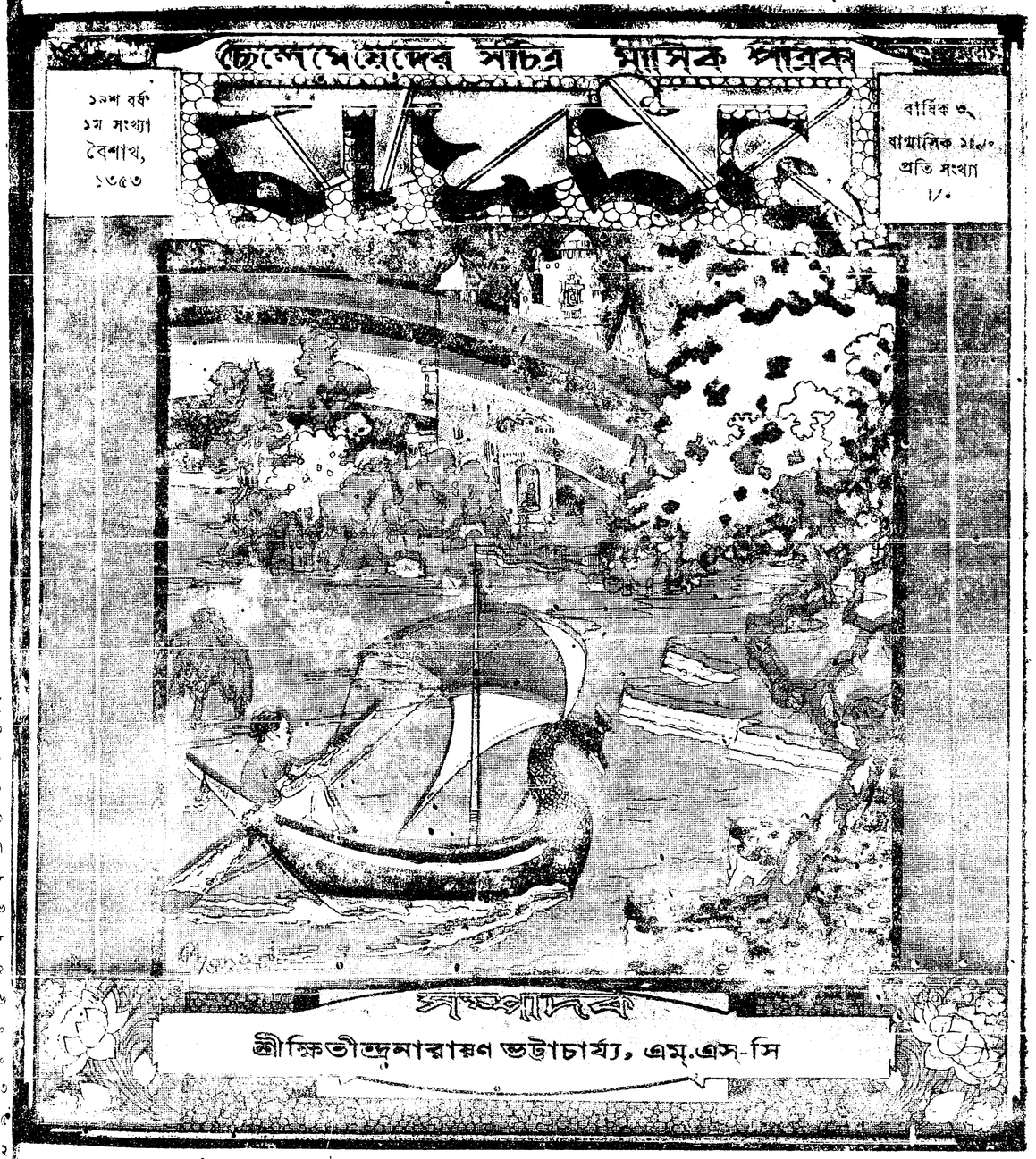

কার্য্যালয়: ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন: সাউথ ১২৬

COLOUR PAPER

ভোজরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আজ নববর্ষের শুভদিন !

বৈশাখী-পুণ্যাহের এই ব্রহ্মমুহূর্ত্তে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত ক'রে বলো ভাই সব

জয় হিন্দ্‌! জয় হিন্দ্‌!!

এ-শুভলগ্নে প্রিয়জনকে একটা সুসংবাদ দিয়ে রাখি :

আগামী পূজায় 'শরৎ-সাহিত্য-ভবন' থেকে যে নূতন পূজাবার্ষিকীখানি আপনাদের হাতে তুলে দেবার জন্ত প্রকাশের আয়োজন হ'চ্ছে, সেখানির নাম—'**আকাশদীপ** !'

যুগমান্য শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ,

শিশু-সাহিত্য সম্রাট

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

— চিত্রবহুল বিরাট পূজাবার্ষিকী —

আকাশদীপ

গত পূজায় '**কলরব**' পেয়ে যাঁরা খুশী হয়েচেন, '**আকাশদীপ**' তাঁদের চিত্ত আকর্ষণ করবেই।

অলকনন্দা সিরিজ

বৈশাখে প্রকাশিত হবে :

শিশু-সাহিত্য সম্রাট **হেমেন্দ্রকুমারের 'সুন্দরবনের রক্তপাগল'**

১। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
রত্নপুরের যাত্রী

২। শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
"বন্দী, জেগে আছো ?"

৩। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
রীতিমত এ্যাড্‌ভেঞ্চার

৪। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

৫। শ্রীসুমথ ঘোষের
মোহনসিংয়ের ফাঁসি

৬। শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
অভিশপ্ত সম্পদ

শরৎ-সাহিত্য-ভবন * ২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, পোঃ বক্স ১৬৬১০, কলিকাতা।

নব প্রকাশিত খানকয়েক ডিটেকটিভ এ্যাড্‌ভেঞ্চার বই—

দুরঙা ছাপা—উঁচু দরের রচনা— বহুছবি-যুক্ত

বিপদ যখন ঘনিয়ে এল—অরণ্যের মাঝে ভগ্ন মন্দিরে রক্তধারা···শিউরে ওঠা রহস্য···যা উদ্ঘা বহু লোক প্রাণ দিল। পুলিশ ব্যর্থ···ডিটেকটিভ পরাজিত···কে তবে শয়তানের মুখস খুল পদে পদে সংঘর্ষ···রোমাঞ্চ···রহস্য। লোহ কঠিন বুক নিয়ে পড়তে হবে। দাম—১।০

কাঠের ড্রাগন—মিঃ সরকার বর্ম্মা হতে নিয়ে এল কাঠের ড্রাগন, যাহার বুকে নি ছিল নীল মণি। সঙ্গে এল রহস্য···রোমাঞ্চ—মৃত্যু—আর বর্ম্মার দুর্দ্দান্ত দস্যু ডাঃ মীন। বাধল—জয়ী হল কে ? শিউরে উঠবে। দাম—১।০

মুখস যখন খুলে গেল—জাহাজের বুকে এল রক্তলোভী ছদ্মবেশী···মূর্ত্ত উঠল সন্দেহ—রহস্য বিভীষিকা। কার নির্ম্মম হস্তস্পর্শে অদ্ভুত চুরি—সুব্রত পাগল—ঘোষালের হ'ল। ভয়াবহ রূপ দেখে কাঁপতে হবে—এমন বই পড় নি কখনও। দাম—১।০

তরুণ লেখক অজয় বসাকের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা

বৃহৎ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

হত্যা যাদের নেশা—সত্য প্রকাশিত। এমন রোমাঞ্চকর গল্প পড়তে, পড়তে গ কাঁটা দেবে। দুর্ব্বৃত্ত ধরা পড়ার ভয়ে দেহকে করলে বিকৃত—পালাল সুদূর বর্ম্মায়। শেষ অবধি সে বাঁচল ? প্রায়শ্চিত্তের কি ভয়াবহ পরিণতি ! এর আগে তোমরা এমন বই দেখ নি। দাম—১।

এর পর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হ'চ্ছে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ডিটেকটিভ গল্প উপন্যাস,

তা ছাড়া নামকরা লেখকের ভাল ভাল বই কেবল আমাদের দোকানেই প্রচুর পাবে

এ, বি, পি,. বুক ডিপো

৮বি রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা (সেবাসদনের সম্মুখে)

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর—

বাকি দিনগুলি সময় নষ্ট না করিয়া পড়া দরকার

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"
(ডিটেকটিভ শিশু-উপন্যাস)

অন্ধকারের বন্ধু	(হেমেন্দ্র)
ছিন্নমস্তার মন্দির	(সৌরীন্দ্র)
তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক	(অখিল)
বিজয়-অভিযান	(নৃপেন্দ্র)
ছায়া কালো-কালো	(বুদ্ধদেব)
রাত্রির যাত্রী	(হেমেন্দ্র)
গুপ্ত ঘাতক	(প্রভাবতী)
হত্যার প্রতিশোধ	(প্রভাবতী)

প্রত্যেকখানির দাম
বারো আনা
ক্রমান্বয়ে বই বাহির হইতেছে

"প্রহেলিকা সিরিজ"
গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ
শিশু-উপন্যাস

কার্ত্তিক মাসে—স্বপ্ন হলো সত্যি
খগেন্দ্রনাথ মিত্র

অগ্রহায়ণ মাসে—অদৃশ্য গোয়েন্দা
পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

পৌষ মাসে—গ্রহের ফের
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মাঘ মাসে—হাওয়ার পেছনে
দীনেশ মুখোপাধ্যায়

পর পর বাহির হইবে
প্রত্যেকখানির দাম—এক টাকা

"বিশ্ব-প্রতিভা সিরিজ"
নতুন ধরণের জীবন-কথা
ছবিতে পরিপূর্ণ

১।	দানবীর কার্ণেগী—পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	৸০
২।	ঋষি অরবিন্দ—চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী	১৲
৩।	দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন—হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৲
৪।	প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট—সরলা নন্দী	১৲
৫।	বলদর্পী হিটলার—যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
৬।	যাদুকর মার্কনী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৲
৭।	সমুদ্রজয়ী কলম্বাস—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৲
৮।	এব্রাহাম্-লিনকন্—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৲

বিশ্ব-প্রতিভা সিরিজের আর একখানি
অমূল্য গ্রন্থ
স্বদেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র—
হেমেন্দ্রবিজয় সেন
মূল্য এক টাকা
ছাপা হইতেছে— শীঘ্রই বাহির হইবে—

—নতুন বই—
বাহির হইল—
"জ্ঞানের আলো"
হেড মাষ্টার মৌলভী মহম্মদ এমাদুল হক
বি-এ, বি-টি প্রণীত
সাধারণ জিনিষগুলির বিষয়
অনেকে জানেন না, সবই উত্তর এতে আছে।
মূল্য বার আনা

দেব সাহিত্য-কুটীর ✱ ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

নতুন বই
ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার
প্রথম গ্রন্থ
দি লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্স্
মর্ম্মানুবাদ করেছেন—সুলেখক শ্রীঅমলেন্দু সেন
দাম ৷৷৵০
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

কিশোর-মনের বলিষ্ঠ মাসিকপত্র
কিশোর বাংলা
সম্পাদক—অরূপ
২৫ বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা

ছোটদের উপহারের কয়েকখানি ভাল ভা
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
ধূমকেতু (রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস)
আবিষ্কারের গল্প (বিখ্যাত অভিযাত্রীদের রোমাঞ্চকর কাহিনী)
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
নূতন পুরাণ (মজার গল্প)
হাস্য ও রহস্য (ঐ)
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়াঘুরি (মজার গল্প)
মনোরঞ্জন ও শিবরামের
এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে (মজার গল্প)
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

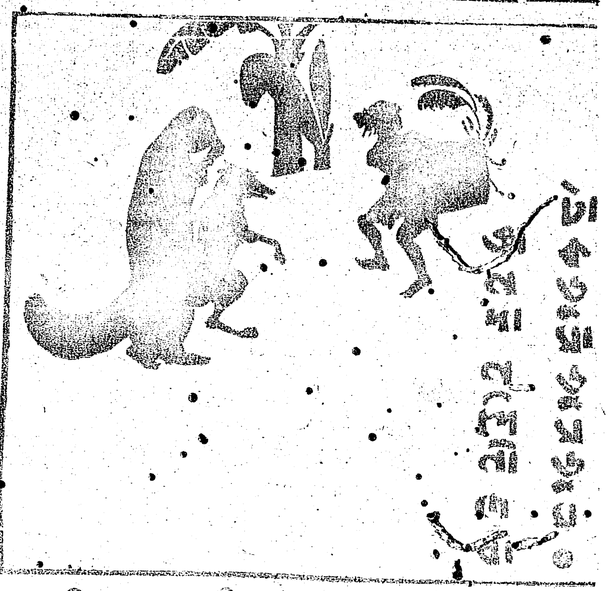

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি। দাম এক টাকা
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

—'লক্ষ্মা ঝি'

আপন-ভোলা

শিল্পী : শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৯শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৫৩ { ১ম সংখ

অভিযান

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এরোপ্লেনে চড়ে', মাগো,
যাবো মামার ঘরে,
কমলা লেবুর দেশে সুদূর
সুরমা নদীর চরে।

পাল তোলা ওই ছোট্ট ডিঙা
যাচ্ছে সেথায় ভেসে
কমলা লেবুর গন্ধ-ভরা
কমলাবতীর দেশে।

আকাশ থেকে সেথায় যখন
নামব প্যারাসুটে—
'কে এলো এ ?'—বল্‌বে সবাই
চমকে তখন উঠে।

বল্‌বে, 'একে চিনি না ত'—
জানি না এর নামই !'
কোলে তুলে চুমু খাবে
কেবল সেজো মামী।

বল্‌বে, 'খোকা এলো মোদের
কোন্ স্বরগের থেকে!
ফিরে যেতে দেবো না আর
দেবই ঘরে রেখে।'

বল্‌ব আমি—'তা হবে না,
সোনালি মেঘ ধরে
মায়ের দেশে ফিরব আবার
মায়ের কোলটী ভরে'।'

বিচিত্র ধরণী

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্.এ

আজ তোমাদের যে দেশের কথা বলব ভূগোলে একে নাকি বলে নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ। আমরা অবশ্য এখানে এলে ঠাণ্ডায় ত্রাহি ত্রাহি করি। তবে পৃথিবীর নানাস্থানে জলবায়ুর তুলনা করলে দেখা যায় এ দেশ খুব বেশী গরমও নয়, খুব বেশী ঠাণ্ডাও নয়। এখানে জলবায়ুর পরিবর্ত্তন কিন্তু খুব বেশী এবং ঝড়-ঝাপটাও লেগেই থাকে। এ দেশে প্রচুর গাছপালা জন্মায়। পণ্ডিতেরা বলেন যে বহুকাল আগে নাকি এখানে ছিল এক নিবিড় অরণ্য। কিন্তু কালক্রমে এখানে প্রকৃতির এবং মানুষের যত পরিবর্ত্তন ঘটেছে পৃথিবার কোথাও তত ঘটে নি।

ওক্, এল্ম্ এবং বিচ্ই হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ দেশের প্রধান বৃক্ষসম্পদ্। খুব বেশী শীত পড়বার আগেই এই সব গাছ নিজেদের পাতা ঝরিয়ে ফেলে। তার কারণ হচ্ছে এই যে এখানকার মাটি খুব শুক্‌নো নয় ব'লে গ্রীষ্মকালে এই সব গাছ শিকড় দিয়ে প্রচুর জল টেনে নিয়ে শরীরের পুষ্টি সঞ্চয় করে। খুব শীত পড়্লে কিন্তু এরা খাদ্য এবং জল কোনটাই বেশী করে আহরণ করতে পারে না। সুতরাং শীতের মাঝামাঝি যদি এদের পাতা ঝর্তো তা হলে হয়তো এরা দুর্ব্বল হতে হতে একেবারে মরেই যেতো। সুতরাং তাদের জীবনধারণের এই আবশ্যক কাজটা তারা শীত খুব জাঁকিয়ে পড়বার আগেই শেষ করে রাখে।

এ দেশের যে দিক্‌টা অধিকতর শুক্‌নো সেখানে নদীর ধার ছাড়া বড় বড় গাছ বড় একটা জন্মায় না। বৃক্ষশ্রেণী শেষ হতেই এসে পড়ে দিগন্ত-বিস্তৃত তৃণভূমি। রুশিয়ার ষ্টেপ্‌সই বল, ক্যানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইরিই বল অথবা দক্ষিণ আমেরিকার প্যাম্পা এবং অষ্ট্রেলিয়ার ঘেসো মাঠের কথাই বল—সবই এই নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছে।

মাঠের পরে মাঠ বনের শেষে। তাই বোধ হয় ভগবান্ তাঁর সৃষ্ট জীবদের এই আবহাওয়াতে প্রধানতঃ দু'টি ক্ষমতা দিয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে মাটি খুড়ে গর্ত্ত করে তার মধ্যে থাকবার ক্ষমতা; দ্বিতীয়টি হচ্ছে আবশ্যক মত দ্রুতগতিতে যাওয়া-আসার শক্তি। কাঠবিড়ালী এবং তার জাত-ভাইদের এই আবহাওয়ায় খুব বেশী মেলে। বড় বড় জন্তুদের মধ্যে বুনো গাধা এবং ঘোড়া, অষ্ট্রেলিয়ার অঞ্চলের ক্যাঙারু এই আবহাওয়ারই সৃষ্টি। ছুট্‌তে এরা অসাধারণ পটু। আমেরিকার প্রেইরি ভূমির রাজা বাইসন্‌কে এক কালে এই জলবায়ুতেই মিল্‌তো। দুঃখের বিষয় মানুষের অত্যাচারে তার বংশ এখন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া আমেরিকার প্রান্তরভূমিতে শিংওয়ালা হরিণও পাওয়া যায়। ঘেসো জমি ব'লে কীটপতঙ্গের অভাব নেই; বরঞ্চ কি ক'রে এই পোকামাকড়ের অত্যাচার থেকে নিজেদের বাঁচাবে মানুষ এই ভাবনাতেই আকুল। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে প্রচুর পাখীও মেলে। বিশেষ ক'রে এ অঞ্চল হচ্ছে গাইয়ে পাখীদের রাজত্ব। শীতকালে পোকামাকড়ের অভাব ব'লে বহু পাখী এদিক্ থেকে দক্ষিণে যায়। কাঠবিড়ালী জাতীয় ছোটখাট জীবেরা গ্রীষ্মকালে পেট পূরে খেয়ে নেয়, তার পর সারা শীত গর্ত্তের মধ্যে গরমে ঘুমোয়।

মানুষের কর্ম্মশক্তির অভিব্যক্তি পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যতটা প্রকাশ পেয়েছে এমন আর কোন স্থানে পায় নি। সে জঙ্গল কেটেছে, মাটি পরিষ্কার করে তাতে নানা প্রকার শস্য বপন করেছে। নিজের কাজে লাগাবার জন্যে বন্য পশুকে পোষ মানিয়েছে। বিবিধ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কলকারখানার পত্তন করেছে। এক কথায় নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশগুলি হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ জাতির লীলাভূমি এবং জ্ঞানে, গুণে ও সভ্যতায় আজ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এই আবহাওয়া ছাড়িয়ে আর একটু অগ্রসর হ'লে আমরা দেখতে পাই শুষ্কতা আরও বাড়ছে এবং বৃষ্টি কমে আসছে; নতুন শুষ্ক এবং রুক্ষ জলবায়ুর আভাস পেয়ে বুঝ্‌তে পারি আমরা ক্রমশঃ মরুদেশের দিকে এগিয়ে চলেছি। এতক্ষণে আমরা পৃথিবীর এক মরু অঞ্চল থেকে অন্য মরুপ্রদেশে এসে পড়লুম। আমরা যাত্রা করেছিলুম বরফের মরুভূমি থেকে, এসে পৌঁছেছি বালুকাময় মরুভূমিতে।

পৃথিবীর এই আবহাওয়াতে বালির সঙ্গে অল্পবিস্তর লবণেরও ছড়াছড়ি রয়েছে। এ অঞ্চলে যে বিরাট হ্রদগুলি দেখতে পাওয়া যায় লোকে সেগুলিকে বলে লবণ-হ্রদ। সেগুলিতে জল নেই বললেই হয়। হ্রদের তীরে এসে উঁকি মারলে দেখতে পাবে যে জলের পরিবর্ত্তে সাদা লবণের চাদর পাতা রয়েছে। মরুভূমির দেশে যে বৃষ্টি খুব কম তা' আমরা সকলেই জানি। জলবায়ুর শুষ্কতা এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দরুণ এখানে জল অনবরত বাষ্পে পরিণত হচ্ছে,—যতটা জল বাইরে থেকে ঢুক্‌ছে তার বেশী ভাগই শুকিয়ে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে। আমরা এ কথা জানি যে পৃথিবীর সব স্থানেই জমিতে অল্পবিস্তর লবণ আছে। যে সব জায়গা দিয়ে কোন নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে সে সকল ভূমিভাগের লবণ জলের সঙ্গে মিশে অনেক পরিমাণে সমুদ্রে চলে যাচ্ছে। কিন্তু যে সমস্ত হ্রদে জল আস্‌বার পথ আছে, বাইরে চলে যাবার পথ নেই সেগুলিতে অনবরত লবণাক্ত জল এসে জমা হয়। জল যখন শুকিয়ে বাষ্প হয়ে যায় তখন লবণটা পড়ে থাকে। ফলে এই অঞ্চলের হ্রদগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর নুনের গুদাম। প্যালেষ্টাইনের ডেড্ সি বা মৃত সাগর এই ধরণের হ্রদের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মরুভূমিতে জীবনসংগ্রাম যে সবচেয়ে ব কথা বলে দিতে হবে না। উদ্ভিদ্ থেকে মানুষ এখানে প্রতি মুহূর্ত্ত প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে কোন রকমে বেঁচে থাকবার জন্য। মরুভূ তাকিয়ে দেখ, দেখ্‌তে পাবে এখানে ছায়াশী নেই, সবুজ ঘাসের কার্পেটও নেই। যত দূর কেবল বালি আর বালি। তাতে সূর্য্যের আ ঝক্ ঝক্ করছে; চাইলেই চোখ ঝল্‌সে যায়।

'ডেড্ সি' বা মরুসাগরের একটি দৃশ্য

প্রভৃতি কোন কোন মরুভূমিতে উদ্ভিদের চিহ্ন বললেই চলে। তবে পৃথিবীর বেশীর ভাগ মরুভূ নয়; মাঝে মাঝে কাঁটাগাছের ঝোপ বা খেজুর গ পাওয়া যায়। অবশ্য একটা গাছ থেকে অন্য দূরত্ব বেশ খানিকটা।

মরুভূমির গাছপালার জীবনধারণ আবার অন্য পানাহারের অভাব এদের এত বেশী যে যতটুকু ততটুকুকে যতক্ষণ পারে কৃপণের মত আঁকড়ে ধরে বেশীর ভাগ ছোট ছোট চারা গাছ বর্ষার সময় ছ ভেতরেই তাদের জীবন কাটিয়ে দেয়। বর্ষা শে

TIGHT BINDING

সঙ্গে সঙ্গেই মাটির উপরের অংশটা একেবারে শুকিয়ে ঝরে যায়। চোখে দেখলে মনে হয় গাছগুলো বুঝি মরেই গেল। কিন্তু মরুভূমিতে যাদের জন্ম তাদের প্রাণ এত সহজে যায় না। মাটি একটু খুঁড়ে দেখো, দেখবে প্রাণের অস্তিত্ব সারা বছরই বর্ত্তমান রয়েছে। মাটির ভেতরের উষ্ণ অন্ধকারে এরা অপেক্ষা ক'রে থাকে কখন আবার সূর্য্যের আলো দেখবার সুযোগ এদের জীবনে আসবে। মরুভূমিতে ক্ষণস্থায়ী বর্ষার আবির্ভাব যেই হবে, তৃষিত বালুরাশি যেই আকাশ থেকে ঝরে-পড়া দু'একটা উষ্ণ বৃষ্টির ফোঁটাকে চুষে খাবে অমনি এরা পত্রপুষ্পে নিজেদের সজ্জিত করে বালির উপর উঁকি মারবে। কিন্তু মরুর এই সৌন্দর্য্য ক্ষণস্থায়ী মাত্র। শেষ বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে এদেরও মাটির উপরকার জীবন সাঙ্গ হবে। আবার সুরু হবে উষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে পুনর্জন্মের জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রাম।

মরুদেশের বড় বড় গাছগুলো এ সব লুকোচুরী খেলা ভালবাসে না। অন্য উপায়ে তারা পারিপার্শ্বিক শুষ্কতার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। বর্ষায় তারা তাদের শরীরে যে জল সঞ্চয় করে রাখে তার জোরে সারা বছর অনায়াসে কাটাতে পারে। বর্ষণশেষে শীতের রুক্ষতার ভয়ে তারা মাটির তলায় ডুব মারে না; বুক ফুলিয়ে বলে—"যুদ্ধং দেহি।" এই সব গাছ নিজেদের কাণ্ডের মধ্যে যে প্রশস্ত শূন্য স্থান রয়েছে তাতে এত জল সঞ্চয় করে রাখতে পারে যে বছরের পর বছর মাটি থেকে আর পানাহার না পেলেও দীর্ঘ দিন তারা সতেজ থাকে। ডাঃ ম্যাকডুগাল এই ধরণের একটি গাছকে এরিজোনার মরুভূমি থেকে এনে এক মিউজিয়ামের মধ্যে রেখে পরীক্ষা করেছিলেন। দীর্ঘ এগারো বছর এই গাছটি নিজ দেহের সঞ্চিত জলে নিজের জীবন রক্ষা করে জীবন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। প্রত্যেক বৎসর ঠিক সময়টিতে তার পাতা গজাতো এবং ঝরে যেতো।

কোন কোন গাছের শুধু কাণ্ড নয়, শাখা-প্রশাখায় পর্য্যন্ত প্রচুর জল সঞ্চয় ক'রে রাখবার স্থান থাকে। নানা শ্রেণীর ক্যাকটাস জাতীয় বৃক্ষ হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমেরিকার মরুভূমিতে এক রকম ক্যাকটাস গাছ দেখতে পাওয়া যায় যার আগাতে জল সঞ্চিত থাকে। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক ধারাল ছুরি দিয়ে আগা ফুটো করে দিলেই সুমিষ্ট জল ঝরণার মত বেগে নীচে পড়তে থাকে। মরুভূমির গাছেরা শুধু নিজেরাই বাঁচে না, অন্যকেও বাঁচাতে জানে।

নিজেদের দেহে জল সঞ্চিত করে রাখতে হলে এটাও দেখা দরকার যে, যে জলটা রাখবার চেষ্টা হচ্ছে সেটা যেন বাষ্পাকারে নিঃশেষিত হয়ে না যায়। বৃক্ষেরা তাদের শরীরে যে জল সঞ্চয় করে পাতার ছিদ্রের মধ্য দিয়েই সাধারণতঃ তা বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। মরুভূমির বৃক্ষেরা জল সঞ্চয়ের জন্য শরীর থেকে পত্রসজ্জা ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয় নি। এ জন্যেই আমরা দেখতে পাই এদের মধ্যে অধিকাংশই পত্রহীন কাণ্ড মাত্র। কোন কোন গাছের পাতা আবার এত সূক্ষ্ম যে তা থেকে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে যেতে পারে না। কোন কোন গাছ তাদের সর্ব্বাঙ্গ মোমের মতন আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখে—যাতে জল বাষ্পাকারে উড়ে না যায়। শিশি-বোতলের মুখে আমরা যে ছিপি ব্যবহার করি তাও গাছের আবরণ মাত্র; সে আবরণ গাছ ব্যবহার করে তার শরীরের জলকে আটকে রাখবার জন্য। মরুভূমির কোন কোন উদ্ভিদ্ আবার সম্পূর্ণ অন্য উপায়ে শরীরে জল সঞ্চয় করে। তারা তাদের পাতায় ঘন কেশর জন্মায়। ঘন কেশরগুচ্ছ জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে সমর্থ হয়।

শরীরে শুধু জল সঞ্চয় করে রাখলেই চলবে না, তাদের অল্পস্বল্প পত্রপুষ্প যা কিছু আছে সেগুলিকেও পশুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। এই জন্যে মরুভূমির প্রায় সমস্ত বৃক্ষই কণ্টকাকীর্ণ। এই ভাবে বহু বিচিত্র কৌশলে যুগ যুগ ধরে উদ্ভিদেরা পর্য্যন্ত মরুর শুষ্কতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বাঁচিয়ে বেঁচে রয়েছে।

বি-কোর্স

শ্রীসুবোধ বসু

ঢং ঢং ক'রে ইস্কুলের ঘণ্টা পড়ল। ক্লাসে না ঢুকে এতক্ষণ যে সব ছাত্র এঁদো গলিটার এখানে ওখানে ঘোরাফেরা করছিল এইবার তারাও তাড়াতাড়ি ইস্কুল-বাড়ির দেওয়াল টপ্‌কে, জলের পাইপ বেয়ে, ভাঙা জান্‌লা গলিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে লাগল। এ রকম ক'রে ঢোকাই এখানে নিয়ম। ঢুকতে ছাত্রদের কোনই অসুবিধে হয় না। কে কত সহজে দেওয়াল টপ্‌কাতে পারে তার বিচার ক'রে বছরের শেষে সেরা প্রবেশ-কারীকে প্রাইজ দেওয়া হয়।

সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে এমন করে পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢোকাটা আশ্চর্য্য ব্যাপার মনে হতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের এতে আর কি আছে? এ স্কুলের সবই আর পাঁচটা ইস্কুলের চেয়ে আলাদা। পড়া আলাদা, বই আলাদা, হোম্-টাস্ক আলাদা, ভালো ছেলে আলাদা, গুড্ কনডাক্ট আলাদা। একবার ইস্কুলের ভেতর ঢুকে পড়লেই এই তফাৎটা তক্ষুণি চোখে পড়বে। তবে ভর্ত্তির একটু কড়াকড়ি আছে; যাকে তাকে য়্যাড্-মিশন দেওয়া হয় না। বাইরে থেকে এসে যে ইচ্ছে মতো হুট্ করে ভেতরে ঢুকে পড়বে, তার উপায় নেই। ছাত্র আর 'ভিজিটর' সবাইকেই খুব পরীক্ষা ক'রে তবে এখানে ঢোকান হয়। সুপারিশ-পত্র না থাকলে এখানে নাক গলাবার সম্ভাবনা নেই।

একবার ম্যাট্রিক ক্লাসে ঢুকে পড়তে পারলেই এখানকার পড়াশুনার নমুনা পাওয়া যাবে। ক্লাস-টিচার সাংঘাতিক সিংহের লেশ-বসানো ফিনফিনে মলমলের পাঞ্জাবি গায়ে, তার নিচে থেকে লাল রঙের রেশমি গেঞ্জির রং ফুটে বের হচ্ছে। চওড়া পাড়ের একটা সাদা শাড়ি লুঙ্গির মতো বেড় দিয়ে পরেছেন। পায়ে গণ্ডার মার্কা নাগ্‌রা জুতো। বড় গোঁফের দুই প্রান্ত পমেটম দিয়ে ছুঁচ্‌লো করা, কানের ছ্যাঁদায় আতর-মাখান তুলো গোঁজা, মুখে আধপোড়া বিড়ি। উল্কি-আঁকা ডানা তুলে তিনি সরলমতি শিশুদের উপদেশ দিচ্ছেন। সহসা বক্তৃতা থামিয়ে তিনি পাশের বেঞ্চের হাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'বল দেখি, হেবো, আদ্দির পাঞ্জাবির
জন্য দু' নম্বর কাঁচি দরকার হলে খাদির
জন্যে ক' নম্বরের দরকার হবে?'

হাবু সসম্ভ্রমে বেঞ্চি থেকে দাঁড়িয়ে, ঢোক
মাথা চুলকে বললে, 'আজ্ঞে স্যার, খদ্দরের পকে
উদাহরণটা এখনো পড়ান নি।'

'তবেই হয়েচে।' সাংঘাতিক বাবু হতাশ
বললেন। 'ও রকম নিরেট মাথা নিয়ে এখানে
এসেছিস কেন? যা না, কোনও হাই ইস্কুে
ভর্ত্তি হ'। পড়ান হোক আর না পড়ান হো
খাটিয়ে কার্য্যোদ্ধার করে আসতে হবে। তাই
পারবি, তবে বড়-বিদ্যা শিখতে শখ কেন?
বাপের পয়সা নষ্ট ক'রে আর লাভ কি? ছে
শেখ গিয়ে…'

'আজ্ঞে তাই তো চেয়েছিলাম স্যার', কাঁচুমাচু
বললে। 'বাবা রেগে বললেন, পরিবারের নাম
চাস? কোথায় ভাবলাম, তোকে বড়-বিদ্যা
পৈতৃক ব্যবসাটা আরও জাঁকিয়ে তুলব, আর
তুমি ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সেজে বসে আছ! দু'
ক্লাসে ফেল করলে কিছু এসে যায় না। কি
থাক। ওস্তাদ মাষ্টার মশায়দের কাছ থেকে বা
যদি কিছুও শিখে আসতে পারিস, তবে হি
যাবে। ছোট বিদ্যা শিখে শুধু শুধু কেরাণী হয়ে মর

'ও, এই কথা!' সাংঘাতিক বাবু অবজ্ঞাভরে
'তুই এক কাজ কর। তুই বি-কোর্সে যা। ভ
ভেজাল আর মেকি চালাবার কৌশলই শেখ
রাহাজানি করা তোর কর্ম্ম নয়। একটু ভুলে
যেখানে হাতে হাতকড়ি পড়ে, সেখানে প্র
মস্তিষ্কের দরকার। তোর তা নেই। যতই ঠু
কেন, মাথায় যা নেই তা কক্ষনো গজাবে না
দেখি ভূতো, লোহার সিন্দুক ভাঙবার আধুনিক
কি কি?'

ভূতো গড়গড় করে জবাব দিলে। মাষ্টার মশায় খুশি হয়ে বল্লেন, 'বেড়ে বলেছিস। মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো করলে একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবি। বস। মাণিক কে?'

মাণিক পেছনের বেঞ্চ থেকে বললে, 'স্যার?'

'কাল যে হোম্-টাস্ক দিয়েছিলাম, ক'রে এনেছিস?'

'এনেছি, স্যার।'

'নিয়ে আয় দেখি। বড়লোকদের সইয়ের নমুনা-খাতাটাও আন। দেখব কতটা মিলেছে। ব্যাঙ্কের লোক-গুলি ত্যাঁদড়ের হাঁড়ি, সই হুবহু না মিললে চট্ ক'রে ধরে ফেলে। অন্যদের সই জাল ক'রে খেতে হলে সই পাকা করতে হবে। কোনও রকমে নকল ক'রে ফেললি, আর হয়ে গেল, বড় বিদ্যায় তা হলে চলবে না। স্বাক্ষরকারী নিজেও জাল ধরতে পারবে, এমন হলে তবেই সহি-জ্যামিতি শিখেচ বলা চলবে।'

'অনেকটা এগিয়ে এনেছি, স্যার।' মাণিক মাথা চুলকে বললে। 'চেকে বাবার নাম জাল ক'রে কাল ব্যাঙ্ক থেকে গোটা পঁচিশেক টাকা তুলে এনেছি।'

'সাবাস।' সহর্ষে সাংঘাতিক নাযু বললেন। 'তা হলে কিছু উন্নতি করেছিস স্বীকার করতে হবে। তবে এখনও অনেক শেখবার আছে। বাপের নাম জাল ক'রে চেক ভাঙানো অন্য কথা; ছেলে ধরা পড়লেও বাপ জাল সইকে নিজের সই বলেই মেনে নেবে, কিন্তু অপরে তো ছেড়ে দেবে না। যখন পরের নাম সই ক'রে পঁচিশ টাকা নয়, পঁচিশ হাজার টাকা লোপাট করতে শিখবি, তখনই ইস্কুলের প্রসপেক্টাসে তোর কৃতিত্বের কথা লেখা হবে। তার আগে নয়।'

'অনেকটা রাত জেগে পড়ছি স্যার! হয়ে যাবে।' বলে মাণিক তার টাস্ক-খাতা এনে হাজির করল।

এ ঘণ্টার পর নীতিশিক্ষার ক্লাস আরম্ভ হ'লো। সেকেণ্ড মাষ্টার মিথ্যাশরণ বাবু যত্ন নিয়ে নীতি শেখান। তাঁর দু' চোখ গাঁজা খাওয়ার দরুণ লাল, মুখে ভুরভুরে তাড়ির গন্ধ। তিনি বলছেন, 'নীতিশিক্ষা না করলে চরিত্র গঠন অসম্ভব। অথচ মজবুত ক'রে চরিত্র গঠন না করলে কোনও সৎসাহসই তোমরা দেখাতে পারবে না। চুরি, গুণ্ডাগিরি, জালিয়াতি, রাহাজানি সব কিছুর জন্যই বুকের পাটা চাই। খুব মন দিয়ে নীতি শিক্ষা করবে।'

'আমরা খুবই মন দিয়ে পড়ি স্যার।' সবাই এক যোগে চেঁচিয়ে বললে।

'পড়িস? আচ্ছা বল দিকি ভূতো', মিথ্যাশরণ বাবু বললেন, 'সদা কিরূপ কথা বলিবে?'

ভূতো কহিল, 'আজ্ঞে, সদা মিথ্যা কথা বলিবে।'

"মিথ্যাশরণ বাবু খুসি হয়ে বললেন, 'বস্। ঠিক বলেছিস। এবার তুই বল দেখি মাণিকে, অতি সাধুতা কাকে বলে? কিরূপেই বা তা করা উচিত?'

'পরের দ্রব্য না বলিয়া নেওয়ার নাম অতি সাধুতা'—মাণিক সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিল।

মিথ্যাশরণ বাবু খুসি হয়ে উঠলেন। বললেন, 'বাঃ বাঃ, বেশ উন্নতি হচ্ছে। ভালো করে পড়াশুনা চালালে ম্যাট্রিকে এবার আমাদের রেজাল্ট ভালো না হয়ে যায় না। বল দেখি, হেবো, ব্যবসার মূল মন্ত্র কি?'

হেবো দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'সততাই ব্যবসার মূল মন্ত্র।'

মিথ্যাশরণ বাবুর সব আনন্দ শুকিয়ে গেল। চোখ পাকিয়ে বললেন, 'সততা! ওরে লক্ষ্মীছাড়া, এত দিন ধরে শেখাচ্চি কি? কত বার বলব, জোচ্চুরিই হচ্চে ব্যবসার মূল মন্ত্র। লোক না ঠকালে ব্যবসায়ে বড়লোক হওয়া যায় না। তবু বলবি, সততাই ব্যবসায়ের মূল মন্ত্র! নাঃ, বড়-বিদ্যা শেখা তোর কর্ম্ম নয়। ছোট বিদ্যার কু-প্রভাবে একেবারে বিগড়ে গেছিস! এক কাজ কর, কিছুদিনের জন্য এক প্রাইভেট টিউটার রাখ। বাড়িতে ঘসে-মেজে সে যদি তোকে পদে আনতে পারে। নইলে আর কোনও ভরসাই নেই। আর তুই যে রকম হাঁদা টাইপের, তাতে তোর ব্যবসা ছাড়া আর উপায় নেই। তার মূল মন্ত্রটা যদি চট্‌পট্ শিখে নিতে না পারিস, তবে অাখেরে অনুতাপ করবি। আমার শালা এ বিষয়টায় ষ্ট্রং। বাপকে একবার জিজ্ঞেস করে তাকেই না হয় কিছু দিনের জন্য রাখ।'

"আজ্ঞে, বাবা বলেন", মাথা চুলকোতে চুলকোতে হাবু বললে, 'বাবা বলেন, ভালো করে কাঁচি চালাতে শেখ। ওতে মূলধনের দরকার হয় না, অথচ চটপট কাঁচা পয়সা

তে আসে। পূজোর মুখে নামী দোকানের খদ্দেরদের কেটে কাঁচি চালিয়ে তিনি একদিনে দেড় হাজার টাকা রোজগার করেছিলেন।'

'করেছিলেন তো বটে', মিথ্যাশরণ বাবু ভেংচে বল্লেন, কিন্তু তুমি যে তাঁর কুপুত্তুর! সদর রাস্তায় অন্যের কেটে কাঁচি চালাতে যে মুরোদ লাগে, তোর সে-মুরোদ -কাঠামোয় গজাবে না। তুই বরঞ্চ সোজা কোর্স নে। বসা করে কি করে ঠকাতে হয়, তুই সেই আর্টে শেষজ্ঞ হ'। ইউরোপে যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে। এ বিদ্যার স্পেক্ট খুবই উজ্জ্বল। তুই বি-কোর্সে ম্যাট্রিক দে। দ পারিস তো ও-ই পারবি, এ-কোর্সে পাস করা তার কর্ম্ম নয়।'

'বাবাকে জিজ্ঞেস করে আসব, স্যার,' হাবু বিনীত ভাবে জানাল।

'তাই করিস। আর না হয়, আমিই গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আসব। উনি প্রাতঃস্মরণীয় লোক। এমন বড়-বিদ্বান্ লোক শহরে ক'টা আছে! অথচ নিজের চেষ্টায়ই উনি এত বড় হয়েচেন। ওঁদের কালে তো এখনকার মতো বড় বিদ্যার ইস্কুল-য়ুনিভার্সিটি ছিল না। ন, বস্। বনেদী ঘরের ছেলে। মূলধনের অভাব কি? কাবার আট টা শিখলেই শতকরা দুশো তিনশো টাকা মুনাফা করতে পারবি। হ্যাঁরে, শুনেচি তোদের বাড়ির গাঁজা খুব ঝাঁঝালো? ভরি খানিক এনে দিস তো বাবা! বি-কোর্সে যা। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করচি, ও দিকে একদিন 'শাইন্' করতে পারবি। ওটা ধীরস্থির অমায়িক লোকেরই লাইন।'

মিথ্যাশরণ বাবুর এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নি। হাবু যখন বি-কোর্সে বড়-ম্যাট্রিক পাশ করে বের হয়েছে, তখন দ্বিতীয় বিশ্বসমর আরম্ভ হয়ে গেছে। হাবু কয়েক হাজার মণ চাল কিনে তা লুকিয়ে ফেললে ও সের প্রতি তাতে এক পো কাঁকর ও পাথরের কুচি মিশিয়ে কালো বাজারে পাঁচগুণ মুনাফায় বিক্রি করতে লাগল। দেখতে দেখতে সে কয়েক লাখের মালিক হয়ে উঠল। কয়েক লক্ষ লোক অনাহারে মরবার পর যখন চাল রেশনিং শুরু হ'ল তখন সে কাঁকর মেশানো চাল সরকারকেই বেচে ফেল্লে। চালের ব্যবসা গুটিয়ে সে কাপড়ের ব গেল। ফলে, কাপড় দুষ্প্রাপ্য ও কাপড়ের দাম চ চড়ে উঠল। সর্ষের তেলের ব্যবসাও সে সাফল্যের চালালে। চিনির ব্যবসাও। যা কিছুই দুষ্প্রাপ্য হ তাতেই তার হাত আছে।

একদিন মোটর হাঁকিয়ে হাবু মিটিঙে যাচ্ছে, সময় বড়বাজারের মোড়ে মাণিককে করুণ মুখে দাঁ থাকতে দেখে সে গাড়ি থামালে।

'আরে, মাণিকে, এখানে কি কচ্ছিস?' হাবু বল

'চুপ চুপ', মাণিক চম্‌কে চেয়ে দেখে বল্লে, 'এ মাড়োয়ারিটার পকেট হাল্‌কা করবার অপেক্ষায় আ

'ওতে আর ক' পয়সা পাবি?' হাবু তাচ্ছিল্যে বল্লে। 'এতে না আছে পয়সা, না আছে আভি ব্যবসা বলতে এখন কল্‌কো বাজার। দু'চার মাসে হয়ে যাওয়া যায়। চুরি, গুণ্ডামি, রাহাজানি, পকে —এ আবার ব্যবসা? আজকাল এমন কি জালিয়া দিন চলে গেছে.....'

"কি করব ভাই!'—মাণিক হতাশার সঙ্গে 'লাইন বাছতে ভুল করেছিলাম। এ-কোর্স সবাই আমরাও নিয়েছিলাম। পড়া পারতিস না বলে বি-কোর্সে গিয়েছিলি। এখন দেখছি, যা লাভ বি-কোর্সের দিকে। যেমন ছোট-বিদ্যায় উকিলের বড়-বিদ্যায় আমাদেরও সেই দশা। তারপর, যাচ্ছিস?'

'মিটিঙে। জোচ্চোর ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নিন্দ পাস্ করতে হবে।...আর তোকে দাঁড় করাব না কাজে যাও সাবধান, আবার ধরা পড়ে যাস নে তোদের লাইনে আবার রিস্কও বেশী। স্কুলে মাষ্টার মশায়দের বলিস, যত বেশী ছেলে পারে বি-কোর্সে পাঠান। এখন বি-কোর্সের দিন।' হাবু গাড়ির স্টার্টার টিপে দিলে।

সম্ভবতঃ মাণিক তার কথাটা বড়-বিদ্যালয়ের মা বলে থাকবে, নইলে দেশে এত কালো বাজার আ ঠকাতে দক্ষ এত ব্যবসায়ীর আমদানি হলো আর থেকে?

ছাতা

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

বেশ বর্ষা নেমেছে। চারিদিক্ জলে ভরে গেছে। তার পর বৃষ্টি থামল, আর দু-একদিন পরে বাগানে দেখা গেল সাদা রংএর গোল গোল কতগুলো জিনিষ,—অনেকটা ছোট্ট ছোট্ট ছাতার মত—যা মাথায় দিয়ে আমরা বর্ষাকালে বৃষ্টির হাত এড়াবার চেষ্টা করি। তোমরা হয়ত সেগুলো বাড়ীতে তুলে আনলে, আর মা ধমক দিয়ে বল্লেন—"দে, শীগ্‌গির ফেলে দে। কোথা থেকে কতকগুলো ব্যাঙের ছাতা নিয়ে এসেছে! ওগুলো ছুঁলে গরল হয় যে!"

ওগুলো তা হলে ব্যাঙের ছাতা। ব্যাঙেরা বর্ষাকালে বুঝি ওরই তলায় আশ্রয় নেয়? আমরা ছোটবেলা তাই ভাবতাম, এবং কখন ব্যাঙ এসে ওর তলায় বসবে তার প্রতীক্ষা করতাম। বলা বাহুল্য, সে আশা কোন দিনই পূর্ণ হয় নি—কারণ ব্যাঙ কখনও ওর তলায় এসে বসে না, ব্যাঙের ছাতার সঙ্গে ব্যাঙের কোন সম্পর্কই নেই। ওগুলি আসলে এক রকম নীচু জাতের উদ্ভিদ্। বৈজ্ঞানিকেরা ওদের বলেন "ফাঙ্গাস্"।

উদ্ভিদ্ হলেও সাধারণ উদ্ভিদের সঙ্গে কিন্তু এদের কোনই মিল নেই। এরা অনেকটা শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের মত। এদের না আছে ফুল, না আছে ফল, এমন কি পাতাও নেই। শুধু চেহারাতেই এরা সাধারণ উদ্ভিদ্ থেকে আলাদা নয়, ব্যবহারেও যথেষ্ট বিভিন্ন। অন্যান্য উদ্ভিদের দেহে সবুজ-কণা থাকে (যার জন্য গাছের রং সবুজ) এবং তারা নিজেদের খাবার তৈরী করতে পারে। কিন্তু ছাতাদের সবুজ-কণার বালাই নেই, তাই এরা সাদা অথবা অন্য রংএর দেখতে হয়। এরা নিজেদের খাবার তৈরী করতে পারে না ব'লে পরের ওপর নির্ভর করে এবং মৃত অথবা জীবিত গাছপালার ওপর জন্মায়।

সাধারণতঃ এদের আকৃতি বহু শাখা-প্রশাখা-বিস্তারিত সরু সুতোর মত, বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলা হয় 'হাইফি'। অনেক সময় এরা গোল ধরণেরও হয়। প্রত্যেক হাইফা একটি অথবা বহু সংখ্যক কোষ দিয়ে তৈরী। প্রায় সমস্ত উদ্ভিদ-কোষে খাদ্য সঞ্চিত থাকে শ্বেতসার (স্টার্চ) রূপে, কিন্তু ছাতাদের কোষে জীব-জন্তু[র] কোষের মত থাকে গ্লাইকোজেন। এইখানে ছাতাদে[র] সঙ্গে উদ্ভিদের চাইতে জীবজন্তুরই যেন খানিকটা বেশী মি[ল] আছে। তা ছাড়া জন্তুদের মত সবুজ-কণার অভাবে[র] কথা তোমাদের আগেই বলেছি। অনেক নিম্ন জাতী[য়] ছাতারা আবার পোকা-মাকড়ের মত একটু-আধটু নড়[া]-চড়াও নাকি করতে পারে!

ছাতাদের বংশবৃদ্ধির প্রথাও অন্য গাছপালা থেকে আলাদা। এদের বংশবৃদ্ধির প্রধান অবলম্বন হচ্ছে 'স্পোর'। স্পোরগুলো হয় যেমনি আকারে ছোট, তেমনি সংখ্যায় অগণ্য। প্রত্যেক স্পোরের ভেতরে থাকে খানিকটা প্রোটোপ্লাজ্‌ম, আর তার বাইরে একটা মোটা আবরণ। এই আবরণের ফলে স্পোরগুলো সহজে শুকিয়ে যায় না এবং বেশী উত্তাপেও নষ্ট হয় না। এগুলো বাঁচেও হাইফির চাইতে অনেক বেশী। স্পোরগুলোর সঙ্গে বড় বড় গাছের বীজের কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে। আমরা মাঠে অথবা বাগানে যে সব ছাতা দেখি আসলে কিন্তু সেগুলো ছাতার অংশ মাত্র। অনেকগুলো হাইফি একত্রিত হয়ে ঐ রকম রূপ ধারণ করে। কোনটা ছাতার মত, কোনটা বাটির মত, আবার কোনটা বলের মত গোল। এদের রংও হয় নানা রকমের। এক একটা আবার ভারি সুন্দর দেখতে হয়। এগুলোকে বলা হয় 'ফ্রুট বডি'; এদের ভেতরে জন্মায় অসংখ্য স্পোর। 'ফ্রুট বডির' আকার একটা ছোলার মত ছোট হতে পারে, আবার মানকচুর পাতার মত বড়ও হতে পারে। 'ফ্রুট বডি' কিন্তু শুধু উঁচু ধরণের ছাতাদেরই হয়।

ছাতা নানা জাতের। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করেছ, খাবার-দাবার অথবা কাটা ফল বর্ষাকালে বেশীক্ষণ খোলা থাকলে পচে যায় এবং তার ওপর ছাতা পড়ে যায়। বাতাসে সর্ব্বদা নানা রকম স্পোর উড়ে বেড়ায়। স্পোর জল অথবা জলীয় বাষ্প এবং উপযুক্ত খাদ্য পেলে অঙ্কুরিত

হয় এবং তা থেকে নতুন ছাতা জন্মায়। এই জন্যই বৃষ্টির পরে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

ছাতারা শুধু আমাদের খাবার-দাবারই নষ্ট করে না, ধান, গম, কপি, আলু, কমলা লেবু প্রভৃতি গাছেরও মহা ক্ষতি করে। এদের অগণ্য স্পোর বাতাসে উড়ে বেড়ায় আর সুবিধে পেলে গাছপালাদের আক্রমণ ক'রে নষ্ট ক'রে দেয়। ধানের খুব অনিষ্ট করে হেলমিনথো-স্পোরিয়াম নামক এক জাতের ছাতা। এরা ধানের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। আলু, কপি, কমলা লেবু প্রভৃতিরও শত্রু আছে। ফাইটফথোরা হচ্ছে আলুর মহা শত্রু, এরা আলুকে পচিয়ে নষ্ট ক'রে দেয়। ভয়ানক ছোঁয়াচে এগুলো, একটা গাছ আক্রান্ত হলে অন্যগুলোও খুব সহজেই আক্রান্ত হয়ে পড়ে। পচা কমলা লেবুর গায়ে সাদা সাদা ছাতা ফুটে উঠতে বোধ হয় লক্ষ্য করেছ? এই ছাতাগুলোর নাম হচ্ছে পেনিসিলিয়াম। বিশ্ববিখ্যাত ওষুধ পেনিসিলিন ঐ রকম ছাতা থেকেই তৈরী হয়; তার নাম হচ্ছে 'পেনিসিলিয়াম নটেটাম'।

ছাতাদের মধ্যে অনেক বিষাক্ত ছাতাও আছে। যেমন, আমানিটা মুসকেরিয়া, আঃ ফ্যালয়ডিস, বলিটাস স্যাটানাস ও আরগট। এই নামগুলোই শুধু খটমট নয়, নামের অধিকারীরাও বেশ গোলমেলে। সাধারণতঃ বিষাক্ত ছাতারা রঙ্গিন হয়,—সবুজ, লাল প্রভৃতি রংএর। আমানিটা ফ্যালয়ডিস হচ্ছে খুব বিষাক্ত স্যাটানাস্ বিষাক্ত হলেও একই গোষ্ঠিভুক্ত কিন্তু মানুষের খাদ্য। কিন্তু খাদ্য হিসাবে ক্যামপেসট্রিস হচ্ছে প্রধান। অনেক দেশে চাষ পর্য্যন্ত করা হয়। চলতি কথায় এদের 'ব্যাঙের ছাতা' বা 'মাশ্‌রুম'।

সব ছাতাই মানুষের অনিষ্টকর নয় উপকারী ছাতাও আছে অনেক। এর মধ্যে নাম করতে হয় পেনিসিলিয়াম্ নটেটাম-এর; আগেই বলা হয়েছে। পেনিসিলিন আবি[ষ্কারের জন্য] ডাঃ ফ্লেমিং ও ফ্লোরিকে ১৯৪৫ সনে নোবল প্র[াইজ দেওয়া] হয়েছে। ইষ্ট-এর কথা তোমরা নিশ্চয়ই শু[নেছ।] আকারে অত্যন্ত ছোট আর দেখতে গোলাকার। একটি মাত্র কোষ দ্বারা এদের [দেহ গঠিত।] গ্লুকোজ হচ্ছে এদের বেশ ভাল খাদ্য। এই থেকে এরা এথাইল এলকোহল তৈরী করে। ভাইটামিন বি থাকে, সেইজন্য ওষুধ হিস[াবে] ব্যবহার আছে। এ ছাড়া পাউরুটি তৈরীর জ[ন্য] দরকার লাগে। আগেই বলা হয়েছে, আর বিষাক্ত ছাতা। কিন্তু তোমরা হয়তো জান, বি[ষও] মাত্রায় নিলে অনেক সময় ওষুধের কাজ করে। বেলাও তাই; এই বিষাক্ত ছাতা থেকে মা[নুষের] উপকারী ওষুধ তৈরী হচ্ছে।

উলিয়ানা

শ্রীসুরুচি সেনগুপ্ত

তার নাম উলিয়ানা; সে ছিল কৃষকের মেয়ে। রাশিয়ার এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে সে বাস করত। বাপ ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন। ছিল মা, আর ছোট একটি বোন। বাপ-মরা মেয়ে দু'টির মা-ই ছিল একমাত্র অবলম্বন, আর বোন দু'টির মধ্যে এত ভাব ছিল যে গ্রামের লোক তাদের বলত 'যোড়া পায়রা'!

কৃষকের মেয়ে হ'লে কি হয়, উলিয়ানা নিজের চেষ্টায় ভালো ক'রে লেখাপড়া শিখেছিল। অবসর পেলেই সে পড়াশোনা করে কাটাত। আর—আর দেশের ভাবত রাশিয়ার সেই কম্যুনি দলের [...] সদ[স্য] তার বয়স উনিশ বছর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়েছে। জার্মানি আক্রমণ ক'রেছে বিদ্যুৎ-গতিতে একটার [পর একটা] স্থান তারা অধিকার ক'রে নিচ্ছে। সমস্ত রাশি[য়া] বিপন্ন; এই পল্লীর গায়েও বিপদের ঢেউ এসে [...]

গ্রাম থেকে শত্রুর আস্তানা আর বেশি দূরে নেই। নীরব নিশীথে মাঝে মাঝে তাদের কামান-গর্জ্জনের আভাস পাওয়া যায়। কল্পনা-জল্পনা মুখর হ'য়ে ওঠে। কখন কোন্ সময় জার্ম্মান্‌রা এসে গ্রামে ঢোকে, না ব্যোম্ থেকে বোমা ফেলে বিধ্বস্ত করে সেই ভয়ে সকলে তটস্থ হ'য়ে আছে। গ্রামে তরুণ, যুবক নেই বল্‌লেই হয়, সকলেই যুদ্ধে চলে গেছে। আছে শুধু বৃদ্ধ, নারী আর শিশু। গ্রামখানা ছোট নয়, অনেক লোকের বাস; তা' ছাড়া মাঠে মাঠে তখন সবুজ ফসলের উৎসব লেগেছে। গ্রামকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতেই হবে, অন্ততঃ ফসল কেটে সরিয়ে না নেওয়া পর্য্যন্ত। খাদ্যসম্ভার এগিয়ে দিয়ে শত্রুকে শক্তি-শালী হ'তে দেওয়া হবে না কখনো।

গ্রামের প্রান্তভাগে শস্যক্ষেত্র ছাড়ালেই তিন দিকে নিবিড় অরণ্য। যেন সবুজের ঢেউ চলেছে। একদিকে শুধু বিস্তৃত উষর সমতলভূমি। গ্রামে ঢুকবার সেটাই পথ।

সেই সমতলভূমির নীচে এক মাইল জায়গা জুড়ে বারুদ সাজিয়ে রাখা হ'ল। শত্রুরা যখন ঐ পথে আস্‌বে তখন ঐ বারুদে আগুন ধরিয়ে দিয়ে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন ক'রতে হবে। কিন্তু অভিযানকারী শত্রুর সম্মুখে গিয়ে যে আগুন ধরাবে মৃত্যু তার নিশ্চিত। শত্রুর চোখে ধূলো দিয়ে আগুন দেওয়াও সহজ নয়।

এই দুঃসাহসিক কাজে যাবার জন্য গ্রামের লোকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হ'ল যে উলিয়ানা যাবে এ কাজে। কারণ অনেক দিন গেরিলা সৈন্যের সঙ্গে থেকে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রেছে সে, আর এ কাজে সবচেয়ে সে-ই ছিল উৎসাহী। তার বুদ্ধি ছিল প্রখর আর তার জার্ম্মান্ ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

নিজের জীবনের জন্য উলিয়ানা গর্ব্ব বোধ করে। উনিশ বছর বয়সে এত বড় দায়িত্বের কাজ পেয়ে বয়স যেন আরো উনিশ বছর বেড়ে যায়।

শোনা গেল, দশ মাইল দূরের একটা গ্রাম শত্রু-অধিকৃত হ'য়েছে। উলিয়ানা আর দেরি না ক'রে গ্রামের বাইরে চ'লে গেল। গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে সেই বারুদগর্ভ-সমতলভূমির কাছে নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে সে আশ্রয় গ্রহণ করল। কাউকে সঙ্গী করতে সে স্বীকৃত হ'ল না, তার হাতের বন্দুকই তার রক্ষক আর সাথী। শুধু দু'বেলা সাইকেল ক'রে তার মা আর বোন তাকে খাবার পৌঁছে দিয়ে যেত।

সেদিন সকালে উঠেই সে বুঝতে পারে যে শত্রু কাছে এসে পড়েছে। সে গাছের উপরে উঠে সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিক্ দেখ্‌তে থাকে। হঠাৎ মায়ের ডাক শুনে সে গাছ থেকে নেমে এলো। মা আর বোন খাবার নিয়ে এসেছে। সে ছুটে তাদের কাছে গেল; বল্‌লে, "বিপদের মুখে কেন এসেছো তোমরা? পালাও, পালাও।' মা বলেন, 'যে বিপদের মুখে তুই রয়েছিস্, তার থেকে আমি না-ই বা পালালাম। আয়, আজ তোকে নিজের হাতে খাইয়ে দি, তুই যে ছানার পুডিং ভালোবাসিস্—'

বোন কিছু না ব'লে শুধু তার গলা জড়িয়ে ধরে। কোলাহল এগিয়ে আসে, জোর করে তাদের সরিয়ে দেয় উলিয়ানা।

বনের মধ্যে শত্রুরা ছাউনি ফেলে, ইচ্ছে করেই ধরা দেয় সে। যদিও তার বেশভূষা ও কথায় তাকে একজন জার্ম্মান্ বালক না ভেবে উপায় ছিল না, তবু সে তাদের সন্দেহের দৃষ্টিতে পড়ল। উলিয়ানা বলে, সে একজন ছোক্‌রা জার্ম্মান্। রুশদের হাতে তার বাপ নিহত হ'য়েছে ব'লে সে প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু পনের বছর বয়স ব'লে সে সেনা-বিভাগে ভর্ত্তি হ'তে পারে নি, তাই শত্রু নাশ ক'রবার জন্য সে লুকিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। চল্‌তে থাকে বাদ-প্রতিবাদ। কিন্তু এই কিশোর বালককে হত্যা না করা সম্বন্ধে সকলে একমত হ'ল। একজন সৈন্য বল্‌লে, 'ঘন গাছের ঝোপে দু'জন রুশ মেয়ে ব'সেছিল, ধ'রে এনেছি। ছেলেটি যদি রুশ হয়, নিজের দেশের দু'টি নির্দ্দোষ মেয়েকে নিজের হাতে হত্যা ক'রতে ওর হাত কাঁপ্‌বেই।'

মেয়ে দু'টি আর কেউ নয়, উলিয়ানারই মা আর বোন গ্রামে খবর দেবার জন্য তারা তাড়াতাড়ি যাচ্ছিল, কিন্তু বেশী দূর যেতে পারে নি, শত্রুরা দেখতে পেয়ে ধরে ফেলে।

তিনটি প্রাণের মধ্যেই শোকের তরঙ্গ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, কিন্তু চোখের দৃষ্টির অথবা মুখের একটি রেখার পরিবর্ত্তন হ'ল না।

মা বোন বললে, 'বনে কাঠ কাটতে এসে আমরা পথ ভুলে গেছি, কোনো মন্দ উদ্দেশ্য আমাদের নেই—'

'পথ ভুলে গেছ?' আচ্ছা, ঠিক পথে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমরা'—সকলে বিদ্রূপ ক'রে হাসে।

উলিয়ানার বন্দুকে তার মা নিজের হাতে টোটা ভরে দিয়েছিলেন। সেই গুলিতে উলিয়ানা তাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিল। বল্‌ল, 'রুশ মাত্রেই আমার শত্রু, তা সে মেয়েই হোক্ আর ছেলেই হোক্।'

তারপর সে গ্রামের অনেক গুপ্ত সন্ধান ওদের জানাল। সাপ খুলে ওরা হুবহু মিলিয়ে নিল সব। বিশ্বাস হ'ল সেই কিশোর জার্ম্মান্ বালকের উপরে।

গভীর নিশীথে চোখের জলে উলিয়ানা মা আর বোনের আত্মাকে স্মরণ করে।

ভোর হ'য়ে গেল, বনের মাথায় মাথায় অরুণালোকের আরোহ। নীল আকাশে তুষারশুভ্র অসংলগ্ন মেঘের অভিযান চলেছে। বুট জুতোর শব্দ, ক্রুর কণ্ঠধ্বনি, কঠোর আদেশ বাক্য।

ছাউনি তুলে তারা গ্রামের উদ্দেশে রওনা হ'ল। ছিল উলিয়ানা—নির্ভীক, নির্ব্বাক্ হ'য়ে।

সমতল কঠিন ভূমির বুকে রূঢ় পদধ্বনির ছন্দ হ'ল। চারিদিকে আর কোনো শব্দ নেই, চরাচর যে হ'য়ে এই অভিযানের পরিণতি দেখছে।

চিহ্নিত স্থানে এসে পৌঁছা মাত্র উলিয়ানার হাউ হাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। পদাঘাতে সুড়ঙ্গের পথ সৃষ্টি করে চোখের পলকে ভূগর্ভে অদৃশ্য হ'য়ে গেল সে। একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়্‌ল চারদিকে, শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যদল চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল।

কেউ কিছু ভাববার আগেই মাটির নীচে গিরির কম্পন জেগে উঠ্‌ল। দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ, সুন্দর নির্ম্মম একদল জার্ম্মান্ সৈন্য ছিন্নমূল তরুর মত পড়্‌ল।

বিনামেঘে বজ্রপতনের শব্দ পেয়ে গ্রামের লোক বুঝতে পারে, উলিয়ানা যে কঠোর কর্ত্তব্যের ভার নিয়েছিল সে কর্ত্তব্য সে পালন করেছে। তার বোনকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দেখে, কেউ নেই, ঘর পড়ে আছে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

৮

বাজারে বাসবের সঙ্গে দেখা হ'ল বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে। বীরেশ্বর রায় এক সময়ে তাদের আখড়ায় বক্সিং লড়তে শেখাতেন। তিনি মানিকদার সহপাঠি। এই শহরেই স্কুলের কাছে খ্রীস্টানদের বসতির পূ তাঁদের বাড়ি। ছোট একখানা একতলা দালান বাড়িখানার চারধারেই গাছপালা। বীরেশ্বর

এখন কলকাতায় এক আফিসে চাকরি করেন। থাকেন মানিকদার সঙ্গে এক মেসে।

তিনি মানুষটা যেন কেমন ধরনের। চোখে খুব মোটা কাঁচের চশমা; শরীরটা থলথলে, মুখখানা গোল, মাথার চুলগুলো কোঁকড়া, কথাবার্তা বলেন কম, হাসেনও কম, কিন্তু মোটা কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থাকেন এত বেশি যে অনেক সময় মনে হয়, অত তাকাবার দরকার কি? অনেকেই তাঁকে পছন্দ করে না। কেউ বলে, "ওটা গোয়েন্দা," কেউ বলে "শয়তান", কেউ বলে "ছুঁচো।"

বাসব কিন্তু তাঁকে এমন কোন বিশেষণে ভূষিত করতে পারে না। তবে তারও লোকটিকে তেমন ভাল লাগে না।

বীরেশ্বর রায় বললেন, "ওহে বাসব, তোমাদের মানিকদাকে যে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।"

বাসব চমকে উঠলো। মনে পড়লো এই জন্যই তিনি এবার পূজোয় বাড়ি আসেন নি। জিজ্ঞেস করলে, "কেন?"

—"সে অনেক কথা। ও সব লোকের সঙ্গে আর মিশ না।"

—"এখন তাঁর কি হবে?"

—"মামলা হবে—স্বদেশী মামলা।" বলে বীরেশ্বর রায় আলু বাছতে লাগলেন।

বাসবও বাজার করতে লাগলো। কিন্তু তার সব আনন্দ মন থেকে গেল উড়ে। মামলা জিনিষটা সে ভাল করে বোঝে না। তার ওপর সেটি যখন "স্বদেশী" হয় তখন আরও যেন ঘোরালো হয়ে ওঠে। তার কাছে মনে হয় স্বদেশী মামলা কলেরা, যক্ষ্মা, টাইফয়েডের মতো। একবার ধরলে আর বাঁচবার উপায় নেই। বাঁচলেও শরীর আর সারে না।

দামান্য পয়সার বাজার, বেশিক্ষণ লাগলো না। বাজার করে সে চললো বাড়ি। পথে তার কেবলই মনে পড়তে লাগলো মানিকদার কথা। তবে একটা আশার কথা এই ছিল যে, মানিকদার এক মামা আলিপুরের খুব বড় উকিল। তিনি হয়তো মানিকদাকে খালাশ করতে পারবেন। মানিকদার মা ও ভাই কখন কখন তাঁর বাড়ি গিয়ে দু' দশ দিন থাকেন। বোধ হয় এবার মানিকদার এই খবর পেয়েই তাঁরা সেখানে চলে গেছেন। এই জন্যেই হলধর তখন তার কথার ভাল করে দেয় নি।

বাসব বাড়ি গিয়ে বাজারের থলিটা রান্না-ঘ দাওয়ায় রেখে, মাছটা এক পাশে ফেলে দিয়ে ধুতে ধুতে বললে, "মা, শুনেছো?"

মা বাটনা বাটছিলেন। বললেন, "কি রে?"

—"মানিকদাকে পুলিশে ধরেছে।"

মা বাটনা রেখে দিয়ে বললেন, "আমাদের মানিক বলিস্ কি? কেন?"

—"জানি না।"

—"আহা! কত কষ্ট পাবে। হীরের টুক ছেলেটা। সবই কপাল। যা স্বদেশী করতো!"

—"স্বদেশী করা কি দোষের?"

—"না হ'লে এমন হবে কেন? বাছারে!" একটা নিশ্বাস ফেলে মা আবার বাটনায় মন দিলেন।

এই মানিকদাকেই বুড়োরা সুনজরে দেখতেন একদল যুবক ঠাট্টা করতো। আবার এঁকেই কত বলে মানুষের মত মানুষ।

ব্যবহারের এমন অসামঞ্জস্য কেন হয় বাসব বুঝতে না। তারও যেমন কতকগুলো লোককে ভাল, কতকগু লোককে খারাপ লাগে, কেন যেমন ধরতে পারে ওদেরও হয়তো তেমনি হয়। এই ভাল লাগা না-লাগা হয়তো অকারণেই ঘটে। কিন্তু তার চিন্তাশক্তি আর একটু পুষ্ট হত এবং সে যদি চিন্তা করে দেখ শিক্ষা পেত, তাহলে তার চোখে এই সত্যটি ধরা যে বিনা কারণে এই পৃথিবীতে, ঐ গ্রহ-উপগ্রহে, সুদূর নক্ষত্রলোকে, স্থূল ও সূক্ষ্মজগতে কিছুই ঘটে মানিকদার মতো লোকেরাই হয়তো স্বার্থে আঘাত বলে বুড়োদের তাঁকে ভাল লাগে না; যুবকে তাঁর মতো হতে পারে না, অথচ হওয়া উচিত চিন্তায়, এই অক্ষমতার বেদনায় তাঁকে পছন্দ করে অথবা বুড়োদের শিক্ষা ও প্রভাবেই তারা তাঁর মারমুখো। কত রকম কারণ হতে পারে। আবার চেহারা, কণ্ঠস্বর, কাজকর্ম করবার ধরন, চাহনি, আ প্রভৃতিও দর্শকের মনে বিরাগ জন্মাতে পারে।

আরও একটা কথা তার মনে হতে লাগলো, স্বদেশী করা কেন দোষের? দোষেরই যদি হয় তবে নানা দেশের এবং তার নিজের দেশেরও দেশপ্রেমিকদের লোকে বীরের মতো পূজা করে কেন? কেন বা তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন? স্বদেশীতে যাদের স্বার্থে ঘা লাগে তারাই দেশের কাজ যারা করে তাদের মনে করে দোষী। আচ্ছা, পরদেশ কি? প্রশ্নটার পরিষ্কার উত্তর সে নিজের মন থেকে পেল না। এবং তখন বসে বসে নিজের মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নিজেই সেগুলির উত্তর দিয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলে না।

সে চুপ করে বাইরের আমতলায় ছায়ায় বসে রইলো। তাদের বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়। ছবিখানি ভাল, মনকে টানে। কিন্তু তখন মনই তাঁর কাছে ধরা দিতে চাইলো না ক্ষুণ্ণ হয়ে, বেদনায় অতীতের দিনগুলির মাঝে একাকী ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

বেলা হল। বোন মাধবী এসে বললে, "দাদা, নাইবে না?"

—"নাইবো।"

মাধু গাছের নিচের দিকের একটা ডাল ধরে তার পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে, "দাদা, তোমাকে গম্ভীর মানায় না! ভারী ভয় করে।"

বাসব জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকালো। তার মনেও জেগে উঠলো এক প্রশ্ন। অনেকে তাকে বলে, "এত চঞ্চল হওয়া ভাল নয়।" আবার মাধু বলছে, "তাকে গম্ভীর মানায় না।" কোন্‌টা ঠিক?

এই রকমের আর একদিনের ব্যাপারে মানিকদা তার সংশয় ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এই বলে যে, সকল মানুষের দেখবার শক্তি এক নয়। আর একই জিনিষ সকল সময় ভাল লাগতে পারে না।

বাসব মুখে হাসি নিয়ে উঠে পড়লো এবং ভেতরে গিয়ে মাথায় তেল দিয়ে, কোমরে গামছা বেঁধে চললো নদীতে।

মা বললেন, "শীগগির আসবি, সাঁতার দিয়ে বেশি দূর যাস্ নি।"

তিনি জানতেন, তাঁর ছেলেটির জলের সঙ্গে মিতালী আছে। একবার নদীতে নামলে সহজে উঠতে চায় না।

বাসব নদীটাকে বড় ভালোবাসে। কেন তা সে বলতে পারে না। সে বলতে পারে না তার স্রো ঢেউ তার নীলে রূপালীতে মিলানো আকা-বাঁকা শীতল স্পর্শ, অন্তরে লুকানো রহস্য স্বপ্ন হ তাকে টানে, ডাকে, ভুলিয়ে-দূরে নিয়ে যেতে চায় তবে এটুকু দেখেছে, এগুলো কখন এক সঙ্গে এক একটি করে তাকে মুগ্ধ ও লুব্ধ করে থাকে। করে ওপারের জনহীন তীর, তার ওধারে স্তব্ধ চর।

বাসব গিয়ে নদীতে নামলো। ছোট ভাই দু করছিল তীরে একটি বাড়ির বারান্দার আশ-পা দু-তিনখানি বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে। বাস নামলে তাদেরও মজা হয়। তারা তীরে দাঁড়ি সে কত রকম করে সাঁতার দিচ্ছে। এক এক স দিয়ে এতক্ষণ থাকে যে ভয় হয় বুঝি ডুবে গেছে।

ঘাটে ছিল অনেকেই। তারও সাথীদের ম অজিত ও সুরেশ। বাসব মনের ভারটা সাঁতারে, কথায়, তর্কে হাল্কা করে নিতে চায়। কিন্তু এ তর্কে ওস্তাদ নয়, ঝগড়ায়ও অপটু, তবে সাঁতারে কি মানিকদার প্রতি তাদেরও শ্রদ্ধা ছিল। বাসব তাদের জানালে তারাও কিছু ক্ষুণ্ণ ও শঙ্কিত হল।

অজিত বললে, "জেল হবে।"

সুরেশ বললে, "দ্বীপান্তর।"

বাসব বললে, "ওঁর মামা বড় উকিল। কিছু না।"

তারা অবিশ্বাসের হাসি হাসলো।

কিছু দূরে উকিল অবিনাশবাবু স্নান করা বাংলা জানা বুড়ো উকিল। জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের আলোচনা করছো?"

ছেলেদের আলোচনার প্রতি ওঁর ভারী কৌতূ বাসব বললে, "মানিকদার কথা।"

—"মানিক? কেন তার কথা উঠলো?"

—"তাঁকে পুলিশে গ্রেফতার করেছে।"

—"তোমরা কি করে জানলে?"

বাসবের উত্তর দিতে ইচ্ছা হল না, অনিচ্ছায় বি বললে, "বীরেশ্বরবাবু বললেন।"

TIGHT BINDING

—"বীরেশ্বর বাবু কে ?"

বাসব মারমুখো হয়ে উঠলো। অজিত ও সুরেশ তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে গেল।

বাসব বললে, "ওপাড়ায় থাকেন।"

—"কোন্ পাড়ায় ?"

বাসব কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ জলে ডুব দিল। এবং হাত কয়েক দূরে গিয়ে উঠে দেখলে অবিনাশবাবু মুখ গম্ভীর করে গা রগড়াচ্ছেন, অজয় ও সুরেশ পাড় দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

সে চললো সাঁতরে জামতলার ঘাটে, সেখান থেকে খানিকটা দূরে ভাটিতে। জামতলার ঘাটটা ভাল নয়। তার ডান দিকে এক জায়গায় পাক আছে। ঘাটটাতে আঠালো মাটিই বেশি, তাই কম লোকে স্নান করে। মেয়েরা পারত-পক্ষে নামে না। তাদের জলভরা কলসি-কাঁখে উঠতে হয়, পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবার সম্ভাবনা। তবুও বছরে দু'-একজনের ভাঙেও। যাদের কাছে হয় তাড়াতাড়ির বা সুবিধার জন্য তারাই নামে।

বাসব চলেছে সাঁতার দিয়ে।

হঠাৎ তার কানে এল, তীর ও নৌকো থেকে লোকের চীৎকার। সে প্রথমটা তাতে কান দিলে না, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, তারা যেন তাকেই লক্ষ্য করে চীৎকার করছে। সে ঘাটের দিকে ফিরে দেখলে, জলে কেউ নেই। ডাঙায় দাঁড়িয়ে নদীর দিকে হাত বাড়িয়ে সকলে চীৎকার করে বলছে, "কুমীর! কুমীর! ছোঁড়াটা গেল—গেল!"

বাসবের বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ির ঘা মারলো। একবার মনে হল, তার জীবনের সেই শেষ। কুমীরটা তাকে এখনি ধরে অথৈ জলে ডুবিয়ে নিয়ে মেরে ফেল্‌বে! উঃ! কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু! কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো, হাঙরের সময় কুমীর ধরতে পারে না। যদি এঁকে-বেঁকে সাঁতার দেওয়া যায় কুমীরের পক্ষে শিকারকে নজরে রাখা হয় কঠিন। কুমীর প্রথমে শিকারকে লক্ষ্য করে। তারপর চোরের মতে হঠাৎ তার কাছে গিয়ে লেজের ঝাপটা মেরে কাৎ ও কাবু করে কামড়ে ধরে জলে দেয় ডুব। তারপর—

বাসবের শরীরের ও মনের শক্তি দশগুণ জেগে উঠলো। বাঁচতে হবে—বাঁচতেই হবে। সেও সাঁতরে চললো এঁকে-বেঁকে তীরের দিকে। তার নিজের পা ও হাতের আঘাতে জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ হচ্ছে, সে সঙ্গে নদী ডাকছে কল্ কল্ ছল্ ছল্। হয়তো বলছে "চল্ চল সঙ্গে চল।" তীর ও নৌকো থেকে কারা কি বলছে সেই শব্দে সে শুনতে ও বুঝতে পারছে না, তার দরকারও নেই। কুমীর ও এক কিশোরে, মৃত্যু ও তরুণ জীবনে চলছে পাল্লা।

জিতবো—জিততেই হবে। কিন্তু ঐ বয়সের দৈহিক শক্তি তো প্রবল নয়, মানসিক শক্তিই বা কতটুকু তবুও সে চলেছে।

ঐ যে ঘাট—ঐ যে ডাঙা—এই যে পায়ের নিচে মাটি —এই যে তীর! বাসব মাটি আঁকড়ে ওপর উঠে হাঁফাতে হাঁফাতে একেবারে এলিয়ে পড়লো। দেখলে কুমীরটাও হু করে কিছু দূরে ভেসে উঠলো। তারপর একবার বিকট চীৎকার ছেড়ে বার কয়েক ঘুরপাক দিয়ে লেজ আছড়ে ব্যর্থ রোষে অতলে ডুবে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন এসে পিছন থেকে তাকে টেনে তুললে।

সে ফিরে দেখলে, মা। তাঁর পাশে মাধু। মা কাঁদছে, মা হয়তো কাঁদছিলেন। তাঁর চোখ দুটো ভিজে মুখখানি থমথমে, মাথার চুলগুলো খুলে পড়েছে, মাথা ঘোমটা নেই, যেন পাগল হয়ে গেছেন।

তাকে তুলে প্রায় জড়িয়ে ধরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "কোন্ দিন তুই এমনি করেই চলে যাবি।"

বাসব উত্তর দিতে পারলে না, অবসন্ন দেহে আস্তে আস্তে তাঁর পাশে চলতে লাগলো।

ঘাটে জড় হয়েছিল নানা বয়সের মানুষের ভিড়, তাই তার উদ্দেশ্যে মিঠে-কড়া নানা কথা বর্ষিত হ'তে লাগলো।

যেতে যেতে বাসব অনুভব করলে কে যেন তার হাত ধরলে। ফিরে দেখলে, তার ছোট ভাইটি। সে তার দিকে চোখ তুলে তাকালো।

বাসবের মন দুলে উঠলো। তাকে এত লোক ভালোবাসে!

(ক্রমশঃ)

স্মৃতির পটে

[আমাদের জীবনে অনেক সময় অনেক ছোটখাট কিন্তু কৌতূহলপূর্ণ বা স্মরণযোগ্য ঘটনা ঘটে। রামধনুর লেখকেরা মাঝে মাঝে স্মৃতির ভাণ্ডার খুঁজে এই ধরণের কিছু কিছু কাহিনী তোমাদের উপহার দেবেন।]

একটি ছোট রকম হাতাহাতি ব্যাপার

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা। আমাদের বয়স তখন অল্প, রক্ত গরম। দুর্গা পূজার পর কামাখ্যায় যাইতেছি। আমি ও আমার বন্ধু সতীশ (বর্ত্তমানে সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)। ট্রেনে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে পড়িতেছে না—একটি ছাড়া। তাও অস্পষ্ট। রাত্রে ঘুমের ঘোর রহিয়াছে। ট্রেন এক জঙ্গলে থামিয়াছে, নড়ে না। শেষটায় খবর পাওয়া গেল ড্রাইভার ও গার্ডে ঝগড়া হইয়া ট্রেন বন্ধ হইয়াছে। ড্রাইভার বুঝি ভয়ানক মাতাল হইয়া খালাসী-দিগকে মারধর করিয়াছে, তাহাদের একজন পালাইয়াছে।

ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। একজন যাত্রী গল্প সুরু করিলেন। তাঁহার নাকি এ অঞ্চলে গাড়ী চড়ার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। এই তেপান্তর জায়গায় সামাজিক বিশুদ্ধ সুখের এতই অভাব যে রেল-কর্ম্মচারীদের একমাত্র আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা প্রচুর মদ্যপান। এই লাইনের দুই ধারে বিশাল জঙ্গল। এখানকার ঘাস ছোট বাঁশের সমান লম্বা। দলে দলে হরিণ, বাঘ, গণ্ডার, ভালুক এই সব জঙ্গলে বিচরণ করে। একবার এইরূপ ট্রেন থামিয়াছিল। একটি লোক নীচে নামা মাত্র তাহাকে বাঘে তুলিয়া লইয়া যায়। এখানকার রেল লাইনের উপর বড় বড় বোড়া সাপ—যাহারা ছাগল বা ছোট হরিণ গিলিতে পারে—কাটা পড়িতে দেখা গিয়াছে। মাঝে মাঝে হাতীরাও দলবদ্ধ হইয়া ট্রেনকে চার্জ্জ করে; অনেক হুইস্‌ল্ দিয়া এবং বিরাট শব্দ করিয়া তবে তাহাদিগকে তাড়াইতে হয়। তিনি থামিলে আর একজন যাত্রী বলিলেন, এখানকার মাছিরা আরও ভয়ঙ্কর। একবার একটি লোক চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিল, খানিক পরে দেখা গেল সেখানে একটা কালো বস্তা রহিয়াছে। আর কিছুই নয়, অসংখ্য মাছির সমষ্টি। লোকটিকে,—মায় তার কাপড়, চাদর পর্য্যন্ত, নিঃশেষ করিয়াছে। শুনিয়া প্রথম গল্পকারী বিষম উঠিলেন। তাঁহার ধারণা তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া আজগুবী গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে। হইল। হাতাহাতি পর্য্যন্ত হয়ত হইত যদি না পাঁচ জনে থামাইয়া দিত।

যাহা হউক আমাদের দুরদৃষ্ট বা শুভাদৃষ্টক্রমে হাতী, মাছি, কেহই আমাদের ভয়ের বা কৌতূ কারণ হয় নাই। কেবল ঐ ঘটনার ফলে ক পাহাড়ের নীচে পাণ্ডু ষ্টেশনে পৌঁছাইতে বেশ একা হইয়া গেল।

ষ্টেশনে লোকজন ছিল। পাণ্ডা ও যাত্রী। এক পাণ্ডা সংগ্রহ করিলাম। আমাদেরই কাছ বয়স—সুদর্শন ও মিষ্টভাষী। এখানকার পা অধিকাংশই বেশ ফর্সা ও সুশ্রী, তবে দেওটা কিছু সং

"ষ্টেশন হইতে পাহাড়ের উপর (যেখানে ক দেবীর মন্দির ও তৎসন্নিহিত পল্লী) দু'-তিন মাইল রাস্তা চলাই—তবে মাঝে মাঝে রাস্তার পাশের হইতে এক-আধটা বাঘ বা ভালুক দেখা দেয় কাহাকেও মারিয়াছে এরূপ শুনা যায় না। আর অনেক লোক যাইতেছি, মানুষের সাড়া প জন্তু-জানোয়ার সরিয়া পড়ে।"—ইত্যাদি দ্বারা পাণ্ডানন্দন আমাদিগকে সেই রাত্রেই জঙ্গলের পথ দিয়া চলিতে উৎসাহিত ও উ করিল। না গিয়াই বা উপায় কি? নীচে কোন

খাদ্য বা আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে এমন সম্ভাবনা মনে হইল না।

পথিমধ্যে সেই পার্ব্বত্য বনপথের এক ধারে দেখিলাম এক তরুণ হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী—নগ্নদেহ, সারা গায়ে বিভূতি, পরনে কৌপীন, ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়া আছে।' সতীশকে বলিলাম, "এদের সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা অদ্ভুত। এই বনের মধ্যে নির্জ্জনে একা বাস করছে। এরা যদি নিজেদের পর্য্যটন-কাহিনী লিখতে পারত তা হলে তা হয়ত সোয়েন হেডিনের কাহিনী থেকে কম বিচিত্র হ'ত না!"

প্রবন্ধ-লেখক অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

তখন কে জানিত ঐই সন্ন্যাসীর সহিতই আমাদের সংঘর্ষ ঘটিবে?

তিন-চার দিন কামাখ্যা পল্লীতে পরমানন্দে কাটাইয়া ফিরিতেছিলাম, ঐ একই পথে। সঙ্গে সেই পাণ্ডানন্দন।

ব্যাপারটা এমনই অতর্কিত ভাবে ঘটিয়াছিল, এবং আমরা উহাতে এমন ভাবে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে আজিও উহার প্রকৃত কারণ ও সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সতীশ রাস্তার কিনারা দিয়া চলিতেছিল। সা ধুনিও রাস্তার পাশেই ছিল। সতীশের দুর্ভাগ্য সে ধু ঠিক পাশ দিয়াই চলিয়াছিল। সহসা সন্ন্যাসী অত্যন্ত রা উঠিয়া সতীশকে একটা অতি কুৎসিত গালি দি আমাদের মধ্যে আমার গায়ে একটু জোরও ছিল, অ 'ডনকুইক্সোটিক' মনোবৃত্তিও ছিল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ সাধুকে সম্যক্ শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে একবারে তা ধুনির উপর গিয়া উঠিলাম। কহিলাম, "তোম্ কা গাড়ি দিয়া?"

সাধু তড়িৎবেগে একখানি জলন্ত কাঠ—দুই-তিন হা লম্বা এবং তিন-চার ইঞ্চি ব্যাসার্দ্ধযুক্ত—লইয়া আমা আক্রমণ করিল। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার শারীরি শক্তি এবং ক্ষিপ্রকারিতা সাধুর চেয়ে একটু বেশী ছিল আমি দ্রুত কাঠখানি এক হাতে এবং তাহার অন্য হাতখা অপর হাতে ধরিয়া ফেলিলাম। ইতিমধ্যে সতীশ তাহা ছাতা দিয়া সাধুকে অনবরত প্রহার করিতেছে। সতী অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ও স্বল্পকায় লোকটি—কিন্তু এ ব্যাপারে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছে।

এখন, আমার বিপদ্ হইল সাধুকে সামলাই কি সতীশকে সামলাই! জলন্ত কাঠখানি সাধুও ছাড়ে না আমিও ছাড়ি নাই। সাধুর ভয়, পাছে আমি তাহার বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া জলন্ত কাঠখানি তাহারই উপ প্রয়োগ করি। আমার ভয়, এই গঞ্জিকা সেবনে আরক্ত লোচন, অর্দ্ধোন্মাদ ব্যক্তির হাতে ঐরূপ বিপজ্জনক হাতিয়া ছাড়িয়াই বা দেই কি করিয়া!

ইতিমধ্যে লোক জমিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের শেষাং যাহারা দেখিল তাহাদের মনে সাধুর প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক হওয়া অসঙ্গত নহে। দুই জন বাঙ্গালী বাবু একজ সাধুকে ধরিয়া পিটিতেছে। কাহারও কাহারও ঘটনা অধর্ম্মজনক ও অমঙ্গল-জনক মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নহে আমাদের পাণ্ডাটি বুদ্ধিমানের মত এই ব্যাপারে নিরাপ স্থান অধিকার করিয়া দর্শক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। তে দু'-এক জন লোক যখন আমাদের বিপক্ষে আন্দোল করিবার উপক্রম করিতেছিল তখন সে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিল, "যদি সাধুরা এইরূপে বাবুদে অপমান করে তাহা হইলে পাণ্ডাদের সব ব্যবসায় মা

বে।" এই, কারণে, এবং সম্ভবতঃ আমাদের মত সাহসিক লোকের বিপক্ষে, কিছু করাটা অনেকেরই তে সমীচীন হয় নাই।

কেবল এক বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা আমাদের প্রতি পালু এবং বাৎসল্যভাব ধারণ করিয়া সাধুর স্তুতি আরম্ভ রিলেন; "বাবা, তুমি অবোধদের ক্ষমা কর; শান্ত ও বাবা!"—ইত্যাদি।

সতীশ এখন শান্ত ও ক্ষান্ত হইয়া সাধুকে ছাড়িয়া য়াছে। জলন্ত কাঠখানিও সাধুর হাত হইতে নাইয়া নেওয়া গিয়াছে। সাধুকে ধুনির নিকট হইতে ঞ্চিৎ দূরে টানিয়া আনিয়াছি। এখন চিন্তা হইল ই জটিল ব্যাপারের মীমাংসা করি কি করিয়া।

সাধুকে ছাড়িয়া দিতে ভরসা হইতেছিল না—পাছে ামাদের উপর আবার লঙ্কাকাণ্ডের অবতারণা হয়। াহাকে দমাইয়া দিবার জন্য বলিলাম, "তোম্‌কো থানামে া যায়েগা।" কিন্তু 'থানামে' ব্যাপারটা সোজা নয়। চ-ছ' মাইল দূরে গৌহাটিতে থানা। অনিচ্ছুককে টানিতে নিতে তত দূর লইয়া যাওয়া সুখকর বোধ হইল না পথিমধ্যে সাধুর স্বপক্ষদলের সংখ্যা বৃদ্ধিও পাইতে পারে। াপাততঃ নিজেদের সম্মানটুকু অক্ষত রাখিয়া ব্যাপারটা কাইয়া চলিয়া যাইতে পারিলেই যেন বুদ্ধিমানের াজ হয়।

সাধুকে আর কয়েক গজ দূরে টানিয়া লইয়া যা সে শান্তভাব ধারণ করিল; বলিল, "ছোড় দেও, কুছ নেই করে গা।" "আউর কভি এসা নেই গা?" "নেই করে গা"। আমরা তাহাকে দিলাম।

ছাড়া পাইবা মাত্র সাধু গোটা দুই-তিন তাণ্ড দিল। অদূরস্থ ভূপতিত এক সুদীর্ঘ 'নারস তরুব গ্রহণ করিয়া তাহা ঘুরাইল। পুনরায় যুদ্ধোদ্যমের স দেখিয়া দর্শকবৃন্দ ক্ষিপ্র এবং দক্ষপদে রঙ্গভূমির বিস্তার করিল। সাধু যখন রাস্তা হইতে কয়ে প্রস্তর কুড়াইয়া লইয়া ছুঁড়িবার উপক্রম করিল তখ দুর্ব্বলতা দেখান বিপজ্জনক বুঝিয়া সাহসে ভর বলিলাম, "একঠো ইটা গামে লাগনেসে তোমারা হাড্ডি নেই সিধা রাখে গা"। এই আস্ফালনের হউক, কিংবা আমাদের বিক্রমের পরিচয় পাইয়াই কিংবা যষ্টি সঞ্চালন এবং লম্ফঝম্পের দ্বারা তীর্থবাস নিকট নিজ হৃত মান কতক ফিরিয়া পাইয়াছে ভ হউক, সাধুর ঢিল আর এদিকে আসিল না। সে ধুনির দিকে ধীরে অগ্রসর হইল।

আমরা আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আ তারপর মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে, কাজটা কি হইয়াছিল?

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল

শ্রীগৌরী দেবী

অল্প কয়েক দিন আগে খবরের কাগজে একটা ছোট্ট খবর বেরিয়েছিল, তোমরা তা লক্ষ্য করেছিলে কিনা জানি না। খবরটা আর কিছুই নয়—একটা সভার বিজ্ঞপ্তি। বৌবাজার সায়ান্স এসোসিয়েশনে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি সভার আয়োজন হয়েছিল। সভায় যোগ দেবার সুবিধা আমার হয় নি, কিন্তু ঐ দিনটিকে আমি বাঙ্গালীর জীবনে একটি পবিত্র, স্মরণীয় দিন ব'লে মনে করি, এবং বরাবর করব।

জানি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করবে—এই মহেন্দ্রলাল লোকটি কে? কি কাজ তিনি করেছিলেন যার জন্য তাঁকে এতটা শ্রদ্ধা দেখানো হ আমার ছেলেও আমাকে ঠিক এই কথাটা জি করেছিল। মহেন্দ্রলালের কথা আজকাল অনেকেই গেছে, নাম শুনলেও তাঁর সম্বন্ধে বেশী কিছু অ জানে না।

সে আজ প্রায় ১৩২ বছর আগেকার কথা। হা পাইকপাড়া গ্রামে ১৮৩৩ সনের নভেম্বর মাসে এক গ ঘরে মহেন্দ্রলাল জন্মেছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর ব তিনি পিতৃহীন হন, মাও মারা যান তার বছর চ পরে। ফলে ছেলেবেলা মামার বাড়ীতেই তাঁকে

হতে হয়। মামাদের অবস্থাও তেমন ভাল ছিল না, তবে তাঁরা পিতৃমাতৃহীন ভাগ্নের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করতে ত্রুটী করেন নি। পাঠশালায় ও বাড়ীতে সামান্য কিছু বাংলা-ইংরাজী শিখিয়ে তাঁকে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হ'ল হেয়ার সাহেবের ইস্কুলে। সেখান থেকে জুনিয়ার স্কলারশিপ্ পেয়ে তিনি গিয়ে ভর্ত্তি হলেন সুবিখ্যাত হিন্দু কলেজে।

মহেন্দ্রলাল অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই হিন্দু কলেজে তিনি অধ্যাপকদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। ১৮৫৪ সনে এই হিন্দু কলেজ নাম পাল্টে হ'ল প্রেসিডেন্সী কলেজ। তখনকার প্রেসিডেন্সী কলেজে সাহিত্য,—বিশেষ ক'রে ইংরেজী সাহিত্য প্রভৃতি খুব ভাল ক'রে পড়ান হ'ত কিন্তু বিজ্ঞান শেখাবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। অথচ মহেন্দ্রলালের এই বিজ্ঞান শিখবার জন্য হ'ল প্রচুর আগ্রহ। কলকাতার কলেজগুলির মধ্যে তখন এক মেডিক্যাল্ কলেজেই যা কিছু সামান্য রকমের বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। মহেন্দ্রলাল ঠিক করলেন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ছেড়ে মেডিক্যাল্ কলেজে গিয়েই ভর্ত্তি হবেন। অধ্যাপকেরা শুনে আপত্তি করলেন, অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন—বিজ্ঞান শিখে কি লাভ, তার চাইতে ভাল রকম ইংরেজী শিখলে দেশের একটা গণ্যমান্য লোক হওয়া যাবে—এই রকম ধারা যুক্তি অনর্গল বর্ষিত হ'ল, কিন্তু মহেন্দ্রলালকে আটকানো গেল না।

মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে মহেন্দ্রলাল নিজের মনের মত বিষয় খুঁজে পেলেন। তখনকার মেডিক্যাল কলেজে যে বিজ্ঞান পড়ান হ'ত আসলে অবশ্য তা তেমন কিছুই নয়, কিন্তু তিনি নানা জায়গা থেকে বইপত্র আনিয়ে, কলেজের পরীক্ষাগারে হাতে-নাতে কাজ ক'রে যতটা সম্ভব তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে লাগলেন। শেষ পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল, কলেজে যতগুলি পুরস্কার আছে সব তিনি দখল করেছেন। তার তিন বছর পরেই মহেন্দ্রলাল ডাক্তারী শাস্ত্রের উচ্চতম উপাধি এম্. ডি অর্জ্জন করলেন। তাঁর আগে এখানে আর একটি মাত্র ছাত্র এ উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর নাম চন্দ্রকুমার দে।

ছাত্রাবস্থা থেকেই অদ্ভুত প্রতিভাশালী ব'লে মহেন্দ্রলালের নাম রটে গিয়েছিল। এম্. ডি. হবার পর তাঁর নাম মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, এবং দেখতে দেখতে তিনি কলকাতায় একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ব'লে সুনাম অর্জ্জন করলেন। পশার বেড়েই চলল।

এর পরে যে ঘটনার কথা বলব, তা শুনলে মহেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার কথা আরও ভাল ক'রে বোঝা যাবে।

বিলেতে বৃটীশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন ব'লে চিকিৎসকদের একটি বড় সমিতি আছে। কয়েকজন বড় বড় বাঙ্গালী ও ইংরেজ ডাক্তারের চেষ্টায় এই সমিতির কলকাতাতেও তার একটা শাখা সমিতি স্থাপিত হ'ল। ডাঃ সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন, মহেন্দ্রলালও ছিলেন। মহেন্দ্রলালই হলেন এর অন্যতম সম্পাদক। পরে তিনি সমিতির সহ-সভাপতি হয়েছিলেন। সমিতির প্রতিষ্ঠার দিনে মহেন্দ্রলাল একটি বড় বক্তৃতা দিলেন। তিনি ভাল বক্তা ছিলেন, বক্তৃতায় তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা-প্রণালীকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করলেন। তখনকার দিনে রাজেন্দ্র দত্ত ছিলেন কলকাতার নাম-করা হোমিওপ্যাথ। মহেন্দ্রলালের বক্তৃতায় তিনি ক্ষুব্ধ হলেন এবং তাঁর কথার সারবত্তা প্রমাণ করবার জন্য তাঁকে বিচারে আহ্বান করলেন। মহেন্দ্রলালও পিছ-পা ন'ন। দীর্ঘ দিন ধরে বিচার-তর্ক চলতে লাগল।

এই সময়ে 'ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড' নামে একখানি পত্রিকা বেরোত, মহেন্দ্রলাল মাঝে মাঝে তা'তে নানা বইএর সমালোচনা লিখতেন। একদিন মর্গান্ সাহেবের লেখা 'ফিলজফি অব্ হোমিওপ্যাথী' নামে একখানি বই তাঁর কাছে সমালোচনার জন্য এল। বইখানি পড়তে পড়তে মহেন্দ্রলালের কেমন খটকা লাগল, কয়েকটা জায়গায় তিনি এমন কিছু পেলেন যা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ নতুন এবং যে সম্বন্ধে ভাল রকম না জেনে মতামত দেওয়া তাঁর উচিত মনে হ'ল না। তিনি ঠিক করলেন, নিজে কিছু দিন হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ ক'রে তার ফলাফল দেখবেন। তিনি রাজেন বাবুকে এ কথা জানালেন এবং রাজেন্দ্র দত্ত খুসী হয়েই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কয়েকটি কঠিন রোগের চিকিৎসা-প্রণালী দেখালেন। মহেন্দ্রলাল যেন এক নতুন সত্যের সন্ধান পেলেন। তিনি

বুঝতে পারলেন, হোমিওপ্যাথীকে তিনি যতটা তাচ্ছিল্য ক'রে উড়িয়ে দিয়েছিলেন আসলে তা নয়।

মহেন্দ্রলাল শুধু অনুতপ্ত হলেন না, তিনি যা সত্য ব'লে বুঝেছেন তা সকলের সামনে প্রচার করাও কর্ত্তব্য মনে করলেন।

১৮৬৭ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী। মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিক সভা বসেছে। মহেন্দ্রলাল বক্তৃতা দিতে এগিয়ে এলেন। জলদগম্ভীর স্বরে তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালীর কতকগুলি ত্রুটীর উল্লেখ ক'রে হোমিওপ্যাথীর বৈশিষ্ট্য দেখালেন এবং প্রবল যুক্তি-তর্কের দ্বারা নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু এর ফল যে তাঁর পক্ষে কি বিপদ্-জনক হতে পারে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। রক্তাশুদ্ধ ডাক্তাররা,—বিশেষ ক'রে কয়েক জন ইংরেজ ডাক্তার, ভীষণ আপত্তি তুললেন। মহেন্দ্রলাল প্রত্যুত্তর দিতে গেলে তাঁরা আরও ক্ষেপে গেলেন। একজন চীৎকার করে বল্লেন, "ডাক্তার সরকার, আর একটি কথা বললে আপনাকে সভা থেকে বার করে দেওয়া হবে।" অনেকেই জানালেন, মহেন্দ্রলালের মত লোক সমিতির সহ-সভাপতি তো দূরের কথা, সভ্য থাকলেও তাঁরা সভ্যপদে ইস্তাফা দেবেন।

সেদিনকার সভাতেই ব্যাপারটা শেষ হ'ল না। মহেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন সুরু হ'ল। সহর শুদ্ধ সমস্ত বড় বড় ডাক্তার তাঁকে একঘরে করলেন। কাগজে কাগজে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য বেরোতে লাগল। তাঁর অত বড় পশার একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। যে ডাক্তারের ঘরে রোগীর ভিড়ে টোকা যেত না, পুরো ছ'মাস সেখানে একটি রোগীও ঢুকল না।

কিন্তু মহেন্দ্রলাল অবিচলিত। তিনি যা সত্য ব'লে বুঝেছেন তার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতেও তিনি রাজী। বললেন, "আমি চাষার ছেলে, না হয় সামান্য কাজ ক'রে খাব, তাতে আর কি? কিন্তু যা সত্য ব'লে বুঝেছি তা বলব এবং করব।"

১৮৬৮ সনে 'ক্যাল্‌কাটা জার্ণাল্ অব্ মেডিসিন' নামে একখানা পত্রিকা বেরুতে সুরু করল। সম্পাদক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। মহেন্দ্রলালের অদ্ভুত প্রতিভা ও যুক্তিতর্কের ফলে ক্রমে লোকে হোমিওপ্যাথীর দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল। মহেন্দ্রলাল হোমিও প্রণালীতে চিকিৎসা সুরু করলেন, এবং কিছুদিন আবার কলকাতার একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রূপে অর্জ্জন করলেন। তাঁর মত অত বড় হোমিওপ চিকিৎসক এ পর্য্যন্ত খুব কমই জন্মেছেন।

কিন্তু শুধু বড় চিকিৎসক ব'লেই আজ মহেন্দ্রলালকে এত বড় শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে বসি নি। আরও এমন একটা কাজ করে গেছেন যার তাঁর নাম বাঙ্গালার সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরদিন হয়ে থাকবে।

বিজ্ঞানের প্রতি মহেন্দ্রলালের প্রগাঢ় অনুরাগের আগেই বলেছি। কিন্তু সে আমলে এ দেশে বি চর্চ্চার তেমন সুযোগ সুবিধা ছিল না। মহেন্দ্রলাল পদে এই অভাব অনুভব করেছিলেন। এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখেন, অনেক আন্দোলন চা অনেকটা তাঁরই ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় বিজ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু মহেন্দ্রলাল সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, তিনি ঠিক ক দেশে এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে যাবেন যেখানে বাঙ্গালী বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণা ভাবী দেশকে গড়ে তুলতে পারে।

কিন্তু শুধু ঠিক করা নয়, যা তিনি করবেন করেছেন, তা করবেনই। জীবনের প্রতি কাজে তার প্রমাণ দেখিয়ে গেছেন। এ ক্ষেত্রেও তাই ১৮৭৬ সনের ১৫ই জানুয়ারী তাঁর স্বপ্ন অনেকটা রূপ নিল। ঐ দিন, বাংলার ছোট লাট বাহাদুর প্রতিষ্ঠানের দ্বারোন্মোচন করলেন। সম্প্রতি বৌবাজ যে সায়ান্স এসোসিয়েশনে মহেন্দ্রলালের স্মৃতি উদ্‌যাপিত হ'ল সেটিই হ'ল এই প্রতিষ্ঠান। তা দেওয়া হ'ল 'ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্ ফর্ দি কাল্টি অব্ সায়ান্স' অর্থাৎ বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য ভা সমিতি।

তোমরা যারা কলকাতায় থাক, বৌবাজারে থামওয়ালা বাড়ীটি দেখে থাকবে। বাংলার এটি অতি বড় গৌরবের সামগ্রী। কত বড় বড় বৈজ্ঞ এখানে বসে বিজ্ঞানের আলোচনা ক'রে গেছেন,

করেছেন, গবেষণা ক'রে নতুন নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন! আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার নানা রকম সরঞ্জাম এখানে বসান হয়েছে। এ দেশের নাম-করা বৈজ্ঞানিকেরা প্রায় সকলেই এর সঙ্গে কোন-না-কোন ভাবে জড়িত ছিলেন, এবং এখনও আছেন। তোমরা স্যর্ সি ভি রামন্-এর নাম সবাই জান। নোবেল্ পুরস্কার পেয়ে তিনি পৃথিবীর বিদ্বজ্জনসভায় স্মরণীয় হয়েছেন। স্যর্ রামনেরও কর্ম্মক্ষেত্র ছিল এই সায়ান্স এসোসিয়েশন্। তিনি অনেক দিন এর অধ্যক্ষও ছিলেন।

মহেন্দ্রলালও তাঁর বাকি জীবন এরই পেছনে খেটে গেছেন। এর জন্য প্রচুর অর্থ এবং ততোধিক মূল্যবান্ তাঁর সময় ব্যয় করে গেছেন। শত কাজ থাকলেও তিনি প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময় এখানে হাজির হতে ক্ষান্ত থাকতেন না। একবারকার ঘটনা শোন। সেদিন বেলা ৪টের সময় মহেন্দ্রলালের সায়ান্স এসোসিয়েশনে বক্তৃতা দেবার কথা। ৩টের সময় একটা জরুরী কল্ এল। সেটা নিলে সায়ান্স এসোসিয়েশনে যেতে আধ ঘণ্টাটাক দেরী হতে পারে, কিন্তু বড় কল্, দু'শ' টাকা ভিজিট পাওয়া যাবে। মহেন্দ্রলাল কিছুতেই তা গ্রহণ করলেন না। ছেলেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে আর তিনি মাত্র দু'শ টাকার জন্য তাদের বসিয়ে রাখবেন! তা হতে পারে না।

১৯০৪ সনে, ৭১ বছর বয়সে মহাপ্রাণ মহেন্দ্রলাল তাঁর সাধের সায়ান্স এসোসিয়েশন্, অসংখ্য ছাত্রবন্ধু ও অগণিত গুণমুগ্ধ দেশবাসীকে কাঁদিয়ে মহাপ্রয়াণ করেন।

একলব্য

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

চরিত্র-পরিচয়

দ্রোণাচার্য	কুরুরাজকুমারদের অস্ত্রগুরু	মংরু	একলব্যের সঙ্গী
অশ্বত্থামা	ঐ পুত্র	চার্বাক	বস্তুবাদী ঋষি
হিরণ্যধনু	ব্যাধ সর্দ্দার	অর্জ্জুন	
একলব্য	ঐ পুত্র	দুর্যোধন	

ব্যাধগণ, শিষ্যগণ, ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(হিরণ্যধনুর গৃহ-প্রাঙ্গণ। একলব্য ও মংরু।)

মংরু—বেলা যে পড়ে আসছে, একলব্য! চল্ এবার যাই; না হ'লে ফিরতে অন্ধকার হ'য়ে যাবে।

একলব্য—শিকারে যেতে আমার আর ভালো লাগে না। এমনি করে দিনের পর দিন বয়া আর কুকুর মেরে, বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি? এমন শিকারী ত' আমাদের ঘরে ঘরেই আছে! এমন করে শুধু জন্তু-জানোয়ারদের পেছনে ছুটে বেড়াতে আমার আর ইচ্ছে করে না, মংরু।

মংরু—তাই বুঝি আজকাল একা একা থাকতে চাস আর আপন মনে এই সব ভাবিস্? কিন্তু কে তোর মাথায় এই সব বুদ্ধি দিলে? শিকারই আমাদের সব; শিকার ছেড়ে দিয়ে কি নিয়ে থাকব আমরা? তা' ছাড়া তুই আমাদের রাজার ছেলে। একদিন তুই-ই হ'বি আমাদের রাজা। আমাদের ভেতর তাই তোকেই হতে হবে সব চেয়ে বড় শিকারী, সব চেয়ে বড় বীর।

একলব্য—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব চেয়ে বড় বীরই আমি হ'তে চাই। ধনুর্বাণই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। সকলে মুগ্ধ

হবে আমার বীরত্বে। এই তুচ্ছ শিকারের খেলায় আর কত দিন নষ্ট করব? বীরের সমাজে আমি সম্মানের আসন পেতে চাই। আমি হ'তে চাই অজেয় ধনুর্বিদ্। সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করে আমি তাঁর যোগ্য শিষ্য হ'তে চাই।

মংরু—(আশ্চর্য হয়ে) এ সব কি বলছিস্ আজ? তুই আবার কার কাছে শিখ্‌তে যাবি? তোর চেয়ে এখানে কে ভাল তীর ছুঁড়তে পারে শুনি?

একলব্য—এখানে নয়, দূরে—অনেক দূরে তিনি আছেন। তুই তাঁকে জানিস্ না।

মংরু—কে সে? কোন্ দেশের লোক?

একলব্য—তিনি থাকেন কুরুরাজ্যে—হস্তিনাপুরে। রাজকুমারদের তিনি অস্ত্রশিক্ষাগুরু। শুনেছি, তিনিই বর্ত্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ্।

মংরু—কি নাম?

একলব্য—দ্রোণাচার্য! গুরু দ্রোণাচার্য! বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তিনি, বীরত্বে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ। তাঁর হাতেই আমি অস্ত্রশিক্ষা নেব।

মংরু—সে কি করে হবে? এত দূরে থেকে—

একলব্য—আমি সেখানে যাব, মংরু! তাঁর চরণতলে আশ্রয় ভিক্ষা করে নেব। তিনি ব্রাহ্মণ—দয়ার সাগর!

মংরু (হেসে)—কিন্তু সেখানে যাবি কি করে? আমরা ত' তোকে যেতে দেব না। আর সর্দারও ত' তোকে ছাড়বে না! শিকার থেকে তোর ফিরতে একটু দেরি হ'লে সর্দার আমাদের অস্থির হ'য়ে পড়ে, তোকে না দেখে তার প্রাণ বাঁচে না। তোকে কিছুতেই ছাড়বে না রে!

একলব্য—সেই কথাই ত' এই ক'দিন ধরে ভাবছি, মংরু! বাবাকে কি করে রাজি করাই। কিন্তু গুরুদেবের কাছে না গেলেও ত' আমি কিছুতেই শান্তি পাব না। কাল থেকে যে তিনি আমায় নিয়ত ডাকছেন। আর আমি কেমন করে থাকি?

মংরু—এ সব কি পাগলামো আরম্ভ করলি বল ত'?

একলব্য (মৃদু হেসে)—আমাকে পাগল ভাব্‌ছিস্? পাগল তা হ'লে তুই। কাল রাতে স্বপ্নে সে কি অপূর্ব দৃশ্যই দেখেছি—তোকে তা' কেমন করে বোঝাব?

মংরু—কি দেখলি স্বপ্নে?

একলব্য—দেখলুম এক সৌম্য, দিব্যকান্তি মহাপুরুষ—সারা অঙ্গে তাঁর কি অপরূপ দ্যুতি, যেন স্বর্ণচ্ছটা!—স্মিত হেসে আমায় আশীর্বাদ জানিয়ে বলছেন, একলব্য, এস, আমার কাছে। আমি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ ক'রব; তোমায় অস্ত্রশিক্ষা দান করে জগতের শ্রেষ্ঠ বীর,—আমার শ্রেষ্ঠ শিষ্য করে তুল্‌ব!

মংরু—তিনি কে?

একলব্য—তিনিই আমার গুরু দ্রোণাচার্য।...ওই বাবা আসছে, বাবাকে কিছু বলিস নি যেন।

(হিরণ্যধনুর প্রবেশ)

হিরণ্যধনু—তোরা এখনো শিকারে যাস্ নি যে?

মংরু—এইবার যাব, সর্দার! ওর জন্যে দেরি হয়ে যাচ্ছে। (একলব্যের দিকে ফিরে) ওঠ্, তীর ধনুকটা নিয়ে আয়।

(একলব্যের প্রস্থান)

হিরণ্যধনু—ও কেবল বসে বসে কি ভাবে বলতে পারিস্, মংরু? আমি ত' কিছুই বুঝতে পারি না। ওকে জিজ্ঞেস করলেও ভাল করে জবাব দেয় না, এড়িয়ে যায়। দিন দিন ও যেন কেমন বদলে যাচ্ছে! ও যেন সেই আগেকার একলব্য আর নেই! মাঝে মাঝে আমার বড় ভয় হয়। ও আমার কাছ থেকে আজকাল যেন কত দূরে সরে যাচ্ছে! আমি আর ওর মনের নাগাল পাচ্ছি না।...তুই ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকিস্, মংরু, ওকে একলা ছেড়ে দিস্ নে।

মংরু—আমি ত' সব সময়েই ওর কাছে থাকি, সর্দার!

হিরণ্যধনু—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর কাছ-ছাড়া হ'স নি। ওকে একলা থাকতে দিস্ নি। কেবলই আমার ভয় হয়—কি যেন একটা ঘটবে।

(ধনুক হাতে একলব্যের পুনঃ প্রবেশ)

ফিরতে যেন দেরী করিস্ নি, একলব্য। আজ রাত্তিরের আমোদের কথা মনে আছে ত'? দক্ষিণ-পাড়ার ভীল-সর্দারের দল এসে নাচ-গান ক'রবে; আমাদের এখানকারও সবাই থাকবে। তারপর খাওয়াদাওয়া হবে,—আজ শিকারও জবর হ'য়েছে।.....তাড়াতাড়ি ফিরবি।

একলব্য—আচ্ছা।

(একলব্য ও মংরুর প্রস্থান। তাদের গমন-পথের দিকে হিরণ্যধনু স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বন-পথ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে)

মংরু—মনে মনে যদি তোর এই ছিল, তা হ'লে আমায় আগে বলিস্ নি কেন, একলব্য? সর্দারের সামনে দিয়ে আমি তোর সঙ্গে তা হ'লে কিছুতেই বেরুতাম না।

একলব্য—রাগ করিস্ নি ভাই! আমার দিকটাও বুঝে দেখ। আগে বললে ত' আমি কিছুতেই বাবার কাছ থেকে ছাড়া পেতুম্ না। আর শুভ কাযে দেরি করা উচিত নয়। কোথা থেকে কি রকম বাধা আসবে, কে জানে? তাই ঠিক করেছি, আজই গুরুদর্শনে যাত্রা ক'রব।

মংরু (খানিক চুপ করে থেকে)—তুই কি নিষ্ঠুর! সর্দারকে ছেড়ে, আমাদের সবাইকে ছেড়ে কোন্ দূর দেশে চলে যেতে তোর কোন কষ্টই নেই!

একলব্য (ম্লান হেসে, মংরুর কাঁধে হাত রেখে)—তোদের ছেড়ে যেতে আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না, এ কথা তুই ভাবতে পারিস, মংরু। আমার উপর অভিমান করিস্ নি। আমি ত' সুখের জন্য যাচ্ছি না। আমি জানি গুরুদেবের ওখানে আমায় কঠোর সাধনায় ব্রতী হতে হবে। সে কঠিন তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে যদি জয়মাল্য নিয়ে আমি ফিরে আসতে পারি, তা হ'লে সে গৌরব কি আমার একার হবে? আমি যদি ভারত-বিখ্যাত দ্রোণাচার্যের শিষ্য হ'তে পারি, তোদের কি তাতে আনন্দ হবে না? আমার যাওয়াতে তুই অমত করিস্ নি, ভাই!

মংরু—আমি অত কথা শুনতে চাই না, বুঝতেও চাই না। আমি শুধু চাই, সর্দারকে ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে তুই উঁচু জাতের লোকদের কাছে যাস্ নি। আমার মন বলছে, এতে ভাল হবে না। উঁচু জাতের লোকদের সঙ্গে আমাদের অনেক তফাৎ, ওদের সঙ্গে আমাদের কোন দিন মিলবে না। ওরা আমাদের পদে কখনো মেশেও না। ওদের কাছে তোর না যাওয়াই ভাল। তুই যাস নি।

একলব্য—ছি, ছি, উঁচু জাতের বিষয় এমন করে বলিস্ নি। ব্রাহ্মণ হ'ল বর্ণশ্রেষ্ঠ, সমাজের মুকুটমণি। ব্রাহ্মণ কি কখনো আমাদের ঘৃণা করতে পারেন? ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের চরণস্পর্শে আমার সমস্ত পাপ দূর হয়ে এ জীবন ধন্য হবে। তাঁর আশীর্বাদে পূর্ণ হবে আমার মনস্কামনা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দের কৃপাতেই ত' আমরা সমস্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করি। তাঁরাই ত' আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন।

মংরু—থাক্, থাক্, ও সব কথা। কথা দিয়ে আমায় ভুলিয়ে রাখতে চাস? সর্দারের কাছে গিয়ে আজ রাতে আমি কি করে দাঁড়াবো বল্ ত'? সবাইকার সামনে তোর কথা কি বলব সর্দারকে? কোথায় গেছিস, কত-দিন পরে ফিরবি—এ সব কথার কি জবাব দেব আমি? যদি যেতেই হয়, আজ থাক, পরে একদিন তুই নিজে সর্দারকে বুঝিয়ে বলে যাস। আজ বাড়ি চল।

একলব্য—না, না, না। আমি স্থির করেই বেরিয়েছি, আর ঘরে ফিরব না। আজই গুরুদেবের কাছে যাত্রা করব। যা' ভাল মনে করিস, বাবাকে বুঝিয়ে বলিস। কিন্তু আমাকে তুই আর বাধা দিস্ নি; পরে কত বাধা আসতে পারে; হয়ত তখন আর গুরুদর্শন করা হবে না। ......তুই এবার ফিরে যা।... (ক'য়েক পা অগ্রসর হ'য়ে) সন্ধ্যা হ'য়ে এল, আর আসিস্ নি।

মংরু (রুদ্ধকণ্ঠে)—আজ ফিরে চল্ একলব্য, আমার কথা শোন্।

একলব্য—বাবাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলিস্। আমি চললুম।

(অন্ধকারে মিলিয়ে গেল)

মংরু—একলব্য!

(ক্রমশঃ)

রাধামাধবের রত্নহার

শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বকঃ—

...য় সময়ের এই কাহিনী তখন বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্ব ভাঙ্গিয়া ...ড়িতেছে কিন্তু ইংরাজ রাজত্ব সুরু হয় নাই। পর্ত্তুগীজ দস্যুদের ...ৎপাতে নিম্ন বঙ্গ—বিশেষ করিয়া জলপথ সর্ব্বদা বিপদসঙ্কুল। বার-...ঘির জমিদার মৃগাঙ্ক রায় শ্যালক রসরাজকে লইয়া সপ্তগ্রামে যাইবার ...থে এক চটিতে পর্ত্তুগীজ বণিক্‌দের নিকট হইতে একটি মহামূল্য রত্নহার ...কনেন ও গ্রামে ফিরিয়া উৎসব-আড়ম্বর সহকারে উহা গৃহবিগ্রহ রাধা-...ধবকে উৎসর্গ করেন। বারদীঘির অদূরবর্ত্তী গ্রাম চন্দনার জমিদার ...ন্দর্প চৌধুরীর সহিত মৃগাঙ্ক রায়ের বিবাদ ছিল। কন্দর্প চৌধুরীর মৃত্যু ...ইলে তাঁর ছেলে নন্দ চৌধুরী জমিদার হইয়াছে। সে অত্যন্ত বিলাসী ...বং অলস। কিন্তু সে মৃগাঙ্ক রায়ের একমাত্র কন্যা সুশ্বেতাকে বিবাহ ...রিতে ইচ্ছুক। এজন্য সে কয়েক বার ঘটক ব্যাকরণবাগীশকে ...াঠাইয়াছে। কিন্তু মৃগাঙ্ক রায় বা সুশ্বেতা কেহই তাহাকে দেখিতে পারে ...া। এ জন্য নন্দ চৌধুরীর সঙ্গীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। কিন্তু অলস নন্দ সব ...থাই উড়াইয়া দেয়। মৃগাঙ্ক রায় বিপত্নীক। কন্যা সুশ্বেতা ছাড়া তাঁর ...য়ন্ত নামে একটি ছেলে আছে,—সুশ্বেতার চেয়ে কিছু ছোট। সম্প্রতি ...য়ন্ত একটু অবাধ্য হইয়া যাইতেছে; সে নাকি লুকাইয়া নন্দ চৌধুরীর ...াছে যাতায়াত করে। ইতিমধ্যে একদিন দুপুর রাত্রে বারদীঘির ...মিদার-বাড়ী ও রাধামাধবের মন্দিরে ডাকাত পড়িল। পরে জানা গেল ডাকাতরা ফিরিঙ্গি পর্ত্তুগীজ এবং তাদের লক্ষ্য সেই রত্নহারটি। দ... পথ প্রদর্শক দুরন্ত মগ বিব্বু। মৃগাঙ্ক রায়ের লাঠিয়ালরা প্রাণ... মন্দির রক্ষার চেষ্টা করিয়া যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে তখন হঠাৎ রহ... জনক ভাবে আকাশ হইতে কতকগুলি তীর আসিয়া ডাকাতদের বি... করিয়া তুলিল এবং তাহারা পালাইল। এদিকে সুন্দরবনে ফিরি... চকে পর্ত্তুগীজদের বিরাট জলদুর্গ। একদিন দুর্গের পাদ্রী ও চিকিৎ... বারেটোকে বিব্বুর সহিত পরামর্শ করিতে দেখা গেল। তার প... একদিন জয়ন্ত বারদীঘি হইতে অদৃশ্য হইল। কয়েক দিন অনুসন্ধা... কাটিলে একদিন মৃগাঙ্ক রায় ফিরিঙ্গিদের নিকট হইতে চিঠি পাই... রাধামাধবের সেই রত্নহারটা ফেরৎ পাইলে তবেই তারা জয়ন্তকে ছা... দিবে—নচেৎ তাকে হত্যা করিবে। মৃগাঙ্ক রায় চিন্তিত হইলেন ... দেবতাকে যা নিবেদন করিয়াছেন তা ছেলের মঙ্গলের জন্যও লইতে র... হইলেন না। নানা পরামর্শের পর সপ্তগ্রামে মৃগাঙ্ক রায়ের ধনী ... ফৌজদারের আত্মীয় এনায়েৎ খাঁর কাছে সাহায্য চাহিয়া রসরা... পাঠান হইল। রসরাজ ২।৩টি সঙ্গী সহ সপ্তগ্রাম পৌঁছিলেন কিন্তু ঘট... চক্রে সেই রাত্রেই কয়েকটি ফিরিঙ্গির সহিত বিবাদ বাধাইলে... ফিরিঙ্গিরা তাঁকে মারিবার জন্য বন্দুক তুলিতে আবার অন্তরীক্ষ হ... সেই রকম রহস্য-জনক তীর আসিয়া তাদে ধরাশায়ী করিল। ... পর পড়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চন্দনা, ফিরিঙ্গির চক ও সপ্তগ্রাম

চন্দনা গ্রামে বেলা তখন এক প্রহর পার হইতে চলিল। ভোরের সূর্য্য মাথা তুলিতে তুলিতে অনেকখানি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামের সর্ব্বত্রই দৈনন্দিন কর্ম্ম-কোলাহল সুরু হইয়াছে শুধু জমিদার বাড়ীর একখানি ঘরে যেন তখনও রাত কাটে নাই। ঘর ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। ভিতরে গৃহস্বামী তখনও আরামে নিদ্রা উপভোগ করিতেছেন। গৃহস্বামী আর কেহ ন'ন, চন্দ... খোদ জমিদার নন্দ চৌধুরী।

ভৃত্য আসিয়া বার কয়েক দরজা পরীক্ষা ক... গিয়াছে, দু'-একবার সাহস করিয়া মৃদু করাঘাতও করিয়া...

কর্ম্মব্যস্ত সাতগাঁর লোকেরা এমন দৃশ্য দেখিতে বড় একটা অভ্যস্ত নয়।

এনায়েৎ খাঁর বৈঠকখানায় রসরাজ একা বসিয়া গৃহস্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ভৃত্য অনেকক্ষণ হয় সুগন্ধি তামাক সাজিয়া ব্রাহ্মণের গড়গড়াটি পাশে রাখিয়া গিয়াছে। চিন্তামগ্ন রসরাজের সেদিকে খেয়াল নাই। বসিয়া বসিয়া তিনি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিলেন। এনায়েৎ খাঁ ফৌজদারের কাছে গিয়াছেন কি সংবাদ লইয়া আসেন বলা যায় না। এদিকে যে জরুরী কাজ লইয়া তিনি আসিয়াছেন তাহাতেও এখানে আর একদিনও দেরী করা সমীচীন নয়। জয়ন্ত এখন কোথায়, কি অবস্থায় আছে কে জানে! দেরী হইলে তার কি বিপদ্ ঘটে তাহাও বলা যায় না। একে তো ধরিতে গেলে রসরাজের জন্যই মৃগাঙ্ক রায়ের আজ এই বিপদ্। তার উপর আবার তাঁরই অপটুতায় যদি জয়ন্তের কোন নতুন বিপদ্ ঘটিয়া যায় তবে আর রসরাজ বারদীঘিতে মুখ দেখাইতে পারিবেন না।

মাদারপাড়ার সেই চটির কথা মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল সেই ইলিশ মাছের কথা,—স্বাদটা যেন আজও মুখে লাগিয়া আছে। সপ্তগ্রামে আসিয়া এই গোলযোগে খাওয়া-দাওয়ার মোটেই যুৎ হইতেছে না। বাজারে জিনিষপত্র কিছুই প্রায় মেলে না। জেলেরা ফিরিঙ্গির ভয়ে সরস্বতীতে পর্য্যন্ত জাল ফেলিতে আসে না। আচ্ছা ফ্যাসাদ জুটিয়াছে এই ফিরিঙ্গিগুলি! ছিলি নিজের দেশে, বেশ ছিলি। গরু খাইতিস, মহিষ খাইতিস—শূয়োর খাইতিস, কেহ বাধা দিত না। সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়া বাংলা দেশে আসিয়া উৎপাত করিবার কি এমন দরকার ছিল তোদের? তা আসিয়াছিস্, ভাল ভাবে থাক্—খা, দা,—এমন ইলিশ মাছ, জন্মে যার মত জিনিষ তোদের দেশে কেউ কল্পনা করিতে পারে না, তাও দিতেছি, চাখিয়া দেখ, তা না মার-ধর, দাঙ্গা-হাঙ্গামা! এ সব কিরে বাপু?

সহসা চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, ঘোড়ার খুরের শব্দে। শব্দ যেন তাঁহারই অনতিদূরে আসিয়া থামিল। রসরাজ চোখ তুলিয়া দেখিলেন প্রৌঢ় এনায়েৎ খাঁ ঘোড়া হইতে নামিয়া ধীর পদে আগাইয়া আসিতেছেন। আশা ও নিরাশার সন্দেহ-দোলায় রসরাজের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

"সুলতান, আপনি বীর—"

(ইতিহাসের গল্প)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

—এক—

"গোলকুণ্ডের সুলতান আবদুল হাসান সম্রাটের কাছে মাথা নত করবেন না, এই তাঁর পণ।"

আওরঙ্গজেব তাঁহার প্রিয় বৃদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষ সরবরা খানের কাছে এ কথা শুনিয়া বিচলিত হইলেন।

সম্রাট্ চিন্তিত ভাবে কহিলেন,—"আমি কি কোন অন্যায় করতে যাচ্ছি সরবরা খাঁ?"

"সে কি জাঁহাপনা? আপনি অন্যায় করবেন! অন্যায় করেছেন আবুল হাসান।"

"তবে নীরবে থাকা কখনও সঙ্গত নয়, কি বল?"

"সম্রাটের যা অভিপ্রায়! আমরা আজ্ঞা পালন করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আমরা আপনার ভৃত্য।"

"সেই কথা! তোমরা আমার বন্ধু! তবে প্রস্তু[ত] হও।"

১৬৮৬ সনের ৩০শে অক্টোবর। আওরঙ্গজেব তাঁহা[র] নববিজিত বিজাপুর নগরী পরিত্যাগ করিলেন এবং প[থে] কুলবর্গ এবং বিদরে কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম করিয়া গোল[কু]ণ্ডার সুলতানকে বশ্যতা স্বীকার করিতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু উদ্ধত গোলকুণ্ডার সুলতান আবুল হাসান সম্রাটে[র] নিকট মাথা নত না করিয়া চাহিল কিনা যুদ্ধ করিতে! এত দূর স্পর্দ্ধা সেই দুর্বিনীত গোলকুণ্ডা-অধিপতির!

অবশেষে জানুয়ারী মাসের ২৮শে তারিখ আলমগী[র] বাদশাহ গোলকুণ্ডার এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক বি[স্তীর্ণ] প্রান্তরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সেনাপ[তি]

ফিরোজ জঙ্গ অতি দ্রুত বিজাপুর হইতে সৈন্যদল লইয়া আসিয়া সম্রাটের সহিত মিলিত হইলেন।

আলমগীর বাদশাহের মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছিল—দেহ তাঁহার দুর্ব্বল এবং কুব্জ হইয়া পড়িয়াছিল অনেকটা—এই দাক্ষিণাত্যের রণক্ষেত্রে। বিদ্রোহ দমন এবং রাজ্য জয় করিতেই তাঁহার সময় কাটিতেছিল। দুর্জ্জয় অভিমানী ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন আওরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধাচরণকারী যত বড় প্রবল শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই হউক না কেন, তাহাদের দমন না করিয়া শান্ত থাকিতে পারিতেন না!

—দুই—

আবুল হাসান যখন শুনিলেন যে আলমগীর বাদশাহ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য আসিয়াছেন তখন প্রথমটা তিনি কিছু ভীত হইলেন। কি সাধ্য আছে তাঁর এত বড় প্রবল প্রতাপশালী মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করেন? তিনি প্রথমতঃ সম্রাটের নিকট সন্ধির প্রস্তাবই করিয়া পাঠাইলেন এই ভাবিয়া—যদি সন্ধি হয় তাহা হইলে তাঁহার এই সুন্দর রাজ্য ধ্বংসের বিভীষিকাময় দৃশ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইবে না। কিন্তু আলমগীর গর্ব্বিত ভাবে দূতকে প্রত্যাখ্যান করিয়া উত্তর দিলেন—"রণক্ষেত্রে তরবারিতে তরবারিতে সঙ্ঘাত দ্বারাই হবে তার পরিচয়।" আবুল হাসানের দূত নির্ভীক্ ভাবে সুলতানের পক্ষ হইয়া উত্তর দিলেন, "তবে তাই হবে সম্রাট্!"

আবুল হাসান এইবার বীরের মত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি গোলকুণ্ডা দুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং সেই দুর্গকে সুরক্ষিত করিবার জন্য তাহার চারিদিকে কয়েকটি গভীর পরিখা খনন করাইলেন। দুর্ভেদ্য উচ্চ প্রাচারবেষ্টিত এই দুর্গ ছিল বহু দূরবিস্তৃত,—দুর্গের মধ্যে আমীর ও ওমরাহদের বাড়ী ছিল, বাজার ছিল, প্রশস্ত রাজপথ ছিল,—আর কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলা সংগৃহীত ছিল প্রচুর। বুদ্ধিমান্ সুলতান সর্ব্বাপেক্ষা দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া। সুলতানের প্রাসাদ, হেরেম, মসজিদ, উদ্যান, বহু কূপ এবং একটি হনুমানের মন্দির ও দুইটি সরাই পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থিত ছিল।

আলমগীরের সৈন্যেরা দুর্গ আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। কিন্তু সে সুযোগ তাহারা পাইতেছি[ল না।]
দুর্গ অবরুদ্ধ করিলেও কোনরূপেই দুর্গ অধিকার ক[রিবার]
পথ পাইতেছিল না। পরিখার পর পরিখা, তাহ[ার পর]
পাহাড়-পর্ব্বত, আবার পরিখা—এই ভাবে দুর্গ সুর[ক্ষিত।]
আবার ওদিকে গোলকুণ্ডার গোলন্দাজরা দুর্গ-
হইতে কামানের পর কামান দাগিতেছিল। [গোলার]
পর গোলা মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি ধরিয়া মোগল
দিগকে ধ্বংস করিতেছিল। আওরঙ্গজেবের সৈ[ন্যেরা]
এজন্য দিনের বেলা আত্মগোপন করিয়া থাকিত
হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, আর ওদিকে
গভীর অন্ধকারে আলমগীর বাদশাহের পূর্ত্ত শিল্পীরা
খনন করিত। এই ভাবে খনন করিতে করিতে
গোলকুণ্ডা দুর্গের প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত
পরিখা খনন হইলে সৈন্যেরাও দুর্গ আক্রমণ ক[রিবার]
জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিল, কিন্তু কি করিবে তা[হারা?]
কেমন করিয়া দুর্গের উপর উঠিবে? দুর্গের
হইতে অনবরত কামান গর্জ্জন করিতেছে, সৈ[ন্যেরা]
কোনরূপেই সুযোগ পাইতেছিল না। সম্রাট্ আ[লমগীর]
স্বয়ং ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিখার প্রান্তে প্রান্তে
সংস্থাপিত করিয়া দুর্গ-বিজয় করিবার সমুদয় সু[যোগ]
করিতেছিলেন।

অবশেষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সম্রাট্ আলমগীরের সাধন[া]
সিদ্ধ। দুর্গের একদিক্ দিয়া দড়ির মই সংস্থাপন
সেই মই বাহিয়া একদল মোগল সৈন্য দুর্গের
উঠিতে লাগিল। এমন সময় একটা কুকুর বিকট চী[ৎকার]
করিতে আরম্ভ করিল। সেই ঘেউ ঘেউ শব্দে দু[র্গের]
গোলকুণ্ডার সৈন্যগণ সেদিকে অগ্রসর হইয়া
ফেলিয়া দিল এবং যে কয়েক জন সৈন্য দুর্গের
উঠিয়াছিল তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল।

এদিকে মোগল সৈন্যেরা খাদ্যাভাবে বিপন্ন
পড়িল। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী গোলকুণ্ডার সুল[তানকে]
সাহায্য করিতে আসিলেন। মারহাট্টা সৈন্যেরা
চারিদিকের মাঠে মাঠে যে শস্য জন্মিয়াছিল সে
করিয়া ফেলিল,—এই উদ্দেশ্যে যেন মোগল সৈ[ন্যেরা]
কোনরূপেই শস্য সংগ্রহ করিতে না পারে। এক
খাদ্যাভাব, অন্য দিকে ব্যাধি ও পীড়ায় মোগল সৈ[ন্য]

বিপন্ন হইয়া পড়িল। আবার বর্ষা আসিল। দিবা-রাত্রি ভীষণ বর্ষণ আরম্ভ হইল। মোগল সৈন্যেরা এবং সৈন্যাধ্যক্ষেরা কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হইবে, কি তারা করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। তাহারা একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িল।

এই প্রবল বর্ষার দিনে অপ্রস্তুত মোগল সৈন্যদিগকে স্বয়ং আবুল হাসান সসৈন্যে আসিয়া আক্রমণ করিলেন। মোগল সৈন্যেরা পরাজিত ও বন্দী হইল অনেকে—'আওরঙ্গজেব প্রমাদ গণিলেন। আবুল হাসান বন্দী মোগলদের তাঁহার সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার দেখাইলেন এবং বলিলেন সম্রাট্ যদি দুর্গ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তবে সুলতান তাঁহার বিপন্ন সৈন্যদিগকে খাদ্যশস্য দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। একজন মোগল সৈন্যকে সুলতান তাঁহার এই বার্ত্তা লইয়া সম্রাটের নিকট পাঠাইলেন।

আলমগীর বাদশাহ শুনিয়া বলিলেন—"যদি সুলতান আবুল হাসান এসে আমার কাছে করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে তবেই তাঁকে মার্জ্জনা করব—নতুবা নয়।"

সৈন্যবল, কামান, গোলা, বন্দুক, তরবারি কিছুতেই মোগল সম্রাট্ গোলকুণ্ডা জয় করিতে পারিলেন না। শেষটায় তাঁহারা অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। উৎকোচের দ্বারা বশীভূত হইয়া গোলকুণ্ডার একজন সৈন্যাধ্যক্ষ গভীর নিশীথে দুর্গের একটা গুপ্ত দ্বার খুলিয়া দিল। মোগল সৈন্যেরা নদীর স্রোতের মত দলে দলে দুর্গে প্রবেশ করিল। দুর্গের সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহসী বীর আবদার রজাক্ এইরূপ আকস্মিক আক্রমণে বিচলিত হইলেন না। তিনি অশ্বে আরোহণ করিয়া মাত্র দ্বাদশ জন বীর ও সাহসী সৈন্যসহ দুর্গদ্বার রোধ করিবার জন্য দ্রুত ধাবিত হইলেন এবং ক্ষতবিক্ষত দেহে দুর্গ-দ্বার রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ দিলেন।

সুলতান আবুল হাসান শুনিতে পাইলেন গোলকুণ্ডার দুর্গমধ্যস্থিত রাজপথে পথে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা—শুনিলেন কামানের গর্জ্জন। বুঝিতে পারিলেন তাঁহার সাধের গোলকুণ্ডা মোগল সম্রাট্ কর্ত্তৃক বিজিত হইল!

নির্ভীক্ সুলতান তাঁহার প্রিয় মহিষীদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাজার মত—বীরের মত দরবার গৃহে আসিয়া সিংহাসনে বসিয়া মোগল সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষ-গণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ সুলতানের দরবারে আসিলে আবুল হাসান তাঁহার নিজ গৌরব ও সম্ভ্রমের সহিত সৈন্যাধ্যক্ষকে গ্রহণ করিলেন এবং তারপর আপনার অশ্বে আরোহণ করিয়া মোগল সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত সম্রাট্ আলমগীরের শিবিরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন।

আলমগীর পরম আদরে আবুল হাসানকে আলিঙ্গন করিলেন; নিকটে বসাইয়া, মৃদু হাস্য সহকারে অভিনন্দিত করিয়া কহিলেন "সুলতান, আপনি বীর।"

কবিতা-কণা

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্.এ, বি.টি

অসাধুর বল অসূয়া প্রবল,
নৃপতির বল দণ্ডবিধি,
নারীর শকতি শুশ্রূষা-সেবা,
ক্ষমা সে গুণীর শক্তিনিধি।

* *

কুঠার-আঘাতে ছিন্ন হ'লেও
বনতরু পুনঃ গজায় তবু,
পরুষ বাক্যে আহত চিত্ত
শত প্রলেপেও সারে না কভু।

ক্রুদ্ধ মানস ক্ষমা পরবশ,
অসাধু বদ্ধ সাধুতা-গুণে,
দানের অধীন দুর্জ্জন জেনো,
মিথ্যা ছিন্ন সত্য-তূণে।

* *

হাসির আড়ালে খড়্গ চালনা
রাজার রীতি—
মান দান ছলে অবমাননার
কূপট নীতি।

সম্পাদক সুরেশ্বর

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

সুরেশ্বরকে চেন? আমাদের সুরেশ্বর? হ্যাঁ, হ্যাঁ, 'গুঞ্জন' কাগজের সম্পাদক সুরেশ্বরের কথাই বলছি। সুরেশ্বর ছেলেবেলা থেকেই একটু আধটু কবিতা লিখতে পারত। স্কুল থেকে ফিরে তার বয়সী অন্যান্য ছেলেরা যখন ফুটবল নিয়ে মাঠের দিকে ছুটত সুরেশ্বর তখন ছোট একটি বাঁধান খাতা নিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠত গিয়ে ছাদে। ছাদের নিরিবিলি কোণে যেখানে ছোট্ট একটি অশথের চারা মাথা তুলেছে তারই পাশে একা একা বসে সে কবিতা লিখত। তোমাদের মধ্যে যারা কবিতা লেখ তারা নিশ্চয়ই জান, কবিতা লেখার সব ভাল শুধু মিলটুকু ছাড়া। তখনও আধুনিক 'অমিল কবিতার রেওয়াজ হয় নি (বেচারা সুরেশ্বর!), তাই অনেক সময় মনে ভাব এলেও সেই সঙ্গে ঠিক মত মিল আসত না। ভাবতে ভাবতে ভাবতে ভাবতে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা পার হয়ে যেত; মাষ্টার মশাই এসে পড়তেন। ফলে সুরেশ্বরকে খাতা-পেন্সিল নিয়ে একেবারে 'কাব্য-লোক' থেকে 'অঙ্ক লোকে' নেমে আসতে হ'ত। শিশু কবির এ দুর্ভোগ ভুক্তভোগী ছাড়া কে বুঝবে?

কিন্তু এ সব দুর্ভোগ (যা থেকে বাল্মীকি-হোমারের কথা জানি না, রবি বাবুর মত কবিরাও রেহাই পান নি) সত্ত্বেও সুরেশ্বর লিখত।

সুরেশ্বর আর একটু বড় হ'ল, হাতও আর একটু পাকুল। স্কুলের ছাপানো ম্যাগাজিনে তার লেখা গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ গিস্ গিস্ করে, সহপাঠীদের মধ্যে একটু খাতিরও হয়। যে সব ছাত্রের লেখা সেখানে স্থান পায় না তারা হয় খাপ্পা। ম্যাগাজিনের ভারপ্রাপ্ত মাষ্টার মশাইদের ওপর পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনে। সুরেশ্বর সম্বন্ধে আড়ালে বলে, 'কোথা থেকে টুকে মেরে দিয়েছে! ও রকম আমরাও পারি!" কিন্তু—, যেতে দাও ও সব তুচ্ছ কথা!

কলেজ থেকে বেরোবার পর সুরেশ্বর লক্ষ্য করল লেখক হিসাবে তার একটু-আধটু নাম হয়েছে। চাকরীর বাজার তখন খুব খারাপ যাচ্ছে। পথেঘাটে পাৎ এত ছড়াছড়ি নেই! অবশ্য সুরেশ্বরদের অবস্থা মন্দ নয়; ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা। বাবা বল্লেন, " চাকরির চেষ্টাই করবি, নাকি ব্যবসা-ট্যবসা কিছু চাস্?" ব্যবসার কথা শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু ব বড় মেহনৎ। যুদ্ধের আগের কথা বলছি—' 'ব্ল্যাক্ মার্কেট' কথাটা তখন অভিধানেও ছিল সুরেশ্বর বল্‌ল, "ব্যবসা করব কিন্তু সাধারণ ব্যবসা আমার ব্যবসায়ে দাঁড়িপাল্লা থাকবে না। আমি ক করব লোকের মনের খোরাক নিয়ে। লাভ? অর্থের দিক্ দিয়ে তেমন হবে না, কিন্তু দেশের সমাজের তৃপ্তি সাধন, সেটাই কি কম লাভ? তারই আমার জীবন উৎসর্গ করব।"

তাই হ'ল। সুরেশ্বর এক পত্রিকা বের ক'রে —'গুঞ্জন'।

গুঞ্জনকে ঘিরে বাংলার লিখিয়ে মধুকরের দল সুরু করলেন। সুরেশ্বর গুঞ্জনের জন্য জীবন না অবসর ও অর্থ দু' হাতে উৎসর্গ করতে লাগ্‌ল। দাঁড়িয়ে গেল। অর্থাৎ বাংলাদেশের শতকরা নিরে খানা কাগজের মত বছরের প্রথম দিকে ৩।৪ বেরিয়েই ছাপাখানার পাওনা মেটাতে অক্ষম প্রেতলোকে মহাপ্রস্থান করল না।

সুরেশ্বরের বাড়ীর নীচেকার তলায়ই তার আ সকালে সেখানে বসেই সে লেখে, দুপুরে সে বসেই সম্পাদকীয় কাজকর্ম করে, এবং সন্ধ্যার সেখানে বসেই সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে চা ও ড সহযোগে সাহিত্য-মজলিস বসায়। রবিবার অ বন্ধ, কিন্তু বৈকালিক সম্মেলন সমান ভাবেই নাম-করা লেখকদের হাতে রাখবার ও নাকি সম্পাদকীয় কৌশল! সকালেও সুরেশ্বর লেখ বসে। কাজের বিরাম নেই। কবিতা লেখা গেছে। সম্পাদকের ও সব বিলাসের সময় কই?

সেদিনও এমনি ধারা এক রবিবার। শীত শেষ হয়ে সবে বাসন্তী হাওয়া বইতে সুরু করেছে। সুরেশ্বর আপিস-ঘরে টেবিলের সামনে বসে ঘন ঘন চায়ে চুমুক দিচ্ছে আর খস্ খস্ ক'রে তার ঝর্ণা-কলম বাঁধান প্যাডের পাতায় ওঠা-নামা করছে। এ মাসের কাগজ বেরুতে আর মাত্র তিন দিন বাকি, কিন্তু সম্পাদকীয়টা আলসেমি ক'রে এখনও লেখা হয় নি। আজ শেষ, না করলেই নয়। সহকারী সম্পাদক মনোহর বাবু আজ তিন দিন থেকে সমানে তাড়া দিচ্ছেন। এ বেলা শেষ করতেই হবে। লেখা শেষ হলেই আবার বেরুতে হবে। মহেন্দ্র বাবুর ক্রমশঃ উপন্যাসের এ মাসের কিস্তি এখনও পাওয়া যায় নি। ক'দিন থেকে রোজ লোক গিয়ে ফিরে আসছে। আজ সে নিজেই যাবে। লেখকেরা একটু নাম কিনলেই যা পায়া ভারী হয় তাদের! দু'দিন আগে যারা সম্পাদকের কাছে দু'বেলা হাঁটাহাঁটি করে পায়ে কড়া বাধিয়ে বসত, দু'দিন বাদে তারাই হয় যেন আর এক মানুষ। নেহাৎ লোকে পছন্দ করে, নইলে—

হঠাৎ দরজায় কার ছায়া পড়ল। একটি বছর ২৩।২৪এর যুবক দরজার পাশে দাঁড়িয়ে স্মিত হাস্যে প্রশ্ন করল, "আসতে পারি স্যর?"

সুরেশ্বর কলম থামিয়ে ইঙ্গিতে সম্মতি জানাল। উপায় কি? অভদ্র হওয়া যায় না তো!

যুবক ঘরে ঢুকে তেমনি মোলায়েম হেসে বলল, "আমাকে হয়তো চিনবেন না স্যর, কিন্তু আমার দাদা-মসয়কে হয়তো চিনবেন—ঈসসর বর্টকেস্ট বিস্বাস।" যুবক বোধ হয় আধুনিক বানানের মত উচ্চারণটাও সহজ করতে চায়! ইংরিজি S-এর অনুকরণে শ, য, স-এর মধ্যে শেষেরটিকেই তার পছন্দ।

সুরেশ্বর করুণ ভাবে জানাল, ও নাম তার শোনার সৌভাগ্য হয় নি। যুবক একটু বিস্মিত হয়ে বলল, "সোনেন নি! সেই যে যিনি সুসীলগঞ্জে একটা গোল্ড্ মাইন্ ইন্‌ভেন্‌সন্ ক'রেছিলেন?—বর্টকেস্ট বিস্বাস?"

সুরেশ্বরের আর ঘাঁটাতে ইচ্ছা করল না, সংক্ষেপে বলল, "ও!"

যুবক সাহস পেয়ে বললে, "আমার নাম গুণসিন্ধু বিস্বাস, সাহিত্য-সৌরভ।" তার পর ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, আপনি গুণী লোক, বয়োজ্যেস্ঠ, আপনাকে লুকোবো না। ছেলেবেলায় ভারী আমাসা হওয়ায় বেসি পড়াসোনা হয় নি। কিন্তু নামের পাসে একটা উপাধি না থাকলে নেড়া নেড়া ঠেকে, তাই ভাসা-বিজ্ঞানপরিসদে কয়েকটা টাকা মনি অর্ডার করে 'সাহিত্য সৌরভ' উপাধিটা আনিয়ে নিয়েছিলাম। কাউকে বলবেন না যেন স্যর!"

সুরেশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

"ছেলেবেলা থেকেই স্যর, আমার পদ্য লেখার ভারী সখ"—গুণসিন্ধু পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ টেনে বার করল। "আপনাকে স্যর একটু সুনতে হবে।"

সুরেশ্বর প্রমাদ গণল, কিন্তু এ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ম্লান হেসে বলল, "আচ্ছা, রেখে যান, পড়ে দেখব।"

"না স্যর, আমি পড়িয়ে সোনাচ্ছি। যুৎসই ক'রে পড়তে না পারলে রসগ্রহণে ব্যাঘাত হবে। দস মিনিট সময় আমাকে দিন—মাত্র দস মিনিট।" এবার সুরেশ্বরের অনুমতির অপেক্ষা না করেই গুণসিন্ধু সুরু করল,—

"দীর্ঘ দিন—লাগে দীর্ঘ রাত
আছি বসে বর্টের কোটরে।
ঘাসের ডগায় ঝলে মাকরের জাল,
সাথে তার ক্ষুদে ক্ষুদে ডিম।
লোভাতুর টিকটিকি দূরে চেয়ে রয়
মনে হয়—"

পড়তে পড়তে গুণসিন্ধুর কপাল কখনও বা কুঞ্চিত হ'ল, নয়ন বিস্ফারিত হ'ল, গলার স্বর ধাপে ধাপে চড়তে লাগল, আবার নামতে লাগ্‌ল।

সুরেশ্বর কলম কামড়ে ধরে বসে রইল। ঝাড়া আধ ঘণ্টা পরে গুণসিন্ধু থামল। মুখে তার আত্মপ্রসাদের হাসি। বললে, "এ মাসের গুঞ্জনে কিন্তু আমার অন্ততঃ দু'টো লেখা দিতে হবে স্যর!"

"এ মাসে! এ মাসের লেখা তো দু'মাস আগেই ঠিক হয়ে আছে। তা ছাড়া—"

"ও সব সুনছি না স্যর। দিতেই হবে। আপনি বয়োজ্যেস্ঠ, তায় 'লিটারেট' লোক। এ লাইনেই করে খাচ্ছেন উসসাহ না দিলে চলবে কেন?" গুণসিন্ধু আর একবার মোলায়েম ভাবে হাসল। সুরেশ্বর বাক্যব্যয় বৃথা বুঝে বললে, "আচ্ছা, রেখে যান।"

'রেখে যান' কথাটিও একটি সম্পাদকীয় ভদ্রতা। অনেক বিপদ্ থেকে সুরেশ্বরকে রক্ষা করেছে।

গুণসিন্ধু চলে গেলে সুরেশ্বর মনোহর বাবুকে ডাকল। "এই নিন আর দু'টি কবিতা। এ মাসে এই নিয়ে ক'টি হ'ল?" মনোহরবাবু একটু ভেবে বললেন, "আটশ' পুরে গেছে বোধ হয়। আর তিন দিন মাস কাবারের আছে, হাজার হয়ে যাবে। তা যাক্, সব একপিঠে লেখা, উল্টো দিকে আপিসের রাফ্ কাজকর্ম্ম করা চলবে। সাদা কাগজের যা দাম আজকাল!"

মনোহর বাবু পাশের ঘরে ঢুকলেন, সুরেশ্বর আবার কলম নিয়ে কাগজের ওপর মনোযোগ দিল। আবার ঘরের দরজা ফাঁক হয়ে গেল। এবারে যিনি ঢুকলেন তিনি আগের মত বিনীত নন, বয়সেও অনেকটা বড়। চটান ভিতরে এসে বল্লেন, "গুঞ্জনের সম্পাদক কে? আপনি?"

সুরেশ্বর থতমত খেয়ে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক যেন খেঁকিয়ে উঠলেন। পকেট থেকে দুমড়া একটা কাগজ বের করে বল্লেন, "হুঁ। আচ্ছা মশাই, জানতে পারি এ লেখাটি ফেরৎ দিয়েছেন কেন? আর—আর এই লেখা—" ভদ্রলোক ফস্ ক'রে বগলের তলা থেকে একখানা পুরোনো গুঞ্জন বার ক'রে বললেন, "এটি আপনার কাছে খুব ভাল লেগেছে, না? কেন, না উনি, শ্রীঅনিন্দ্য রায়, ২।৪টে ট্র্যাশ্ বই ছেপে বাজারে একটু নাম ছড়িয়েছেন, কেমন না?"

সুরেশ্বর দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দেখল সামনে একটি দীর্ঘ রচনা। লেখকের নামের জায়গায় মোটা মোটা অক্ষরে লেখা শ্রীক্ষেমঙ্করী দাসী। ওপরে রবার ষ্ট্যাম্পে গুঞ্জন কার্য্যালয়ের ছাপ দেওয়া। তার নীচে আর একটি ছাপ—'অমনোনীত'। নীচে তার নামের আদ্যক্ষর —'সু'।

বললে, "লেখা পত্রিকার উপযোগী কিনা সম্পাদকের মতামতের ওপর নির্ভর করে। তার যদি সবাইকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় তবে তো আর—"

ভদ্রলোক কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "থামুন ম থামুন। লেখার ভাল-মন্দ আমরাও কিছু কিছু সম্পাদকী কার না বলে একেবারে ঘাসও খাই সব আপনাদের পক্ষপাতিত্ব; নইলে—"

সুরেশ্বর তর্ক না ক'রে নিজের লেখার দিকে মনো দেবার চেষ্টা করল। ভদ্রলোক ব'লে যেতে লাগ "শুনুন তবে। ওটি আমার স্ত্রীর লেখা। ভেবেছি মেয়েছেলে, একটু উৎসাহ পাবে। ওদিকে কাগজে খুব লম্বা-চওড়া লেখেন—মেয়েদের তুলতে হবে, প হবে, হেন করতে হবে, তেন করতে হবে—কত তা যাক্, এবার দেখা যাবে ক'দিন কাগজ চাল ভদ্রলোক দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়া বললেন, "হ্যাঁ, আমার স্ত্রী আপনাদের গ্রাহিকা ছি নাম কেটে দেবেন। ও রকম ওঁচা কাগজ বা যাওয়া আমি পছন্দ করি না।"

সুরেশ্বর কি জবাব দিতে গেল, কিন্তু ভদ্রলোক আগেই বেরিয়ে গেছেন। সুরেশ্বরের মনটা খি গেল। চায়ের ঝোঁকটা থাকতে থাকতে বেশ দরদ সে স্ত্রীশিক্ষার ওপরই এক কলম লিখতে যাচ্ছিল যে!

মিনিট দুই মাত্র। দরজা আবার ফাঁক হ'ল। এ প্রৌঢ় ভদ্রলোক বছর দশেকের গোলগাল, টেপা একটি মেয়ের হাত ধরে ঘরে ঢুকলেন।

"আপনার নামই সুরেশ্বর বাবু?'নমস্কার।"

"নমস্কার।"

"এলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করতে। এটি আ মেয়ে টেঁপ—মানে অলকনন্দা চ্যাটার্জ্জি।" মেয়ের চি চেয়ে বললেন, "নমস্কার করেছিস?", প্রত্যুত্তরে —মানে অলকনন্দা চ্যাটার্জ্জি ড্যাবডেবে চোখে সুরেশ দিকে তাকিয়ে রইল। মুখে কোনই ভাবান্তর গেল না।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক কিন্তু দমলেন না। বললেন, "নি মেয়ে, নিজের মুখে বলাটা ভাল দেখায় না, কিন্তু অ প্রতিভা মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না—"

বিশ্বাস করবার জন্য সুরেশ্বর প্রতিভাময়ীটির দিকে ফিরে তাকাল। বেশ কুমড়ো কুমড়ো চেহারা। প্রতিভার কোন পরিচয়, মুখে অন্ততঃ, নেই

"বের কর তো টেঁপ,—মানে অলকনন্দা সেই ছবিটা! দেখুন মশাই, এইটুকু মেয়ে, নি-ঈজে এঁকেছে। বিশ্বাস করেন?" ব'লে ভদ্রলোক সুরেশ্বরের সামনে একটি ভাঁজ করা কাগজ মেলে ধরলেন। সুরেশ্বর বিস্মিত হয়ে দেখল এবং সেটা যে 'টেঁপ, অর্থাৎ অলকনন্দার' নি-ঈজের আঁকা তাও বিশ্বাস করল। ছবির নীচে টেঁপ—অর্থাৎ অলকনন্দার মতই-গোদা গোদা অক্ষরে লেখা 'ধানের আঁটি'। (ছবিখানা দেখলে হয়তো তলায় "আমের আঁটি" বা 'গাবের আঁটি' লিখে দিতেই সাধ যাবে।) আরও নীচে অশুদ্ধ বানানে শিল্পীর নাম টেঁপি লিখে কেটে শ্রীমতী অলকনন্দা চ্যাটার্জ্জি বসানো হয়েছে। ছবির বিষয়বস্তু এই রকম:—প্রকাণ্ড একটি মেয়ে—মাথাটা শরীরের দ্বিগুণ, পটল-চেরা নয়, একেবারে ঝিঙে-চেরা চোখ নিয়ে এক হাঁটু ব্লু-ব্ল্যাক্ কালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হাতের আঙুলগুলো সব ঠুঁটো। হাত ও আঙুল দুই-ই খাড়া ওপর দিকে উঠে আছে। তার ওপর ইকড়িমিকড়ি কুণ্ডলী পাকানো সাপের মত কতগুলো যেন কি! সেগুলিই সম্ভবতঃ ধানের (বা আমের) আঁটি। ছবির পেছনে আকাশের গায়ে বেশ বিরাট্ আকারের একটি গোল সূর্য্য। কম্পাস দিয়ে এমন ভাবে গোল করা হয়েছে যে কম্পাসের কাঁটায় কাগজ ফুটো হয়ে গেছে। তার কিছু পেছনে আধখানা কামড়ানো লুচির মত এক ফালি চাঁদই হবে বোধ হয়! এবং তারও পেছনে কয়েকটি উড়ন্ত পাখী বা মশা বা ঐ রকম কিছু একটা!

"এটি কিন্তু মশাই, আপনার কাগজে বের করা চাই। এ মাসেই। জানেন তো, সুযোগ না দিলে প্রতিভারও অপমৃত্যু হয়—ফুল্ মেনি এ জেম্ অব পিওরেষ্ট্ রে সিরীন্—পড়েছেন তো?"—টেঁপির বাবা বললেন।

সুরেশ্বরের ইচ্ছা করছিল, এখনই গলা টিপে এক সঙ্গে প্রতিভা ও সেই প্রতিভার পিতৃদেবের শুদ্ধ অপমৃত্যুর ব্যবস্থা ক'রে দেয় ভবিষ্যতের জন্য ফেলে না রেখে। কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে কাষ্ঠহাসি হেসে সে শুধু বল্‌ল, "আচ্ছা, রেখে যান।"

ক্রিং—ক্রিং-ং-ং-ং। সুরেশ্বর টেলিফোনটা কানে চেপে বল্‌ল, "হ্যালো? হ্যাঁ, গুঞ্জন অফিস। স্পিকিং। কিন্তু আজ আপিস বন্ধ, কাল বরঞ্চ—য়্যাঁ? না, ধারাবাহিক উপন্যাসের জায়গা নেই। তবু—কি বলছেন? জোরে বলুন। একটা অভিমত? কি দরকার? আচ্ছা, না না, আজ আসবেন না, উইক্ ডে-তে একদিন পাঠিয়ে দেবেন। হুঁ, নমস্কা-র।" খটাং করে রিসিভারটা স্বস্থানে রাখতেই আবার সামনের দরজা খুলে গেল।

তার পর পর পর সতেরো জন।

সুরেশ্বর দরজা বন্ধ ক'রে ওপরে চলে গেল। সারা সকালটাই মাটী। ওপরে গিয়ে, ভাইপো-ভাইঝিদের চীৎকার অগ্রাহ্য করেই সে আর একবার লেখাটা নিয়ে বসবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু হায়রে, ওপরে আসতে না আসতে চাকর ছক্কুলাল এসে জানাল; "একটা বাবু আইসেছে। আপনাকে বোলাইছে।"

সুরেশ্বর তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল, বল্‌ল, "বল্ গিয়ে বাবু মরে গেছে।" ছক্কুলাল ঘাড় নেড়ে বললে, "জি!"

সে সত্যি সত্যি চলে যায় দেখে সুরেশ্বর তাকে ডেকে ফেরাল। বললে, "এই, শোন্, কি বলবি?"

ছক্কুলাল বোকা হাসি হেসে বল্‌ল, "বলবে বাবু বলিয়েছেন তিনি মরিয়ে গেছেন।"

"দূর গাধা! আচ্ছা শোন্। কোন্ বাবু, কি রকম দেখতে?"

ছক্কুলাল হাতের তেলো মাটীর ওপর সমান্তরাল ভাবে ধরে উচ্চতা দেখিয়ে বল্‌ল, "এই এত্তো বোড়ো।"

"দূর হাঁদা! কত বয়স হবে?"

"এই এক কুড়ি দু' কুড়ি হবে।" সুরেশ্বর আর কথা না বাড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে নীচে নেমে এল।

ফাল্গুনের গুঞ্জন বেরিয়ে গেছে। ২।৪ দিনের জন্য একটু নিঃশ্বাস ফেলা যাবে। বাবাঃ, একেই বলে সাহিত্য সেবা! মনের খোরাক নিয়ে কারবার এরই নাম? সুরেশ্বর ভাবতে পারে নি, অতি সাধের কাজও অবশ্য-কর্ত্তব্য হ'লে বিরক্তিকর হ'তে পারে। সুরেশ্বর

ঠিক করল কয়েক দিনের জন্য দার্জ্জিলীং ঘুরে আসবে। কলকাতায় থাকলে নিশ্চয়ই সে হার্ট ফেল করবে।

দার্জ্জিলীং। লুই জুবিলী স্যানিটেরিয়াম্। দলে দলে স্বাস্থ্য ও আমোদাপিয়াসীর ভীড়। নিজের গায়ে ওভারকোট্ এবং কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে সুরেশ্বর ম্যানেজারের ঘরে এসে হাজির হ'ল। "একটা সিংগল্ সিটেড্ ঘর চাই স্যর!" ম্যানেজার অবাক হ'য়ে বল্লেন, "সিংগল্-সিটেড্ ঘর! এই ভীড়ে? ক্ষেপেছেন? ডবল-সিটেড্ ঘরও একখানা খালি নেই। তবে—, আচ্ছা দাঁড়ান। একখানা বোধ হয় ডবল-সিটেড্ ঘর আছে। সেখানকার একজন বোর্ডার কাল চলে গেছেন। মিস্টার ভড় একা আছেন। তা সেখানে প্রায় সিংগল-সিটেড্ ঘরের মতই আরাম পাবেন। মিস্টার ভড় বয়স্ক লোক, আর অতি সজ্জন।" অগত্যা সুরেশ্বর তাতেই রাজি হ'ল। উপায় কি?

মিস্টার ভড় অর্থাৎ গোবর্দ্ধন ভড় সওদাগরী আপিসে চাকরী করেন। বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। মুখে সর্ব্বদাই হাসি লেগে আছে। সুরেশ্বরকে তিনি খুব খাতির ক'রে গ্রহণ করলেন।

"ক'দিন আছেন? এক সপ্তাহে কি হবে মশাই! থেকে যান, থেকে যান। এখন মেওয়া সস্তা, কপি আর কড়াইশুঁটি এন্তার। ও জিনিষ, এখন প্লেনে কোথায় পাচ্ছেন? তার পর জানলা খুললেই নগাধিরাজ—"

একটু পরে আবার প্রশ্ন করলেন, "কি করা হয়?"

"এই একটা কাগজ দেখাশোনা করি।"

"কাগজ! কাগজের দোকান আছে বুঝি? তবে তো রাজা লোক। উঃ, কি দামটাই বেড়েছে কাগজের!"

"সে কাগজ নয়, মাসিক কাগজ—'গুঞ্জন'।"

"গুঞ্জন? মাসিক পত্র? আপনিই এডিটার বুঝি?" গোবর্দ্ধন বাবুর মুখে এবার সম্ভ্রমের চিহ্ন ফুটে উঠল।

সারা দিন টৈ-টৈ ক'রে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ক্লান্ত সুরেশ্বর সন্ধ্যার পর তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু এখানে সবই টাইম্ বাঁধা; খাবার ঘণ্টা পড়লে তবে খাবার আসবে। ঘণ্টা দুই তীর্থের কাকের মত বসে থাকবার পর স্কুলের ছুটীর ঘণ্টার মত মধুর ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। অমনি একসঙ্গে সিঁড়িতে, ঘরে, বারান্দায়, উঠোনে চটি, স্যাণ্ডাল এবং ভারী জুতোর প্রবল শব্দে বোঝা দার্জ্জিলীংএ খিদেটা বোধ হয় ভালই হয়।

টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে, প্রচুর ঠাণ্ডা। এ ঘুমটাও যুৎসই হবে। সুরেশ্বর মনে মনে ভাব দার্জ্জিলীংএর এই তো মজা।

সবে তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় গোবর্দ্ধন বাবু ডাক "মশাই, ও মশাই, শুনছেন? বলি ও এডিটার বাবু!"

সুরেশ্বর ধড়মড় ক'রে উঠে বসল,—"কি, কি! ব্যাপার?"

"না, কিছু নয়। আপনাকে একটা জিনিষ শোন এখনই ঘুমুবেন কি? এখানে কি লোকে ঘুমুতে আ গোবর্দ্ধন বাবু স্যুট্‌কেস্ খুলে একখানা মোটা খাতা করলেন। একটু যেন সলজ্জ ভাবে বললেন, "অ দিন থেকে একটু-আধটু নাটক লিখে আসছি, ছাপান দূরে থাক, কাউকে শোনাতেই পারি না। এত দিন পরে যোগ্য লোক পেয়েছি। একটু শু হবে। বেশী নয়, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই হয়ে যাবে।"

"য়্যা—এখন?"

"না না, ওসব ওজর চলবে না। আপনি জ আপনার মতের একটা মূল্য আছে,—শুনতেই হবে। না, শুয়ে শুয়ে হয় না, উঠে বসুন।" সুরেশ্বরকে প্রতিবাদের সময় না দিয়ে গোবর্দ্ধন বাবু আরম্ভ করলে

"জাঁহাপনা!

কী সংবাদ দূত? অসঙ্কোচে কর নিবেদন।"

সুরেশ্বর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। গোব বাবু অভিনয়ের ভঙ্গীতে পড়ে চললেন। তিনি নাট্যকার ন'ন, নটও।

বাইরে ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, কন্ব হাওয়া জানলার ফুটো দিয়ে সূচের মত মুখে-চে বিঁধছে। এই ভাবে চল্‌ল পাকা তিন ঘণ্টা। শে গোবর্দ্ধন বাবু থামলেন। "এটা ঐতিহাসিক, কাল এ পৌরাণিক নাটক শোনাব—জরাসন্ধ বধ। সামাজি আছে, তা পরে হবে। সব শুদ্ধ চোদ্দখানা লিখেছি; চোদ্দ দিনের আগে কিন্তু আপনাকে ছাড়ছি না।"

সে রাতে সুরেশ্বরের ঘুম হ'ল না। পরদিন সকা

শোনা গেল, ভোর হবার আগেই সে কখন ম্যানেজারকে জাগিয়ে, হিসেব চুকিয়ে, এক ভুটিয়া কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে চলে গেছে। স্টেশনের দিকে নয়,—সোজা উত্তরে, বোধ হয় তিব্বতের পথে। বিশ্রাম তার চাই-ই।

খালার তরে

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্.এ

অন্ধকারে বাড়ী এলেম চকের পুকুরে
কা'রা যেন দাঁড়িয়েছিল কোন্ মধুপুরে!
সেখানে সেই হাওয়াগাড়ী
যোজন ভরা গন্ধ তারি
আন্‌ছে মনে অনেক স্মৃতি গোপন দুপুরে;
অন্ধকারে বাড়ী এলেম চকের পুকুরে।

তরুণ জোয়ান সেই গাড়োয়ান মন যে টানে গো,
গহন বটের ছায়ায় ছায়ায় চড়ুই হানে গো।
পথ ভুলায়ে আনছে কোথা
কাঁসাতলির বিলের সোঁতা
আপ্‌সানেতে[১], আধেক রেতে ভয় যে প্রাণে গো,
তরুণ জোয়ান সেই গাড়োয়ান মন যে টানে গো!

তাই ত' দেখি অবাক্ চোখে সেদিন নাহি রে,
সবার স্বপন আস্‌ছে যেন নয়ন ঘিরি রে!
সবুজ পেঁপের লালের পাশে
কোন্ সে কোকিল ঘনিয়ে আসে,
ছায়ার মতন খালার কাঁদন, করুণ দীঘি রে।
সবার স্বপন আস্‌ছে যেন নয়ন ঘিরি রে!

ভিটের উপর ঘুঘু চড়ে সরিষা ফুলে
বাজ হেনে যায় রঙের ছায়া সে কোন্ দুকূলে।
মধুপুরের গাড়ীর তরে
মন যে তাহার গুম্‌রে মরে
খেজুর ছায়ার স্নেহের লাগি' পরাণ যে খুলে
কইল মোরে মনের কথা সরিষা ফুলে।

অনেক দিনের খালা আমার গেছে সে কোথা?
কে যে আসে আর কেঁদে যায় জানি নে হোথা[২]!
ভিটেয় তা'দের ঘুঘু চড়ে
পরাণ আমার গুম্‌রে মরে।
তেমন যতন কে আর করে—মলিনে সোঁতা
অনেক দিনের খালা[২] আমার গেছে সে কোথা'?

১. আপ্‌সানেতে—ঢেউএ, ২. খালা—মাসীমা

রামধনুর প্রিয় পাঠকপাঠিকা,

শুভ নববর্ষে আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ ক'র। এই মাসে রামধনু উনিশ বছরে পড়ল। তার এই আঠারো বছরের ইতিহাসের সঙ্গে কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে! রামধনুকে যিনি শৈশব থেকে লালন-পালন ক'রে কৈশোর অবস্থায় এনে দিয়েছিলেন, রামধনুকে যিনি সন্তানের মত ভাল বাসতেন—সেই পরলোকগত সম্পাদক অধ্যাপক মনোরঞ্জন আজ আর নেই। কিন্তু তাঁর দেওয়া শুভ প্রেরণা আমাদের এগিয়ে যাবার পথে শক্তি দেবে এ আমরা বিশ্বাস করি। শুভ সংকল্প নিয়ে আমরা নতুন বছর সুরু করলাম।

গত বারে তোমাদের জানিয়েছিলাম সরকার থেকে রামধনুর পৃষ্ঠ সংখ্যা কিছু বাড়াবার অনুমতি পাওয়া গেছে কিন্তু দু' মাস যেতে না যেতেই আবার তাঁরা জানিয়েছেন, ভারতে আবার খবরের কাগজ ছাপার কাগজের ঘাঁটতি পড়েছে, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও উপযুক্ত পরিমাণ কাগজ আসছে না; ফলে আমাদের (এবং অনুরূপ অন্যান্য পত্রিকা—যাঁরা খবরের কাগজের জন্য বিশেষ ধরণের কাগজ ব্যবহার করেন তাঁদের) জন্য নির্দিষ্ট কাগজের পরিমাণ কমিয়ে দিতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। অবশ্য তাঁরা জানিয়েছেন, এখন ইচ্ছা করলে আমরা আবার সাদা কাগজ ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আমাদের কাছে তার আইন আরও কড়া, কারণ তা নিলে রামধনুর পৃষ্ঠা এর চাইতেও কমাতে হবে। যাই হোক্, সরকার এও জানিয়েছেন যে খবরের কাগজের আমদানী বাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা হচ্ছে, এবং তা পাওয়া গেলেই পত্রিকাগুলিকে কাগজের বরাদ্দ আবার বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। সেই শুভদিনের আশায় অপেক্ষা ক ছাড়া উপায় নেই। আইনের পাকে হাত-পা আমা বাঁধা।

গত বারে তোমাদের বলেছি, সারা ভারতে আ প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কলকা রেশনের চালের বরাদ্দ তো ইতিমধ্যেই কমিয়ে দে হয়েছে। এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ যাতে আবার ভয়াবহ র না দেখা দিতে পারে তার জন্য তোমাদেরও যতটা ক করতে হবে তা গত বারে তোমাদের বলেছি। তো শুনে সুখী হবে, এ সম্বন্ধে কলকাতার খ্যাতনামা চিকিৎ ডাক্তার যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডাঃ জে. সি. মুখার্জি ইনি শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহ-সভা এবং নানা শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লি **কিশোর অভিযান** নামে একটি চমৎ পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর এই পরিকল্পনায় দে কিশোর-শক্তিকে দুর্ভিক্ষ দমনের কাজে কি ক লাগানো যেতে পারে তার উপায় দেখান হয়ে তোমাদের বাড়ীর আশেপাশে, আনাচে কানাচে, প্র বেশী, বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে, গ্রামের বা সহরের বি অংশে যে সব টুকরো বা পতিত জমি আছে সেখ লাউ, কুমড়ো, ঢেঁড়স, ডাঁটা, ঝিঙ্গে, পালং প্রভৃতি ন রকম দেশী তরিতরকারী, শাকশব্জী লাগাতে হবে। স সামান্য যত্নে ও অতি অল্প দিনে এগুলো ফলে। শ শব্জী বেশী পেলে অনেকটা চাল বেঁচে যাবে, তা হয়তো যাদের একেবারে কিছু চাল নেই তারাও পাবে। এ ভাবে দেশের ছেলেরাই ৫০ লক্ষ লো খাবার সংস্থান করতে পারে। প্রতি শনিবার

কাজ বন্ধ রেখে এই বাগান-পরিচর্য্যায় সময় নিয়োগ করতে হবে। শুধু তাই নয়, যাতে ছেলেদের কাজে বীজের অভাব না হয় সেজন্য কৃষি বিভাগ ও নানা জায়গা থেকে সব রকম বীজ সংগ্রহ করে তা তোমাদের বিনামূল্যে বিতরণের আয়োজনও ডাঃ মুখার্জ্জি করেছেন এ বিষয়ে কিশোর অভিযান কার্য্যালয়ে (৪১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা), চিঠি দিলেই সমস্ত খবর পাবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। এই কিশোর অভিযান সফল করার ভার তোমাদেরই উপর নির্ভর করছে। কিশোর অভিযানের সংকল্প বাক্য হবে—"দুর্ভিক্ষ হতে দেব না, দুর্ভিক্ষ হতে দেব না, দুর্ভিক্ষ হতে দেব না।"

—রাঃ সঃ

কৃপণের সাজা

(বিদেশী গল্প)

শ্রীকৌটিল্য

এক ছিল কৃপণ। বুড়ো হয়েও তার হাত দিয়ে এক ফোঁটা জল গল্‌ত না, এমনি কৃপণ। টাকা পয়সা জমিয়েছিল সে প্রচুর; (খরচ না করলে জমবেই তো।) কিন্তু কখনও ভাবত না মরলে ওগুলো আর তার কাজে আসবে না, অপরে লুটে খাবে।

শেষ পর্য্যন্ত একদিন কৃপণকে সত্যি সত্যি মরতে হ'ল। মৃত্যুর পর বৈতরণী পার হ'তে হয়। নদী পার হবার জন্য কৃপণ খেয়া নৌকোয় চড়লে পর খেয়ার মাঝি তার কাছে পারের কড়ি চাইল। কিন্তু কৃপণ দেবে পয়সা, তা হলেই হয়েছে! সে বললে "দরকার নেই তোমার নৌকোর, আমি সাঁতরেই পার হয়ে যাচ্ছি।" বলে সে জলে লাফিয়ে পড়ল এবং সাঁতরে গিয়ে ওপারে উঠল।

এদিকে যমপুরীতে হুলস্থূল ব্যাপার। কৃপণের কাণ্ড দেখে সবাই অবাক্। কিন্তু এ ভাবে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। এ ভাবে ওর দেখাদেখি সবাই যদি পারের কড়ি দিতে অরাজি হয় তবে যমপুরীর আয় হবে কোথা থেকে? খরচ চলবে কি ক'রে?

কৃপণকে ধরে আনা হ'ল। বিচার হবে তার। দোষ সে খুবই করেছে, এখন কি শাস্তি দেওয়া যায়? কেউ বললে, "ওকে গলা জলে ডুবিয়ে রাখ, কিন্তু এক ফোঁটা জল খেতে দিও না, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও না। বুঝুক ও, কি অপরাধ করেছে।" আর একজন বললে, "না, ওকে পাহাড়ের ওপর শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ, আর শকুনি এসে ওকে জ্যান্ত ঠুকরে খাক। সেই হবে ওর শাস্তি।"

যমরাজ এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। এবার বল্লেন, "ও সবে কিছু হবে না, আমি ওর আসল শাস্তির ব্যবস্থা করছি। ওকে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেব। সেখানে গেলে ও দেখতে পাবে ওর ছেলেরা কি ভাবে ওর জমানো টাকা নিয়ে খরচ করছে। সেই হবে ওর সব চেয়ে বড় শাস্তি।"

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

বাংলার কুটীরশিল্প (জ্ঞানভারতী গ্রন্থমালা)—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী। আশুতোষ লাইব্রেরী ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ॥৵০

আমাদের দেশে এক সময় কুটীরশিল্প ছিল দেশের প্রাণ। এরই কল্যাণে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকত। আজ অনাদরে এই সব শিল্প ধীরে ধীরে নষ্ট

হতে বসেছে, সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে দেশের আর্থিক দুর্গতি। বাংলার খাঁটী নিজস্ব কুটীরশিল্প সম্বন্ধে ছোটরা কেন, বড়রাও অনেক কিছু জানেন না। লেখক সরস, প্রাঞ্জল ভাষায় ছোটদের মত ক'রে তার পরিচয় দিয়েছেন বস্ত্রশিল্প, শর্করাশিল্প, ধাতুশিল্প মৃৎশিল্প, দারুশিল্প এবং আরও নানা রকম শিল্পের পরিচয় এতে আছে। ব খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। উদ্ভট রোমাঞ্চকর উপন্য সমারোহের মধ্যে এই ধরণের বই ছেলেদের হাতে দিয়ে লেখকের সঙ্গে প্রকাশকও সৎসাহসের দিয়েছেন সন্দেহ নেই।

বাংলাকে চিনতে শেখ

শ্রীহেমলতা দেবী

তোমরা ভূগোলে পৃথিবীর খবর পড়। পৃথিবীর কোথায় কোন্ সহর, কোথায় কোন্ নদী, সব হয়তো তোমাদের মুখস্থ! কিন্তু আমাদের বাংলার বিবরণ হয়তো অনেকেরই ভাল করে জানা নেই। দেশভ্রমণ করতে হ'লে আমরা আগে ছুটি বাংলার বাইরে; ঘরের কাছে যে সব দেখবার জিনিষ আছে তা আমরা দেখা প্রয়োজন বোধ করি না। এই সব জায়গার সঙ্গে আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি—আমাদের দেশভাইদের কত সুখদুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে তা কেউ খোঁজ করবার চেষ্টা করে না। বিলেতের ইস্কুলের ছেলেরা ছুটী পেলেই কখনো মাষ্টার মশাইদের সঙ্গে, কখনো বা

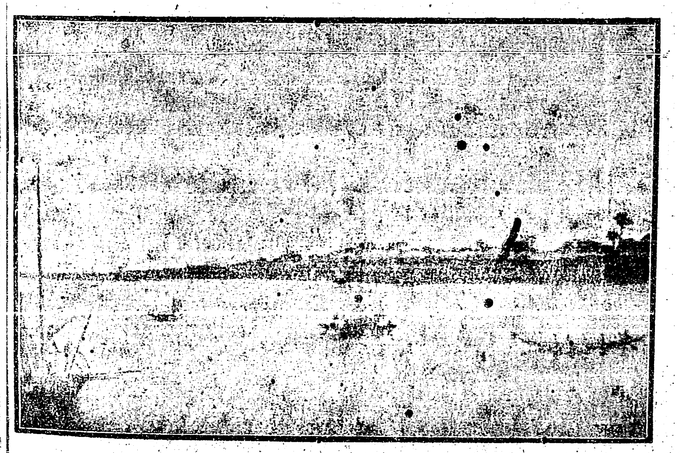

নিজেরা দল বেঁধে তাদের দেশের পল্লী অঞ্চলে (কান্ট্রি সাইড) ঘুরে বেড়ায়। এ দেশে তার একেবারেই রেওয়াজ নেই। হয়তো ওদেশের মত ভাল ঘাট আমাদের দেশে নেই—কিন্তু তবু, যেটুকু তারই বা সদ্ব্যবহার হয় কই? কলকাতার ছে হয়তো বড় জোর শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক করতে কিংবা যায় দক্ষিণেশ্বর; বড় জোর কলকাতার আশপাশে আরও কত দেখবার আছে। সকালে বেরিয়ে, সারাদিন ঘুরে দেখে বিকেলের দিকেই ফিরে আসা যায়। অথচ কেউ খোঁজ করে না! এমনি ধারা মফঃস্বল সব স কাছাকাছি কিছু না কিছু দেখবার মত জায়গা আছে রামধনু মারফৎ তোমাদের মাঝে মাঝে এই জায়গার পরিচয় দেব। যদি দেখে আসতে শুধু মনে আনন্দ পাবে না—শিখবেও নিজের দেশকে—মাটিকে (মা-টি) চেনার থেকেও বঞ্চিত হবে না।

আজ বল্‌ব ফল্‌তার কথা। ফলতা ব'লে একটা জায়গা আছে, বারাকপুরের কাছে থেকে কলকাতার কলের জল সরবরাহ কর তার কথা কিন্তু বলছি না। কালীঘাট-ফ রেলওয়ে ব'লে একটি ছোট রেলপথের নাম শুনে থাকবে। কলকাতা থেকে বেহালা পথে মাঝেরহাট স্টেশনে এই রেলপথের পাবে। এই রেলপথেরই শেষ স্টেশন ফলতা। কলকাতা (মাঝেরহাট) থেকে মাইল রাস্তা।

ফলতা জায়গাটা গঙ্গার ওপর। প্রসিদ্ধ দাঙ্গে

নদও এখানে এসে মিশেছে। কাজেই বন্দর হিসাবে ফলতার কিছুটা মূল্য এখনও আছে।

কিন্তু এই ফলতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা বড় ঐতিহাসিক ঘটনা। তোমরা নিশ্চয়ই জান, কলকাতা সহর ইংরেজদের তৈরী হলেও নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধে একবার ইংরেজরা হেরে যায় এবং সিরাজ-উদ্দৌলা সসৈন্যে কলকাতা দখল করেন। (এই সময়কার ঘটনা নিয়েই অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী রচিত হয়।) ইংরেজরা কলকাতার দুর্গ (এখন অবশ্য সে দুর্গ নেই) থেকে পালিয়ে চলে যায় ফলত দুর্গে। ফলতা দুর্গে ইংরেজরা অনেক দিন থাকতে বাধ্য হয়েছিল, এবং এখানে থেকেই তারা আবার সৈন্যসামন্ত যোগাড় ক'রে, নানা তোড়জোড়ের 'পর কলকাতা পুনরুদ্ধার করে।

ইংরেজের সেই বিখ্যাত দুর্গটি ফলতায় গেলে এখনও দেখতে পাবে। এখন অবশ্যি সেটা দুর্গ হিসাবে ব্যবহার করা হয় না—তার কতক অংশকে ডাক বাংলো করা হয়েছে কিন্তু দেখলে দুর্গ বলে চিনতে কোন অসুবিধাই হয় না। দুর্গের চারধারে যে পরিখা ছিল তা এখনও আছে, এবং তাতে সব, সময় জলও থাকে। গঙ্গার সঙ্গে এই পরিখার সংযোগ আছে। দুর্গে ঢুকবার দরজাটি দরকার হলে, শত্রুর আক্রমণের সময়, তুলে ফেলা যেত। এখনও তার সরঞ্জাম, চিহ্ন রয়েছে। শুধু তাই নয়, দুর্গের দু'টি প্রাচীর, বাইরের এবং ভিতরের, এখনও প্রায় অক্ষত রয়েছে—তবে জায়গায় জায়গায় জঙ্গল হয়ে গেছে। দুর্গের ভিতরে দু'টি কামানও পড়ে আছে।

ইংরেজদের আগে ওলন্দাজরা এখানে কুঠি বসিয়েছিল। এখানে তাদের জাহাজও রাখবার ব্যবস্থা (ডক্) ছিল। এখন অবশ্যি তার কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

কিন্তু আর একটি কারণে ফলতার গৌরব বেড়েছে। ফলতায় যদি কখনও যাও, দেখবে গঙ্গার ঠিক ওপরে সুন্দর একটি বাগানওয়ালা বাড়ী। গঙ্গার ঢেউ তার দেওয়ালে দিবারাত্র আছড়ে পড়ছে। এ বাড়ীটি ছিল আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর। ফলতা জায়গাটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। এখানে বসে তিনি উদ্ভিদ্ নিয়ে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গবেষণা করে গেছেন। এখানে তিনি শুধু বাড়ীই করেন নি, একটি চমৎকার বাগানও তৈরী করেছিলেন—আর তার নাম দিয়েছিলেন মায়াপুরী। গবেষণার জন্য পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে নানা দুষ্প্রাপ্য গাছ এনে এখানে লাগিয়েছিলেন। সে বাগান এখনও আছে। তোমরা যদি কখনও ফলতা যাও—মহামনীষীর স্মৃতিজড়িত 'মায়াপুরী' দেখে আসতে ভুল না যেন!

যে জিনিষ করা সহজ

আমাদের নিত্য ব্যবহারের অনেক জিনিষ আমরা ঘরেই তৈরী ক'রে নিতে পারি। নিজের হাতে নিজের ব্যবহারের জিনিষ তৈরী করতে পারা (যদি নিখুঁত নাও হয়) কম আনন্দকর নয়। তাই এই ধরণের কিছু কিছু জিনিষ তৈরীর সহজ উপায় তোমাদের শিখিয়ে দেব।

আজ বলব কি ক'রে লেখার কালি তৈরী করতে হয়। কালি তৈরীর প্রধান দু'টি উপাদান হচ্ছে ট্যানিক এসিড আর হিরাকষ। এই ট্যানিক এসিড পাওয়া যায় হরিতকী, আমলকী, মাজু ফল, বাবলার ছাল ইত্যাদি থেকে; আর হিরাকষও বেনের দোকানে পাবে। হিরাকষের মধ্যে লোহা থাকে এবং কালির জন্য সেই লোহাটুকুরই দরকার।

খানিকটা হরিতকী, আমলকী, বা বাবলার ছাল নিয়ে ভাল ক'রে কুটে বা থেঁৎলে গরম জলে সিদ্ধ কর। এবারে যে কষজল তৈরী হ'ল তার সঙ্গে খানিকটা হিরাকষ মেশাও। তার পর তার সঙ্গে সামান্য কিছু গঁদ মেশালেই কালি তৈরী হয়ে গেল। কতটা হিরাকষ মেশালে কালি সব চেয়ে ভাল হবে তা বিভিন্ন ভাগ নিয়ে পরীক্ষা ক'রে বার করবে। কালিতে যাতে ছাতা না পড়ে সে জন্য এক ফোঁটা কার্ব্বলিক এসিড মেশালে ভাল হয়।

মাজু ফলের কালি আরও ভাল হয়। এই মাজু ফলও বেনের দোকানে বিক্রী হয়। মাজু ফল দিয়ে এই ভাবে ভাল কালি তৈরী করা যেতে পারে: এক ছটাক মাজু ফল থেঁৎলে তিন পোয়া জলের মধ্যে অন্ততঃ দশ দিন ভিজিয়ে রাখ। তার পর সেই কষজল ছেঁকে তার মধ্যে সিকি ছটাক আরবী গঁদ ও আধ ছটাক কি তার চেয়েও কিছু কম হিরাকষ মেশাও। তা হলেই কালি তৈরী হবে।

এই কালি লিখবার সময় ততটা গাঢ় হয় না—কিন্তু একটু শুকোলেই বেশ কালো হয়। লেখার সঙ্গে সঙ্গে কালি গাঢ় করতে হলে তার মধ্যে কিছু প্রাশিয়ান্ ব্লু বা ইণ্ডিগো সাল্‌ফেট বা ঐ রকম কোন নীল রং মেশাতে হয়। এই কালি হবে ব্লু ব্ল্যাক্। এই সব রং যাঁরা রাসায়নিক দ্রব্যাদির কারবার করেন তাঁদের কাছে পাওয়া য

খুব ভাল কালির জন্য (যা ফাউণ্টেন পেনে হয়)—বিশুদ্ধ ট্যানিক এসিড্ ব্যবহার করতে এর একটা ভাগও এখানে দেওয়া গেল:—ট্যানি ১৫ ভাগ, হিরাকষ ১৫ ভাগ, হাইড্রোক্লোরিক্ ১০ ভাগ, কার্ব্বলিক এসিড ১ ভাগ, অল্প পরিমাণ জলে মেশে এমন কোনও নীল রং (যেমন সা ব্লু)। অবশ্যি এর সঙ্গে পরিমাণ মত জলও মেশাতে

গত বারে তোমাদের বলেছিলাম রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় হোলকার দলের নতুন রেকর্ডের কথা। তার পর রণজি প্রতিযোগিতার ফাইনাল্ খেলা হয়ে গেছে। হোলকার দল বরোদা দলকে ৫৬ রানে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। এই খেলাটি শেষ পর্য্যন্ত খুব উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। হোলকারের প্রবীণ অধিনায়ক কর্ণেল নাইডু ম ইনিংস্‌এ একাই করেন ২০০ রান্।

* * * *

যুদ্ধের জন্য ১৯৩৭ সনের পর এত দিন ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ্‌গুলিতে কোন নির্ব্বাচন হয় নি। ন' বছর পরে সম্প্রতি আবার নতুন ক'রে ব্যবস্থা-পরিষদ্‌গুলি পুনর্গঠিত হয়েছে। ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৮টি প্রদেশে কংগ্রেস দল অধিকাংশ আসন দখল করায় তারাই মন্ত্রিসভা গঠন করেছে বা করবে। এই প্রদেশগুলি হচ্ছে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ। বাংলাদেশে মুসলমানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনগুলি মুসলিম লীগই অধিকাংশ দখল করেছে। সুতরাং বাংলার মন্ত্রিসভা (এখনও গঠিত হয় নি) হয় পুরোপুরি লীগ, না হয় লীগের সঙ্গে অন্য দলের 'কোয়ালিশন্' হয়ে গঠিত হবে। মুসলিম লীগের নেতা সারওয়ার্দি সাহেব হবেন প্রধান মন্ত্রী। বাংলার বর্ণ হিন্দু ও তপশীলী হিন্দু গুলির অধিকাংশই অবশ্যি কংগ্রেস দখল করেছে। প্রদেশ দু'টির মধ্যে সিন্ধুতে লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হ পাঞ্জাবে হয়েছে কংগ্রেস, ইউনিয়নিষ্ট ও আকা দলের সম্মিলিত মন্ত্রিসভা। অন্যান্য দলগুলি, কমিউনিষ্ট দল, হিন্দু মহাসভা, র‍্যাডিক্যাল ডেমো বা জাতীয়তাবাদী মুসলিম—এরা বিশেষ সুবিধা পারে নি।

* * * *

ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হ এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য ভারতে এসেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যর্ ষ্ট্যাফোর্ড ক্রি আলেকজাণ্ডার। এঁরা দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। চনার ফল কি হবে বলা যায় না। কংগ্রেস দল অখণ্ড ভারত এবং মুসলিম লীগ দৃঢ়ভাবে পাকিস্থানে জানিয়েছে।

* * * *

তোমরা ইতিহাসে বড় বড় লোকের প আত্মোৎসর্গের কাহিনী পড়। সম্প্রতি এই রকম

আত্মত্যাগের কাহিনী শোন। ঘটনাটি ঘটেছে মাত্র কয়েক দিন আগে কলকাতা সহরে। ঝড়ে একটি ছেলে গাছ চাপা পড়ে, এবং সাহায্যের জন্য চেঁচাতে থাকে। শৈলেন্দ্রনাথ নন্দী নামে এক ভদ্রলোক চীৎকার শুনে ছেলেটিকে উদ্ধারের জন্য ছুটে যান। বহু কষ্টে তিনি ছেলেটিকে গাছের তলা থেকে টেনে বার করেন, কিন্তু সেই গাছের সঙ্গে ছিঁড়ে পড়েছিল ট্রামের বিদ্যুতের তার। শৈলেন্দ্রনাথ বেরিয়ে আসবার আগেই সেই তারের সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তড়িতাহত হয়ে এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিটির মৃত্যু ঘটে। ছেলেটি অবশ্য রক্ষা পায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যখন হিংসা, দ্বেষ এবং পরস্পরকে হত্যার তাণ্ডব লীলা চলছে তখন একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের এই রকম পরের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জ্জনের কাহিনী শুনলেও মন শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে নাকি?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

সো	ভি	য়ে	ট	*	স্ট্যা
না	শি	না	*	চা	লি
র	ন্	ন্	নি	র্বা	ণ
বা	স্কি	গো	র্কী	ক	গ্রা
ভ	ম	ও	পু	*	ড
লা	মি	জা	রে	ব	ল্

উত্তরদাতাদের নাম:—চিত্রলেখা গ্রন্থাগারের সভ্যবৃন্দ (কলিকাতা); শিপ্রা সেন (নিউ দিল্লী); কমল বসু (কলিকাতা); নীপা, ঝুলু, মোহন (এলাহাবাদ); চম্পা দাশগুপ্তা (কাশী); নির্ম্মল ও সাবিত্রী (ঢাকা); নুরজাহান বেগম (কলিকাতা); নন্দা দেবী (কটক); রণজিৎ দত্ত (কনকহাটি); রমা, বাচ্চু, শ্যামল (পুনা)।

নূতন ধাঁধা

শ্রী—

"ওহে রমেশ, আমাদের রামবাবুকে নাকি চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে?"

"তা তো জানি না, তবে ওঁদের অফিসে ৫৫ বছর বয়সের আগে কাউকে চাকরি থেকে ছাড়ান হয় না এইটুকু ঠিক জানি।"

তা হলে বুঝতে হবে—

(১) রামবাবুর বয়স ৫৫ বছর হয়েছে, সুতরাং তাঁর চাকরি গেছে।

কিংবা (২) রামবাবুর চাকরি গেছে, সুতরাং তাঁর বয়স ৫৫ বছর হয়ে গেছে।

কিংবা (৩) রামবাবুর চাকরি যদি না গিয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে তাঁর বয়স এখনও ৫৫ বছর হয় নি।

কিংবা (৪) হয় রামবাবুর বয়স ৫৫ বছর হয় নি, কিংবা তাঁর চাকরি গেছে।

কিংবা (৫) হয় রামবাবুর বয়স ৫৫ বছর, কিংবা তাঁর চাকরি যায় নি।

এর মধ্যে কোন্‌টা বা কোন্‌গুলি ঠিক?

আগামী সংখ্যায়
নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

—দেশবাসীর এই অনাবিল প্রশংসা আমাদের উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধন করে আসছে এক শতাব্দীর উপর। এর মূলে রয়েছে আমাদের একনিষ্ঠ সাধনা, কারিগরগণের অননুকরণীয় নৈপুণ্য ও তদুপরি আমাদের বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট উপকরণ।

TIGHT BINDING

Regd. No

গহনা ও শাড়ী

শুধু শাড়ী যত সুন্দর হোক,
তা নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ করে না।
শুধু গহণা যত সুন্দর হোক,
তাতে নারী-রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে
ওঠে না।
শাড়ী ও গহণার মিলনেই
নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ হয়।

তাই আমরা—
পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা পরিবেশনের
জন্য নানা প্রকারের বেণারসী শাড়ীর
আয়োজন করেছি—শাড়ীগুলি
বর্ণ-বৈচিত্র্যে, রূপরচনায়
অনিন্দ্যসুন্দর।

আমাদের গহণা—আধুনিক রুচি-
সম্মত শিল্পচাতুর্য্যে, রূপছন্দে
অভিনব।

কার্য্যালয় : ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্ : সাউথ্ ১২৬

Regd. No C

গহনা ও শাড়ী

শুধু শাড়ী যত সুন্দর হোক,
তা নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ করে না।
শুধু গহণা যত সুন্দর হোক,
তাতে নারী-রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে
ওঠে না।
শাড়ী ও গহণার মিলনেই
নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ হয়।

তাই আমরা—
পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা পরিবেশনের
জন্য নানা প্রকারের বেণারসী শাড়ীর
আয়োজন করেছি—শাড়ীগুলি
বর্ণ-বৈচিত্র্যে, রূপরচনায়
অনিন্দ্যসুন্দর।

আমাদের গহণা—আধুনিক রুচি-
সম্মত শিল্পচাতুর্য্যে, রূপছন্দে
অভিনব।

কুণ্ড জুয়েলারী ওয়ার্কস
প্রো: জে. এল. কুণ্ডু
১০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন: বি.বি. ১১০০ GRAMS: KUNDJUEL
KJW SYMBOL OF PERFECTION

কার্য্যালয়: ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্: সাউথ ১২৬

COLOUR PAPER

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর—

বাকি দিনগুলি সময় নষ্ট না করিয়া পড়া দরকার

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"

(ডিটেকটিভ শিশু-উপন্যাস)

অন্ধকারের বন্ধু	(হেমেন্দ্র)
ছিন্নমস্তার মন্দির	(সৌরীন্দ্র)
তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক	(অখিল)
বিজয়-অভিযান	(নৃপেন্দ্র)
ছায়া কালো-কালো	(বুদ্ধদেব)
রাত্রির যাত্রী	(হেমেন্দ্র)
গুপ্ত ঘাতক	(প্রভাবতী)
হত্যার প্রতিশোধ	(প্রভাবতী)

প্রত্যেকখানির দাম
বারো আনা
ক্রমান্বয়ে বই বাহির হইতেছে

"প্রহেলিকা সিরিজ"

গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ
শিশু-উপন্যাস

কার্ত্তিক মাসে—**স্বপ্ন হলো সত্যি**
খগেন্দ্রনাথ

অগ্রহায়ণ মাসে—**অদৃশ্য গোয়েন্দা**
পরেশচন্দ্র সেন

পৌষ মাসে—**গ্রহের ফের**
প্রভাবতী দেবী সরস্ব

মাঘ মাসে—**হাওয়ার পেছনে**
দীনেশ মুখোপাধ্

পর পর বাহির হইবে
প্রত্যেকখানির দাম—এক টাকা

"বিশ্ব-প্রতিভা সিরিজ"

নতুন ধরণের জীবন-কথা
ছবিতে পরিপূর্ণ

১। দানবীর কার্ণেগী—পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	৸০
২। ঋষি অরবিন্দ—চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী	১৲
৩। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন—হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৲
৪। প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট—সরলা নন্দী	১৲
৫। বলদর্পী হিটলার—যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
৬। মাতুকর মার্কনী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৲
৭। সমুদ্রজয়ী কলম্বাস—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৲
৮। এব্রাহাম্-লিনকন্—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৲

বিশ্ব-প্রতিভা সিরিজের আর একখানি
অমূল্য গ্রন্থ
স্বদেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র—
হেমেন্দ্রবিজয়
মূল্য এক টাকা
ছাপা হইতেছে— শীঘ্রই বাহির হইবে

—নতুন বই—
বাহির হইল—
"জ্ঞানের আলো"
হেড মাষ্টার মৌলভী মহম্মদ এমাদুল হক
বি-এ, বি-টি প্রণীত
সাধারণ জিনিষগুলির বিষয়
অনেকে জানেন না, সবই উত্তর এতে আছে।
মূল্য বার আনা

দেব সাহিত্য-কুটীর * ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ-পুণ্যাহের এ-শুভলগ্নে প্রিয়জনকে একটা সুসংবাদ দিয়ে রাখি :
আগামী পূজায় 'শরৎ-সাহিত্য ভবন' থেকে যে নূতন পূজাবার্ষিকীখানি আপনাদের হাতে তুলে দেবার জন্য প্রকাশের আয়োজন হ'চ্ছে, সেখানির নাম—'আকাশদীপ !'

যুগমান্য শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ,

শিশুসাহিত্য-সম্রাট

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

— চিত্রবহুল বিরাট পূজাবার্ষিকী —

আকাশদীপ

মহাপূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হবে।
গত পূজায় 'কলরব' পেয়ে যাঁরা খুশী হয়েছেন, 'আকাশদীপ' তাঁদের চিত্ত আকর্ষণ করবেই।

অলকনন্দা-সিরিজ

বৈশাখে প্রকাশিত হয়েছে :
শিশুসাহিত্য-সম্রাট **হেমেন্দ্রকুমারের 'সুন্দরবনের রক্তপাগল'**

জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত হবে :
শিশুসাহিত্যাচার্য্য **সৌরীন্দ্রমোহনের 'পথ-ভোলা পথিক'**

১। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের **রত্নপুরের যাত্রী**	৪। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের **বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে**
২। শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর **"বন্দী, জেগে আছো ?"**	৫। শ্রীসুমথনাথ ঘোষের **মোহনসিংয়ের ফাঁসি**
৩। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের **রীতিমত এ্যাড্‌ভেঞ্চার**	৬। শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর **অভিশপ্ত সম্পদ**

শরৎ-সাহিত্য-ভবন * ২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, পোঃ বক্স ১৬৬১০, কলিকাতা।

নব প্রকাশিত খানকয়েক ডিটেকটিভ এ্যাড্‌ভেঞ্চার বই—
দুরঙা ছাপা—উঁচু দরের রচনা—বহু ছবি-যুক্ত

বিপদ যখন ঘনিয়ে এল—অরণ্যের মাঝে ভগ্ন মন্দিরে রক্তধারা···শিউরে ওঠা রহস্য···যা উদ্‌ঘাটনে বহু লোক প্রাণ দিল। পুলিশ ব্যর্থ···ডিটেকটিভ পরাজিত···কে তবে শয়তানের মুখস খুলল? পদে পদে সংঘর্ষ···রোমাঞ্চ···রহস্য। লৌহ কঠিন বুক নিয়ে পড়তে হবে। দাম—১।০

কাঠের ড্রাগন—মিঃ সরকার বর্ম্মা হতে নিয়ে এল কাঠের ড্রাগন, যাহার বুকে নিহিত ছিল নীল মণি। সঙ্গে এল রহস্য···রোমাঞ্চ—মৃত্যু—আর বর্ম্মার দুর্দ্দান্ত দস্যু ডাঃ মীন। সংঘর্ষ বাধল—জয়ী হল কে? শিউরে উঠবে। দাম—১।০

মুখস যখন খুলে গেল—জাহাজের বুকে এল রক্তলোভী ছদ্মবেশী···মূর্ত্ত হয়ে উঠল সন্দেহ—রহস্য বিভীষিকা। কার নির্ম্মম হস্তস্পর্শে অদ্ভুত চুরি—সুব্রত পাগল—ঘোষালের মৃত্যু হ'ল। ভয়াবহ রূপ দেখে কাঁপতে হবে—এমন বই পড় নি কখনও। দাম—১।০

তরুণ লেখক অজয় বসাকের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা
বৃহৎ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

হত্যা যাদের নেশা—সদ্য প্রকাশিত। এমন রোমাঞ্চকর গল্প পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দেবে। দুর্বৃত্ত ধরা পড়ার ভয়ে দেহকে করলে বিকৃত—পালাল সুদূর বর্ম্মায়। শেষ অবধি সে কি বাঁচল? প্রায়শ্চিত্তের কি ভয়াবহ পরিণতি! এর আগে তোমরা এমন বই দেখ নি। দাম—১।০

এর পর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হ'চ্ছে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ডিটেকটিভ গল্প উপন্যাস

তা ছাড়া নামকরা লেখকের ভাল ভাল বই কেবল আমাদের দোকানেই প্রচুর পাবে

এ, বি, পি, বুক ডিপো
৮বি রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা (সেবাসদনের সম্মুখে)

নতুন বই
ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার
প্রথম গ্রন্থ
দি লাষ্ট্‌ অফ্‌ দি মোহিকান্‌স্‌
মর্ম্মানুবাদ করেছেন—সুলেখক শ্রীঅমলেন্দু সেন
দাম ॥৵০
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

কিশোর-মনের বলিষ্ঠ মাসিকপত্র
কিশোর-বাংলা
সম্পাদক—অরূপ
২৫ বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা

ছোটদের উপহারের কয়েকখানি ভাল ভাল বই
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
ধূমকেতু (রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস) ৸০
আবিষ্কারের গল্প (বিখ্যাত অভিযাত্রীদের রোমাঞ্চকর কাহিনী) ৸০
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
নূতন পুরাণ (মজার গল্প) ৸৵০
হাস্য ও রহস্য (ঐ) ৸৵০
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি (মজার গল্প) ৸০
মনোরঞ্জন ও শিবরামের
এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে (মজার গল্প) ৸৵০
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
৯বি, রসা রোড, কলিকাতা

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম,
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি। দাম এক টাকা
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

—'লক্ষ্মী ঘি'

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৯শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩ { ২য় সংখ্যা

খোকার আদর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

খোকার চুমা কে খাবি?
পারিজাতের পাপড়িতে কে
আয় রে অধর ঠেকাবি।
কচি রাঙা তার অধরে—
জান না কি মাণিক ঝরে,
টাটকা মধুর কাব্‌লী আঙুর
ভরা সোনার রেকাবী।

ঐ মধুরই আশায় রে,
চন্দ্র তারে টিপ দিয়ে যায়,
সূর্য্য তারে হাসায় রে।
বিহগ তারে শুনায় গীতি,
ব্যজন করে পবন নিতি,
বাঁধা বৃহৎ সৌর জগৎ
তাহার ভালবাসায় রে!

চিনবে তারে বল্ কে?
পৌর্ণমাসী মারছে উঁকি
প্রতিপদের আলোকে।
দেখে ও কি কেউ দেখে নি
জীবন্ত নীলকান্ত মণি—
ঝক্‌মকাবে রাজার কিরীট
—উহার জ্যোতির ঝলকে।

সেক্‌স্‌পীয়ার

শ্রীসুশীলকুমার সিদ্ধান্ত

সেক্‌স্‌পীয়ারের নাম-তোমাদের কারো অজানা নেই। তাঁর লেখাই তাঁকে অমর ক'রে রেখেছে। ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনি এত বড় একজন লোক (মোটে তিন শ' বছরের কিছু বেশী আগে তিনি মারা গিয়েছেন) তাঁর জীবন সম্বন্ধে আমরা যা জানি তা অত্যন্ত অল্প। অন্ততঃ সেটা তাঁর দেশবাসীর পক্ষে মোটেই গৌরবের কথা নয়। আমরা তাঁর জীবনের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং মোটামুটি একটা বিবরণ পাই। তাতে আমাদের কৌতূহল মেটে না, বেড়ে যায়।

ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-অন-য়্যাভন নামে একটা ছোট ছবির মত গ্রামে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা সব রকম ব্যবসার দোর-গোড়ায়ই একবার মাথা ঠুকে দেখেছিলেন—কোনটায় বেশ দু'পয়সার মালিক হ'তে পারেন কিনা। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি। তবুও তাঁকে ঠিক গরীব বলা চলতে পারে না। কারণ, জানা গিয়েছে যে, তিনি একবার তাঁর নিজের সহরের মেয়র হয়েছিলেন।

স্থানীয় ব্যবসাদারদের যে কোন ছোট ছেলের মত, সেক্‌স্‌পীয়ার তাঁর বাল্যকাল কাটিয়েছিলেন গ্রামের গ্রামার-ইস্কুলে পড়াশোনা ও অবসর সময়ে খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে। এই গ্রামার-ইস্কুলের যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি মাইনে পেতেন বছরে ২০ পাউণ্ড। (হেস না, কারণ এই সভ্যযুগেও আমাদের দেশের প্রাইমারী ইস্কুলের শিক্ষকেরা কত মাইনে পান জান কি? গড়পড়তা মাসিক ১০৲ – তাও ৬ মাস ৯ মাস অন্তর।) সেক্‌স্‌পীয়ারের স্মৃতি-জড়িত সেই পাঠশালা আজও বর্ত্তমান। তবে বাড়ীটার অদল-বদল হয়েছে।

সেক্‌স্‌পীয়ারকে ছেলেবেলায় উঠ্‌তে হ'ত খুব ভোরে, কারণ তাঁদের ক্লাস আরম্ভ হ'ত ভোর ছ'টায় (গ্রীষ্মকালে)। ভেবে দেখ, শীতের দেশে ভোর ছ'টায় ৭।৮ বছরের বালক সেক্‌স্‌পীয়ারকে যেতে হ'ত পাততাড়ি বগলে ক'রে! তবে তাঁকে বেশী দূর যেতে হ'ত না এই যা!

বালক সেক্‌স্‌পীয়ার খুব হাসিখুসি, আমুদে ধরণের ছেলে ছিলেন। তাঁর কপাল ছিল বেশ উঁচু আর চওড়া, মাথায় প্রচুর কাল চুল, আর দুষ্টুমিতে চঞ্চল ছিল তাঁর চোখ দুটী। কি রকম ধরণের ছাত্র ছিলেন তিনি? তাঁর শিক্ষকের গর্ব্বের জিনিষ অথবা তাঁর পক্ষে আপদস্বরূপ? সে বিষয়ে কিছু নির্দ্দিষ্ট ভাবে জানা যায় নি। তবে পরবর্ত্তী জীবনের লেখা থেকে মনে হয় তিনি বোধ হয় তাঁর শিক্ষকের প্রিয় পাত্রই ছিলেন।

সেক্‌স্‌পীয়ার কি পড়তেন? তাঁর সময়কার স্কুলে যে প্রাকৃতিক ইতিহাস পড়ান হ'ত তা শুনে তোমরা হেসে আর বাঁচবে না। উদাহরণ দিচ্ছি, শোন:

"হাতীর রক্ত পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ঠাণ্ডা রক্ত। আর প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যখন ড্রাগনরা তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তখন এই ঠাণ্ডা রক্তই তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে।"

পড়ে মনে হয় যেন তখনকার ও দেশের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা হাতী কখনও চোখেই দেখেন নি। এ রকম অসম্পূর্ণ বিবরণ সেক্‌স্‌পীয়ারের মত সজীব মনের তৃপ্তি আনতে পারত না। কাজেই তিনি একা একা বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন রহস্যময়ী প্রকৃতির মর্ম-উদ্‌ঘাটনে। একদিন তিনি বে-আইনী ভাবে একটা হরিণ মেরে বিপদেই পড়েছিলেন। বনরক্ষীরা তাঁকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে স্যর টমাস লুসির সামনে এনে উপস্থিত করেছিল। তিনি তাঁকে সকলের সামনে মনের সুখে মেরেছিলেন।

ইস্কুলে তিনি ছ' বছর পড়েছিলেন। এই ছ' বছরের শিক্ষাই তাঁকে পরবর্ত্তী জীবনে সুন্দর ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছিল।

তাঁর যৌবন সম্বন্ধেও আমরা অন্ধকারে। তাঁর যখন ১৪ বছর বয়স তখন তাঁর বাবার অবস্থা এত খারাপ হয়ে যায় যে তিনি বাধ্য হয়ে তাঁকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন ও কাজে লাগান। কি কাজ তিনি করেছিলেন তা আমরা ঠিক ভাবে জানি না। কেউ বলেন, তিনি কসাইয়ের সহকারী ছিলেন আবার কারও কারও মতে তিনি উকীলের মুহুরীগিরি করেছিলেন। যা-ই করে থাকুন না কেন, তিনি যে খুব বিবেচনাশীল যুবক ছিলেন না—এটা

কই। তা না হ'লে কি আর ১৯ বছর বয়সের সময় বিয়ে ক'রে বসেন য়্যানে হাথএওয়েকে, যিনি ছিলেন সেক্‌স্‌পীয়ারের চেয়ে ৮ বছরের বড়? অবশ্য এ নিয়ে পিতাপুত্রে মনান্তর হয়েছিল বলেই মনে হয়। কারণ সে সময়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা তাঁদের মোটেই ছিল না।

মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়ার

বিয়ের ৩।৪ বছর পর—যখন তাঁর তিনটী সন্তান হয়েছে—সেক্‌সপীয়ার চল্লেন লণ্ডনে, তাঁর ভাগ্যান্বেষণে। শোনা যায় যে তিনি থিয়েটার হলের সামনে "জেণ্টল্‌ম্যান"দের ঘোড়া ধরে রাখতেন, আর তাতে কিছু আয় হ'ত। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তখনকার একটা থিয়েটার কোম্পানীর সভ্য হ'লেন।

এইবারে তাঁর জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায় আরম্ভ হ'ল। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন। অথবা, লেখা সংশোধন আরম্ভ করলেন বললেই ঠিক বলা হয়। আর তার সাথে সাথে মঞ্চেও নামতে আরম্ভ করলেন। তবে তিনি একজন নামকরা অভিনেতা ছিলেন ব'লে মনে হয় না। এমন কি, যখন তাঁর নিজের লেখা বই অভিনীত হচ্ছে, তখনও তাতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ তিনি পান নি।

সৌভাগ্যক্রমে সেক্‌স্‌পীয়ার তাঁর সময়কার বিখ্যাত নটদের থেকে অনেক বেশী প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁর লেখা ট্র্যাজেডী ও কমেডিগুলো তখনকার লণ্ডনে লোকে আগ্রহে এবং সাদরে বরণ করে নিয়েছিল। তার ফলে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই গ্লোব থিয়েটারের আংশিক মালিক হ'ন এবং ১৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি নাকি "বড়লোক" হয়ে দাঁড়ান। তাঁর ক্ষমতার বলে তিনি "য়্যাকটীং" ম্যানেজার পর্য্যন্ত হন। সেক্‌স্‌পীয়ার হিসাবী লোক ছিলেন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে সবচেয়ে বড় বাড়ীখানা কিনে ফেলেন। ঐ বাড়ীটার নাম ছিল "নিউ প্লেস"। কিন্তু বাড়ী কিনেই তিনি সেখানে বাস করতে আরম্ভ করেন নি। বাড়ী কেনাটা শুধু বড় করবার জন্যই ছিল না—আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। তাঁর গ্রামের লোকেরা লেখাপড়ার বিশেষ ধার ধারত না কাজেই, সেক্‌স্‌পীয়ার একজন বড় কবি ও নাট্যকার হয়েছেন—এ খবর তাদের মনে বিশেষ রেখাপাত করত না। তাই বোধ হয় তিনি গ্রামের সবচেয়ে বড় বাড়ীখানা কিনলেন, যাতে লোকে বুঝতে পারে যে জন্ সেক্‌স্‌পীয়ার "হতভাগা বকাটে" ছেলেটা মানুষ হয়েছে। বলা বাহুল্য এতে গ্রামের সকলের চোখে রাতারাতি তিনি একজন মান্যগণ্য লোক হয়ে উঠলেন।

সেক্‌স্‌পীয়ার-এর সময়কার স্টেজ সম্বন্ধে তোমাদের কোন ধারণা আছে কি? আজকালকার চোখ-ঝল্‌সানো জৌলুষ সে স্টেজে ছিল না। এমন কি তোমাদের সামান্য যদি এলিজাবেথের যুগের স্টেজ একটা এনে উপস্থিত করা যায়, তা হ'লে তোমরা বুঝতেই পারবে না যে সেটা একটা স্টেজ। তখনকার বড়লোকদের দুর্গের মত ছুঁচোলো বাড়ীগুলোর মাথাটা যদি ছেঁটে ফেলা যেত তা হ'লে সে স্টেজের মত কতকটা হ'ত। স্টেজের দেওয়ালে ঘেঁষে পর পর তিনটে গ্যালারীতে বসবার আসন ছিল, এবং আর একদিকে ছিল স্টেজটা, হলের অর্দ্ধেক অংশ যুড়ে। কোন রকম সিন, সিনারী ব্যবহার করা হ'ত না, এবং দর্শকবৃন্দের কতক স্টেজের ওপরে ও পেছনে "বক্স"এ বসত, সময় সময় স্টেজের ভিতরেই বসত। তাঁর সময়ে মেয়ে অভিনেত্রী ছিল না। ছেলেরাই দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে মেয়েদের পোষাক পরে অভিনয় করত।

সেক্‌স্‌পীয়ার নাট্যকার হিসাবে এত কৃতিত্ব ও সাফল্য লাভ করেছিলেন যে তাঁর আয় বাৎসরিক প্রায় ৫০০০ পাউণ্ড হয়ে উঠ ল এবং তাই দিয়ে ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-এ তিনি নিজের সম্পত্তি বাড়িয়ে তুললেন। এবং শেষে সহরের কোলাহল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করবার জন্য ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-এ এক সম্ভ্রান্ত ও মান্যগণ্য ভদ্রলোক হিসেবে বাস করতে লাগলেন।

শেষ জীবন তাঁর শান্তিতেই কেটেছিল। তাঁর দুই মেয়ে ছিল;—তাদের তিনি আগেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র মাত্র বারো বৎসর বয়সেই মারা যায়। তিনি গ্রামের লোকেদের সাথে, তাদেরই একজনের মত হাস্যে, গল্পে ও কথাবার্ত্তায় দিন কাটিয়ে গিয়েছেন। তখনও হয়তো ইংল্যাণ্ডে এখনকার বুদ্ধিজীবী, শ্রেণীসচেতন "ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্‌"দের উদ্ভব হয় নি। কাজেই অত বড় একজন লোক হয়েও তাঁর কোন ভ্রান্ত মর্য্যাদা জ্ঞান ছিল না।

১৬১৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তাঁর বন্ধু মাইকেল ড্রেটন ও বেন্‌ জন্‌সন্‌ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ও তিন বন্ধুতে মিলে খুব আমোদ-আহ্লাদ হয়। তারই আতিশয্যের ফলে ২৩শে এপ্রিল, ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে, তাঁরই নিজের জন্মদিনের তারিখে, সেক্‌স্‌পীয়ার ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে তাঁর নিজের বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

বিচিত্র ধরণী

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্‌.এ

মরুভূমির প্রাণীদের জীবনসংগ্রাম অত্যন্ত কঠোর। শত্রুদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যই বোধ হয় এদের মধ্যে অধিকাংশেরই রং ঠিক বালির মত। এদের পা এমন ভাবে তৈরী যে অতি দ্রুতবেগে চললেও বালুতে বসে যায় না। সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজ থেকে বাঁচবার জন্য এদের মধ্যে অনেকেই মাঠের মধ্যে বাস করে। মরুভূমির সমস্ত প্রাণীই খুব অল্প জল খেয়ে প্রাণ ধারণ করে। কেউ কেউ বর্ষার দিনে শরীরে পানাহার সঞ্চয় করে গর্ত্তে ঢুকে পড়ে এবং ঘুমোয়। শীত ও গ্রীষ্মে আর বাইরে আসে না। আবার মরুভূমির হরিণের মত কোন কোন প্রাণী প্রায় জল খায়ই না; প্রাণ ধারণের জন্যে যেটুকু জলের আবশ্যক খাদ্যের থেকেই তারা সেটুকু আহরণ করে নেয়। কোন কোন প্রাণী নিজেদের শরীরের বিশিষ্ট স্থানে জল সংগ্রহ ক'রে রাখে এবং আবশ্যক মত তা গ্রহণ করে। অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে এ ধরণের বহু ভেক আছে। এদের শরীরে একটা বড় থলি থাকে শুধু জল সঞ্চয় ক'রে রাখবার জন্যে। এ দেশের আদিম অধিবাসীরা যখন জলের একান্ত অভাব বোধ করে তখন এই ভেককুল নিধন ক'রে পিপাসা নিবারণ করে।

একজন ইংরেজ লেখক ব'লে গেছেন 'উট হচ্ছে মরুভূমির অবর্ণপোত।' কথাটার মধ্যে অত্যুক্তি নেই। উট না থাকলে যুগ যুগ ধরে মানুষ কিছুতেই মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে অবাধে কাজ চালাতে পারত না। এদের পা এমন ভাবে তৈরী যে ঘোড়া অথবা মোটর-গাড়ি যেখানে অচল হ'য়ে ডুবে যায়, উটেরা অবলীলা-ক্রমে সেখান দিয়ে চলাফেরা করতে পারে। শুধু তাই নয়, এদের পাকস্থলীতে জল সঞ্চয় ক'রে রাখবার এমন ব্যবস্থা রয়েছে যে একবার পেট ভরে জল খেয়ে নিতে পারলে তিন চার দিন পুনরায় জল না পেলেও এরা যথা-রীতি কাজ ক'রে যেতে পারে। এস্কিমোরা যেমন জীবন ধারণের জন্যে সম্পূর্ণভাবে সীলের উপর নির্ভর করে, ল্যাপেরা যেমন বন্য হরিণের সাহায্য না পেলে মরে যেতো, আরব, সাহারা এবং মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীরা তেমনি উট ছাড়া এক পা নড়তে পারে না। উটই তাদের একমাত্র যানবাহন; উটের দুধ তাদের নিত্য ব্যবহার্য্য এবং উটের মাংস তাদের অতি উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু উটকেও তাদের খাবার যোগাতে হবে। মরুভূমির একস্থানে যথেষ্ট খাদ্য পাওয়া যায় না। সে জন্যে এই সব মরুভূমির বাসিন্দারা হ'চ্ছে যাযাবর। তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাদের বাহনের খাদ্য খুঁজে বেড়ায়।

মরুপ্রদেশ এবং উষ্ণ দেশের নিবিড় বনভূমির মধ্যে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক আবহাওয়ার এক বিরাট প্রান্তরভূমি রয়েছে। এ দেশটা অনেকটা বাগানের মত এবং ইতস্ততঃ বৃক্ষশোভিত। দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী জীব-জন্তুরও প্রকৃতি গড়ে উঠেছে। যে সব পশুর এখানে জন্মভূমি তারা তৃণভুক্ এবং অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন। তারা সাধারণতঃ দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। বিপদের সম্ভাবনা জানতে পারলেই দলের একজন অন্য সকলকে সাবধান ক'রে দেয়। এই প্রান্তরভূমির অধিকাংশই আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। সুতরাং এই পশুদের জন্মভূমিও আফ্রিকা। গায়ে ডোরা কাটা জেব্রার দল, বুনো মহিষের পাল, ভয়ঙ্কর গণ্ডার, শিংওয়ালা ন্যু, উটপাখী —এরা সবাই এ দেশের বাসিন্দা। জিরাফ হচ্ছে

দক্ষিণ আমেরিকার নিবিড় অরণ্যের একটি দৃশ্য

এ স্থানের আর একটি অদ্ভুত প্রাণী। গাছের আগার নরম পাতা এদের সব চেয়ে প্রিয় খাবার। শত শত বৎসর ধরে এই উপাদেয় আহারের চেষ্টা ক'রে, ক'রে কালক্রমে এদের গলা বিলক্ষণ লম্বা হ'য়ে গিয়েছে। এই সব শস্যভুক প্রাণীরা আবার হিংস্র জন্তুদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হ'য়ে আস্‌ছে। পশুরাজ সিংহ, চিতাবাঘ, হায়না এবং ততোধিক ভয়ানক বুনো কুকুরেরা সর্ব্বদাই নিরীহ শস্যভুক প্রাণীদের উপর তাদের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে উৎসুক।

আমাদের যাত্রাপথ প্রায় শেষ হয়ে এল। চেয়ে দেখ নীচে আর সেই বিস্তৃত মাঠ দেখা যাচ্ছে না। তার পরিবর্ত্তে যত দূর চক্ষু যায় দেখতে পাচ্ছি নিবিড় অরণ্যে ঢাকা এক বনভূমি! কাল্পনিক বিষুবরেখার আশে পাশে এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলময় প্রদেশ বর্ত্তমান। উষ্ণতা এবং অত্যধিক স্যাঁতস্যেতে আবহাওয়াই এর কারণ। মরু-ভূমির সঙ্গে এদের তুলনা করলে কতকগুলো বিপরীত সমস্যা আমাদের চোখে পড়বে। মরুদেশের বৃক্ষেরা চায় কি ক'রে শরীরে জল আট্‌কে রাখবে, এখানকার গাছপালা চায় কি ক'রে শরীর থেকে অনাবশ্যক জল বের ক'রে দেবে। এ জন্যে এদের পাতাগুলো চওড়া এবং শাখা প্রশাখা অনেক। এত ঝাঁকড়া যে নিম্নভূমিতে আলো প্রবেশ ক'রতে পায় না। সুতরাং এ দেশের বেশীর ভাগ স্থানই অন্ধকার এবং ভিজে। সত্যি কথা বলতে গেলে শীত এখানে আসেই না। গাছেরাও একই সময় তাদের সব পাতা ঝরায় না। এখানকার বনভূমি চিরশ্যামল। উদ্ভিদের জন্মের পক্ষে এ আবহাওয়া যত অনুকূল তেমন কোন আবহাওয়াই নয়। বস্তুতঃ এখানে বৃক্ষাবলীর এত প্রাচুর্য্য যে মানুষ চায় জঙ্গল কেটে মাটি পরিষ্কার রাখতে। শুধু গাছ নয়, এখানে গাছের উপরেও গাছ জন্মায়। এদের বলা হয় পরগাছা। নানা প্রকারের লতা বড় বড় গাছ বেয়ে ওঠে এবং এই সব গাছ থেকে রস টেনে নিয়েই বাঁচে। ফার্ণ, অর্কিড্‌ প্রভৃতিরাও এদের দলে ফেলা চলে। কোন কোন পরগাছার শিকড় ডালপালা বেয়ে শূন্যে এসে ঝুল্‌তে থাকে এবং এই ভাবে বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে।

এই রকম ভয়ঙ্কর জঙ্গলময় প্রদেশ দেখতে হ'লে প্রথমেই যেতে হয় দক্ষিণ আমেরিকা। এখানে আমরা অনেক জীবজন্তু দেখতে পাই যারা সারা জীবন গাছে গাছেই কাটিয়ে দেয়। লম্বা লেজওয়ালা এক রকম বানর এই বনভূমির প্রধান বাসিন্দা। লেজ দিয়ে এরা অনায়াসে ডালপালা আঁকড়ে বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে যাওয়া-আসা

করে। শ্লথ এ দেশের আর এক আজব জীব। লেজ দিয়ে গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে ঝুলতে ঝুলতে এরা উপর দিকে পা এবং নীচের দিকে মাথা রেখে চলাফেরা করে। বৃক্ষজীবনে এরা এত অধিক অভ্যস্ত যে বৃক্ষহীন স্থানে বাঁচতে পারে না। মাটিতে সোজা হ'য়ে দাঁড়ান পর্য্যন্ত এদের পক্ষে অসম্ভব। এ ছাড়া এ দেশে প্রচুর পিপীলিকাভুক দেখতে পাওয়া যায়। লম্বা লেজের সাহায্যে গাছে উঠতে এরা খুব পটু। গেছো ব্যাং, গেছো সাপ, গেছো বাদুড়, জাগুয়ার প্রভৃতি যে সকল প্রাণী গাছকে অবলম্বন করেই বাঁচে তাদের বংশধরেরা এ দেশে সগৌরবে রাজত্ব করছে।

টারমাইট নামক পোকার এ দেশে বাস। তারা কাঠ খেয়েই বাঁচে। গাছের ডালে ডালে বিরাট মাকড়সার বাসা; জালের সাহায্যে তারা ছোটখাট পাখী পর্য্যন্ত ধরে থাকে। উড়ন্ত কাঠবিড়ালী, উড়ন্ত লেমুর এবং ফ্যালেঞ্জার, ডানাওয়ালা গিরগিটি, উড়ন্ত সাপ এবং ব্যাঙ—রূপকথার প্রাণী নয়। তোমার আমার মত এদের অস্তিত্বও পৃথিবীতে সত্য।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

৯

জীবন-পথের যে পথিকটির গল্প বলছি, তার জীবনে মৃত্যুর সঙ্গে এ রকমের লড়াই সে পর্য্যন্ত আর কখন হয় নি। সৌভাগ্য যে সে তাতে জয়ী হল। আর এই জয়ে সে লাভ করলো অভিজ্ঞতা কতকগুলি লোকের কাছ থেকে সম্মান ও শ্রদ্ধা। তার নিজের শক্তির ওপরেও বিশ্বাস গেল বেড়ে।

জীবনের পথে চলতে চলতে মানুষ অহরহ যুদ্ধ করছে। তবে সকল যুদ্ধের বিষয়ে সে সচেতন থাকে না। সে নিজের অজানিতে বহু যুদ্ধে জয়ী হয়ে এগিয়ে চলে। সে এগিয়ে চলে একটি লক্ষ্যে। কিন্তু এই লক্ষ্যটি কি? জীবনের গোড়ায় কারো লক্ষ্য থাকে বড় চাকরি, কারো লক্ষ্য ধনী হওয়া, কারো লক্ষ্য প্রচুর বিদ্যার্জ্জন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ লক্ষ্যে সকলেই পৌঁছতে পারে না। কেন এমন হয়? অবস্থার সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম ও তাতে পরাজয়। তাতে যে জয়ী হয় সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। কিন্তু তুমি বিদ্বান্ বা ধনী হলেও অথবা বড় চাকরি করলেই কি তোমার জীবন সফল হল? না। যে মানুষ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সে মানুষের স্থান, এক সময়ে মানুষের সমাজে বিশেষ ভাবে থাকলেও, এখন আর থাকতে পারে না। কেবল নিজেকে বাঁচালেই চলবে না, নিজের সুখ আনন্দের ব্যবস্থা করলেই চলবে না। এখন নিজেকে দেখতে হবে সকলের একজন করে। আর, সকলকে দেখতে হবে নিজের মতো করে। এখনও যারা নিজকে নিয়েই, কেবল নিজের সুখের দিকে রেখে, সচেতন হয়ে, লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে আমি বলছি তাদের কথাই। অবশ্য জীবনের গোড়ায় কারোই লেখা-পড়া শেখা ছাড়া আর কোন লক্ষ্যই থাকে না। কিছু পরে তাদের জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে দেন অভিভাবকেরা। যারা নোঙর-ছেঁড়া

ীকোর মতো ভেসে বেড়ায় এমন লোকও আছে লক্ষ ক। তাদের শক্তি আছে অথচ সে শক্তি নষ্ট হয়ে য়। অমাদের দেশের এমনই অবস্থা যে আমরা তা নষ্ট তে দিই।

বাসবের দুর্ভাগ্যই হোক আর সৌভাগ্যই হোক তখন ার জীবনের একটি লক্ষ্য স্থির করে দেবার আর কেউ ল না। তবে দোষ-ত্রুটির সমালোচনার, গুণের প্রশংসার ল অনেক। মা ছিলেন; দিদি ছিলেন, তাঁরা আশা করে সেছিলেন, সে ধনী হবে। অনেক টাকা রোজগার রে ঘরে আনবে। তাহলে আর দুঃখ থাকবে না। নিকদা ছিলেন কিন্তু তিনি পর। তিনি পরামর্শ দিতেন, ৎসাহ দিতেন, উদাহরণ দেখাতেন, শিক্ষার, পথে এগিয়ে তেন আর সামনে ধরতেন একটা বড় আদর্শ। সে াদর্শে পৌঁছতে গেলে চাই ত্যাগ। তাতে ধনী হওয়া য় না বরং ভাগ্যে জোটে নির্য্যাতন—যেমন হয়েছিল ার নিজের। তাই বাসবের জীবনের কোন নির্দ্দিষ্ট ক্ষ্য ছিল না। সে এগিয়ে চলেছিল এইমাত্র। কন্তু সেদিনকার ঘটনাটা তার মনে একটা বেশ স্পষ্ট ধারণা ই করে দিল যে তার মা, বোন ও ভাই দুটি তারই ওপর র্ভর করে আছে। তাকে টাকা রোজগার করতে হবে। বং জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই দিকেই।

প্রায় তখন থেকেই তার মধ্যে কেমন একটা পরিবর্ত্তন রু হল। মুখ, চোখ ও চলা-ফেরায় মনের ছায়া পড়ে। গুলো যেন দর্পণ। তবে সে ছায়া বাইরের কেউ দেখে, কেউ দেখে না। আর যার মনের ছায়া পড়ে সেও যে সে মুহূর্ত্তে হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে তাও নয়। তবুও তার পরিবর্ত্তন বাসবের বন্ধুবান্ধবদের কারো কারো দৃষ্টি এড়ালো না। কিন্তু তারা স্পষ্ট করে ব্যাপারটা ধরতে পারলে না বং তাকে ভুল বুঝে মনে করলে, বাসবের অহঙ্কার য়েছে। ও নিজেকে ভাবছে বীর।

যারা তখনকার ঘটনাটা দেখে নি, সন্ধ্যায় বারোয়ারি-লায় যখন সকলে ঠাকুর দেখে এক জায়গায় বসে গল্প রছিল তাদের মধ্যে তারাও ছিল। তখন সুরেশ বল্লে, বাসবের কি সাহস!"

বাসব চুপ করে রইলো। তার মুখে যে আনন্দের াপ পড়লো না তা নয়। তার ওপর আবার শারদীয়া সপ্তমীর চাঁদের রূপালি আলো পড়ে তার সদাস্নিগ্ধ মুখ-খানিকে স্নিগ্ধতর ও শান্ততর করে তুলেছে।

কথাটা ওপাড়ার হরিপদ ও মহেশের ভাল লাগলো না। হরিপদ বাসবের মুখের দিকে তাকিয়ে আরও জ্বলে উঠলো। মনে করলে সে "চাল দেখাচ্ছে"। বললে, "ও রকম সাহস সকলেই দেখাতে পারে। বাঘে তাড়া করলে মানুষ পালায় না? পালিয়ে বাঁচলেই বীরত্ব হল?"

অজিত বললে, "আর বোকার মতো লড়াই করে মরলেই বীর হল? ওর হাতে কোন অস্ত্র ছিল?"

মোহিনী বললে, "তুই একবার যা না দেখি। ও রকম হলে তুই 'মা—আ—' বলেই অজ্ঞান হয়ে বালির বস্তার মতো তলিয়ে যেতিস্।"

হরিপদ বললে, "আমাদের গ্রামের নিচ দিয়েও এই নদী গেছে। সেবার একটা চাষার ছেলে কুমীরের মুখ থেকে বেঁচেছিল। তাহলে বল সেও সাহসী?"

—"নিশ্চয়।"

সুরেশ বললে, "এই রকম করে সাঁতরে?"

—"না। কুমীর তার পা কামড়ে ধরেছিল।"

—"তারপর?"

—"দুটোতে টানাটানি। শেষে চাষারা এসে ঠেঙিয়ে কুমীরটাকে সাবাড় করে দেয়।"

মোহিনী বললে, "তাহলে চাষারাই সাহসী, ছেলেটা নয়। আচ্ছা, দেখা যাবে বাচ খেলার দিন। তোকে জলে ফেলে দেব—"

বাসব হাসতে হাসতে বলে উঠলো, "ও যাবেই না আমাদের সঙ্গে।"

হরিপদ আর সেখানে বসলো না, উঠে গেল। মহেশও একটু পরে "আসছি" বলে সরে পড়লো।

তারাও ক'জনে একটু পরে উঠে দল বেঁধে চললো বাড়ি। পশ্চিমে বাঁশঝাড়ের মাথায় তখন চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। পথে ছায়ামাখা জ্যোৎস্না লেগে আছে। বারোয়ারিতলার ঢাকের আওয়াজ আসছে ভেসে। স্ত্রী-লোকেরা চলছে বারোয়ারিতলার দিকে দল বেঁধে ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম্ম চুকিয়ে। শিশুরা করছে কলরব।

চলতে চলতে এদিক্ ওদিক্ ছুটে যাচ্ছে। তখন ধমক খাচ্ছে।

বাসবরা চললো নদীর ধারে। বাচের নৌকো সেদিনই বিকেলে ঠিক হয়ে গেছে। একসঙ্গে দশ-বারোজন উঠবে। তাই পানসি ভাড়া করেছে। পানসি আর কি বাচ খেলবে? কেবল ঘাটে ঘাটে ভেসেই বেড়াবে। বাসব মনে মনে ঠিক করেছে, সেদিন যে খানকয়েক ছিপ বাচ খেলবে সে তার একখানিতে উঠবে। ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগের কথা বলছি। তখনও মুসলমানরা হিন্দুর পর্ব্বে যোগ দিত। ভাসানের দিন আনন্দ করে বাচ খেলতো। পূজোয় ছেলে-মেয়েদের নূতন কাপড়-জামা কিনে দিয়ে তাদের হাসিমুখ দেখতো।

বাসব মতলব করেছিল, তার সহপাঠী ইয়াকুবের বাড়ি গিয়ে তাকে ধরে তার বাবার যে ছিপখানা বাচ খেলবে তাতে সেদিন উঠবে আর ছোট ভাইগুটিকে তার জায়গায় দেবে পানসিতে। পানসিখানা সকলে চাঁদা করে ভাড়া করেছে। প্রত্যেকের ভাগে পড়বে চার আনা করে। ইয়াকুবরা নিকারী। মুসলমান জেলে। তাদের বাড়ি শহর থেকে এক মাইল ভাটিতে। বাসব সেখানে বছরে অন্ততঃ দুবার গেছে। সে ভোরে উঠেই বেড়িয়ে পড়বে।

সকলে নদীর ধারে গিয়ে বসলো। 'সব নিঝুম, নিথর। গাছ-পালা ঘুমোচ্ছে, নীড়ে ঘুমোয় পাখি। ওপারে চরভরা ঘুম, এপারে তটের চোখে ঘুম আসে আসে। আর নদী যেন এ দুইয়ের মাঝে দেহ এলিয়ে দিয়েছেন মা। মা যেমন সারাদিনের ক্লান্তির পর দুটি শিশুকে দুপাশে নিয়ে শুয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে গাইতে আধঘুমে তাঁর নিজেরও চোখ দুটি জড়িয়ে আসে, তাঁর কণ্ঠের ঘুমপাড়ানি গানের মিঠে সুরে যেমন আরও মধু জড়িয়ে যায়, তাই শুনে ও তাঁর ঘুমের ছোঁয়া লেগে শিশুদের চোখে যেমন তাড়াতাড়ি ঘুম নেমে আসে, নদীটিও যেন তেমনি করে এ দুটিকে ঘুম-পাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে নিজেও আধ-ঘুমে জড়িয়ে গেছে। তাই তার মর্ম্মরতা কানে লাগছে আরও মধুর।

তাদের মধ্যে মোহিনীর গানের গলা ছিল। সে একটা গান ধরলে। পুরোনো পচা গান। লক্ষ লোকে গায়। কণ্ঠে তার আসল সুর কবে উড়ে গেছে। তবুও গাইতে লাগলো। আর সকলে তার সঙ্গে সুর ধরলে কেবল বাসব চুপ করে ভাবতে লাগলো ভাসানের দিনে বাচ খেলার কথা।

তার মনে হল, সে যেন হয়েছে এক বিখ্যাত নৌ সেনাপতি। তার অধীনে আছে বিরাট নৌবহর। সে নৌবহর চলেছে সাগরে সাগরে, দেশ-দেশান্তরে। তা মাস্তুলে উড়ছে তাদের জাতীয় পতাকা। পৃথিবীতে হয়েছে সকলের সমান অধিকার। যে তাতে বাধা দিতে সে চলেছে যেন তারই বিরুদ্ধে। তারা কাউকেই পরাধী রাখবে না। এই পৃথিবীতে কেউ কারো অধীন নয়।

হঠাৎ বিজয় বলে উঠলো, "আরে সাপ—সাপ!"

সকলে লাফিয়ে উঠলো। চরে তখনও জ্যোৎস্না লেগে ছিল। সেই আলোয় তারা দেখলে, সত্যিই একটা সাপ বালির ওপর দিয়ে চলেছে। তার কালো গা চিক চিক করছে। সাপটা পাড়ের ছায়ায় সরে গেল।

তারাও তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চললো বাড়ির দিকে।

রাত তখন বোধ হয় বারোটা হবে। হঠাৎ গোলমালে বাসবের ঘুম ভেঙে গেল।

কে যেন বললে, "আগুন! আগুন!"

বাসব এক লাফে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখে, বাজারের দিক্কার আকাশ লালে লাল হ'য়ে গেছে।

কে যেন শিষ দিলে। বাসব কোমর বেঁধে চললো তাদের সেবা-কেন্দ্রে। এ শিষ তাদেরই প্রত্যেককে ডাকবার সঙ্কেত। আগুনটা লেগেছিল কিছুক্ষণ আগে কিন্তু কোথায় লেগেছে কেউ ঠিক করতে পারে নি।

তারা যখন সেবা-কেন্দ্রে গিয়ে পৌছলো তখন খবর গেল শহরের বাইরে পাটের গোদাম জ্বলছে। জায়গাটা তাদের এলাকার বাইরে। তাদের ক্যাপটেন বললে, "আমাদের কিছু করবার নেই। তবে সতর্ক থাক। আগুনটা শহরে এগিয়ে এসে আর কোথাও না লাগে। তখন যেতে হবে।"

সকলে সেখানে বসে রইলো। বাসব উঠলো গাছে সে সেখান থেকে আগুনের জায়গাটা কতকটা দেখা

পেল। বললে ও-ই দিকে—শহরের বাইরে। উঃ, কি লকি উড়ছে!"

শরৎকাল, তাই বাতাস ছিল না। কিন্তু আগুন লাগলে সেখানে বাতাসের আলোড়ন হয়ই। তবে সে বাতাস লকিকে বেশি দূর উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তবুও সকলে সেখানে প্রতীক্ষায় রইলো। ভোরের আগে আগুন নিভলো না। যখন নিভলো তখন ইয়াকুবদের বাড়ি বাসবের যাবার আগ্রহ থাকল না। বাড়ি গিয়ে শুয়ে গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

(ক্রমশঃ)

আলুমিনিয়ামের গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যখন আলুমিনিয়াম্ প্রথম বাজারে বাহির হয় তখন উহার মূল্য পাউণ্ড প্রতি ২০ শিলিং ছিল। ১৮৯৫ সনে উহার দাম কমিয়া পাউণ্ড প্রতি তের শিলিংএ দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে প্রতি বছর তিন লক্ষ টনের উপর ঐ ধাতু বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে যে জিনিষের লোকে অস্তিত্বই জানিত না এখন তাহা গৃহস্থের নিত্য ব্যবহারে আসিতেছে।

আলুমিনিয়াম্ কারখানার একটি দৃশ্য: লম্বা লম্বা নল তৈরী হইতেছে।

রান্নার কাজে আলুমিনিয়াম্ পিতল ও তামার পাত্র বা মাটির হাঁড়ির স্থান দ্রুত গ্রহণ করিতেছে। পিতল ও তামার কলঙ্ক উঠিয়া খাদ্য অনেক সময় বিষাক্ত হইয়া পড়ে। মাটির হাঁড়ি এ বিষয়ে নির্দ্দোষ। আলুমিনিয়াম্ অত নির্দ্দোষ না হইলেও পিতল ও তামার বাসন অপেক্ষা ভাল। আজকালকার দিনে কাঠ ও কয়লার দা অতিরিক্ত হওয়ার জন্য মাটির হাঁড়িতে অত্যন্ত খরচ পড়ে এজন্য গরীবরাও মাটি ছাড়িয়া আলুমিনিয়াম্ ব্যবহা করিতেছে। ইহার আর একটা সুবিধা, পাত্রগুলি খু পাতলা বলিয়া সহজেই গরম হয়। রান্না শীঘ্র হয়, কয়ল বা কাঠ খরচ কম হয়। ইহাও একটা কম সুবিধার ক নয়।

আলুমিনিয়ামের অন্য ব্যবহারও আছে। মোটরকা ও এরোপ্লেন নির্ম্মাণে এবং ইলেকট্রিক তার প্রস্তু ব্যাপারে।

অনেক ছেলে যারা নিজেরা ঘরে আতস বাজী তৈ করে তারা আলুমিনিয়ামের গুঁড়ার ব্যবহার জানে তুবড়ীতে বারুদের সঙ্গে ঐ গুঁড়া মিশাইলে খুব উজ্জ্ব তারকার মত ফুল বাহির হইতে থাকে। লোহার গুঁড়া ফুল হলদে আভাময় হয়। পরিত্যক্ত ভাঙ্গা আলুমিনিয়াম বাসনের গুঁড়া লইয়া এই ভাবে তুবড়ীতে ব্যবহার ক যাইতে পারে।

আলুমিনিয়াম্ চূর্ণ এবং ফেরিক্ অক্সাইড চূর্ণ (লোহ মরিচা) মিশাইয়া থার্মিট নামক এক দাহ্য পদার্থ প্রস্ত হয়। এই পদার্থের দহন আরম্ভ হইলে উহাতে এ উগ্র তাপ হয় যে উহার প্রভাবে লোহা প্রভৃতি ধাতু গলাইয়া দেওয়া যায়। যুদ্ধের সময় আগুনে বে (ইন্‌সেন্‌ডিয়ারী বম্) ঐ থার্মিটের দ্বারা প্রস্তুত হইত সাধারণ আগুনকে জল, বালি বা কার্ব্বন ডাইঅক্সাই গ্যাস দ্বারা নিভান যায়; সাধারণ আগুন বাতাসে অক্সিজেনের সাহায্যে জ্বলে, অক্সিজেন্ না পাইলে

TIGHT BINDING

তাহা নিভিয়া যায়। থার্মিট জ্বলিবার জন্য অক্সিজেন্ প্রয়োজন হয় না। ঐ বোমা একবার জ্বলিতে আরম্ভ করিলে উহা নিভিয়া যায় না। আর উহার উগ্র তাপে বাড়ীর ছাদ ও লোহা প্রভৃতি গলিয়া যায়। বোমা উহাদের ভেদ করিয়া নীচের তলায় গিয়া হাজির হয়।

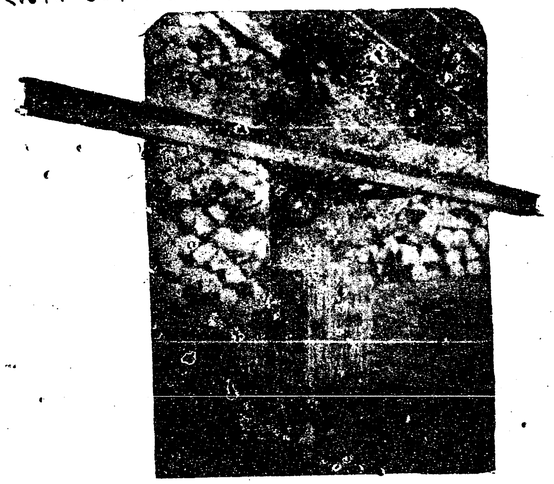

আলুমিনিয়ামের তৈরী 'বীম্' বা ঘরের কড়ি। কী অসম্ভব হাল্কা!

য়্যামোন্যাল নামক এক প্রকার বিস্ফোরক আলুমিনিয়াম্ চূর্ণ ও আলুমিনিয়াম্ নাইট্রেট নামক পদার্থের সহযোগে প্রস্তুত হয়। সূক্ষ্ম আলুমিনিয়াম্ চূর্ণ তিসির তেলের সহিত মিশাইয়া এক প্রকার রং প্রস্তুত হয়। অনেক ধাতুদ্রব্যের উপর এই রং ব্যবহৃত হয়।

বক্সাইট্ নামক খনিজ হইতে আলুমিনিয়াম্ ধা প্রস্তুত হয়। প্রস্তুত করিবার জন্য প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োজন। বিদ্যুৎ প্রবাহ বক্সাইট্‌কে বিশ্লিষ্ট করি উহার মধ্যস্থ আলুমিনিয়াম্‌কে পৃথক্ করে। যে সব স্থা পাহাড় হইতে নদী বাহির হয় সেই সকল স্থা খুব শক্ত, প্রকাণ্ড ও উচ্চ সিমেণ্ট সহযোগে প্রস্তুত বা প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া নদীর জল রোধ করা হ রুদ্ধ নদীর জল অনেক উচ্চে উঠে, তখন সেই জল নিম্নে পড়িতে দেওয়া হয়। উহাতে অনেকটা কৃত্রি জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। ঐ জল তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রে ডানার উপর পড়িয়া উহাকে ঘুরাইয়া বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে। দক্ষিণ ভারতে টাটা কোম্পানী ঐরূপ তড়িৎ উৎপন্ন করিয়া বোম্বাই সহরকে খুব কম খরচা তড়িৎ সরবরাহ করে। জলপ্রপাত হইতে তড়িৎ খু কম খরচে হয়। আলুমিনিয়াম্ প্রস্তুতের কারখানায় ঐরূপ তড়িতের প্রয়োজন হয়।

তোমরা সকলেই ফটকিরি দেখিয়াছ, এবং তোমাদে বাড়ীতে নানা সময় উহা নিশ্চয়ই ব্যবহার করা হয় এই ফটকিরি কিন্তু আর কিছুই নয়—আলুমিনিয়াম্ ঘটি এক প্রকার লবণ পদার্থ। ফটকিরি অতি প্রাচীন কা হইতে বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

নতুন বই

এই দেশেরই মেয়ে—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। এম্. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৸৹

বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে পৌরাণিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত যে সব মহীয়সী নারী আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন তাঁদেরই জীবনের ছোট ছোট গল্প। মন-গড়া কাহিনীর বদলে এই ধরণের সত্য কাহিনী ছোটদের শোনাবার সময় এসেছে, এবং এদিক্ দিয়ে লেখক যথেষ্ট কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কলমের আঁচড়ে সত্য কাহিনীও গল্পে মত লোভনীয় হয়ে উঠেছে।

স্বর্ণ নদী—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। সর সাহিত্য ভবন, ২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা দাম ১৲

রাস্‌কিনের লেখা "দি কিং অব্ দি গোল্ডেন রিভার এবং হথর্ণের লেখা "দি গোল্ডেন ফ্লীস্" বিশ্বসাহিত্যে দু'টি সম্পদ্। খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহ বাংলায় তার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ক'রে ছোটদের উপহা

দিয়েছেন। ছোটদের কাছে এ বইএর খুবই সমাদর হবে। বইটির মলাট, ছবি, ছাপা প্রভৃতি খুবই সুন্দর।

মোহন সিংয়ের ফাঁসি—শ্রীসুমথনাথ ঘোষ। শরৎ-সাহিত্য ভবন, ২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা। দাম ১৲

এটি অলকনন্দা সিরিজের ৫ম গ্রন্থ। এই গ্রন্থমালার অন্য বইগুলির মত এটিও ছোটদের কাছে পরম লোভনীয় মনে হবে—বিশেষ ক'রে যারা রহস্যপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর বই পড়তে ভালবাসে তাদের কাছে। বইখানির ঝকমকে মলাট, সুদৃশ্য ছবি, দু'রঙা ছাপা ও মোহন বাঁধাই ইত্যাদিতেও অলকনন্দা সিরিজের বৈশিষ্ট্য অব্যাহত আছে।

আজো ওঠে চাঁদ—অজয় ভট্টাচার্য্য। সা সাহিত্য সংসদ, ৪১ডি, একডালিয়া রোড, কলিকা দাম ১৷৹

এটি বিখ্যাত গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য্যের র কতকগুলি গানের সংকলন। এর কোন কে ইতিপূর্ব্বেই ছায়াচিত্রে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। গুলিও সঙ্গীতরসিকদের প্রচুর আনন্দ দেবে সন্দেহ গানগুলি অবশ্য ছোটদের জন্য রচিত নয়।

বইখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি মনো যাঁরা উপহারের জন্য ভাল বই খুঁজে বেড়ান এটি সহ তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
শেখরেশ্বরের শিষ্য লাভ

বারদীঘির জমিদার-বাড়ী হইতে কিছু দক্ষিণে জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটা সরু পায়ে-চলা পথ। দু'ধারে উঁচু বনতুলসীর ঝোপ, এধারে ওধারে দু'চারিটা কাঁটা গাছ, মনসা গাছ, নয়তো বাবলার ঝাঁক। মাঝে মাঝে পত্র-বহুল বট-পাকুড়ও আছে। পথটি বড় নিরিবিলি। পথের ধূলা ভেদ করিয়া এখানে ওখানে দূর্ব্বা ঘাস গজাইয়া জানাইয়া দিতেছে এ পথে লোক চলাচল বেশী হয় না।

বেলা তখন দুপুর গড়াইয়া আসিয়াছে। এই জনবিরল পথ দিয়া একজন স্থূলকায় ব্রাহ্মণ হন্ হন্ হাঁটিয়া আসিতেছিলেন;—অবশ্য মেদবহুল দেহ যতটা তাড়াতাড়ি হাঁটা যায়। ব্রাহ্মণের পরনে পট্টবস্ত্র, হাতে নামাবলী দিয়া জড়ান একটি পু কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ব্রাহ্মণটিকে আমরা একবার দেখিয়াছি, ইনি আর কেহ ন'ন,—শেখ গোস্বামী—রাধামাধব-মন্দিরের পূজারী। পূজা বাড়ী ফিরিতেছেন।

শেখর ঠাকুরের বাড়ী মন্দির হইতে সোজা

দিয়া গেলে বেশী পথ নহে, কিন্তু মন্দ কপাল বশতঃ প্রায়ই তাঁকে সোজা রাস্তা ছাড়িয়া, ঝোপ জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, অনেক ঘোরা পথে বাড়ী ফিরিতে হয়। শেখর ঠাকুরের বিবাহ-বাতিকের কথা সকলেই জানে এবং তাঁর বর্ত্তমান ব্রাহ্মণীরা সে সাধে বাদ সাধিবার জন্য কেমন করিয়া গ্রামের দুষ্ট ছেলেদের হাত করিয়াছেন সে কথাও ইতিপূর্ব্বে তোমাদের বলিয়াছি। এই বালক-শত্রুদের এড়াইবার জন্যই শেখর ঠাকুরকে মাঝে মাঝে সদর রাস্তা ছাড়িয়া ঝোপ জঙ্গল ভাঙ্গিয়া বাড়ী ফিরিতে হয়। আজও তিনি তাই করিতেছিলেন।

পথ জনশূন্য। এধারে ওধারে এক-একটা ফড়িং কম্পমান পাখা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দূরে একটা ঘুঘু অবিশ্রাম ডাকিয়া চলিয়াছে, আর কোথাও কোন জীবন্ত প্রাণীর ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। শেখর ঠাকুর হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছেন।

হঠাৎ মনে হইল, দূরে গাছের আড়ালে আড়ালে কে একজন তাঁহারই দিকে আসিতেছে। নাঃ, ছোঁড়া-গুলির জ্বালায় আর পারা গেল না! কাল হইতে আরও ঘুরিয়া গণেশ দীঘির ধার দিয়া ফিরিতে হইবে। একটু দেরী হইবে, তা ছাড়াও পথে সাপখোপেরও একটু উৎপাত আছে, কিন্তু এর চেয়ে তাও ভাল। যাই হোক, আপাততঃ একটু গা ঢাকা দেওয়াই শ্রেয়ঃ। শেখর ঠাকুর রাস্তা ছাড়িয়া জঙ্গলে ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন।

লোকটি আরও কাছে আসিল। একেবারে ছেলে ছোকরা নয়, বয়স দুইএর কোঠায় হইবে। পিঠে একটা বড় পুঁটুলি; গায়ে চাদর জড়ান। শেখর ঠাকুর দূর হইতে তাকে চিনিতে পারিলেন না, সম্ভবতঃ এ গাঁয়ের কেহ নয়। তবে এ পথে কেন?

লোকটি চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। বোধ হয় সে শেখর ঠাকুরের খোঁজেই আসিতেছিল। হঠাৎ পথের মধ্যে তাঁকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছে।

শেখর ঠাকুর দর্শন দিবেন কিনা ভাবিতে লাগিলেন। লোকটির কি মতলব জানা নাই। তবে গাঁয়ের অকাল-পক্ক ছোঁড়াদের সহকর্ম্মী বলিয়া তাকে মনে হইল না। পথ হারাইয়া এ দিকে আসিয়াছে কি? কিন্তু বেশী ভাবিবার অবসর তাঁর হইল না; মশার মত এক র[illegible] উড়ন্ত পোকা তাঁহাকে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। এই বনতুলসী ঝোপ তাদেরই রাজত্ব, রবাহূত আগন্তুককে তারা চা[illegible] না—তা তিনি যত বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই হউন না কেন। শেষে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঃ আঃ করিতে করিতে তি[illegible] ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন—একেবারে আগন্তুকের মুখামুখি।

লোকটি কিন্তু বেশ হাসিখুসি। পথশ্রমে ক্লান্ত, তা[illegible] উপর পিঠের বোঝাটিও বেশ ভারী, কিন্তু সেদিকে তা[illegible] ভ্রূক্ষেপ নাই। নমস্কার করিয়া কহিল, "ঠাকুর মশা[illegible] আমি অনেক দূর থেকে আসছি। এখানে এসে রা[illegible] গোলমাল ক'রে ফেলেছি। আপনি বলতে পারে[illegible] এখানে শেখর ঠাকুরের বাড়ী কোন্ দিকে?"

"কার?—কার বাড়ী?"

"শেখর ঠাকুর। পণ্ডিত শেখরেশ্বর গোস্বামী। রাধা-মাধব-মন্দিরের পুরোহিত।"

শেখর ঠাকুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আগন্তুকের মুখে[illegible] দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। তার পর এক[illegible] থামিয়া, ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমারই না[illegible] শেখরেশ্বর গোস্বামী।"

লোকটির মুখে এবার তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল। পুঁটলিটি নামাইয়া পথের উপরেই সে সাড়ম্বরে শেখ[illegible] ঠাকুরের পায়ের ধূলা লইল। কহিল, "অনেক দূর থেকে আসছি আপনার কাছে। আমাদের বাড়ী হুগলী জেলায়। কাঁঠালপাড়ার নাম শুনেছেন বোধ হয়। তারই কাছে সিমলাই গাঁয়ে। আমরাও ব্রাহ্মণ।"

শেখরেশ্বর একটু বিব্রত কণ্ঠে কহিলেন, "ও!"

আগন্তুক বুঝিল ঠাকুর ক্লান্ত। কহিল, "চলুন, হাঁটতে হাঁটতে কথা হবে। আপনার বোধ হয় দেরী হয় গেছে। এ পথে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি বাড়ী যাওয়া যাবে? আমি আবার এদিক্কার কিচ্ছু চিনি না।"

শেখর ঠাকুর বুঝিলেন, এবারে কিছু একটা ব[illegible] দরকার। কহিলেন, "হ্যাঁ, ঐ ঝোপের ভিতর দিয়ে গেলে আরও তাড়াতাড়ি যাওয়া যেত—কিন্তু ওদিক্টায় বড্ড—[illegible] হে।"

চলিতে চলিতে ব্রাহ্মণ যুবক আত্মপরিচয় দিল। তার নাম শশীকান্ত। দেশে অল্পস্বল্প ভূ-সম্পত্তি আছে, কিছু যজমানও আছে। কিন্তু অল্প বয়সেই সে পিতৃহীন হইয়া পড়ায় সব দিক্ গুছাইয়া লইতে পারে নাই। তা ছাড়া বাপের একমাত্র পুত্র হওয়ায় ছেলেবেলা হইতে অত্যধিক আদর পাইয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তিমূলক কাজকর্ম্মও তেমন করিয়া শেখে নাই। তা যাক, যে জন্য সে এত দূর আসিয়াছে তাহাই বলিতেছে। সম্প্রতি সে মুশকিলে পড়িয়াছে একটি বিবাহযোগ্যা ভগিনী লইয়া। তার বাপ একটু উদার মতাবলম্বী লোক ছিলেন। মায়েরও মত সেই রূপ। মূর্খ কুলীনে কন্যা পাত্রস্থ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত ন'ন। তাঁর ইচ্ছা এমন একটি ব্রাহ্মণ-সন্তানকে জামাই করেন পণ্ডিত বলিয়া যার খ্যাতি আছে—দশ বিশটা গাঁয়ে নাম করিলে যাকে লোকে এক ডাকে চিনিতে পারে। তা বয়স একটু বেশী হইলেও তাঁদের কোন আপত্তি নাই। শেখরেশ্বর ঠাকুরের নাম তারা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছে। তাদের গ্রামের সকলেই প্রায় জানে। তা ছাড়া তাদের এক কুটুম্ব কাছাকাছিই কোন্ এক গ্রামে থাকেন, তিনিও শেখর ঠাকুরের কথা প্রায়ই বলেন। রূপে গুণে, বিদ্যায়, নিষ্ঠায় এবং আর্থিক সঙ্গতিতে এরূপ পাত্র মেলা ভার। কু-লোকে বয়সটা কিছু বাড়াইয়া বলে কিন্তু তাদের সেই কুটুম্বটি বলিয়াছেন, ঠাকুরের বয়স এমন কিছুই না। আজ সে স্বচক্ষেও তা দেখিতেছে। আর ষাটে কন্যাদান? শেখর ঠাকুরের তো মাত্র তিন সংসার, এর কম এরূপ পাত্রের পক্ষে আশা করাই তো অন্যায়। কুলীনে কন্যা দিতে হইলে তো কম করিয়া দশ-বিশটা সতীনের ঝুক্কি পোহাইতে হইত! আর তার ভগিনীর কথা? নিজের বোন সম্বন্ধে সত্য কথা বলিলেও হয়তো লোকে বিশ্বাস করিবে না। তার বোন নন্দরাণী সত্য সত্যই নন্দরাণী। রূপে, গুণে আর গৃহকর্ম্মে দশখানি গ্রামে তার জুড়ি মিলিবে না এ কথা শশীকান্ত পৈতা ছুঁইয়া বলিতে পারে। আর স্বভাবের তো কথাই নাই! শেখর ঠাকুরের আপত্তি না থাকিলে সে তাঁকে তাদের গাঁয়ে ধরিয়া লইয়া যাইবে। নিজের চোখে সমস্ত দেখিয়া পাত্রী পছন্দ হইলে তিনি সম্বন্ধ পাকা করিয়া আসিবেন, এবং তারপর যত শীঘ্র সম্ভব শুভদিন দেখিয়া সে শুভকর্ম্ম সারিয়া ফেলিবে। শেখর ঠাকুরের কোন ওজর আপত্তি সে শুনিবে না, তাঁকে তার সঙ্গে যাইতেই হইবে। পাত্রী দেখিলে তিনি কোন রকমেই আপত্তি করিতে পারিবেন না, শশীকান্ত এ কথা লিখিয়া দিতে পারে।

শেখরেশ্বরের মন ভিজিয়া উঠিল। বাস্তবিক, এ পোড়া গাঁয়েই শুধু কেহ তাঁহার কদর বুঝিল না, নহিলে কত দূর দূরান্তর হইতে লোকে তাঁর নাম শুনিয়া ছুটিয়া আসে! তা, এ ছোকরাটিকে ফিরাইয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না। ছোকরা বেশ চালাক চতুর, তা ছাড়া যখন ভগিনীর গুণপনা সম্বন্ধে একেবারে লিখিয়া দিতে পর্য্যন্ত রাজী হইতেছে তখন আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই—পাত্রীটি নিশ্চয়ই সৎপাত্রী। আর এ-ও যখন এত আগ্রহ দেখাইতেছে। কিন্তু—

এই "কিন্তু"টুকুই বড় ভয়ানক। এই 'কিন্তু'রা আর কেহ নয়, শেখর ঠাকুরের তিনটি ব্রাহ্মণী। তিন জনেই অল্পবিস্তর মুখরা। শেখর ঠাকুর যদি এখন হুট্ করিয়া এই আগন্তুককে লইয়া ঘরে গিয়া হাজির হন এবং আগন্তুকের আগমনের উদ্দেশ্য যদি ব্রাহ্মণীদের কানে যায় তবে এই ভর দুপুরবেলা তাঁর শান্তিময় বাড়ীতে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইবে। অথচ ইহাকে ব্যাপারটা ভাল করিয়া না বুঝাইয়া লইয়া যাওয়াই বা যায় কি করিয়া? অবশ্য এক কাজ করা যাইতে পারে, উহাকে আপাততঃ জমিদার-বাড়ীর অতিথিশালায় লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু বিদেশী লোক, ব্রাহ্মণ সন্তান, তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহারই কাছে আসিয়াছে—কুটুম্বিতার প্রস্তাব লইয়া। ইহাকে নিজের বাড়ী না লইয়া গিয়া জমিদারের অতিথিশালায় ঢুকাইয়া দেওয়াটাই বা কি রকম ভদ্রতা হইবে? হয়তো উহার ফলে লোকটি তাঁর প্রতি বিরক্ত হইয়া বিবাহের প্রস্তাবই ফিরাইয়া লইবে। শেখরেশ্বর মহা দ্বিধায় পড়িলেন।

কিন্তু শশীকান্ত লোকটি অদ্ভুত। শেখরেশ্বরের আমতা আমতা ভাব দেখিয়া সে যেন তাঁর মনের কথা টের পাইল, কহিল, "একটা কথা আমার একটু-আধটু কানে এসেছে। শুনেছি আপনার ব্রাহ্মণীরা কেউই আপনার পুনর্ব্বিবাহের পক্ষপাতী ন'ন। সুতরাং এ রকম একটা নতুন প্রস্তাব নিয়ে

আমি গেলে হয়তো তাঁরা খুসী হবেন না। তাই আপনার আপত্তি না থাকলে আর একটা প্রস্তাব করি।"

শেখরেশ্বর যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। আগ্রহের সঙ্গে বলিলেন, "হ্যা, তাঁরা কেমন যেন একটু ইয়ে—। তা কি প্রস্তাব?"

"ধরুন আমি যদি এই ব'লে পরিচয় দেই যে আমি আপনার শিষ্য হতে এসেছি। আপনার কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করব,—ব্রাহ্মণের যা কাজ। আপনি ছাত্র হিসাবে আপনার বাড়ীতে আমাকে স্থান দেবেন। কেমন? তাতে তো ঠাকরুণরা কোন সন্দেহ করবেন না নিশ্চয়ই? তা ছাড়া তাঁদেরকে খুসী রাখবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন।"

"চমৎকার!" ছোকরার অদ্ভুত বুদ্ধি। শেখরেশ্বর শশীকান্তের উপর ভীষণ খুসী হইয়া উঠিলেন,—"বেশ, বেশ, ভাল কথা। তা হলে আর কোন কথা উঠবে না। আসছে পূর্ণিমার দিন রাধামাধবের মন্দিরে, একটা মহোৎসব গোছের আছে, সেটা চুকে গেলেই রায় মশাইকে ব'লে আমি কয়েক দিনের ছুটী নিয়ে আপনার সঙ্গে আপনাদের —কি বলেন? সিমলাই!—হ্যাঁ, সিমলাই যেতে পারব। এ ক'টা দিন ঐ ব্যবস্থাই ভাল।"

"ভাল। কিন্তু আমাকে যেন আর 'আপনি' বলবেন না; 'আমি আপনার শিষ্য হতে এসেছি, 'তুমি' বলেই ডাকবেন।"

শেখরেশ্বর থতমত খাইয়া বোকাহাসি হাসিয়া বলিলেন—"হেঁ হেঁ, তা বটেই তো!"

বাড়ী ফিরিয়া শেখরেশ্বর শশীকান্তকে দাওয়ায় বসাইয়া অন্দরে ঢুকিয়া হাঁক দিলেন, "কোথায় গো, বড় বৌ কোথায় গেলে? মেজবৌ!"

উত্তর দিলেন ছোট বৌ। কহিলেন, "বাড়ী ঢোকা মাত্র ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? সঙ্গে একটি লোক দেখলাম ব'লে মনে হচ্ছে—কে ঐ মুখপোড়া?"

"ছিঃ, ব্রাহ্মণের ছেলে, ওভাবে কথা বলতে হয় না।" শেখরেশ্বর কাঁচুমাচু মুখে বলিলেন। ততক্ষণে অপর দুই ব্রাহ্মণীও আসিয়া জুটিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণের ছেলে, তা এখানে মরতে এয়েছে কেন?"

"আঃ, ছোট বৌ। চুপ কর। অনেক দূর থেকে আমার নাম শুনে এসেছে। আমার শিষ্য হতে চায়।"

এবারে তিন ব্রাহ্মণীই এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন "তোমার কাছে! আর লোক জুটল না ভূ-ভারতে! কি শেখাবে তুমি ওকে?—ব্যাকরণ, না কাব্য না দর্শন স্মৃতি?" আবার হাসির ঝঙ্কারে ঘর ভরিয়া উঠিল।

বাস্তবিক এ দিক্ দিয়া শেখরেশ্বরের নিজেরও এ ভাবনা ছিল। নামের আগে যতই পণ্ডিত শব্দটি উচ্চার করুন না কেন, শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ঐ পূজার মন্ত্র পর্য্যন্ত; ছেলেবেলায় কিছু দিন টোলে পড়িয়াছিলে কিন্তু ব্যাকরণের বিভীষিকা এড়াইয়া বেশী দূর আগাইতে পারেন নাই। ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতির ধার দিয়াও কোন দি যান নাই। তা ছাড়া তাঁরা বংশানুক্রমে জমীদার-বাড়ী পুরোহিত, অল্প বয়স হইতেই চর্চ্চা যা হইয়াছে পূজা-আর্চ্চ সম্বন্ধেই হইয়াছে। আজ খোঁটা দিবার সময় ব্রাহ্মণী সুযোগ লইবেনই তো!

হাসি থামিলে বড় বৌ কহিলেন, "বলি—অন্ত কো মতলব নেই তো হতভাগার? তোমরা তো ডুবে ডু জল খাও!"

শেখর ঠাকুর কি জবাব দিবেন ভাবিতেছেন, উদ্ধা করিল স্বয়ং শশীকান্ত। দমকা হওয়ায় দরজাটা খুলিয়া গি ছিল, শশীকান্ত নিঃসঙ্কোচে আসিয়া ভিতরে ঢুকিল এ স্তম্ভিত ব্রাহ্মণীদের কিছু বুঝিবার অবসর না দিয়া চটু তিন জনের পদধূলি লইয়া মাথায় মুখে ছোঁয়াইল। পুটু হইতে তিনখানি গরদের শাড়ী ও তিনটি সোনার বাহির করিয়া প্রণামী স্বরূপ মাটীতে রাখিয়া হাসিমু কহিল, "অনেক দূর থেকে গোস্বামী ঠাকুরের নাম শু এসেছি। উনি আমাকে শিষ্য করে নিতে রাজী হয়েছেন আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন ওঁর যোগ্য শিষ্য হ পারি।" কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণীরা তিন জনেই ঈষৎ বাঁকাইয়া হাসিলেন, কিন্তু মুখে কিছু কহিলেন ছোকরার বুদ্ধি না থাকুক 'আক্কেল' জিনিষটি যে আছে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

বেলা বাড়িতেছিল। বড়বৌ কহিলেন, "তোমরা একটু জিরিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এস, ঠাঁই করে দিই।"

শশাকান্ত হাসিয়া বলিল, "আমার স্নান হয় নি, নেয়ে এসে প্রসাদ নেব। এখন একটু তেল পেলেই হয়।" (ক্রমশঃ)

আমার দেশের মানুষ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ফকিরগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির ইলেক্‌শন্।

সহরের এই অঞ্চল থেকে শচীবিলাস বাবুর দাঁড়ানোর কথা। বারো বছর জেল খেটে ক'দিন আগে তিনি বেরিয়েছেন, কংগ্রেসকর্মীরা তাঁকেই দল থেকে মনোনীত করার পক্ষপাতী। অমন নির্লোভ মানুষ নাকি এখন অল্পই আছে।

ইন্দ্রনাথের কানে কথাটা পৌঁছাতে দেরী হয় না। বারো বছর ধরে এই শহরে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি হয়ে আছেন। এখানে তাঁর বায়ান্নখানা ভাড়াটে বাড়ী আছে, কাছাকাছি দুটো ফ্যাক্টরীর তিনি মালিক, তিনটী লিমিটেড কোম্পানীর ডাইরেকটার। আর একটা লোক বারো বছর জেল খেটে এসেই তাঁর সমকক্ষ হয়ে যাবে!

কংগ্রেসের তিন-রঙা নিশান উড়িয়ে হাডসন-টেরাপ্লেন মোটর ছুটিয়ে তিনি তাদের অ্যাফসে এসে উঠলেন, বললেন—এবার আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই। আর সত্যি কথা বলতে কি, গত বারো বছর ধরে মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপারে আমি তো আপনাদের নীতিই সমর্থন করেছি, এবারকার ইলেক্‌শনে আমি আপনাদের পুরোপুরি সমর্থন চাই। অবশ্য দলের কাজকে এগিয়ে দেবার জন্য যে টাকার দরকার হবে তা আমি খরচ করবো—

—কিন্তু এবার যে আমরা শচীবিলাস বাবুকে—

শচীবিলাস বাবু পুরানো কর্মী, অনেক ত্যাগ স্বীকারও করেছেন সত্যি, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরের ব্যাপার জানেন তো? নির্বাচনের সময় এই যে এত টাকা পয়সা খরচ করে, সে তো নিজের স্বার্থের জন্যই! জানেন তো স্বার্থের কাছে কোন যুক্তিই টেঁকে না। শচীবিলাস বাবু বিনা পয়সায় কি এদেরকে দলে টানতে পারবেন? সে কথাটাও একবার ভেবে দেখবেন। বাংলার মানুষগুলো ভারী চালাক, টাকা ছাড়া আর কিছুই তারা বোঝে না।

মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরের নানা তথ্য বিস্তারিত ভাবে ইন্দ্রনাথ আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদের কোন বেতন না থাকলেও, নানা দিক্ থেকে কি ভাবে তাঁরা গোপনে উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করেন সেই সব কথা এমন ভাবে বলেন, যেন, তিনি এই সব নোংরা ব্যাপারের অনেক উপরে।

দিন দুয়েকের মধ্যেই আলোচনা শেষ হয়। পাঁচ হাজার টাকার একখানি চেক লিখে দিয়ে ইন্দ্রনাথ মনোনয়ন ক্রয় করেন।

কমিটির সম্পাদক শচীবিলাসবাবুকে বললেন—ভেবেছিলাম এবার আপনাকেই দাঁড় করাবো, তা আর হ'ল না। ভিতরের খবর যা শুনলাম, পয়সাওলা লোক না হলে ওখানে কিছু করে ওঠা শক্ত। ইন্দ্রনাথবাবু প্রতিশ্রুতি দিলেন যত টাকা লাগে খরচ করবেন, সেই জন্যই ভদ্রলোককে আর একটা চ্যান্স দেওয়া গেল। ওঁর মত একটা পয়সাওলা লোক আমাদের দলে থাকা ভালো। জানেন তো, আজকালকার দিনে টাকা ছাড়া কিছু হয় না।

টাকা ছাড়া যে কিছু হয় না, শচীবিলাসবাবু তা ভালোমতই জানেন। মা আজ বছর খানেক ধরে বাতে কষ্ট পাচ্ছেন, অর্থাভাবে তাঁর ভালোমত একটা চিকিৎসা হচ্ছে না। কিন্তু ফকিরগঞ্জের কংগ্রেসকর্মীদের অধিকাংশের কাছেও যে অর্থের গুরুত্ব অধিক তা তিনি এতদিন জানতেন না। হেসে বললেন—আমিও চাই নি, আপনারাই আমাকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। যাক্, এ ভালোই হ'ল।

ইন্দ্রনাথ পাড়ার ছেলেদেরকে ডেকে বললেন—মাথা পিছু একটাকা, আর বিকালে এক একখানি ডবল ওমলেট। লেগে যাও দিকি আজ থেকে—

ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ জাগলো, ইস্কুল-কলেজ থেকে

TIGHT BINDING

ফিরে এসেই তারা পাড়ায় পাড়ায় হৈ-চৈ তুললো, মুখে টিনের চোঙ নিয়ে চীৎকার সুরু করলো—ভোট ফর ইন্দ্রনাথ! বন্দে মাতরম্!

পার্কে পার্কে সভা করা হয়। ইন্দ্রনাথ বলেন—আমি আপনাদের সেবা করতে চাই। বারো বছর ধরে আমি এই সহরের সেবা করার চেষ্টা করেছি. বহু বিরোধী দলের সঙ্গে আমাকে বিরোধ করতে হয়েছে, অনেক বন্ধু শত্রু হয়ে গেছে, কাজ বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। এবার কংগ্রেসের বহু কর্মীকে আমার সহকর্মী হিসাবে পাবার আশা রাখি, এবং অন্যান্য বারের চেয়ে এবার আমার কাজের অনেক সুবিধা হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

কাগজ ছাপিয়ে ইন্দ্রনাথবাবু বাড়ী বাড়ী বিলি করেন, তাতে তাঁর কাজের প্রোগ্রাম ছাপা থাকে—বস্তীতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হবে, বস্তী অঞ্চল পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা হবে, দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুবন্দোবস্ত হবে, আরো কয়েকটি বিনা বেতনের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হবে……ইত্যাদি মানুষের কল্যাণের জন্য যা কিছু করা সম্ভব এবার ইন্দ্রনাথবাবু তার কোনটিই বাদ দেবেন না।

দেয়ালে দেয়ালে প্রাচীরপত্র লটকে দেওয়া হয়—'আপনাদের একনিষ্ঠ সেবক, অক্লান্ত কংগ্রেস-কর্মী ইন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীকে ভোট দিয়া আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন।'

দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ দলের প্রতিনিধি, কাজেই ভোটের অভাব হ'ল না। তা ছাড়া কতকগুলো ব্যাপারে ইন্দ্রনাথ আগে থেকেই সুবন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। সে ব্যবস্থায় যারা সশরীরে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারল না তাঁদের ভোটও তাঁরই নামে জমা হয়ে গেল। ইন্দ্রনাথ জিতলেন।

পাড়ার ছেলেরা সভা ক'রে ইন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা জানালো। ব্যাণ্ড বাজলো, জাতীয় পতাকা ওড়ানো হ'ল, কত জন কত কথা বললেন। সবার শেষে ইন্দ্রনাথ বললেন—আমি কংগ্রেসের দীন সেবক মাত্র। জনগণের সেবা করা প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মীর কাম্য। আমাকে নির্বাচন করে আপনারা আমাকে সেই সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি, এই আমি আজ প্রার্থনা করছি। আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমাকে সাহস দিন, আমি যেন অন্যায় ও মিথ্যাকে আঘাত কর পারি, আমি যেন জনগণের সত্যিকারের কল্যাণ কর পারি ইত্যাদি…

ছেলের দলকে আগে থেকেই শেখানো ছিল, সাড়া তুললো—ইন্দ্রনাথবাবুকি জয়! বন্দে মাতর ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

ভীড় ঠেলে ইন্দ্রনাথ মোটরে এসে উঠলেন। দু' পার্ষদ আগেই মোটরে এসে বসেছিলেন, ইন্দ্র বললেন—যাক্, এত দিনে একটা হাঙ্গামা চুকলো, তিনেকের মত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

—তা কত টাকা আন্দাজ খরচ করলে?

—কাল রসে বসে হিসাব দেখছিলাম, তেরো হাজ সাত শ' টাকা…

—ওই চৌদ্দ হাজারই ধর! তিন বছরে ওই টা এখন তুলতে পারবে তো?

—তিন বছর? হুঁ! এক বছরে উঠিয়ে আনবো—

—কিন্তু কংগ্রেসের টিকিটে গেছ—

—গেছি তো গেছি। ইলেক্‌শন চুকে গেছে, এখন আ কংগ্রেসকে কিসের তোয়াক্কা? যা খুসি করব। তা ছা সাচ্চা কংগ্রেসওয়ালা তো কেউ যায় নি, তারা এ জেল খাটছে। যারা গেছে তারা অনেকেই আমার ম টাকা খরচ ক'রে তারা মনোনয়ন কিনেছে। আমি করবো তারাও তাই করবে। ট্যাকের পয়সা খরচ ক' তারা কেউ যাত্রা দেখতে আসে নি!

কথাটা ইন্দ্রনাথ বোধ হয় মিথ্যা বলেন না। ক'দিনে মধ্যেই পার্টি মিটিং হয়। সেখানে কংগ্রেসের নামে যা মিউনিসিপ্যালিটিতে এসেছেন তাঁরা কি ভাবে কা করবেন তারই আলোচনা হয়, অবশ্য ইন্দ্রনাথের বাড়াতেই দরজা বন্ধ ক'রে আলোচনা চলে. বাইরের কোন লো সেখানে থাকতে পায় না। যাঁরা আলোচনা করে তাঁরা কংগ্রেসের নীতি নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান না কার কত টাকা খরচ হ'ল এবং কি কি উপায়ে সে টাকা তোলা যায়, তারই একটা সলা-পরামর্শ চললে।

প্রথম দিনের সভাতেই নানা কমিটি গঠিত হ'ল জল-কমিটি, স্বাস্থ্য-কমিটি, বস্তী-কমিটি, রাস্তা-কমিটি

রা কত কি! কাগজে খবর পড়ে লোকে বললো—ার সত্যি এরা একটা কিছু করছে!

জল-কমিটি পাড়ায় পাড়ায় টিউব-ওয়েল বসাবার জন্য াদার ডাকলো। যে ঠিকাদার সবচেয়ে বেশী টাকা মিটির সদস্যদের হাতে গুজে দিতে পারলেন তিনিই উব ওয়েল বসাবার অনুমতি পেলেন। সে টিউব-ওয়েল ল কি মন্দ কেউ দেখলো না। পাঁচ ছ' মাস জল ওঠার প্রত্যেকটি টিউব-ওয়েল গেল বিগড়ে।

স্বাস্থ্য-কমিটির কাজও চললো ওই একই ধারায়। কোম্পানী বেশী টাকা কমিটির সদস্যদের ঢেলে দিল রই তৈরী ওষুধ কেনা কমিটি সুবিধাজনক ব'লে বিবেচনা রলো। শিশির মধ্যে কতখানি ওষুধ আর কতখানি ল তা তারা বিচার করলো না। যে সব লোক চাকরী ল তাদেরও গুণ বিবেচনা করা হ'ল ঘুষের পরিমাণ য়ে। বিদ্যাবুদ্ধি বা যোগ্যতার প্রশ্ন কেউ করলো না।

বস্তী-কমিটি বস্তীগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলো। বস্তী াংরা করে রাখার জন্য বস্তীর মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা ার ভয় দেখালো। তারাও ভিতরে ভিতরে টাকা-সা দিয়ে মিটমাট করলো।

রাস্তা-কমিটি নতুন রাস্তা করবার জন্য ও পুরানো স্তা সারাবার জন্য ঠিকাদার ডাকলো, সেখানেও টাকার পার…

যারা জানলো তারা বললো—চোর!

ইন্দ্রনাথের কানে কথাটা উঠলো। ভারিক্কি চালে তিনি লেন—ওরা কনট্রাক্‌ট্ পায় নি। তাই গালি দিচ্ছে। বেছিল আমাদের বোকা বানিয়ে কিছু লাভ করে নেবে। তো পারলো না, স্বার্থে ঘা পড়লো, তাই এখন গায়ের ালা…

দুর্নীতির ব্যাপার কিছুই গোপন থাকে না। কংগ্রেস-র্মীরা ক্ষুণ্ণ হয়। এত দূর জানলে এই মানুষগুলোকে রা আর নির্বাচনের সুযোগই দিত না, কিন্তু এখন তা আর উপায় নেই! তিন বছরের মধ্যে তো নির্বাচন য়ে গেছে! ইতিমধ্যে এই দুর্নীতির কোন একটা তিকার না করতে পারলে কংগ্রেসের উপর লোকের শ্বাস নষ্ট হবে। অনেক বিচার বিবেচনা ক'রে কংগ্রেসকর্মীরা এক সভা ডাকলো। শচীবিলাসবাবুকে তারা ডেকে আনলো সভাপতিত্ব করার জন্য।

সভার গোড়াতেই শচীবিলাসবাবু সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন, এবং যাঁরা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যদের দুর্নীতির সম্পর্কে আলোচনা করতে চান তাঁদেরকে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান করলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্রনাথবাবু মোটর থেকে এসে নামলেন, এক পাশ থেকে তিনি বললেন—এই সভার মাঝে আমার একটা বিনীত নিবেদন আছে। আমাদের সম্পর্কে আপনারা যা কিছু শুনেছেন তার অধিকাংশই মিথ্যা রটনা। এবং এই রটনার মূলে আছেন আমাদের রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদী দল। এঁরা নিজেদেরকে দেশকর্মী ব'লে পরিচয় দেন, অথচ ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে নিয়মিত ভাবে সাহায্য নেন কংগ্রেসকর্মীদের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য। স্বদেশী গান্ধীজীর চেয়ে বিদেশী ষ্ট্যালিনের উপর এঁদের শ্রদ্ধা বেশী। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এঁরা লোকের মনকে বিষিয়ে তুলতে চান। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আজকের এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। আপনারা জানেন, এবারকার নির্বাচনের সময় শচীবিলাসবাবু আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু কংগ্রেস থেকে তিনি সমর্থন পান নি—তার কারণ তিনি সম্প্রতি ঐ বিপক্ষ দলের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছেন। সেই সমর্থন না পাওয়ার জন্যই তিনি আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্যে নেমেছেন। আমার শুধু বিনীত নিবেদন, যে কংগ্রেস-কর্মীদের নামে এই সব না ক'রে, সোজা নিজেদের কমিউনিষ্ট দলের নামে আত্মপ্রকাশ করতে তাঁর বাধছে কেন?

ইন্দ্রনাথবাবু আগে থেকেই একদল ছেলেকে সভায় পাঠিয়েছিলেন। তারা এবার ভীড়ের মধ্যে থেকে চীৎকার তুললো—কমিউনিষ্ট! কমিউনিষ্ট!!

সভা আরম্ভ হবার আগেই ভেঙে গেল।

ইন্দ্রনাথ মোটরে উঠে বসলেন। বন্ধুদের বললেন—দেখলে তো, এক চালেই মাৎ। বুদ্ধিতে শচীবিলাস আমাকে ঠকাবে? হুঁ। টাকা খরচ করতে জানলে দিগ্বিজয় করা যায়। দুনিয়া টাকার গোলাম, বুঝলে হে!

TIGHT BINDING

তারা ভালোমতই বোঝে, যখন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্ নির্বাচনের সময় ইন্দ্রনাথ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন, এবং এক-একটি ভোট দেওয়ার জন্য সেই টাকার এক-একটি অংশ তাদের পকেটে আসে।

চেয়ারম্যানের আসনে বসে ইন্দ্রনাথ বলেন—কি ভাবে যারা জীবন ধরে তিনি কংগ্রেসের নীতি মেনে চলেছেন…

পরদিন সমস্ত কাগজে ইন্দ্রনাথের ছবি বেরো বক্তৃতা ছাপা হয়।

পাড়ার ছেলেরা আর একবার ইন্দ্রনাথের কাছ থে টাকা নিয়ে ইন্দ্রনাথকেই সম্বর্দ্ধনা জানায়।

আর শচীবিলাসবাবু পথে বেরুলে ছেলের গালি দে —বেটা বারো বছর জেল খেটে এসে এখন কমিউনি হয়েছেন!…

একলব্য

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য

[মহর্ষি চার্বাকের আশ্রম। প্রত্যূষ। চার্বাক ও তাঁর শিষ্যগণ।]

চার্বাক। বৎসগণ, এর চেয়ে আমাদের বহুগুণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হবে। ভবিষ্যতে যে বাধা বিপত্তি এবং লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে, তার কাছে বর্ত্তমানের এই দুর্গতি বোধ হয় কিছুই নয়। আজ শুধু ভাববাদী দার্শনিকদের ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ আর আস্ফালনের কোলাহল থেকে দূরে সরে এসে অনার্য পল্লীর ধারে এই বনের মধ্যে আমরা আশ্রম করেছি, নির্বিঘ্নে সুরু করেছি আমাদের মানসিক অনুশীলন। আজ শুধু ওদের দুষ্টবুদ্ধি আমাদের প্রচারিত দার্শনিক তত্ত্বকে বিকৃত করছে, বিকট উল্লাসে চীৎকার করছে—বস্তুবাদী দর্শনের মূল কথা: ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। কিন্তু এইখানেই তো শেষ নয়। কারণ, চিরদিন আমরা এই বনের আশ্রম-কুটীরে বসে শুধু অধ্যয়ন-আলোচনায় দিন কাটাব না। তোমাদের প্রত্যেককে বিদ্যায়, যুক্তি-তর্কে সুপণ্ডিত ক'রে আমরা মহা-ভারতের দিগ্বিদিকে যাত্রা করব বস্তুবাদী দর্শনের প্রচারে। ভাববাদের সমস্ত মায়া কুজ্ঝটিকা-জাল বিদীর্ণ ক'রে প্রচার করব সত্য—জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। এবং নিশ্চিত জেনো, এই নব দর্শনের মর্মকথা অনার্য জনসাধারণের প্রাণে অসাধারণ স্পন্দন জাগাবে, এই দর্শনের বাণীকে তারা গ্রহণ করবে অন্তরে অন্তরে,—কারণ আর্য পুরোহিত-কুলের অনুশাসনে তারাই সব চেয়ে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত। তাদের জীবনের মধ্যে দিয়েই আমাদের এই আদর্শ দি দিন শক্তি সঞ্চয় করবে। তখনই সুরু হবে আমাদে চরম নির্যাতনের পালা। পুরোহিতদের পাশে এ সসৈন্যে দাঁড়াবেন দেশের আর্য রাজন্যবর্গ। আমাদে বিরুদ্ধে চলবে সশস্ত্র অভিযান।

শিষ্যগণ। সশস্ত্র অভিযান?

চার্বাক। হ্যাঁ, বৎসগণ, সশস্ত্র অভিযান। আমাদে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই হবে রাজকুলের উদ্দেশ্য।

১ম শিষ্য। শুধু তত্ত্ব প্রচারের ফল এতখানি গুরুত হবে কেন গুরুদেব? ভাববাদী দার্শনিক এবং পুরোহিত শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের তত্ত্বের ক্ষেত্রে আদর্শের সংঘা হ'তে পারে, কিন্তু রাজপুরুষদের সঙ্গে আমাদের সম্প কি? তাঁদের সঙ্গে ত' আমাদের কোন বিরোধ নেই!

চার্বাক। আছে বই কি, বৎস, তাঁদের সঙ্গেই আমাদের আসল বিরোধ। আমাদের এই মতবা তাঁদেরই স্বার্থে ঘা দেবে সব চেয়ে বেশী। যে দার্শনিক ভাববাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁ সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞাতসারে রাজন্যবর্গেরই স্বার্থসিদ্ধির এ আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেন। যাদের অধীনতা ওপরে রাজাদের রাজত্বের ভিত্তি, শাসন শক্তি এ ঐশ্বর্যের বিলাস নির্ভর করে, সেই জনসাধারণের মন দৃষ্টি যদি আধ্যাত্মিক ভাবে আচ্ছন্ন থাকে, তারা যদি দার্শনিকদের অধ্যাত্মবাদ প্রচারে মোহগ্রস্ত হয়ে জীবন

গতের মূলে কেবল ভাবের খেলা দেখে—হপতিরা া হলে অতি নিশ্চিন্ত বোধ করেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ক অপরিবর্ত্তনীয়, অলঙ্ঘ্যনীয় চক্রে অনাদিকাল থেকে াবর্তিত হ'য়ে চলেছে সারা ব্রহ্মাণ্ড ও জীবলোক, এবং ার মূলে আছে এক অজ্ঞেয় অলৌকিক ভাব—কিংবা রম প্রভু ঈশ্বরের সৃষ্টি এই মহাবিশ্বে সমস্তই তাঁর ইঙ্গিতে টে—কিংবা পূর্ব্বজন্মের কৃতকর্ম অনুসারেই মানুষ সুখ ঃখ ভোগ করে,—কিংবা বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন দুঃখ-দৈন্যের চিন্তা মনে স্থান দিও না, তিনিই ভবযন্ত্রণা থকে মুক্তি দান ক'রে পরলোকে শান্তি দেবেন—কিংবা াজাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ঈশ্বরের নির্দ্দেশে প্রজাদের ঙ্গলের জন্যই তিনি রাজ্যশাসন করছেন, তাঁকে মান্য র, তাঁকে বন্দনা কর, তা হলেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন এবং মি বৈকুণ্ঠে স্থান পাবে—এমনি সব বিশ্বাস যদি প্রজা ধারণের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে যায়, তা হলে রাজপুরুষদের চয়ে বেশী লাভের আশা আর কারুরই নেই। তখনই ারা সকলের ওপর নিষ্কণ্টকে আধিপত্য বিস্তার করতে ারেন। কিন্তু যদি জনসাধারণ বুঝতে পারে যে, জগৎ ংসারের বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে কোন ঈশ্বরের ালাচঞ্চল ইঙ্গিত নেই, পৃথিবীর ও মানুষের জীবনের প্রতিটি ঘটনার পেছনে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণ রয়েছে, ষ্টির ধারায় সবার আগে এবং সমস্ত কিছুর অন্তস্থলে আছে বস্তু, বস্তুরই নানা রূপান্তরের ফলে জীবজগতে দেখা দেয় পরিবর্ত্তন, প্রয়োজনে আর পরিবেশে আসে নানা প্রকার ভেদ, মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুরই রূপান্তর, জন্মান্তর নেই—মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি, বাস্তব জীবনের সমস্ত দুর্দশা দুর্ভোগের কারণ আছে, প্রতিকারও আছে, রাজা কোন ঈশ্বর-প্রেরিত অলৌকিক শক্তিধারী পুরুষ ন'ন্—ছলে, বলে, কৌশলে সম্পদ্ আহরণ করেছেন মাত্র, প্রজাদের বঞ্চনার উপরেই তাঁর রাজত্বের অস্তিত্ব, দুর্লভ মানবজন্মে প্রত্যেকেরই সুখে ভোগে বাঁচবার অধিকার আছে, ঈশ্বর ও পর-লোকের মধুর বাক্‌চাতুর্য্যের আড়ালে সেই'দাবী ক্ষুণ্ণ করার অধিকার কারুরই নেই, মূলে ও মর্যাদায় কোন মানুষই হেয় নয়, এবং তার দুরবস্থা কোন ঈশ্বরের বিধান বা পূর্ব কর্ম্মফলেও দেখা দেয়নি,—তাহলে তার চেয়ে বড় দুর্দিন প্রভুদের আর নেই। তাঁদের সমস্ত অন্যায় সুবিধা লাভের সেই হবে অন্তিম সময়। তাই অধ্যাত্মবাদকে রক্ষা করবার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন রাজন্যশ্রেণী। বৎসগণ, আজ যা আমাদের শুষ্ক মতবাদ মাত্র, ভবিষ্যতে তা-ই অগণিত জীবন্ত জনগণের মধ্যে মূর্ত হ'য়ে উঠবে।

২য় শিষ্য। বুঝেছি, গুরুদেব! আপনার আশীর্বাদে আমরা ভবিষ্যতের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত ক'রে নিতে পারব। এখন আমার একটি প্রশ্ন আছে, দেব, যদি অনুমতি দেন তাহলে নিবেদন করি।

চার্বাক। বল, তোমার প্রশ্ন কি?

২য় শিষ্য। এ প্রশ্ন শুধু আমার নয়; মনে হয় আমার সব সতীর্থদের মনেই এ প্রশ্ন জেগেছে। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি: প্রাণ কি, এবং কি ভাবে আমরা তার ব্যাখ্যা করব?

চার্বাক। এ কথা জিজ্ঞাসা করে তুমি অসামান্য জ্ঞান-স্পৃহার পরিচয় দিয়েছ বৎস। তোমার এই প্রশ্নটি বস্তুবাদী দর্শনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। এবার মন দিয়ে শোন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত আবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্যে বস্তুর যেমন সূক্ষ্মতম রূপের রূপান্তরের ক্রিয়া চলে, মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যেও তেমনি। নরদেহ বস্তুর বিভিন্ন ভগ্নাংশে গঠিত; এবং শরীরের বস্তুর সূক্ষ্মতম অংশগুলির একটি বিশেষভাবে সংগঠনের ফলই হচ্ছে প্রাণ। অর্থাৎ প্রাণ বলে আলাদা কিছুর অস্তিত্ব নেই। দেহের একটি বিশেষ অবস্থায়—অর্থাৎ দেহস্থ বস্তু বিশেষভাবে সংগঠিত হ'লে—আমরা বলি, দেহে প্রাণ আছে। দেহের সেই বিশেষ সংগঠনের, অর্থাৎ বস্তুকণিকার সেইভাবে অবস্থানের, মধ্যে যদি গুরুতর পরিবর্তন ঘটে তা হলে সেই দেহ নিষ্প্রাণ হ'য়ে পড়ে। লোকে তখন বলে, প্রাণ বেরিয়ে গেল। আসলে কিন্তু প্রাণ নামে অন্য কোন বায়ু কোন দিন শরীরের মধ্যে আসেও না, তাই শরীর থেকে তার বেরুবার কথাও ওঠে না। দেহের যে বিশেষ সং-গঠনের জন্য তাকে আমরা জীবন্ত বলি, নানা কারণে—ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধির ফলে—তার এমন বিপর্যয় ঘটে যে, শরীরের শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়, হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া স্তব্ধ হ'য়ে পড়ে। কোন-না-কোন ব্যাধি বা দুর্ঘটনার ফলে এই

শারীরিক বিপর্যয় দেখা দেয়। সেই সমস্ত ব্যাধি বা ঘটনার কারণ আমরা সব সময় জানতে বা বুঝতে পারি না বলেই ভুল ক'রে ভারি—প্রাণের বিয়োগ হ'ল এবং এই মৃত্যুর পেছনে কোন দুর্জ্ঞেয় অলৌকিক রহস্য আছে। কিন্তু যেদিন মানুষ বস্তুর চরম বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হবে, সেদিন দেহ ও জীব-লোক থেকে আরম্ভ করে নিখিল বিশ্বের সমস্ত রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে সে লাভ করবে সত্য দৃষ্টি—সৃষ্টি-ধারায় কার্যকারণের সম্পর্ক তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর যতদিন পর্যন্ত—

(একলব্যের প্রবেশ)

—কে তুমি বালক?

একলব্য। প্রণাম গ্রহণ করুন ঋষিবর! আমি একলব্য। নিষাদপতি হিরণ্যধনু আমার পিতা। হস্তিনাপুরে যাবার পথ হারিয়ে আপনার আশ্রমে এসে পড়েছি। আমাকে যদি অনুগ্রহ ক'রে হস্তিনাপুরের পথ দেখিয়ে দেন, তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, দেব!

চার্বাক। অবশ্যই সে সন্ধান দেব, বৎস, কিন্তু কেন তুমি একা হস্তিনাপুর চলেছ, বলবে কি?

একলব্য। গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে আমি অস্ত্রশিক্ষা করব।

চার্বাক। (আশ্চর্য হয়ে) কুরুরাজকুমারদের আর্য-গুরু দ্রোণাচার্য! তিনি তোমায় অস্ত্রশিক্ষা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন?

একলব্য। তাঁর সঙ্গে আমার এখনো সাক্ষাৎ হয় নি।

চার্বাক। তবে এখান থেকেই ঘরে ফিরে যাও একলব্য। দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে না যাওয়াই তোমার পক্ষে মঙ্গল। তিনি তোমাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করবেন না।

একলব্য। কেন প্রভু? আমার অপরাধ কি? আর আপনিই বা এ কথা কেমন করে জানলেন?

চার্বাক। জানি বৎস, আর্য নায়কদের জাতির দম্ভ আমি ভালভাবেই জানি। এই দ্রোণাচার্য কর্ণকে পর্যন্ত সূতপুত্র বলে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন! তোমাকেও করবেন। কারণ, তোমারও তেমনি অপরাধ আছে—অনার্য ব্যাধের সন্তান তুমি!

একলব্য। না, না, না, এ আপনি কি বলছেন, দেব! এ কখনো সত্য হ'তে পারে না। হেমকান্তি, সৌম্যমূর্তি আর্যশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তিনি। তাঁর মত আর্য কখনো এমন অসহিষ্ণু হ'তে পারেন না। সুসভ্য আর্যজাতি আমাদের প্রণম্য; প্রভু। ক্ষমায়, করুণায় ত' তাঁরা আদর্শ!

চার্বাক। আর্য, আর্য, আর্য! আর্যকে তুমি কি চোখে দেখেছ একলব্য? কবে তোমার মোহ ভঙ্গ হবে? হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কারে মদমত্ত আর্যদের কবে তুমি চিনবে বৎস? তোমার সুসভ্য আর্যজাতি তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের সাহায্যে প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং অস্ত্র দিয়েই সে আধিপত্য রক্ষা করে চলেন! আর্য ব্রাহ্মণশ্রেণী অহিংসার শান্তি বারি সিঞ্চনে অনার্যদের বিদ্রোহ-বহ্নি নির্বাপিত করে দেন, বিজয়ী আর্য রাজকুলের শিরে বর্ষণ করেন আশীর্বাদ। আর অনার্য শূদ্রদের তাঁরা এমনি ক্ষমা ও করুণার চক্ষে দেখেন যে, বেদপাঠ শ্রবণ করলে তাদের কর্ণকুহরে গলিত উত্তপ্ত সীসা উপহার দেওয়া হয়। আর্যদের এমনি আরো বহু কীর্তি আছে একলব্য, সেগুলি ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

একলব্য। (কানে হাত দিয়ে) এ সব কথা শোনা আমার পক্ষে পাপ, মহাপাপ। এ স্থান আমার এখনই পরিত্যাগ করা উচিত, আর এক দণ্ডও এখানে নয়। পথের সন্ধান আমি নিজেই করব। গুরুভক্তি যেন আমার অটুট থাকে—গুরুভক্তি যেন আমার অটুট থাকে—

(প্রস্থান)

চার্বাক। হায় রে আত্মবিস্মৃত অনার্য-নন্দন!

(ক্রমশঃ)

স্মৃতির পটে

ঠাকুরদাদার আত্মকাহিনী

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
('রামধনু'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক)

'ঠাকুরদা'র ঝুলি' একটা প্রবাদ বাক্য হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার ঝুলিটী অনেক কালের, সুতরাং তাহাতে অনেক কিছু থাকিবারই কথা। সব সময়ে হয়ত তাহা তরুণদিগের ভাল লাগে না, আবার কখন কখন তাহারা বেশ কৌতুক অনুভব করে। আজ রামধনু-সম্পাদকের অনুরোধে ঠাকুরদাদার সেকালকার কোন কোন কথা শুনাইব।

এই ঠাকুরদাদার জন্ম ফরিদপুর জেলার এক অজ পাড়াগাঁয়ে, আজ হইতে প্রায় ৭৬ বছর আগে। সেখানে বাঁধান রাস্তা, হাট, বাজার, ডাকঘর প্রভৃতির বালাই ছিল না। ক্ষুদ্র পাঠশালা মাঝে মাঝে গজাইয়া উঠিত, আবার কিছুদিন পরে লয় পাইত। ধারে কাছে স্কুল নামধারী কোন বিদ্যালয় ছিল না।

হাট-বাজার গ্রামে না থাকিলেও কিছু দূরে দূরে ছিল। সাধারণতঃ সপ্তাহে দুইবার হাট হইতে তরিতরকারী কিনিয়া রাখা হইত। সকলের বাড়ীতেই কিছু কিছু তরিতরকারী জন্মিত, সুতরাং ইহার অভাব বিশেষ অনুভব করার কারণ ছিল না। গোল আলু একটা দুষ্প্রাপ্য জিনিষ ছিল কিন্তু তাহার জন্য কাহাকেও কাঁদিতে দেখা যায় নাই। মোটা ভাত, মোটা কাপড়, পুকুরের বা মাঠের মাছ এবং প্রচুর গরুর দুধ অনেকেরই আয়ত্তের মধ্যে ছিল। 'মাঠের মাছ' লিখিলাম কারণ বর্ষাকালে দেশ জলে ভাসিয়া যাইত, তাহার পর কয়েক মাস পর্য্যন্ত যাহার একটু অধ্যবসায় ছিল সে-ই মাছ ধরিয়া খাইতে পারিত। এদিকে হাটে বাজারে বা অন্যত্র যে মাছ কেনা হইত তাহার দামের কথা শুনিলে তোমরা চমকাইয়া উঠিবে। এক আনায় ৪টী ইলিশ মাছ পাওয়া গেলে কেহই বিস্মিত হইত না। আর দুধ? সন্দেশ রসগোল্লার মুখ আমরা বাল্যকালে খুব কমই দেখিতাম কিন্তু খেজুর গাছে প্রচুর রস উৎপন্ন হইত; তাহার ও দুই পয়সা সের খাঁটি দুধের সাহায্যে যে নানা প্রকার মিষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হইত তাহার স্বাদ এখনও ভুলিতে পারি নাই। গ্রীষ্মকালে আমের অভাব ছিল না।

প্রবন্ধলেখক রামধনুর প্রথম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

কিন্তু সেই আমের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গসুলভ পোকাও যথেষ্ট বিরাজ করিত। সে পোকা দেখিবার জিনিষ। আম কাটা হইল, হয়ত ভিতর হইতে কাল রং-এর পোকা বাহির হইয়া দিল শূন্যে দৌড়। এই পোকার ভাগীদার হইয়া ধামায় ধামায় আমের সদ্ব্যবহার করা যাইত।

পল্লীগ্রামে যেমন হয়, গাছপালার মধ্যে দৌড়-ঝাঁপে

কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। বাল্যসঙ্গীরা যে গ্রাম্য খেলাধূলায় পশ্চাদ্‌পদ ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। বর্ষাকালে যেমন চারিদিক্ জলে ভরা, গ্রীষ্মকালে তেমনি চারিদিকে শুধু মাঠ। সাঁতার কাটা, হাডুডু খেলা, গাছে চড়া, লুকাইয়া তাস খেলা প্রভৃতিতে অল্প বয়সেই অভ্যস্ত হইলাম। মাঝে মাঝে যে পিঠে প্রহার যুটিত তাহা এখনও মনে পড়ে।

আমাদের পারিবারিক বৃত্তি ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বৃত্তির সংমিশ্রণ। ব্রাহ্মণবৃত্তি কি? তখন সন্ধ্যার পরে গুরুজনের নিকট বসিয়া পূর্ব্বপুরুষের নামের সহিত তাহাও শিখিতে হইত। ষট্‌কর্ম্মশালিত্বং ব্রাহ্মণত্বং—ষট্‌কর্ম্ম কি কি? যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ! গ্রামের অন্যান্য ব্রাহ্মণ-বাড়ী ও আমাদের বাড়ী একত্র করিয়া ধরিলে ইহার সকলগুলিই চলিত, শুধু আমাদের বাড়ীতে ইহার কতকগুলি। ক্ষত্রিয়বৃত্তি কি?—দান ও ঈশ্বর ভাব (গীতা)। পূর্ব্বপুরুষের তালুক ভাগাভাগি হইয়া যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক বা তালুকের অংশের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার রক্ষা ও ব্যবহার লইয়া একটু-আধটু ক্ষাত্র ভাবের প্রয়োজন হইত বই কি? একবার এক খণ্ডযুদ্ধের কল্যাণে পিতাঠাকুরকে কোর্টে কিছু জরিমানাও দিতে হইয়াছিল। বৈশ্যবৃত্তি কি? খাসে যে কিছু জমি ছিল তাহা চাষবাসের ব্যবস্থা, সামান্য যে পুঁজি ছিল তাহা সুদে দাদন ইত্যাদি। এই তিন বৃত্তির সম্মিলনে সাংসারিক ব্যয় কোন মতে চলিয়া যাইত. অতিথি অভ্যাগতের সৎকারও ইহার মধ্যে ছিল—সেকালে একালকার অপেক্ষা ব্যাপক ভাবেই উহা গৃহস্থের কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য ছিল।

আমাদের বাড়ী অনেকটা জায়গা লইয়া ছিল কিন্তু ঘর ছিল তখন খড়ের। পূর্ব্ববঙ্গে আমাদের অপেক্ষা অবস্থাপন্ন বহু লোকের বাড়ীও তখন খড়েরই হইত। তবে সে খড়ের ঘরে অনেক রচনাকৌশল থাকিত। পূর্ব্ববঙ্গের এক রাজা বা রাজকুমার বহু হাজার টাকা খরচ করাইয়া এক বিবিধ কারুকার্য্যযুক্ত খড়ের ঘর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—ইহাকে তাঁহার খেয়ালই বলিতে হয়।

আমাদের বাড়ীর সীমানার মধ্যে এক ঘর শূদ্রের বসতি ছিল। ইহাদের দুই ভাইকে আমি 'বড় ম' ও 'ছোট মনা' বলিয়া ডাকিতাম, আর তাদের মা ডাকিতাম 'নাম্মামা' বলিয়া। 'ছোট মনা' ও 'বড় ম' শব্দের যাহাই অর্থ হউক, "নাম্মামা" শব্দের অর্থ করি বোধ হয় যে কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্‌কে গলদ্‌ঘর্ম্ম হই হইবে। বড় মনা' তখন দূরে চাকরী-বাকরী করি 'ছোট মনা' সাধারণতঃ আমাদের বাড়ীর কাজকর্ম খাকিত এবং তাহার সহিত আমার বেশ মেলামে ঘটিত। পূর্ব্ববঙ্গের রীতি অনুসারে, বর্ষাকালে চলাচ করিতে, যাহার অবস্থায় কুলাইত সে-ই একখানি ছো নৌকা রাখিত (এখনও এই প্রথা অন্তর্হিত হয় নাই)। আমাদেরও এইরূপ নৌকা ছিল এবং 'ছোট মনা' উ চালাইতে এত সিদ্ধহস্ত ছিল যে সে বিষয়ে ইহার সমক কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। আর, 'নাম্মা ছিল আমার প্রতিপালিকা। অনেক সময় তাহার নিক শুইয়া বসিয়া কাটাইতাম। রাত্রিবেলায় তাহার কাঁথা উপর শয়নের স্থান করিয়া লইতাম। মাঝে মাঝে বাড়ী তলব হইত কিন্তু নাম্মামা'র কোল হইতে আমাকে কে সরায়? আমার পিতা নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন কি 'নাম্মামা'র বাড়ীতে বাল্যকালে যে কেবল বর্ণাশ্র ধর্ম্মসঙ্গত জিনিষই আমার উদরস্থ হইয়াছে এ কথা শপ করিয়া বলা সম্ভব নয়।

আমাদের বাড়ীতে দূর সম্পর্কে আমার এক জ্যেঠ মহাশয় থাকিতেন। তিনি পূর্ব্বে আমাদের এ জ্ঞাতি-বাড়ীর অংশীদার রূপে বাস করার সময় নিকট মাঠে এক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বাঘে কামড়ে যে ঘা হইয়াছিল তাহার দাগ আমরা দেখিয়াছি এবং তাঁহার বাঘা জ্যেঠা নামটাও মনে আছে; কি আমাদের আমলে গ্রামে কোন বাঘের উপদ্রব হয় নাই তবে মাঝে মাঝে জঙ্গল হইতে বন্য শূকর বাহির হইত ঐ জ্যেঠা মহাশয় মোকদ্দমায় তাঁহার জমি হারাইয় আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং বাড়ীর পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন।

দেশে নানা প্রকার আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে দিন কাটিত কিন্তু একটী বিষয় মাঝে মাঝে বেশ ক পাইতে হইত—সেটা ছিল মাথার বেদনা। "আধ কপালে

বা সম্পূর্ণ মাথা যুড়িয়া বেদনা দেখা দিত এবং শরীরও একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিত। 'জবাকুসুম' তেলের তখনও জন্ম হইয়াছে কিনা জানি না। পরবর্ত্তী কালে শিরঃপীড়া উপশমের জন্য আমি এই তেলের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। তোমরা ইহাকে জবাকুসুম তেলের বিজ্ঞাপন মনে করিও না। উহার বিক্রেতারা আমাকে জবাকুসুম তেলের গুণ ব্যাখ্যা করিতে কোন অনুরোধ করেন নাই।

গ্রামে যে সময় সময় পাঠশালার আবির্ভাব হইত তাহা পরিদর্শনের জন্য কোন কোন কর্ত্তৃপক্ষীয় কর্ম্মচারী উপস্থিত হইলে আমারও ডাক পড়িত। একবার এইরূপ পরিদর্শন উপলক্ষে আমি নাকি খুব চটপট সব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম কিন্তু সে উত্তর কেবল হাসিরই উদ্রেক করিয়াছিল—যাহা মুখে আসিতেছিল ঠিক বেঠিক বিবেচনা না করিয়াই নাকি একদিক্ হইতে বলিয়া দিয়াছিলাম।

তখন প্রথম লেখা শিখান হইতে তালপাতায়, একটু বড় হইলে কলাপাতায়। কলাপাতায় হাত না পাকিলে কাগজে লেখার অধিকার জন্মিত না। আমার এক প্রতিবেশী কায়স্থের ছেলে আমার সঙ্গে লেখাপড়া শিখিত। লেখাপড়ায় তাহার যতটুকু মনোযোগ ছিল তাহা অপেক্ষা বেশী ছিল কলাপাতা কাটায়। কলাপাতার তাড়া আমাদের বাড়ীতেই থাকিত, আমি মাঝে মাঝে উহা জঙ্গলে ফেলিয়া দিয়া আসিতাম। খোঁজ, খোঁজ,—যখন জঙ্গলে পাতা পাওয়া যাইত তখন তাহার আনন্দ দেখে কে? আবার লেখাপড়ায় একটু মনোযোগ দেখা দিত।

এইরূপে সুখে দুঃখে কয়েক বৎসর কাটিবার পর চিন্তা উঠিল আমার শিক্ষার কি ব্যবস্থা করা যায়। তখন যেখানে সেখানে এখনকার মত ইংরাজী শেখার ব্যবস্থা ছিল না। পূর্ব্বপুরুষের প্রথামত টোলে পড়ার কথাও উঠিল। কিন্তু তাহার রেওয়াজ তখন চলিয়া যাইতেছে। শেষে আমার এক অপুত্রক জ্যেঠা মহাশয় (পিতার খাসতুত ভাই) আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া পড়াইবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার মফঃস্বলে এক মুন্সেফ কোর্টে চাকরী করিতেন। সেখানে একটী মাইনর স্কুল গড়িয়া উঠিয়াছিল। অনেক কথা-বার্ত্তার পর তাঁহার চাকরীস্থলে যাওয়াই স্থির হইল।

পূজার বন্ধের পর এক শুভদিনে পিতামাতার ও পুকুরের কই মাছের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ীঘর ছাড়িয়া জ্যেঠা মহাশয়ের সঙ্গে রওনা হইলাম। শুভদিনে ঠিক রওনা হইয়াছিলাম কিনা তাহাও স্মরণ নাই, কারণ, শুভদিনে 'যাত্রার' পর ২।১ দিন গৃহান্তরে থাকা যায়,—গ্রহ-নক্ষত্রদিগকে এইভাবে ফাঁকি দেওয়া চলে। তখন আমার বয়স ৮ বৎসর পূর্ণ হইয়া ৭।৮ মাস হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া একেবারে বাংলা দেশের পশ্চিম প্রান্তে! তখন পথ কি দুর্গম ছিল! আমাদের বাড়ীর নিকট বা গন্তব্য স্থানের নিকট রেল ষ্টেশন ছিল না। বাড়ী হইতে স্থলপথে প্রায় ৪০ মাইল গোয়ালন্দ। সে পর্য্যন্ত নৌকা যোগে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বাষ্পীয় যানে কতক দূর আসা চলিত—তাহার পর আবার সুদীর্ঘ পথ গরুর গাড়ীতে। নৌকাপথে চলাচল আমার অভ্যাস ছিল কিন্তু গোযানে চলিতে গেলেই বমি আসিত। লম্বা পথ—মাঝে মাঝে গৃহস্থদের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিতে হইত। সেই মসিনার তেল ও কাঁচা কলাইয়ের ডালের জন্য কৃতজ্ঞ না থাকিলে নিমকহারাম হইতে হইবে।

অবশেষে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। সে কথা আগামী বারে বলিব।

হারাধন বাবুর বাঘ শিকার

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এক যে ছিল বাঘ—

সেই বাঘটাকে শিকার করেছিলেন আমাদের জমিদার হারাধন বাবু। ব্যস্, ওই পর্য্যন্ত। এক বিখ্যাত শিকারীর জীবনেতিহাসের শেষ ওইখানেই। আর হারাধন বাবু বন্দুক ধরেন নি।

কারণটা কি?

তার আগে বরং বলি, কেন তিনি বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলেন। তবেই সব ঘটনাটা সুড় সুড় করে বেরিয়ে আসবে।

ভারতবর্ষকে ব্যাঘ্রহীন করে সমগ্র ভারতকে বিপদ-শূন্য করে চিরস্মরণীয় হবার মতলব যে ক্রোড়পতি হারাধন বাবুর ছিল না সেটা আমি জানি। বন্দুকটা কেনার পর থেকেই কেমন যেন তাঁর একটা ইচ্ছা হচ্ছিল একটা বাঘ শিকার করতে। তার উপর তাঁরই এক আত্মীয় জমিদার শিবনারায়ণ বাবু এরোপ্লেনে কলকাতা থেকে ঢাকায় গিয়ে এক অভিনব ষ্ট্যাড্‌ভেঞ্চার' দেখাবার পর থেকেই বাঘ শিকার করার ইচ্ছাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

শিবনারায়ণ বাবুর সম্মানে একটি সভা ও নেমন্তন্ন করতেই হবে, নয়ত শত্রুপক্ষ গায়ে থুতু দেবে, কিন্তু সমস্ত যশ, গৌরব শিবনারায়ণ বাবু একা নিয়ে যাবেন—এ কি করে তিনি সহ্য করেন? একটা বাঘ শিকার, বাঘের পাশে বন্দুক হাতে হারাধন বাবু, আর একটা ফটো। বাঘের চামড়া—মাথাটা রেখে না হয় শিবনারায়ণ বাবুকে চামড়াটা উপহারই দেওয়া যাবে। তবে সম্মানিত আতিথ হয়ে আসবেন অবশ্য শিবনারায়ণ বাবু। কিন্তু সমস্ত যশ, গৌরব, সম্মান নিয়ে যাবেন হারাধন বাবু।

হারাধন বাবুর জন্যই যেন একেবারে সব ঠিক করা ছিল। তিনি গোপনে দু'টি শিকারী ডেকে ঠিক করে ফেললেন, যদি তাঁরা তাঁকে কোনও রকম বিপদ বা পরিশ্রমের মধ্যে না ফেলে একটা বাঘ শিকার করায় সাহায্য করেন তবে প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা করে দেবেন। বরাতক্রমে পাশের গ্রামেই একটি বাঘের উৎপাতের খবর পাওয়া গেল। বাঘটি অত্যন্ত বুড়ো হয়ে পড়ায় মানুষের সঙ্গে লড়তে আর চায় না, ছোট ছোট গৃহপালিত জন্তু নিয়েই সুখে আছে।

সেই গ্রামের লোকেরাও টাকা পেলে বাঘ শিকারে সাহায্য করতে সম্মত হ'লো। হারাধন বাবুর সম্মতি পেয়ে তারা বাঘের অনুসরণ করে গাছে মাচা বেঁধে সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখলো। একটু দূরে একটা ছাগল বাঁধা হ'লো। হারাধন বাবু বন্দুক নিয়ে মাচায় উঠলেন, পাশে রইলেন বন্ধু হরিসাধন বাবু। শিকারীরা রইলো আর একটি মাচায়।

হরিসাধন বাবু মাচায় ভাল করে বসে বললেন—আমরা একটু বিপদের মধ্যে আছি, নয় কি?

হারাধন বাবু উত্তর দেন—পাগল! বাঘটা এত বুড়ো যে লাফাতেই পারবে না।

তাঁরা চুপ করলেন, বাঘটাও রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল। আশে পাশের ঝোপে গ্রামের লোকেরা লুকিয়ে শিকার করার প্রতীক্ষা করছে, বাঘটি ঘায়েল হলেই তারা বেরিয়ে আসবে। বাঘটি বোধ হয় আক্রমণের আগে গুড়ি মেরে বসলো।

হরিসাধন বাবু বললেন—বোধ হয় বাঘটার অসুখ করেছে!

হারাধন বাবু ফটমট করে তাকালেন।

বাঘটি আস্তে আস্তে এগোতে সুরু করলো। হরিসাধন বাবু বলে উঠলেন—এই সময় গুলিটা চালাও দাও হে। তবে পাঁঠাটা ওর পেটে না গিয়ে আমাদের পেটেই যেতে পারবে।

বন্দুকটা ভীষণ শব্দ করে গর্জ্জে উঠলো। বাঘটা এক ভীষণ গর্জ্জন করে আকাশে লাফিয়ে উঠে মাটিতে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ চীৎকার করে উঠলো গ্রামবাসীরা। বাঘের চারি পা তারা ছেঁকে ধরলো। শিকারীরা নেমে এলেন, হরিসাধন বাবু নেমে এলেন আর বিজয়দৃপ্ত পদে নেমে এলো শিকারী হারাধন বাবু। শিবনারায়ণ বাবুর জয় এবার যাবে তবে!

হরিসাধন বাবুই প্রথম ওটা আবিষ্কার করলেন ছাগলটা মারা গেছে বন্দুকের গুলিতে, কিন্তু বাঘের শরীরে 'কোথাও গুলির চিহ্নমাত্র নেই—বুড়ো বাঘটি হার্টফেল বন্দুকের শব্দে হার্টফেল করেছে! হাসাহাসি সুরু করল গ্রামবাসীরা, হারাধন বাবু, হরিসাধন বাবুকে ইশা করলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরিসাধন বাবু জানালেন—দশ হাজার টাকাতেই রফা হ'লো। দু'শ'জন এসেছিল, প্রত্যেকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে।

হারাধন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কোনও গণ্ডগোল হবে না তো?

না—হরিসাধন বাবু জানালেন।

এইবার আর একবার বন্দুকটা গর্জ্জে উঠলো। হরিসাধন বাবু বললেন—এবারে গুলিটা ঠিক বাঘের গায়েই লেগেছে।

তার পর ফটো তোলা হ'লো। সামনে প্রকাণ্ড বাঘটি, বাঘের পেটের উপর পা রেখে বন্দুক হাতে জমিদার হারাধন বাবু। দুই পাশে হরিসাধন বাবু আর শিকারী দুজন।

নেমন্তন্নটা দেখবার মতই হয়েছিল। মুখ কালি করে শিবনারায়ণ বাবু বাঘের চামড়াটি নিলেন, আর নিলেন শিকারী হারাধন বাবুর ফটো। তাঁর এরোপ্লেন ভ্রমণের প্রশংসা হ'লো না মোটেও, সকলেই বলাবলি করতে লাগলো হারাধন বাবুর বাঘ শিকারের কথা। এরোপ্লেনে চড়ায় এমন কি সাহস লাগে?—টাকা থাকলেই হ'লো—কিন্তু বাঘ শিকার চাট্টিখানি কথা নয়! হারাধন বাবু বিনীতভাবে সে সম্মান গ্রহণ করলেন।

একটু নির্জ্জনে হরিসাধন বাবু হারাধন বাবুকে ডেকে নিয়ে বললেন—ওরা সত্যি কথাটা জানলেই বোধ হয় ভাল হ'তো।

হারাধন বাবু চমকে উঠলেন—তুমি কি বলতে চাও?

হরিসাধন বাবু নিস্পৃহকণ্ঠে বললেন—কিছুই না। বাঘটা যে তুমি শিকার কর নি—এই সত্যি কথাটা সকলে জানলেই ভাল হ'তো। বাঘ শিকার করতে গিয়ে ছাগলটাকেই তো মেরেছ!

রাগে কাঁপতে কাঁপতে হারাধন বাবু বললেন—কেউ বিশ্বাস করবে না।

উত্তর এলো—শিবনারায়ণ বাবু করবেন।

—তুমি কি আমাকে অপদস্থ করতে চাও? ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন হারাধন বাবু।

কিছুক্ষণ হরিসাধন বাবু কোনও কথা বললেন না। তার পর আস্তে আস্তে বললেন—একটা সুন্দর বাড়ী দেখেছি। দাম মাত্র সত্তর হাজার টাকা। টাকাটা যে কোথায় পাই!

হরিসাধন বাবু টাকাও পেলেন, বাড়ীটাও তাঁর হ'লো। শুধু শিকার করা ছাড়লেন হারাধন বাবু। বলেন—বাঘ শিকারে খরচ খণ্ডই বেশী। একটা শিকারেই এক লাখ টাকা! অত খরচ পোষায় না।

হারিয়ে যে যায় ঘুম

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

রোজ সকালে ফুলের বনে
কে যেন ভাই সঙ্গোপনে
আলোর গুঁড়ি ছড়িয়ে বেড়ায়,
মাখিয়ে দে যায় চুম্,
খুঁজতে তারে চোখ হ'তে মোর
হারিয়ে যে যায় ঘুম।

ভর দুপুরে ঠায় দাঁড়িয়ে
গাছপালা সব শির নাড়িয়ে
মন্ত্র পড়ে কার যেন ভাই
উড়িয়ে রোদের ধুম,
খুঁজতে তারে চোখ হতে মোর
হারিয়ে যে যায় ঘুম।

হঠাৎ দেখি রাতের বেলা
এই পৃথিবী করছে খেলা
কার সাথে ভাই চুপটি ক'রে
একলা সে নিরুঝুম,
খুঁজতে তারে চোখ হতে মোর,
হারিয়ে যে যায় ঘুম।

অবাক্ হয়ে ভাবতে থাকি
কাহার সাথে প্রীতির রাখী
রাখছে বেঁধে এই পৃথিবী
স্নেহে সে মরশুম্,
খুঁজতে তারে চোখ হতে মোর
হারিয়ে যে যায় ঘুম।

হকি

শ্রীধীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ

কলিকাতায় এ বছরের হকি মরশুম শেষ হইল। এবারে সব চেয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে পোর্ট কমিশনার্স দল। প্রথম বিভাগের লীগ্ এবং বেটন্ কাপ্ দু'টিরই এবার চ্যাম্পিয়ন্ হইয়াছে তাহারা।

পোর্ট কমিশনার্স দল ১৯৩০ সনে একবার বেটন কাপ্ প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠিয়া কাষ্টমস্‌এর নিকট পরাজিত হইয়াছিল। এবারে তাহারা ফাইনালে বি. এন্. আর দলকে ২-১ গোলে হারাইয়াছে। বি. এন্. আর দল হকিতে দুর্দ্ধর্ষ—পর পর চার বার তাহারা বেটন্ কাপ্ ফাইনালে উঠিবার গৌরব অর্জ্জন করে। এবারের ফাইনালে তাহারা তেমন খেলিতে পারে নাই।

এবারের প্রথম বিভাগের লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্‌শিপ্ লইয়া শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেরূপ প্রতিযোগিতা দেখা গিয়াছে সেরূপ বড় একটা দেখা যায় না। পোর্ট কমিশনার্স রেঞ্জার্স, মোহনবাগান ও গ্রীয়ার এই চার দলের মধ্যে কে যে চ্যাম্পিয়ন্ হইবে বলা কঠিন ছিল। প্রথম দিকের খেলা দেখিয়া অনেকেই মনে করিয়াছিল এবার বিজয়গৌরব মোহনবাগানেরই হইবে। কিন্তু শেষ দিকে পর পর কয়েকটি খেলায় পয়েণ্ট নষ্ট করিয়া তাহারা সকলকে হতাশ করে। শেষ খেলায় গ্রীয়ারের সহিত মোহ বাগান ড্র করায় ঐ দু'টি দলকেই চ্যাম্পিয়ন্‌শিপে প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। পো কমিশনার্স ও রেঞ্জার্স দল শেষ পর্য্যন্ত সমান সংখ্যক পয়ে পাওয়ায় তাহাদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্‌শিপ্ লইয়া আবা একটি খেলা হয় এবং তাহাতে রেঞ্জার্স দল পরাজিত হয়

এবারকার লক্ষ্মীবিলাস কাপ্ প্রতিযোগিতায় বিজ হইয়াছে পার্শী দল—ইষ্ট বেঙ্গল দলকে ফাইনালে ২ গোলে হারাইয়া।

ওদিকে বোম্বাইএ আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতাও শে হইয়াছে। ফাইনালে কল্যাণমল মিল্‌স্ দল ভূপাল ওয়াণ্ডা রার্স দলকে ৪-২ গোলে হারাইয়া চ্যাম্পিয়ন্ হইয়াছে মোহনবাগান দলও এবার আগা খাঁ প্রতিযোগিতা খেলিতে গিয়াছিল। তাহারা কোয়ার্টার ফাইনালে জি. আই. পি. রেল দলের কাছে পরাজিত হইয়াছে অবশ্য দুর্ভাগ্য ক্রমে পরাজিত হইলেও এই খেলাটিতে মোহনবাগান খুব ভালই খেলিয়াছিল এবং দর্শকদে প্রশংসাও লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার আর মূ কি!

মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি-পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত এই পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত গ্রহকেরা পুরস্কার পাবেন :—

যাঁদের বয়স ১৪ বছরের উপরে তাঁদের মধ্যে—শ্রীঅনিলকুমার রায়চৌধুরী (কলিকাতা)। যাঁদের বয়স ১৪ বছর বা তার নীচে তাঁদের মধ্যে—কুমারী রুণু ব (লাহোর)। এঁরা ছাড়া কুমারী অপরাজিতা বরা (দিল্লী শ্রীচিন্ময় ঘোষ (জয়পুর), নূরজাহান বেগম (ঢাকা) ও শ্রীরঞ্জ ব্যানার্জ্জি (কলিকাতা)—এঁদের লেখাও ভাল হয়েছে।

গত বারে তোমাদের বাংলার মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে জানিয়েছিলাম—যে এখানে হয় পুরোপুরি মুসলিম লীগের, নয়তো তাঁদের সঙ্গে কোয়ালিশন ক'রে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। প্রথমটা কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনের চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। ফলে বাংলায় সুরাওয়ার্দ্দি সাহেবের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে তাতে একজন তপশীল শ্রেণীর মন্ত্রী ছাড়া আর সকলেই লীগের দলভুক্ত মুসলমান। হিন্দু—অর্থাৎ সরকারী ভাষায় যাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে বর্ণ হিন্দু'—তাঁদের মধ্যে থেকে একজনও মন্ত্রিসভায় নেই। যে হিন্দু সমাজ শিক্ষায় দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে, এক কথায়—সর্ব্ব দিক্ দিয়ে নব্য বাংলাকে গড়ে তুলেছে তাদের একেবারে বাদ দিয়ে তাদেরই দেশের শাসন পরিচালনা নিতান্ত অদ্ভুত এবং কিছুটা হাস্যকর নয় কি?

* * * *

প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা ভুলাভাই দেশাই আর ইহলোকে নেই। বিশিষ্ট আইনব্যবসায়ী হিসাবে তিনি যেমন সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন, দেশপ্রেমিক হিসাবেও তেমনি তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর। এক সময় তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন, কেন্দ্রীয় আইন সভায় কংগ্রেস দলের নেতা ছিলেন, দেশের কাজে কারাবরণ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য কাজ—আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনজন সেনানায়ক—শা নওয়াজ, ধীলন ও সায়গলের যখন বিচার হয় তখন তা'তে অন্য কয়েকজন আইনব্যবসায়ীর সহযোগে আসামী পক্ষ সমর্থন। এ ব্যাপারে তিনিই তাঁর দলের প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। বিচারে তাঁদের কৃতিত্বের কথা তোমরা শুনেছ। তিনি যে পাণ্ডিত্য, আইন-জ্ঞান ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা অনেক দিন মনে থাকবে।

* * * *

সম্প্রতি রেভারেণ্ড টম্‌সন্ সাহেবের মৃত্যু হয়েছে বিদেশী হয়েও যাঁরা বাংলা দেশকে—বাংলা ভাষাকে ভালবাসতেন তিনি তারই একজন বাংলা ভাষায় তাঁ প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাং ভাষার তিনি ছিলেন প্রধান অধ্যাপক। টম্‌সন্ সাহে রবীন্দ্রনাথেরও একজন বড় ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্র-সাহি সম্বন্ধে তিনি নানা মূল্যবান্ প্রবন্ধ এবং কয়েকখানি ব লিখে গেছেন।

* * * *

ভারতীয় ক্রিকেট দল এ বছর ইংলণ্ডে টেষ্ট ম খেলতে রওনা হয়ে গেছেন, সে খবর হয়তো শুনেছ দলের অধিনায়ক হয়ে গেছেন পাটাউডির নবাব। ই এদেশে ক্রিকেট খেলায় তেমন যোগ না দিলেও এক স ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে করেছিলেন এবং ইংলণ্ডের হয়ে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খে প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। ইংলণ্ডে বিভিন্ন খে ফলাফল তোমরা যথাসময়ে জানতে পারবে।

* * * *

এবারে যে ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংলণ্ডে খে গেছেন তাঁরা বেশ শক্তিশালী। ও-দেশের ক্রীড়ামো তাই এঁদের খেলা দেখার জন্য খুব উৎসাহ প্রকাশ করছে এই উৎসাহীদের মধ্যে ম্যাকিনন্ নামে একটি পুরো খেলোয়াড়ও আছেন। ভদ্রলোকের বয়স এখন ৯৮ বছ প্রায় ৭০ বছর আগে ইনি একবার ইংলণ্ডের অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেষ্ট ম্যাচ খেলে এসেছিলেন।

* * * *

পাণ্ডার নাম শুনেছ? পুরী বা কাশীর পাণ্ডা ন এ পাণ্ডা ভালুক জাতীয় এক রকম প্রাণী—অত্যন্ত দুষ্প্র জীব। পৃথিবীতে এদের সংখ্যা এত কম যে কিছুদিন প হয়তো এদের বংশ পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যা এ হেন একটি পাণ্ডার ছানা সম্প্রতি চীন সরকার বিলা রয়াল জুলজিক্যাল্ সোসাইটিকে উপহার দিয়েছে পাণ্ডাটিকে লণ্ডন চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবার জন্য বি

এরোপ্লেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এতে, যে সব ইংরেজ সামরিক কাজে এদেশে এসে জাহাজ বা এরোপ্লেনে স্থানাভাবের জন্য দেশে ফিরতে পারছেন না তাঁরা, খুব চটে গেছেন। তাঁদের মতে মানুষের চাইতে 'ভালুক-ছানার' আদর বেশী হবে কেন? হোক্ না সে যত্ন দুষ্প্রাপ্য—তবু জানোয়ার তো বটে!

নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

১ম, ২য়, ৩য়—মোট ৩টি পুরস্কার দেওয়া হবে।

বিষয়—একটি ছোট্ট হাসির গল্প, হাসির নাটক বা হাস্যকৌতুক,—সবশুদ্ধ যেন ২০০ শব্দের বেশী না হয়। ১লা আষাঢ়ের (১৩৫৩) মধ্যে লেখা রামধনু কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। রামধনু-সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত ব'লে ধরা হবে। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে প্রতিযোগীর নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নং (নিজের হওয়া চাই) পাঠাতে হবে।

ঝরণা

কুমারী অপরাজিতা বরা (গ্রাহিকা)

ঝর ঝর ঝর ঝর ঝর্ণার জল
থামে নাক' একবার—চলে অবিরল?
এঁকে বেঁকে তার জল যায় ধীরে বয়ে
কুলু কুলু কানে কানে কি কথাটি কয়ে!
চলে যায় বার বার পাথরেতে ঠেকে
হয়ে যাই বিমোহিত দেখে আর দেখে।
কোথায় যে যায় চলে
কাহাকেও নাহি বলে,
চেয়ে চেয়ে ভাবি মনে এমনি করিয়া,
কি মজা—আমিও যদি যেতাম বহিয়া!

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(২) ও (৫) ঠিক। রাম বাবুর অফিসে কাউকে ৫৫ বছরের আগে চাকরী থেকে ছাড়ান হয় না, কিন্তু ৫৫ বছর হলেই যে চাকরী থেকে ছাড়ান হবেই এমন কোন কথা নেই।

উত্তরদাতাদের নাম:—শীলা ঘোষ, (নিউ দিল্লী); মণিকা দেবী (কলিকাতা); সুবোধ রায় (বালীগঞ্জ); রহমৎ ও জাহানারা (ঢাকা); সবিতা ও মণ্টু (এলাহাবাদ); শোভা, অমল, টুকুন ও বুটু (কাশী); অমরজিৎ চট্টোপাধ্যায় (গয়া); নন্দিতা দেবী (লক্ষ্ণৌ); কিশোর-কিশোরী সংঘের সভ্যগণ (কলিকাতা)।

নূতন ধাঁধা

যদু আর মধু বাজারে এসেছে শার্টের কাপড় কিনতে। মধুর চাইতে যদুর কাছে তিন টাকা বেশী আছে। দোকানদার বললে, "আমি কাপড় বেচি বর্গ গজের দরে,—অর্থাৎ এক গজ লম্বা এক গজ চওড়া কাপড়ের এই দাম হবে।"

যদু আর মধু দু'জনেই তাতে রাজি হ'ল এবং প্রত্যেকেই এক এক টুকরো (চৌকো) কাপড় কিনে ফেল্‌ল। দেখা গেল তাদের কাছে যা টাকা ছিল সবই লেগে গেছে, এবং শুধু তাই নয়, যদু যে টুক্‌রোটা কিনেছে সেটা লম্বায় চওড়ার চাইতে ৫ গজ বড়, আর মধুর টুক্‌রোটা যদুর টুক্‌রোর চাইতে লম্বায় ১ গজ বড় কিন্তু চওড়ায় এক গজ ছোট।

তা হ'লে দোকানদার প্রতি বর্গ গজ কাপড়ের জন্য কি দর নিয়েছিল?

—দেশবাসীর এই অনাবিল প্রশংসা আমাদের উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধন করে আসছে এক শতাব্দীর উপর। এর মূলে রয়েছে আমাদের একনিষ্ঠ সাধনা, কারিগরগণের অননুকরণীয় নৈপুণ্য ও তদুপরি আমাদের বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট উপকরণ।

Regd, No C

গহনা ও শাড়ী

শুধু শাড়ী যত সুন্দর হোক,
তা নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ করে না।
শুধু গহণা যত সুন্দর হোক,
তাতে নারী-রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে
ওঠে না।
শাড়ী ও গহণার মিলনেই
নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ হয়।

তাই আমরা—
পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা পরিবেশনের
জন্য নানা প্রকারের বেণারসী শাড়ীর
আয়োজন করেছি—শাড়ীগুলি
বর্ণ-বৈচিত্র্যে, রূপরচনায়
অনিন্দ্যসুন্দর।

আমাদের গহণা—আধুনিক রুচি-
সম্মত শিল্পচাতুর্য্যে, রূপছন্দে
অভিনব।

কুণ্ডু জুয়েলারী ওয়ার্কস

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

আষাঢ়, ১৩৫৩

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ন ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি

কার্য্যালয়: ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্: সাউথ ১২৬

Regd, No C-

গহনা ও শাড়ী

শুধু শাড়ী যত সুন্দর হোক,
তা নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ করে না;
শুধু গহণা যত সুন্দর হোক,
তাতে নারী-রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে
ওঠে না।
শাড়ী ও গহণার মিলনেই
নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ হয়।

তাই আমরা—
পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা পরিবেশনের
জন্য নানা প্রকারের বেণারসী শাড়ীর
আয়োজন করেছি—শাড়ীগুলি
বর্ণ-বৈচিত্র্যে, রূপরচনায়
অনিন্দ্যসুন্দর।

আমাদের গহণা—আধুনিক রুচি-
সম্মত শিল্পচাতুর্য্যে, রূপছন্দে
অভিনব।

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১০ম বর্ষ
৩য় সংখ্যা
আষাঢ়,
১৩৫৩

বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ১৸৹
প্রতি সংখ্যা
।৵৹

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

কার্য্যালয় : ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্ : সাউথ ১২৬

COLOUR PAPE

ডাক্তারের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিংশ শতাব্দীর স্মরণীয় সাহিত্য আহরণ !

স্মরণাতীত কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত শিশু-কিশোর-তরুণদের বিশ্রামের অবসর আনন্দ-মুখর ক'রে তোলবার জন্য সাহিত্যজগতে যাঁরা প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে এসেছেন, সবার আগে তাঁদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে—

যুগমান্য শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ,

শিশু-সাহিত্য সম্রাট

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

— চিত্রবহুল বিরাট পূজাবার্ষিকী —

আকাশদীপ

গত পূজায় '**কলরব**' পেয়ে যাঁরা খুশী হয়েছেন, 'আকাশদীপ' তাঁদের চিত্ত আকর্ষণ করবেই এ-বিশ্বাস আমাদের আছে।

অলকনন্দা-সিরিজ

অতঃপর প'ড়বেন,

শিশু-সাহিত্য সম্রাট **হেমেন্দ্রকুমারের 'সুন্দরবনের রক্তপাগল'**

তারপর প'ড়বেন।

শিশুসাহিত্যাচার্য্য **সৌরীন্দ্রমোহনের 'পথভোলা পথিক'**

১। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
রত্নপুরের যাত্রী

২। শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
"বন্দী, জেগে আছো ?"

৩। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
রীতিমত এ্যাড্‌ভেঞ্চার

৪। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

৫। শ্রীসুমথনাথ ঘোষের
মোহনসিংয়ের ফাঁসি

৬। শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
অভিশপ্ত সম্পদ

শরৎ-সাহিত্য-ভবন * ২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, পোঃ, বক্স ১৬৬১০, কলিকাতা।

এবার পূজায় ছেলেমেয়েদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার

অঞ্জলি

কবিতা
গল্প
উপন্যাস
আমোদ প্রমোদ
খেলাধূলা
রংবেরঙের ছবি

বিরাট ঝকঝকে বই !
ছোটদের আনন্দের খনি !

পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

দেব সাহিত্য কুটীর ★ ২২/৫ বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

নতুন বই

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার

প্রথম গ্রন্থ

দি লাষ্ট্‌ অফ্‌ দি মোহিকান্‌স্‌

মর্ম্মানুবাদ করেছেন—সুলেখক শ্রীঅমলেন্দু সেন

দাম ॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রসা রোড্‌, কলিকাতা

কিশোর-মনের বলিষ্ঠ মাসিকপত্র

কিশোর বাংলা

সম্পাদক—অরূপ

২৫ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছোটদের উপহারের কয়েকখানি ভাল ভাল :

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

ধূমকেতু (রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস)
আবিষ্কারের গল্প (বিখ্যাত অভিযাত্রীদের রোমাঞ্চকর কাহিনী)

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

নূতন পুরাণ (মজার গল্প) ৮
হাস্য ও রহস্য (ঐ) ৮

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি (মজার গল্প)

মনোরঞ্জন ও শিবরামের

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে (মজার গল্প) ৮

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রসা রোড্‌, কলিকাতা

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

—'লক্ষ্মী ঘি'

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৯শ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৫৩ | ৩য় সংখ্যা

ধান্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ধান্য, তুমি রক্ষ জগৎ, পোষণ এবং ভরণ করি,
সবায় তুমি বরণ কর, আজকে তোমায় বরণ করি।
লক্ষ্মী দেবীর তুমিই প্রিয়,
আলো কর সবার গৃহ,
থাকলে ঘরে মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষকে আর কি ডরি?

সোনার বরণ হয় নি কালি, যদিও যুগ দেখলে চারি,
অন্নপ্রাশন দেখলে তুমিই হাস্য মুখে মান্ধাতারি।
যুগে যুগে করলে আলা
কতই অধিবাসের ডালা—
সতীর সাথে পুড়লে তুমি—দিলে সপ্ত সাগর পাড়ি।

পিরামিডের ভিতের তলে আছে তোমার উদ্বোধনী,
চীনের প্রাচীর তোমায় চেনে, চেনে রোমের পান্থিয়নই
ডালে তখন দুল্লতো যারা—
তোমায় দেখে আত্মহারা,
ম্যমীর সাথে থাকতে মোড়া, মন্ত্র জানে সঞ্জীবনী।

ধান্য, জগন্মান্য তুমি—অন্নসত্র তুমিই খোলো,
বুভুক্ষুরে অন্ন দিতে দু'হাত কেন, দশ হাত তোলো।
তুমি দূর্ব্বাদলের সাথে
উঠ হুপের হুপের সাথে,
তুমি ভিন্ন নান্য গতি—স্তুতি আমার সঙ্গে হ'লো।

বিচিত্র ধরণী

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্.এ

এর আগের বারে তোমাদের পৃথিবীর নিবিড় অরণ্য-ভূমির কথা বলেছিলাম। বৃক্ষহীন সমতল প্রান্তরে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হ'লে প্রখর দৃষ্টিশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তি আবশ্যক। কিন্তু ঘন বনে দৃষ্টিশক্তি বেশী দূর চলে না। বড় বড় গাছ হাওয়ার গতি রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে ব'লে ঘ্রাণশক্তিও খুব বেশী সাহায্য করে না। জীবনসংগ্রামের জন্য প্রত্যেক জীবকে এখানে নির্ভর করতে হয় শ্রবণশক্তির উপর। নানা জাতের বানর, টিয়া, কাকাতুয়া প্রভৃতি শুধু যে খুব চেঁচাতে পারে তাই নয়, শ্রবণশক্তিও এদের খুব প্রখর। এই দুই শক্তির সাহায্যে এরা দলছাড়াদের ঘরে ফিরিয়ে আনে এবং নিজেরা বিপদে পড়লে সাহায্যের জন্য অন্যকে ডাকে। এই আবহাওয়াতে পরিপুষ্ট অধিকাংশ প্রাণীর কানের আকারও বড়।

অরণ্যভূমির বাসিন্দা : গেছো বা উড়ুক্কু ব্যাঙ

এই নিবিড় জঙ্গলে মানুষের জীবনও সুখের নয়। গাছের পর গাছ। তাদের অসংখ্য পাতায় সমস্ত বনভূমি আচ্ছন্ন। সূর্য্যের আলো এ সব স্থানে খুব কমই প্রবেশ লাভ করতে পারে। গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠ্‌লে তবে সোনালী আলো এবং নির্ম্মল বায়ু পাওয়া যায়। গাছের তলায় হাঁটলে বোধ হয় কে যেন চক্ষু বেঁধে দিয়ে গোলকধাঁধায় নামিয়ে দিয়েছে। প্রাণের প্রাচুর্য্য এখানে এত অধিক—বৃক্ষ, লতা, তৃণ সবই এত দ্রুত এবং অধিক পরিমাণে বাড়ে যে কি ক'রে জমি পরিষ্কার ক'রে শস্য বুনবে তাই হচ্ছে মানুষের ভাবনা। এই আবহাওয়াতে অসংখ্য পোকামাকড়ের বাস। শস্য বপন করলেও মানুষকে সর্ব্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় কখন এই পতঙ্গকুল শস্য খেয়ে নির্ম্মূল করে দেবে।

অরণ্যভূমির বাসিন্দা : উড়ুক্কু লেমুর

এই সব কারণে,—দক্ষিণ আমেরিকাতেই বলো বা মধ্য আফ্রিকাতেই বলো—যেখানে নিবিড় অরণ্য রয়েছে সেখানে মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হ'তে পারে নি। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির, সাহায্যে এই সব গাছপালা একেবারে নির্ম্মূল করে সেখানে চাষ আবাদ এবং অন্যান্য আবশ্যক কার্য্যাদি করা হয় একমাত্র তা হ'লেই এই জঙ্গল-ভূমি ও তার অধিবাসীদের উন্নতি সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা করা এখনও সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে নি। তবে উষ্ণ দেশগুলির যে সব স্থানে জলবায়ু এতটা স্যাঁতস্যেতে নয় এবং যেখানে কোনও প্রাকৃতিক কারণে বৃক্ষলতার এত অধিক প্রাচুর্য্য ঘটে নি সে সমস্ত স্থানে মানুষ অনেকটা কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ

যবদ্বীপের উল্লেখ করতে পারি। দ্বীপটি আকারে ণ্ডের চেয়েও বড়। জঙ্গল তত ঘন নয়। এই র অবস্থিতি বাণিজ্যের অনুকূল ব'লে এখানে চাল, , রবার এবং নানা রকম ফলের চাষ দিন দিন ড় চলেছে। এদেশের জনসংখ্যাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি চ্ছে।

এ ধরণের আবহাওয়া কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের জীবন ধারণের ক্ষ অধিকতর উপযোগী। এ আবহাওয়াতে সূর্য-ু অতি উগ্র। প্রখর সূর্য্যালোক শরীরে প্রবেশ লে কুফল হওয়া সম্ভব। কৃষ্ণচর্ম্ম দেহকে এই অনিষ্টের ত থেকে রক্ষা করে থাকে। এ জন্যে এই জলবায়ুতে সব মানুষের বাস তাদের দেহবর্ণ হয় কালো, নয় মাটে। এদের অধিকাংশেরই নাকের ছিদ্র প্রশস্ত। ন্তস্বরূপ নিগ্রো এবং দক্ষিণ আমেরিকার রেড্ ওয়ানদের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রশস্ত নাসা-দ্রের সাহায্যে এরা সহজে এবং দ্রুত প্রচুর বায়ু ফুসে টেনে নিতে পারে। শীতের দেশের বাসিন্দা স্কিমো এবং উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের কের ছেঁদা কিন্তু অনেক সরু। বাতাস তাদের ফুস্-স পৌঁছতে অনেকটা সময় নেয় এবং ইতিমধ্যে টু গরম হ'য়েও যায়। তা না হ'লে হয়তো ঠাণ্ডা গে এদের অধিকাংশ মরেই যেতো। আবার নিগ্রো প্রভৃতি কৃষ্ণাঙ্গদের দেহে ঘর্ম্ম-নিঃসরণের যে ব্যবস্থা রয়েছে শ্বেতাঙ্গ এবং পীতাঙ্গ মানুষের শরীরে তা নেই। ঘাম কালো লোকের শরীরকে শীতল করে রেখে তাকে এই আবহাওয়া সহ্য করবার ক্ষমতা দিয়েছে।

কল্পনা-রথে পৃথিবী ভ্রমণ করা গেল। দেখা গেল উদ্ভিদ্ পশু এবং মানব প্রত্যেকেই বিভিন্ন আবহাওয়া অনুসারে বিভিন্নভাবে নিজেকে জীবন ধারণের উপযোগী ক'রে তুলেছে। যখনই কোন দেশের জলবায়ুর কথা আমরা জানতে পারি তখনই আমরা অনুমান করে নিই সে দেশের উদ্ভিদ্, পশু এবং মানুষের সংখ্যা বেশী না কম, তারা কি ভাবে জীবন যাপন করে এবং তাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য কোথায়।

বিজ্ঞান আমাদের যতটুকু শিখিয়েছে তাতে আমরা জানতে পেরেছি যে সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে অদ্ভুত এক সামঞ্জস্য বর্ত্তমান; জগতে যা কিছু ঘটছে তার পশ্চাতে একটা সন্তোষজনক কারণও আছে। কারণ ছাড়া পৃথিবীর কোথাও কোন কার্য ঘটছে না। তবু সৃষ্টিরহস্য আমাদের কাছে অজ্ঞাত। আমরা যেটুকু জানি সেটুকু অতি অল্প। জানবার আমাদের বহু—বহু বাকী। তাই বিজ্ঞানী যখন নতুন কিছুর সন্ধান পান তখন একটি আবিষ্কার বহু রহস্যের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করে। হয়তো তিনি মনে মনে ভাবেন—"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু চিনি!"

দুঃখ জয়ের মন্ত্র

শ্রীসুকুমার দে সরকার

এই পৃথিবী মাথা নীচু করেছিল; দিগ্বিজয় শেষ হয়ে গেছে, উদ্ধত যৌবনের নেশায় পড়েছে ভাঁটা, রাজকুমার ইন্দ্রসেন ভাবছিলেন। সসাগরা পৃথিবী আজ তাঁর পদানত। সমুদ্রের পাগলা হাওয়ার মত তাঁর ঘোড়া মকরকেতুর ক্ষুরের ধূলোয় আজ ছেয়েছে পৃথিবী। কি ছেয়েছে? ছেয়েছে কি মানুষের দুঃখ? অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রকে জয় করেছেন তিনি, মানুষকে কি জয় করেছেন? বিদেশী চাষা কি বিজাত বিজেতাকে অকারণ তার চাষের ফসল তুলে দিতে বিধাতার কাছে নীরবে জানায় না তার দুঃখ? নাঃ, এ দিগ্বিজয় বোধ হয় নয়। নতুন করে জয় করতে হবে পৃথিবীকে—যে পৃথিবী শুধু মাটি আর জল নয়, যে পৃথিবী মানুষের পৃথিবী, মানুষের মন। আনতে হবে দুঃখ জয়ের মন্ত্র। দুঃখ-জয়? তারি মন্ত্র? কোথায়—কোথায় পাওয়া যাবে সে মন্ত্র?

সেদিন ভোরের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ ইন্দ্রসেন মন স্থির করে ফেললেন। আকাশে তখন রূপালী উষার লাজুক আভাস। ইন্দ্রসেন নিঃশব্দে এসে ঘোড়ায় চাপলেন। মকরকেতু চিঁহি-রবে তার মনের আনন্দ জানিয়ে দিল। আবার বুঝি সেই বিজয়ের উন্মাদনা, সেই গতি!

TIGHT BINDING

সমুদ্রের পাগলা ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল পৃথিবীর কোলে; ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলল মকরকেতু। দেখতে দেখতে ছাড়িয়ে গেল কত মাঠ, কত ঘাট, লোকালয়। দেখতে দেখতে সূর্য্যের সোনালী আলোয় হেসে উঠল পৃথিবীর মুখ। ইন্দ্রসেনের ঘোড়া তখনও—তখনও ছুটেছে দুরন্ত নিরুদ্দেশ। দুঃখ জয়ের মন্ত্র! কোথায় সে? কার কাছে পাওয়া যায়?

হঠাৎ ইন্দ্রসেনের মনে হ'ল এত তীব্র গতিতে কেন—কেন চলেছেন তিনি? আর ত' সেই যুদ্ধ জয়ের তীব্র গতির প্রয়োজন নেই! মকরকেতুর গতি সংযত করলেন তিনি। বল্গা ছেড়ে দিলেন। ধীর পায়ে চলল ঘোড়া।

আর সেই যেন পৃথিবীকে দেখবার অবসর পেলেন তিনি। পৃথিবী এতদিন তাঁর কাছে ছিল একটা মানচিত্র—যাকে তিনি ঘূর্ণি হাওয়ার মত উড়ে পড়ে রক্তে রাঙা ছুপিয়ে নিয়েছিলেন। আজ সেই পৃথিবীর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করলেন তাকে। দূরে আকাশের নীলিমায় আর ধরণীর শ্যামলিমায় মিশে ধোঁয়াটে ঝিম ঝিম। ধ্যানগম্ভীর পর্ব্বতরাজি যেন আকাশের পটে অদৃশ্য শিল্পীর রহস্য-লেখা। মকরকেতু দুলকি চালে চলতে লাগল। ইন্দ্রসেনের হাত দু'টো শিথিল পাশে ঝুলে আছে। দূর নদীতে সাদা পাল তোলা একটা নৌকো পাড়ি দিয়েছে। হঠাৎ ইন্দ্রসেন কোষ থেকে তরোয়ালখানা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মাথার শিরস্ত্রাণও তরোয়ালের পেছু নিল। ঈশ্বরের স্নিগ্ধ বাতাস মাথা জুড়িয়ে দিল। তেপান্তরের মাঠ মায়ামধুর আবাহন ক'রল নিরুদ্দেশ রাজকুমারের উদ্দেশে।

ঘোড়া চলেছে, চলেছে। পার হয়ে মাঠ ঘাট। পথে একটা দলের সঙ্গে দেখা। একজন বণিক্, তার অনুচরবর্গ দ্রব্যসম্ভার নিয়ে বাণিজ্য করতে চলেছে।

ইন্দ্রসেন দেখলেন, প্রহরীবেষ্টিত চতুর্দ্দোলায় বসে একজন বিশাল-বপু লোক। চাঁদের মত গোল মুখের ওপর তার প্রকাণ্ড একজোড়া ঝুলে পড়া গোঁফ। গোঁফের ডগাগুলো যেন ইঁদুরে কেটে দিয়েছে। চতুর্দ্দোলার পেছনে ঘোড়া আর গাধার পিঠে দ্রব্যসম্ভার। দেখতে দেখতে দলটা ইন্দ্রসেনের পাশাপাশি এসে পড়ল।

রাজকুমার ইন্দ্রসেনের সুকান্ত মূর্ত্তি আর তাতে রৌদ্র-তপ্ত স্বেদবিন্দু দেখে বণিক্ মুরুব্বিয়ানা স্বরে প্রশ্ন করলেন, "পথিক, চলেছ কোথায়?"

"উদ্দেশ নেই"—ইন্দ্রসেন উত্তর দিলেন। "আপনি কে?"

"গোবিন্দমাণিক্য শ্রেষ্ঠিকে জান না? তুমি কোথাকার লোক হে!"

"ও! আপনিই?" তার পরে একটু থেমে ইন্দ্রসেন বললেন, "আপনি ত' দেশ বিদেশ ভ্রমণ করেছেন; বহু অভিজ্ঞতা আপনার, আপনার কাছে উপদেশ পেতে পারি?"

"হুঁ! পারই ত'!"

"আমি চলেছি এক মন্ত্রের সন্ধানে। কোথায়, কার কাছে দুঃখ জয়ের মন্ত্র পাওয়া যাবে জানেন?"

শ্রেষ্ঠি হো হো করে হেসে উঠল। "দুঃখ-জয়ের মন্ত্র! অদ্ভুত তোমার উদ্দেশ্য ত' হে! কিন্তু খুব সহজ। সে মন্ত্র তুমি আমার কাছেই পাবে।"

"আপনার কাছে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার কাছে। অভিজ্ঞতায় চুল পাকিয়ে ফেললাম আর এই সামান্য খবরটুকু দিতে পারি নে! দুঃখ জয়ের একমাত্র মন্ত্র হ'ল—ধন, অর্থ, সম্পদ্! অর্থ থাকলেই দুঃখকে জয় করা যায়। যার অর্থ নেই তার আছে কি?—দুঃখ। এ ত' সোজা কথা।" শ্রেষ্ঠি হেসে উঠল।

ইন্দ্রসেন বললেন, "কিন্তু আপনার ত' অনেক আছে, তবুও আপনি আবার এই কষ্ট সহ্য করে আরও ধনের আশায় চলেছেন! এত ধন নিয়ে করবেন কি?"

"তুমি একটি নির্ব্বোধ।" শ্রেষ্ঠি বলে উঠল। "মহারাজ ইন্দ্রসেনের নাম শুনেছ? তাঁরও অনেক রাজ্য, তবু তিনি রাজ্য জয় করে বেড়ান। কেন?"

ইন্দ্রসেন ঠোঁট কামড়ালেন, "কিন্তু এত ধন সংগ্রহ করে আপনার লাভ? দরকারের অতিরিক্ত দিয়ে প্রয়োজন?"

"জানি না, কিন্তু ভাল লাগে। অনেক—অনেক ধন সংগ্রহ করার এক প্রচুর আনন্দ। বলতে পার, এত রাজ্য নিয়ে মহারাজ ইন্দ্রসেন কি করবেন?"

"মহারাজ ইন্দ্রসেন ভুল করেছেন।"

"বাচাল যুবক! তুমি দেখছি ইন্দ্রসেনের মনের কথা জেনে নিয়েছ! আমার কাছে, তাই রক্ষে। মহারাজ ইন্দ্রসেনের কানে গেলে ঘাড়ে মাথাটি থাকবে না জান?"

"ইন্দ্রসেন অকারণ হত্যা করেন না। নিজের মত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা সকলের থাকা উচিত।"

"তুমি দেখছি আমার চেয়েও বেশী জান! অকারণ হত্যা করেন না ইন্দ্রসেন? শত শত সৈনিক তাঁর অকারণ আক্রমণে নিহত হচ্ছে। শেখো শেখো যুবক বন্ধু, আমার মত পক্বকেশ বৃদ্ধের কাছে জেনে নাও। তোমার ভাগ্য ভাল যে এত সহজেই ঠিক জায়গায় এসে পড়েছ। ধনই দুঃখ জয়ের ক্ষমতা। আজকের দিনটা আমার সঙ্গে থেকে যাও, আমি তোমাকে দেখাব অর্থের অপরিমেয় সুখ দেবার শক্তি।"

ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে নেমে এল উদাস রাঙা সন্ধ্যা। পৃথিবী রূপ বদলাতে লাগল। নদীর ধারে মাঠের ওপর শ্রেষ্ঠি গোবিন্দমাণিক্যের তাঁবু পড়ল। রাত নেমে আসছে। শ্রেষ্ঠির তাঁবুতে বিলাসিতার চূড়ান্ত।

"কি হে বন্ধু!" শ্রেষ্ঠি দাঁত খুঁটতে খুঁটতে প্রশ্ন করল, "এই আরাম ধন ছাড়া আর কিসে দিতে পারে?"

ইন্দ্রসেন কোন জবাব দিলেন না।

রাত বাড়তে লাগল। খাওয়ার সময়। উপাদেয় চর্ব্য, চোষ্য লেহ্য পেয় সব আসতে লাগল।

"কি বন্ধু, কেমন? কখনও খেয়েছ এ সব? এত সুখ ধন ছাড়া কিসে? দুঃখের ছাপ এর মধ্যে কোথাও পাও?"

ইন্দ্রসেনের মনে দ্বিধা। তাই ত', রক্তপাত না ক'রে যদি শান্তি নিয়েই মানুষ ধন সংগ্রহ করে ব্যবসায় বাণিজ্যে—তা হলে ধনেই কি দুঃখ জয় করতে পারে? ধনেই কি আছে দুঃখ জয়ের মন্ত্র?

এদিকে গাঢ় হয়ে আসতে লাগল রাত। আর শ্রেষ্ঠির মেদবহুল বপুতে কেমন একটা ক্লান্ত শিথিলতা আসতে লাগল। খাওয়ার শেষ দিকটায় ইন্দ্রসেন দেখলেন যে শ্রেষ্ঠি আর মন দিয়ে খাচ্ছে না, কেমন যেন অনিমনা হয়ে গেছে, চুপ করে বসে গোঁফের ডগাগুলো কুট্ কুট্ ক'রে কামড়াচ্ছে।

"আপনি যে কিছু খাচ্ছেন না শ্রেষ্ঠি!" ইন্দ্রসেন বলে উঠলেন।

"হ, একটু চিন্তায় পড়ে গেছি বন্ধু!"

"কিসের চিন্তা শ্রেষ্ঠি?"

"এই রাতটাকে ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেছিলেন বলতে পার বন্ধু?"

"সারা দিনের কাজের ক্লান্তি হরণের জন্য, বিশ্রামের জন্য।"

"না, না, এই রাতটাকে আমার ভাল লাগে না।" দিনের পর রাত আসে, পৃথিবীর বুকে কে যেন ভয়ের কালো যবনিকা টেনে দেয়! বিশ্রাম? বিশ্রাম কোথায় বন্ধু? রাত আর কালো ভয়ে চোখের ঘুম আমার হরে নিয়ে যায়!"

"ভয়! ভয় কিসের?"

"ধনের বন্ধু, ধনের! দস্যুর—তস্করের। সঙ্গে এত ধন-সম্পদ্ নিয়ে রাতে আমার ঘুম হয় না। মনে হয় ওই বুঝি এল চোর, এল দস্যু! সর্ব্বস্ব লুঠে নিয়ে গেল বুঝি বা!"

ইন্দ্রসেনের চোখ বিস্ফারিত হ'ল। "এত ধন নিয়েও তা হলে আপনার সুখ নেই! ধন থাকা সত্ত্বেও সামান্য চোরের ভয়ে আপনি ভীত?"

"সে তুমি বুঝবে না বন্ধু!"

"তা হলে ধনেরও ত' দুঃখ জয়ের শক্তি নেই! ধনও পারে না এ দুঃখ দূর করতে?"

"না না। কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। পৃথিবীতে আমার বন্ধু নেই। এই ধর না, তুমিই যদি দস্যু হও! তুমিই যদি রাতে আমাকে মেরে রেখে লুঠ ক'রে পালাও!"

ইন্দ্রসেন হাসলেন। "সামান্য চোরও দেখছি আপনার

চেয়ে সুখী! যাক্, আপনার ভয় নেই, আমি বিদায় নিলাম। দুঃখ জয়ের মন্ত্র আপনার কাছে নেই, আপনি নিজেই বড় দুঃখী।"

রাজকুমার ইন্দ্রসেন বেরিয়ে এসে আবার মকরকেতু পিঠে চাপলেন। মাথায় একফালি পাণ্ডুর চাঁদ আর সামনে পথ,—আবছা, মায়াময়, মধুর।

স্মৃতির পটে

ঠাকুরদাদার আত্মকাহিনী

২

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
('রামধনু'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক)

একটা কথা বলিতে ভুল হইয়াছে। সেকালে পূজা-পার্ব্বণ, ব্রত নিয়ম খুব বেশী প্রচলিত ছিল। আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামে অনেক বাড়ীতেই দুর্গাপূজা হইত। তাহাতে আমাদের বয়সের ছেলেরা আনন্দও পাইত প্রচুর। পূজার অনেক দিন পূর্ব্বেই 'দেউড়ী' অর্থাৎ কুম্ভকার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে আসিত। খড় দিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ, একমেটে, দোমেটে প্রভৃতি বাড়ীর উপরই হইত। রং লাগাইত কখনও কুমার, কখনও অন্য 'লোক, আর সাজ বসাইত গ্রামের লোক নিজ হাতে। পূজার কয় দিন নৈবেদ্য নৌকায় করিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে বিতরণ করা হইত। আমাদের 'বড় মনা' ছিল পাঁঠা কাটায় সিদ্ধহস্ত; কিন্তু একবার তাহার হাতে কি অন্য কাহারও হাতে, মনে নাই— আমাদের বাড়ীতে 'পাঁঠা ঠেকিয়া' গেল অর্থাৎ এক কোপে কাটা গেল না। 'মা' গ্রহণ করিলেন না— ভয়ে সবাই ব্যাকুল। মায়ের প্রসন্নতা লাভের জন্য মানত করা হইল, অবশ্য অতিরিক্ত পাঁঠা কবুল করিয়া। বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে দলে দলে তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায়ের লোক 'খেউড়' গাহিতে আসিত। নবমীর খেউড়ের একটা বদনাম আছে। কিন্তু আমি এই খেউড় গানে অশ্লীলতার কোন ভাঁজ পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ পড়ে না। খেউড় গানের বিনিময়ে পূজা প্রাঙ্গণে যে কলা, নারিকেল, বাতাবি লেবু প্রভৃতি সাময়িক ফল টাঙ্গাইয়া রাখা হইত তাহার কিছু অংশ পাইলেই উহারা খুসী হইয়া যাইত। বিসর্জ্জনের দিন যেরূপ ধূমধাম হইত তাহা বোধ হয় আর ফিরিয়া আসিবে না। নৌকায় করিয়া প্রতিমা তোলা হইত এবং অনেক সময়ে তাহা আড়ংএ লইয়া যাওয়া হইত। আড়ং—যেখানে নদীবক্ষে বহু প্রতিমা আসিয়া বিসর্জ্জনের জন্য একত্র হইত, কাহার নৌকা আগে যাইবে তাহার প্রতিযোগিতা চলিত, 'বাইচ' খেলা হইত। 'বাইচএর' নৌকা তোমরা কখন দেখিয়াছ কি? ঐ এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত নৌকা, পাশে কম, লম্বায় খুব বড়, দুইধারে হয়ত এক শত লোক 'বৈঠা' হাতে করিয়া উহা অন্য নৌকার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া চালাইত। বলা বাহুল্য, এইরূপ নৌকা নির্ম্মাণ ঘরে অন্ন-বস্ত্রের মত থাকিলে চলিতে পারে না। কোন ক্রমে বিবাদ বাধিয়া এই সকল "বৈঠা" অস্ত্রের কাজ করিত। বিসর্জ্জনের পর গৃহে প্রত্যাগমন, প্রণাম, কোলাকুলি ও মিষ্ট বিতরণ।

এই পূজায় না হউক, উৎসবে পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানেরা বেশ আন্তরিকতার সহিতই যোগ দিত। মুসলমান স্ত্রীলোকেরা দলে দলে প্রতিমা দেখিতে আসিত। বাহুল্য তখনও পাকিস্থানের জিগির উঠে নাই। ঐ মুসলমান রাজত্ব বাঙ্গালীর এই জাতীয় উৎসব যে নির্ব্বি করিয়া দেয় নাই আমার বাল্যকালের অবস্থাই তাহা প্রমাণ।

গ্রাম ছাড়িয়া লেখাপড়া শিখিবার জন্য গন্তব্য স্থানে যখন প্রথম বার পৌছিলাম তখন স্থানটী অবশ্যই কোন. কোন বিষয়ে নূতন রকমের মনে হইতে লাগিল। 'ছোট মনার' যে শক্তিশালী প্রচণ্ড কুঠারে কাঠ খণ্ড খণ্ড হইতে দেখিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে মুসলমান মজুরের হাতে সরু বাঁশের বাঁটযুক্ত ক্ষুদ্র কুঠার দেখিলাম। রাস্তাঘাট আমাদের গ্রামের তুলনায় বেশ ভালই ছিল—বাজার, ডাকঘর, পুলিশের ফাঁড়ি প্রভৃতি সভ্যতার কোন কোন অঙ্গ এখানে মিলিল। মিঠাইওয়ালারও অভাব ছিল না। মাইনর স্কুলটী এক খড়ের বাংলোয়, মুন্সেফ কোর্টটীও তাহাই। তবে সে বাংলো ছিল খুব প্রকাণ্ড। কোন ইমারত এখানেও দেখিলাম না। উকিল, আমলা, হাকিম—সবাই খড়ের ঘরে বাস করিতেন।

আমি মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। গ্রামে যাহা কিছু শিখিয়াছিলাম তাহা অগ্রাহ্য করিয়া মাষ্টার বা পণ্ডিত মহাশয় আমাকে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ধরাইলেন। কিন্তু সে কয় দিনের জন্য? কিছু বিদ্যা ত' পেটে ছিল। 'প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, শিশু-শিক্ষা তৃতীয় ভাগ, বোধোদয় প্রভৃতি চটপট শেষ হইয়া গেল। ভাল ছেলে বলিয়া আমার নামও পড়িয়া গেল।

এদিকে ডাণ্ডাগুলি খেলিতে শিখিলাম। শিয়ালমারি নামে যে এক কেদারবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ছিল সেখানে দল বাঁধিয়া সাঁতার কাটিতে বড়ই ভাল লাগিত। সাঁতার ত' অভ্যস্তই ছিল। প্রাতঃকৃত্যের খানিকটা মাঠেই সারিতে হইত; কিন্তু ও বালাই আমার কমই ছিল। সপ্তাহে বড় জোর একবার। এখন বুঝি, কেন আমার এত মাথা ধরিত। সারা পাঠ্যাবস্থায় এবং পরবর্ত্তী জীবনেও অনেক দিন পর্য্যন্ত এই পীড়া আমাকে অনেক সময় দারুণ কষ্ট দিয়াছে।

স্কুলে সহপাঠীদের সহিত ক্রীড়াকৌতুক যথেষ্ট চলিত কিন্তু উচ্চারণ-বৈষম্যের দরুণ আমার নাম হইয়া গেল 'বাঙ্গাল'। এই 'বাঙ্গাল' পাঠ্যপুস্তকের কয়েক স্তর একা একা শেষ করিয়া যখন নিয়মিত ক্লাসে অন্য ছাত্রদের সহিত পড়িতে লাগিল তখন সে শিক্ষক মহাশয়গণের স্নেহদৃষ্টিতেই পড়িল। স্থানীয় মুন্সেফ বাবুও বেশ আদর করিতেন।

গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন বাড়ী যাইতাম তখন সেই পোকা-ধরা আম ভালই লাগিত কিন্তু যেখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিতাম সেটা ছিল একটা রীতিমত আমের জায়গা। গাড়াতে গাড়াতে আম বিক্রী হইত। আর মুরশিদাবাদের আমের একটা খ্যাতিও আছে।

গ্রামে লুকাইয়া তাস খেলা অভ্যাস করিয়াছিলাম, সে দোষটা এখানেও লোপ পায় নাই। অবশ্য এখানে স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে। আবার সন্ধ্যার পর বৃদ্ধদের কাছে বসিয়া দাবা খেলাও কতকটা শিখিয়া ফেলিলাম। তোমাদিগকে ইহার অনুকরণ করিতে বলি না।

ক্রমে আমার ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করিবার সময় আসিল। বাড়ী হইতে উপনয়নের ডাক আসিল। কিন্তু বাল্যকালে নাম্মামা'র সংশ্রবে কি না কি পেটে গিয়াছে—একবার গঙ্গাস্নান দ্বারা পেটটা শুদ্ধ করিয়া লইবার ব্যবস্থা হইল। গরুর গাড়ীতে করিয়া গঙ্গাতীরে বহরমপুরে যাত্রা করিলাম—রাস্তায় সেই বমি। বহরমপুরে আমার জ্যেঠা মহাশয়ের এক বন্ধুর বাসায় কয়েক দিন অবস্থান করিলাম এবং গঙ্গাজলে পেট ও নাড়ী শুদ্ধ করিয়া লইলাম। ফিরিয়া 'বড় মনা'র সঙ্গে বাড়ী গিয়া গলায় যজ্ঞসূত্র পরিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলাম। রীতিমত এগার দিন ঘরে বন্দী থাকিতে হইয়াছিল—হবিষ্যান্ন ও ফলমূল ছিল আহার্য্য।

যথাসময়ে আজিমগঞ্জে ফিরিয়া মাইনর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। (মাইনর স্কুলটী এই স্থানেই, ডাকঘরের নাম ছিল ডোমকল, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নামে)। ইতিপূর্ব্বে এই স্কুল হইতে কেহ কেহ মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু তৃতীয় বিভাগের উপরে স্থান পায় নাই। আমার উপর শিক্ষক মহাশয়দিগের একটু বেশী আশা ভরসা ছিল। প্রায় ৪ বৎসর তাঁহাদের শিক্ষাধীন থাকিয়া পরীক্ষা দিবার জন্য যথাসময়ে বহরমপুর রওনা হইলাম এবং সেখানে জ্যেঠা মহাশয়ের অপর এক বন্ধুর বাসায় আশ্রয় লইলাম। পরীক্ষার কয় দিন এক রকমে কাটিয়া গেল। সেই ছেলেবেলা

যে গ্রাম্য স্কুল পরিদর্শকের প্রশ্নের উত্তরে যা তা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম মাইনর পরীক্ষায় ভূগোলের কোন প্রশ্নে তাহার পুনরভিনয় হইল, কিন্তু মোটের উপর শিক্ষক মহাশয়দিগকে নিরাশ করিলাম না। একদিন (বোধ হয় ইংরাজী পরীক্ষার দিন) একাদশীর উপবাস করিয়া পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলাম শুনিয়া হেড মাষ্টার মহাশয় বিরক্তি প্রকাশ করিলেন—কিন্তু পরীক্ষা বেশী কি ধর্ম্ম বেশী? আমি যে তখন উপনয়নের পর ব্রহ্মচারী!

পরীক্ষা দিয়া আজিমগঞ্জে ফিরিলাম এবং সেখান হইতে পূজা উপলক্ষে বাড়ী আসিলাম। এবার আর জ্যেঠা মহাশয়ের সঙ্গে আজিমগঞ্জে ফিরিলাম না, দুর্বুদ্ধি বশতঃ বাড়ীতে থাকিয়া গেলাম এবং দেশের বিবিধ মাছ ও খেজুর গাছের রসের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলাম। আমাদের গ্রাম মোটের উপর অস্বাস্থ্যকর ছিল না কিন্তু কে জানে কোন্ কর্ম্মফলে আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিল! শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইলেও ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও জ্ঞাতসারে জ্বরে ভুগি নাই। গ্রামের ডাক্তার দাদা (ইনি এখনও জীবিত এবং ইহার পৌত্র মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তার) নানা আকারে কুইনিন পরিবেশন করিতে লাগিলেন, কবিরাজ মহাশয় নাটার বীজ, শেফালিকার বড়ি, আরও তাঁহার ভাণ্ডারের কত কি খাওয়াইলেন কিন্তু সে জ্ব একেবারে ছাড়িয়া যাইতে রীতিমত অস্বীকার করিল, একবার ছাড়ে, আবার কয়েক দিন পরেই আসিয়া দে দেয়—মাসের পর মাস এইরূপে চাপিয়া রহিল।

মাইনর পরীক্ষার ফল বাহির হইল। মুরশিদাবা জেলায় একমাত্র আমিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম, এণ্ট্রেন্স স্কুলে পড়ার জন্য আমার একটা সরকারী বৃ যুটিবে ইহা স্পষ্টই বোঝা গেল, আর এই রূপ বৃত্তি যুটিলে তখনকার নিয়মানুসারে কোন সরকারী স্কুলে ছাত্রবেতন লাগিবে না। তবে একটু সন্দেহ রহিল ইংরাজীতে নম্ব সম্বন্ধে। ইংরাজীতে প্রশ্নপত্রটী কিছু কঠিন হইয়াছিল— উহাতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর না পাইলে আমার বৃ মাসিক ৪৲ (ছাত্রবৃত্তির মত) হইত। কিন্তু ইংরাজী আমার নম্বর একটু উপরেই উঠিয়াছিল—আমার বৃত্তিই বরাদ্দ হইল। বহরমপুরে গিয়া এণ্ট্রেন্স স্কু ভর্ত্তি হওয়ার জন্য আমি আবার আজিমগঞ্জ আসিলা —এবারে কাহার সঙ্গে মনে নাই, তবে ম্যালেরিয়া কৃপায় আসিতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

আজ এই পর্য্যন্তই।

ইন্দোচীনের রাহুমুক্তি

শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী

সেদিনের চীন আজকের মত ছিল না। এসিয়ার বুক যুড়ে ছিল তার দাপট! বর্ম্মার ওপরে তখন উড়ত চীনের পতাকা। ইন্দোচীনে শাসন করত চীনের রাজ-প্রতিনিধি। শীতের সাইবেরিয়ার প্রান্ত থেকে ভারতের সীমা ছুঁয়ে ছিল চীন-সম্রাটের সাম্রাজ্য—কত বড় আর কি বিরাট!

চিরদিন কারুর সমান যায় না। তাই যুগ যুগান্তের চীন সাম্রাজ্যে দেখা দিয়েছিল ফাটল। দেশ বিদেশের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ গিয়েছিল থেমে। কালাপানি পেরোনই ছিল মহাপাপ। এদিকে ইউরোপে তখন মহা হুলস্থূল। যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়েছে হাজারো রকমের। জাহাজের ডগায় লাল, নীল হরেক রকমের পতাকা উড়িয়ে ইংরাজ, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ আর ফরা ব্যবসায়ীরা এ সমুদ্র সে সমুদ্রে ঘুরছে ফিরছে। সুবিধা পেলেই লুঠতরাজে তারা সিদ্ধহস্ত! নিরীহ চীনা মাঝিমাল্লা প্রাণের ভয়ে সমুদ্রে ডিঙি ভাসাতেই ভরসা পেত না।

চীনের তখন দুরবস্থা—ঠিক যেন বুড়ো বাতের রো নড়তে চড়তে পারে না—গাঁটে গাঁটে ব্যথা করে, হাত টনটন করে—পাশ ফিরতে কষ্ট হয়।

এমন ভাল শিকারের লোভ কেউ ছাড়তে পারে ইংরাজ, ফরাসী, আর সবাই তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছি চীনের বুকে। ছিঁড়েকুড়ে কেড়ে নিয়েছিল ব্রহ্মদে আর ইন্দোচীনকে।

ফরাসীদের অধীনে এসে ইন্দোচীনের জীবনের ধা

ল বদলে। পদে পদে বাধা আর নিষেধ। সবুজে ভরা ছিল দেশ—ধানে ভরা ক্ষেত-খামার। নিরীহ আপনভোলা ইন্দোচীনারা কায়ক্লেশে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা নির্বাহ করত। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের নিশ্বাসে সব পুড়ে খাক হয়ে গেল।

ফরাসী শাসনের রূপই ছিল আলাদা। সবার উপরে থাকতেন গভর্ণর জেনারেল, তাঁকে সাহায্য করার জন্য নামে মাত্র এক শাসন পরিষদ্ ছিল। আমাদের দেশের ব্যবস্থা-পরিষদ্‌গুলোর কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তাদের অধিকারের কোন ক্ষমতাই নেই সভ্যদের। লাট সাহেব যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। ইন্দোচীনেও ফরাসী এমনি নামে মাত্র পরিষদ্ সৃষ্টি করেছিল। সেই পরিষদের সভ্য ছিলেন ২৪ জন। কোটি কোটি লোকের ভাগ্য ছিল শুধু ২৪ জন সভ্য আর গভর্ণর জেনারেলের উপর। এই ২৪ জন সভ্যও সাধারণতঃ ফরাসীর খাঁ ছাড়া কেউ হতে পারতেন না।

ফ্রান্সের আছে নানা কারখানা, আর ইন্দোচীনে হয় ঘাসবাস। পৃথিবীর কারখানা চালাতে হলে চাই কয়লা, লোহার,—আরও হাজারো ধাতু! চাই চাল, গম, ভুট্টা—এই সব কল-কারখানার লক্ষ লক্ষ মানুষের পেট ভরাতে।

ইন্দোচীন দখল করেই ফরাসীদের লক্ষ্য হ'ল সমস্ত ইন্দোচীনে যত খাদ্যশস্য জন্মে—মাটির নীচে যত ধাতু আছে তা সব ফ্রান্সে এনে কল-কারখানা চালানো।

ইন্দোচীনের লোক যাতে নিজের দেশের অবস্থা বুঝতে পারে তার জন্যই বা কত চেষ্টা! দেশে লেখাপড়া শেখানোর কোন বন্দোবস্তই করে নি তাঁরা। কত শত গোয়েন্দা ঘুরে বেড়াত রাজনীতির সন্ধানে।

কিন্তু এত করলে কি হবে? স্বাধীনতা হারিয়ে জন্তুর মত থাকতে কে চায় বল? স্বদেশের মুক্তির জন্য বীরের প্রাণ করে ছটফট। এমনি লোক ছিলেন ইন্দোচীনে বহু। তাঁদের প্রথম বিপ্লবের চেষ্টা হয়েছিল ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে! কিন্তু কামান, গোলা-বারুদ, যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে কত দিন আর তারা খালি হাতে যুদ্ধ করে! অবশেষে হার মানতেই হয়েছিল!

ফ্রান্সের কিন্তু দেশ জয়ের ক্ষিদে এততেও মেটে নি। তারা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আনাম প্রদেশ জয় করেছিল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গুয়েন থিয়েন যুয়াট নামে একজন বিপ্লবীর নেতৃত্বে আনামীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল। সে বিদ্রোহও সফল হয় নি।

তার পরে চলেছিল একটানা কুড়ি বছর ধরে ফরাসীদের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রাম। হোয়াং হোয়াথাম ছিলেন সে মুক্তি-আন্দোলনের নেতা। রূপকথার মত শোনায় তাঁর জীবনী। প্রতি মুহূর্ত্তে মরণের সঙ্গে সংগ্রাম করেও তিনি এক দিনের জন্য কর্ত্তব্যচ্যুত হন নি। ইন্দোচীনের ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল সে আহ্বান। শত শত তরুণ গিলোটিনে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। প্রতি পদে তাঁরা পেয়েছিলেন ব্যর্থতা—তবু হতাশ হন নি কেউ! তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জলছিল সবাইকার মনে সে আগুনের শিখা!

এমনি সময় রুশ জাপান যুদ্ধের পরে এশিয়ায় দেখা দিয়েছিল নব জাগরণ! ভারতে তখন চলছে স্বদেশীর জোয়ার। ইন্দোচীনের দেশপ্রেমীরাও নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—সে দেশের "জিজিয়া" কর বন্ধের আন্দোলনে। জাতীয় অপমানের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এবারও ব্যর্থ হ'ল জাতীয়তার অভিযান। বন্দুক আর বেয়নেটের খোঁচায় সে আন্দোলন ডুবিয়ে দিয়েছিল ফ্রান্স।

বেশীদিন তাদের অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৯১৪ সনে শুরু হয়েছিল বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধ। পৃথিবীর বহু পরাধীন জাতিই নতুন উদ্যমে আর একবার চেষ্টা করেছিল মুক্তির জন্য। ইন্দোচীনও পিছিয়ে ছিল না। এবারের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন খুদে রাজন্যরাও। ভারতেরই মত কতগুলো "স্বাধীন রাজ্য" ছিল ইন্দোচীনে। তারাও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ায় আন্দোলনের তীব্রতাও গিয়েছিল অনেক বেড়ে। প্রিন্স পুই থান ছিলেন সে বিদ্রোহের নেতা। চার বছর অবিশ্রাম আন্দোলন চলবার পর—আবার সাম্রাজ্যবাদীদেরই হয়েছিল জয়। কিন্তু এতগুলো আন্দোলনের ধাক্কায় ইন্দোচীনের সাধারণ

TIGHT BINDING

লোকও সচেতন হয়ে উঠেছিল। তাই শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল ফ্রান্সকে।

সে প্রতিশ্রুতি অবশ্য তারা রাখে নি—আর কেই বা তা রাখে বল? ইংরাজও সেই যুদ্ধের পর শাসন-সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—অথচ কাজে আমরা কি পেয়েছিলাম? জালিয়ানওয়ালা বাগ এবং রাওলাট আইন।

এবার ইন্দোচীনের মুক্তি-যুদ্ধের নেতৃত্ব এসে পড়েছিল নবীনদের হাতে। এবারে আর পুরানো ঢংএ মুক্তি আন্দোলন চালানো হয় নি। সুগঠিত সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী দুটি দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। "নবীন আনাম" আর "বিপ্লবী আনামী যুবসংঘ"। ইন্দোচীন, দক্ষিণ চীন ও ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবী দলের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের উপর চিরকালই ইন্দোচীনের লক্ষ্য ছিল। তাই বিপ্লবের গতি ও পরিণতি নিয়ে ইন্দোচীনের নেতা ডুয়ং ভ্যান গিউ ১৯২৭ সনে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সঙ্গে বহু আলাপ আলোচনা করেছিলেন। ১৯২৯ সনের কংগ্রেস অধিবেশনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভেতরে জন্ম হয়েছিল চাষী-মজুরের রাজত্ব সোভিয়েটের। তখন থেকেই পৃথিবীময় বিপ্লবীদের পথ প্রদর্শকও ছিল সেই সোভিয়েট। দেশের লক্ষ লক্ষ চাষী আর মজুরের মুক্তি না হলে যে স্বাধীনতার কোন দামই থাকতে পারে না এ কথা বুঝতে আরম্ভ করেছিল সব দেশের তরুণরা। ইন্দোচীনেও সোভিয়েট বিপ্লবের ঢেউ এসে লেগেছিল যথা সময়ে। তাই ১৯৩০ সনে সে দেশে স্থাপিত হয়েছিল চাষী-মজুরের কমিউনিষ্ট দল।

এই আন্দোলন অঙ্কুরেই নাশ করবার জন্য ফ্রান্সের শাসনকর্ত্তারা চেষ্টার ত্রুটী করেন নি। কিন্তু তা করলে কি হবে, গোপনে গোপনে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ইন্দোচীনে। যে কৃষাণরা এতদিন নির্বিবাদে শোষিত হয়ে এসেছে—তারা আর শোষণের সুযোগ দিতে নারাজ। বহু গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিষাণ সমিতি। ১৯৩১-৩৪ সনের মধ্যে সারা দেশ টলমল করেছিল কিষাণ আন্দোলনের জোয়ারে।

গত যুদ্ধের পর একদিকে ইন্দোচীনে যেমন আ[ন্দো]লনের মোড় ফিরে গিয়েছিল—তেমনি ফ্রান্সেও [শ্র]মজুরের ভেতর এসেছিল নব চেতনা। ফ্রা[ন্সে] কমিউনিষ্ট দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইন্দোচীনের দা[বী] সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট দল। [১৯৩৬] সনে তাদেরই নেতৃত্বে সব প্রগতিশীল রাজনৈতিক [দল] এক হয়ে ফ্রান্স শাসন করত। ফ্রান্সের সে যুগকে [বলা] হয় 'পপুলার ফ্রন্টের' শাসন। তখন ইন্দোচীনের [স্বা]আন্দোলনের উপর থেকে অনেক বাধা নিষেধ সরি[য়ে] দেওয়া হয়েছিল। আগে মজুরদের দাবী আদায় করা[র] জন্যে ইন্দোচীনে কোনও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধি[কার] ছিল না। 'পপুলার ফ্রন্টের শাসনে ইন্দোচীনে [ট্রে]ড ইউনিয়ন স্থাপিত হয়েছিল। ফ্রান্সের পপুলার [ফ্রন্ট] আয়ু বেশি দিন ছিল না। কাজেই পপুলার [ফ্রন্ট] ভেঙ্গে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দোচীনের মজুর ও চাষী[দের] স্বাধীনতার সংগ্রামে ভাঁটা পড়েছিল।

ভাঁটা পড়লেও আন্দোলন কিন্তু থামে নি মোটে[র] শাসক শ্রেণী বেশ বুঝতে পারছিলেন যে তাঁদের [দি]ফুরিয়ে আসছে। যারা চিরদিন চাবুক খেয়েছে—[মু]রা-টি করে নি—তারাই যে এখন নিজের দাবী স[ম্বন্ধে] সচেতন হয়ে উঠেছিল! শুধু ইন্দোচীনেই তো না[—] ফ্রান্সের বুকেও প্রগতিশীল আন্দোলন সব দমন [করা] হয়েছিল। ফ্যাসিষ্টপন্থা শাসকরা তখন ফ্রান্সের ভা[গ্য] দেশকে শোষণই করেছেন তাঁরা, ভবিষ্যৎ বিপদের বি[রু]তৈরী করেন নি তাকে এতটুকুও। ফলে ১৯৪০ [সা]যুদ্ধের গোড়ার দিকেই হিটলার ফ্রান্স দখল করে নি[তে] ছিলেন।

হিটলারের বন্ধু ছিল জাপান। ইতালী, জাপান [ও] জার্মানীর ভেতর ছিল গোপন চুক্তি। তাতে ফ্রা[ন্সের] পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জাপান এগিয়ে এসেছিল ই[ন্দো]চীনে। ফ্রান্সের পতাকার বদলে ইন্দোচীনে উ[ড়ল] জাপানী পতাকা।

কিন্তু ইন্দোচীনের তরুণ-তরুণী, চাষী-মজুর এতদি[নে] শিক্ষা ভোলে নি। তারা কেউই জাপানকে মুক্তি[দা]ব'লে অভ্যর্থনা করতে এগোয় নি। দেশের য[ত]

রাজনৈতিক দল মিলে জাপানী শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। প্রতিরোধ আন্দোলন হ'ল দিন দিন শক্তি-শালী। ১৯৪১ সনে এঁরা এক পতাকার তলে যোগ দিয়ে "স্বাধীনতা সঙ্ঘ" গড়ে তুলেছিলেন। তিন বছর অবিশ্রান্ত ভাবে গোপন আন্দোলন চালাবার পরে ১৯৪৪ সনে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই বিদ্রোহের ঘোষণা বাণী থেকে কিছুটা শোনাচ্ছি তোমাদের।

ঘোষণা বাণীর প্রথমেই আছে স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস। কি করে ১৮৬২ থেকে আনামীরা মুক্তি আন্দোলনের জন্যে জীবন পণ সংগ্রাম করেছে তারই গৌরবময় কাহিনী প্রাণে উদ্দীপনা সঞ্চার করে।

তার পরেই আছে স্বাধীন ইন্দোচীনের গঠনতন্ত্রের খসড়া। দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ভোটে নির্ব্বাচিত একটি গণপরিষদ্ গঠন করা হবে। সেই পরিষদ্ই ইন্দোচীনের গণতন্ত্র রচনা করবে। প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনতা স্বীকার করা হবে তা'তে।

ইন্দোচীনে যত ভিন্ন ভিন্ন ছোট বড় জাতি আছে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী মেনে নেবে স্বাধীন সরকার। আত্মনিয়ন্ত্রণ শব্দটির মানে বোঝা হয়ত প্রথমে কঠিন হবে তোমাদের। এর মূল কথা হচ্ছে যে একই জাতির যে সমস্ত লোক কোন বিশেষ অঞ্চলে বসবাস করে তাদের নিজেদের ভাষা, সাহিত্য, জীবনযাত্রা-প্রণালীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা দরকার। জোর করে অন্য অঞ্চলের সঙ্গে তাদের যুক্ত করলে জাতির পরিপূর্ণ উন্নতি কখনই হতে পারে না। যত ছোটই হোক না কেন—প্রত্যেক জাতিরই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নিজেদের উন্নতির অধিকার আছে। সেজন্যই নতুন যুগের যত বিপ্লবী শাসনতন্ত্র রচিত হচ্ছে তাঁদের প্রত্যেকটিতেই ছোট বড় সব জাতিরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে। এ দাবীর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, জাতিরা ইচ্ছে করলে নিজেরা স্বাধীন দেশ গড়ে তুলতে পারে।

বিপ্লব সফল করাবার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দরকার। কৃষক সভা, মজুরদের ইউনিয়ন, তরুণ সঙ্ঘ এ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দেশ সংগঠন করতে হবে। সেই সংগঠনের লক্ষ্য হবে সশস্ত্র বিপ্লব। তাদের সাহায্য করবার জন্য দেশের প্রতি গ্রামে ও সহরে গড়ে তুলতে হবে গেরিলা বাহিনী।

তার পরে বিশ্বের বিপ্লবী শক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে ঘোষণা বাণীতে।

"আমাদের দেশের কথা জগতের কম লোকই শুনেছে। আমাদের পক্ষে প্রচার করুন আপনাদের দেশে।"—এই হচ্ছে সে ঘোষণার শেষ পঙ্‌ক্তি।

ইউরোপে তখন জার্মানী পরাজয়ের মুখে। ইতালী পরাজিত। জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণ ক্রমশঃই শক্তিশালী হচ্ছে। এ সুযোগে স্বাধীনতা সঙ্ঘ দেশে নিজেদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের একতা যাতে নষ্ট হতে না পারে সে জন্য ইন্দোচীনের কমিউনিষ্টরা নিজেদের দল ভেঙে দিয়ে একসঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতেন।

তারপর জাপান পরাজিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীনতা সঙ্ঘের নেতারা "অস্থায়ী শাসন পরিষদ্" প্রতিষ্ঠা করে ইন্দোচীন শাসনের ভার নিজেদের হাতে নিয়েছিলেন। জাপানী সেনারা দলে দলে আত্মসমর্পণ করেছিল অস্থায়ী সরকারের কাছে।

কিন্তু হিটলারের কবল থেকে মুক্তি পেলেও ফ্রান্সে তখনো আগের যুগেরই শাসকদের ক্ষমতা ছিল বেশি। তাঁরা কেউ চান নি যে ইন্দোচীন সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়। কাজেই ইংল্যাণ্ডের সহযোগিতায় ফ্রান্সের শাসনকর্ত্তারা ইন্দোচীনের মুক্তি আন্দোলন দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সফল হন নি। গত সাধারণ নির্বাচনে ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট দলই আবার সব চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়েছে। তারা আর সোশ্যা-লিষ্টরা মিলে অন্য সব দলের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হওয়ায় ইন্দোচীনের লোকের বুকে এবার ভরসা এসেছে।

এই নতুন ফ্রান্সের শাসনকর্ত্তারা সবাই ইন্দোচীনকে স্বাধীন বন্ধুর মত দেখতে চান। তাই ইন্দোচীনের নেতাদের সঙ্গে তাঁদের নানা আলাপ আলোচনা চলছে।

দান-বীর

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

দাশু খুড়ো বেজায় কৃপণ, মাঝেরগাঁয়ে বাড়ী,
সবাই বলে নামটি নিলে ফাটে ভাতের হাঁড়ি।
সেদিন ভোরে বাড়ীতে তার নতুন বেয়াই এলো,
দেখেই তারে দাশু খুড়োর বুক শুকিয়ে গেলো।
কি আর করে, কুটুম মানুষ, যত্ন করা চাই,
কৃপণ হলেও এ সব সময় অন্য উপায় নাই।
যা হোক যখন দুপুর বেলা খাবার সময় এলো,
দাশু খুড়ো বেয়াই নিয়ে খাবার ঘরে গেলো।
অনেক সময় বসার পরে এলো ভাতের থালা,
তরকারী নেই,—একটু কেবল আলুভাতের দলা।
কি আর করে, ক্ষিদের চোটে তাহাই মেখে ভাতে
নতুন বেয়াই ধীরে ধীরে করলে সুরু খেতে।
অন্য কিছু রান্না হতে হয়ত দেরী হবে,
একটু করে খায় আর শুধু মনে মনে ভাবে।

এমনি করে অনেকখানি সময় গেল কেটে
বুঝলে বেয়াই অন্য কিছুর নেইকো আশা মোটে।
আলুভাতেই মেখে ভাতে নতুন বেয়াই তাই
তাড়াতাড়ি লাগলো খেতে, পেট তো ভরা চাই!
কোথায় ছিল দাশু খুড়ো, দৌড়ে এসে বলে,
'তাড়াতাড়ি ক'রো না ভাই, আনছে তেঁতুল গুলে।'
রাগতে মানা—কুটুম্ববাড়ী, বেয়াই বলে, 'ভাই,
কুটুম হলেও ব্যয়ের সীমা একটা থাকা চাই!
সিদ্ধ আলু, ভাত প্রভৃতির এমন আয়োজন,
এর ওপরেও তেঁতুল গোলা!—কীই বা প্রয়োজন?'
দাশু বলে, 'এমনি স্বভাব বলবো তোমায় কি—
এমনি ভাবেই খাইয়ে খাইয়ে ফতুর হয়েছি।
শাস্ত্রে আছে স্বভাব তো ভাই, যায় না গেলেও মরে,
অমন ক'রে বলো না ভাই, লজ্জা আমার করে।'

একলব্য

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

(হস্তিনাপুর। রাজকুমারদের ক্রীড়াভূমি। পদচারণ-রত দ্রোণাচার্য।)

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

দ্রোণ। কে, অশ্বত্থামা? এখানে কেন?

অশ্বত্থামা। পিতা, এখানে আপনার কাছে আসা কি আমার অন্যায় হয়েছে? আপনি যদি বিরক্ত হয়ে থাকেন, আমি তা'হলে গৃহেই ফিরে যাই!

দ্রোণ। অবুঝ হয়ো না, অশ্বত্থামা! এখানে তোমার অভিমান সাজে না। জান ত' এইখানে আমি রাজ-কুমারদের অস্ত্রশিক্ষা দেবার জন্য বেতন ভোগ করি। এখন আমি রাজভৃত্য। এই প্রত্যুষে তোমাকে যদি রাজপরিবারের কেউ এখানে দেখে, তা হলে আমায় সন্দেহ করবে। ভাববে, গোপনে আমি নিজ পুত্রকে অস্ত্রশিক্ষা দিই, রাজকুমারদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য পাল[ন] করি না। দুর্যোধন এ কথা জানতে পারলে আমা[র] অপমান পর্যন্ত করতে পারে। তুমি এখন গৃহে যা[ও]; রাজকুমারদের আসবার সময় হয়েছে।

অশ্বত্থামা। তা হলে আমার অস্ত্রশিক্ষার কি হ[বে] পিতা? হস্তিনাপুরে আসার পর থেকে আপনার কা[ছে] আমি কতটুকু থাকতে পাই? তাতে আমার কি শি[ক্ষা] হবে? এই ক্রীড়াভূমিতে, রাজপরিবারে আর না[না] রাজপুরুষদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে আপনার সা[রা] দিন চলে যায়! আমাকে শিক্ষা দেবার মতন অব[কাশ] এখন আপনার কোথায়? তাই এখানে, এই প্রত্যু[ষে] উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু এখানেও আপনার অসুবিধ[া]... আমার শিক্ষার আশা তা হলে জলাঞ্জলি দেব! তা[ই] হোক, অপরে আপনার বিদ্যার অধিকারী হয়ে অপা[র]

[খ]্যাতি লাভ করুক। আর সকলে বলুক, মূর্খ, [অপদ]ার্থ অশ্বত্থামা—আচার্যের অযোগ্য সন্তান!

দ্রোণ। না, না, না, বৎস, সে আমি কোন দিন চাই [না।] তোমার অপযশ শেল হয়ে আমার বুকে বাজবে। [তোম]ার অস্ত্রশিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখব এ কথা স্বপ্নেও ভেব [না।] তুমি হবে অর্জ্জুনের সমকক্ষ বীর। কিন্তু তোমার [শিক্ষ]ার স্থান এখানে নয়। গোপনে, গৃহভূমিতে [তোম]ায় অস্ত্রশস্ত্রের কৌশল শিক্ষা দেব। কেউ জানবে [না,] সন্দেহও করবে না—কত বড় শক্তিধর হবে [অশ্ব]ত্থামা!

অশ্বত্থামা। পিতা, যদি অনুমতি দেন ত' বলি। সর্ব্বদা এই ভয়, সঙ্কোচ, নিষেধ, অনুশাসনে ঘেরা এই [...]-পরিবেশে আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। এখানে [...] স্বার্থের সংঘাত আর স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্ত। শান্তির [লেশ]মাত্র আশাও এখানে নেই। আর আমাদের একমাত্র [কর্ত্ত]ব্য, দিবারাত্র রাজকুলের মনোরঞ্জন! আপন [পুত্র]কে পর্যন্ত প্রকাশ্যে শিক্ষাদানের আপনার স্বাধীনতা [নেই]! পিতা, অহর্নিশ এই গ্লানিময় জীবন আমার অসহ্য [হয়ে] উঠেছে। আর এই রাজ-অনুগ্রহে কাজ নেই। এ [ঐশ্ব]র্যের চেয়ে সেই আমাদের কুটীরের দরিদ্র, শান্তিময় [জীব]ন অনেক ভাল। সেই নিরালা কুটীর-প্রাঙ্গণে [আব]ার ফিরে যাই চলুন। আবার সেখানে আপনার [পদ]তলে বসে ধনুর্বেদ শিক্ষা করি। পিতা, সে দারিদ্র্যও [এর চেয়ে] আমাদের শত গুণে ভাল।

দ্রোণ। অশ্বত্থামা, তুমি এখনো অতি সরল, অতি [অ]বোধ! সংসারের বহু শিক্ষাই এখনো তোমার বাকী [আ]ছে। নিতান্ত নির্বোধ ভিন্ন কেউ দারিদ্র্যের মধ্যে শান্তি [পে]তে পারে না। দারিদ্র্যে উন্নতির সমস্ত পথ রুদ্ধ করে, [মনুষ্য]ত্ব নষ্ট করে। সারা জগতের চোখে দরিদ্র ব্যক্তি [হীন], অবজ্ঞাত, মূল্যহীন! শৌর্য, বীরত্বের কোন সম্মান [নে]ই, যদি না তার সঙ্গে যুক্ত থাকে সম্পদ্। আমি তো [এক]দিন অনন্যমনা হয়ে দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়ে শুধু [জ্ঞা]নের সাধনা করেছিলাম। ঐশ্বর্য, বৈভব, প্রতিপত্তি—[সব]ই ছিল আমার কাছে তুচ্ছ। তাই জগৎও এত দিন [উপেক্ষা] করেছিল আমাকে। মূঢ় আমি, পূর্বে এ কথা কখনো [ভাবি] নি। সরল হৃদয়ে দ্রুপদ রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে গিয়েছিলেম। দ্রুপদের সেই ক্রূর হাসি এখনো আমায় কশাঘাত করে—'দরিদ্র ব্রাহ্মণ! সখ্য হয় সমানে সমানে।' সেইদিন থেকে আমার চৈতন্য হয়েছে—আমি শুরু করেছি আত্ম-প্রতিষ্ঠার, ক্ষমতা লাভের সাধনা—দ্রুপদের সমকক্ষ হবার সাধনা। তার জন্য আমি যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত। যে ভাবেই হোক, ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধনের বিশ্বাস আমায় অর্জন করতে হবে।

অশ্বত্থামা। ওই দুর্বিনীত দুর্যোধনকে মেনে নিতে হবে?

দ্রোণ। উপায় কি? আমার দৃঢ় ধারণা—ছলে, বলে, কৌশলে দুর্যোধনই হবে কুরুরাজ্যের অধীশ্বর। ধৃতরাষ্ট্রেরও তাই গোপন বাসনা। দুর্যোধনের সঙ্গে, সদ্ভাব আমায় রাখতেই হবে। ওই অর্জুন আসছে, তুমি এখনি এ স্থান পরিত্যাগ কর।

(অশ্বত্থামার প্রস্থান)

(অর্জুনের প্রবেশ)

এস, এস, তৃতীয় পাণ্ডব!

অর্জুন। গুরুদেব, আজ আমার উপস্থিত হ'তে কিছু বিলম্ব হয়েছে। আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন।

দ্রোণ। বৎস, তোমার গুরুভক্তিতে এবং অস্ত্রশিক্ষার সাধনায় আমি পরম প্রীত। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তুমি ভুবনবিজয়ী বীর হও।

অর্জুন। আপনার কৃপা হ'লে আমি অবশ্যই তা হ'তে পারব গুরুদেব! অতি ভাগ্যবলে আপনাকে গুরু রূপে পেয়েছি। আপনার শুভাশীষই আমার কাছে সব চেয়ে বড়। আশীর্বাদ করুন, যেন আপনার নামে পরিচয় দিতে পারি।

দ্রোণ। নিয়তই আমি তোমায় অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করি বৎস! তুমি আমার প্রিয়তম শিষ্য। তোমা হ'তেই আমার মুখ উজ্জ্বল হবে। তোমার ওপর আমার সে বিশ্বাস আছে, অর্জুন! কিন্তু কথায় কথায় বেলা বেড়ে চলেছে। আর নয়, এবার অস্ত্রাভ্যাস শুরু কর। আর শোন। আমি স্থির করেছি, আজ তোমায় বরুণাস্ত্রের প্রয়োগ-কৌশল শিক্ষা দেব।

অর্জুন। আমার প্রতি আপনার অশেষ কৃপা গুরুদেব! আজ্ঞা করুন।

(দুর্যোধনের প্রবেশ)

দুর্যোধন। এই যে, অর্জুন, এরি মধ্যে ধনুক নিয়ে শুরু করে দিয়েছ! রাতে কি তোমরা ঘুমাও না? গুরুদেব, কত প্রত্যুষে আপনার শিক্ষাদান আরম্ভ হয়? আমি শত চেষ্টাতেও কোন দিন যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারি না। আমি অতি দুর্ভাগ্য।

দ্রোণ। অনুতাপ ক'রো না দুর্যোধন, আজ তুমি যথাসময়েই এসেছ। এখনও আমি অর্জুনকে কোন অস্ত্রশিক্ষাই দিই নি।

দুর্যোধন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি আচার্যদেব, আপনি অর্জুনকে ধনুক হাতে কি বলছিলেন। আপনি নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত অস্ত্রের কথা বোঝাচ্ছিলেন অর্জুনকে।

দ্রোণ। দুর্যোধন। অমন উত্তেজিত হয়ে উঠো না। আমার কথা শোন। আমি মিথ্যা বলছি না।

দুর্যোধন। আপনি আমার কাছে গোপন করছেন। আপনি আমাদের সকলেরই আচার্য, কিন্তু অর্জুনের প্রতি আপনার অত্যন্ত পক্ষপাতিত্ব দেখি। আপনি অর্জুনকেই শিক্ষা দিন আমি যাই।

দ্রোণ। সে কি কথা দুর্যোধন! তোমরা সবাই আমার কাছে সমান। কারো ওপরেই আমার পক্ষপাতিত্ব নেই। তোমার মনে যদি কোন সন্দেহ হয়ে থাকে, তা হলে আরো সকালে এস, অর্জুনের সঙ্গে একত্রে তোমাকেও শিক্ষা দেব।

অর্জুন। আমাকে বৃথা ঈর্ষা না ক'রে তা-ই কর না দুর্যোধন!

দুর্যোধন। থাক থাক্, তোমার উপদেশে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি চলি, তুমি যত পার শেখ। (প্রস্থান)

দ্রোণ। দুর্যোধন, শোন, শোন।

অর্জুন। ও আজ আর ফিরবে না গুরুদেব!

দ্রোণ। দেখ ত', কি কুটিল মন ওর! এখনি গিয়ে অন্ধ রাজার কানে কি শোনাবে, কে জানে! কিন্তু তুমি লক্ষ্য করেছ অর্জুন, আসলে দুর্যোধন আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয় নি, তোমাকেই ও মনে মনে হিংসা করে।

অর্জুন। তা আমি জানি গুরুদেব!

(একলব্যের প্রবেশ)

দ্রোণ। (একলব্যের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে —কে তুই?

একলব্য। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন দেব! আপনি কি গুরু দ্রোণাচার্য?

দ্রোণ। হ্যাঁ, কিন্তু তুই কে? এখানে তোর প্রয়োজনই বা কি?

একলব্য। আমি নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য। আপনার শিষ্যত্ব লাভে জীবন ধন্য করতে এসেছি গুরুদেব!

দ্রোণ। ঘৃণ্য নিষাদ কুলে জন্মলাভ ক'রে আমার শিষ্য হ'তে এসেছিস! এত বড় স্পর্দ্ধা তোর? যদি মঙ্গল চাস এখনি দূর হয়ে যা। তোর ছায়াস্পর্শে আমার আত্মা কলুষিত হবে। দূর হ, দূর হ!

একলব্য। কৃপা করুন দেব। এমন করে দাসকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। বহু দূর থেকে বড় আশা ক আপনার কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে এসেছি। পিতা, মা সাথী, পরিজন সকলের স্নেহ ছিন্ন করে এই সুদূর এসেছি শুধু আপনারই অনুগ্রহ লাভের আশায়। আ অনুমতি দিন দেব, দূর থেকেই আমি শিক্ষা নে কোন দিন আপনার কাছে আসব না, আমার ছায়া ক'রে কখনো আপনাকে অপবিত্র হ'তে হবে না। কোন দিন আপনার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করব না। আপন কোন আর্য-শিষ্যের চেয়ে আমি হীনতর হব না ভক্তিতে। আপনার দয়া ভিক্ষা পেলে আপনার উপ শিষ্য আমি হ'তে পারব গুরুদেব!

দ্রোণ। থাম্, থাম্, বাচাল চণ্ডাল! বার বার সম্বোধনে আর আমার জাতি-ধর্ম কলঙ্কিত করিস দ্রোণাচার্য কখনো নরকের কীটদের অস্ত্রশিক্ষা দেয় না।

একলব্য। দেব, আমি চিরদিন কীটেরই মতন নীচ করে থাকব। আমি আপনার দাসানুদাস। আপন জন্যে আমি সর্ব্বস্ব বিসর্জন দিয়ে এসেছি—(অগ্রসর হ —শ্রীচরণের আশ্রয় থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না প্র

দ্রোণ। ওরে ধৃষ্ট অনার্য বর্ব্বর! শ্রীচরণে এত সাধ—এই নিয়ে যা—(পদাঘাতে উদ্যত)—না, না, ক্রোধে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি। অস্পৃশ্য চণ্ডা স্পর্শে যে আমার অনন্ত নরকবাস ঘটবে! এ কি উৎপাত! অর্জুন, এই নীচ সংস্পর্শ থেকে আমার মর্যাদা রক্ষা কর বৎস!

অর্জুন। এ মূর্খের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা গুরুদেব! অনুমতি দেন ত' এই ঘৃণিত পাপাত্মাকে সমুচিত শাস্তি দিই। না হয় আসুন, আমরা এস্থান পরিত্যাগ করি।

দ্রোণ। সেই ভাল। এ অশুচির সঙ্গ ত্যাগ করাই ভাল। (অর্জুন ও দ্রোণাচার্যের প্রস্থান)

একলব্য। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন! হায়, কেন এই হেয় জ্ঞান? অনার্য কি মানুষ নয়? আমার গুরুভক্তি কি অর্জুনের চেয়ে কম? যদি গুরুদেবের কাছে অস্ত্রশিক্ষার সুযোগ পাই—আমি কি তা হ'লে অর্জুনের সমকক্ষ বীর হ'তে পারি না? দ্রোণাচার্য আজ আমায় প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু আমার গুরুভক্তি যদি মিথ্যা না হয় ত' তাঁর চিত্ত আমি একদিন জয় করবই। আজ থেকে তাই হবে আমার একান্ত সাধনা। (ক্রমশঃ)

একটি নতুন আবিষ্কার

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

তোমরা অনেকেই হয়তো ক্যানিউট রাজার গল্প শুনেছ! ক্যানিউট্ ছিলেন বৃটেনের রাজা। মস্ত বড় রাজা। কিন্তু হ'লে কি হয়, তাঁর চার পাশে জুটেছিল কতকগুলি চাটুকার। সব সময়ে তারা কারণে অকারণে তাঁর খোসামোদ করত। একদিন তারা বল্‌ল, 'আমাদের রাজা যা বলবেন তাই হবে; তিনি যদি সমুদ্রকে ডেকে হুকুম করেন তবে সমুদ্রকেও তাঁর হুকুম মানতে হবে।' ক্যানিউট রাজার এত খোসামোদ ভাল লাগত না। তিনি ঠিক করলেন, এই সব চটুকারদের জব্দ করতে হবে। তাঁর আদেশে তাঁর সিংহাসন নিয়ে সমুদ্রের ধারে বসান হ'ল। ক্যানিউট্ সিংহাসনে ব'সে সমুদ্রকে ডেকে বললেন, "সমুদ্র, তুমি তফাৎ যাও, আমার হুকুম।" কিন্তু মুহূর্ত্তে সমুদ্রের ঢেউ এসে তাঁর পা এবং সিংহাসন ভিজিয়ে দিল, তাঁর হুকুম মোটেই মানল না। জলকে কথা মানাবার ক্ষমতা অত বড় রাজারও ছিল না।

কিন্তু ক্যানিউট্ রাজা যা পারেন নি এ যুগের বিজ্ঞানিকেরা তা সম্ভব করেছেন আর এক দিক্ দিয়ে। জলকে কি করে সম্পূর্ণভাবে ঠেকিয়ে রাখতে হয় সে কৌশল আজ আর তাঁদের অজানা নেই।

তোমরা ফ্রান্সের বিখ্যাত ম্যাজিনট্ লাইনের নাম শুনেছ বোধ হয়? ম্যাজিনট্ লাইন ছিল মাটির তলায় এক সুরক্ষিত বিরাট দুর্গশৃঙ্খল। বহু কৌশলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ফরাসী সামরিক এঞ্জিনীয়াররা মাটীর তলায় শত শত ফুট নীচে এই দুর্ভেদ্য গোপন সামরিক গৃহ তৈরী করেন আধুনিক বিজ্ঞানের যত রকম সুখ-সুবিধা, সুবন্দোবস্ত হ'তে পারে সবেরই ব্যবস্থা ছিল সেই পাতালপুরীর মধ্যে অস্ত্রাগার, কল-কারখানা, সৈন্যদের ব্যারাক—কিছুই বাকি ছিল না। মোট কথা, পৃথিবীর সেই সপ্ত আশ্চর্য্যকেও যেন ছাড়িয়ে গিয়েছিল ফরাসীদের এই নতুন আশ্চর্য্য!

কিন্তু এত ক'রেও একটি ব্যাপারে ফরাসী কর্তৃপক্ষ বড় মুশ্‌কিলে পড়ে গেলেন। সে বাধা হচ্ছে জল। মাটীর নীচে এদিক্ সেদিকে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ঝরণা, জলা, ফল্গুধারা। ওপর থেকে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দিনে দিনে পলে পলে তারা তাদের কাজ ক'রে যাচ্ছে। ম্যাজিনট্ লাইনের দেওয়াল সুদৃঢ় কন্‌ক্রিট্ দিয়ে গাঁথা। কিন্তু হ'লে কি হয়, দিবারাত্র প্রতি মুহূর্ত্তে বিন্দু বিন্দু জলকণা তার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে তাকে ক'রে দিল ভিজে—স্যাঁৎসেঁতে। নানা রকম মতলব খাটিয়েও বিজ্ঞানীরা সেই অদৃশ্য জলকণাকে রুখতে পারলেন না। শুধু তাই নয়, সেই সূক্ষ্ম জলকণা ম্যাজিনট্ লাইনের বাতাসকেও ক'রে দিল আর্দ্র। ফলে দুর্গের মধ্যে যে সব সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি থাকত তা'তে মরচে পড়তে সুরু করল। আর তার মানে আর কিছু না—সেগুলো একেবারে অকেজো হয়ে যাওয়া। জায়গায় জায়গায় আবার জল সূক্ষ্ম জলকণা হয়েই দেখা

দিত না—দস্তুর মত ঝরণা হয়ে বেরিয়ে আসত। ক্রমাগত পাম্প ক'রে ক'রেও তা নিঃশেষ করা যেত না।

কিন্তু সব চেয়ে মুশ্‌কিল দেখা দিল যখন ম্যাজিনট্ লাইনের ভিতর দেখা দিল নানা রকম ব্যারাম-পীড়া—সর্দ্দী, কাসি, নিউমোনিয়া। ডাক্তারেরা বল্‌লেন, মাটীর তলাকার আবদ্ধ দূষিত জলে আবহাওয়া হয়ে পড়েছে অস্বাস্থ্যকর। এ জল তাড়াতে না পারলে এ আবহাওয়াও শোধরানো যাবে না—ক্রমশঃ সৈন্যদলের মধ্যে এ সব ব্যারাম মহামারী হয়ে দেখা দেবে। শীগ্‌গির যা হয় ব্যবস্থা কর।

এদিকে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মান্ বাহিনী অমিতবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ফ্রান্সের উপর। তাদের প্রচণ্ড শক্তির কাছে ফ্রান্সের সামরিক শক্তি ক্রমেই যেন ধ্বসে পড়ছে। ম্যাজিনট্ লাইন বাঁচাবার জন্য ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন, যে এই অদৃশ্য জলস্রোতকে ঠেকিয়ে রাখবার মত কোন নতুন উপায় বার করতে পারবে তাকে দেওয়া হবে প্রচুর পুরস্কার।

কতকটা পুরস্কারের লোভে এবং কতকটা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফরাসী বিজ্ঞানীরা উঠে-পড়ে লাগলেন,—এর একটা হেস্তনেস্ত করবেনই চলল পরীক্ষা। দিনের পর দিন—রাতের পর রাত; চোখে ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, নাবার-খাবার সময় পর্য্যন্ত নেই। উপায় বার করতেই হবে।

অবশেষে সন্ধান মিল্‌ল। ফরাসী রাসায়নিকরা এমন একটা অদ্ভুত গুঁড়োর সন্ধান পেলেন যা জলে গুলে যে কোন জায়গায় মাখিয়ে দিলে তা হবে জলের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। গুঁড়ো জলের সঙ্গে দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে যাবে এবং শুকিয়ে গেলেই ফুলে উঠে এমন ভাবে সে ছিদ্র যুড়ে বসবে যে কোন খান দিয়ে এক ফোঁটা জলের আর ভিতরে ঢুকবার সাধ্য থাকবে না। জলকে ফরাসী ভাষায় বলে 'য়্যাকোয়া'। তাই বিজ্ঞানীরা এই মশলার নাম দিলেন 'য়্যাকোয়েলা'।

য়্যাকোয়েলার আবিষ্কার হতেই চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। ফরাসী এঞ্জিনীয়াররা আর কালবিলম্ব না ক'রে ম্যাজিনট্ লাইনের সমস্ত কন্‌ক্রিটের দেওয়াল য়্যাকোয়েলা দিয়ে "চুণকাম" (?) ক'রে নিলেন। পাতালপুরীর অদৃশ্য জলস্রোতকে হার মানতে হ'ল। ব্যারাম-পীড়া বন্ধ হ'ল, বাতাস শুক্‌নো হ'ল, যন্ত্রপাতিও মরচের হাত থেকে রক্ষা পেল।

কিন্তু এত ক'রেও যে শেষ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় নি তা তোমরা সবাই জান। সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য ম্যাজিনট্ লাইন দিয়ে তার কোন কাজই হ'ল না। ঝড়ের বেগে জার্ম্মান্ সৈন্যরা এসে ফ্রান্স দখল ক'রে নিল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্যারিস নগরীর পতন হ'ল। বোমার ঘায়ে ফ্রান্সের বহু কারখানা গেল গুঁড়ো হয়ে। য়্যাকোয়েলার কারখানাও তার মধ্যে একটি।

এই তো গেল ইতিহাসের এক অধ্যায়। তার পরের ইতিহাসও তোমাদের অজানা নেই। বহুদিন ফ্রান্স দখল ক'রে থাকার পর রাশিয়া, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি সম্মিলিত শক্তির কাছে দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মান্ বাহিনীর ভাগ্যও কেমন ক'রে বিপর্য্যস্ত হ'ল—সে কথা নতুন ক'রে বলবার কিছু নেই। ফ্রান্স আবার ফিরে এল ফরাসীদের হাতে। কিন্তু তখন আর ম্যাজিনট্ লাইনের কোন প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু তা না থাকলেও এই ম্যাজিনট্ লাইন রক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে যে ছোট্ট আবিষ্কারটি সম্ভব হয়েছিল বিজ্ঞানীর কাছে তাই হয়ে রইল পরম আশীর্ব্বাদ। তার পরের কথা শুনলেই তা বুঝবে।

য়্যাকোয়েলার কারখানা তো ধ্বংস হ'ল জার্ম্মানদের বোমায়। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিকে ধ্বংস করতে পারে এমন বোমা তো তৈরী হয় নি,—কাজেই জিনিষটি গাঁথা রইল বৈজ্ঞানিকের মগজে। এই বৈজ্ঞানিকটির নাম হচ্ছে হেগ্‌নিয়ের।

হেগ্‌নিয়ের পালিয়ে এলেন আমেরিকায়। কিছু দিন নানা কষ্টের মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে তিনি তাঁর এক বন্ধুর সাহায্যে তাঁর আবিষ্কৃত জিনিষটি আমেরিকার বাজারে চালাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমেরিকানরা বৈজ্ঞানিক জাতি, কিন্তু এমন একটা উপকারী জিনিষের সন্ধান এর আগে তারাও পায় নি। হেগ্‌নিয়েরের

বিষ্কার তারা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করল এবং একদিন তৈরী হয়েছিল সম্পূর্ণ সামরিক প্রয়োজনে ই ঘুরতে লাগল আমেরিকান্ এঞ্জিনীয়ারদের হাতে তে। তাঁরা দেখলেন, জলার দেশে, স্যাঁৎসেঁতে য়গায় বাড়ীঘর তুলতে হ'লে এর আর যুড়ি নেই। দ্রের ধারে জলের মধ্যে প্রাচীর গেঁথে তা'তে ফাটল রী ক'রে সেখানে য়্যাকোয়েলা লাগিয়ে তাঁরা পরীক্ষা রে দেখলেন দিনের পর দিন সমুদ্রের জল সেই টলের গায়ে আছড়ে পড়েও তা বিন্দুমাত্র ভেদ রতে পারছে না—একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জলকণাও এদিকে সছে না! নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁরা জিনিষটির ব্যবহার রু করলেন। দেখতে দেখতে এর কথা চার দিকে ড়িয়ে পড়ল, চাহিদা গেল প্রচুর বেড়ে।

আমাদের দেশে 'য়্যাকোয়েলা' এ পর্য্যন্ত এসেছে ব'লে শুনি নি—কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই আসবে এ কথা আন্দাজ করা যায়। এ দেশের অনেক বড় বড় সহরে খাবার জলের (কলের জলের) ব্যবস্থায় প্রচুর গলদ রয়েছে। জল হয়ত ভালই ছিল, কিন্তু পাইপের ভিতর দিয়ে সর্ব্বত্র চলাফেরার সময়ে পাইপের গায়ের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে তার মধ্যে বাইরে থেকে দূষিত পদার্থ ঢুকে ভিতরের জলকেও দূষিত করে তোলে, পরীক্ষা ক'রে এ কথা জানা গেছে। এঞ্জিনীয়াররা তাই ভাবছেন ভবিষ্যতে নতুন পাইপ বসাবার সময় সেগুলির গায়ে যদি ঐ রকম জলরোধক মশলা মাখিয়ে দেওয়া যায় তবে হয়তো শত শত লোককে অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান যেতে পারবে।

দুই বন্ধু

(হাদিস হইতে অনুবাদ)

বন্দে আলী মিয়া

দুই বন্ধু বেড়াতে বের হয়েছিল। চল্‌তে চল্‌তে নক দূর যাবার পর সহসা চারিদিক্ অন্ধকার হয়ে ে করে এলো। পার্ব্বত্য বন্ধুর পথ—বাড়ী ফিরে ওয়া সম্ভব হবে না ভেবে দু'জনে আশ্রয় সন্ধান রতে লাগল। অল্পক্ষণ পরে দারুণ ঝড় বইতে সুরু ল, দু'জনে এক গুহার মধ্যে প্রবেশ ক'রে আত্মরক্ষা রলে। প্রবল ঝড়ের বেগে একখানা প্রকাণ্ড পাথর ড়িয়ে গুহার মুখে এসে আটকে গেল। গুহার মুখ একবারে বন্ধ হয়ে গেল। দুই বন্ধু ভীষণ ফাঁপরে ড়লো। সাধারণ শক্তিতে মুক্তির উপায় নেই দেখে জনে স্থির করলো, জীবনে তারা যে সকল সৎকাজ রেছে তার আলোচনা ক'রে খোদার দয়া প্রার্থনা রবে, তাতে পাথরখানা গুহামুখ থেকে হয়তো সরেও তে পারে।

প্রথম বন্ধু বলতে আরম্ভ করলে:—আমার মাতা-পিতা খুবই বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছেন। আমি কাজকর্ম্ম উপলক্ষ্যে সারাদিন বাইরে থাকি। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে নিজ হাতে গাভীর দুধ দোহন ক'রে আগে তাঁদের পান করতে দিই, তাঁর পর নিজে আহারাদি করি। একবার দূরদেশে থেকে এলাম, তখন আমার ছেলেমেয়েরা আমাকে চারিদিক্ থেকে ঘিরে ধরলো। আমি তাদের সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা না ব'লে আগে পিতামাতার তত্ত্ব নিতে গেলাম। তাঁরা আমাকে দেখে খুব খুসী হলেন, আমার কাছে জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি তখন দূরবর্ত্তী ঝরণায় জল আনতে গেলাম। সেখান থেকে ফিরতে খানিকটা দেরী হ'লো। এসে দেখি বাবা-মা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে ভেবে কাউকে ডাকলাম না, কখন ঘুম থেকে উঠে

জলপান করতে চান এই আশঙ্কায় তাঁদের কাছে জল নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। শীতের রাত। সারা রাত জেগে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষ রাতে তাঁরা ঘুম থেকে জেগে আমাকে জল নিয়ে প্রতীক্ষা করতে দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে আমার জন্য খোদার নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করলেন। পিতামাতার এই সেবায় যদি কিছু সৎকার্য্য করা হয়ে থাকে তবে তার পুরস্কারে খোদা এই বিপদ্ থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন।

এই কথা বলতে না বলতে গুহার মুখ থেকে পাথরখানা কিঞ্চিৎ সরে গেল, বাইরের কিছু আলো গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। কিন্তু পরিসর অতি সঙ্কীর্ণ, এর মধ্যে দিয়ে একজন মানুষেরও যাবার মত রাস্তা হ'লো না।

তারপর দ্বিতীয় বন্ধু বলতে লাগলো :—আমি একজন ব্যবসায়ী। অনেক লোকজন আমার অধীনে চাকুরী করে। তা ছাড়া অনেক সময় ঠিকা মজুরেরও সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। একদিন একজন মজুর আমার কারখানায় কাজ করলো। তার মজুরী খুচরা পয়সার অভাবে সম্পূর্ণ রূপে পরিশোধ করতে পারা গেল না। অন্য একদিন এসে কারখানা থেকে অবশিষ্ট প্রাপ্য নিয়ে যাবার জন্য ব'লে দিলাম। কিন্তু সে এলো না। তার সামান্য বাকি প্রাপ্যটা কারবারে খাটাতে লাগলাম। লাভ থাকায় মুন্‌শীকে একটা স্বতন্ত্র হিসাব রাখতে বল মজুরীর বাকি পয়সা কারবারে খেটে খেটে বৎসরের মধ্যে হাজার উট, হাজার ঘোড়া, হাজার ও হাজার ছাগলের মূল্য পরিমাণ মূলধনে পরিণত হ সহসা একদিন সেই মজুরটী এসে তার মজুরীর পয়সাগুলো প্রার্থনা করলো। তাকে সহস্র উট, ঘোড়া প্রভৃতি নিয়ে যেতে বললাম। মজুরটী বল 'হুজুর, আপনি পরম জ্ঞানী ও ধনবান্—আমার মত উপহাস করবেন না। আমার খাটুনীর মাত্র ক'টা বাকি আছে, শুধু তাই আমাকে দিয়ে দিন।' তখন সকল কথা বুঝিয়ে বললুম, সে খুসী হ'য়ে তার প্রাপ্য ঘোড়া, মেষ ও ছাগলের পাল নিয়ে চলে গেল। হ'লো, আমার মাথার উপর থেকে যেন একটা গুরু বোঝা নেমে গেল। এই কাজে যদি আমার কিছু লাভ হ'য়ে থাকে তবে খোদাতালা আমাদের এই বি থেকে উদ্ধার করবেন।

এইবার পাথরখানা গুহামুখ থেকে একেবারে স গেল। বন্ধু দু'জন মুক্তিলাভ ক'রে খোদার জয় করতে করতে গন্তব্য স্থলের দিকে এগিয়ে চল্‌লো।

মীমাংসা

শ্রীপ্রভাত বসু

বেগুন কহিল ডাকি—"ওহে নৈনিতাল!
সেজে গুজে হাটে এসে কি দেখাও চাল?
দাম বেশী ব'লে ভাব মাথা নেছ কিনে,
মাটি-ধোয়া রূপ দেখে হেসেই বাঁচি নে!"

আলু বলে, "রে বেগুন, স্পর্দ্ধা বড় তোর!
সর্ব আনাজের মাঝে উচ্চকুল মোর—
সে কথাটি মনে রেখে মাথা কর, হেঁট,
নহিলে ফাটাব তোর ঐ ভুঁড়ো পেট।"

বাজারের থলি হাতে এল খরিদ্দার,
আলু আর বেগুনের হ'ল সমাহার।
বিপদে পড়িয়া তারা স্মরে দুর্গানাম—
বড় ছোট দু'জনার হ'ল এক দাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গুরুশিষ্য-সংবাদ

তোফা একটি দিবানিদ্রার পর শেখরেশ্বর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে, ঢেঁকিঘরের পাশে তালগাছটার ছায়া ক্রমেই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া আসিতেছে, দূরে থাকিয়া থাকিয়া গাভীর হাম্বারব শোনা যাইতেছে; তাদের ঘরে ফিরিবার সময় হইয়া আসিল।

মেজবৌ ঘরে ঢুকিয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "খুব তো মাকে তেল ঢেলে ঘুমোনো হচ্ছে, ওদিকে শিষ্য বেচারা কতা সেই কোন্ সময় থেকে গুরুর জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে বসে আছে! যাও, উঠে গিয়ে খুঙ্গিপুঁথি যা আছে খুঁজে পেতে খুলে নিয়ে বস। বহুদিন তো আর ও সবের চালাই নেই!"

শেখরেশ্বর আবার এক নতুন ভাবনায় পড়িলেন। এক মহা ফ্যাসাদ জুটিয়াছে যা হোক্! ব্রাহ্মণীদের চোখে ধূলা দিবার জন্য না হয় শশিকান্তকে শিষ্য জানাইয়াছেন, কিন্তু শশিকান্তর চোখেও তো ধূলা দেওয়া দরকার। অত দূর দেশ হইতে আসিয়া হাজির হইয়াছে তাহাকে পণ্ডিত ঠাওরাইয়া। নিজের বোনকে তাঁর হাতে সম্প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে—সেও তো তাঁর পাণ্ডিত্য-খ্যাতির জন্যই! এখন আগে ভাগেই যদি ধরা পড়িয়া যান তবে সে বড়ই কেলেঙ্কারীর কথা হইবে।

ব্রাহ্মণীদের দেখাইবার জন্য সকালে বিকালে শশিকান্তর সঙ্গে পুঁথি লইয়া বসিতেই হইবে, আবার পুঁথি খুলিলেই শশিকান্তর কাছে ধরা পড়িয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। ভাবিতে ভাবিতে শেখরেশ্বর ঘামিয়া উঠিলেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ বসিয়া ঘামিবারও উপায় ছিল না। শেখরেশ্বরের মনে পড়িল ঘরের চালের নীচে মাচায় বহুদিনের পরিত্যক্ত তাঁর ছাত্রজীবনের ২।৪ খানি ছেঁড়া পুঁথি হয়তো খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে। হয়তো মুগ্ধবোধের দু'চারখানি পাতাও মিলিয়া যাইতে পারে।

ছিন্ন মুগ্ধবোধখানি খুলিয়া শেখরেশ্বর বাল্যে অধীত বিদ্যাটুকু একটু ঝালাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নাঃ, উইএ ধরা পুঁথির অক্ষরগুলিও যেন তাঁর কাছে অসংখ্য উই বলিয়া মনে হইতে লাগিল—সূত্রগুলির একটিও মনে নাই। সমাস, বিভক্তি আর তদ্ধিৎ সার বাঁধিয়া যেন তাঁকে মুখ ভ্যাংচাইতে লাগিল।

কিন্তু শেখর ঠাকুরের অদৃষ্ট ভাল, পথের সন্ধান মিলিল তাঁরই ব্রাহ্মণীর কাছে। মেজবৌ স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া কহিলেন, "আ আমার পোড়াকপাল! ব'সে বসে ঢং করা হচ্ছে! ছাত্তর পড়াবেন পণ্ডিত মশাই! আরে, তার চেয়ে ছাত্তরটিকে নিয়ে গুটি গুটি মন্দিরে যাও। কি ক'রে কোষাকুষি নাড়তে হয়, কি ক'রে নাক টিপে,

চোখ বুজে চাল-কলার ধ্যান করতে হয় সেই সব বুঝিয়ে দাও গে। ওরও আখেরে কাজ দেবে, তোমারও বুকের ধড়ফড়ানি থামবে। 'নাও, কাপড় চাদর পরে নাও। বলি কোথায় গেলে ভালমানুষের বাছা।" বলিয়া ব্রাহ্মণী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন শশিকান্তরই খোঁজে।

শেখর ঠাকুর যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। বাস্তবিকই এ কথাটা তো তাঁর আগে মনে আসে নাই! কে বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী?

শশিকান্ত সামনে আসিতেই শেখরেশ্বর কহিলেন, "ভেবে দেখলাম, সকল শাস্ত্রের বড় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। ব্যাকরণ বল, কাব্য বল আর দর্শনই বল—সকলেরই শেষ লক্ষ্য হচ্ছে সেই পরমাত্মার সঙ্গে পরিচয় লাভ। ঈশ্বরের করুণায় সেই পরমাত্মা রাধামাধবের রূপ নিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন। তাঁকে সেবা করতে শিখলেই সেই পরমাত্মাকে লাভ করা হবে। তাই আমার শিষ্যকে আমি গোড়া থেকেই সেই পরমশাস্ত্র শেখাব ঠিক করেছি। তুমি তৈরী হয়ে নাও। এখনই আমরা মন্দিরে রওনা হব।"

রাধামাধবের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া চলিয়াছে। জমিদার মৃগাঙ্ক রায়ের স্নেহের দুলাল, জমিদারীর ভাবী উত্তরাধিকারী জয়ন্ত দুরন্ত দস্যুদের হাতে বন্দী। কি অবস্থায় সে আছে কিছুই জানা নাই। সারা বারদীঘি গ্রাম জয়ন্তের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। কিন্তু রাধামাধবের মন্দিরে সে উৎকণ্ঠার ঢেউ আসিয়া লাগে নাই।

সহস্র ঝাড়ের আলোয় মন্দির ঝলমল করিতেছে। সেই আলোয় রাধামাধব তেমনি অপলক দৃষ্টিতে ভক্তের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। যে রত্নহারটি লইয়া এত কাণ্ড, ঝাড়ের আলো তারও উপর পড়িয়া হাজার টুকরায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মনে হয়, সেও যেন হাসিতেছে! পূজার আয়োজন তেমনি সাড়ম্বরে সাজানো। অভ্যস্ত চোখেও সামান্য ত্রুটীটুকু পড়ে না। শেখরেশ্বর শশিকান্তকে অদূরে বসিতে বলিয়া আরতির আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মন্দিরের জমকালো রূপ দেখিয়া শশিকান্ত অব[illegible]র খুসী হইয়া গেল। রাধামাধব-মন্দিরের সমারোহের ক[illegible]ন আর কানাঘুষায় সে অঞ্চলের সকলের সঙ্গে সেও কিছু কি[illegible] শুনিয়াছিল, কিন্তু তা যে এমনধারা তা সে ভাবিতে পা[illegible] নাই। বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে সে যেন প্রতিমূহূ[illegible] বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছিল।

তার বিমুগ্ধ ভাব সুশ্বেতার চোখ এড়ায় নাই। এ[illegible] তরুণ নবাগতটির পরিচয় সে আগেই শেখর ঠাকু[illegible] কাছে পাইয়াছে। শেখর ঠাকুর অনুমতি লইয়া[illegible] শিষ্যকে মন্দিরে আনিয়াছিলেন—নচেৎ সম্পূর্ণ অপ[illegible]চিতকে বিগ্রহের এত কাছে বসিতে দিবার নিয়ম এখা[illegible] নাই। তা যাই হোক, লোকটির ভক্তি দেখিয়া সুশ্বে[illegible] খুসীই হইয়াছিল। শেখর ঠাকুরের বয়স হইয়াছে, [illegible] ছাড়া পূজা ব্যাপারে তাঁর চালচলনে আড়ম্বরটাই [illegible] বেশী করিয়া চোখে পড়ে। এ লোকটিকে দেখিয়া ম[illegible] হয় দেবতাকে এ ভালবাসিতে জানে, নহিলে কি এমন ত[illegible] হইয়া বিগ্রহের দিক কেউ চাহিয়া থাকিতে পারে[illegible] ভবিষ্যতে বৃদ্ধ শেখর ঠাকুরের আসনে তাঁর এই শিষ্যটি[illegible] কল্পনা করিয়া সুশ্বেতা নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন এ[illegible] খুসী হইয়া উঠিল।

আরতি শেষ হইলে মৃগাঙ্ক রায় আসিয়া শশিকা[illegible] সহিত আলাপ করিলেন। যুবকের বিমুগ্ধ ভাব তাঁহা[illegible] দৃষ্টি এড়ায় নাই।

দেখিতে দেখিতে পূর্ণিমা আসিয়া পড়িল। এ[illegible] পূর্ণিমার দিন মন্দিরে একটি বিশেষ উৎসব হ[illegible] জয়ন্ত নাই বলিয়া তা বন্ধ করিবার কোন [illegible] নাই। শেখর ঠাকুর এই উৎসবটুকুর জন্যই অপে[illegible] করিতেছিলেন। এটি শেষ হইলেই তিনি দিন কয়ে[illegible] ছুটী লইয়া শশিকান্তর সহিত গোপনে সিমলাই র[illegible] হইবেন এই রকম ব্যবস্থা আছে।

শশিকান্ত রোজই তাঁহার সহিত মন্দিরে যায়। ক[illegible] দিনের মধ্যেই সে মন্দিরের কাজকর্ম্ম অনেকটা শি[illegible] ফেলিয়াছে। শেখরেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সেও পূজা [illegible] তা ছাড়া কীর্ত্তনেও সে অভ্যস্ত। ভারী মিষ্টি গলা [illegible] ফলে মৃগাঙ্ক রায় হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই [illegible]

[illegible]র খুসী। এমন কি শেখর ঠাকুরের ব্রাহ্মণী তিন জনও [illegible]ন আর তাকে আড়াল হইতে 'মুখপোড়া', 'হতভাগা' [illegible]তি বিশেষণে ভূষিত করা প্রয়োজন মনে করেন না— [illegible] একটু স্নেহের চোখেই দেখেন।

[illegible] শেখর ঠাকুরের সঙ্গেও তার ইতিমধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা [illegible]য়াছে। বাহিরে লোক দেখান গুরু-শিষ্য সম্পর্ক [illegible]ইলেও নিজেদের মধ্যে তাহারা ভাবী শালা-ভগিনীপতির [illegible]র সম্পর্কটাই পাতাইয়া লইয়াছে। বয়সে যথেষ্ট তফাৎ [illegible]কিলেও শেখর ঠাকুর মাঝে মাঝে তার সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা [illegible]রেন। শশিকান্তও ইতিমধ্যে ভাবী ভগিনীপতিকে সিদ্ধি [illegible]ইতে শিখাইয়াছে। বৈষ্ণবদের মধ্যে সিদ্ধির চলন [illegible]মন নাই—সিদ্ধি বিশেষ করিয়া শৈবদেরই নিত্যসঙ্গী, [illegible] শশিকান্ত অল্প বয়স হইতেই এ বিদ্যায় পক্ক হইয়া- [illegible]ল। এখন গুরুকেও সে বিদ্যায় দীক্ষা দিতে ছাড়িল না।

[illegible] উৎসবের আগের দিন। ভোর হইতেই মন্দিরে [illegible]ক্তের ভীড় পড়িয়া যাইবে। আশপাশের নানা গ্রাম [illegible]তে অনেক লোক আসিবে। রাধামাধবকে এই দিন [illegible] ভাল করিয়া সাজান হয়। এ দিন তাই শেষ রাত্রে [illegible]ঠিয়াই শেখর ঠাকুরকে মন্দিরে গিয়া ঠাকুর সাজাইবার [illegible]স্থা করিতে হয়। পুরোহিত ছাড়া বিগ্রহকে স্পর্শ [illegible]রিবার অধিকার তো সকলের নাই!

[illegible] শেষ রাত্রে শেখর ঠাকুর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া [illegible]লেন। কাল রাত্রে গোপনে সিদ্ধিপানের পরিমাণটা [illegible]টু বেশীই হইয়া গিয়াছিল। শশিকান্তের হাতের [illegible]দ্ধির সরবৎ বড় চমৎকার। শেখর ঠাকুরের নেশার [illegible]রটা যেন তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই। হঠাৎ [illegible] হইল পেটের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া কিসে [illegible] মোচড় দিতেছে। কেমন যেন একটা অস্বাস্তর ভাব! [illegible]মেই বাড়িতেছে।

[illegible] শশিকান্ত আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। শেখরেশ্বর [illegible]াকে মন্দিরে গিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে বলিলেন। [illegible] কিছু পরে একটু সুস্থ হইলেই আসিতেছেন।

[illegible] শশিকান্ত মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ফুরফুরে [illegible]স রাশিরাশি সুগন্ধি ফুল আনিয়া ইতিমধ্যেই জড় [illegible] হইয়াছে। তার গন্ধে চারিদিক্ ভরিয়া উঠিয়াছে।

অন্যান্য আয়োজনও তৈরী। সুশ্বেতাও এই অন্ধকারে উঠিয়া চারিদিক্ তদারক করিতেছে।

"শেখর ঠাকুর কোথায় গেলেন? তিনি এলেন না?"

"আসছেন এখনই। শরীরটা একটু অসুস্থ, তাই আমাকে আগে পাঠালেন, আমি কাজ আরম্ভ করে দি, কেমন?"

সুশ্বেতার সুম্মতি জানিয়া শশিকান্ত ঠাকুর সাজাইবার কাজ সুরু করিয়া দিল।

অনেকটা সময় চলিয়া গেল, কিন্তু শেখর ঠাকুরের তবু দেখা নাই। শশিকান্ত মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া রাধামাধবকে সাজাইতেছে। সুশ্বেতা খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, কিন্তু ধ্যানীর ধ্যান ভঙ্গ করিবার তার ইচ্ছা ছিল না, একটু দাঁড়াইয়া সে অন্য কাজে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

যখন ফিরিয়া আসিল তখন ঠাকুর সাজানো হইয়া গিয়াছে। কী চমৎকারই না দেখাইতেছে ঠাকুরকে! ফুল দিয়া সারা অঙ্গ মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তার মধ্যেও কেমন একটা রুচির পরিচয়—চোখ যেন ফিরাইতে ইচ্ছা করে না!

শুধু একটা খুঁত—রত্নহারটিও ফুলের তলায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সুশ্বেতার উহা পছন্দ হইল না। ফুল যতই সুন্দর, পবিত্র, নয়নাভিরাম হউক না কেন, অমন সাত রাজার ধন রত্নহারটিকে তাই বলিয়া ঢাকিয়া রাখিলে চলিবে কেন? ওটি না হইলে যে ঠাকুরকে মোটেই মানায় না! উহার উপর আলো পড়িয়া হাজার টুকরায় ছিটকাইয়া পড়িবে, তবেই না—!

সুশ্বেতা শশিকান্তকে ডাকিতে গেল। কে একজন বলিল, 'ছোটু ঠাকুর মশায় নৈবেদ্যের থালা ধুতে সামনের পুকুরে গেছেন, এখনই আসবেন।' কিন্তু সুশ্বেতার তর সহিতেছিল না। বিগ্রহ স্পর্শ করিবার অধিকার তারও আছে, সে নিজেই ফুল সরাইয়া রত্নহারটি বাহির করিয়া দিবে।

কিন্তু একি! রাধামাধবের গলায় তো রত্নহার নাই! কোথায় গেল—কোথায় গেল সে হার! শশিকান্তই বা কোথায়?

কিন্তু খোঁজ মিলিল না। না রত্নহারের, না শশিকান্তের; জমিদারের পাইক মন্দিরের আনাচে কানাচে, এবং শেষে গ্রামের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিল। রত্নহার শশিকান্ত কোনটিরই কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। (ক্র

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

১১

বাসবের ঘুম ভাঙলো বেলায়। অমনি রাতের ঘটনাটা তার মনে পড়ে গেল।

তার উঠতে দেরি দেখে সেদিনকার একটা কর্ত্তব্যের ভার, বাজার করা, ছোট ভাইটি নিয়েছিল। এবং বাজারে চলেও গিয়েছিল।

বাসব মুখ-হাত ধুয়ে প্রতিদিনকার মতো সফেন ভাত খেয়ে বললে, "মা, আমি যাচ্ছি বাজারের দিকে কাল যেখানে আগুন লেগেছিল সেখানে—"

মা বললেন, "শুনেছিস্ কি হয়েছে?"

—"কখন শুনবো?"

—"কালকের আগুনে দুটো লোক পুড়ে মরেছে।"

—"কার কাছে শুনলে?"

—"রাস্তায় দাঁড়িয়ে সকলে যে বলাবলি করছিল।"

—"এই দেখ মা! তোমাকে যে বলেছিলাম যত বিপদ, যত দুর্ঘটনা সবই ঘটে গরীবদের ভাগ্যে, এখানেও হয়তো তাই হয়েছে।"

—"কি করে জানলি? না জেনেশুনে কোন কথা বলা ঠিক নয়।"

—"আচ্ছা, আমি তো যাচ্ছি।"

—"গিয়ে কি হবে? যে মরেছে সে তো আর আসবে না। আর তাদের আত্মীয়-স্বজনের দুঃখও তুই দূর কর পারবি না। এই আমাদেরই অবস্থা ধর। আমা মতো আরও কত লোক আছে। আমাদের দুঃখের জেনেও কি তা দূর করতে পেরেছি? এ হ'ল তা কথা। দুঃখের কপাল করে এসেছি—"

বাসব মায়ের সুন্দর, শান্ত, করুণ মুখের দিকে দু বিস্ফারিত করে তাকালো। তার মন পীড়িত উঠলো। তবুও বললে, "মা, ভাগ্য বলে কিছু নেই। অবস্থার মধ্যে আমরা, গরীবেরা, রয়েছি যে অবস্থার লড়াই করে করে ক্লান্ত হয়ে আর পারছি না বলেই থাকি ভাগ্য। এই কি ভাগ্য মা, যে এশিয়ার জাতিগু কালো-হলদে-বাদামি মানুষগুলো, সাদা মানুষগু দাসানুদাস হয়ে মানুষেরও অধম জীবন যাপন কর ভগবান কি সেই ব্যবস্থা করেছেন? তুমিই তো আমা ভাই-বোনদের সকলকে শিখিয়েছ, ভগবানের স সকলেই সমান। তিনি মঙ্গলময়। মানুষের দুঃখে চোখে জল আসে। তবুও অবস্থার এমন গরমিল, অ অবিচার দেখা যায় কেন? এ সব করেছে মানু যারা ধনী, যাদের অনেক আছে, তাদের চেয়ে গরী নিকৃষ্ট নয়, বরং উৎকৃষ্ট মানুষ তবুও তারা—"

বাসবের মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা দেখা দিল! সে যাকে যা বলতে চায় তা ঠিকমতো বলতে পারছে না! তবুও তার কথায় মায়ের মুখে মাখিয়ে গেল খানিকটা প্রশান্তি। তিনি যেন তার মন বুঝলেন।

বাসব আবার বললে, "আমাদের অবস্থাটা ভাল করে দেখে রাখা দরকার। না হলে আমরা গরীবেরা এ সব দূর করবো কি করে? আমরা ছাড়া আর কেউ আমাদের দুঃখ দূর করবে না মা।"

—"তাই হোক। তুই অনেক টাকা রোজগার কর—"

—"আমি অনেক টাকা রোজগার করলে তো কেবল আমারই অবস্থা ফিরবে। বল, আজকের গরীবেরা সকলেই অনেক টাকা রোজগার করবে, তাদের পয়সার দুঃখ থাকবে না—"

—"বেশ কথা। কিন্তু তুই এখন বেরুলে ফিরবি কখন?"

—"যদি বেলা হয় ভেবো না।"

বাসব বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাঁশতলা দিয়ে, জোলা-পাড়া দিয়ে মুচিপাড়ার পাশ দিয়ে গিয়ে পৌঁছলো রেল-লাইনে। এবং তার ওপর দিয়ে চললো বাজারের দিকে।

লাইনটার একদিকে গ্রামে, একদিকে শহর—মফঃস্বলের শহর। সব মফঃস্বল শহরই প্রায় এক রকম, কিন্তু জেলার উত্তর-দক্ষিণ ও-পূব-পশ্চিমাংশের গ্রামগুলি এক রকমের নয়। বাসব অবশ্য এ সব পার্থক্য দেখে নি। এই মিল ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এক বিষয়ে মিল আছে—সেটি হচ্ছে, এর সব অংশই বিদেশীর অধীন আর সকল অংশের লোকের অবস্থাই এক রকম। অভাব, উৎপীড়ন, শোষণ সর্ব্বত্রই সমান। এক শ্রেণী প্রভু, এক শ্রেণী দাস। মুসলমান ধনী, জমিদার ও মহাজন মুসলমানকে হিন্দুর মতোই শোষণ ও শাসন করে। হিন্দুও হিন্দুকে রেহাই দেয় না। সর্ব্বত্রই একতার অভাব। বাসবকে এসব কথা বলছিলেন মানিকদা। তাদের লাঠি খেলার আখড়ায়ও সে এ কথা শুনেছে। সেবা-কেন্দ্রেও মাঝে মাঝে কোথা থেকে এক একটি অদ্ভুত ধরনের লোক কয়েক ঘণ্টার জন্য এসে সকলকে ডেকে দেশের অবস্থা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের চেহারা ও বেশ-ভূষা অতি সাধারণ মানুষের মতো কিন্তু বাসব তাঁদের চোখে দেখেছে আগুন। তাঁদের চলা-ফেরা রহস্যময়, কিন্তু কথাবার্ত্তা বড় স্পষ্ট, মিষ্ট; শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে অন্তরে কেমন একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগে। বাসব তাদের কারো নাম জানে না। জানবার উপায়ও নেই। তাঁরা হঠাৎ আসেন এবং অলক্ষ্যে চলে যান। পুলিশ তাঁদের মনে করে ভয়ঙ্কর লোক। কিন্তু মানুষের প্রতি যাঁদের এত ভালোবাসা তাঁরা ভয়ঙ্কর কিসে? তাঁদের দেখলেই বাসবের মনে হয়, এক একজন যেন ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও সাহসিকতার এক একটি জীবন্ত কাহিনী যা শুনলে মনের ময়লা ধুয়ে মন নির্ম্মল হয়। এত কষ্ট, এত নির্য্যাতন এঁরা সহ্য করেন কি কেবল নিজের জন্য?

পাশের গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে বাসবের এ সব কথা মনে পড়ে গেল। সে ভাবতে ভাবতে এমন আত্মভোলা হয়ে গিয়েছিল যে, পিছনে যে গাড়ি হুইসল দিচ্ছে তা তার কানেই পৌঁছচ্ছিল না। সামনে ছিল গুমঠি। গুমঠিওয়ালার ধমকে সে চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকিয়ে পায়ে-চলা পথটিতে নেমে গেল। ওই গাড়ি আসছে—কালো ইনজিন, সাদা ধোঁয়া। ইনজিনখানা যেন রোদে ও পথশ্রমে ঘেমে চক্‌চক্ করছে।

একখানা মালগাড়ি তার পাশ দিয়ে মাটি কাঁপিয়ে ঝড়ের শব্দে চলে গেল।

বাসব আবার লাইন ধরে বাজারের পাশে গিয়ে পৌঁছলো। এবং বাজার ছাড়িয়ে ষ্টেশন ছাড়িয়ে গিয়ে পড়লো ব্যাপারী-পাড়ায়। সেখানে আছে কেবল বড় বড় গোদাম বা আড়ৎ—ধানের, পাটের, তিসির, তিলের। জায়গাটায় কেমন একটা ঝাঁঝালো মিশ্র গন্ধ। আড়ৎগুলোর পর একটা বাবলার বন। সেটা ছাড়ালে একখানা বড় মাঠ। তারপর শ্মশান। শ্মশানের পর খাল। খালের ওপারের গাঁয়ে ইয়াকুবদের বাড়ি।

বাসব দেখলো, আড়তে মজুরেরা, দেশী মজুরেরা, কাজ করছে। তাদের মধ্যে মুসলমানই চৌদ্দো আনা। তাদের মুখে দাড়ি, চওড়া বুকের ছাতি, কালো কষ্টি-পাথরের মতো গায়ের রঙ, মুখে রূঢ় অশ্লীল ভাষা লেগেই আছে। তারা মাঝে মাঝে পরস্পরের ওপরে রেগে উঠছে। এ সব দেখতে ও শুনতে বিশ্রী লাগে। কিন্তু কেউ তো তাদের শ্লীলতা ও শিষ্টতা শেখায় না!

যারা শিক্ষিত ও ভদ্র বলে পরিচিত, গর্ব্বিত তারাও যে হামেশাই নোংরা ভাষায় নোংরামি প্রকাশ করে, শিষ্টতার সীমা ডিঙিয়ে যায় এও তো সে দেখেছে। এটা আবার কখন কখন হয় তাদের বড়াইয়ের বিষয়। মজুরেরা এমন ভাবে কাজ করছিল, দুজন দুজন করে বড় বড় বস্তা বইছিল, প্রকাণ্ড কাঠের দাঁড়-পাল্লায় পাট ওজন করছিল, বাণ্ডিল বাঁধছিল যেন সেখানে কিছুই হয় নি! তাদেরই মাঝে শস্যের আড়তে কাজ করছিল বর্ষিয়সী মেয়ে-মজুরেরা—কালো রঙ, শুকনো, শক্ত দেহ ও মুখ, পরনে ময়লা কাপড় গাছ কোমর বাঁধা। কিন্তু সকলেরই মাথায় কাপড়, এবং বেশির ভাগেরই শুধু হাতে, দু' একজনের গোল-মোটা বলিষ্ঠ হাতে একগাছি করে কাঁচের চুড়ি। তাদের বয়স অল্প। কারো কারো সঙ্গে ছোট ছেলে-মেয়েও এসেছে। ছেলে-মেয়েগুলি উলঙ্গ, কালো, ধূলি ধূসরিত ও পেট-সর্ব্বস্ব। তারা ধুলো থেকে শস্য কুড়িয়ে খেলা করছে, ছুটছে, হাসছে। এই শোচনীয় পরিবেশ! এর মাঝেও হাসি ও আনন্দ? হায় রে অভাগা! এই দিনগুলিকেও, এই ক্ষণগুলিকেই বার্দ্ধক্যে মনে করে এঁরা নিশ্বাস ফেলবে। মনে মনে বলবে—"কি আনন্দেরই ছিল! আবার যদি ফিরে পেতাম!" এদের চেয়ে বাসবদের মতো যারা তাদের অবস্থা কতখানি ভাল? বেশি নয়।

পাড়াটার ভেতর দিয়ে একেবারে শেষ সীমায় গিয়ে বাসব দেখলে এক জায়গায় অনেক লোক, লাল পাগড়ি, ভস্মস্তূপ ও তা থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে।

বাসব ভিড় ঠেলে গিয়ে দেখে, দুটি দগ্ধ দেহকে টেনে একটি ধারে পাশাপাশি শুইয়ে রাখা হয়েছে তারা এমনভাবে পুড়ে, বিকৃত হয়ে বেঁকে গেছে যে চেনা তো দূরের কথা তাকানোই যায় না।

কি করে যে আগুন লেগেছিল কেউ জানে না। গোদামটা পাটের। মালিক চৈতন্য সাহা। বাসব চৈতন্য সাহাকে দেখেছে। তার গলায় কণ্ঠি, হাতে হরিনামের ঝুলি, পরনে আটহাতি থান, পায়ে খড়ম, কপালে তিলক, চোখ দুটি লাল কিন্তু প্রায় সব সময়েই বন্ধই থাকে। কিন্তু সে যখন দেখেছিল তখন তা ছিল খোলা। লোকে বলে চৈতন সা টাকার কুমীর। সকলকেই নমস্কার করে, সকলকেই "বাবু" বলে, এমন কি তাদে বলেছিল। বাসবের মনে হয়েছিল, সম্বোধনটার ম বিদ্রূপ আছে।

কে যেন বললে, "রেশারেশি করে আড় পুড়িয়েছে। সাজি মশাইয়ের ভাইপোর সঙ্গে হাইকো বিষয় নিয়ে মামলা হচ্ছে—"

বাসবের সে সব কথা শুনতে ভাল লাগল না তার মন ব্যথিয়ে উঠছিল সেই দুটি দগ্ধ লোকের জন্য একজন বলছিল তারা সাজি মশাইয়েরই লোক। রাত্রে বেলা নাকি আড়তে শুয়েছিল। রোজই শো কাল যাত্রা শুনে এসে একটু রাত করে শুয়েছিল তারপর এই কাণ্ড। ওদের বাড়ি হ'ল চট্‌রা গাঁ চট্‌রা গাঁ বেশিদূর নয়। সেখান থেকে আধক্রো হবে। দুজনের বাড়িতে বউ, মা, ছেলে-মেয়ে আছে এখন তারা খাবে কি?

এমন সময় আর একজন বললে, "এটা সাজি মশাইয়েরই কাজ। ক'দিন ধরে পাট সরাচ্ছিল। কা লাগলো আগুন।"

—"সাজি মশাই আসে নি?"

—"না। সে নাকি শুনে কেবলই বলছে, 'প্রভু ইচ্ছা।"

হঠাৎ বাসবের কানে এল স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ তার পাশের লোকটি বললে, "ওদের বউ, ছেলেমে এল। আহা!"

বাসব আর দাঁড়ালো না তার দাঁড়াতে ইচ্ছা হ না, সে চললো শ্মশানের দিকে। অসহায় পরিবা বর্গের হাহাকার সে তো প্রায়ই শুনে থাকে। তাদের ঘরে একদিন তা বেজে উঠেছিল। কি হবে ওদের গরীবেরা যা শিখেছে—ভগবান্ ভরসা। এক হা চোখের জল মোছে, এক হাতে খাটে আর মি আশায় বুক বেঁধে অভাব ও রোগের সঙ্গে লড়াই করে।

তার সামনে নির্জ্জন বাবলা বন। তলায় প আছে শুকনো কাঁটা, গাছগুলোর গায়ে বেরিয়েছে কাঁ মতো আঠা। পাতা ও ছালের ঝাঁঝালো গ সেখানকার বাতাস ভারী। একটা দোয়েল এ গাছের ডালে বসে শিষ দিচ্ছিল আর এদিক-ওদি

চ্ছিল। আর একটা গাছে বসে কয়েকটা চড়ুই য়ে ছিল ঝগড়া। তারা বাসবকে গ্রাহ্যই করলে না। বাবলা বন ছাড়িয়ে শ্মশানকে বাঁয়ে রেখে চললো র দিকে। শ্মশানের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে, যেন একটি চিতা সাজাচ্ছে, চরের ওপর বাঁশের য় কাপড় ঢাকা পড়ে আছে একটি মৃতদেহ। কার জানে! কেউ তো ওর জন্য কাঁদছে না!

সে খালের ধারে গিয়ে পৌঁছলো। খালে খেয়া। তখন একখানা খেয়া ওপারে যাবার আয়োজন ছিল। পাটনি তার চেনা। ভাল লাঠি খেলতে । নাম ভগবান্।

বাসব গিয়ে খেয়ায় উঠলো।

ভগবান্ বললে, "কি গো বাসু, কোথায় যাবে?"

বাসব বললে, "ইয়াকুবদের বাড়ি।"

—"এত বেলায় যে?"

—"বেলা আর কৈ? দশটা হবে।"

—"তা হবে," বলে ভগবান হাল কাচাতে লাগলো।

ছোট খাল, অল্পস্রোতে সামান্য সময়ের মধ্যেই খেয়া র ঘাটে ভিড়লো। বাসব নেমে পাড়ে উঠে ক্ষেতের দিয়ে আলের ওপর দিয়ে মাঠ ভেঙে গ্রামে গিয়ে লো।

গ্রামের মুখেই নিকারিপাড়া গাছ-পালার ছায়ায় ঢাকা দিয়ে আছে। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে কটা ক'রে ফাঁকা। কোথাও জাল শুকোচ্ছে, কেউ র বাতা চাঁছছে, কেউ বসে তামাক খাচ্ছে। থাও দু তিনটি লোক বসে দোয়াড় ও পোলো ছে, কেউ জাল বুনছে আর গল্প করছে। সমস্ত টায় আঁশটে গন্ধ। লোকগুলো বাসবের দিকে তূহলভরা চোখে দেখতে লাগলো।

বাসবের মনে পড়লো এইখানেই গত বছর তার মুখে দেশীর" কথা শুনে এক বুড়ো বলেছিল, "তুমি বড় হয়ে ল হবে।"

সে বুড়ো ইয়াকুবের আত্মীয় হয়। মাস কতক আগে লেরায় মারা গেছে। তখন শহরেও বহু লোক কলেরায় ছিল। প্রতি বছরই মরে।

লোকটা যেন চেনা, জিজ্ঞেস করলে, "কোথা যাবে? বাড়ি কোথায়?"

বাসব বললে, "যাব ইয়াকুবদের বাড়ি। থাকি শহরে।"

—"এই পথ দিয়ে সোজা যাও। ওই আমগাছটির বাঁয়ে যে বাংলা সেই বাড়ি—"

বাসব জানতো; তবুও বললে, "আচ্ছা!"

কিন্তু সে ইয়াকুবদের বাড়ি গিয়ে শুনলো সে গেছে জোলাপাড়া।

জোলাপাড়াটাও বাসব চিনতো। সেখান থেকে বেশি দূর নয়, সামনে আমবাগানটার ওপারে। তাঁতের খট্ খট্ আওয়াজ আসছিল। বাসব বাগান-খানা পার হয়ে জোলাপাড়ায় ঢুকে খান দুই বাড়ি ছাড়াতেই এক জায়গা থেকে কে যেন বলে উঠলো, "কে যায়?"

বাসব ফিরে দেখলো ইয়াকুব। ইয়াকুবের হাতে হুঁকো। সে তামাক খাচ্ছিল! বাসব জানতো যে সে তামাক খায়। বাসব এই জন্য ক্লাসে তাকে ঠাট্টাও করেছে অনেক দিন, তবুও বদ্ অভ্যাসটা ছাড়াতে পারে নি। ওদের বাড়িতেও এর জন্য ওকে কেউ কিছু বলে না, যেন স্বাভাবিক যা, তা-ই সে করছে।

বাসব গিয়ে বসলো ঝকঝকে নিকোনো দাওয়ায়, একখানা তেলচিটে ময়লা পুরোনো পাটির মাদুরে। ঘরে তাঁত চলছিল। দাওয়ায় বসে ইয়াকুবের স্যাঙাৎ লাটাই গোটাচ্ছিল, সামনে উঠোনে জোলা-বউ ঘুরে-ফিরে টানা দিচ্ছিল। জায়গাটাতে মাড়ের মিঠে গন্ধ। সেই সঙ্গে মিশছে গাছ-পালার ও বুনো পচা মাটির টক গন্ধ।

ইয়াকুব এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে, "বাসু, কি জন্যে এসেছো?"

—"বেড়াতে।"

—"এত বেলায়?"

—"এস্নি" বলে সে উঠে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগিলো কেমন করে তাঁত চলছে। দেখলে, ছিট তৈরি হচ্ছে। তাঁত-চালানো সে আগেও দেখেছে। এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই কিন্তু এই সব লোক সমাজের

একটি বিশেষ প্রয়োজন মিটায় অথচ থাকে কি কষ্টে! সর্ব্বত্রই এদের অবস্থা সমান।

কিন্তু সেখানে তার দাঁড়াতে ভাল লাগলো না। তার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। সে কি যেন একটা করতে চায় কিন্তু পারছে না। সেজন্য তার মন এমন অস্বস্তি বোধ করছে, এমন অশান্ত হয়েছে, এমন বেদনায় ভরে আছে যে কোথাও গিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে না। সে সরে এসে বললে, "ইয়াকুব, চললাম।"

—"এলে যখন তখন খানিকটা বস। চল আমাদের বাড়ি!"

—"কি হবে গিয়ে?"

বাচ খেলার কথা তাকে জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছা ছিল না, তবুও সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে।

ইয়াকুব বললে, "এবার কি একটা গোলমাল হয়েছে। বাপজানের দেহও ভাল না। তাই খেলা হবে ... তোমরা বাচ খেলবে না? তোমাদের তো পরব"

—"বাচ আর কি খেলবো? নৌকোয় বেড়া... হবে"

—"তোমার মনটা বুঝি ভাল নেই বাসু? ... মাঝে তোমার কি হয় বল তো?" বলে ইয়াকুব তার কাঁ... হাত রেখে মুখের দিকে জিজ্ঞাসা-ভরা চোখে তাকালে।

বাসব হেসে ফেললে, বললে, "কিছু না।"

—"হাঁ, হয়। তুমি ভাবুক, কবি। কি ভাব, আঁ..."

বাসব চুপ করে রইলো।

—"চল আমাদের বাড়ি। চল-চল—" বলে ... বাসবের হাত ধরে টানতে টানতে তাদের বাড়ির দি... নিয়ে চললো।

(ক্রমশঃ)

বিলাতের ক্রিকেট

শ্রীধীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ

তোমরা বোধ হয় জান যে ভারতবর্ষ থেকে বাছাই করা একটি দল এ বছর বিলেতে ক্রিকেট খেলতে গিয়েছে। এর আগেও এ দেশ থেকে বিলেতে ক্রিকেট দল পাঠানো হয়েছিল, তবে এবারকার টীমই বোধ হয় সব চেয়ে শক্তিশালী। এবারকার টীমের ক্যাপ্টেন হয়েছেন পতৌদির নবাব এবং ম্যানেজার হয়ে গিয়েছেন পঙ্কজ গুপ্ত।

এবারকার টীম মনোনয়ন নিয়ে বেশ কিছু সমালোচনা হয়ে গিয়েছে। অধিকারী, আমির ইলাহি এবং ইব্রাহিমের এ দলে স্থান পাওয়া উচিত ছিল। ভারতীয় দলকে বিলেতে গিয়েই উরষ্টার ক্রিকেট টীমের সঙ্গে খেলতে হ... ভারতীয় দলের ভাগ্য সেদিন খারাপ বৃষ্টি এবং ... পড়াতে খেলা ভাল ভাবে চলতে পারে নি। ফলে ভার... দলকে প্রথম খেলায় সামান্যর জন্য (১৬ রানে) উরষ্টারের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। খেলা... ফলাফল: উরষ্টার—প্রথম ইনিংস—১৯১ রান্, দ্বি... ইনিংস—২৮৪ রান্! ভারতীয় দল—প্রথম ইনিংস—... রান্, দ্বিতীয় ইনিংস—২৬৭ রান্।

এর পরে ভারতীয় দলকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যাল... সঙ্গে খেলতে হয়। তাদের সঙ্গেও ভারতীয় ...

...টেই ভাল খেলতে পারে নি অক্সফোর্ড প্রথম ইনিংসে করে ২৫৬ রান্, দ্বিতীয় ইনিংসে—২৪৫ রান্ (৩ উইঃ)। ভারতীয় দল করে প্রথম ইনিংসে ২৪৮ রান্। দু'দিনের খেলা সময়াভাবে ড্র হয়ে রইল।

কিন্তু এর পর থেকেই ভারতীয় দলের খেলা একেবারে ...রে গেল! ভারতীয় দলের তৃতীয় খেলা সারের সাথে ...য়। এই খেলায় ভারতীয় দল ৯ উইকেটে জয়লাভ ...রে। এই খেলায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল শেষ ...ইকেটে ব্যানার্জ্জি ও সারেভাতের জুটি রেকর্ড। তাঁরা ...লণ্ডের আগের রেকর্ড শেষ উইকেটে ২৩৫ রান্ ভেঙ্গে ...৪৯ করলেন। ব্যানার্জ্জি এবং সারেভাতে যথাক্রমে ১২১ ও ...২৪ (নঃআঃ) রান্ করেছেন। খেলার ফলাফল: ভারতীয় ...ল প্রথম ইনিংস ৪৫৪, দ্বিতীয় ইনিংস—২৪ (১ উইঃ)। ...রে—প্রথম ইনিংস—১৩৫ দ্বিতীয় ইনিংস—৩৩৮।

এর পরের খেলা কেম্ব্রিজ দলের সঙ্গে হয়। এ ...লায় ভারতীয় দল ১ ইনিংস ও ১৯ রানে জয়লাভ ...রে।

এর ঠিক পরেই ভারতীয় দলকে লিষ্টার দলের ...ঙ্গে খেলতে হয় এবং ৩ দিনের খেলাতে ড্র হয়ে শেষ ...। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে করে ১৯৮ রান্ (... উইঃ), দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৭ রান্ (৬ উইঃ)। লিষ্টার—প্রথম ইনিংসে ১১৪ রান্, দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪ রান্ (১ উইঃ)।

এরপর ভারতীয় দল স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে দু'দিনের খেলা খেলে ১ ইনিংস ও ৫৬ রানে জয়লাভ করে।

ভারতীয় দলের ষষ্ঠ খেলা হয় বিলেতের নামকরা টীম এম্.সি.সির সঙ্গে। ভারতীয় দল এ খেলাতে ১ ইনিংস ও ১৯৪ রানে জয়লাভ ক'রে গৌরব অর্জ্জন করে।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে হয় ৪৩৮ রান্, এম. সি. সির প্রথম ইনিংসে ১৩৯, দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৫।

এরপর ভারতীয় দল ইণ্ডিয়ান্ জিমখানার সঙ্গে একদিন ব্যাপী খেলা খেলে ৬ উইকেটে জয়লাভ করে।

এর পরের খেলা ভারতীয় দল হ্যাম্পশায়ার দলের সঙ্গে খেলে ৬ উইকেটে জয়লাভ করে।

হ্যাম্পশায়ার প্রথম ইনিংসে করে ১৯৭ রান্, দ্বিতীয় ইনিংসে—১৪২ রান্। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে করে ১৩০ রান্, দ্বিতীয় ইনিংসে ২১২ রান্ (৪ উইঃ)।

পরের খেলা গ্লেমোরগান টীমের সঙ্গে হয়। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে করে ৩৭৬ (ডিক্লেয়ার্ড)। গ্লেমোরগান প্রথম ইনিংসে করে ১৪৯ রান্, দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৩ রান্ (৭ উইঃ)। সময়াভাবে খেলা ড্র হয়।

কুড়ান গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্.সি

১

আদালতে খুনের মামলা চলিতেছে। দায়রায় ...চারের শেষ অঙ্ক আসামী দোষ স্বীকার করিয়াছে। ...জ্, সাহেব জুরিদের চার্জ বুঝাইয়া দিয়াছেন। জুরিরা ...রামর্শ-গৃহে গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে জুরিরা ফিরিয়া ...সিলেন এবং মত দিলেন 'নট্ গিল্টি'—অর্থাৎ আসামী ...র্দ্দোষ! জজ্ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন—বলিলেন, "বলেন ...; লোকটা নিজে অপরাধ স্বীকার করেছে, তা সত্ত্বেও কি ...পনাদের এই মত?" জুরিদের ফোরম্যান্ বলিলেন, "...জুর, আমরা এ অঞ্চলের লোক, আসামীকে খুব চিনি। সে জীবনে একটাও সত্য কথা বলে নি। কাজেই তার কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। নিশ্চয়ই তার কোনও মতলব আছে, তাই স্বীকার করেছে।"

২

এক জেলায় কালেক্টর সাহেবের হাতের লেখা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য ছিল। নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগকে মাঝে মাঝে সাহেবের নিকট গিয়া উহা বুঝিয়া আসিতে হইত। একবার সাহেব কোন এক কাজের বিষয়ে এক আদেশ (order) লিখিয়া রাখিয়া মফঃস্বলে যান। পরদিন

প্রধান কেরাণী সেই আদেশ অনুসারে কি ভাবে কাজ হইবে তাহা পড়িতে গিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অন্যান্য কর্ম্মচারীর সমবেত চেষ্টার ফলেও যখন ব্যাপারটার কোনও সমাধান করা গেল না তখন সকলে সিনিয়ার ডেপুটির কাছে গিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তিনিও কিন্তু পাঠোদ্ধার করিতে পারিলেন না। অথচ উহা পড়া না গেলে কাজ-কর্ম্মই বা কিরূপে হইবে! সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এক জন বৃদ্ধ কেরাণী বলিলেন, "কম্পাউণ্ডাররা ডাক্তারদের অনেক দুর্ব্বোধ্য লেখাও পড়ে ওষুধ তৈরী করে দেয়, তাদের কারও সাহায্য নিলে কেমন হয়?" উপায়ান্তর না থাকায় সেইটীই সমীচীন পরামর্শ স্থির হইল। ডেপুটী বাবু স্বয়ং নিকটস্থ এক প্রসিদ্ধ ঔষধের দোকানে গিয়া কম্পাউণ্ডারকে উহা পড়িতে বলিলেন। কম্পাউণ্ডার তখন ব্যস্ত ছিলেন, বলিলেন, "রেখে যান, এক ঘণ্টা পরে আসবেন।" ডেপুটী বাবু ভাবিলেন দুরূহ লেখা, পড়িতে সময় লাগিবে, তাই পরে আসিতে বলিয়াছে। একঘণ্টা পরে যখন ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইলেন তখন কম্পাউণ্ডার তাঁহার নিকট এক শিশি ঔষধ, ডাক্তারখানার ছাপমারা কালেক্টরের অর্ডারপত্র এবং আড়াই টাকার একটি বিল উপস্থিত করিলেন।

৩

আচার্য্য বেদীতে বসিয়া গম্ভীরভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিতে ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভক্তির কথা বলিতেছিলেন। আবেগ ভরে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইল। নিজের ভাষার মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন, সময়ের প্রতি আর তাঁহার দৃষ্টি রহিল না। শ্রোতৃবৃন্দ কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশের প্রতি এতক্ষণ মনোনিবেশে সমর্থ হইল না। একজন একজন করিয়া তাহারা চলিয়া যাইতে লাগিল। বক্তা যখন চোখ খুলিলেন তখন দেখিলেন, সভাগৃহ জনশূন্য। দেখিয়া তিনি বড় ক্ষুব্ধ হইলেন। এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়িল, দূরে শেষের দিকের একটি আসনে এক ব্যক্তি তখনও বসিয়া আছে। এবার আচার্য্যের বড় আনন্দ হইল; তা হইলে অন্ততঃ একজন লোক তাঁহার বক্তৃতার সমজদার জুটিয়াছে! অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আসুন আসুন, আপনি অত দূরে কেন?—একজন ভাল লোক সহস্র সাধারণ লোকের সমান।"

লোকটি করযোড়ে বলিল, "এই দেখুন না, আমার লোক এই আসছি ব'লে আমাকে বসিয়ে রেখে গেছে সব লোক চলে গেল, আমি যেতে পারলাম না খোঁড়া মানুষ, এখনও তাই বসে আছি।"

নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

(রজত-স্মৃতি পুরস্কার)

১ম, ২য়, ৩য়—মোট তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে।

বিষয়: "তোমার চোখে স্বাধীন ভারতের রূপ কি রকম হবে"—এই বিষয়ে একটি ছোট প্রবন্ধ (অর্দ্ধ ফুল্‌স্ক্যাপ ২ পৃষ্ঠার বেশী না হয়) লিখে পাঠাতে হবে। ১৬ বছর বয়স পর্য্যন্ত যে কোন ছেলেমেয়ে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে। লেখার সঙ্গে নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখে ১০ই শ্রাবণের মধ্যে রামধনু-সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে।

এই পুরস্কার দেবেন শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু,—তাঁর ছেলে রজত বসুর স্মৃতি রক্ষার জন্য। রজত খুব প্রতিভাবান্ ছেলে ছিল। মাত্র ৫ বছর বয়সে একটি দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

দি ফোর হরস মেন অফ্ দি অ্যাপোক্যালিপ্‌সি—অনুবাদক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। ভারত সাহিত্য ভবন, ২০৩।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম স্প্যানিশ লেখক ব্লাস্‌কো ইবানেজের বিখ্যাত বই

গল্পাংশ, ছোটদের উপযোগী ক'রে লেখা। অনুবাদ-সাহিত্যে খগেন বাবু সিদ্ধহস্ত—এ বইএও তিনি তাঁর সে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অনুবাদ হলেও এর ভাষায় ও লিখনভঙ্গীতে মৌলিক উপন্যাসের মাধুর্য্য পাওয়া যায়। ছোটদের কাছে এর আদর হবেই। বইএর মলাটটিও বেশ মনোজ্ঞ।

সংক্ষেপ

আগামী বারে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। এই নিয়ে ৪ বার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হলেন।

* * * *

ভারতবর্ষের শাসন-ভার ভারতীয়দের হাতে দেওয়ার জন্য এবং তদনুসারে এক সাময়িক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য ইংল্যাণ্ডের তিনজন মন্ত্রী এ দেশে এসে বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিলেন সে খবর তোমরা জান। সাময়িক গভর্ণমেণ্টের যে খসড়া তাঁরা করেছেন তাতে মুসলিম লীগ দল শেষ পর্য্যন্ত রাজী হয়েছেন কিন্তু কংগ্রেস দল এখনও রাজী হন নি। প্রস্তাবে কতকগুলি বড় রকম গলদ থাকায় তাঁরা তা সংশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেটিকে মেনে নিতে পারেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

* * * *

কলকাতার ফুটবল্ লীগ্ পুরোদমে চলছে। প্রথম বিভাগে শীর্ষ স্থান পাবার জন্য মোহনবাগান ও ইষ্ট বেঙ্গল দলের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলছে। প্রথমার্দ্ধের শেষে এবং এখন পর্য্যন্ত মোহনবাগানই সকলের উপরে আছে। তবে শেষ পর্য্যন্ত ইষ্ট বেঙ্গল তাদের স্থানচ্যুত করবে কিনা বলা যায় না। মহমেডান্ স্পোর্টিং এবারেও তেমন সুবিধা করতে পারছে না। নীচের দিকে কাষ্টম্‌স্ প্রায় রেকর্ড করতে বসেছে। প্রথম ১৩টি খেলায় তারা প্রত্যেকটিতে হেরেছে এবং গোল খেয়েছে মোট ৭৫ খানার উপর।

* * * *

সম্প্রতি কানিহারি কিশোর-সভার উদ্যোগে এবং ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন কিশোর প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় ময়মনসিংহ সহর থেকে কয়েক মাইল দূরে কানিহারি গ্রামে "ময়মনসিংহ জেলা কিশোর সম্মেলন" সমারোহের সঙ্গে হয়ে গেছে। ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু কিশোর প্রতিনিধি এবং কলকাতা থেকেও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন রামধনু-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য এবং প্রধান অতিথি হয়েছিলেন জাতীয় ক্রীড়াসংঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মল্লিক। সম্মেলনের বিবরণ তোমাদের বারান্তরে শোনান যাবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

আট আনা।

উত্তরদাতাদের নাম:—রামরতি চক্রবর্ত্তী; সুনীল চট্টোপাধ্যায় (বালীগঞ্জ), শিপ্রারাণী ঘোষ (ময়মনসিংহ); সুহাসচন্দ্র মুখার্জ্জি (হাসী ষ্ট্রীট); প্রসন্নকুমার দাস (জিয়াগঞ্জ); কেশবদাস ও প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (কালীঘাট); দেবীপ্রসন্ন, রামেশ্বরপ্রসন্ন, সুভাষপ্রসন্ন, ইন্দুপ্রসন্ন ও গৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); তুষারকুমার ঘোষ (ভবানীপুর); কাঞ্চন-সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (কাঞ্চননগর); বাবলু পাইন (ঘাটশিলা); শ্রীলেখা, প্রতিমা বসু ও বীরেন দা (সসারাম)।

নূতন ধাঁধা

হরিশের সঙ্গে মাধবীর বিয়ে হয়েছে। হরিশের মেজমাসিমার পিশতুত ননদ সাবিত্রী দেবী। তাঁর ভাইপোর খুড়শ্বশুর হচ্ছেন মাধবীর বাবা। তা হলে হরিশের সঙ্গে মাধবীর কি সম্পর্ক হ'ল?

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"

(গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

আট রকম বইএর নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, বাকি বইগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

১। হারান বই—(নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)
২। জীবন্ত সমাধি—(সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)
৩। মিসমিদের কবচ—(বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)
৪। উদাসী বাবার আখড়া—(নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ)
৫। কেউটের ছোবল—সুনির্ম্মল বসু
৬। মুখ আর মুখোস—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)
৭। নীল আলো—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেকখানি বারো আনা

"প্রহেলিকা সিরিজ"

(ডিটেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চার)

ফাল্গুন মাস—রক্তভৃষা—অনলকুমার চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র—নকলের হিমালয়—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বৈশাখ—বি, এল, এ-২০৫—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো
জ্যৈষ্ঠ—জয়-পরাজয়—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
আষাঢ়—পূজনীয় দস্যু—খগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রত্যেকখানি দাম এক টাকা।

বিরাট সচিত্র গ্রন্থ—১৫৪ পৃষ্ঠা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

এক মাসের মধ্যে বই নিঃশেষ হওয়ায়

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

চমকপ্রদ অন্তর্দ্ধান কাহিনী পরিপূর্ণ মূল্য ১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর * ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি। দাম এক টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বজগতের শেষ কথা!

—দেশবাসীর এই অনাবিল প্রশংসা আমাদের উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধন করে আসছে এক শতাব্দীর উপর। এর মূলে রয়েছে আমাদের একনিষ্ঠ সাধনা, কারিগরগণের অননুকরণীয় নৈপুণ্য ও তদুপরি আমাদের বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট উপকরণ।

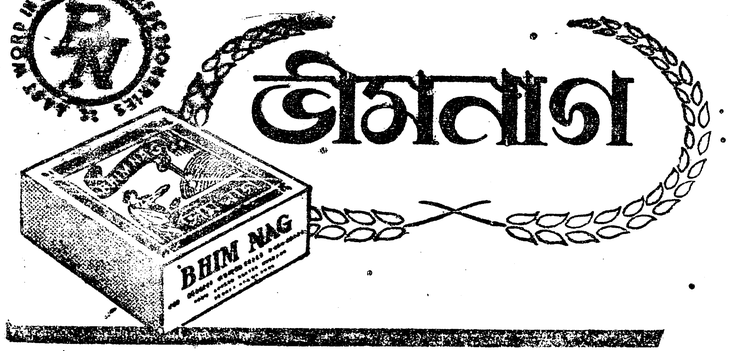

Regd.

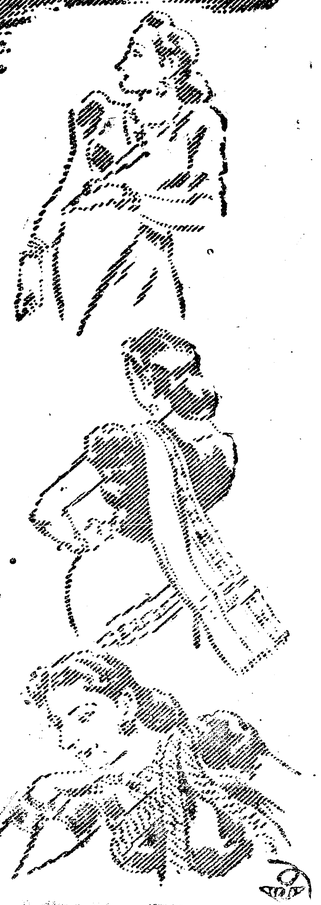

গহনা ও শাড়ী

শুধু শাড়ী যত সুন্দর হোক,
তা নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ করে না।
শুধু গহণা যত সুন্দর হোক,
তাতে নারী-রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে
ওঠে না।
শাড়ী ও গহণার মিলনেই
নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ হয়।

তাই আমরা—
পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা পরিবেশনের
জন্য নানা প্রকারের বেণারসী শাড়ীর
আয়োজন করেছি—শাড়ীগুলি
বর্ণ-বৈচিত্র্যে, রূপরচনায়
অনিন্দ্যসুন্দর।

আমাদের গহণা—আধুনিক রুচি-
সম্মত শিল্পচাতুর্য্যে, রূপছন্দে
অভিনব।

KJW

GRAMS: KUNDJUEL

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১৩৫৩

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস-সি

কার্য্যালয় : ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন : সাউথ ১২৬

Regd. No

গহনা ও শাড়ী

শুধু শাড়ী যত সুন্দর হোক,
তা নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ করে না।
শুধু গহনা যত সুন্দর হোক,
তাতে নারী-রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে
ওঠে না।
শাড়ী ও গহনার মিলনেই
নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ হয়।

তাই আমরা—
পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা পরিবেশনের
জন্য নানা প্রকারের বেণারসী শাড়ীর
আয়োজন করেছি—শাড়ীগুলি
বর্ণ-বৈচিত্র্যে, রূপরচনায়
অনিন্দ্যসুন্দর।

আমাদের গহনা—আধুনিক রুচি-
সম্মত শিল্পচাতুর্য্যে, রূপছন্দে
অভিনব।

১০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন: বি.বি. ৩৩০০ GRAMS: KUNDJUEL

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১৯শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
শ্রাবণ,
১৩৫৩

বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ১৸৵
প্রতি সংখ্যা
।৵

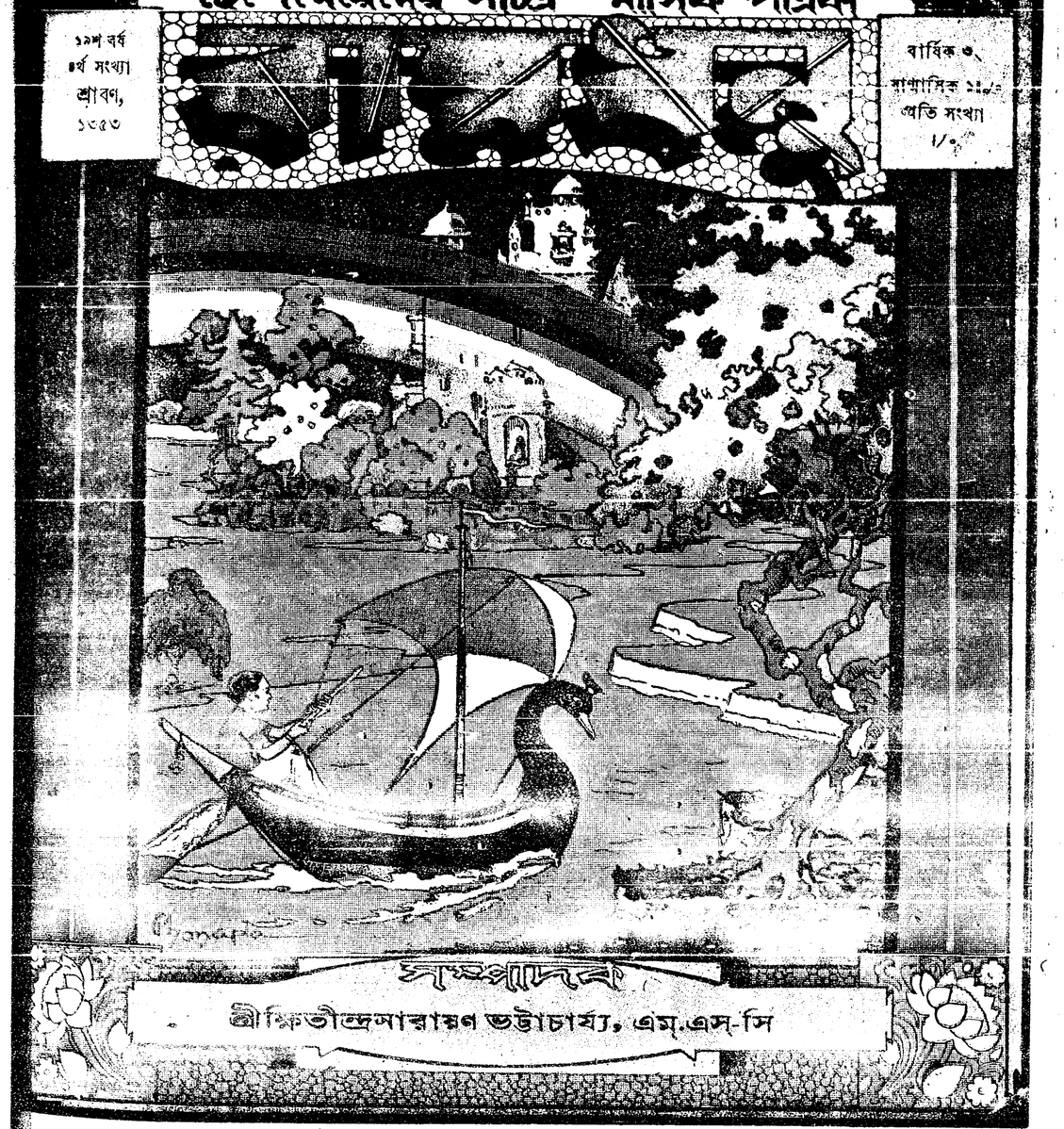

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

কার্য্যালয়: ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্: সাউথ ১২৬

COLOUR PAPER

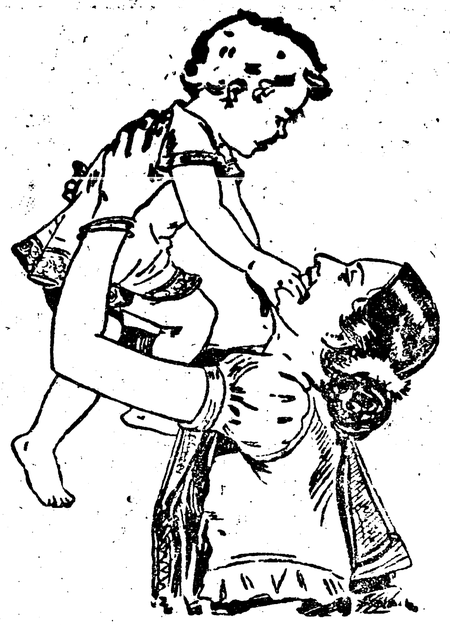

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তৈল ব্যবহার করুন

২৪৩, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা ফোন: ২৭৭৪ বড়বাজার

১৩ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লিলি ব্র্যাণ্ড
বার্লি

স্বাস্থ্য সংরক্ষনে ও জন-কল্যানে
লিলি-ব্র্যাণ্ড বার্লি
তার আদর্শকে কোন দিন খর্ব করে নাই।

তাই সুদিনে বা দুর্দিনে সবার কাছে
তার সমান আদর!

লিলি বিস্কুট কোম্পানী: কলিকাতা

Regd. No

গহনা ও শাড়ী

শুধু শাড়ী যত সুন্দর হোক,
তা নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ করে না।
শুধু গহণা যত সুন্দর হোক,
তাতে নারী-রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে
ওঠে না।
শাড়ী ও গহণার মিলনেই
নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ হয়।

তাই আমরা—
পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা পরিবেশনের
জন্য নানা প্রকারের বেণারসী শাড়ীর
আয়োজন করেছি—শাড়ীগুলি
বর্ণ-বৈচিত্র্যে, রূপরচনায়
অনিন্দ্যসুন্দর।

আমাদের গহণা—আধুনিক রুচি-
সম্মত শিল্পচাতুর্য্যে, রূপছন্দে
অভিনব।

KJW

২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন বি. বি. ৩১০০ GRAMS: KUNDJUEL

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১৯শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
শ্রাবণ,
১৩৫৩

বার্ষিক ৩,
ষাণ্মাসিক ১৸৴০
প্রতি সংখ্যা
।৴০

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

কার্য্যালয় : ১৬, টাউন্‌সেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্ : সাউথ ১২৬

COLOUR PAPER

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিংশ শতাব্দীর স্মরণীয় সাহিত্য আহরণ !

স্মরণাতীত কাল থেকে আজপর্য্যন্ত শিশু-কিশোর-তরুণদের বিশ্রামের অবসর আনন্দ-মুখর ক'রে তোলবার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে এসেছেন, সবার আগে তাঁদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে প্রকাশের আয়োজন হচ্ছে, অভিজাত-পূজাবার্ষিকী—'আকাশদীপ।'

যুগমান্য শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ,

শিশুসাহিত্য-সম্রাট

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

—'চিত্রবহুল বিরাট পূজাবার্ষিকী —

আকাশদীপ

মহাপূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হবে।

গত পূজায় '**কলরব**' পেয়ে যাঁরা খুশী হয়েছেন, '**আকাশদীপ**' তাঁদের চিত্ত আকর্ষণ **করবেই** এ-বিশ্বাস আমাদের আছে।

অলকনন্দা-সিরিজ অতঃপর প'ড়বেন—

শিশুসাহিত্য-সম্রাট **হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'সুন্দরবনের রক্তপাগল !'**

তারপর শিশুসাহিত্যাচার্য্য **সৌরীন্দ্রমোহনের 'পথভোলা পথিক'**

১। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
রত্নপুরের যাত্রী

২। শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
"বন্দী, জেগে আছো ?"

৩। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
রীতিমত এ্যাড্‌ভেঞ্চার

৪। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

৫। শ্রীসুমথনাথ ঘোষের
মোহন সিংয়ের ফাঁসী

৬। শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
অভিশপ্ত সম্পদ

শরৎ-সাহিত্য-ভবন * ২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, পোঃ বক্স ১৬৬১০, কলিকাতা।

এবার পূজায় ছেলেমেয়েদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার

অঞ্জলি

কবিতা
গল্প
উপন্যাস
আমোদ প্রমোদ
খেলাধুলা
রংবেরংয়ের ছবি

বিরাট ঝকঝকে বই !

ছোটদের আনন্দের খনি !

পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

দেব সাহিত্য কুটীর ★ ২২/৫ বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

নতুন বই

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার

প্রথম গ্রন্থ

দি লাষ্ট্‌ অফ্‌ দি মোহিকান্‌স্‌

মর্ম্মানুবাদ করেছেন—সুলেখক শ্রীঅমলেন্দু সেন,

দাম ॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রসা রোড্‌, কলিকাতা

কিশোর-মনের বলিষ্ঠ মাসিকপত্র

কিশোর বাংলা

সম্পাদক—অরূপ

২৫ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছোটদের উপহারের কয়েকখানি ভাল ভাল বই

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

ধূমকেতু (রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস) ৸০

আবিষ্কারের গল্প (বিখ্যাত অভিযাত্রীদের রোমাঞ্চকর কাহিনী) ৸০

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

নূতন পুরাণ (মজার গল্প) ৸৵০

হাস্য ও রহস্য (ঐ) ৸৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি (মজার গল্প) ৸০

মনোরঞ্জন ও শিবরামের

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে (মজার গল্প) ৸৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রসা রোড্‌, কলিকাতা

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

—'লক্ষ্মী ঘি'

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৯শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৫৩ | ৪র্থ সংখ্যা

এক যে ছিলো মজার শিশু

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

এক যে ছিলো মজার শিশু—বয়স মাত্র আশী—
সকল শিশুর মন ভুলাতো বাজিয়ে মোহন বাঁশী।
কেশের গুচ্ছ নয়নরম
হিমালয়ের তুষার সম,—
গাল-ভরা তার শ্মশ্রু সাথে খেলতো মধুর হাসি;
সকল শিশুর মনের সাথী—বয়স মাত্র আশী।

সেই শিশুটির কণ্ঠে কেবল ছিলো খুসীর গান,
ছন্দে তা'রি উঠ্‌তো নেচে ছেলেমেয়ের প্রাণ।
আপন-ভোলা বাউল বুড়ো
অঙ্গে মেখে গোলাপ গুঁড়ো
ফুল্‌তো সে যে ফুলের বনে মৌমাছিদের তান:
তা'দের দলে নাচিয়ে দিতো গেয়ে খুসীর গান।

যাদুকরের মতন সে যে জালতো রঙীন আলো,—
বনের ধারে অন্ধকারেও রইতো না আর কালো।
শান্ত শিশু চল্‌তো ছুটে
পথের ঘাসে বাইরে লুটে,
রুটিন্-বাঁধা পাঠশালা আর লাগ্‌তো না তার ভালো,
নীল আকাশের ইসারাতেই জ্বল্‌তো তারার আলো।

মায়া-কাজল পরিয়ে দিলো সেই ত' শিশুর চোখে,—
ফুট্‌লো ছবি রঙ্-বেরঙের নতুন বিশ্বলোকে।
গল্প যতো সত্যি হ'য়ে
খোকায় নে' যায় কোথায় ব'য়ে,—
তেপান্তরের মাঠ বেয়ে সে সিংদরজায় ঢোকে—
রাজকন্যে হঠাৎ জেগে তাকায় অবাক্ চোখে।

তার যাদুতেই ফাগুন বনে যখন আগুন জ্বলে,
অশোক-পলাশ-শিমুল ফুলে রক্তজবার দলে,—
বকুল-চাঁপার চিকণ রঙে,
কৃষ্ণচূড়ার মোহন ঢঙে,
লাগ্‌তো মায়া শিশুর চোখে রঙীন জলস্থলে,
ফাগুন বনের রক্ত ফুলে আগুন যখন জ্বলে।

কালবোশেখীর মেঘটা যেন হঠাৎ আসে ধেয়ে—
ঘট্‌বে কি যে—ভয়-ভাবনায় শিশুরা রয় চেয়ে।
শেষ কালে তার তড়িৎ-রাগে
একটু মিঠে হাসি জাগে,—
বৃষ্টি নামে ঝর্‌ঝরিয়ে মাঠের প্রান্ত ধেয়ে;
দেশটা জুড়ে টাপুর-টুপুর গান আসে তার ধেয়ে।

সেই যে ছিলো মজার শিশু—বয়স মাত্র আশী,—
লুকোচুরি খেল্‌তে হঠাৎ থাম্‌লো তাহার বাঁশী।
মিলিয়ে গেলো কোন্‌খানে যে,
কোন্ রূপে ফের আস্‌বে সেজে,
কখন্ কোথায় আড়াল থেকে উঠ্‌বে চাপা হাসি!
লুকোচুরি খেলার গুরু—বয়স মাত্র আশী।

বাংলা দেশের শিশুরা আজ খেলছে আকাশ-তলে,
আভাসে সে দেখা যে দেয়—হারিয়ে যাওয়ার ছলে।
কাশের গুচ্ছে নদীর তীরে
মাথা তুলে একটু ফিরে'
উঁকি মেরে যায় সে ডুবে হাওয়ায়-দোলা জলে;
চাদরখানি ছড়িয়ে দে' যায় উষার আকাশ-তলে।

আগমনীর সুরে যখন হর্ষে সবাই মাতে,
ছেলেমেয়ে নেচে বেড়ায় মুখর আঙ্গিনাতে,—
'কাঙালিনীর' করুণ বেশে
দুয়ারে সে দাঁড়ায় এসে,
অশ্রু নামে সকল মায়ের সজল আঁখিপাতে;
বক্ষে তারে জড়িয়ে নিতে ছেলেরা সব মাতে।

স্বপন হয়ে নামে সে যে খোকার আঁখির 'পরে,
চাঁদের আলোয় ইসারা তার সারা আকাশ ভরে।
ঘুম ভেঙে যায় পরশে কা'র,
চমক লাগে দুষ্টু খোকার,—
হঠাৎ দেখে হাসিটি তার ভুবন আলো করে!
শিশুর কবি রাঙ্গা 'রবি' নামে আঁখির 'পরে।

বাইরনের বাড়ীতে

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

মানুষ মাত্রেই শৈশবে তার চরিত্র গঠন করে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার বশবর্ত্তী হয়ে। যে সমাজে সে মানুষ হয়েছে, যে বাড়ীতে সে বাস করেছে, যে প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় সে শৈশবকালের খামখেয়ালী মন নিয়ে খেলা করে বেড়িয়েছে সেগুলির প্রভাব তার মনে এমন দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় যে বয়স বাড়লেও মানুষ সেগুলির কবল থেকে নিজেকে একেবারে ছাড়াতে পারে না।

তবে এ থেকে মনে করা ভুল যে, শুধু সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বাস ক'রে যে কোনো লোক একজন কবি হয়ে উঠতে পারে। কবি হ'তে হ'লে প্রয়োজন একটা বিশেষ সৌন্দর্য্যবোধ ও সেই সৌন্দর্য্যবোধকে কালি-কলমে ফুটিয়ে তুলতে পারার ক্ষমতা। বাইরনের এই দু'টী গুণই ছিল ও তাই নিউষ্টেড এবিনিউয়ের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর কাব্যের উপর একটা বিশেষ ছাপ দিতে পেরেছিল। নিউষ্টেড এবিনিউয়ে বাইরনের বাড়ীতে, বাড়ীর চার পাশে সুন্দর বাগান, বাগানে ও বনের ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বারে বারে আমার সে কথা মনে হচ্ছিল।

বাইরন যখন শৈশবে নটিংহামে বাস করতেন তখন

ছুটীর দিনে নিউষ্টেড এবিনিউএ বেড়াতে ন। স্থানটিতে এসে তাঁর কাব্যিক মন খুলে যেত। তন্ময় চিত্তে সেখানে বেড়িয়ে বেড়াতেন। সত্যই সুন্দর সে স্থান। সবুজ ঘাসের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে লাল কাঁকর বিছানো রাস্তা। রাস্তার দুই ধারে গাছের সারি। প্রকাণ্ড বাড়ী। তার চার ধারে বাগান ও স্থানে স্থানে গাছগুলি এত ঘনভাবে হয়ে আছে যে দূর থেকে দেখলে বন ব'লে ভুল ফুলগাছ অসংখ্য। রেলিং দিয়ে ঘেরা খোকা ফুলগাছে ফুল ফুটে রয়েছে। আজও সে বাগানে জন মালী নিযুক্ত করা আছে, তাই বাগানের অযত্ন । একটা পুকুর, তাতে ভাসছে শাপলার লতা। ভিতর প্রবেশ করে দেখি কবির বহু স্মৃতি সেখানে পেয়েছে। কবির লাইব্রেরী, কবির শোবার ঘর, বসবার ঘর সবই আজ সেখানে দেখতে পাওয়া সাধারণ চোখ নিয়ে দেখলে বাড়ীটির ভিতর কোনো জিনিষ দেখতে পাওয়া যায় না যা দেখলে মন মনে থাকতে পারে কিন্তু জিনিষগুলি আমাদের ন প্রিয় কবির নিজস্ব ছিল এ কথা মনে হলে ঐ পারে সামগ্রীর ভিতর থেকেও যথেষ্ট মাধুর্য্য গ্রহণ যায়। আর তা ছাড়া কবির কাব্যের সঙ্গে কবির ও কবির মনের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক ব্যবহারিক র একট যোগ আছে।

াইরন স্বভাবতঃ খুব আমুদে প্রকৃতির লোক ন না। ব্যথার রেশ সর্বদাই তাঁর মনের উপর কুহেলিকার সৃষ্টি করতো। বাইরনের মত উচ্চ-আদর্শবাদীরা সাধারণতঃ সমাজের অবিচার, র অন্যায়, বন্ধুবান্ধব ও প্রিয় জনের মনের র্ণতাকে অনুভব ক'রে দুঃখবোধ করেন। এইরূপ র মন নিয়ে তিনি নিউষ্টেড এবিনিউয়ের গাছ-ঢাকা নির্জ্জন স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে প্রচুর পেতেন।

ত দিন এমনি গেছে যেদিন কবি নিউষ্টেড এবি-য়ের বাগানের এক কোণে গালে হাত দিয়ে বসে পাতাল চিন্তা ক'রে চলেছেন। এক রাশ হাওয়া তাঁর দুঃখে দুঃখিত হয়ে সামনের ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। গাছের ভিতরে পাখীর কলরব। সামনে ফুলগাছে সমস্ত দিন ধরে যে ফুল ফুটেছিল সেও দিনের আলো ডুবে যেতেই পাপড়ী বুজিয়ে মুখ ঢেকেছে। মাথার উপরে লম্বা লম্বা গাছের ভিতর দিয়ে এক ঝাঁক বাদুড় উড়ে গেল। কাছেই গির্জ্জা। ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজিয়ে সন্ধ্যারতি হচ্ছে।

আমি সেখানে বেড়াতে গেছি দু'দিন,—একদিন পনেরো মাইল দূর থেকে হেঁটে, আর একদিন সাইকেল করে। দু'টো দিনই ছিল ছুটীর দিন। তাই গিয়ে দেখি দলে দলে লোক সেখানে বেড়াতে গেছে। তাদের ভিতর কেউ কেউ দিন ভর সেখানে কাটাবে ব'লে সঙ্গে খাবার নিয়ে গেছে। অতগুলি লোকের ভিতর আমি একা ভারতীয়। তাই বহু লোক কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

কবির বাড়ীতে বেড়াতে বেড়াতে কবির জীবনের অনেক কথাই মনে পড়তে লাগলো। বাইরন শুধু কবিই ছিলেন না, একজন আত্মত্যাগী ও মহৎ অন্তঃকরণের মানুষও ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শবাদী এবং জাতীয় স্বাধীনতাকে তিনি অতি উঁচুতে স্থান দিতেন। ইংলণ্ডের সেদিন মহা সঙ্কটের দিন। নেপোলিয়নের দাপটে সমগ্র ইউরোপ তার স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিতে বসেছে। ইংলণ্ডের আর কোনো কবি সেদিন তা'তে তেমন বিচলিত হ'ন নি। সাউদে তখন হিন্দুপুরাণ নিয়ে গবেষণা করছেন, রজার্স তাঁর কাব্য নিয়ে ব্যস্ত, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তখন অন্য এক ধরণের জনসেবায় মন দিয়েছেন, ওয়াল্‌টার স্কট বা কোল্‌রিজেরও এদিকে তেমন নজর যায় নি, ক্যাম্বেল তাঁর এক মূল্যবান্ কাব্যগ্রন্থ শেষ করবার জন্য দিনপাত করছেন, মূর দেশের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বটে তবে দেশের যে কত বড় সঙ্কটের দিন এসেছে তার গুরুত্ব তেমন বোঝেন নি। বাইরন বেরিয়ে এলেন তাঁর কল্পলোক ছেড়ে। ইংলণ্ডবাসীকে তিনি মহাসমরে আহ্বান করলেন তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে। সে যুগে বিজ্ঞানের চেয়ে কাব্যের প্রভাব মনের উপর বেশী ছিল। তাই বাইরনের আহ্বানে তারা সাড়া

TIGHT BINDING

দিল। তাঁর কাব্যের সুন্দর ভাষা, মধুর ছন্দ, প্রাণময় ভাব এসে বিঁধলো জনগণের মনের উপর। সহস্র সহস্র লোক উদ্দীপিত হয়ে উঠলো কবির আহ্বানে।

আজ জাতীয় জীবন গঠনে কাব্যের প্রভাব কম। এর কারণ বিজ্ঞানের একাধিপত্য ক্ষমতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ যুগে কোনো কবি জনসমাজকে তাঁদের দেশের [illegible]বাদে উদ্দীপ্ত করতে খানিকটা প্রয়াস পেয়েছেন। এমনি সব কবির কি আবির্ভাব হতে পারে না [illegible] বাইরনের মত আদর্শ নিয়ে সমগ্র-মানব জাতির [illegible] সংগ্রামে ব্রতী হতে পারেন?

হিরোশিমার বিভীষিকা

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

সুনীল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে সবুজ পত্রশস্যে ঢাকা, নিপ্পন দ্বীপমালা। বিদেশীরা যাকে বলে জাপান। দূরে দূরে পাহাড়ের শ্রেণী। পাহাড়ের গায়ে গায়ে কাঠ, বাঁশ ও কাগজের তৈরি ছোট্ট জাপানী ঘরগুলি দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। ঘরগুলি ছোট হ'লেও খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং প্রত্যেকটি বাড়ী মনোরম ফুলের বাগানে ঘেরা।

রাজধানী টোকিও যে খাড়ীর ওপর অবস্থিত তারই অপর পাশে একখানি ছোট্ট গ্রাম। অধিবাসীরা প্রায় সকলেই জেলে। তারা সমুদ্রে মাছ ধরে টোকিওতে চালান দেয়। এই গ্রামেরই একখানি কুটীরে বৃদ্ধ ধীবর হামাগুচি বাস করে। তুষারাবৃত 'গিরিরাজ ফুজিয়ামা—যাকে জাপানীরা জাপানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব'লে পূজা করে—তা এই গ্রাম থেকে অল্প দূরেই অবস্থিত।

বৃদ্ধ হামাগুচির সংসারে তার একমাত্র ছেলে ইয়া-জিমো। সে শৈশবেই মাতৃহীন। চৌদ্দ বছর আগে একদিন হামাগুচি কিছুদিন সপরিবারে দূর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল, সেই সময়ে হঠাৎ এক ভীষণ ঝড় উঠে তার ছোট্ট নৌকাখানিকে উল্টিয়ে দেয়। 'ইয়াজিমোর মা শিশুপুত্রটিকে কোন রকমে স্বামীর কোলে ফেলে দিয়ে নিজে অতল সমুদ্রে সলিল সমাধি লাভ করেন। সেই থেকে শিশু ইয়াজিমোকে তার পিতাই মানুষ ক'রে তুলেছে। মাকে তার মনে পড়ে না। কিন্তু সমুদ্রের ওপর তার একটা প্রবল আকর্ষণ। তার ইচ্ছা বড় হয়ে সে নাবিক হবে, অসীম সমুদ্রে পাল তুলে দিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবে।

কিন্তু হামাগুচি কিছুতেই তাকে দূর সমুদ্রে [illegible] দেয় না। তার সর্ব্বদাই ভয় হয় পাছে তার এক[illegible] পুত্রকেও সে হারায়। তাই সে ইয়াজিমোকে টোকি[illegible] এক স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছে। স্কুলে ইয়াজিমো [illegible] ছেলেদের মধ্যে একজন। কিন্তু অঙ্কে তার কিছু[illegible] মন লাগে না। তার প্রিয় বিষয় হচ্ছে ইতিহাস ও প্রা[illegible] জাপানের বীরগাথা। পাশ্চাত্য জাতিগুলির ওপর [illegible] মোটেই শ্রদ্ধা নেই, তবু ইংলণ্ডের ইতিহাস সে গ[illegible] মনোযোগের সঙ্গে পড়ে। তার বিশ্বাস, দেশবি[illegible] বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তার ক'রে একটা জাত কি ক[illegible] বড় হয় তার রহস্য ইংলণ্ডের ইতিহাসেই আ[illegible] নিপ্পনের প্রাকৃতিক সুবিধা ও খনিজ-সম্পদ্ ইংলণ্ডের [illegible] কম নয়, তবে সে-ই বা কেন পিছে পড়ে থাকবে?

১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাস। জাপান বৃটেন [illegible] আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইয়াজিমোর [illegible] হৃদয় উদ্দীপনায় নেচে উঠল। এইবারে তাদের সু[illegible] এসেছে। জাপানের আইন অনুসারে ১৮ বছর ব[illegible] সকল পুরুষকেই কিছুদিনের জন্য স্থল বা জল-সৈন্যদলে [illegible] শিখতে হয়। আজ সঙ্কটকালে জাপানী সরকার ১৫ ব[illegible] বয়স্ক বালকদেরও আহ্বান করেছেন। ইয়াজিমো স[illegible] স্কুল থেকে নৌসৈন্যদলে নাম লিখিয়েছে। বাপকে [illegible] জানিয়েই। তার এত দিনের সঞ্চিত আশা আজ [illegible] হবে।

জাহাজে গিয়ে ইয়াজিমো খুব মনোযোগের সঙ্গে [illegible] করতে লাগল। তার পরিশ্রম নিপুণতা ও ক[illegible] পরায়ণতা দেখে কর্তৃপক্ষ খুব সন্তুষ্ট হলেন। সে যে [illegible]ন সুদক্ষ নাবিক হবে এ অভিমত সকলেই প্রকাশ [illegible] লাগলেন। প্রায় তিন বছর কাজ করার পর সে [illegible] মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ী এল বুড়ো বাপকে সে [illegible]ক দিন দেখে নি। তা ছাড়া চিঠি এসেছিল মাকুসীও [illegible]নে এসেছে। মাকুসী তার মাসতুত বোন। তার [illegible]য় বছর দুইএর ছোট।

মাকুসীর মা তাকে মায়ের মতই ভালবাসতেন। [illegible]রাশিমায় তাঁদের মস্ত বড় কাপড়ের কারখানা ছিল। [illegible]ত্তিও ছিল। বছর কয়েক হ'ল মাকুসীর বাবা মারা [illegible]য়ায় কারখানা উঠে গেছে। এখন মাকুসীর মা [illegible]জই সম্পত্তি দেখাশুনা করেন। মাকুসীর বাবার [illegible] ছিল যে তাঁর মেয়ে উচ্চশিক্ষিতা হয়; মাকুসীকে [illegible] তিনি হিরোশিমাতেই এক উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ক'রে [illegible]য়েছেন।

ইয়াজিমোর সঙ্গে মাকুসীর খুব ভাব। তারা একত্র [illegible]ই সর্ব্বদা এক সঙ্গে বেড়ায়, একসঙ্গে খেলে, এক সঙ্গে [illegible]র কাটে, এক সঙ্গে মাছ ধরে, নৌকো নিয়ে এক সঙ্গে [illegible]দ্রে পাড়ি দেয় এবং এক সঙ্গে গল্প ক'রে দিনের পর [illegible] কাটিয়ে দেয়। তাদের দেখে কে বলবে যে তারা [illegible] মায়ের পেটের ভাই বোন নয়। কিন্তু এতটা ভাব [illegible]ও উভয়ের প্রকৃতিতে অনেকটা পার্থক্য। ইয়াজিমো [illegible]হাস ও সংবাদপত্র পড়তে ভালবাসে, সে চায় জাপান [illegible]বার মধ্যে সব চেয়ে মাথা উঁচু করে থাকে, তার জন্য [illegible] জাতিগুলি যদি ধ্বংস হয়ে যায় তো ক্ষতি নেই। [illegible]সী কবিতা লিখতে, চিত্রবিদ্যায় ও অন্যান্য চারুশিল্পে [illegible]। সে চায় সমগ্র জগতে শান্তি স্থাপিত হোক। মানুষে [illegible]য় হিংসা, দ্বেষ ও যুদ্ধবিগ্রহ সে মোটেই পছন্দ করে না। [illegible]য় ভাষা ইয়াজিমো নিয়েছে ইংরেজী, কিন্তু মাকুসী [illegible]ছে পালি। ধর্ম্মেও ইয়াজিমো শিন্তো, কিন্তু মাকুসী [illegible]। জাপানে এ রকম এক পরিবারের মধ্যেও ভিন্ন ধর্ম্ম [illegible]। জাপানের প্রাচীন শিন্তো ধর্ম্ম, পূর্ব্বপুরুষের পূজা [illegible]রপূজাই ইয়াজিমোর কৌলিক ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মই [illegible] খুব ভাল লাগে। ছেলেবেলায় খৃষ্টান পাদরীদের [illegible]শে এসে খৃষ্টানদের সে দেখতে পারত না। ওদিকে [illegible]র কৌলিক ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্মের চর্চ্চায় তার [illegible] কোমল বৃত্তিগুলিও বিকশিত হয়েছিল। সুত্তপিটকের কতকগুলি বুদ্ধের বাণী সে সুন্দর জাপানী পদ্যে অনুবাদ করেছে।

বহুদিন পর আবার দুই ভাইবোনে দেখা। এখন উভয়েরই বয়স হয়েছে, এখন আর তারা খেলা ও মাছ ধরায় তত আনন্দ পায় না। এ সময় জাপানের দারুণ দুর্দ্দিন। ইয়োরোপে হিটলারের জার্ম্মানী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জাপান একা হাতে প্রবল শত্রুদের সঙ্গে লড়ছে। মাকুসী পূর্ব্বাপরই এই যুদ্ধের বিরোধী ছিল এবং তা নিয়ে ভাইবোনে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়। এবার তাদের অধিকাংশ সময় রাজনীতি চর্চ্চা নিয়েই অতিবাহিত হ'ল। ছুটীর শেষে ইয়াজিমো আবার নৌবাহিনীতে ফিরে গেল।

১৯৪৫ সনের বসন্তকাল। জাপানের দুর্দ্দিন আরও ঘনিয়ে এসেছে। জার্ম্মানী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। আমেরিকান ফৌজেরা ওকিনাওয়াতে অবতরণ করেছে, তাদের দুর্দ্দাম গতি অবরোধের শক্তি আর জাপানের অবশিষ্ট আছে ব'লে মনে হচ্ছে না।

আজকাল ইয়াজিমোকে প্রায়ই চিন্তামগ্ন দেখা যায়। তাদের সোনার নিপ্পন কি সত্যই শত্রুর পদানত হবে? সূর্য্য-লাঞ্ছিত পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়ে সেখানে তারকা-লাঞ্ছিত পতাকা উড়বে? যে পুণ্যভূমিতে হাজার বছরের মধ্যেও কোন শত্রু পদার্পণ করতে পারে নি সে আজ খৃষ্টান শক্তির পদসেবা করবে? এ যে ভাবতেও পারা যায় না! কখনও না, এ কিছুতেই সে হতে দেবে না। কখনও দেখা যায় সে নিরুৎসাহ নাবিকদের মধ্যে উদ্দীপনাময় বক্তৃতার ধারায় তাদের প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করছে—"জাপান কখনও বশ্যতা স্বীকার করবে না।" আবার মাঝে মাঝে একা বসে ভাবছে, তবে কি মাকুসীর কথাই ঠিক! জাপান ভুল পথে গেছে?

এমন সময় নিদারুণ খবর এল, হিরোশিমায় আমে-রিকান বিমান থেকে প্রথম আণবিক বোমা পড়ে প্রায় সমস্ত সহরটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। সহরের আড়াই লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় দুই লক্ষই নিহত হয়েছে। খবর শুনে ইয়াজিমো আতঙ্কে শিউরে উঠল। মাকুসী বেঁচে আছে তো? ভরসা কি! যে রকম বিবরণ সে কাগজে পড়েছে, তাতে তো বেঁচে থাকাটাই অভাবনীয়!

তারপর নাগাসাকির পালা। এবং তার পরই খবর

এল মিকাডো মন্ত্রিসভার পরামর্শে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এবং এ সংবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রায় দশ হাজার রাজভক্ত জাপানী কর্ম্মচারী ও নাগরিক হারাকিরি (পেট কেটে আত্মহত্যা) ক'রে প্রাণত্যাগ করেছেন। ইয়াজিমো ঠিক করল সেও আর এ কলঙ্কময় জীবন রাখবে না। সেও হারাকিরি করবে। কিন্তু তার পূর্ব্বে একবার মাকুসীর খোঁজ না নিয়ে সে স্থির থাকতে পারল না।

দু' এক দিনের মধ্যেই আমেরিকানরা এসে সমস্ত জাপানী নৌবহর দখল করে নাবিকদের নিরস্ত্র করে ফেলল। ইয়াজিমো ক্ষুণ্ণমনে দেশে ফিরে এল। এসে দেখে গ্রামের আর সে অবস্থা নেই। অনেক লোক দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কারু মুখে হাসি নেই। বাড়ীঘর, পথঘাট সবই আজ শ্রীহীন। যা হোক্, বৃদ্ধ হামাগুচি তার ছেলেকে ফিরে পেয়ে কিছুটা খুসী হ'ল। কিন্তু পরদিনই যখন সে হিরোশিমা যাবার বায়না ধরল তখন আর সে স্থির থাকতে পারল না, বললে, "ওরে, হিরোশিমার যে আজ ভয়ানক অবস্থা। এখনও সেখানকার বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হয়ে আছে, এখনও কত লোক মরছে।" কিন্তু ছেলে কিছুতেই তার জিদ ছাড়ল না।

ইয়াজিমো টোকিওর বড় রেলষ্টেশনে পৌছল। এখন সমস্ত রেলপথ আমেরিকান মিলিটারীর নিয়ন্ত্রণাধীনে। ট্রেনে ভ্রমণ করতে হলে আমেরিকান অফিসারের অনুমতি-পত্র নিতে হয়। ইয়াজিমো দরখাস্ত নিয়ে সোজাসুজি অফিসারের কাছে চলে গেল। ইংরেজীতে বলল, "হিরোশিমাতে আমার ছোট বোনের খোঁজ নিতে আমাকে যেতেই হবে।"

"খোঁজ নিতে কারু যাওয়ার দরকার নেই," অফিসার বল্লেন। "হয় সে মরেছে, নয়ত বেঁচে আছে। যদি মরে থাকে, বুদ্ধের বাবারও সাধ্যি নেই যে তাকে বাঁচায়, আর—"

ইয়াজিমোর মনটা রাগে জ্বলে উঠল। বুদ্ধদেবকে সে আগে নিজেই অনেক ঠাট্টা করেছে, কিন্তু আজ এই বিদেশীর মুখে বিদ্রূপ বাক্য তার অসহ্য বোধ হ'ল।

"আর যদি বেঁচে থাকে তো কোন চিন্তা নেই। আমরা তাদের সাহায্য ও শুশ্রূষার যথেষ্ট ব[illegible] করেছি।" ইয়াজিমো ভাবল 'গরু মেরে জুতো দান [illegible]'

শেষ পর্য্যন্ত অফিসারের কি মনে হ'ল কে জানে, [illegible] অনুমতি-পত্রে স্বাক্ষর করে দিলেন। কিন্তু তার [illegible] একবার ইয়াজিমোকে খানাতল্লাসী করতে ভুললেন [illegible] কিন্তু একখানা পেন্সিল-কাটা ছুরি ছাড়া আর [illegible] পেলেন না।

ট্রেনে অসম্ভব ভীড়। দিনে একখানা মাত্র ট্রেন ছা[illegible] সকলেই সহর ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত। রাস্তায় কত [illegible] যে ইয়াজিমোর দেহ পরীক্ষা ও অনুমতি-পত্র প[illegible] হ'ল তার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে দুপুরের কাছা[illegible] সময় একটা ষ্টেশনে গাড়ী খালি ক'রে সব যাত্রীকে না[illegible] দেওয়া হ'ল।

এখান থেকে হিরোশিমা বহু দূর। রেল[illegible] বিধ্বস্ত আর কোন যানবাহনও পাওয়া যায় [illegible] ইয়াজিমো পায়ে হেঁটেই রওনা হ'ল। সমস্ত দি[illegible] অনাহার ও পরিশ্রমের পর বিকালে হিরোশিমার [illegible] পৌছল।

এই কি সেই হিরোশিমা সহর! দেখে আর [illegible] যায় না। শুধু কাঠ ও ইটের স্তূপ। সহরের [illegible] ছোট বড় অনেকগুলি তাঁবু পড়েছে। তার কোন[illegible] সাহায্য বিতরণ, কোনটায় লঙ্গরখানা, কোনটায় [illegible] পাতাল আর কোনটায় আমেরিকান মিলিটারী[illegible] আড্ডা। ইয়াজিমো একখানা ছোট্ট দোকান বা স[illegible] খানা দেখতে পেয়ে গিয়ে মালিককে জিজ্ঞেস করল [illegible] মাকুসীর বাপ ওয়াজাকু তাঁতীর বাড়ী জানে কিনা।

ঠিক এই সময়েই কিছু দূরে সে দেখতে পেল মা[illegible] তার দিকে পেছন ফিরে শহরের দিকে যাচ্ছে। [illegible] এক হাতে কয়েকখানা বই ও অন্য হাতে একখানা [illegible] পাখা। তাকে দেখতে পেয়েই ইয়াজিমো "মা[illegible] মাকুসী!' বল্লে ডাকতে লাগল। দোকানী অবাক্ [illegible] জিজ্ঞেস করল, "কাকে ডাকছ, ছোকরা?" সে ব[illegible] যে আমার বোন যাচ্ছে!" দোকানী গম্ভীরভাবে [illegible] "দেখ, এই সন্ধ্যাবেল আলেয়ার পিছে পিছে [illegible] প্রবেশ ক'রো না, বিপদ্ ঘটবে। তার চেয়ে আজ [illegible]

[illegible]আর দোকানে থাক। কাল সকালে যাকে হয় খুঁজে [illegible]বে।"

কিন্তু ইয়াজিমো সে কথায় কর্ণপাত না করে দৌড়ে [illegible]য়ে মাকুসীর নাগাল ধরল। মাকুসী পেছন ফিরে বল্ল, [illegible], তুমি! কখন এলে?" ইয়াজিমো বল্লে, "এই তো [illegible]সছি, তুমি কোত্থেকে আসছ?"

"স্কুল থেকে"—মাকুসী বল্ল।

"স্কুল থেকে! এখনও কি স্কুল আছে? কোথায় [illegible]?"

মাকুসী হাত দিয়ে তাঁবুগুলির দিকে দেখালে।

"তার পর, মাসীমা বেঁচে আছেন?" ইয়াজিমো [illegible]জ্ঞেস করল।

মাকুসী কোন উত্তর দিল না। আবার জিজ্ঞেস করায় "জানি নে। এস না, দেখি যদি তাকে বাঁচাতে পারি। [illegible]নও তো অনেক জীবিত মানুষ বেরুচ্ছে!"

আর কোন কথা না বলে ইয়াজিমো মাকুসীর পিছে [illegible]ছ চলতে লাগল। অনেক অলিগলি, ধ্বংসস্তূপ পার [illegible] তারা এমন একটা জায়গায় এল যেখানে অনেক-[illegible] বড় বড় বাড়ী পড়ে গিয়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। [illegible]সী অবলীলাক্রমে সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতরে চলে [illegible]। ইয়াজিমো কিন্তু অত সহজে সেখানে পৌছতে [illegible]ল না। মাকুসী একটা জায়গায় উপুড় হয়ে বসে [illegible] কি দেখতে লাগল। ইয়াজিমো দেখতে পেল [illegible]নে মাকুসী বসেছে তার নীচেই একটা গভীর গর্ত্ত। [illegible]চীৎকার করে ডাকতে লাগল, "মাকুসী, মাকুসী, ফিরে [illegible] অত বিপদের মধ্যে যেও না। আমি কালই [illegible]জন নিয়ে এসে জায়গাটা খুঁড়িয়ে দেখব।"

কিন্তু মাকুসী কোন উত্তর দিল না, সে আরও উপুড় [illegible] কি দেখতে লাগল।

এমন সময় বোঁ—ওঁ—ওঁ শব্দে কয়েকখানা বিমান [illegible] থেকে এসে তাদের মাথার ওপর ঘুরতে লাগল। [illegible]জিমো ভাবলে হয়ত আমেরিকান বিমান হিরোশিমায় সাহায্য বিতরণের জন্য এসেছে। কিন্তু ওপরে তাকিয়ে দেখবার আগেই সহসা এক কান ফাটান বিকট আওয়াজ। সে ওপরে চেয়ে দেখলে ধোঁয়া, ধুলো ও সুড়কীর গুঁড়োয় চতুর্দ্দিক্ আঁধার হয়ে গেছে। তারই মধ্যে সে স্পষ্ট দেখতে পেল একখানা তেতালা বাড়ীর ছাদ সমেত ওপরের কোঠা হুড়মুড় করে পড়ল ঠিক সেই জায়গায় যেখানে মাকুসী বসে ছিল।

সর্ব্বনাশ! ইয়াজিমো আতঙ্কে শিউরে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সে দেখতে পেল ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে মাকুসী।

"মাকুসী, মাকুসী!"—সে ব্যগ্রভাবে ডাকল, "তোমার চোট লাগে নি ত'?"

"কই, না! পিঠে একটু লেগেছে।"

"দেখি!" বলে ইয়াজিমো দৌড়ে গেল তার কাছে। গিয়ে দেখে, ওমা! এ যে কেবলই রক্ত-মাংস আর হাড়ের একটা পিণ্ড! সমস্তটা থেঁৎলিয়ে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে! হাড়গুলো পর্য্যন্ত টুকরো টুকরো হয়ে বিশ্রীভাবে বেঁকে গিয়েছে। সে সভয়ে চোখ বুজে দু'পা পিছিয়ে এল।

চোখ খুলে কিন্তু আর সে কাউকে দেখতে পেল না। আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার, তাতে চাঁদ হাসছে। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, শুধু কিছু দূর থেকে একটা বিকট হা হা হা শব্দ ভেসে এল। কিন্তু তা শবমাংসলোলুপ শেয়ালের চীৎকার না প্রেতাত্মার অট্টহাসি, তা সে ঠিক বুঝতে পারল না।

পরদিন খনকেরা এসে দেখতে পেল ওয়াজাকু তাঁতীর ভগ্নগৃহের সম্মুখে এক অপরিচিত যুবকের মৃতদেহ পেটে ছুরি বসান অবস্থায় পড়ে আছে।*

---

* কিছুদিন পূর্ব্বে খবরের কাগজে দেখে থাকবে যে ধ্বংসীভূত হিরোশিমা শহরে স্কুল প্রত্যাগত এক বালিকার 'ছায়া' দেখা গিয়েছিল। সেই কি মাকুসী?—লেখক

স্মৃতির পটে

ঠাকুরদাদার আত্মকাহিনী

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

৩

স্কুলের ইতিহাসে একটা অভিনব ঘটনা। একটা সভা হইল এবং বক্তৃতান্তে আমাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হইল

আমি বহরমপুর আসিলাম। জ্যেঠা মহাশয়ের যে বন্ধুর গৃহে উপনয়নের পূর্ব্বে নাড়ী শুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম তাঁহারই আশ্রয়ে উঠিলাম। খড়ের ঘরের পরিবর্ত্তে এক সুবৃহৎ দ্বিতল গৃহ আবাসস্থল হইল। অত বড় বাড়া—ভাড়া মাসিক দশ টাকা মাত্র! সেদিন আর এ দিন, কতই প্রভেদ! জ্যেঠা মহাশয়ের এই বন্ধুটী মুন্সেফ কোর্টে বেশ নামজাদা উকীল ছিলেন—আয় ভালই ছিল। বহরমপুরে ছাত্রদের থাকিবার হোষ্টেল ছিল এবং সেখানে খুব বেশী খরচও লাগিত না। আমি কিছুদিন ইতস্ততঃ করিবার পর যেখানে উঠিয়াছিলাম সেইখানেই রহিয়া গেলাম। এখানে পাঠের সঙ্গী অনেক যুটিল। বাড়াতেই অনেক ছাত্র থাকিত তবে অধিকাংশই গৃহস্বামীর সম্পর্কিত। আমার সহিত তখনও সম্পর্ক হয় নাই, তবে তিনিও ফরিদপুর জেলার লোক ছিলেন।

বহরমপুর গবর্ণমেণ্ট কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইতে গেলাম। মাইনর পাস ছাত্রদের স্থান ছিল সাধারণতঃ এণ্ট্রেন্স স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে চাহিলাম—তখন উপর হইতে শ্রেণী গণনা করা হইত। হেড্ মাষ্টার মহাশয় বেশ সুশিক্ষিত ও রাসভারী লোক ছিলেন। লোকে বলিত তিনি ওয়েবষ্টারের ডিক্‌শনারী মুখস্থ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কতটা করিয়াছিলেন আমি সে বিষয়ে কোন গবেষণা করি নাই. আমাকে তৃতীয় শ্রেণীতেই লওয়া হইল—অন্ ট্রায়াল্

এদিকে ম্যালেরিয়া আমাকে এমন পাইয়া বসিল যে কিছুতেই ছাড়ে না। কয়েক দিন ভাল থাকি, আবার জ্বর। গৃহস্বামীর উদ্যোগে একজন সুযোগ্য ডাক্তার ও একজন কবিরাজ আমার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইতে বহুদিন লাগিল। এ[illegible]
সংস্কৃত ও বীজগণিত (Algebra) নূতন করিয়া [illegible]
করিতে হইল তৃতীয় শ্রেণীতে। যাহা হউক, অস্[illegible]
ক্রমে কাটাইয়া উঠিলাম। প্রথম যে টার্মিনাল্ পরীক্[illegible]
দিলাম তাহাতে ট্রায়ালের অবস্থাটা কাটিয়া গেল। [illegible]
স্বাস্থ্য একটু ভাল হইতে লাগিল এবং পড়াশুনায়ও অগ্র[illegible]
হইতে লাগিলাম। খেলাধূলায়ও যোগ দিতে ছাড়ি[illegible]
না হাডু ডু-ডু, ক্রিকেট ইত্যাদি। ফুটবলের তখ[illegible]
রেওয়াজ হয় নাই। দাবা খেলা এখানেও ভুলিতে পা[illegible]
নাই। আর, স্নানের সময় ভাগীরথী বক্ষে সাঁতার,—
ভুলিবার জিনিষ নয়।

স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীতেই গণি[illegible]
বহুদূর অগ্রসর করাইয়া দিলেন। বাৎসরিক পরী[illegible]
আমি প্রত্যেক বিষয়েই প্রথম হইলাম, গণিতে পূর্ণসং[illegible]
পাইলাম। তবে বলা উচিত, ইহার মধ্যে একটু [illegible]
ছিল। একজন মুসলমান ছাত্র আমার সংস্কৃতে [illegible]
অপেক্ষা উর্দু কি পার্শীতে মৌলবী সাহেবের নিকট [illegible]
নম্বর পাইল। এই মৌলবী সাহেবের নম্বর দেওয়া বি[illegible]
বেশ একটু সুনাম ছিল। একটা গল্প রটিয়াছিল [illegible]
একবার তিনি কোন ছাত্রকে ১০০ নম্বরের মধ্যে [illegible]
নম্বর দিয়াছিলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছি[illegible]
যে ছেলেটী এত ভাল লিখিয়াছে যে খুশী হইয়া তাহ[illegible]
৫ নম্বর বেশী দিয়াছেন। আমার শোনা কথা মাত্র—ই[illegible]
কোন প্রমাণ পাই নাই। কয়েক দিন জ্বরের পর যে[illegible]
ক্লাসে উপস্থিত হইলাম তখন পরীক্ষার ফল বাহির [illegible]
গিয়াছে। তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত তারাকিশোর মুখোপা[illegible]
মহাশয় (সাউথ সুবার্বান্ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্[illegible]
দেবকিশোর বাবুর পিতা) হাসিতে হাসিতে বলিলে[illegible]
তুমি গণিতে ফেল্ হইয়াছ। আমিও একটু হাসিলাম [illegible]

এই সময় স্কুলে যে সব বন্ধু যুটিয়াছিল তাহার[illegible]

[illegible]ধনী কায়স্থসন্তানের কথা উল্লেখযোগ্য। তাহার
[illegible] গেলেই নানা প্রকার মিষ্টদ্রব্য বাজার হইতে আসিয়া
[illegible]র হইত—আর, মুরশিদাবাদ বা বহরমপুর মিষ্টদ্রব্যে
[illegible]রও পিছনে পড়িত না।

[illegible]স্কুল ছিল বাসা হইতে অনেক দূরে। পদব্রজে যাওয়াই
[illegible]রণ ছাত্রদের রীতি ছিল কিন্তু অনেক সময় অসুস্থতার
[illegible] আমাকে সেয়ারের গাড়ীতে যাইতে হইত। বাসাতেও
[illegible] জন্য অতিরিক্ত দুগ্ধাদির ব্যবস্থা করিতে হইত।

[illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম—সংস্কৃত ও ইংরাজীর
[illegible]দুই বৎসর পড়ার পর এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেওয়ার রীতি
[illegible]। তদনুসারে পড়িতে লাগিলাম। কিন্তু সেবার হুকুম
[illegible]র হইল যে পরীক্ষা শীতকালে না হইয়া এপ্রিল মাসে
[illegible]ব এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত
[illegible]চিত হইবে তাহারা আর অপেক্ষা না করিয়া পরবর্ত্তী
[illegible]ল মাসেই পরীক্ষা দিতে পারিবে। পূজার কাছা-
[illegible]ই একটা ক্লাস পরীক্ষা হইল, তাহাতে আমি সকল বিষয়ে
[illegible] হইলে আমার মাথায় খুন চাপিল—আর এক বৎসর
[illegible]ক্ষা করা কেন? অভিভাবকশ্রেণীর মধ্যে অনেকেই
[illegible]ার পরীক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে মত দিলেন কিন্তু দ্বিতীয়
[illegible]ক মহাশয় (ইনি ক্রমশঃ প্রমোশন পাইয়া গবর্ণমেণ্ট
[illegible]জের প্রিন্সিপাল পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন এবং সাহিত্য-
[illegible]ত্রেও নাম করিয়াছিলেন) সে বারই পরীক্ষা দেওয়ার
[illegible]দৃঢ় মত প্রকাশ করিলেন। আমি প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে
[illegible]তে লাগিলাম এবং ইংরাজী ও সংস্কৃতে ঐ শ্রেণীর বই
[illegible]াম মনে করিলাম, দেখা যাউক্ টেষ্ট পরীক্ষায় কি
[illegible] টেষ্ট পরীক্ষা আসিল. আমি মোটের উপর প্রথম
[illegible]াম, আর যে ছাত্রটী এত দিন প্রথম হইয়া আসিতে-
[illegible] সে হইল দ্বিতীয়। তাহার সহিত ইতিমধ্যে আমার
[illegible] বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল কিন্তু ক্লাসে দ্বিতীয় স্থান হওয়ায় সে
[illegible] প্রীতি লাভ করিতে পারে নাই। তখনও আমার
[illegible]ার পরীক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য কিনা সে বিষয় মতদ্বৈধ
[illegible]তে লাগিল। হেডমাষ্টার মহাশয় (যিনি ছাত্রদের
[illegible]ত ইংরাজীতে কথা কহিতেন এবং মনে হইত যেন
[illegible]কে কেবল মুখ চেনা ভাবে চেনেন) একদিন বারা-
[illegible] আমার নম্বর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া সে বৎসরই পরীক্ষা
দিতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "পর বৎসর তুমি হয়ত অসুখে পড়িতে পার" (অবশ্য ইংরাজীতে)। পরীক্ষা যথা সময়ে দেওয়া হইয়া গেল এবং ক্রমে পল্লীগ্রামে আসিয়া গ্রীষ্মের ছুটি ভোগ করিতে লাগিলাম। কিছু দিন পরে—যত দূর মনে পড়ে আমি হাডু-ডু-ডু খেলিতেছি এমন সময়—ফরিদপুর হইতে এক মোক্তার বাবুর প্রেরিত পত্র-বাহক মারফৎ জানিতে পারিলাম আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি। ক্রমে সংবাদপত্র মারফৎ কায়েমী সংবাদ জানিয়া লইলাম।

যথা সময়ে বহরমপুরে ফিরিয়া প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। বৃত্তির ফলাফল অপেক্ষা করিতেছি এমন সময় একদিন বন্ধু নিখিল (পরবর্ত্তী সময়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়) তাড়াতাড়ি আসিয়া খবর দিল আমার মাসিক ১৫৲ হিসাবে বৃত্তি হইয়াছে এবং ক্লাসে যে ছাত্রটী দ্বিতীয় দাঁড়াইয়াছিল তাহার হইয়াছে ১০৲ করিয়া। বেশ উৎসাহের সহিতই ক্লাসে পড়িতে লাগিলাম। অন্য স্থান হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রও আসিয়া কলেজে যোগ দিল।

কিছুদিন পরে স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের পরামর্শে পূর্ব্বোক্ত ১০৲ টাকার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রটী ও আমি বহরমপুর হইতে নাম কাটাইয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলাম—উদ্দেশ্য কোন স্থান হইতে সাহায্য যোগাড় করিতে পারিলে বিলাত যাত্রা। আমরা উভয়ে এক মেসে এক কামরায় স্থান লইলাম এবং সিটি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। শিক্ষক মহাশয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট পত্র দিয়াছিলেন। ইহাদিগের নিকট ঘোরাফেরা করিলাম এবং একটু-আধটু ফ্রেঞ্চ শিখিবার চেষ্টা করিলাম—কলেজের পড়া কমই হইতে লাগিল। সাহায্য ত' যুটিলই না, উপরন্তু কলেজের পড়ায় পিছাইয়া পড়িলাম। কয়েক মাস পরে আমার বন্ধুটী বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের নিকট পত্র লিখিয়া সেখানে ফিরিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিল এবং সেখানে যে মাসিক ৫৲ করিয়া একটি স্থানীয় বৃত্তি ছাড়িয়া আসা হইয়াছিল তাহাও পাইবে স্থির হইল। আমিও জানিতে পারিয়া তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলাম।

নন্দ মিস্ত্রীর দোকান

সোনা তৈরীর মন্তর

শ্রীশামুক

সেদিন সন্ধ্যায় বহুদিন পরে ভৈরব নন্দ মিস্ত্রীর দোকানে এসে হাজির।

—নন্দদা, এক ছিলিম তামুক খাওয়াও।

—আরে ভৈরব! ভৈরব যে! কবে এলে? এ যেন বিনা মেঘে বজ্জর, এবারে পেলে কিছু?—সকলে হৈ হৈ করে ওঠে।

দাঠাকুর উত্তেজনায় গোদা বিপিনের পা মাড়িয়ে দেয়। বিপিনের পায়ে হাতীর মত গোদ, গোড়ালিতে কালো সুতোয় এক ঘেঁচি কড়ি বাঁধা। যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠে উফ্।

কেসো রুগী নিতাই—ভৈরব—বলেই সেই যে বেদম কাসে তা আর থামতে চায় না।

—পেয়েছি পেয়েছি, এবারে আসল জিনিষই পেয়েছি। দাঁড়াও, আগে সুস্থির হয়ে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করে নি।—ভৈরব ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানে আর মিটি মিটি চায়।

এরা সকলে খবরটা জানবার কৌতূহলে উসখুস করে, মুখগুলো আনন্দে ও আগ্রহে টসটসে দেখায়।

নন্দর সহকারী বিরিঞ্চি হঠাৎ বলে ওঠে,—ঐরে! ও কত্তা, গোপালরা এসে গেল যে! সকলের মুখেই বিরক্তির ছায়া এসে পড়ে। ভৈরব চোখ বুজিয়ে মনোযোগ দিয়ে তামাক টানে, আর গাল দুটো হাপরের জাঁতার মত ফুলে ওঠে, আবার চুপসে ভিতরে ঢুকে যায়।

গোপাল কিছু খারাপ লোক নয়, তবে ভারি ছটফটে, তর্কবাজ মানুষ। সব জিনিষে না করেই আছে। অন্য দিন হলে মন্দ হ'ত না বরং জমে উঠত সভা, কিন্তু আজকে ভৈরবের সংগে তকরার করলে হবে এই যে মুখরোচক খবরটি পাওয়া যাবে না পুরোপুরি।

গোপাল লাফিয়ে দোকানে ঢুকতে গিয়েই লাগিয়ে দেয় এক চুঁ! এক পাথীর খাঁচা ঝুলছিল, ঝন্‌ঝন্ করে পড়ে গড়াগড়ি খায়। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে, —নন্দদা যত রাজ্যের টিনের ও তারের জিনিষ বানিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রেখেছ মাথা ভাঙবার জন্যে। উঃ, তেলোয় কে যেন লংকাবাটা ঘষে দিলে!

—কি করে ভাই, ঐ ত' ওর পেশা। না হলে পেট চলবে না। তোমার মতন আদালতের চাপরাশি গিরি ক'জনার ভাগ্যে জোটে বল?—দাঠাকুর জবাব দেয়।

—হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ে গেল। শোন দাঠাকুর, আজ কোর্টে যা মজা। পিনসিন সাহেবের এজলাসে বসেছে। সরকারী উকিল মাধব বাবু করছেন বক্তৃতা আর আমি পিছনের টুলে বসে ঢুলছি। মাধব বাবুর এই বয়স হয়েছে, তার ওপর গুণগুণে ঘুমপাড়ানি গলা, এ শুনলেই ঘুম না এসে পারে না। বেশ খানিকটে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হয়তো, হঠাৎ ছোট পেশকারের চিমটি তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে উঠি।—যা যা, শীগ্‌গির জল নিয়ে আয়।

আরে বাপু, কানের কাছে হঠাৎ জল জল করে চেঁচালে মনে হয় বেশী জল চাই—এক বালতি জল চাই —কেউ নিশ্চয় ভীরমী গেছে, এমনি ত' কত হয় আদালতে —নয় কি? পড়ি ত' মরি করে এক বালতি জল নিয়ে ঢুকেছি আর একটা চাপা হাসিতে ঘর গেল ভরে। পিনসিন সাহেবের চোখে আগুন! ভারি কড়া মেজাজ আমাদের পিনসিন সাহেবের, একটা ছুঁচ পড়ার আওয়াজ হলে চোখ কপালে তোলে। একবার এক ছোট উকিল শব্দ করে হাই তুলেছিল, তখুনি জরিমানা দশ টাকা—

ভৈরব হুঁকাটি বিরিঞ্চির হাতে দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে এক প্রকাণ্ড হাই তুলে বলে,—উহু মাগো, তারা মন্দোদরী এবার চলি ভাই নন্দদা?

আরে, সে কি হয়!—সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গোপাল বিপিন বুঝিয়ে বলে,—গোপাল, তোমার আদালতের কথা থামাও ভাই! এখন ভৈরবের কাছে শুনতে হবে। ও গেছে আসল জিনিষ পেয়েছে এবারে।

—ইস, ভারি আসল জিনিষ! কত বার ত' শুনলাম ঐ বাজে কথা,' দেখলামও চোখে, আমার কথা গেছে আগে।

ভৈরব চোখ পাকিয়ে বলতে যাচ্ছিল অনেক কিছু কিন্তু তার আগেই গোপাল আরম্ভ করে দেয় নিজের কথা

ইসারা ক'রে ভৈরবকে একটু ধৈর্য্য ধরতে অনুনয় ।

—পিনসিন সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা গেল। বেসামাল হয়ে খানিকটা জল ছলাৎ করে গেল ঘরে। আমার বরাতে দশ টাকা না হলেও নির্ঘাৎ পাঁচ টাকা জরিমানা বরাদ্দ ছিল কিন্তু ানের দয়া অসীম শুনতে পেলাম—উক উক— সকলের হাসি খুক খুক! দেখি আসামী পক্ষের ল বিনোদ বাবু তালগাছের মতন সটান দাঁড়িয়ে, মুখ কাশে, থেমে থেমে আওয়াজ হচ্ছে উক! ফ্যাচাং দেখ বার! এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারটি কি বিনোদ র হেঁচকি লেগে গেছে হঠাৎ! গেরো আর কি, এত ক থাকতে কিনা বুলডগ-মেজাজ পিনসিন সাহেবের লাসে!

পিনসিন হুংকার ছাড়ে,—চোপ চোপ!

বিনোদ বাবু বিনিয়ে বিনিয়ে বলে,—হুজুর আমি—উক চেষ্টা করছি—উক—কিন্তু কিছুতেই—উক—উক—

পিনসিন রাগে গরগর করতে করতে হাতের কলম ড় ফেলে নিজের খাস্ কামরায় চলে গেল। আশ্চর্য যে কলমটি তাগ করে বড় পেশকারের ভুঁড়িতে বিঁধে কে রইলো—যেন তীরন্দাজের তীর!

সকলে হাসে। বিরিঞ্চি বলে ওঠে,—তারপর কি গোপালদা? টেনে কে বার করলে?

—তুই থাম দেখি বিরিঞ্চি! গোপাল, এবারে একটু কর ভাই। ভৈরবের খবরটা শোনা যাক—নন্দ বলে।

—খবর আর নতুন কী? আমার সমস্ত মুখস্থ হয়ে ছে শুনে শুনে। তবে হাঁ, বিচ্ছুর ওষুধ ও মন্তর ভৈরব নে বটে, এ কথা স্বীকার করতে হয়। নিজের চোখে খছি। আমার শ্বশুরকে কামড়ালো এক এয়া কাঁকড়া ছ, আধাড়ি পাধাড়ি যন্ত্রণায় অত বড় সাজোয়ান মানুষটা ছোট ছেলের অধম—কেঁদে খুন। ভৈরব এসে কটা কি পাতা বেটে এমন এক কড়া মন্তর আওড়ালে বিষ চচ্চড় নেমে হাওয়া! তবে ঐ সোনা তৈরীর ব? ও শুধু মিছেমিছি-রক্ত জল-করা পয়সা আর গতর করছে। —গোপাল এক লম্বা বক্তৃতা দিয়ে থামে।

এতক্ষণ কেউ নজর করে নি যে ভৈরবের মুখটা রাগে টকটকে লাল। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে,—চুপ কর গোপাল! যা জানো না তা নিয়ে ফচর ফচর কোরো না! এ বয়স্ত দেখলে কোথায়, শুনলেই বা কি?

—শুনি নি কি গো, শুনে শুনে হাল্লাক মেরে গেলাম! অমুক সাধুকে গাঁজা খাইয়ে তোয়াজ করে আমাদের ভৈরবচন্দর এক মন্তর জোগাড় করেছে। পিতলের বাটি নিয়ে মন্তর পড়ে আর ফুঁ দেয়। ফুঁ দিতে দিতে দম গেল ফুরিয়ে কিন্তু পিতল ঠিক পিতলই রয়ে যায়, সোনা আর হয় না। আবার শুনি এবারে এক ফকিরের জবরদস্ত মন্তর। মাঝ রাতে কি সব নিয়ে বসে বসে আগুনে ফোটাও, পাকা সোনার তাল পাবে! কিন্তু তালের বড়াও দুটো কপালে ঠক ঠকালো না!

গোপাল হাত নেড়ে খুব মজা করে মনের আনন্দে বলে চলছিল কিন্তু শেষ করতে হ'ল না। ভৈরব ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে গলা টিপে ধরে। সে যেন কচ্ছপের কামড়; সকলে মিলে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে টানে, কিছুতেই ছাড়ে না— এদিকে গোপালের মুখে প্রায় রক্ত উঠে আসে। শেষে নন্দ ভাঙ-খোঁটরি নিয়ে ভয় দেখায়, তবে হাতের মুঠো ছাড়ল।

গোপাল হাঁফায় আর গলায় হাত বুলায়, গলাতে দশ আঙুলের দশটি মোটা মোটা দাগ।

—খবরদার নন্দদা, আমার দিব্যি গোপালকে ছাড়বে না। আমি এখুনি ওর চোখের সামনে সোনা তৈরী করে দিচ্ছি, এই দেখ সব সরঞ্জাম সংগেই আছে।—ভৈরব গামছা জড়ানো কতকগুলি কি উঁচু করে দেখিয়ে বলে।

রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেছে; তবু দরজা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। ভিতরে এমন চুপ যেন মানুষ কেউ নেই। টিমটিমে পিঁদিমের আলোতে চারিদিকে কত রকমের কত আকারের ছায়া। মানুষের ছায়া, ঝোলানো জিনিষের কত ছায়া—ছায়ার ওপর ছায়া গিয়ে পড়েছে। কেউ স্থির, কেউ কাঁপছে কেউ দুলছে বা।

ভৈরবের চুল পাটে পাটে পিছন দিকে আঁচড়ানো, কপালে লাল ত্রিশূল আঁকা; কানে, গলায়, বুকের মাঝখানে লাল সিঁদুরের গোল 'গোল টোপ'। বিরিঞ্চি হাপরের দড়ি টেনে আগুন গনগনে করে দেয়। ভৈরব খানিকটা নরম মাটির সংগে অনেক কিছু গুঁড়ো গুঁড়ো

মিশিয়ে ময়দা মাখার মত ঠেসে ঠেসে মোলায়েম করে। একটা পিতলের ঘটি চেয়ে নেয়—একে সোনার করা হবে।

ঘটিতে নরম মাটির লেপ দেওয়া হ'ল ঘন করে—সবুজ রঙের মাটি দিয়ে যেন কুমোর সবুজ ঘটি করে দিল তৈরী! খুব সন্তর্পণে ঘটিটি কাঠ কয়লার আগুনের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়। বিরিঞ্চি ইংগিত পেয়ে জোরে জোরে কপিকলের দড়ি টানে, ভুস ভুস্ আওয়াজ করে লাল আগুন নীল আগুন ওপরে উঠতে থাকে।

ভৈরব এবারে পূজার আসনে বসে বিড় বিড় করে মন্তর বলে একটানা। একটি পাত্রে জল নিয়ে তাতে এক জবাফুল ডুবিয়ে আগুনের ওপর মাঝে মাঝে ধরে। জবার ঝুমকো বেয়ে টুপ টুপ পড়ে জল। লাল আগুন নীল আগুন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নাচছিল, বিরক্তি জানায় ছ্যাক্ ছ্যাক্—যেন বলছে—ছিঃ ছিঃ

নন্দর এতেই ভক্তি ও বিশ্বাস এসে যায়। হাত যোড় করে চুপচাপ বসে থাকে, সিদ্ধি-খাওয়া ঢুলে-পড়া চোখ দু'টি টেনে টেনে খুলে দেখে। গোদা বিপিন গোদা পা'টি ছড়িয়ে ভৈরবের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। বাচাল গোপাল খুব তাড়াতাড়ি পা নাচাচ্ছিল, থামিয়ে চুপ করে যায়। এমন কি কেসো নিতাইএর কাসিও বন্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ঐ ঐ কুর্রে চেঁচিয়ে গোপাল উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, গোদা বিপিন কাপড়ের খুঁট ধরে টেনে বসিয়ে দেয়। দেখা গেল সেই পিতলের ঘটির একটা অংশ থেকে মাটি খসে পড়ছে ও সেই অনাবৃত অংশটুকু জলজল করছে পালিশ করা আসল সোনার আরো দেখা গেল যে ভৈরবের ঘামে ভেজা মাঝখানের শিরাটি ফুলে উঠেছে ও তার সংগে ত্রিশূলটিও।

একটু একটু করে মাটি খসে খসে পড়ে আসে সোনা—জলন্ত সোনা! বিরিঞ্চি দম বন্ধ জোরে জোরে হাপর চালায়।

উত্তেজনায় নিতাইএর কাসি এসে যায় বুকে মুখে হাত চাপা দিয়ে থামাতে চেষ্টা করে, পারে না। নন্দ মাটিতে মাথা ঠুকে গড় হয়ে এক করে ফেলে, আগুনকে কি ঘটিকে কি ভৈরবকে বোঝা গেল না।

বিরিঞ্চির হাত থেকে হঠাৎ দড়ি ছেড়ে গেল, মুখ একটা শব্দ বেরিয়ে আসে—উস্।

সেই ঘটি—সেই সোনার রঙের ঘটি হয়ে গেছে ঝুল—একেবারে লোহার মতন নির্লজ্জ নিরেট রঙ। ভৈরবের হাত থেকে জবাফুল খসে আগুনে পিট পিট করে পুড়ে যেতে থাকে। চারিদিক্ ধোঁয়াকার।

গোদা বিপিন গোদা পায়ে আস্তে আস্তে হাত আরম্ভ করে। নিতাই কাসছে তখনো, আর হাতের ওপর মাথা রেখে নীচু মুখে চুপ করে বসে মনে হয় যেন কাঁদছে

ধরা গলায় নন্দ বলে ওঠে,—বিরিঞ্চি ভাই, একটু তামুক সাজো, আর দরজাটা খুলে দাও, ভিতরে বড়

দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়ে

মিশর

রঞ্জিত ভাই

নীল নদের দান মিশর দেশ, পূর্ব ও পশ্চিম পৃথিবীর মাঝখানে যুগ যুগান্তর পার হয়ে আজো তার দুই স্নেহাঞ্চল বিস্তার ক'রে বিরাজ করছে। একদিকে তার সভ্য দেশ ইউরোপ ও আমেরিকা, আর অন্য দিকে এশিয়া মহাদেশ। এই দুই মহাদেশের মাঝখানে মিশরের প্রাধান্য অত্যন্ত বেশী। কারণ প্রাচীন সভ্যতার প্রতীক মিশর যুগের ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সেই 'পিরামিড' ও 'ফারাও'র দেশ মিশর!

সেখানকার ছেলেমেয়েদের কথা বলতে গেলে মনে পড়ে মিশরের শিশু-ভবন। মিশরে দুই রকম

আছে; এক সর্ব্বক্ষণস্থায়ী, আর এক অস্থায়ী। শিশু-ভবনে (৩৬০) প্রায় ৬০ হাজার ছেলে-শিক্ষালাভ করে। আর অস্থায়ী শিশু-ভবনে (৩৪০০) ১০০,০০০ ছেলেমেয়ে পড়ে। এই সব শিশু-ভবনে ৪ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত পড়তে হয়। ড়া আধুনিক মিশরে সরকারী শিশু-ভবন এবং ছেলেমেয়েদের জন্য শিশু-ভবনও আছে।

মিশরে আর এক রকম ইস্কুল আছে, তার নাম রাণ-আবৃত্তি-বিদ্যালয়'। এখানে প্রায় তিন বছর কোরাণ পাঠ ও মুখস্থ করানো হয়।

মিশরের রাজধানী কায়রোতে যে সব প্রাথমিক ইস্কুল তার বেশীর ভাগ সরকারী, আর বাকী বিদেশী। কিণ্ডারগার্টেন ও শিশুভবন থেকে পাশ ক'য়ে ছাত্রেরা এখানে ভর্ত্তি হয়। সকাল ন'টায় ইস্কুল ছুটি হয় বেলা একটায়; প্রত্যেক দু' ঘণ্টার ১৫ মিনিট বিশ্রাম। প্রত্যেক দিন নিয়মিত ব্যায়াম ত হয়। প্রত্যেক দিন বেলা একটায় ইস্কুলে খাওয়ার বস্ত আছে। প্রত্যেক ছাত্র তার ইস্কুলের পরিচয় একটি 'ব্যাজ' ব্যবহার করে। আজকাল আবার দের ভেতর ধর্ম্মঘট করার প্রবৃত্তি খুব বেশি।

কায়রোতে মদ্রাসার সংখ্যাও কম নয়। এখন আর সায় ছেলেরা তালপাতা কি খেজুরপাতায় লেখে —স্লেট, পেন্সিল নিয়ে মাদ্রাসায় যায়, ছাপানো বই , সুর করে নামতা মুখস্থ করে, কবিতা আবৃত্তি কোরাণ পাঠ করে।

মিশরের শিক্ষাপদ্ধতিতে ইউরোপের অন্যান্য দেশ-র প্রভাব আছে। উচ্চবিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রকে ছর পড়তে হয়; সেখান থেকে পাশ করলে বিশ্ব-লয়ে যেতে পারে। এই সব ইস্কুলের প্রধান ভাষা আরবী; তা ছাড়া আর দু'টি ভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় লেরা পড়ে। ফরাসী ভাষা অবশ্যপাঠ্য। কেউ কেউ ত ইংরেজি, তুর্কী বা গ্রীক ভাষা পড়তে পারে।

মিশরের আল্-আজ্হার (Ul-Azhar) বিশ্ববিদ্যালয় ার অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র। কায়রোতে এই বিদ্যালয় স্থাপিত। এখানে বিনা বেতনে ছাত্রদের দেওয়া হয়। প্রায় ১৭ হাজার ছাত্র এখানে পড়ে। মিশরের বিভিন্ন গ্রামে ও শহরের মাদ্রাসাগুলি এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্দ্দেশমত কাজ করে। মিশরের 'রয়াল ইউনিভার্সিটি' আর একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার নানা বিভাগ আছে, যে কোন ছাত্র যে কোন বিষয়েই পড়তে পারে।

মিশরের শহরে অথবা সেখানকার ইস্কুলে যারা শিক্ষা-লাভ করে তাদের বেশির ভাগই ভদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়ে। এবং সে সব পরিবার স্বভাবতঃই ধনী। গ্রামের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ মাদ্রাসাতেই লেখাপড়া করে। কায়রোর পথেঘাটে প্রায়ই গরীব ছেলেমেয়ে দেখতে পাওয়া যায় তাদের কেউ খবরের কাগজ বিক্রী করে, কেউ রাস্তার ধারে বসে জুতো ব্রুশ্ করে, চীনাবাদাম ও লেমোনেড বিক্রী করে, এবং মাঝে মাঝে সুবিধা পেলে বিদেশীদের কাছে মিশরের ছবি বিক্রী করে। বড় বড় দোকানের সামনে এদের দেখতে পাওয়া যায়। দোকানে কোন গ্রাহক এলে এরা মোটরের দরজা খুলে দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়, কুকুর, ছড়ি প্রভৃতি জমা রাখে, আর বিদায় কালে বকশিষ্ দাবী করে, আদায় করে। মিশরের সমস্ত শহরের পথেঘাটেই এদের ভিড় দেখতে পাওয়া যায়। কখনো এদের দেখে মজা লাগে, কখনো দুঃখ হয়।

পূর্ব-পৃথিবীর অতি প্রাচীন দেশ মিশর। সেখানে নানা জাতির বাস—কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ও পোর্ট সৈয়দ প্রভৃতি শহরে পৃথিবীর নানা জাতি ও শ্রেণীর মানুষের ভিড়। সেখানে আরব, মুসলমান, ফরাসী, ইতালীয়, গ্রীক ও ইহুদী—সব দেশের ও সব জাতের লোক আছে। সুতরাং সে দেশের ছেলেমেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদে, আচার ব্যবহারে বিভিন্নতা যারা শহরে থাকে তাদের পোষাক সাধারণতঃ বিদেশী, তবে কোন কোন ছেলেরা এখনো 'আচ্কান' ব্যবহার করে। বেশীর ভাগ ছেলেদের পোষাক কোট, প্যাণ্ট্ আর গলায় নেক্টাই। শহরের মেয়েরাও ইউরোপীয় পোষাক পরে—হাই হিল জুতো স্কার্ট ও পুলওভার। শহরের ছেলে-মেয়েরা বিদেশী পরিবেশের ভেতর থাকে বলেই অত্যন্ত ফ্যাশান মাফিক চলাফেরা করে। তা'ছাড়া মিশরের সব জায়গাতেই হাব্সী, সুদানী ও নিগ্রো বালকদের দেখতে

পাওয়া যায়—যাদের জীবনকাহিনী সমাজের নিম্নশ্রেণীর অন্ধকারেই বিলীন হয়ে যায়।

মিশরের ছেলেরা যেমন একদিকে পৃথিবীর অগ্রগতির তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তেমনি সেখানকার মেয়েরাও এ বিষয়ে আর পেছিয়ে নেই। আধুনিক মিশরে মেয়েদের জন্য ৩৬টি কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুল, ৩৪টি প্রাথমিক ইস্কুল ৮টি উচ্চবিদ্যালয় এবং কয়েকটি কলেজ আছে। তা ছাড়া শিল্পকলা, সূচিবিদ্যা প্রভৃতির ইস্কুলও আছে।

মিশরের মেয়েদের স্বভাবতঃই সৌন্দর্যজ্ঞান খুব বেশি। তারা গান খুব ভালোবাসে। তবে মিশরের নিজস্ব সঙ্গীত বলতে কিছু নেই। আধুনিক মিশরীয় সঙ্গীত আরবী ও ইউরোপীয় সঙ্গীতের সংমিশ্রণ। মিশরের নানা শহরে আজকাল অপেরা হাউস ও সঙ্গীত-বিদ্যালয় দেখতে পাওয়া যায়।

মিশরের আর একটি প্রাচীনতম শিক্ষাকেন্দ্র হ'ল দার্-উল্-উলাম (Dar-Ul-Ulum)। ১৮৭২ সনে এর প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। এইখানে পৃথিবীর নানা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা করা হয়। এ সব ছাড়াও মিশরে শিক্ষক-দের শিক্ষিত করবার জন্য নানারকম বিদ্যালয় ও কলেজ আছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কারিগরি শিক্ষার ইস্কুল বিভিন্ন শহরে আজকাল ছড়িয়ে পড়েছে।

মিশরের মত প্রাচীন দেশে শিক্ষার এমন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেখানকার শিক্ষিতের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। গ্রামের ছেলেদের ভেতর শতকরা ৯৩ জন লিখতে পড়তে জানে না, মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৯৮ জন।

মিশরের গ্রামের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত অপরিষ্কার। মিশর দেশ প্রধানতঃ মরু প্রান্তরময়। সুতরাং অভাবে সে দেশের ছেলেমেয়েরা বহুদিনের পর একদিন স্নান করে। গ্রামের ছেলেরা লাটিম খেলে, ওড়ায়, উট গাধায় চড়ে, জুয়া খেলে, আর সব সিগারেট খায়। মেয়েরা কালো রঙের জামা পরে, দুল, হাতে চুড়ি, গলায় লাল রঙের মালা, হাতে নানা জায়গায় উল্‌কী পরে। দিনের বেলায় ছেলেরা বন্দুক হাতে শিকার ক'রে বেড়ায়, আর হ'লেই ছেলে বুড়ো সবাই মিলে গ্রামের কফিখানায় গান করে, নাচে যোগ দেয়। এমনিভাবেই তাদের সুখে দুঃখে অতিবাহিত হয়ে যায়।

গ্রামের ছেলেমেয়েরা গান গাইতে খুব ভালো প্রায়ই তাদের কিশোর কণ্ঠে মিশরের জাতীয় শুনতে পাওয়া যায়। গ্রামে বা শহরের প্রান্তে বিদেশীকে দেখলেই তারা জিজ্ঞাসা করে "মুসলিম?"—তুমি কি মুসলমান? যদি বিদেশী উত্তর 'আল্‌হাদ্‌মুলিল্লাহ"!—আল্লার জয় হোক্! তা তারা খুব খুশী হয়ে বিদেশীকে কাছে ডেকে আর বলে "আহ্‌লান, আহ্‌লান"। আসুন, আ সামাজিক ভদ্রতাজ্ঞান গ্রামের ছেলেমেয়েদের আছে মনে হয়।

প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মিশর ও ভারতবর্ষ। মিশর আজ সাহিত্যে, শিল্পে ও সংস্কৃতিতে ইউরোপ গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষ তা করে নি। ভারতবর্ষ পথ পাশ্চাত্য সভ্যতার পথ নয়। সে যাকে গ্রহণ ক তা হ'ল নূতনের মাঝে চির-পুরাতন। সমগ্র এ সেই বাণী একদিন গ্রহণ করবে। সেদিন ভারতবর্ষ তার প্রাণকেন্দ্র।

বল তো?

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ভাই-এ ভাই-এ শত্রু তারা—আপন হ'ল পর;
হানাহানি, কাটাকাটি—পরকে নিয়ে ঘর।
সবার মাথায় কাঁটাল ভেঙে খাচ্ছে তোফা কে সে;
সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারেতে বসে!
এক না হয়ে যারা ভায়ের ঘাড় ভাঙে কেবল;—
কোন্ দেশেতে থাকেরে সেই হাঁদারামের দল?

একলব্য

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য

(হিরণ্যধনুর গৃহ)

১ম ব্যাধ। সর্দারের ফিরতে ত' আজ বড় দেরি ছে! আগে হ'লে সর্দার কখনো এতক্ষণ বাইরে ত না।

২য় ব্যাধ। সত্যি, সেই একলব্য চলে যাবার পর ক সর্দারের যেন কি হয়েছে! কোন কিছুর ঠিক-না নেই। ঘরে ঢুকলে আর বেরুতে চাইবে না; বাইরে বেরুলে ত' ঘরে ফেরবার কথা মনেই থাকে এমন করে আর কত দিন চলবে, কে জানে? কে একলব্যেরও ত' সেই থেকে কোন খবরই নেই!

১ম. ব্যাধ। কোন বিপদ্ আপদ্ ঘটেছে কি না তা-ই কে বলতে পারে? "একলব্য শীগ্‌গীরই ফিরে আসবে" আমরা ত' রোজ সর্দারকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। কিন্তু দেশে গিয়ে সে যদি কোন বিপদে পড়ে থাকে? নে যে তার কোন আপনার জন নেই! এ কথাটা াদের এর মধ্যে একবারও মনে হয়নি। অথচ এটা বার কথা।

২য় ব্যাধ। হ্যাঁ, ভাববার কথা বটে।

৩য় ব্যাধ। আচ্ছা, সর্দারকে আজ কথাটা বল্‌লে ন?

১ম ব্যাধ। আমারও তাই মনে হচ্ছে। এ বিষয়ে কি মনে হয়, জিজ্ঞেস করা দরকার।

২য় ব্যাধ। কিন্তু এ কথা শুনলে সর্দার আবার ভয় য় একেবারে ভেঙ্গে না পড়ে! কিংবা যদি সেখানে জে যেতে চায়, তা হলেও ত' মুস্কিল্।

১ম ব্যাধ। মুস্কিল আর কি? সেই হলেই ত' ভাল ! এমনি ভাবে দিনের পর দিন আশায় আশায় বসে' ার চেয়ে একলব্যের কাছে গেলে বোধ হয় সুবিধে তে পারে। সর্দার যদি একবার তার সামনে গিয়ে ড়ায়, সে আর না এসে পারবে না।

৩য় ব্যাধ। সে বেশ হবে। এই ঠিক উপায় বের করেছি। সর্দারকে দেখলে সে ঠিক ঘরে ফিরবে। আর সর্দারের মুখেও তা হ'লে আবার হাসি ফুটবে। সর্দার এমনি মন-মরা হ'য়ে থাকলে আমাদেরও যে আর ভাল লাগে না!

১ম ব্যাধ। তা হলে আজ সবাই মিলে সর্দারকে ধরা যাক, কেমন?

২য় ব্যাধ। তাই হোক। আমরাও সকলে সর্দারের সঙ্গে হস্তিনাপুর যেতে চাইব। তা হ'লে আর না বল্‌তে পারবে না। তারপর সবাই মিলে সেখানে গিয়ে একলব্যকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। না হ'লে এইভাবে বেশি দিন চল্‌লে কেঁদে কেঁদে সর্দারের চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।

১ম ব্যাধ। সত্যি, সর্দারের কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। এই বুড়ো বয়সে ছেলের জন্যে কি দুঃখই পাচ্ছে!

৩য় ব্যাধ। তবু মংরুটা সঙ্গে সঙ্গে থাকায় অনেকটা ভাল হয়েছে।

২য় ব্যাধ। ওই যে সর্দার আসছে।

(মংরুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হিরণ্যধনুর প্রবেশ)

হিরণ্যধনু। না, না, না, মংরু, তুই আমায় আর আশা দিস নি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তার জন্যে চুপ করে ঘরে বসে থাকলে সে কোন দিন ফিরবে না। নিশ্চয় সে কোন বিপদে পড়েছে, না হ'লে এত দিন আমায় ছেড়ে থাকতে পারত না। আমায় আর তুই বারণ করিস্ নি, আমি যাব।

১ম ব্যাধ। মংরু কি বারণ করছে, সর্দার?

হিরণ্যধনু। মংরু বলছে আমি বুড়ো হয়েছি। আমার অত দূরে যাওয়া ঠিক হবে না। একলব্য এইবার এসে পড়বে; আর বেশি দেরি করবে না। কিন্তু আমার আর ঘরে থাকতে মন সায় দিচ্ছে না। আমার মন কেবলই বল্‌ছে, তার কোন বিপদ্ ঘটেছে। আমি আর স্থির থাকতে পাচ্ছি না। কালই আমি হস্তিনাপুর যাব ঠিক

করেছি। দেখি সেখানে কে তাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে রাখ্তে পারে! যদি দরকার হয় ত' এই বুড়ো হাড়ের শক্তি একবার দেখাব, মংরু!

মংরু। আমি ত' যেতে বারণ করি নি, সর্দার, আমি শুধু বল্ছিলুম, আর কিছুদিন দেখতে।

১ম ব্যাধ। আমরা এখন এই সব কথাই বলাবলি করছিলুম, সর্দার! আমাদের সকলেরই মত হচ্ছে, আর দেরি করা ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি সেখানে যাওয়াই ভাল।

হিরণ্যধনু। তোদের সকলেরই এই মত? আঃ তোরা আমায় বাঁচালি। তা হ'লে কালই আমি যাবার ব্যবস্থা করি।

১ম ব্যাধ। হ্যাঁ, সর্দার, আর দেরি ক'রে কি লাভ? কাল হয় ত' কালই যাওয়া ভাল। আর আমরাও সবাই সঙ্গে যাব ঠিক করেছি। আমাদের ছেলেকে যদি জোর ক'রে নিয়ে আস্তে হয়—দেখব উঁচু জাতের মধ্যে কত বড় বীর আছে!

হিরণ্যধনু। তোরাও সবাই যাবি? তা বেশ, তা বেশ। দল বেঁধে তা হ'লে কালই রওনা হওয়া যাবে। আর আমি বসে থাকতে পাচ্ছি না।

মংরু। আমিও যাব, সর্দার!

হিরণ্যধনু। হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তোকে কি আর রেখে যাব? তুইও যাবি আমাদের সঙ্গে।

দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য

বন

(দ্রোণাচার্যের প্রতিমূর্তির সম্মুখে ধনুক হস্তে একল

একলব্য। দাসকে তুমি যত ঘৃণাই কর, দেব, তুমি আমার গুরু, আমার প্রণম্য। আমাকে তুমি দূরেই ঠেলে দাও, তোমার স্থান আমার বুকের মা আমার চোখের সামনে। এই গভীর নির্জন বনের তোমার মূর্তি সামনে রেখেই আমি আমার অস্ত্র-শা করব। তোমার এই মৃন্ময় মূর্তি ত' আমায় প্রত্যা করতে পারবে না! গুরুভক্তি যদি আমার মিথ্যা না তবে একদিন আমি অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করতে পা সেদিন এই দীন শিষ্যের কাছে তোমায় এসে দাঁড় হবে, প্রভু, নিতে হবে আমার অর্ঘ্য। সাধনা আ ব্যর্থ হ'তে দেব না আচার্যদেব! এই অনার্য, একদিন জয় করবে তোমার হৃদয়। সেদিন আর ত ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। (ক্রমশ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

১২

শহরের পাশে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। সেদিন হাটবার। ইয়াকুবদের একখানা নৌকো আস্ছিল পণ্য নিয়ে হাটে। ইয়াকুব বাসবকে তাতে তুলে দিলে।

ছইহীন নৌকো। দাঁড়, মাঝি ও বাসবকে ছ'জন যাত্রী। দু'জন দাঁড়ে বসলো। নৌকো চ উজানে। বাসবের মনমরা ভাবটা কেটে গেল।

ড়দের একজনকে চিন্তো। সে ইয়াকুবের কোন্ রু যেন ভাই হয়। নাম তোরাব। বয়স হবে বছর ক। বেশ লম্বা-চওড়া জোয়ান। বাসব বললে, রাব, আমাকেও দাঁড় টানতে দাও।"

তোরাব বললে, "এই রোদে তুমি পারবে?"

—"কেন পারবো না? তোমরা পারছো কি করে?"

যাত্রীদের একজন মাথায় গামছা দিয়ে নৌকোর মাঝ- ন বসে ছিল। লোকটি প্রৌঢ়। বললে, "বাবু, রা হলাম চাষা। আমাদের দেহ যত টনকো ভদ্দর- কের কি তাই হয়?"

বাসব বললে, "কেন হয় না?"

কেন হয় না, সে কথাগুলো গুছিয়ে বলবার শক্তি কটির ছিল না। তবুও বললে, "ভদ্দনোকেরা কি , পানি আমাদের মতো সইতি পারে? আমরা এক চারটে ভাত খেয়ে ভর দিন বলদের মতো মেহনৎ ।"

বাসব তা জানতো. কিন্তু এ কথা জানতো না, এই নশীলতা ও কর্ম্মশক্তির উৎস কোথায়। এ শক্তি যে বল মুসলমানের আছে, হিন্দুর নেই তা নয়। যারা স্তরের মানুষ বলে উচ্চস্তরের মানুষদের মার্কা মারা দেরই মধ্যে এটি দেখা যায়। উচ্চস্তরের যারা তাদের রো এই গুণটি থাকলে সে তাই নিয়ে বড়াই করে। চ তার যা বড়াইয়ের ওদের পক্ষে তা স্বাভাবিক। বও কষ্টসহিষ্ণু। কেবল বাসব কেন, তাদের মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যারা তারাই এই গুণের অধিকারী।

বাসব লোকটির সঙ্গে আর তর্ক করলে না; রাবকে আবার বললে, "তোরাব ভাই, তোমার টা আমায় দাও না?"

তোরাব অবশ্য তার অনুরোধ রাখলে না; তার দার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এস"।

তার ওঠবার কারণও ছিল। একজন তখন ডাবা কোর একটা নূতন কলকে চড়িয়ে একটান দিয়ে মারের মতো ধোঁয়া ছাড়ছিল। চিটেগুড় মাখা দ কাটা াকের ঝাঁঝালো গন্ধে বাসবের মাথাটা চিন্ চিন্ করে লেও সে মধুলোভী মৌমাছির মতো মেতে উঠছিল বলে ন হল। সে এগিয়ে এল হুঁকোওয়ালার কাছে আর বাসব গিয়ে দাঁড়ে বসলো। এবং নদীতে ঝুঁকে হাত দিয়ে একটু জল তুলে দু'হাতের তালু ভিজিয়ে দাঁড়ের মোটা মুঠি তার ছোট হাত দু' দিয়ে ধরে তোরাবের সঙ্গে সমান তালে টান্তে লাগলো। নৌকো একটু দুলে উঠে চললো আগের চেয়ে জোরে।

মাঝি বললে, "খোকাবাবু, তুমি আমাদের চাষার ছাওয়ালের মতো দাঁড় টানিতিছ।"

বাসব অবশ্য এ কথায় ক্ষুণ্ণ হল না। সে বুঝলে, লোকটি তার প্রশংসা করলে।

নৌকো যাচ্ছিল পাড়ের কাছ দিয়ে। উঁচু পাড়। মাঝে মাঝে ভেঙে পড়েছে। কোথাও দোয়াড় পাতা, কোথাও টানা জালের খুঁটি পোতা। তার গায়ে স্রোত ধাক্কা খেয়ে ধারার মতো বয়ে চলেছে। তীর দিয়ে পসরা মাথায় মেয়ে ও পুরুষ দু'জন, চারজন করে যাওয়া-আসা করছিল আর নিজেদের মধ্যে গল্প বলছিল—বোধ হয় সুখ-দুঃখের। নৌকোর যাত্রীরাও নিজেদের, পরের ও গ্রামের সুখ-দুঃখের কথা বলছিল। বাসব একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছে, এই সব স্তরের লোকেরা যখন একত্র হয় তখন তাদের মধ্যে পর-নিন্দা ও পরচর্চ্চার চেয়ে সুখ-দুঃখের কথাই হয় প্রধান আলোচনার বিষয়। তবে অল্পবয়সীদের কথা আলাদা।

তোরাব দাঁড়ে একটা হেঁচকা টান দিয়ে বললে, "হেঃ! এস বাসু।"

বাসবের পৌরুষ জেগে উঠলো। সে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাঁড় টানতে লাগলো। সামনে গুণ টেনে যাচ্ছিল দু'খানা নারকেল বোঝাই ঢাউস নৌকো। তারা তাদের ছাড়িয়ে গেল। বাসব ও তোরাবের উৎসাহের ছোঁয়াচ লাগলো মাঝি ও যাত্রীদের মনেও। তাদের মুখে হাসি ও বোল ফুটলো। তারা দু'জনকে উৎসাহ দিতে লাগলো। মাথার ওপর প্রচণ্ড সূর্য্য। রোদে মাথার তালু পুড়ে যাচ্ছে। শ্রমে ও তাপে বাসবের দু' রগ বেয়ে ঘাম ঝরছে।

মাঝি বললে, "সাবাস্!"

যে প্রৌঢ়টি বাসবের প্রশংসা করছিল, সে বললে, "ছাড়ান দাও, খোকাবাবু! দম নাও।"

কিন্তু খোকাবাবুর কাছে তখন দম নেওয়াটা পরাজয় ও লজ্জারই সমান বলে হচ্ছে। সে 'ছাড়ান' না দিয়ে আরও জোরে টানতে লাগলো। সামনে ব্যাপারি-পাড়ার ঘাট। সেখানে বড় বড় নৌকো বাঁধা—ধান, পাট, নারকেল প্রভৃতি পণ্য এসেছে এবং কতকগুলো বোঝাই হচ্ছে। বাসবদের নৌকোখানার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাপারি-ঘাট। তারা গিয়ে সেই ঘাটে ভিড়লো। এবং বাসব যখন নৌকো থেকে নেমে ডাঙায় উঠলো তখন তার শরীর ক্লান্ত, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। পা দু'খানা টলছে। নদীর ধারের পথটা অপেক্ষাকৃত সোজা। সে সেই পথেই বাড়ি এসে পৌছলো। বেলা তখন অনেক।

ভাইয়েদের সকলের খাওয়া তখন হয়ে গেছে; মা বসে আছেন তার জন্য। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি হঠাৎ কোমল হয়ে গেলেন। বললেন, "তোর এ কি মূর্ত্তি? মুখখানা কালি হয়ে গেছে, চোখ দুটো লাল! কোথায় গিয়েছিলি?"

বাসব বললে, "কাজিরপুর।"

—"এই না তুই আড়তের আগুন দেখতে গিয়েছিলি?"

—"সেখান থেকে গিয়েছিলাম।"

—"এত বেলায় আর চান করিস নি। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে খেতে বস।"

—"এই গরমে চান না করলে মরে যাবো।" বলে বাসব গামছাখানা নিয়ে চললো নদীতে। মাথায় মাখবার তেল সব দিন জোটে না, জুটলেও মাখতে ইচ্ছা করে না।

বেলা দুপুর। সে ঘাটে গিয়ে নামলো। শূন্য ঘাট। এক জায়গায় একটি বক চুপ করে জলের ধারে তীক্ষ্ণ ঠোঁট উঁচিয়ে বসে আছে। মাঝগাঙে একটা শুশুক হুস করে উঠে আবার ডুব দিল। পাশে একটা কচ্ছপ জল থেকে মাথা তুলে যেন তাকেই দেখে তলিয়ে গেল। তীরে জামগাছের ডালে বসে একটা চিল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠলো। ওপার দিয়ে একখানা ডিঙি অলসের মতো ভাটিতে ভেসে যাচ্ছে। দূরে, বোধ হয় পশ্চিম-পাড়া থেকে, ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। নদীর নীল জল রোদে তলোয়ারের মতো চক্ চক্ করছে। বাতাসের স্পর্শে বাসবের শরীর একটু আরাম পেলেও শিউরে উঠলো। মাথার দু'টি রগ এবারে যেন কেমন টন্ টন্ করে উঠ[illegible]। সকালে তার মনে যে গুমোট ভাবটা ছিল এখ[illegible] জায়গায় দেখা দিল বিষাদ। সমস্ত দৃশ্যটাই তার [illegible] কেমন নিরানন্দ ও শূন্য বোধ হতে লাগলো।

সে এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে নদীতে নেমে কয়[illegible] ডুব দিয়ে ডাঙায় উঠে মাথা মুছ্‌তে মুছ্‌তে বাড়ি [illegible] গেল।

খেতে বসেও তার শরীরটা তেমন স্ফূর্ত্তি পেল [illegible] খাবারে স্পৃহা জাগলো না। যেন অনিচ্ছায় ভাত [illegible] গিলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

মা আশ্চর্য্য হলেন। দুপুরে সে কখনও ঘুমো[illegible] হয় বই পড়ে, নয় দা-বাঁখারি নিয়ে কিছু তৈরি করে [illegible] কারো বাড়ি যায়। কোন কোন দিন ভাইবোনগু[illegible] নিয়ে গল্প ফেঁদে বসে। তারা হাঁ করে শোনে। [illegible] এ কি হ'ল? তবুও তিনি কৌতূহল দমন করে [illegible] সংসারের কাজে ব্যস্ত রইলেন। তখনও তাঁর [illegible] হয় নি। প্রত্যহ আহার করেন প্রায় শেষ বে[illegible] রাতের বেলা মাসের মধ্যে পঁচিশ দিনই অনাহারে থা[illegible] কারণ জিজ্ঞেস করলেই বলেন, "আমার আর [illegible] দরকার নেই। তোমরা খাও।"

ছেলে-মেয়েরা বুঝতো না যে, আহারের প্রতি [illegible] অবহেলা তাদেরই খাদ্যে যাতে টান না পড়ে [illegible] ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে। এমন মা বাংলায় অনেক আছেন।

সন্ধ্যার দিকে মা দেখলেন, বাসব তখনও [illegible] ডাকলেন, সাড়া পেলেন না। কাছে গিয়ে কপালে [illegible] দিয়ে দেখেন, আগুন!

দারিদ্রের ঘরে ছেলে-মেয়ের অসুখে প্রথমটা [illegible] হয় এখানেও তাই হ'ল। কোন চিকিৎসাই [illegible] না। চিকিৎসক পয়সা না দিলে আসে না, [illegible] না দিলে ওষুধও পাওয়া যায় না। তবুও পাড়ায় [illegible] এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। নাম সতীশ [illegible] তিনি জীবনে স্কুলে পড়েছিলেন সাত বছর। [illegible] পিতাঠাকুর লোককে টোটকা ওষুধ দান [illegible] এবং স্থানীয় আদালতের ছিলেন মুন্সি। তিনি [illegible] যাবার পর পুত্র পড়া ছেড়ে দিয়ে হানিমানী বাংলা [illegible] পড়ে ঔষধের বাক্স ও স্টেথসকোপ কিনে বাজারে [illegible] একটি ছোট টিনের ঘরে আলমারি, টেবিল [illegible], বেঞ্চি দিয়ে সাজিয়ে ডিসপেনসারি খুলে দিলেন। [illegible]নে সন্ধ্যায় বসতো আড্ডা, পুড়তো তামাক, [illegible]তা আলোচনা আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, [illegible]ক। এক একদিন তুমুল তর্ক ও ঝগড়া হ'ত। [illegible] ডাক্তার বাবুকে কেউ ঘাঁটাতো না। এবং [illegible]ল-বিকাল রোগীও আসতো। তিনিও একটি বলদে [illegible]ায় চড়ে যেতেন শহরের বাইরে গ্রামে, নদীপারে [illegible]ন্তরে চাষীদের বাড়ি রোগী দেখতে। তাঁর নাম [illegible] খুব, অবশ্য সাধারণের মধ্যে; খাতিরও ছিল বেশ। [illegible] পয়সাওলা শিক্ষিতদের মধ্যে ছিল বদনাম। তাঁকে [illegible] আড়ালে অনেকেই হাস্য-পরিহাস করতো। কিন্তু [illegible]ই কপাল যে শিক্ষিতদের মধ্যেও তাঁর রোগীর অভাব [illegible] না। তারা তাঁর ওষুধ বা জল যা খেয়েই হোক, [illegible]বা নিতান্ত ভাগ্য জোরেই অনেক সময় সেরে উঠতো। [illegible]রা, আমাশয়, পেটের অসুখের সময় তাঁর পড়তো [illegible]ম।

[illegible] লোকটির গায়ের রঙ কালো, শরীরটি বেঁটে থলথলে, [illegible]ক জোড়া প্রকাণ্ড ও কাঁচা-পাকা, মাথার চুলগুলি গোল [illegible]র ছাঁটা, মুখখানিও গোল, চোখ দুটি বড়, গালে সব [illegible]য়ে পান। পোশাকের মধ্যে কি শীত, কি গ্রীষ্ম গায়ে [illegible]টি ছিটের কোট, বুকে চাদর বা আলোয়ান বাঁধা। [illegible]কালে মাথায় জড়াতেন কমফর্টার, পায়ে দিতেন মোজা [illegible]ানায় আবদুল কারিগরের তৈরী পুরু সোল ফিতে [illegible] কালো বার্নিশ জুতো। জুতো কিনতে তাঁর পয়সা [illegible]তো না। আবদুল ফিয়ের বদলে তাঁকে বছরে এক [illegible]ড়া জুতো তৈরী করে দিত।

বাসবের ছোট ভাইটি সন্ধ্যার একটু পরে গিয়ে ডিস[illegible]ারিতে হাজির হ'ল।

ডাক্তার বাবু তখন সবে একটা শক্ত কেস' দেখে [illegible]রছেন। বাসবের ছোট ভাইটিকে তিনি চিনতেন; [illegible]জ্ঞেস করলেন, "কিরে সুধো?"

তার নাম সুবোধ। বেচারী ম্লান মুখে দাঁড়িয়েছিল। [illegible] দাদাকে একটু বেশি ভালোবাসে।

সুবোধ বললে, "দাদার খুব জর। মা বললে—"

ডাক্তার বাবু বললেন, "কবে হয়েছে?"

—"আজ সন্ধ্যেয়।"

—"আচ্ছা। যাবো—"

সুবোধ আরও যেন কি বলতে চাইলে, কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন, "যা— বাড়ি যা।"

এবং একটু রাত্রে বাসবকে দেখতে এলেন। দেখে কি বুঝলেন, তিনিই জানেন। রোগী তো বেহুঁস। তবুও মাকে সাহস দিলেন, "ভয় নেই ওষুধ দিচ্ছি, সেরে যাবে। সুধো, একটা শিশি নিয়ে আয়।"

দরজার পাশ থেকে মা মাধুকে ফিস্ ফিস্ করে কি বললেন। মাধু বললে, "আপনার ফি পরে দেবো। দিদিকে দাদার অসুখের কথা লিখছি—"

ডাক্তার বাবু বললেন, "আচ্ছা—আচ্ছা। আমার ফিয়ের কথা লিখতে হবে না। চল্ সুধো।"

সুধো ডাক্তার বাবুর সঙ্গে শিশি নিয়ে বেরিয়ে গেল। তাদের বাড়ির খান কয়েক বাড়ি পরেই ডাক্তার বাবুর বাড়ি। বাড়ির সামনে মাঠ। বাসবেরা কতদিন লুকিয়ে ডাক্তার বাবুর ঘোড়াটার পিঠে চড়বার চেষ্টা করেছে। ঘোড়াটার পিঠ থেকে পড়ে হরিপদ একবার হাত ভেঙে গিয়েছিল। বাসবও পড়ে খানিকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল।

মা মনে মনে ডাক্তারকেই আশীর্বাদ করলেন, "ভাল হোক।" ফিয়ের বদলে এই সামগ্রীটি ডাক্তার বাবু বেশির ভাগ লোকের কাছ থেকেই পেয়ে থাকেন। এবং এ কথা বন্ধুমহলে বেশ খুশি হয়েই বলেন।

তাঁরা ঠাট্টা করে বলেন, "এমন ধন-দৌলৎ কত জমেছে?"

ডাক্তার বলেন, "ঈশ্বর জানেন। কিন্তু এক এক সময় মনে হয় এত ভারী যে আর বইতে পারবো না।" বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটো চক্ চক্ করে ওঠে, গলার স্বর কেমন গাঢ় হয়ে যায়। তারপরই একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, "মানুষের কি অবস্থা!"

কিছুক্ষণ পরে সুবোধ ওষুধ নিয়ে এল। রোগীকে কোন রকমে এক দাগ খাওয়ান হ'ল, কিন্তু তার চোখ দু'টো আর খুললো না। (ক্রমশঃ)

রাধামাধবের রত্নহার

শ্রী ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চাঁদপালের দরবার

নিমপুকুর গ্রামের আসল নাম মাথা-কাটা। কিন্তু ঐ নামের সঙ্গে একটা আপত্তিকর স্মৃতি জড়িত থাকায় বর্ত্তমান জমিদারের আমলে গ্রামের নাম বদলাইয়া নিম-পুকুর রাখা হইয়াছে। তবে বৃদ্ধেরা এখনও নতুন নাম রপ্ত করিতে পারেন নাই, মাঝে মাঝে ভুল করিয়া ফেলেন। ৫০।৬০ বছর আগে কিন্তু ঐ মাথা কাটা নামটাও প্রচলিত ছিল না—তখন লোকে বলিত 'সাধুর চর'। ঐখান দিয়া সে সময় এক মস্ত নদী বহিয়া যাইত, তাতেই চর পড়িয়া গ্রামের সৃষ্টি।

সেই ৫০।৬০ বছর আগের কথাই বলিতেছি। পর্ত্তু-গীজ দস্যুর উৎপাত তখন হইতেই বাংলা দেশে সুরু হইয়া গিয়াছে। দিল্লীতে মোগল বাদশাহ রাজত্ব করিতেছেন বটে কিন্তু সুবে বাংলার নানা জায়গায় অরাজকতা চলিতেছে। ছোট ছোট জমিদাররাও শক্তি সঞ্চয় করিয়া ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছেন। সুবে-দারকে তাঁরা আর বিশেষ আমলে আনতে চান না। আর এই জমিদারী ও তাহার আনুষঙ্গিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁরা যে পথ বাছিয়া লইয়াছেন তাহাও তেমন নিষ্কলঙ্ক নয়। জমিদারী বৃদ্ধির প্রধান উপায় তখন দস্যুবৃত্তি। বেতনভোগী ডাকাত রাখিয়া, ছলে-বলে-কৌশলে নিরপরাধ পথিকের ধনপ্রাণ হরণ করিয়া এই কার্য্য সমাধা হইতেছে। জমিদার হয়তো ভাল মানুষটি সাজিয়া বসিয়া আছেন—যেন ভাজা মাছটিও উল্টাইয়া খাইতে জানেন না!

সাধুর চরেও এই রকম এক জমিদারী গড়িয়া উঠিতেছিল। জমিদারের নাম রত্নেশ্বর। নামটি সার্থক করিবার জন্য কোন দুষ্কর্ম্ম করাইতেই তাঁর বাধিত না, আর এ কাজে তাঁর প্রধান সহায় ছিল ভীমপাল নামক জনৈক কৈবর্ত্ত-সন্তান। চেহারায়, আকারে এবং চলনে ভীমপাল সত্যি সত্যিই ছিল ভীমের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রত্নেশ্বরের নামে বাঘে গরুতে এক জল খাইত—কিন্তু সে ব্যবস্থা হইত ভীমপালেরই দিয়া। আশপাশে সর্ব্বত্র তাহার গুপ্তচর বেড়াইত কোথায় কোন্ বণিক্ জলপথে পণ্য চলিয়াছে, তাহাকে ডুবাইয়া নৌকা লুট করিতে কোথায় কোন্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল শ্রাদ্ধের দান মাঠ পার হইতেছেন, লাঠির ঘায়ে তাঁদের সেই পুঁতিয়া দানের জিনিষ কাড়িয়া লইতে হইবে, কোন্ নববধূ নতুন বিবাহের পর অলঙ্কারপত্র পাল্কী চড়িয়া শ্বশুর-বাড়ী চলিয়াছে, কেমন করিয়া হত্যা করিয়া সে অলঙ্কারপত্র দখল করিতে হইবে সব বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে ভীমপালের যুড়ি ছিল রত্নেশ্বর অত্যন্ত বদ্‌রাগী লোক ছিলেন, কাহারও বিরক্ত হইলে তাহার মাথা না নিয়া রেহাই দিতেন

দিয়া একবার শুধু উচ্চারণ করিতেন 'মাথা আন', পর মুহূর্ত্তে ভীমপালের দৌলতে অপরাধীর কাটা আনিয়া হাজির হইত। যারা দিবার কেহ ছিল না।

সেই রত্নেশ্বর একবার কি কারণে খোদ ভীমপালের পরই গেলেন চটিয়া। সামান্য কারণ, কিন্তু কি বুদ্ধি হইল, অভ্যাস মত মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল 'মাথা আন'। কিন্তু রত্নেশ্বর ভাবিতে পারেন নাই তাঁর প্রতাপ তার সবটাই এখন ভীমপালের দৌলতে; এবং প্রশ্রয় দিয়া দিয়া আজ এমন অবস্থা হইয়াছে যে তাঁর লোকেরাও আজ তাঁর চেয়ে ভীমপালকে বেশী ভয় করিতে শিখিয়াছে। শোনা যায় ঐ আদেশই রত্নেশ্বরের শেষ আদেশ। আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ভীমপালের বদলে তাঁর নিজের মাথাই স্কন্ধচ্যুত হইয়া পড়ে এবং সেই হইতে জমিদারী ভীমপালের হাতে চলিয়া আসে। রত্নেশ্বরের বালক পুত্র ও বিধবা পত্নীও সেই রাত্রেই কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!

সেই হইতে 'সাধুর চর' হইল মাথা-কাটা। প্রভুর রক্ত রঞ্জিত-হস্ত ভীমপাল ইহার পর কিছুদিন আরও দাপের সহিত জমিদারী বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বেশী দিন সে সুযোগ তার হয় নাই। জমিদারী ব্যাপারেই একদিন নৌকার পথে যাইবার সময় পড়িয়া সরস্বতীর গর্ভে নৌকা সমেত তার জমিদারী-লীলা শেষ হয়।

ভীমপালের ছেলে ভূপাল, এবং ভূপালের ছেলে মান জমিদার চাঁদপাল। চাঁদপালের আমলেই মাথা-কাটা আবার নাম বদলাইয়া নিমপুকুর হইয়াছে।

চাঁদপাল বয়সে প্রৌঢ়। তামাটে রং, বলিষ্ঠ, রোমশ —দেখিলে অনেকটা তার পিতামহের কথাই মনে হয়। সব চেয়ে লক্ষ্য করিবার জিনিষ তার চোখ দু'টি, চোখ তো নয়, যেন দু'টি আগুনের গোলক! সে চোখের দিকে তাকাইলেই মন যেন কেমন অস্বস্তিতে ভরিয়া ওঠে! চাঁদপাল পিতামহের সদ্‌গুণগুলির অধিকাংশই পাইয়াছে এবং সম্পত্তি বৃদ্ধির বিভিন্ন পথগুলিও যথারীতি আয়ত্ত করিয়াছে। কিন্তু সে নাকি তিন পুরুষের জমিদার, সেই তাঁর আচার-ব্যবহারে কিছুটা আভিজাত্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়—যা ভীমপালের বেলায় থাকা সম্ভব ছিল না।

প্রকাণ্ড দীঘির পাড়ে চাঁদপালের বিরাট অট্টালিকা। দীঘির চার দিক্ ঘিরিয়া সারি সারি নিম গাছ—ইহারই জন্য গাঁয়ের নাম নিমপুকুর। গাছের ঘন ছায়া দীঘির ঘন জলকে যেন আরও ঘন করিয়া তুলিয়াছে।

বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর। মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামের পর চাঁদপাল তাঁর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছে। এই ঘরটিকে দরবার-গৃহ বলা হয়। বিকালে এখানে বসিয়াই চাঁদপাল লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা বলে, মন্ত্রণা, পরামর্শ ইত্যাদিও এখানেই হয়।

এক এক করিয়া দর্শনপ্রার্থীরা হাজির হইতে লাগিল। কাহারও খাজনা বাকি পড়িয়াছে, হুজুরের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষার জন্য আসিয়াছে; কেহ বা সময় ভিক্ষার জন্য। কিন্তু চাঁদপালের দরবারে উহার কোনটিই সহজপ্রাপ্য নয়। কয়েক জনকে পাইকরাই বাঁধিয়া আনিয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাদের কারো ভাগ্যই সুপ্রসন্ন নয়, সকলের উপরই চাবুক ও আজ রাত্রের মত অন্ধ-কুঠুরীতে বাসের হুকুম হইবে ইহা প্রায় জানা কথা। হইলও তাই।

দর্শনার্থীরা বিদায় হইলে ঘরের দরজা ভেজাইয়া দেওয়া হইল, ঘরের অধিবাসীরা আরও ঘনীভূত হইয়া বসিল। ইহারা সকলেই চাঁদপালের মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্য; যত রকম দুষ্কর্ম্মের প্রধান সহায়।

একটি একটি করিয়া খবর পরিবেশন সুরু হইল। গত কাল বেদিয়ার চরে দু'খানি বড় বড় সওদাগরী নৌকা লুট করা হইয়াছে—লুটের পরিমাণ মেহাৎ মন্দ হইবে না। সিতারার জঙ্গলে প্রতিবেশী জমিদার তমিজুদ্দীনের কয়েক জন কর্ম্মচারী মহাল হইতে টাকা আদায় করিয়া ফিরিতে-ছিল, তাদের আক্রমণ করিয়া টাকা কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে। একজন খুনও হইয়াছে, তবে এ পক্ষের ভুলু সর্দ্দার ছাড়া আর কেউ তেমন জখম হয় নাই। ভুলুকে হয়তো এখন মাস দুইএর জন্য বিশ্রাম দিতে হইবে। সরস্বতীর বুকে কয়েকখানি ভারী বজরা আটকানো হইয়া-ছিল, কিন্তু উহা নাকি পর্ত্তুগীজদের আশ্রিত তাই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বজরার আরোহী মারফৎ ডি-মেলো সাহেবকে শুভেচ্ছা জানাইতেও ভুল হয় নাই। মৈনুদ্দিন

TIGHT BINDING

সর্দ্দারের দল সুন্দরবনের কোন্ এক অঞ্চল হইতে একদল তীর্থযাত্রীকে সপরিবারে বাঁধিয়া আনিয়াছে। হুজুরের হুকুম মত তাদের ব্যবস্থা করা হইবে। তারা নাকি চন্দনা গাঁয়ের প্রজা।

এক মুখ কড়া তামাকের ধোঁয়া উদ্গীরণ করিয়া চাঁদপাল বিরক্ত কণ্ঠে কহিল, "এ সব টোটকা খবর তো রোজই আছে, আর কোন খবর নেই?—ফিরিঙ্গীর চক্ থেকে কোন লোক আসে নি?"

"আজ্ঞে, না তো!"

চাঁদপালের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, "শেষটায় বারেটোও কি বেইমানি করলে! এত দিন হয়ে গেল, আগাম টাকা দেওয়া হ'ল, অথচ সেই চুপচাপ! আমার ধারণা ছিল পর্ত্তুগীজরা আর যাই হোক্ বিশ্বাস ভঙ্গ করে না। কথা দিয়ে কথা রাখতে কসুর করে না।" একটু থামিয়া কহিল, "ওদিকে সুবেদার সাহেব পেছনে লেগেছেন—তারও দাওয়াই দেওয়া যাচ্ছে না!"

চাঁদপালের কথা শেষ হইতে না হইতে দরজায় করাঘাত পড়িল। চকিতে পারিষদ্ দল একটু সরিয়া বসিল।

"কে?"

"আজ্ঞে আমি। বিব্বু।"

"ওঃ! এস, ভেতরে এস।"

ঘরে ঢুকিয় বিব্বু আভূমি নত হইয়া অভিবাদন ক... তার পর পেছন ফিরিয়া, বোধ হয় ৫ জন ফি... সৈনিককেই লক্ষ্য করিয়া, কহিল, "তোমরা বা... অপেক্ষা কর।" বিব্বুর মুখে প্রসন্নতার হাসি।

"কি খবর, বিব্বু? পাদ্রী সাহেব ভাল আ... তো?"

"হ্যাঁ, তাঁর কাছ থেকেই আসছি।" বিব্বু সন্ত... পোষাকের ভিতর হইতে কাপড়ে মোড়া একটি ... বাক্স বাহির করিয়া ইতস্ততঃ ভাবে চারদিকে চাহিল।

"কি আছে ওর মধ্যে? স্বচ্ছন্দে খুলতে পার।"

এবার আর বিব্বু দ্বিধা না করিয়া বাক্সটি খু... চাঁদপালের হাতে অর্পণ করিল। ঠিক সেই সময়ে জা... দিয়া পড়ন্ত সূর্য্যের আলো ঘরের মধ্যে লুকোচুরি খেল... ছিল। তারই এক টুকরা ছিটকাইয়া আসিয়া সেই... পাড়তেই একটা তীব্র আলোকচ্ছটায় ঘর শুদ্ধ লো... চোখ ধাঁধিয়া উঠিল। সকলে বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে দে... চাঁদপালের হাতে একটি অপরূপ কণ্ঠাভরণ। পরক্ষ... একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল—'রাধামাধবের রত্নহা...

(ক্রমশঃ)

উষ্ট্র-চরিত

শ্রীবেলা বসু, বি. এ.

মরুভূমির কথা ভাবিতে গেলে উটের কথা আগে মনে হয়। মরুভূমি পার হইবার জন্যই যেন উটের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সেই জন্য ইহার গড়নেও কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। নীচের বালির তাপ ও ঝলসানি ... চক্ষুকে রক্ষা করিবার জন্য উটের মাথা উঁচুতে ... দরকার, সেই জন্য ইহার ঘাড় লম্বা। চোখে ...

...জে বালি ঢুকিতে না পারে সে জন্য চোখের পাতা... ও লম্বা। কানের গর্ত্ত দুইটিও লোমে ঢাকা। নাকের ...ও গোল না হইয়া দুইটি কাটার দাগের মত, ইচ্ছা ...লেই বন্ধ করা যায়। উটের প্রত্যেক পায়ে দুইটি ...ুল এবং সেই আঙ্গুলগুলির শুধু আগাটুকুই মাটিতে ...ক। খানিকটা আবার খুর দিয়া ঢাকা। ইহারা ...মত আঙ্গুল বাঁকাইতে পারে, সে জন্য নরম বালিতে ...দের পা বসিয়া যায় না। তা ছাড়া ইহাদের গায়ের ...ড়া বেশ শক্ত। বুকের ও হাঁটুর কাছে এত শক্ত যে ...ানে ঐ চামড়া শিঙের মত এক জিনিষে গিয়া ...াইয়াছে।

উটের আর দুইটি খুব আশ্চর্য্যজনক সম্পত্তি আছে, ...বশেষ লক্ষ্য করিবার জিনিষ। প্রথমটি উটের পাক..., দ্বিতীয়টি কুঁজ। উটের পাকস্থলী তিন ভাগে ...ক্ত। প্রথম ভাগের ভিতর দিকের গায়ে ৮০০ চামড়ার ... আছে; ইহাদের মধ্যে বড়গুলি তিন ইঞ্চি চওড়া ...তন ইঞ্চি গভীর। এই থলগুলির প্রত্যেকটির মুখ ...পেশী দিয়া ঢাকা। যখন মরুভূমিতে দিনের পর দিন ...না খাইয়া থাকিতে হয় তখন পাকস্থলার এই সঞ্চিত ... ফোঁটা ফোঁটা আসিয়া উটের শরীরের রক্তের সহিত ...।

উটের দ্বিতীয় অদ্ভুত সম্পত্তি তাহার কুঁজ। আরব...য় উটের দুইটি করিয়া কুঁজ থাকে। আমাদের ...শের উটের একটি মাত্র কুঁজ। এই কুঁজ ... কিন্তু ইহার ...াঁড়া বেঁকিয়া হয় নাই—ইহা একটি চর্ব্বির তাল...। অন্য খাদ্যদ্রব্য না পাইলে ইহারা কুঁজের ঐই ...কে খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। কাজেই স্পষ্ট দেখা ...তেছে, উটের শারীরিক গঠনপ্রণালী মরুভূমিতে ...য়াত করিবার বিশেষ উপযোগী। এই কারণে ...রাজীতে উটকে বলে, "মরুভূমির জাহাজ"।

আরব দেশীয় উট জন্মাইবার এক সপ্তাহ পরেই ... উঁচু হয় এবং ১৬-১৭ বৎসর অবধি বাড়ে। ইহারা ...০ বছর অবধি বাঁচে। উটের মাংস নাকি আরবদের ...প্রিয় খাদ্য। ইহার দুধও নাকি অতি সুস্বাদু ও ...কারক। তবে সে দুধে মাখন হয় না। উটের গলার ... পায়ের উপরিভাগে ও কুঁজের উপর এক রকম লোম জন্মায়। আরবেরা এই লোম হইতে এক প্রকার কাপড় প্রস্তুত করে। বাইবেলে আছে—প্রচারক জন্ দি ব্যাপটিষ্ট এই উটের লোমে তৈরী কাপড়ের পোষাক পরিতেন। আজকাল এই লোম হইতে চিত্রকরের তুলি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। মরা উটের চামড়াও খুব মজবুত।

উটের ভার বহিবার ক্ষমতা প্রচুর। কোন কোন জাতের উট ১২,১৩ মণ মোট লইয়া যাইতে পারে এবং ক্রমান্বয়ে ৪,৫ দিন জল না খাইয়া মরুভূমির উপর দিয়া অক্লেশে চলিতে পারে। একবার নাকি অষ্ট্রেলিয়া দেশে একটি উট জল না খাইয়া ক্রমাগত চলিতে চলিতে ৩৪ দিনে ৫৩৭ মাইল গিয়াছিল। সূর্য্যতাপে বোধ হয় ইহাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। ভার নামাইয়া দিয়া ইহারা ছায়ার দিকে না গিয়া রৌদ্রেই দাঁড়াইয়া থাকে। মরু-

মরুভূমিতে উট

ভূমিতে গরম বালির ঝড় চলিতে আরম্ভ হইলে ইহারা নাক বন্ধ করিয়া, বালির মধ্যে গলা ঢুকাইয়া, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়ে। ইহাতে চালকেরাও কতক পরিমাণে রক্ষা পায়।

উটের ঘ্রাণশক্তি অতি তীব্র। এক মাইল দূরে জল থাকিলেও ইহারা বুঝিতে পারে। তখন রাশ না মানিয়া সোজা সেই জলের দিকে ছোটে। গাছের লতাপাতা ও শুষ্ক শাক-শব্জী ইহাদের প্রধান খাদ্য। মরুভূমিতে অনেক দিন ঘুরিবার পর ইহারা যখন প্রথম ভাল চরিবার জায়গায় পৌঁছায় তখন প্রায়ই অত্যধিক ভোজনে প্রাণ হারায়।

অপর দিকে আবার যখন অন্য প্রাণীরা অনাহারে মরে তখন ইহারা ডালপালা চিবাইয়া দিব্যি প্রাণধারণ করে।

উটের বুদ্ধি বড় কম। একবার চলিতে আরম্ভ করিলে চালকের ইঙ্গিত মানিতে চাহে না। ইহাদের বশে আনা বড় কষ্টকর, কেবল বোকা বলিয়াই মানুষের বশে আসিয়াছে। কখন কখন উটেরা দল বাঁধিয়া পালায়। ইহারা বদরাগী ও সাধারণতঃ রুক্ষ। ইহার জন্য বোধ হয় পালকেরা কতকটা দায়ী। উটের পালকদের প্রায়ই কোন রকম দয়ামায়ার পরিচয় পাওয়া যায় না।

স্তন্যপায়ী ও গৃহপালিত পশুদের মধ্যে উটই বোধ হয় প্রাচীনতম। তবে কোথায় বা কবে ইহারা প্রথম পোষ মানিল তাহা জানা যায় নাই। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর আমেরিকাতে এই জাতীয় প্রাণীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তখন অবশ্য ইহাদের আকার খুবই ছোট ছিল। উটের এই পূর্ব্ব পুরুষকে পেট্রোলোপাস বলা হয়। ইহাদের পায়ে চারিটি আঙ্গুল ছিল। পরের যুগে ইহারা একটু বড় হইলে ইহাদের দুইটি আঙ্গুল ছোট হইয়া গেল। পণ্ডিতেরা তাহাদের নাম দিয়াছেন প্রাইব্রোথেরিয়াম।

পেরু দেশের লামারা উটের অতি নিকট সম্পর্কীয় জন্তু। তোমরা জান বোধ হয়, এই লামার লোম হইতে খুব সুন্দর এক রকম পোষাকের কাপড় তৈরী হয়। এক সময় আমেরিকাতেও যথেষ্ট উটের বাস ছিল। তারপর ধীরে ধীরে,—সেও বহু যুগ আগে—ইহারা এসিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে (বেরিং প্রণালী তখন যোজক ছিল)। আমেরি আর উট রহিল না, রহিল শুধু তাদের পূর্ব্ব পুরুষদের হাড়, সাগরের সঙ্গে মিশিয়া।

আজকাল অবশ্য কিছু কিছু উট আমেরিকা ও লিয়ায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইয়োরোপ মাত্র পিসা নগরেই উট দেখা যায়। বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে, আফ্রিকায়, এমন কি স্পেনেও উট গিয়াছে। মিশর দেশে তো ছিলই। সে উটের কুঁজ! পারস্য দেশের খোরাসান্ নামে উটগুলি মধ্যে সবচেয়ে বলশালী ও আকারে বড়।

কিন্তু উট যেখানেই থাকুক না কেন, উটের চেয়ে বেশী আরব দেশে। সেখানে উটকে মূল্যবান্ সম্পত্তি বলিয়া জ্ঞান করে। গাড়ী টানা, মাল বহন করা, মরুভূমি পার হওয়া, পাহাড় চড়া খাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য আরবরা বিভিন্ন উট পোষে।

কেহ কেহ বলেন উট মানুষের অতি প্রয়োজনীয় হইলেও দেখিতে কুৎসিত ও কদাকার। আবার কাহারও মতে উটকে আদৌ কদাকার জীব বলা বরং তাহাদের আকৃতিতে একটি গম্ভীর, চিন্তাপূ আভিজাত্যের ভাব দেখা যায়। তোমরা নিশ্চয় দেখিয়াছ। ইহাদের কোন্ মতটি তোমরা অনু কর?

ভয়ানক ঠাণ্ডার দিন। অবিরাম তুষারপাত হচ্ছিল··· অন্ধকারাচ্ছন্ন চারিদিক্। সন্ধ্যাকাল—পুরোনো বছরের শেষ সন্ধ্যা আজ। কিন্তু এই ঠাণ্ডা ও অন্ধকার সত্ত্বেও একটি ছোট্ট গরীব মেয়ে খালি মাথায়, খালি পায়ে তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছিল পথে পথে।

দেশলাই-বিক্রেতা বালিকা

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

বাড়ী থেকে বেরোবার সময় অবশ্য তার পায়ে জোড়া চটি জুতো ছিল। কিন্তু সে দুটো অত্যন্ত বড় অসলে তা তার মার পায়ের জুতো। চটিটা, যখ দুটো গাড়ীর মাঝ থেকে বাঁচবার জন্য দৌড়ে রাস্ত হচ্ছিল তখন, পা থেকে খুলে যায়। একটাকে

পায় নি; অন্যটা একটি ছোট ছেলে নিয়ে পালায়— ছিল হয়তো তা দিয়ে তার পুতুলের দোলনা হবে। কাজেই মেয়েটি এই ভাবেই হাঁটছিল। তার খালি ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে। তার হাতে ছিল একটি ট দেশলাইয়ের বাণ্ডিল এবং আরো অনেকগুলো লো দেশলাই ছিল তার ছেঁড়া জামার ভেতর। সারা নর মধ্যে একটিও তার কেউ কেনে নি, কেউ তাকে নি একটিও পয়সা।

সাদা সাদা শিশিরবিন্দু ঝ'রে পড়ছিল ওর কাঁধের- র-ছ'ড়িয়ে-পড়া কোঁকড়ান চুলগুলোতে। কিন্তু সে দিকে হুঁস নেই কয়েকটা বাড়ী থেকে হাঁসের দের সুস্বাদু কাবাব রান্নার গন্ধ তার নাকে এল, ন বছরের আগমন উৎসবের জন্য নিশ্চয়!

একটা বাড়ীর সামনে আর একটা বাড়ী উঠে নিকটা কোণ মতো হ'য়েছিল; সে বসে পড়লে খানে। গরম ক'রবার জন্য তার পা দু'খানাকে গুটিয়ে নলে কোলের ভেতর বাড়ী ফিরে যেতে সাহস লে না সে। কারণ একটি দেশলাইও সে বিক্রী তে পারে নি—একটি পয়সাও সে রোজগার করতে রে নি আজ। হয়তো তাকে মার খেতে হবে। ছাড়া তাদের বাড়ীও প্রায় পথের মতই ঠাণ্ডা। কারণ টা একটা চিলে কোঠা। যদিও তার দেওয়ালের বড় ফুটোগুলোকে খড় আর কম্বল দিয়ে বন্ধ করা হ'য়ে- ল তবুও তার মধ্যে দিয়ে তুষার এবং ঠাণ্ডা হাওয়া াসে বারে বারে।

ঠাণ্ডাতে অসাড় হ'য়ে এল তার হাত-পা। বাণ্ডিলের ধ্যে থেকে একটা দেশলাই এখন বার ক'রে যদি সে লতে পারে সাহস ক'রে তা হ'লে হয়তো একটু গরম ওয়া যায়। একটা কাঠি বার ক'রলে সে এবং টাকে দেওয়ালের গায়ে ঘষলে। বাঃ! একটা সুন্দর, াম আগুনের শিখা! ওর ওপর সে তার হাত রাখলে। মেয়েটির মনে হ'ল যেন সে একটি ঝক্‌মকে বড় াহার স্টোভের কাছে বসে আছে—যার থেকে বের ছে সুন্দর উজ্জ্বল আগুন!

তার পা দু' খানাকেও গরম ক'রবে ব'লে বার করলে সে। কিন্তু তক্ষুনি নিভে গেল আগুন—অদৃশ্য হ'য়ে গেল স্টোভ, রইল শুধু পোড়া কাঠিটা।

আবার সে সাহস ক'রে আর একটি কাঠি নিয়ে দেওয়ালে ঘষল উজ্জ্বল আলো নিয়ে জ্বলে উঠল তা যেখানে পড়ল সেই আলো সেখানকার দেওয়াল সরে গেল পর্দ্দার মতন; মেয়েটি ভেতরের ঘর পর্য্যন্ত দেখতে পেলে স্পষ্ট। সে দেখলে, টেবিলের ওপর রিছানো রয়েছে ফুল-তোলা সাদা কাপড়, চীনা মাটির থালা সাজানো তার ওপরে। রান্না হাঁসের মাংস ধোঁয়াচ্ছিল এক পাশে সব চেয়ে মজার জিনিষ—ছুরি ও কাঁটা মাংসের মধ্যে বেঁধানো থাকা সত্ত্বেও জীবন্ত হাঁস হ'য়ে যেন সেগুলো থালা থেকে লাফিয়ে পড়ে সোজা মেয়েটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল!

কাঠিটা পুড়ে গেল, রইল শুধু চওড়া আর শক্ত দেওয়াল তার পাশে।

এবারে তৃতীয় কাঠিটি জ্বাললে সে। শিখায়িত হ'য়ে উঠল আবার আলো। এবার মনে হ'ল যেন সে বসে আছে সুন্দর একটা বিরাট্ বড়দিন-বৃক্ষের নীচে। তার ডালে ডালে শত শত মোমবাতি ঝুলছে। ছোট ছোট রঙীন মূর্ত্তি গাছের ওপর থেকে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। মেয়েটি আনন্দে হাত বাড়ালে তাদের দিকে। ···সেই মুহূর্ত্তে নিভে গেল আলো! কিন্তু তখনও জ্বলতে লাগল বড়দিনের বাতিগুলো ওপরে—আরো ওপরে। সে তাদের স্বর্গের তারার মতন জ্বল্‌জ্বলে দেখতে পেলে। একটা তাদের মধ্যে পড়ে গেল। পেছনে একটা লম্বা আগুনের লেজের মত আলোটা ভেসে বেড়াতে লাগল শূন্যে!—'কেউ বোধ হয় এখন মারা যাচ্ছে!' কোমল কণ্ঠে বল্লে মেয়েটি। তার ঠাকুরমা (যিনি একমাত্র তাকে ভালবাসতেন—এখন তিনি মরে গেছেন।) তাকে বলেছিলেন যে, যখন কোন তারা খসে পড়ে তখন একটি অমর আত্মা ভগবানের কাছে ফিরে যায়।

দেওয়ালে ঘষে সে আর একটি কাঠি জ্বাললে ফের। আর আলো ঘিরে সে দেখলে তার সেই প্রিয় ঠাকুরমা এসে দাঁড়িয়েছেন তার সামনে। তেমনি ধীর ও স্নেহময়ী।

—'ঠাকুরমা!' চীৎকার ক'রে উঠল মেয়েটি।—

'আমাকে তোমার সংগে নিয়ে চল। আমি জানি তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে কাঠিটা নিভে যাওয়ার সংগে সংগেই।' সে বাণ্ডিলের বাকী কাঠিগুলো জ্বালিয়ে ফেললে তাড়াতাড়ি, পাছে তার ঠাকুরমা অদৃশ্য হ'য়ে যান। ঠাকুরমা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তার পর উড়ে চল্লেন উঁচুতে—অনেক উঁচুতে···

পরদিন সকালে দেখা গেল দেওয়ালের কোণায় ছোট্ট একটি মেয়ে নুয়ে পড়ে আছে। তার গাল ছিল রক্তিমাভ—তার ঠোঁট ছিল হাসি-ভরা। পুরোনো বছরের শেষ দিন রাত্রে সে শীতে জমে মারা গিয়েছিল। হীন বালিকার ওপর পড়েছিল নতুন বছরের আলো। নিশ্চল ভাবে বসেছিল সে। কোলে দেশলাই। এক বাণ্ডিল তার মধ্যে পোড়া।

'আহা! মেয়েটি নিজেকে গরম ক'রতে চেষ্টা ছিল!'—বল্লে লোকেরা।

কিন্তু কেউ জানলে না কী মধুর স্বপ্ন সে দেখেছি আর কত আনন্দে সে তার ঠাকুরমার সঙ্গে ক'রলে নববর্ষের উৎসব! (অ্যাণ্ডারসনের গল্প থেকে)

শ্রীচন্দ্রচূড় চক্রবর্ত্তী

কলকাতার ফুটবল লীগে প্রথম বিভাগে এবারেও আবার ইষ্ট বেঙ্গল লীগ বিজয়ী হয়েছে। এখনও সব খেলা শেষ হয় নি, তবুও বলা যায় মোহনবাগান রানার্স্ আপ্ হবে। টিম্ হিসাবে দেখতে গেলে এবার মোহনবাগান সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল—এরিয়ান্স্ থেকে মেওয়ালাল ও ইষ্ট বেঙ্গল থেকে মহাবীরকে পাওয়াতে সকলেরই আশা হয়েছিল হয়ত এবার তারাই লীগ্ বিজয়ী হবে। সে দিক্ থেকে ইষ্ট বেঙ্গলের ক্ষতি হয়েছে সব চেয়ে বেশী—তারা গোল-কিপার কে. দত্ত আর হাফ্ ব্যাক্ মহাবীরকে হারিয়েছে। সুতরাং এই জয়লাভে তাদের বেশ কৃতিত্ব আছে। এবার নিয়ে তারা পর পর দু'বার লীগ্ বিজয়ী হ'ল। মোহনবাগান অবশ্য একটা ম্যাচেও হারে নি—কিন্তু ড্র করেছে অনেকগুলো।

কাষ্টমস্ এবারে গোল খাওয়াতে আর এক রেকর্ড রাখল। এ বছরে যে কয়টি এংলো ইণ্ডিয়ান্ টিম্ খেলেছে—তারা কেউই প্রথম বিভাগে খেলবার উপ নয়। কাষ্টম্স্ দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যাবে আর দ্বি বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে ওঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগবে জর্জ্জ টেলিগ্রাফ, সালকিয়া ফ্রেণ্ডস্ ও রাজস্থান (আগেকার মারোয়াড়ি) ক্লাবের মধ্যে।

বিজয় মার্চেণ্ট

এবারের ফুটবলের খেলা স্মরণীয় হয়ে থাকবে কলকাতায় তিনটি প্রসিদ্ধ ক্লাবের সমর্থকদের গুণ্ডামি ও মারিতে। ভবানীপুরের সঙ্গে দু'টি খেলাতেই মহমেডান স্পোর্টিংএর এবং মোহনবাগান ইষ্ট বেঙ্গলের শেষ খেলায় দুই ক্লাবের সমর্থকদের মধ্যে যে ব্যাপার হয়ে গেছে ফলে সমর্থকরা তাঁদের সমর্থিত ক্লাবের গৌরব না বাড়িয়ে সকলের সামনে ছোট করারই চেষ্টা করেছেন।

[illegible]র অ-খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তি নিতান্ত নিন্দনীয় এবং [illegible]তে যাতে বন্ধ হয় তার জন্য কড়া ব্যবস্থা দরকার।

গত বছরের মত এবারেও অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে বলতে [illegible], কলকাতায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে বাঙালীদের খুব বেশী নেই। বড় বড় ক্লাব লীগ্ জয়ের জন্য এত [illegible]ল যে বাঙালী খেলোয়াড় তৈরী করার দিকে তাঁদের [illegible] নেই।

ওদিকে ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট [illegible]তে গেছে এবং প্রথম দিক্কার খেলার ফলাফল কি [illegible]ছে তা তোমরা আগেই শুনেছ। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডের [illegible] ভারতীয় দলের প্রথম টেষ্ট্ ম্যাচ্ হয়ে গেছে। [illegible]ত কিন্তু ভারতীয় দল ভীষণ ভাবে (১০ উইকেটে) [illegible] গেছে। হার্ডষ্টাফ্ এই খেলায় একাই আউট না [illegible] ২০৫ রান্ করেছেন। অবশ্য তার পরে কোন কোন [illegible]য় ভারতীয় দল ভাল ভাবে জয়লাভ করলেও টেষ্ট [illegible]ই হচ্ছে আসল পরীক্ষা। দেখা যাক ২য় টেষ্টে কি [illegible] ইতিমধ্যে পরবর্ত্তী দু'টি খেলায় মার্চেণ্ট ও হাজারী [illegible]নেই আউট্ না হয়ে ডবল্ সেঞ্চুরি ক'রে আর একবার তাঁদের অসাধারণ ব্যাটিং-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

ইংল্যাণ্ডের টেষ্ট-ক্যাপ্টেন হ্যামণ্ড

[illegible]ত বারে তোমরা শুনেছিলে; বৃটিশ মন্ত্রিসভার তিন জন [illegible] ভারতে এসে এখানকার প্রধান প্রধান রাজনৈতিক [illegible]লের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন—এ দেশের [illegible]ভার ভারতীয়দের হাতে কি ভাবে দেওয়া যায় [illegible] সম্বন্ধে। একটা সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠনের যে [illegible] তাঁরা করেছিলেন শেষ পর্য্যন্ত তা ভেঙে গেছে—[illegible]র সর্ত্তে কংগ্রেস দল রাজী হতে পারেন নি। একটি [illegible] মুসলিম ও বর্ণ হিন্দুদের সমান আসন দেওয়া হয়েছিল [illegible]ও ভারতে শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রথমোক্তদের প্রায় তিন গুণ। তা ছাড়া আরও কতকগুলি সর্ত্ত কংগ্রেস মেনে নেওয়ার অনুপযুক্ত মনে করেন। ফলে মুসলিম লীগ্ দল রাজী হলেও কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠন করা সম্ভব হয় নি। তবে কংগ্রেস মন্ত্রি-মিশনের গণপরিষদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে এই বিষয়ে নির্ব্বাচনের আয়োজন চলছে।

* * * *

বোম্বাইএ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন

হয়ে গেল। এই অধিবেশনে নতুন রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওহরলাল ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম

রাষ্ট্রপতি জওহরলাল

আজাদের কাছ থেকে সভাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন এবং নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেছেন।

* * * *

টেলিভিশনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। টেলিফোনে যেমন এক জায়গা থেকে বহুদূরে অন্য জায়গার লোকের সঙ্গে কথা বলা যায়—টেলিভিশুনে তা তো যায়ই, সেই সঙ্গে সেই লোকের চেহারাও দেখা যায়। টেলিভিশনের আবিষ্কারক হচ্ছেন বেয়ার্ড। সম্প্রতি মৃত্যু হওয়ায় একজন বড় বৈজ্ঞানিককে আমরা হারা বেয়ার্ডের বাড়ী ছিল ইংলণ্ডে। কিছুদিন যাবৎ টেলিভিশনে রঙ্গিন ছবি দেখাবার চেষ্টা করছি এবং এ বিষয়ে তাঁর গবেষণা প্রায় শেষ হয়ে এসেছি

* * * *

ডাঃ সুধীন্দ্র বসু ছিলেন আমেরিকার আইওয়া বিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। গত ৩০ বছর আমেরিকায় অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শুধু অধ্যাপক হিসাবেই ন'ন, সাংবাদিক, গ্রন্থকার পণ্ডিত হিসাবেও তাঁর প্রচুর নাম ছিল। যে সব বিদেশের সমক্ষে ভারতের সম্মান বাড়িয়ে গেছেন তাঁদেরই একজন। তা ছাড়া বিদেশে থেকে স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনায়ও তিনি একটা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা প্রকৃত সুসন্তানকে হারিয়েছে।

* * * *

দেখতে দেখতে আবার একবার ২২শে শ্রাবণ ফিরে আসছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ এই তারিখটি স্মরণীয় হয়ে আছে। কবি আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর কাব্যের ভিতর সর্ব্বদাই আমরা তাঁকে অনুভব করছি—হাজার পরেও রব। ঐ পুণ্যতিথিটিতে তোমরা তাঁর প্রতি জানাতে ভুল না।

খোকা

শ্রীঅরুণিমা (লিলি) সেন (গ্রাহিকা)

সেদিন আমার ভাই হয়েছে—ফুট্‌ফুটে তার মুখ,
রাঙা রাঙা ঠোঁট দু'খানি করতেছে টুক্‌টুক্।
গাল দু'টি তার টুক্‌টুকে লাল, চোখ দু'টি ঢুল্‌ঢুল্,
বুকে চাপি যেন সে এক জীবন্ত পুতুল!
নানান্ ঢঙে কচি কচি হাত দু'খানি নাড়ে,
ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে গেলে চোখের আড়ে।
মনটি ভাল থাকলে পরে দোলায় চড়ে, দোলে,
নইলে পরে কেঁদে জানায় থাকবে শুধু কোলে।
সোনামণি ব'লে যদি আদর করে কেউ
মুখের পরে যায় বয়ে' তাঁর সোনার হাসির ঢেউ।
কি নাম তারে দেব আমি খুঁজে না পাই পাড়া,
যে নামে তায় ডাকি মোরা সে নামে দেয় সাড়া।

জ্যৈষ্ঠ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

জ্যৈষ্ঠের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাবেন শ্রীনন্দিতা চট্টোপাধ্যায় (কাশী) ও তৃতীয় পুরস্কার পাবেন শ্রীরণজিৎ রায় (কলিকাতা), দ্বিতীয় পুরস্কার পাবেন কুমারী রাবেয়া খাতুন (বৈকালী, ঢাকা)।

পুস্তক-পরিচয়

বাংলা বর্ষলিপি; ১৩৫৩। শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী সম্পাদিত। সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। দাম ১৷৷০

গত বছরের মত এবারেও এই বর্ষলিপি বা বাংলা ইয়ার বুক্‌খানা বার ক'রে প্রকাশক বাঙ্গালী সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এবারে বইখানিকে আরও পরিবর্দ্ধিত করা হয়েছে এবং অনেক নতুন নতুন তথ্য সন্নিবিষ্ট হওয়ায় সাধারণের বিশেষ উপযোগী হয়েছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে দিনপঞ্জীটাও উল্লেখযোগ্য। তবে "বর্ত্তমানের বিশিষ্ট বাঙ্গালী" শীর্ষক বিভাগটি আর একটু সম্পূর্ণ হ'লে ভাল হ'ত—অবশ্য তা'তে বইটির কলেবরও হয়তো কিছু বাড়াতে হ'ত।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

স্বামী-স্ত্রী

উত্তরদাতাদের নামঃ—মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য (রানীপুর); ছবি, ছায়া ও মায়া রায় (নিউ দিল্লী); সুহাসিনী মুখোপাধ্যায় (হাসি ষ্ট্রীট); শান্তি ও দীপালি মুখার্জ্জি, গোপাল মামা (এলাহাবাদ); নূরজাহান বেগম (কলিকাতা); মণিময় সেন (ঢাকা); গোপা ও অতীন (ময়মনসিংহ); সিদ্ধেশ্বর বসু (বরিশাল); নীপা ও সীতা দেবী (কাশী)।

নূতন ধাঁধা

জ্যেঠামশাই বাড়ী এসে বললেন, "কালু, টুলু, ভুলু, তোমাদের মধ্যে ছাদে দৌড়ের পাল্লা হবে। কিন্তু আমি সেখানে থাকব না, তোমরাই এসে বলবে কে কত হলে। যে সম্পূর্ণ সত্যি কথা বলবে তাকে একটা প্রাইজ্ দেব।"

দৌড়ের পর কালু এসে বললে, "ভুলু ১ম হয়েছে, টুলু ২য় হয়েছে।" টুলু বললে, "না, ভুলুই ২য় হয়েছে, ভুলু ৩য় হয়েছে।" ভুলু বললে, "তা নয়, ভুলু হয়েছে ৪র্থ, কালু হয়েছে ২য়।" ভুলু বললে, "না না, টুলু ৪র্থ হয়েছে, আমি ৩য় হয়েছি।"

জ্যেঠামশাই বুঝলেন এদের তিন জন একটি ক'রে সত্যি কথা বলেছে, কিন্তু একজন সম্পূর্ণ সত্যি কথা বলেছে। তাকেই তিনি প্রাইজ্ দিলেন। বল তো কে প্রাইজ্ পেল?

গহণাও শাড়ী

শুধু শাড়ী যত সুন্দর হোক,
তা নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ করে না।
শুধু গহণা যত সুন্দর হোক,
তাতে নারী-রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে
ওঠে না।
শাড়ী ও গহণার মিলনেই
নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ হয়।

তাই আমরা—
পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা পরিবেশনের
জন্য নানা প্রকারের বেণারসী শাড়ীর
আয়োজন করেছি—শাড়ীগুলি
বর্ণ-বৈচিত্র্যে, রূপরচনায়
অনিন্দ্যসুন্দর।

আমাদের গহণা—আধুনিক রুচি-
সম্মত শিল্পচাতুর্য্যে, রূপছন্দে
অভিনব।

Regd.

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১০ম বর্ষ
সংখ্যা
ভাদ্র,
১৩৫৩

বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ১।৵০
প্রতি সংখ্যা
।৵০

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি

কার্য্যালয়: ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্: সাউথ ১২৬

গহনা ও শাড়ী

শুধু শাড়ী যত সুন্দর হোক,
তা নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ করে না।
শুধু গহণা যত সুন্দর হোক,
তাতে নারী-রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে
ওঠে না।
শাড়ী ও গহণার মিলনেই
নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ হয়।

তাই আমরা—
পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা পরিবেশনের
জন্য নানা প্রকারের বেণারসী শাড়ীর
আয়োজন করেছি—শাড়ীগুলি
বর্ণ-বৈচিত্র্যে, রূপরচনায়
অনিন্দ্যসুন্দর।

আমাদের গহণা—আধুনিক রুচি-
সম্মত শিল্পচাতুর্য্যে, রূপছন্দে
অভিনব।

Regd. N

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১৯শ বর্ষ
[illegible]ম সংখ্যা
ভাদ্র,
১৩৫৩

বার্ষিক ৩৲
বাণ্মাসিক ১৸৴৹
প্রতি সংখ্যা
৷৴৹

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

কার্য্যালয় : ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্ : সাউথ্ ১২৬

COLOUR PAPER

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ও জন-কল্যাণে

লিলি-ব্র্যাণ্ড বার্লি

তার আদর্শকে কোন দিন খর্ব করে নাই।

তাই সুদিনে বা দুর্দিনে সবার কাছে
তার সমান আদর!

লিলি বিস্কুট কোম্পানী: কলিকাতা

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"

(গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

আট রকম বইএর নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, বাকি বইগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

১। হারান বই—(নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)
২। ঘোর প্যাঁচ—(অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)
৩। রাতের আতঙ্ক—(নীহাররঞ্জন গুপ্ত)
৪। ভূতের মত অদ্ভুত—(বুদ্ধদেব বসু)
৫। কেউটের ছোবল—সুনির্ম্মল বসু
৬। মুখ আর মুখোস—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)
৭। নীল আলো—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেকখানি বারো আনা

"প্রহেলিকা সিরিজ"

(ডিটেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চার)

ফাল্গুন মাস—রক্তভৃষা—অনলকুমার চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র—নকলের হিমালয়—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বৈশাখ—বি, এল, এ-২০৫—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো
জ্যৈষ্ঠ—জয় পরাজয়—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
আষাঢ় পূজনীয় দস্যু—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রাবণ—দুর্যোগের রাতে—শ্রীসব্যসাচি

প্রত্যেকখানি দাম এক টাকা

বিরাট সচিত্র গ্রন্থ—১৫৪ পৃষ্ঠা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—(আট খানা হাফটোন ছবি

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

এক মাসের মধ্যে বই নিঃশেষ হওয়ায়

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

চমকপ্রদ অন্তর্দ্ধান কাহিনী পরিপূর্ণ মূল্য ১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর * ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি। দাম এক টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিংশ শতাব্দীর স্মরণীয় সাহিত্য আহরণ!

স্মরণাতীত কাল থেকে আজপর্য্যন্ত শিশু-কিশোর-তরুণদের বিশ্রামের অবসর আনন্দ-মুখর ক'রে তোলবার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে এসেছেন, সবার আগে তাঁদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে প্রকাশের আয়োজন হচ্ছে, অভিজাত-পূজাবার্ষিকী—'আকাশদীপ'।

যুগমান্য শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ,

শিশুসাহিত্য-সম্রাট

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

— চিত্রবহুল বিরাট পূজাবার্ষিকী —

আকাশদীপ

মহাপূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হবে।

গত পূজায় 'কলরব' পেয়ে যাঁরা খুশী হয়েছেন, 'আকাশদীপ' তাঁদের চিত্ত আকর্ষণ করবেই এ-বিশ্বাস আমাদের আছে।

অলকনন্দা-সিরিজ অতঃপর প'ড়বেন—

শিশুসাহিত্য-সম্রাট হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'সুন্দরবনের রক্তপাগল!'

তারপর শিশুসাহিত্যাচার্য্য সৌরীন্দ্রমোহনের 'পথভোলা পথিক'

১। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
রত্নপুরের যাত্রী

২। শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
"বন্দী, জেগে আছো?"

৩। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
রীতিমত এ্যাড্‌ভেঞ্চার

৪। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

৫। শ্রীসুমথনাথ ঘোষের
মোহন সিংয়ের ফাঁসী

৬। শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
অভিশপ্ত সম্পদ

শরৎ-সাহিত্য-ভবন * ২৫.ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, পোঃ বক্স ১৬৬১০, কলিকাতা।

এবার ৺পূজায় ছেলেমেয়েদের উপহার দিবার

সবার চেয়ে সেরা বই

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মৈত্র সম্পাদিত

কাগজের নৌকা

দাম ২॥০ টাকা

এতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক ও লেখিকাদের লেখা গল্প, দুখানি উপন্যাস, রোমাঞ্চকর কাহিনী, ম্যাজিকের খেলা, কবিতার ছড়াছড়ি, প্রবন্ধ, জীবনী, শিল্প ও বিজ্ঞানের কথা, হরেক রকমের শিক্ষাপ্রদ সঞ্চয়ন, পাতায় পাতায় ছবি, বড় বড় মনীষীদের রঙীন ছবি আর বাণী, বইখানিকে অসাধারণ করেছে। এত কম দামে এমন একখানি সঙ্কলন এর আগে বেরোয় নি।

এতে লিখেছেন :

গল্প

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
এস, ওয়াজেদ আলি,
শ্রীসুকুমার দে সরকার
শ্রীবিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
শ্রীইন্দিরা দেবী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য
শ্রীবিমল দত্ত
শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল
শ্রীপ্রবোধ সান্যাল
শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
বনফুল
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

উপন্যাস

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

প্রবন্ধ

শ্রীসুধীর সরকার
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
ম্যাজিসিয়ান্ এস, কে, ভাদুড়ী
শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

কবিতা

শ্রীকালিদাস রায়
শ্রীসুনির্ম্মল বসু
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
শ্রীউপেন মল্লিক
শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

ইউনিভার্সাল বুক্ সিণ্ডিকেট
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

— কয়েকটা দুর্দ্দান্ত বই —

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

১। হত্যা এবং তারপর ১৲ ২। মোহনপুরের শ্মশান ॥৶০

মণিলাল অধিকারীর — রক্তাভ-বুদ্ধ ১৲

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের — বিদেহী আত্মা ১।০

পূজোর আগেই বেরুবে।

সবে বেরুলো! **বিভীষিকা সিরিজ** পাতায় পাতায় শিহরণ!

১। অদৃশ্য কালো হাত—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
২। দ্বীপান্তরের কয়েদী—অমিয় চক্রবর্ত্তী
৩। রক্ত-পিপাসু—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৪। আকাশের ইঙ্গিত—নীলাদ্রিশিখর বসু

প্রতি বই আট আনা

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
১০৯।এ, লেক রোড, কলিকাতা

এবার পূজায় ছেলেমেয়েদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার

অঞ্জলি

কবিতা
গল্প
উপন্যাস
আমোদ প্রমোদ
খেলাধুলা
রংবেরঙের ছবি

বিরাট ঝকঝকে বই!
ছোটদের আনন্দের খনি!

পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

দেব সাহিত্য কুটীর ★ ২২/৫ বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

—'লক্ষ্মী ঘি'

নিবেদন

ভাদ্র সংখ্যা রামধনু ছাপা হইয়া গত ১৫ই আগষ্ট (৩০শে শ্রাবণ) বাঁধাই হইতে গিয়াছিল। তার পর দিন কলিকাতায় অভাবনীয় দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু হয়, বহু দোকানপাট ও গৃহ ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হয়—হাজার হাজার নরনারী হত ও আহত হয়। সে ভয়াবহ ঘটনার বিষয় কে না জানে? সমবেদনা জানাইবার ভাষা কোথায়?

এই হাঙ্গামায় 'রামধনুর'ও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। রামধনু যেখানে বাঁধাই হইতে গিয়াছিল হাঙ্গামার সময়ে তাহা রেহাই পায় নাই। ফলে অন্যান্য জিনিষের সহিত ভাদ্র সংখ্যা রামধনুও লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছে। ফলে এ সংখ্যা আবার আমাদের নতুন করিয়া ছাপিতে হইয়াছে। এ জন্য ভাদ্র সংখ্যা বাহির হইতে কিছু দেরী হইল। আশা করি গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ক্ষমা করিবেন।

রামধনুর জন্য আমরা প্রতি মাসে মাত্র নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাগজ পাই। সুতরাং ভাদ্র সংখ্যা প্রথমে যাহা ছাপা হইয়াছিল তাহা পুনরায় সম্পূর্ণ দেওয়া সম্ভব হইল না, পৃষ্ঠা কিছু কমাইয়া দিতে হইল। আমরা ভারত সরকারের নিকট পুনরায় কাঁগজের অনুমতি চাহিয়া আবেদন করিয়াছি; যদি পাওয়া যায় তবে আগামী সংখ্যায় উহা পূরণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিব।

দিদিমার মোর ভাবনার ওর নাই।
দেবতা-দুয়ারে মানত করেন, এনে দেন স্নান-জল,
সকলি কিন্তু হইতেছে নিষ্ফল।
একদিন আসি হাজির হইল প্রাচীন গণৎকার,
এই বাড়ীটিতে প্রচুর পসার তার।
বলে দিদিমাকে, "খুড়ি ঠাকরুণ, জরটা দুষিত বটে,
করি না গোপন তোমার নিকটে;
বাড়ীর সুমুখে ওই তালগাছ বড়ই উচ্চ শির
গোপন বসত আছে হোথা শকুনির।
ভাল হবে খোকা—বেড়াইবে হাসমুখে।
গাছটী সিদ্ধ গ্রহবিপ্রকে করিতে পারিলে দান
আরও শুভ হবে—করুন না সন্ধান?"
দিদিমা বলেন, "শকুনিটা আসে, বসেও ওখানে জানি,
গৃহস্থের তো উহারাই করে হানি।
ভাল আচার্য্য অন্য আবার কোথায় মিলিবে কহ?
গাছটী শীঘ্র তুমিই কাটিয়া লহ।"
গণক বলিল, "আপনার কথা এড়াই সাধ্য নাই,
'আলাই বালাই' খুঁটে বেঁধে নিয়ে যাই।"

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

—'লক্ষ্মী ঘি'

নিবেদন

ভাদ্র সংখ্যা রামধনু ছাপা হইয়া গত ১৫ই আগষ্ট (৩০শে শ্রাবণ) বাঁধাই হইতে গিয়াছিল। তার পর দিনই কলিকাতায় অভাবনীয় দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু হয়, বহু দোকানপাট ও গৃহ ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হয়—হাজার হাজার নরনারী নিহত ও আহত হয়। সে ভয়াবহ ঘটনার বিষয় কে না জানে? সমবেদনা জানাইবার ভাষা কোথায়?

এই হাঙ্গামায় 'রামধনুর'ও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। রামধনু যেখানে বাঁধাই হইতে গিয়াছিল হাঙ্গামার সময়ে তাহাও রেহাই পায় নাই। ফলে অন্যান্য জিনিষের সহিত ভাদ্র সংখ্যা রামধনুও লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছে। ফলে এই সংখ্যা আবার আমাদের নতুন করিয়া ছাপিতে হইয়াছে। এ জন্য ভাদ্র সংখ্যা বাহির হইতে কিছু দেরী হইল। আশা করি গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ক্ষমা করিবেন।

রামধনুর জন্য আমরা প্রতি মাসে মাত্র নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাগজ পাই। সুতরাং ভাদ্র সংখ্যা প্রথমে যাহা ছাপা হইয়াছিল তাহা পুনরায় সম্পূর্ণ দেওয়া সম্ভব হইল না, পৃষ্ঠা কিছু কমাইয়া দিতে হইল। আমরা ভারত সরকারের নিকট পুনরায় কাঁগজের অনুমতি চাহিয়া আবেদন করিয়াছি; যদি পাওয়া যায় তবে আগামী সংখ্যায় উহা পূরণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিব।

Correction

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

কয়েকখানি বাছা বাছা বই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

পদ্মরাগ ... ১৷৷০
সোনার হরিণ ... ১৷৷০
চায়ের ধোঁয়া ... ৸০
ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি
(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞান-বুড়ো ... ১৲
আকাশের গল্প ... ১৷০
জন্মদিনের উপহার ... ৸৵০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং ... ৸০

শ্রীলীলা মজুমদারের

বঙ্গিনাথের বড়ি ... ৸০

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ

চার্লস্ ডিকেন্সের

অলিভার টুইষ্ট ... ৷৷৵০
(মর্ম্মানুবাদ করেছেন—শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়)

শীগ্‌গিরই বেরোবে

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা

—'লক্ষ্মী ঘি'

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৯শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৫৩ | ৫ম সংখ্যা

কুদৃষ্টি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

রয় বছরের শিশু আমি যবে, প্রায় মাসাবধি ধরি'
ম্যালেরিয়া জ্বরে থাকি বিছানায় পড়ি।
কত ঔষধ, কত চিকিৎসা চলিয়াছে একাজাই—
দিদিমার মোর ভাবনার ওর নাই।
দেবতা-দুয়ারে মানত করেন, এনে দেন স্নান-জল,
সকলি কিন্তু হইতেছে নিষ্ফল।
একদিন আসি হাজির হইল প্রাচীন গণৎকার,
এই বাড়ীটিতে প্রচুর পসার তার।
বলে দিদিমাকে, "খুড়ি ঠাক্কুণ, জ্বরটা দুষিত বটে,
করি না গোপন তোমার সন্নিকটে;
বাড়ীর সুমুখে ওই তালগাছ বড়ই উচ্চ শির
গোপন বসত আছে হোথা শকুনির।
একটা শকুনি মাঝে মাঝে এসে কুদৃষ্টি দেয় ঠিক,
এই পানে রয় তাকায়ে নির্নিমিখ।
গাছটী কাটিলে ঘুচে যাবে বসা, আপদ যাইবে চুকে,
ভাল হবে খোকা—বেড়াইবে হাসিমুখে।
গাছটী সিদ্ধ গ্রহবিপ্রকে করিতে পারিলে দান
আরও শুভ হবে—করুন না সন্ধান?"
দিদিমা বলেন, "শকুনিটা আসে, বসেও ওখানে জানি,
গৃহস্থের তো উহারাই করে হানি।
ভাল আচার্য্য অন্য আবার কোথায় মিলিবে কহ?
গাছটী শীঘ্র তুমিই কাটিয়া লহ।"
গণক বলিল, "আপনার কথা এড়াই সাধ্য নাই,
'আলাই বালাই' খুঁটে বেঁধে নিয়ে যাই।"

বিশ টাকা দিয়া তেমন বৃক্ষ মিলানই দুষ্কর,
হৃষ্ট গণক নিয়ে গেল সত্বর।
জ্বর ছেড়ে গেল, সাধ্য সেলাম—নাহিক উপদ্রব,
কয়টা দিনেই ভাল হয়ে গেল সব।
গণককে দেখি লোকে হেসে বলে, "বাপু, তুমি সব পারো,
গাছটী তো ভাল—শকুনিটী ভাল আরও।

কেবল তোমার নূতন ঘরের তালকাঁড়ি গড়ে দিতে
ফল-ভরা তরু পড়িল কুদৃষ্টিতে।
তোমারি ঘরের ভাবনা ভাবিত গাছে বসে মনে হা
শকুনিটী তব সুহৃদ সুনিশ্চয়।"
চতুর গণক শুনেও শুনে না—লোকে দেখে ফেলে পা
লুকাইতে হাসি নস্য লইয়া হাঁচে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

১৩

পরদিনও বাসবের কাটলো তেম্নি অবস্থায়। তাদের বাড়িখানি নিরানন্দ ও একটা অশুভ আশঙ্কায় ভরে রইলো।

বয়সের অনুপাতে মাধুরীর বুদ্ধি একটু বেশী। বললে, "মা, আজ নবমী। সবাইয়েরই দাদারা, ভাইয়েরা কেমন হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, আর আমার দাদা জ্বরে বেঁহুস!"

ঠিক এই কথাটি মায়ের মনেও উঠছিল। তিনি শুধু ম্লান হাসি হাসলেন। কিন্তু সকল পরিবারের সারা দেশের ছবি তো তাঁদের চোখে পড়ছিল না! পড়লে দেখতে পেতেন, এর চেয়েও দুঃখে, দুরবস্থায় কাটাচ্ছে এই দিনটি কত পরিবার। তাদের কানেও পৌঁছচ্ছে উৎসবের বাঁশি কিন্তু মন বেদনায় নুয়ে রয়েছে, তাতে সাড়া দিতেও বেদনা বোধ হচ্ছে।

মা তবুও বাসবের ছোট দুটি ভাই ও মাধুকে বললেন, "তোরা যা, ঠাকুর দেখে আয়। বচ্ছরকার দিন। আবার বছর পরে আসবে এই দিনটি। যা কপাল! সেই দিনটা যদি—"

মাধু বললে, "ওরা দুজনেই যাক্।"

সুবোধ বললে, "আমি ঢের ঠাকুর দেখেছি। কি দেখে?"

তার এ কথাটি বলবার একটু কারণও ছি ঠাকুরের ওপর তার মনে একটু রাগ জমে উঠেছি তার ধারণা হয়েছিল, ঠাকুর ইচ্ছা করেই তার দাদা শয্যাশায়ী করে রেখেছে। কিন্তু কেন যে ঠাকুরের সে দুষ্ট ইচ্ছা জাগতে পারে সে চিন্তার উদয় তার হয়ই নি।

মা তবুও বললেন, "যাও তোমরা। দেখে এস—

মাধু বললে, "দাদা যদি ভাল থাকে সন্ধ্যায় যাবে

সুবোধ কিছুই বললে না। তাদের বাড়ির পি ডোবার ধারে বাঁশ ঝাড়ের এক পাশে তেঁতুল গা ডালে তখন যে হল্‌দে পাখিটা এসে বসেছিল সে একমনে দেখছিল। দাদা বলেছিল, একটা হল্‌দে একদিন ধরবে। সে জন্য তারা দু'ভাই একটা খাঁচাও তৈরি করেছিল; পাখিটাকে দেখে তার সে মনে পড়লো। দাদা ভাল থাকলে সে পাখিটাকে নিশ্চয়ই ধরতো। পাখিটা বোধ হয় সেই ভয়েই

গেল। সুবোধ তবুও বারান্দায় বাঁশের খুঁটিতে দিয়ে বাঁশ ঝাড়টার দিকে তাকিয়ে রইলো। তার ভাইটি ছিল পাশের বাড়িতে তার সঙ্গীদের সঙ্গে মত্ত।

বললেন, "সুধো, তবে একবার ডাক্তারের কাছে বলে এস, জ্বর তেম্নি আছে, হুঁস হয় নি।"

বোধ উঠে চলে গেল। মা আর একবার ছেলের হাত দিয়ে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এলেন। তেম্নি বসে রইলো। তার দু'জন সঙ্গিনী এল তাকে ত। সে তাদের ফিরিয়ে দিলে।

লা চললো বেড়ে।

বোধ ফিরে এসে বললে, "ডাক্তারবাবু চরে রোগী গেছেন।"

থেকে রোগী দেখে তাঁর বাড়ি ফিরতে বেলা প্রায় বাজে। বাড়ি এসে স্নানাহার ও বিশ্রামে বেলা ড়িয়ে। তারপর যান ডাক্তারখানায়। রোগীরা সইখানে।

াজেই সকলে হতাশ হয়ে পড়লেন। তাঁদের সব রসা যেন নদীপারে চরের গ্রামে গ্রামে উড়ে গিয়ে ।

সাধ্যমতো ঠাকুর-দেবতার কাছে মানৎ করে আর ব্যয়ে জড়িয়ে পড়লেন। বোনটি দুর্গা ঠাকরুণকে ত লাগ্‌লো মনে মনে।

কিন্তু যার জন্য এত অস্থিরতা ও ভাবনা, সে রয়েছে অসাড়। অসাড় থাকলেও তার দেহের মধ্যে ঘোর সংগ্রাম—জীবন ও মৃত্যুর। এই সংগ্রামে জয়ী হয় জীবন, কখন জয় হয় মৃত্যুর। সে আত্মীয়-দের কাঁদিয়ে প্রিয়জনকে নিয়ে চলে যায়। ঔষধ কে পরাস্ত করে মৃত্যুকেও সেই সঙ্গে পরাভূত করে সতীশ ডাক্তারের ঔষধের সে গুণ ছিল কি না না, তবে রোগী ধীরে ধীরে এক সময় চোখ মেলে একটু তাকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করলে। তারপর চোখ মেলে তাকিয়ে একটু পাশে মাথা ফেরাতেই ব্যস্ত হয়ে ডাকলে, "মা, ও মা, শীগ্‌গির এস।"

ছিলেন উঠোনে। ডাক শুনেই তাঁর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠ্‌লো। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে উঠে এলেন।

বাসব আস্তে আস্তে বললে, "মাধু, তুই এখানে বসে কেন?"

সে উত্তর দেবার আগেই মা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি? কি হয়েছে?" এবং বাসবের দিকে তাকিয়েই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তার মাথায় শীতল হাত-খানি দিয়ে বললেন, "ঘামে কপাল, মাথা ভিজে গেছে। কপালটা এখন অনেক ঠাণ্ডা। কেমন আছিস বাসু?" বলে তার চুলগুলোর মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করলেন।

বাসব বললে, "আমার কি হয়েছিল?"

—"জ্বর। গায়ে হাত রাখা যাচ্ছিল না। কাল থেকে তুই বেহুঁস হয়ে ছিলি। সতীশ ডাক্তারের ওষুধে তবে তোর জ্ঞান হ'ল—"

আর পাঁচটি শিক্ষিত ভদ্রলোকের মতো বাসবেরও সতীশ ডাক্তারের ডাক্তারি ও ঔষধের ওপর শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু আজকে তার ওপরই তিনি ডাক্তারি করে প্রমাণ দিলেন, কেবল চরের চাষারাই তাঁর ওষুধে সারে না, শহরে তাদের মতো ছেলেদেরও হুঁস হয়। এমন প্রমাণের বিরুদ্ধে যাবার যুক্তি সেঁ জ্বরক্লিষ্ট মস্তিষ্কে খুঁজে পেল না। কেবল চুপ ক'রে রইলো।

মা বললেন, "তুই এবার কিছু খা। মিছরি, দুধ, সাবু—"

বাসব নাক সিঁটকে মাথা নাড়লে।

মা তবুও ছাড়লেন না, চলে গেলেন মিছরি আনতে। খাদ্যসামগ্রী কয়টিকে তিনি সকাল থেকে একে একে সংগ্রহ করেছিলেন।

বাসব বললে, "মাধু, তুই এখানে বসে আছিস কেন?"

মাধু বললে, "তোমার এত জ্বর। তোমাকে একলা ফেলে রাখা কি ঠিক?"

তার কণ্ঠস্বরে ও কথায় বাসবের কৌতুক বোধ হ'ল। সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, মাধুর, ছোট্ট মাধুরীর, কচি মুখখানিতে বয়স্কের গাম্ভীর্য্য ফুটে উঠেছে। এই কর্ত্তব্য-বোধ দরিদ্রের ছেলেমেয়েদের যত শীঘ্র জাগে, তাদের বুদ্ধি যত তাড়াতাড়ি পরিণত হয়ে ওঠে সচ্ছল পরিবারে তত তাড়াতাড়ি হয় না। কারণ দরিদ্রের জীবন-সংগ্রাম

TIGHT BINDING

কঠোর ও শুরু হয় জীবনের প্রারম্ভ থেকেই। তবে এ কথা বলা যায় না যে, তারা সকলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সমবেদনাশীল হয়ে ওঠে। কিন্তু কর্ত্তব্য ও করুণার ক্ষেত্র তারা চেনে। এই দুই ক্ষেত্রে তাদের অবহেলারও বহু কারণ আছে। প্রথম কারণ শিক্ষার ও শিক্ষকের অভাব। আবার শিক্ষার ও শিক্ষকের অভাবের মূলেও আছে কারণ।

বাসবের জ্বর তখন সম্পূর্ণ মুক্ত না হলেও তার মনের জড়তা দূর হয়ে চিন্তাশক্তি ফিরে এল। মনে আনন্দেরও সুর বাজতে লাগলো। তার সঙ্গে পরিবারের সকলেরই মুখ হয়ে উঠল উজ্জ্বল।

বাসব বললে, "মাধু, তুই যা, খেলা কর গে। মা আছে।"

মাধুরী তবুও উঠলো না, পাশে মাচা থেকে তার জামাটি পেড়ে নিয়ে সেলাই করতে লাগলো। বাসব এক দৃষ্টিতে তার সেলাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। ছোট ছোট আঙুলগুলি কেমন নড়ছে। মা এক ডেলা মিছরি ও এক গেলাস জল হাতে ক'রে ঘরে ঢুকলেন এবং ছেলেকে খাওয়াতে লাগলেন।

বাসব অনিচ্ছায় সেটুকু খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে চুপ করে পড়ে রইলো। মা গেলেন বাকী কাজগুলো সারতে।

নিঝুম দুপুর। কোথায় যেন একটি ঘুঘু ডাকছিল। দূর থেকে ভেসে আসছিল ছেলেদের কল-কোলাহল। বাসব চুপ করে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লো।

তার ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেলা পড়ে এসেছে, শরীর অনেকটা সুস্থ। মনে হচ্ছে, গায়ে যেন কিছু জোর ফিরে এসেছে, উঠে বসতে—এমন কি হাঁটতেও পারে। সে দেখলে, ঘরে কেউ নেই, কোণে কোণে অন্ধকার জমে উঠেছে, আলো সরে যাচ্ছে। তার মাথার কাছে জানলাটি ছিল আধখোলা। তার ভেতর দিয়ে একটু বাতাস আসছিল। সে উঠে জানলাটি খুলে দিয়েই চমকে উঠলো।

জানলায় ফুটে উঠেছে একখানি মুখ, যেন ফ্রেমে আঁটা ছবি।

বাসব উল্লাসে ডাকলে, "অমৃত! তুই? কোথা থেকে?"

অমৃত হেসে বললো, "বাড়ি থেকে একটু কয়েকটা জিনিষ কিনতে এসেছি। শুনলাম তোর তাই—"

—"ভেতরে আয়।"

—"যাচ্ছি। কেমন আছিস?" এবং উত্তরের না করেই সেখান থেকে সরে গেল।

এই জানলাটিতে দাঁড়িয়ে অমৃত কত দিন বা ডেকেছে। সে ইচ্ছা করলে, বাড়ির ভেতরেও আ একটুও বাধা নেই। বাসবের মায়ের সঙ্গে সে "মা সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়ে এবং নিজের স্বভাব গুণে তাঁর প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া, ছেলেটি পাড়াগাঁয়ে পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা লোককে খুব শীঘ্রই আপনার নিতে পারে।

অমৃত ভেতরে এল। বারান্দায় মাদুরে বসে বাস মা আলোর চিমনি পরিষ্কার করছিলেন। অমৃ দেখেই বলে উঠলেন, "কি অমৃত, তুমি না গিয়েছিলে?"

—"হাঁ মাসীমা। আজ এসেছি বাঁরোয়ারির কা দরকারী জিনিষ কিনতে।"

—"কার সঙ্গে এসেছো?"

—"একা। জিনিষ ক'টা কিনে বাসবের সঙ্গে করতে আসছিলাম, পথে সুবোধের সঙ্গে দেখা। বললে 'দাদার জ্বর'।"

—"তুমি আজই ফিরবে?"

—"হাঁ। পৌঁছতে একটু রাত হয়ে যাবে।"

—"একাই যাবে?"

—"না, গ্রামের আরও দু'জন আছে। তিন জ সাইকেল আছে। চাঁদনী রাত। রাস্তাও হয়ে এসেছে। চলে যাবো—" বলে সে বা উঠ্‌তে উঠ্‌তে জিজ্ঞেস করলে, "মাধু, মোহন—এরা কোথায়? ঠাকুর দেখতে?"

—"হাঁ।"

অমৃত ঘরে গিয়ে বাসবের মাথার কাছে বসে কপালে হাত রাখলে।

বাসবের মনে পড়ছিল অমৃতের সঙ্গে সেদিনকার

ও তার ব্যথাক্লিষ্ট মুখখানি। সে তাকে দেখে যেমন লিত, তেম্নি লজ্জিতও হল।

অমৃত বললে, "তোর জ্বর এখন নেই বল্‌লেই হয়।"

বাসব উত্তর দিল না, সে কেবল তার হাতখানি ধরে ল। সে একবার তাকিয়ে দেখলে, অমৃতর গায়ে জামা, পরনে নূতন কাপড়, পায়ে নূতন জুতো।

অমৃত বললে, "পূজোটা তোর গেল এম্নি।"

—"না। জ্বর তো কাল বিকেল থেকে হয়েছে। বুদের বাড়ি থেকে নৌকোয় ফিরেছিলাম। দাঁড় ছিলাম রোদে। তারপরই চান করি—"

—"এবার আমাদের গ্রামে খুব বড় মেলা বসেছে। হচ্ছে। বিলে নৌকো এসেছে অনেক। তার মধ্যে কতক নৌকো, সেগুলো ছিপ নয়, ছিপের মতো তে, নানা রঙের নিশান দিয়ে সাজানো। নৌকো না যখন চলে দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন জলের দিয়ে মালা উড়ে যাচ্ছে। যদি যেতিস কি আনন্দ তুই তো গ্রাম্যজীবন দেখতে ভালোবাসিস্ কিন্তু বাধিয়ে বসলি!"

—"জ্বর সারলেই যাবো।"

—"পরশু দিন রাঘব ভুঁইমালি বর্শা দিয়ে একটা লো শূয়র মেরেছিল। ঐ শূয়রটা দিন কতক ধরে ভারী উৎপাত করছিল। কেউ ওটাকে শেষ করতে ছিল না। আমাদের লাহিড়ীমশায় এবার কলকাতা আসেন নি। গ্রামের কেবল ওঁর কাছেই বন্দুক ছে। চাঁদু মিঞা তো গত বছরই মরে গেছে। তার কে বন্দুকের লাইসেন্স দেয় নি সে ভারী স্বদেশী বলে। গিয়েছিল তার ক্ষেতে। হাতে ছিল বর্শা। সে ছিল টঙে। শূয়রটা যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। যেমন দেখা মার। এখনও রাস্তায় শূয়রের ভয় আছে।"

—"তবে তোরা রাত্তিরে যাবি কি করে?"

—"এখন পূজোর সময় পথে একটু রাত অবধি লোক চল করে, গরুর গাড়িও যায়। আর, আমরা তো সাইকেলে। তুই ভাল থাকলে আজকে খুব মজা যেত।"

বাসব নিশ্বাস ফেললে; তারপর বললে, "ভাল আমি যাবও শীগ্‌গির। তখন দেখিস—"

—"আচ্ছা, আজ চললাম।"

—"তোর সাইকেল কোথায়?"

—"বাড়িতে। আমার সঙ্গীরা হয়তো এতক্ষণে এসে গেছে। না এসে থাকলে আমাকেই যেতে হবে তাদের কাছে।"

—"মানিকদার খবর শুনেছিস? তাকে পুলিশে গ্রেফতার করেছে।"

—"কেন?"

—"জানি না।"

—অমৃত কথাটা মনে তুলে নিয়ে ক্লিষ্ট মুখে বেরিয়ে গেল।

বাসব শুয়ে শুয়ে খোলা জানলাটা দিয়ে শরতের কোমল নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। আকাশের গা থেকে একটু একটু করে আলো মিলিয়ে আসছে। একটি পাখি উড়ে গেল। তখন মনে হল, আকাশখানা কি নির্জ্জন! ওই একখানা সাদা মেঘ উঁকি দিচ্ছে।

দিনের আলো মিলাতে না মিলাতে ছড়িয়ে পড়লো নবমীর চাঁদের আলো; ফুটলো তারা। মা ঘরে আলো দিয়ে গেলেন। বাসবের কপালে হাত দিয়ে দেখলেন, গা আরও ঠাণ্ডা। তিনি বেরিয়ে গেলেন সংসারের কাজে।

কথা ছিল সুবোধ সন্ধ্যায় ডাক্তারখানায় গিয়ে ডাক্তার বাবুকে রোগীর সংবাদ দিয়ে আসবে। বাসব শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো অমৃতের কথা। তার দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে সে চলেছে তারও পরিচিত পথটি দিয়ে। সুবোধ যখন ফিরে এল তখন সে ঘুমোচ্ছে। দশমীও কেটে গেল রোগ-শয্যায়। নদীর ধারে বাড়ি। দশমীর দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে বিসর্জ্জনের বাজনা শুনলে। সানাই যেন কেঁদে কেঁদে সন্ধ্যার আকাশে বিদায়বাণী ছড়িয়ে দিতে লাগলো। এবারের মতো উৎসব হল শেষ! আবার বর্ষান্তে শরতের সাদা কাশের মেলায়, পদ্মের বনে বনে, আকাশের নীল পাথারে রাজহাঁসের মতো সাদা মেঘের দলে বাজবে বাংলার, বাঙালির সেরা উৎসবের আগমনীর সুর। কোমল কচি ঘাসের মাথায় হীরের গুঁড়ো যাবে ছড়িয়ে, অমল জলের কোমল বুকে গলা সোনার মতো আলো পড়বে ঝরে, কেয়াবনের গন্ধ উড়বে বাতাসে।

বাসব দীর্ঘ নিশ্বাসে উৎসবের শেষ দিনটিকে দিনান্তে বিদায় দিলে। সে খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইলো। তার মাথায় ঘুরতে লাগলো এলোমেলো ভাবনা—অতীতের, বর্ত্তমানের। সেই সঙ্গে সে ভবিষ্যতের দিনগুলিরও একটু একটু কল্পনা করতে লাগলো। সে সব কল্পনা ঘুরপাক দিতে লাগলো বিশেষ করে খাবার জিনিষকেই কেন্দ্র করে। কিন্তু যেদিন পথ্য পেল সেদিন খাবার তার মুখে রুচলো না, সবই বিস্বাদ বোধ হল। মনে হতে লাগলো, তার মা রান্না ভুলে গেছেন।

১৪

বাসব একদিন বললে, "মা, কাল আমি যাবো অমৃতদের গাঁয়ে।"

মা বললেন, "সে কি? এই সেদিন অমন অসুখ থেকে উঠলি! সেখানে গিয়ে যদি আবার কিছু হয়?"

—"আর কিচ্ছু হবে না। আমি সেখানে দু'দিনের বেশি থাকবো না। তোমার কোন ভয় নেই।"

—"ভরসাই বা কি? পাড়া-গাঁ। সেখানে কত রকম কি হতে পারে।"

—"সেখানেও তো মানুষ আছে।"

—"তাদের কথা আলাদা। তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। অসুখ-বিসুখ হলে সেখানে ডাক্তার-বদ্যি নেই।"

বাসব কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

মা আবার বললেন, "গিয়ে কাজ নেই।" কিন্তু নিষেধটা জোর করে করতে পারলেন না। কারণ জানেন, নিষেধটাই সময় সময় তার মনে এমন উত্তেজনা জাগায় যে, সে কাজটা সম্পন্ন করেই। আবার সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হল, এমন অসুখের পর দু' দিন কোথাও গিয়ে যদি খুশি হয় তো যাক্। অমৃত ছেলেটি বড় ভাল। ওদের বাড়ি গেলে দুর্ভাবনারও কিছু নেই। তবে পাড়া-গাঁ! এখন জ্বর-জ্বালার সময়।

কিন্তু তাঁদের সেই শহরেও শুরু হয়েছিল জ্বর।

বাসব বললে, "আমি হেঁটে যাবো।"

—"এত পথ হেঁটে যাবি?"

—"কত লোক যাচ্ছে, আসছে। আমার ছেলেরাও যায়। কেন পারবো না?"

—"তুমি কি পথ চেনো?"

বাসব একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলে। তা বললে, "তুমি সে পথ দেখ নি তাই ভয় পাচ্ছো। এ বারে সোজা সড়ক, কাণাও যেতে পারে।"

—"ওদের গাঁয়ের নাম যেন কি?"

—"হরিশঙ্করপুর। মস্ত বিল আছে সেখানে। অমৃ বাড়ি থেকে বিলটা হবে সিকি মাইল। বিলে মাছ! আমি সেবার ছিপে একটা মাছ গেঁথেছিল মস্ত মাছ কিনা তাই সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে গে এবারও মাছ ধরবো। বড় মাছ হলে এখানে নি আসবো—"

সুবোধ এসে দাঁড়িয়েছিল পিছনে। সে শুনে শেষের কথাগুলি। বললে, "দাদা, আমিও যাবো ধরতে।"

বাসব হেসে উঠলো। মা বললেন, "ও কি মাছ ধ যাচ্ছে? ও যাবে অমৃতদের দেশে। সেখানে গিয়ে করবে তাই বলছে।"

সুবোধ বললে, "আমাকেও নিয়ে চল।"

বাসব বললে, "আচ্ছা, গরমের ছুটির সময় আ যখন যাব তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

কিন্তু ভবিষ্যতের আনন্দের প্রতি সুবোধের ছিল না, তাই সে বায়না ধরলো। বাসব নানা ক তাকে ভুলিয়ে নিরস্ত করলে। বললে, "যদি পারি জন্যে একটা হলদে পাখি ধরে আনবো।"

—"যদি না পার?"

—"একটা কিছু আনবই। হয়তো সেটা হবে পাখির চেয়ে আরও ভাল।"

সুবোধ এ কথাতেই শান্ত হল।

বাসব পরদিন ভোরে উঠলো। মা তত সকা তার জন্যে ফেনে ভাতে রান্না করে দিলেন। সে রওনা হল তখন সুবোধ ও তার ছোট ভাইটি ঘুমো মা ও মাধু দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে হাসিমুখে বিদায় দিলে

বাসবের বেশটা আজ অবশ্য সেই প্রথম দিন তাকে যে রকম দেখেছিলাম সে রকম নয়। তার

শার্ট, কাপড়খানিও নূতন, পায়ে এক জোড়া রবারের নূতন জুতো, মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে হাতে একখানি লাঠি ও একটি ছোট পোঁটলায় নি কাপড় ও একটি শার্ট। দুটিই বাড়িতে কাচা নো।

খনও রোদ ওঠে নি, গাছের পাতায় পাতায় শিশির না রয়েছে। পথে পথিক চলছে দুটি একটি, নি গরুর গাড়ি আসছে মন্থর গতিতে, যেন বাহন ও র ঘুম তখনও যায় নি।

সব শহর ছাড়িয়ে গিয়ে পড়লো বাইরে গ্রামের পথের দু'পাশেই ধান-ক্ষেত। মঞ্জরীগুলি ফল শরের ভারে নুয়ে পড়েছে। ক্ষেতের মাঝে মাঝে জমে আছে। পাশের গ্রাম থেকে চাষীরা দু'এক সে ক্ষেতের এখানে-সেখানে কি যেন করছে। য় জল চলাচলের পথ কেটে দিচ্ছে। একটা য়েছে পদ্মবন; আর এক জায়গায় শালুকের একটি স্ত্রীলোক জলার তীরে দাঁড়িয়ে আঁকষি ালুকের ডাঁটা ও ফুল তুলছে, বোধ হয় রান্না াবে। তার পাশে একটি ছোট্ট, রোগা, কালো, মেয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বোধ হয় ক্ষুধায়। কটির সেদিকে খেয়ালই নেই।

সব দু'পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছে। সামনে একটা প্রকাণ্ড গাছের সৌন্দর্য্য দেখে সে মুগ্ধ হয়ে তার ডালে ডালে সাদা ও বড় বড় ফুল ফুটে । দু-একটা ফুল পাড়বারও তার লোভ হল। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গিয়ে নিজের মনে উঠলো। সেগুলো ফুল নয়, সাদা বক। ইংরেজীতে বলে 'হেরন'—ওরা সেই জাতের।

তক্ষণে সবুজে, হলুদে, সদায়, নীলে আঁকা ছবিগুলি ঝলমল করছে। পাখি ডাকছে, ঝির ঝির শব্দে জল বয়ে চলেছে। কিন্তু পথ প্রায় পথিকহীন। হন ফিরে দেখলে কেউ আসছে না, সামনেও কেউ তবে হঠাৎ একবার টিং টিং আওয়াজ হল। সে বুঝলে সাইকেল আসছে এবং গাড়িখানির পড়েছে অন্ততঃ একটি লোক। একটু পরেই পথের থেকে তার সামনে দিয়ে সাইকেল-আরোহী বেরিয়ে এলেন। আরোহী গ্রাম্য ভদ্রলোক বোধ হয় চলেছেন শহরে কোন কাজে। তিনি বাসবের দিকে সকৌতূহলে তাকাতে তাকাতে চলে গেলেন।

বাসবও মোড় ঘুরে দেখলে, একটি গ্রামের লোক দুটি রোগা পাঁঠা নিয়ে আসছে, বোধ হয় শহরের হাটে বেচতে। লোকটির এক হাতে পাতাশুদ্ধ একটি কাঁঠালের ডাল, আর হাতে একগাছি সরু ও ছোট খেজুর ছড়ি। যে হাতে কাঁঠালের ডাল সেই হাতেই সে পাঁঠা দুটির দড়ি ধরে আছে। সামনে কালীপূজো। পাঁঠা দু'টি পাতার লোভে লোভে খুট্ খুট্ করে ছুটতে ছুটতে আসছে। তারা বুঝতেই পারছে না, তারা হাড়কাঠের দরজা পেরলেই তাদের জন্যে রয়েছে স্বর্গ। সেখানে হাটও নেই, বলিও নেই, বেচাও নেই, কেনাও নেই। কেবল খাওয়া—যা ইচ্ছা, যত ইচ্ছা। তারপর পারিজাত বা মন্দারগাছের ছায়ায় শুয়ে চোখ দুটি বন্ধ করে কেবল জাবর কাটা।

বাসবের কেমন হাসি পেল। সেবার অমৃতদের গ্রামে লাহিড়ীদের বাড়ির পুজোয় সে দেখেছিল পাঁঠা ও মহিষ বলি। হাঁ, বলি বটে! তাজা, গরম রক্তে বলির জায়গাটায় কাদা হয়ে গিয়েছিল। আর সেই কাদায় সকলে হুত্য করেছিল, গড়াগড়ি দিয়েছিল। দলে পড়ে সেও বাদ যায় নি।

বেলা যত বাড়তে লাগলো লোকের ও গরুর গাড়ির আনাগোনা হতে লাগলো ততই বেশি। কিন্তু তা শহরের মতো নয়। সেদিন শহরে হাট বলে অন্য দিনের চেয়ে পণ্য নিয়ে লোকজন ও গরুর গাড়ির আনাগোনা দেখা যেতে লাগলো বেশি করে। এই সব পণ্য যাবে শহরে। এগুলির বিনিময়ে গ্রামে যাবে পয়সা বা শহরে তৈরী জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। গ্রাম না থাকলে শহর চলে না, শহর না থাকলে গ্রাম্যজীবনেও উন্নতি ঘটে না, কতকগুলি অভাব থেকেই যায়। শহর কৃষ্টির কেন্দ্র, গ্রাম হল অন্নের ভাণ্ডার। কিন্তু এই ভাণ্ডারের কি দুর্দ্দশা!

ঠিক দু' ক্রোশের মাথায় ছিল একখানি ছোট গ্রাম। নাম মোহনপুর। মোহনপুরের পাশে একটি প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় ছিল একখানি ছোট্ট ময়রার দোকান। তাতে জিলিপি, চিনির জোড়া মণ্ডা, মেঠাই, কখন সখন

রসগোল্লা বা চম্‌চম্ তৈরি হত। আর পাওয়া যেত ছোট-বড় বাতাসা, খাগড়াই, মুড়ি, দিয়াশলাই, বিড়ি, তামাক ও পান। মিষ্টগুলিতে সর্ব্বদাই বসে থাকতো বোলতা, দু'টি-চারটি মৌমাছি ও গুবরে মাছি। তারা সকলেই মিষ্টের রসে ফুলে এমন অলস হয়ে পড়েছিল যে কামড়ান তো দূরের কথা একটি থেকে আর একটিতে উড়ে গিয়ে বসতেও তাদের কষ্ট হত যেমন হয় জমিদার ও মহাজনদের। দোকানে খাবার তৈরি হত, সপ্তাহে মোটের ওপর একদিন। বিক্রিও হত বেশি শহরের হাটবারে। তবে তামাকের খদ্দেরটা ছিল রোজই ভোর থেকে রাত দশটা অবধি। শীতকালের কথা অবশ্য আলাদা। দোকানখানি টিনের। সামনে খান দুই খেজুর গুঁড়ির বেঞ্চি পাতা ছিল। ঘরের কোণে মালসায় থাকতো আগুন। গাড়োয়ানরা অনেকেই সেই আগুনে নারকেলের ছোবড়ার নুড়ি বা টিকেখানা ধরিয়ে নিয়ে কলকের মাথায় চড়িয়ে ফুঁ দিতে দিতে চলে যেত।

রোদে চলতে চলতে বাসবের তৃষ্ণা বোধ হ'ল সে সেবার অমৃতদের সঙ্গে যাওয়া-আসবার সময় দোকানখানা দেখেছিল। গ্রামের নাম ভুলে গেলেও দোকানখানার ছবি সে ভুলতে পারে নি। যাবার পথে দেখেছিল দোকানের বেঞ্চির ওপর বসে এক বুড়ো বাউল একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। ময়রা তখন বাতাসা কাটছিল। বাউলের দু'পাশে ও সামনে ছিল জনকয়েক গ্রাম্য শ্রোতা। গানখানি বৃদ্ধের গলার গুণে জমে উঠেছিল বেশ।

দোকানখানা ছিল সামনেই, সেখান থেকে খানিক দূরে। বাসব দেখলে একটি লোক বেঞ্চিতে বসে তামাক খাচ্ছে আর দোকানের দিকে তাকিয়ে কাকে কি যেন বলছে। বোধ হয় ময়রাকে উদ্দেশ করে।

বাসব গিয়ে দোকানের সামনে দাঁড়াতেই ময়রা ও হুঁকো হাতে লোকটি তার দিকে সকৌতূহলে তাকালো। লোকটির চোখ দুটি কিছুতেই বাসবের মুখ থেকে অন্য দিকে ঘুরতেই চাইলে না।

বাসব ময়রার দিকে তাকিয়ে বললে, "এক গেলাস জল দেবে?"

ময়রার পো উঠে একটি পেতলের পাতলা গেলাসে মেটে কলসী থেকে জল গড়িয়ে তাকে জল দিলে। গেলাসটা তেল হড়হড়ে, বোটকা গন্ধভরা। জলটু... ঘোলা, ওপরে তেল ভাসছে। তারপর সে লো... বললে, "সতীশ ডাক্তারও কিছু করতে পারলে না?"

—"ডাক্তার ডাকবার সময় পেল কই? রা... হল, ছেলেটা সকালে মরে গেল। ছেলেটা ছি... ভাল। শহরের ইস্কুলে পড়তো। বিহারীদা' তো এ... ভেঙে পড়েছে!"

বাসবের কান দুটো খুব সজাগ হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি জলটুকু খেয়ে গেলাসটা মুখ থেকে ... দোকানের মেঝেতে রাখতে রাখতে আবার শুনতে... "কে জানতো এমন হবে? বুড়ো বয়সে—"

ময়রা বললে, "এই তো নবমীর দিন সাইকেলে ... যাচ্ছিল। যাবার পথে এখানে নামলো। বসে ... খেলে। ছেলেটার কথাবার্ত্তা ছিল ভাল।"

এবার বাসবের বুকের ভেতরটা কেমন করে উ... হাত-পা অবশ হয়ে গেল। সে আর দাঁড়াতে পা... না, পাশের বেঞ্চিতে বসে পড়লো।

সেই লোকটি তার দিকে তেমি তাকিয়ে ... করলে, "তোমার বাড়ি কোথায় গো?

—"শহরে।"

—"এদিকে কোথায় এসেছ?"

বাসবের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "বেড়াতে।"

—"বেড়াতে? তোমায় আমি যেন কোথায় দে... তুমি অমৃতের বন্ধু না?"

—"হ্যাঁ।"

—"তাই চেনা ঠেকছে। শুনেছ, তোমার বন্ধু... একদিনের জ্বরে মারা গেছে।"

বাসব শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের ... তাকিয়ে রইলো। ময়রা ও সে পরস্পরকে আরও ... কথা বললে, তা তার কানে গেল না। সে উঠে ... ফিরে চললো।

এবং খানিক দূর চলে পথের ধারে মাইল পো... ওপর পরম ক্লান্তিতে বসে গালে হাত দিয়ে রইলো। মনে উঠতে লাগলো নানা কথা। প্রখর রোদে ... মাথা ও পিঠ পুড়ে যাচ্ছে সেদিকে খেয়ালই রইলো... চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়লো পথের ধারে ঘাসের ...।

তারপর এক সময় উঠে সে ফিরে চলতে লাগলো ...র দিকে। কিন্তু পথটাকে তার বোধ হতে লাগলো দীর্ঘ, কষ্টকর ও নিঃসঙ্গ। বাড়িও যেন বহুদূরে। সেখানে পৌছতে আরও কত কি ঘটবে কে বলে দেবে!

— প্রথম খণ্ড সমাপ্ত —

মুর্শীদাবাদে একদিন

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

...বরযাত্রী আমি খুব কমই গিয়েছি। কিন্তু পাড়ার ...া মুকুন্দের বিয়েতে সবাই ধরলেন, আমাকে বরযাত্রী ...ই হবে। আমি জানালাম, সময়াভাব—বিশেষ, ...ত্রা যাওয়াতে আমার খুব উৎসাহও নেই।

কিন্তু অমল, কুমারেশ, শিবু ওরা জানাল, বরযাত্রীটা ...ক্ষ্য মাত্র—মুর্শীদাবাদ দেখাই তাদের আসল ইচ্ছা। ...ং এক ঢিলে ওরা দুই পাখীর যায়গায় তিন পাখী ...তে চায়। বরযাত্রী যাওয়া হ'ল এবং খাওয়া-দাওয়া-...র ভাবনা বরের শ্বশুরের ঘাড়ে চাপিয়ে—ফাঁকতালে ...বাদটাও দেখে আসা গেল।

কিন্তু আমাকে ছেড়ে ওরা কিছুতেই যেতে রাজী নয়। ...ক্রে ভগাবান্‌ও ভূত হন, আমাকেও পাড়ার পাঁচজনের ...য় প'ড়ে বরযাত্রা হ'তে হ'ল।

...দেখা গেল, বরযাত্রীকে আদর-আপ্যায়ন বরের সাত ...ঘোরা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত! তারপর আমরা ...প্রাণী—সার্ টমাস রো যে ভাবে জাহাঙ্গীরের রাজসভা ...নৈশ উৎসবের পর অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে ...র আসতেন, ঠিক সেইভাবে খুঁজতে খুঁজতে আমাদের ...কাটাবার জন্য নির্দিষ্ট যায়গায়—অর্থাৎ অদূরবর্তী ...ড়ীটায় বর এসে প্রথমে উঠেছিলেন সেইখানে, এসে ...স্থিত হলাম এখানে তখন না আছে আলো, না ... বরাসনের সে বালিশ নেই, এমন কি, সতরঞ্চির ...কার চাদরটি পর্যন্ত তুলে নেওয়া হয়েছে! এদিকে ...গুঞ্জন শব্দে মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে দশখানা ...প্লেন চল্‌ছে একসঙ্গে। বরের ভগ্নিপতি এবং ... ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি আপনার লোক যাঁরা—তাঁরা ...য় ডুব মারলেন তাঁরাই জানেন!

উৎসাহী বরযাত্রীরা প্রথম দিকটায় সতরঞ্চির অপরাধ তুলে গায়ে জড়িয়ে নিলেন—ঠিক জাপানীদের ছেলে-মেয়েরা যে ভাবে থলের মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়ে। ঐ ভাবে তাঁরা ঢুকে পড়লেন সতরঞ্চির ভিতর! সাধে কি আর বলেছে, বাড়ীর ওঁচা যারা তারাই বরযাত্রী যায়!

কিন্তু জ্যৈষ্ঠের অসহ্য গরমের মধ্যে সতরঞ্চ মুড়ি দিয়ে প'ড়ে থাকা—সাধু-সন্ন্যাসীরা পারেন কিনা জানি না, আমাদের মত সাধারণ মানুষে যে পারে না এটা সত্যি।

সেই জন্য ক্রমে ক্রমে সকলকেই বাইরের রোয়াকের উপর এসে আশ্রয় নিতে হ'ল। রাত তখন দু'টো হবে। রোয়াকের উপর কেউ পায়চারি কচ্ছে, কেউ ব'সে ব'সে ঝিমুচ্ছে, আবার কেউ বা চোখ বুজে ব'সে উঃ আঃ করছে আর নিজের মুখে-পিঠে চপেটাঘাত করছে। রাত বাড়বার সঙ্গে মশার হুঙ্কারও ক্রমে বেড়ে চলেছে।

গৃহকর্তা বিবাহবাড়ী থেকে সস্ত্রীক ফিরলেন রাত তিনটের সময়। তাঁর আগমনে বরযাত্রীর দল একটু আশান্বিত হয়েছিল কিন্তু তিনি যখন ওদের দিকে ফিরেও তাকালেন না এবং সোজা উপরে গিয়ে ঘরে খিল দিলেন তখন এই আশাবাদী যুবকের দল একসঙ্গে চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দিল। কেউ ডাকছে বিড়াল, কেউ শেয়াল, আবার কেউ বা কুকুর। তাদের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত পাড়ার সমস্ত কুকুরও যোগ দিয়ে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে তুলল।

কিন্তু একের অপরাধে অন্যের শাস্তি হওয়াও উচিত নয়। আমাদের রাত্রিবাসের সুব্যবস্থা হয় নি ব'লে (বরের ভগ্নিপতি পরে নাকি বলেছিলেন, এই না হওয়াটাই স্বাভাবিক) পাড়ার লোকের শান্তিভঙ্গের অধিকার কি আমাদের আছে?

অবশেষে স্থির হ'ল—বাকী রাতটুকু গঙ্গার ফাঁকা চরায় কাটিয়ে ভোরের গাড়ীতেই আমরা মুর্শীদাবাদ রওনা দেব।

কিন্তু সেখানে অদৃষ্টের ফেরে পুলিশের হাতে আমরা বন্দী হলাম। কিছুদিন আগে নাকি সেখানে কোন্ এক বড় অফিসারের ঘোড়ার গাড়ী আক্রমণ ক'রে ডাকাতের দল প্রচুর অলঙ্কারপত্র নিয়ে গেছে।

বালক যীশুর হদিস না পেয়ে রাজা হেরোদ যেমন আদেশ দিয়েছিলেন—শিশু পেলে আর ছাড়বে না, ডাকাতের সন্ধান না পেয়ে এখানকার পুলিশ বিভাগেও বোধ হয় এমনি ধারা কোনও আদেশ দেওয়া হয়েছে—রাত্রিবেলায় নিরিবিলিতে একসঙ্গে চার-পাঁচজন যুবক দেখলে আর ছাড়বে না!

পাহারাওয়ালারা বলল, 'আপনাদের একবার ক্লাবে যেতে হবে—সেখানে দারোগাবাবুরা আছেন—'

বলাবাহুল্য আকস্মিক বিপদে দুর্ভাবনা হ'য়েছিল আমাদের প্রচুর; কিন্তু 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ'—পুলিশের হাতে প'ড়ে যে আমাদের অদৃষ্ট ফিরে যাবে, আগে তা কে জানত? রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে দেখা গেল, ক্লাবের অন্যতম দারোগা আমাদেরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু,—মিঃ ব্যানার্জি।

আমাদের সনাক্ত (আইডেন্‌টিফাই) করবার জন্য যে বরকর্তা ও কন্যাকর্তাদের ডেকে আনতে হয় নি এইটি আমাদের পরম সৌভাগ্য।

আদর-যত্ন পেলাম আমরা এখানে যথেষ্ট। এমন কি তাঁরা লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে পর্যন্ত আমাদের হাজার দুয়ারী প্রভৃতি দেখবার সুযোগ ক'রে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে দিলেন।

স্নান এবং খাওয়া-দাওয়ার পর বহরমপুর থেকে ট্রেনে মুর্শীদাবাদ। নদীয়ার যেমন কৃষ্ণনগর প্রধান সহর মুর্শীদাবাদেরও তেমনি বহরমপুর প্রধান।

মুর্শীদাবাদ নেমে আমরা হতাশ হ'লাম। এই সেই বাংলার নবাবের রাজধানী মুর্শীদাবাদ! একটা সঙ্কীর্ণ জঙ্গলা পথ দিয়ে কোনক্রমে আমরা লালবাগ থানায় পৌঁছে গেলাম। দারোগাবাবুর বাড়ী খুলনা। তিনিও আমাদের যথেষ্ট সমাদর করলেন এবং থানা একজন লোক আমাদের সঙ্গে দিলেন।

এই ভদ্রলোক কতকগুলি ভাঙ্গা জীর্ণ বাড়ীর পা অবশেষে গঙ্গার ধারে নবাব প্যালেসে নিয়ে আমাদের। গঙ্গা এখানে বেশ গভীর এবং প্রশস্ত। বাঁধাঘাট ও বর্ত্তমান নবাবের প্যালেস আমরা ইমামবাড়ীর সম্মুখে প্রসিদ্ধ 'হাজার দুয়ারী' লিকায় উপস্থিত হ'লাম। এখানকার সুপারিন্‌টেন্‌ কাছ থেকে অনুমতি-পত্র নিয়ে আমরা 'গাইডের প্রথমে নীচেকার অস্ত্রাগার দেখতে গেলাম। দুটো ঘরের মধ্যে বহু অস্ত্রশস্ত্র এখানে জড় করা আছে।

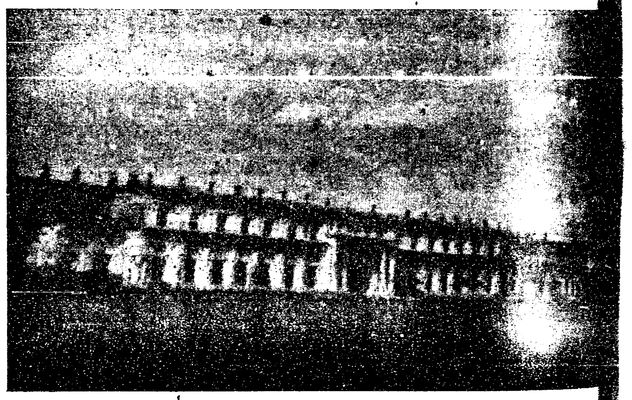

মুর্শীদাবাদের নবাববাড়ী

শড়কী, বর্শা, বন্দুক, কামান এবং অসংখ্য অ সেখানকার রক্ষক আমাদের দেখিয়ে দিল—এই দিয়ে সিরাজকে হত্যা করা হয়, এই কামান মো ব্যবহার করেছিলো, এই তরবারি সিরাজের, ই সেখান থেকে আমরা দোতালায় দরবার ঘর, বৈঠ ঘর এবং তে-তালায় লাইব্রেরী-ঘর, শয়নকক্ষ ও দেখলাম। প্রত্যেক ঘরে এবং সিঁড়ির দু'পাশে বিদেশী, ছোট-বড় এবং অতিবৃহৎ বহু তৈলচিত্র বিদেশী যুদ্ধের ও নবাব নাজিমদের সুন্দর, সুন্দ

নে বর্তমান। মুর্শীদাবাদের প্রসিদ্ধ শিল্প হাতীর র বহু জিনিষও এখানে সংরক্ষিত আছে। গম্বুজবিশিষ্ট ত্রিতল প্রাসাদটি নবাব নাজিম হুমায়ুনজা নির্মাণ য়েছিলেন। ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, নয় বৎসর সময়ে ারেল ম্যাকলাউড নামক এঞ্জিনীয়ারের তত্ত্বাবধানে ৭ খৃষ্টাব্দে এর নির্মাণকার্য শেষ হয়। এখানকার ব্রেরীটি একটা দেখবার মত জিনিষ। 'হাজার দুয়ারী' আর কিছু আমাদের দেখা ঘটল না। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের দিকে ফিরবার সময় এক বড় আম বাগানের এলে বৃষ্টি এল। আমরা একটা আমগাছের তলায় দাঁড়ালাম, কিন্তু জল খুব বেশী আরম্ভ হওয়ায় আমরা আম-বাগানের পথ ধরে ছুটতে বাধ্য হলাম। আম নের রক্ষকরা কিন্তু আমাদের ছুটতে দেখে মনে করেছিল—আমরা নিশ্চয় আম-চোর! তারাও আমাদের পিছন পিছন ছুটে ষ্টেশন পর্যন্ত এসেছিল!

জলে ভিজে আমরা একেবারে কাকের ছা হ'য়ে গিয়েছি তখন। কুমারেশ ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে টিকিটের ভাড়া নিয়ে। কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুর তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া একটাকা। বহরমপুর থেকে মুর্শীদাবাদ দু' আনা।—অথচ মুর্শীদাবাদ থেকে কৃষ্ণনগর একটাকা তিন আনা!—কুমারেশ বলে, 'এক আনা আপনি বেশী নেবেন কেন?' মাষ্টার মশাই টিকিটখানা ধরেন সম্মুখে; —সত্যিই এক টাকা তিন আনা লেখা রয়েছে! অমল অবাক্ হ'য়ে বলে—'তার মানে!' মাষ্টার মশায় হেসে উত্তর দেন: "ঐ ত' মশায়, এটা যে রাজধানী যায়গা!"

এ মহা রাত

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

তুফানী রাত! তুফানী রাত!
এলোমেলো ঝড়ে কী সংঘাত,
বজ্রপাত!
তুফানী রাত।

হাওয়াতে আসে যে জলের ছাট,
জানালার পাশে ভেজালো খাট;
খেলার মাঠ!
জলের ছাট।

অঝোর ধারায় এ কি এ জল—
ভাসাবে নাকি গো ধরণীতল?
ভাঙা আগল—
এ কি এ জল!

ভাল লাগে ব'সে চুপ ক'রে
জল পড়ে খুব জোরে—
খুব তোড়ে!
চুপ ক'রে।
কালো মেঘে আলো বিদ্যুতে—
মনে হয় বুঝি কোন্ ভূতে
আসে ছুঁতে!
বিদ্যুতে!

মত্ত তুফানে কিসের গান,
ব্যর্থ পেয়ে কাঁদে কাদের প্রাণ?
প্রলাপী তান!
কিসের গান!

আজি এ রাত—তুফানী রাত
বন্ধু দুয়ার করে আঘাত—
আনে প্রভাত!
তুফানী রাত।

ভোলানাথ

শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার

ঝ্যাক্, ঝ্যাক্, ঝ্যাক্, ঝ্যাক্,—লালগোলা ঘাট প্যাসেঞ্জার ছুটছে একটা বিশ্রী আওয়াজ করতে করতে। একটা ছোট ষ্টেশনে এসে থামতে টিকিট-চেকার কেশব অভ্যস্ত হাতে হাল্কা একটা দোল খেয়ে ট্রেনে উঠলো। অসহ্য গরম, কোটটার বোতাম খোলা সত্ত্বেও কিছুতেই শরীরটা ঠাণ্ডা হচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে টিন খুলে কেশব একটা সিগারেট ধরালো। যা ঝামেলার কাজ, তাতে আবার এই গরমের দিন! একটা আরাম সূচক আ— ক'রে চোখ খুলতেই কিন্তু কেশবের চক্ষুস্থির। সামনের বেঞ্চে পা ছড়িয়ে হোল্ডঅল্‌টাকে তাকিয়ার মত ঠেস দিয়ে বিষ্টুকাকা মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছেন। একেবারে সামনের বেঞ্চিটাতে। হাতে তাঁর বার্ম্মা মোটা চুরুট, কিন্তু তা টানা আর হচ্ছে না। সিগারেটটা লুকাল না কেশব। জানে বিষ্টু কাকার মনটা ঐ বইএর পেছনে ট্রেনের চাইতেও বেগে ছুটছে। ট্রেনের কলিশন না হ'লে, বা ঐ চুরুটের শেষ আগুনটা আঙ্গুলে ছ্যাঁক্ ক'রে না লাগলে তাঁর চোখ বই থেকে সরবে না। অতএব নিশ্চিন্ত হয়ে আরাম করে সিগারেটটা শেষ করল কেশব। তারপর বিষ্টু কাকার কাছে গিয়ে বলল—"টিকিট?"

সে কথা বিষ্টু কাকার কানের ধারে কাছেও গিয়ে পৌঁছাল না। অগত্যা আর একটু গলায় জোর দিয়ে কেশব বলল, "আপনার টিকিট?"

এবার কানে গিয়ে বোধ হয় পৌঁছাল, কিন্তু চোখ তিনি তুললেন না। হাতের চুরুটটা হাত থেকে মুখে নিলেন সুধু, বোধ হয় টিকিটটা বের করবার পূর্ব্বাভাস। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। অগত্যা কেশবকে আর একবার গলা খাঁকারি দিতে হ'ল। এবার হাতটা কোটের পকেটে ঢুকল, বিষ্টু কাকা পকেট থেকে হাতটা বের ক'রে বইএর উপর চোখ রেখেই সেটা কেশবের হাতে তুলে দিলেন। কেশব দেখল টিকিটের সাইজেরই মত বিষ্টুকাকার একটা কার্ড, ডক্টর বি, সি, মুখার্জী, আর তার পেছনে দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট ছোট অক্ষরের একগাদা ডিগ্রীর লাইন।

তাই হাসি চেপে আর একবার চেঁচিয়ে বল্‌ল, ... ত' টিকিট না. আপনার কার্ড।"

বিষ্টুকাকার চমক ভাঙ্গলো, "তাই তো! কি ... ওটা? কার্ড? তাই তো, বড় ভুল হয়ে গেছে, টি... বদলে দিলাম কার্ড!" কোটের এ পকেট ও ... হাতড়াতে লাগলেন তিনি। শেষে কোট ছেড়ে পা... পকেট হাতড়াতে লাগলেন।

কেশব জানত বিষ্টুকাকার ব্যাপার। কল... বিষ্টুকাকাদের পাশের বাড়ীতে তারা দশ বছর ... কোনো কিছুর ব্যাপারে ভদ্রলোকের কিছু ঠিক থা... টিকিট তিনি করেছেন নিশ্চয়ই. এখন, কোথায় রে... সেইটাই সমস্যা। তাই একবার হাঁক দিল, "আমাকে ... পারছেন বিষ্টুকা'?" বিষ্টুকাকা চশমাটা খুলে ... দেখে নিয়ে এবার একগাল হেসে বললেন—"আ... বলিস, চিনতে পারবো না কেন? মদন ত'? তোদে... পুরে আমি সেদিনও তো গেলাম। সময় ছিল না ... তোদের ওখানে যেতে পারি নি। তারপর চাকরী কর... বেশ বেশ, বাবা কেমন আছেন?"

কেশবের ইচ্ছে হ'ল প্রাণ খুলে হাসে দিনরা... আর প্রবন্ধ নিয়ে থাকলে যে কি রকম ভোলানাথ ... যেতে হয় বিষ্টুকাকা তার একটা জ্যান্ত প্রমাণ না... প্রফেসার, বই ছাড়া ভূ-ভারতে তাঁর কাছে আর ... আছে কিনা সন্দেহ! কেশবকে ভুল ক'রে মদন ... তাঁর বাড়ী মধুপুর ঠাউরে নিয়েছেন বিষ্টুকাকা ... ভাবুন, সে ভুল ভাঙ্গিয়ে কোনো লাভ নেই, তাই ... "বাবা ভালোই আছেন। আপনি ততক্ষণ টিকিটটা ... আমি ওদিকটা দেখে আসছি।" হাঁ, "হাঁ, নিশ্চ... বিষ্টুকাকা টিকিটটা খুঁজতে লাগলেন।

কেশব ওধারটা গেল টিকিট দেখতে দেখতে। ... লোক বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে ছিল, তাকে বের ... হ'ল। থমকে থামকে একটু ওদিক ফিরে তাকাতেই ... বিষ্টুকাকা তাঁর বইএর পাতায় আবার ডুবে গিয়ে...

...র আরাম করে হোল্ডঅলটা ঠেস দিয়ে নয়, বসে ...ই টিকিটটা পেয়ে গেছেন বোধ হয়।

তাই. ও বেঞ্চির লাইনটা শেষ করে বিষ্টুকাকার কাছে ...র পেন্সিলটা বের করে আগের মত আবার ডাকলো, ...কাকা, টিকটটা?" বিষ্টুকাকা এবার ধড়মড়িয়ে ...ক উঠলেন, তারপর বললেন, "ওঃ, তাই তো, খোঁজা ...নি।" তারপর পকেটে হাত দিতে দিতে বললেন, ...ষ্ট মনে আছে টিকিটটা করলাম, বার আনা পয়সা ...ং দিল। তাই তো, টিকিটটা!" বিষ্টুকাকা বুক-...ট আর পাশ পকেট থেকে হাজার রকম কাগজ বের ...তে লাগলেন। কেশব বলল, "আচ্ছা, আপনি খুঁজুন, ...ম ঐ পাশের কম্পার্টমেণ্টটা থেকে ঘুরে আসছি।" ...কাকা বললেন, "সেই ভাল, আমিও ততক্ষণ খুঁজে ...করে রাখি।" কেশব চল্‌ল পাশের কম্পার্টমেণ্টে; ...ট চেক করতে করতে পেছনে একবার ফিরে দেখে ...কাকা ঐ পকেটের কাগজগুলো হাতে নিয়েই আবার ...র পাতায় তন্ময় হয়ে গেছেন। চোখে তাঁর অখণ্ড ...যোগ, মোটা বইটার একেবারে শেষের দিকে এসে ...ন তিনি। বোধ হয় পাতা দু'য়েক বাকি। কেশব ...র কম্পার্টমেণ্টে ঢুকল।

আধ ঘণ্টা পরে কেশব যখন আবার বিষ্টুকাকার ...রাতে এল, তখন দেখে বিষ্টুকাকা জামা খুলে ...গায়ে হন্তদন্ত হয়ে সুটকেস ঘাঁটছেন। তাঁর বিছানা ...া, আর কোট, পাঞ্জাবীর পকেটে যত কাগজ ছিল ...মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ঘামে তাঁর গেঞ্জি ভিজে ...ং, চশমাটা কপালে তুলে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে একবার ...কস ঘাঁটছেন, একবার পকেট হাতড়াচ্ছেন। কেশবের ...হল বিষ্টুকাকার অবস্থা দেখে। কাছে এসে একটু ...য়ে আস্তে আস্তে বলল, "থাক গে কাকা, আপনাকে ... খুঁজতে হবে না। আপনি টিকিট কেটেছেন তা ...জানি, আমাকে না দেখালেও চলবে।"

"উঁহু, তা নয়।" বিষ্টুকাকার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

"তা নয় মানে?" কেশব একটু দ্বিধার সঙ্গে প্রশ্ন করে। বিষ্টুকাকার অনর্থক এত হয়রানির কোনো অর্থ বোঝা যায় না।

"মানে?" বিষ্টুকাকার গলায় বিরক্তির সুর। দু'হাত তুলে তিনি বলেন, "মানে, কোথায় যাবো সেটা তো মনে আনতে হবে। গোবিন্দপুর কি ধাপার মাঠ হলে ত' চলে না।" তারপর আবার কাগজপত্র ঘাটতে ঘাঁটতে গজ গজ করে বলে চলেন, "জরুরী মিটিং, ইনুভার্সিটি থেকে শ্যাম বাবু আসছেন, প্রিসাইড করবেন। কোথায় কাল আমার পৌঁছে যাবার কথা, তা না, কোথায় কোন্ মুলুকে নামব, তা ছাই কিছুতেই মনে পড়ছে না। মনেরই বা দোষ দিই কেন? বাড়ীতে গোলমাল, ট্রেনে গোল-মাল, এখানে গোলমাল, সেখানে গোলমাল, (কেশব মনে মনে বলল, কোথাও না, সুধু মাথায়) মনে ক'রে যে ঠিক সময় ট্রেনে উঠেছি এই যথেষ্ট। এখন টিকিটটার টিকি দেখতে পেলেই সব ল্যাঠা চুকত। নয় তো কোথায় নামবো বলে দাও।" বিষ্টুকাকা বেঞ্চিটাকেই প্রায় সম্বোধন করেন। "এদিকে জরুরী মিটিং, ছি ছি ছি, সব যেন এক সঙ্গে পেছনে লেগেছে! কাজের সময় যে কোথায় পালায়!" ব'লেই বিরক্ত মুখে ট্রেনের সেই মোটা বইটা উঁচুতে তুলে ধরলেন, যদি পাতার মধ্যে ভুল করে রেখে থাকেন। উপরে তুলতেই ফরফর করে পাতা সরতে লাগল ট্রেনের জানলার জোর হাওয়াতে। আর, বইএর মাঝখান থেকে, টিকিটটা স্পষ্ট দু'জনের চোখের সামনে জানলার উপর লাফিয়ে পড়ল। আর পড়েই আর এক লাফে বাইরে হাওয়া।

ধর ধর ক'রে উঠলেন বিষ্টুকাকা। কিন্তু জানালাটা এক গুঁতো মেরে তাঁকে আটকাল। সেটাও তাঁর পেছনে লেগেছে আজ!

একলব্য

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

দ্রোণাচার্যের গৃহ। দ্রোণাচার্য ও অশ্বত্থামা।

দ্রোণ। তা হলে বায়ু-বাণের বিষয়ে তোমার আর কিছু জান্‌বার নেই বোধ হয়? এই বায়ু-বাণ যুদ্ধক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয়। ভাল যোদ্ধা হ'তে গেলে এর প্রয়োগ-কৌশল বিশেষভাবে আয়ত্ত করতে হয়।

অশ্বত্থামা। আপনার আশীর্ব্বাদে বায়ু-বাণ আমার করায়ত্ত হয়েছে পিতা। আমার বিশ্বাস—

দ্রোণ। শোন, অশ্বত্থামা। এই কথাটি সর্বদা মনে রাখ্‌বে যে, যত দিন পর্য্যন্ত না কোন অস্ত্র শস্ত্রের শিক্ষা বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষা করতে পারছ, তত দিন সে সবের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। যুদ্ধে কিম্বা অন্ততঃ রাজকীয় শিকার-অভিযানে এই জন্য মাঝে মাঝে যাওয়া উচিত। তা না হ'লে অস্ত্র-শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই ভাবে পরীক্ষা না ক'রে দেখ্‌লে ঠিক বোঝা যায় না, শিক্ষা আয়ত্ত হ'ল কি-না। অথচ এ বিষয়ে এখনো পর্য্যন্ত তোমার জন্য কোন ভাল ব্যবস্থা আমি করতে পারলুম না। তাই বড় দুশ্চিন্তায় আছি, বৎস!

অশ্বত্থামা। কেন, পিতা, দুর্যোধনের মুখে শুনলুম শীঘ্রই ত' শিকারে যাওয়া হবে! আর আমাকেও সে সঙ্গে যেতে বলছিল।

দ্রোণ। আজ ক'দিন ধরে সেই ত' আমার ভাবনা হয়েছে। রাজকুমারদের সঙ্গে তোমায় নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কিনা ভেবে ঠিক করতে পারছি না। দুর্যোধন তোমায় যেতে বল্‌লেও ধৃতরাষ্ট্র যদি তা'তে অসন্তুষ্ট হন? অশ্বত্থামা। আমি গেলে ধৃতরাষ্ট্র অসন্তুষ্ট হবেন? আর সে কথা ভেবে আপনিও আমায় নিতে অনিচ্ছুক? বেশ, আপনি রাজকুমারদের নিয়েই যান, পিতা। রাজ-কুমারদের শিক্ষাই আপনি সম্পূর্ণ করুন। হতভাগ্য অশ্বত্থামা এই ঘরের কোণে পড়ে থাক।

দ্রোণ। হায়, অশ্বত্থামা, তুমি কেবল শিশুর মতন অভিমান করতেই জান। আমার মর্মজ্বালার কোন সন্ধানই তুমি রাখ না। দাসত্বের বিড়ম্বনা ত' তোমায় সহ্য করতে হয় নি। তাই তুমি বুঝতে চাও তোমার প্রতি সব কর্তব্য করবার স্বাধীনতা আমার তোমাকে রাজকুমারদের সঙ্গে শিকারে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সন্দেহ হবে যে, কুমারদের সঙ্গে তোমায় সমান শিক্ষার সুযোগ দিচ্ছি। ধৃতরাষ্ট্রের মনে সে আমি কিছুতেই জাগতে দেব না। ধৃতরাষ্ট্র অ তার বিরক্তি-ভাজন হওয়া আমার পক্ষে মূর্খতা (খানিক চিন্তা করে')—আচ্ছা, এক কাজ করলে দুর্যোধনকে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে তোমার হয় যাওয়া চল্‌তে পারে। ধৃতরাষ্ট্র তা'তে সন্তুষ্ট আর দুর্যোধনও তোষামোদে খুশী হবে। সেই ধৃতরাষ্ট্রকে জানাবার জন্য তা'হলে দুর্যোধনকেই বলো।

অশ্বত্থামা। আপনার আদেশ আমি কোন দিন করি নি। কিন্তু এমনি ভাবে জীবন কাটাতে আমার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। আমার ভাল লাগে না। আমার সব উৎসাহ নষ্ট হয়ে রাত্রিদিন এই হীনতা, এই অপমান আর কুটিল চক্রান্ত নাগপাশের মতন আমাদের সর্বাঙ্গে বাঁধা। এই বাঁধন থেকে মুক্তি পাব, পিতা?

দ্রোণ। মুক্তি? মুক্তি কোথায়? এখানে পরিবারের চক্র—নির্লজ্জ, জটিল ষড়যন্ত্র! কিন্তু যে আমরা পেছনে ফেলে এসেছি—তাও কি মুক্ত দারিদ্র্যের কশাঘাতে, অভাবের তাড়নায়, নিত্য অসম্ জ্বালায়—সেও ছিল অতি ঘৃণ্য বন্ধন। তাই চিন্তা করেই বর্ত্তমান জীবন গ্রহণ করেছি। যে রকমেই হ'ক, প্রতিষ্ঠা অর্জন করতেই হবে। যাক্ কথা। অর্জুন, দুর্যোধনদের এখানে আসবার হ'য়েছে। এই শিকারে যাওয়ার বিষয় কয়েকটা তোমায় বলি। সেই মতন চল্‌বে। প্রথমে দুর্যো দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি নেবে। তোমার যাওয়া

ত হয়, তা হলে সেখানে গিয়ে যেন ভুলেও অস্ত্রধারণ না। পরে তোমার জন্যে অন্য শিকার-অভিযানের করব। এ শিকারে তুমি যাবে দুর্যোধনের পার্শ্বচর বে। আর অর্জুনের অস্ত্র-প্রয়োগ কৌশল বিশেষ-লক্ষ্য করবে। কিন্তু সে যেন তোমার কোন কৌশল ত না পায়। সে জানে, তাকেই আমি সমস্ত অস্ত্র-দান করেছি। তুমিও যে তারই মতন শিক্ষা পেয়েছ, সে জানে না। তাই তোমায় তার সামনে অস্ত্র নিষেধ করছি। বুঝেছ?

অশ্বত্থামা। বুঝেছি দেব। আপনার আদেশ আমার থাকবে। কিন্তু এত অসুবিধার মধ্যে শিকারে আমার গেলেই ত' ভাল হ'ত! আমি না হয় অন্য কোন সময় আপনার সঙ্গে যাব?

দ্রোণ। না, দুর্যোধন যদি সঙ্গে নিতে চায়, তা হলে যাওয়াই ভাল। তা ছাড়া এতে তোমার যে হবে, সে কথাও ত' শুনলে। দুর্যোধন সঙ্গে নিতে আমার কথা মতন চল্‌বে। ভুল না।

অশ্বত্থামা। আপনার সব কথাই আমার মনে থাকবে।

(অর্জুন ও দুর্যোধনের প্রবেশ)

দ্রোণ। এস, এস, দুর্যোধন! এস অর্জুন! আমি ক্ষণ থেকে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি।

অর্জুন। গুরুদেব। শিকারে যাওয়া স্থির করবার কি আজ আমাদের স্মরণ করেছেন?

দুর্যোধন। আর যাবার দিনও নাকি স্থির হয়ে ?

দ্রোণ। হ্যাঁ বৎস, আমি ভাবছি আগামী পূর্ণিমা আমাদের যাত্রা করলে ভাল হয়। এ কথা দের জানাবার জন্যেই এখানে আসতে বলেছিলুম। দের কোন অসুবিধা হবে না ত'?

অর্জুন। আপনার সমস্ত আদেশ আমার শিরোধার্য। আমার অসুবিধার কোন কথাই আসে না, দেব! আর যদি কোন আদেশ না থাকে, তা হলে অনুমতি দিন—গৃহে ফিরে যাত্রার আয়োজন করি।

দ্রোণ। ভাল বৎস, তুমি যাত্রার আয়োজন কর।

অর্জুন। দুর্যোধন, এখন যাবে নাকি?

দুর্যোধন। না, আমার ফিরতে দেরী হবে।

(অর্জুনের প্রস্থান)

(দ্রোণের প্রতি) তা হলে শিকার-যাত্রা একেবারে স্থির হয়ে গেল?

দ্রোণ। কেন, বৎস তোমার কি এতে আপত্তি আছে?

দুর্যোধন। না, আপত্তি ঠিক নয়। তবে আপনি জানেন ত' তীর-ধনুক আমার তেমন ভাল লাগে না। অথচ শিকারে গিয়ে গদা দিয়ে বিশেষ কায হবে না। তার ওপর আবার অর্জুন চোখের সামনে তীর-ধনুকে বীরত্ব ফলাবে—সে আমার অসহ্য।

দ্রোণ। তোমার কোন চিন্তা নেই বৎস গদা চালনারও অনেক সুযোগ তুমি পাবে। শিকারে গদার প্রয়োজন নেই কে বললে?

দুর্যোধন। তা হলে আমার আর কোন আপত্তি নেই। আচ্ছা, অশ্বত্থামার যাবার বিষয় আপনি কিছু বললেন না ত'?

দ্রোণ। তোমাদের সঙ্গে অশ্বত্থামার যাবার কথা বলবার অধিকারী ত' আমি নই, বৎস! আর তা' ছাড়া সে রাজকুমারদের সঙ্গে সর্বত্র যাওয়ারও যোগ্য নয়।

অশ্বত্থামা। মহারাজ অনুমতি না দিলে আমি কি করে যাব?

দুর্যোধন। (অন্যমনস্ক ভাবে) কে? কে মহারাজ?

অশ্বত্থামা। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র।

দুর্যোধন। ওঃ! আচ্ছা, আমি তাঁকে বলে রাখব। আর আমি বল্‌ছি, এই কি যথেষ্ট নয়? গুরুদেব কি বলেন?

দ্রোণ। নিশ্চয় নিশ্চয়। তবে মহারাজ যাতে কিছু মনে না করেন, সেই জন্যেই তাঁকে একবার জানানো ভাল।

দুর্যোধন। সে আমি বুঝব। অশ্বত্থামার তা'হলে আমার সঙ্গে যাওয়া ঠিক হয়ে রইল। আমি এখন যাই।

(দুর্যোধনের প্রস্থান)

দ্রোণ। যাক্, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

রাধামাধবের রত্নহার

শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ফিরিঙ্গী-প্রসঙ্গ

ইতিপূর্ব্বে আমরা রসরাজকে সপ্তগ্রামে এনায়েৎ খাঁর বাড়ীতে চিন্তাকুল অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। এবার আর একবার তাঁর খোঁজ নেওয়া যাক্।

এনায়েৎ খাঁ ফৌজদারের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এবং সে সম্বন্ধেই রসরাজের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতেছিল :

"তা হ'লে ফৌজদার নিজে এখন কিছু আশ্বাস দিতে পারছেন না ?" রসরাজ নিরাশ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

"তাই তো তাঁর কথার ভাবে বুঝলাম। বেচারা এখন নিজের তালই সামলাতে পারছেন না। সপ্তগ্রামে এই গোলমাল, তার ওপর ফিরিঙ্গীরা শাসিয়েছে, বন্দরের একখানা ইটও তারা স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে না। হুগলীতে তাদের প্রবল প্রতিপত্তি—কেল্লা ভর্ত্তি রসদ আর সৈন্য। আর সে সৈন্যও ফৌজদারের সৈন্যদের চাইতে অনেক বেশী শিক্ষিত। রক্তও তাদের গরম—অপমানের পুরোপুরি প্রতিশোধ না নিয়ে নাকি তারা থামবে না।"

"ফৌজদার কি করছেন ?"

"কি আর করবেন, যে কোন মুহূর্ত্তে ফিরিঙ্গীরা আবার হয়তো একটা বড় রকম আক্রমণ করবে—তারই প্রতীক্ষা করছেন। এবারে হয়তো ওরা জাহাজ সমেত আসবে, তোপ দাগতেও ছাড়বে না! ফৌজদারের হাতে যা সৈন্য আর গোলা-বারুদ আছে তা'তে বাইরে থেকে ... না পেলে ভাবনার কথা। আশপাশে যেখানে ... নবাবের সৈন্যদের ঘাঁটি আছে সর্ব্বত্র খবর পাঠান ... সাহায্য যে কোন সময়ে এসে পড়তে পারে।"

রসরাজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, ... কহিলেন, "হুঁ, মার ছাড়া আর ওষুধ নেই। শুনে... গোয়ায় এদের নতুন শাসনকর্ত্তা এসেছে—তারা ... লোক। ডাকাতি করার চাইতে ব্যবসার দিকে ... ক'রে নজর দেবার জন্যই নাকি সে হুকুম দিয়ে ... কিন্তু এ পোড়া বাংলা দেশে দেখছি তার উল্টো ... হচ্ছে! ফিরিঙ্গীর সংখ্যাও যেমন দিনকে দিন ... নানান্ জায়গায় তেমনি নতুন নতুন ঘাঁটিও ... আবার নাকি মগেরাও এসে ওর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে ... বিষ এখনই তুলে ফেলতে না পারলে বাদশা'র ... টেকা ভার হবে।"

এনায়েৎ খাঁ সায় দিয়া কহিলেন, "বাস্তবিক ... তা ছাড়া, শুনেছেন বোধ হয়, এই ফিরিঙ্গীরা ... জাতের নয়। বাংলাদেশে যারা উৎপাত করছে ... সব পর্ত্তুগীজ্। এখন এদেরই প্রতাপ বেশী ... ছাড়া ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি আরও ... জাতের ফিরিঙ্গী আছে। বাংলা মুলুকে না এলেও ...

...র নানা জায়গায় এরা কুঠি বসিয়েছে। শুনেছি ...র ধারে ধারে—সুরাটে, মাদ্রাজে এবং আরো কোথায় ...য় এদের ঘাঁটি রয়েছে। ওদেরও পরস্পরের মধ্যে ...ন সম্প্রীতি নেই।"

...সরাজ একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "তা হ'লে ওদের একটার পেছনে আর একটাকে লাগিয়ে দিতে ...লই হয়। নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি ক'রে ...গে না!"

...তাঁর কথার ভঙ্গীতে এনায়েৎ খাঁ না হাসিয়া পারিলেন ... "খুব সহজ পথ তো বাৎলে দিলেন। কিন্তু লাগাবার ... করে কে? তা ছাড়া যে জাত, যাকে তোয়াজ ...ন সেই হয়তো বুকের ওপর চেপে বসবে!" তারপর ... ভাবে কহিলেন, "ঠাট্টা নয়, সত্যি এখন ভাববার ... এসেছে। আমার মাঝে মাঝে কি ভয় হয় জানেন, ...যে বিদেশ থেকে নতুন শক্তি একটু একটু ক'রে এ ...র মাটীতে ভিৎ গাড়তে সুরু করল, এ সহজে থামবে ... এখন থেকে সতর্ক না হ'লে অমন যে বাদশা'র রাজত্ব হয়তো এর প্রতাপে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে! ...মুসলমান এক হ'য়ে, ঘরোয়া বিবাদ ত্যাগ ক'রে, এক...ট এখন এদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দরকার। কাঁচা ...য় গোড়া ধরে উপড়ে না ফেলতে পারলে শেষে ...র ধ্বংস করা কঠিন হবে। শেষটা এরাই না হিন্দু-...র সিংহাসন দখল ক'রে বসে!"

এবার সায় দিবার পালা রসরাজের। "আমরা আদার ...রী, জাহাজের খোঁজ নেওয়া হয়তো মানায় না— তবু মনে হয়, বাদশাহ্ একটু ভুল করছেন। নানা ...য় এদের কুঠি বসাতে দিয়ে, অবাধ বাণিজ্য করবার ...ণ দিয়ে, প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এর ফল কি হবে কে ...। বাংলার সুবেদারও তো শুনলাম এদের সঙ্গে ...র রাখারই চেষ্টা করছেন!"

এনায়েৎ খাঁ বাধা দিয়া বলিলেন, "সেটা বোধ হয় ...নয়। এখানকার ফৌজদার তেমন কড়া নয় দেখে ...তো তাই মনে করছেন। ফৌজদার লোকটি একটু ... প্রকৃতির। আমারই আত্মীয় তো, আমি জানি। ...দিন যিনি সুবেদার ছিলেন তিনিও ছিলেন ঐ রকম, ... ওদের ঘাঁটাতে চাইতেন না। কিন্তু সম্প্রতি যিনি নতুন সুবেদার হয়েছেন তাঁর সঙ্গে নাকি ফিরিঙ্গীদের বনিবনাও হচ্ছে না। ইনি অবশ্যি অল্প দিনের জন্যই গদীতে বসেছেন; আগ্রা থেকে বাদশা'রই কোন আত্মীয় এলে ও পদ ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু যত দূর শুনেছি ফিরিঙ্গীদের ব্যবহারে এই অল্প ক'দিনেই ইনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ফৌজদারের সঙ্গে আমার সেই কথাই হচ্ছিল।"

"কি কথা?"

ফৌজদার বলছিলেন আমায় একবার জাহাঙ্গীরনগর যেতে। গিয়ে সুবেদারের সঙ্গে দেখা ক'রে ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে ফেলতে। তাঁর নিজেরও যাবার দরকার ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় তাঁর পক্ষে এখন সাতগাঁ ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সে সবের কিছু কিছু ভারও আমার ওপর চাপাতে চান। আমিও ভাবছিলাম, রায়মশাইএর ব্যাপারটার জন্যই একবার খোদ জাহাঙ্গীরনগর গেলে ভাল হ'ত।"

"কিন্তু সে তো অনেক দূর—তত দিনে এদিকে যে অনেক কিছুই অঘটন ঘটে যেতে পারে!"

"তা ঠিক; কিন্তু এখানে থেকেই বা আমরা কি করছি? আমি বলি কি, আমার বিশ্বস্ত লোক দিয়ে রায় মশাইকে একটা খবর পাঠাই, তারপর চলুন আমি আর আপনি চলে যাই জাহাঙ্গীরনগর—সুবেদারের কাছে। তাঁর সাহায্য ছাড়া এ উৎপাত ঠাণ্ডা করা যাবে ব'লে মনে হয় না।"

রসরাজকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া এনায়েৎ খাঁ আবার কহিলেন, "এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই। যদি ভাগ্নেকে বাঁচাতে চান, ভগ্নীপতির বিপদ্ দূর করতে চান তবে এই করতে হবে। এবং দেরী না ক'রে আজকালের মধ্যেই রওনা হ'তে হবে। সময় যতটা লাগবে মনে করছেন তা লাগবে না। সবটা আমরা জলপথে যাব না, যতটা পারি ঘোড়ায় যাব। তা ছাড়া ফৌজদারের ছাড় যোগাড় ক'রে নেব। তা' সঙ্গে থাকলে পথে কোন অসুবিধা হবে না—চাই কি সরকারী ছিপের সাহায্যও পাওয়া যাবে। আর ভাববার কিছু নেই, মন ঠিক করে, চলুন, বেরিয়ে পড়ি।"

রসরাজ এনায়েৎ খাঁকে ভাল রকমই চিনিতেন। মৃগাঙ্ক রায়ের তিনি কত বড় বন্ধু তাহাও তাঁর অজানা ছিল

না। বন্ধুর বিপদে তিনি যা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তা হইতে তাঁকে ফেরান সম্ভব হইবে না। মহামায়ার যদি ইচ্ছা থাকে জয়ন্তের উদ্ধার হইবেই, ফিরিঙ্গী দস্যুরাও ঢিট হইবে।

পরদিন খুব ভোরেই এনায়েৎ খাঁ রসরাজ ও ক… বিশ্বস্ত অনুচর সহ রাজধানীর উদ্দেশে রওনা গেলেন।

(ক্রম…)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

সমুদ্রের শৈবাল

শৈবাল বা শেওলা বলতেই মনে পড়ে কলতলার ছ্যাৎলা (বর্ষাকালে যেখানে হরদম্ আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা) বা পুকুরে পাড়ের কাছাকাছি সবুজ পিচ্ছিল লতাগুলি: এগুলি আসলে উদ্ভিদ্ তা তোমরা নিশ্চয়ই জান, কিন্তু একটু নীচ জাতের উদ্ভিদ্—সাধারণ গাছ-পালার সঙ্গে চালচলনে এদের অনেক বিষয়েই তফাৎ। কাজেই এদের হয়তো তোমরা একটু তাচ্ছীল্যই কর। কিন্তু এদেরই যে সব জাতভাই সমুদ্রে বাস করে তাদের কথা শুনলে হয়তো সে মনোভাব তোমাদের বদলে যাবে।

শেওলা বা শৈবাল নানা জাতের হয়। সামুদ্রিক শেওলার রকমারি আরও বেশী। সেখানকার শেওলা শুধু সবুজ নয়,—লাল, সাদা, পিঙ্গল—হরেক রকম রংএরই হতে পারে। বিশাল সমুদ্রে যে সব শৈবাল বাস করে তাদের আকার-প্রকারও যে সমুদ্রেরই উপযোগী হবে এতে আর বিচিত্র কি! ম্যাক্রোসিস্টিস্ নামে এক জাতের সামুদ্রিক শৈবাল আছে যেগুলির সঙ্গে চেহারায় পাল্লা দিতে গেলে ডাঙ্গার যে কোন বড় গাছ লজ্জায় পড়বে,—তা বটই বল, অশ্বত্থই বল আর তাল-নারকেল গাছই বল। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ক্যাপ্টেন কুক্ দক্ষিণ মহাসাগরে অভিযানের সময় এই রকম এক ম্যাক্রো-সিস্টিস্ জাতের শেওলা তুলে মেপে দেখেছিলেন—লম্বায় ছিল ১২০ ফুট। তার পর আরও অনেক উ… তত্ত্ববিদ্ এ নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং ২০০, ৩০০, … কি হাজার ফুট লম্বা ম্যাক্রোসিস্টিসেরও সন্ধান পেয়ে… ফক্ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে বন্দরে ঢুকবার মুখে এই শেওলা… ভীষণ ভাবে জমে থাকতে দেখা গেছে যা ঠেলে ব… জাহাজও বন্দরে ঢুকতে পারে নি। ঐ দ্বীপের … সমুদ্রতীরে মাইলের পর মাইল শুকনো ম্যাক্রোসিস… ডাল পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তার এক একটা … ৪।৫ ফুট হবে।

সমুদ্রের শৈবাল সম্বন্ধে আর একদিন তোমাদের… ক'রে শোনাব।

মৃত্যুর সাথে পাল্লা

ক্যালিফোর্ণিয়ার সাণ্টা ক্লারা উপত্যকায় একটি … আছে যেটা তৈরী করতে চল্লিশ বছরেরও ওপর… লেগেছিল। তাই ব'লে বাড়ীটা যে স্থাপত্যের দিক… খুব উল্লেখযোগ্য একটা কিছু তা মনে করবার কারণ… আসলে বাড়ীটা ছিল এক ধনবতী মহিলার। তাঁর … মিসেস্ উইঞ্চেষ্টার। তাঁর প্রেততত্ত্বে খুব … ছিল। ঐ চর্চ্চা করতে করতে কি ক'রে তাঁর ধারণা… …দিন তাঁর বাড়ী তৈরী শেষ না হবে ততদিন তাঁর … হবে না। ফলে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য তিনি … একটা বাড়ী তৈরী করবেন যা আর কখনও শেষ … না। টাকার অভাব ছিল না—কাজেই তাঁর খেয়াল … বাড়ী বেড়েই চল্ল। কোন নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা না … বাড়ীটা হ'য়ে দাঁড়াল একটা কিম্ভূত কিমাকার … ক ধাঁধার মত। কিন্তু এত ক'রেও তিনি মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। চল্লিশ বছর ধরে ঐ ভাবে কাটাবার পর ১৯২২ সনে মহিলাটির হঠাৎ একদিন মৃত্যু হ'ল। তখন দেখা গেল এই অদ্ভুত বাড়ীটিতে মাত্র ১৬০টি ঘর তৈরী হয়েছে—যার দরজার সংখ্যা হচ্ছে দু' হাজার; জানালা আরও বেশী। আজও বহু ভ্রমণকারী প্রতি বছর এই অদ্ভুত বাড়ীটা দেখবার জন্য সেখানে ভীড় করে।

…কলকাতার ফুটবল্ লীগ্ শেষ হয়ে গেছে এবং ১ম …গে চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছে ইষ্ট বেঙ্গল ও রানার্স্ আপ্ …ছে মোহনবাগান। কাষ্টম্স শেষ পর্য্যন্ত ১ম বিভাগে … গেছে, ২য় বিভাগে নেমে গেল পুলিশ দল। ২য় …গ থেকে জর্জ্জ টেলিগ্রাফ দল ১ম বিভাগে উঠল।

…লীগের পর আই. এফ্. এ শীল্ড্ খেলা চলছে। …রে থেকে যে সব দল খেলতে এসেছিল তারা প্রায় …লই একে একে পরাজিত হয়ে বিদায় নিচ্ছে। শেষ … শুধু স্থানীয় দলগুলিই টিকে থাকলে আশ্চর্য্য হবার … নেই।

* * * *

ওদিকে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় বনাম ইংল্যাণ্ডের ২য় টেষ্ট … হয়ে গেছে। ক্রিকেট খেলার নিয়ম অনুযায়ী ফল …ছে ড্র। ইংল্যাণ্ড—১ম ইনিংসএ ২৯৪, ২য় ইনিংস্এ … উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ১৫৩। ভারতীয় দল—১ম …স্এ ১৭০, ২য় ইনিংস্ এ ১৫২ (৯ উইকেটে)।

* * * *

…মন্ত্রী-মিশন স্বদেশে চলে যাবার পর ভারতের রাজ-…ক রঙ্গমঞ্চে আবার নতুন পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে। …লিম্ লীগ্ দল তাঁদের আগেকার মত বাতিল ক'রে …মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং প্রত্যক্ষ … সংগ্রাম সুরু করবেন বলে শাসিয়েছেন। তাঁদের দলের কেউ কেউ (সকলে নয়) রাজদত্ত খেতাব ত্যাগ ক'রে শুধু 'শ্রীঃ' নামে পরিচিত হবেন জানিয়েছেন। ওদিকে বড়লাট রাষ্ট্রপতি জওহরলালকে ডেকে মধ্যবর্তী কালীন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে অনুরোধ করেছেন। রাষ্ট্রপতি এবার রাজী হয়েছেন এবং কংগ্রেস থেকে লীগ্ ও অন্যান্য দলের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। দেখা যাক্ এর পর কি হয়!

* * * *

সমস্ত ভারতবর্ষে ডাক-কর্ম্মচারীরা একযোগে ধর্ম্মঘট করায় যে পরিস্থিতি হয়েছিল তা তোমরা সবাই জান। এ দেশে এ ধরণের ব্যাপার আর কখনও হয় নি। সরকার থেকে চেষ্টা করলে হয়তো দেশব্যাপী এই বিশৃঙ্খলা আগেই মেটান যেত। শ্রাবণের 'রামধনু' যথা সময়ে বেরোলেও এই কারণে বেশীর ভাগ গ্রাহকদের পেতে অত্যন্ত দেরী হয়েছে। কিন্তু কোন উপায় ছিল না।

* * * *

সম্প্রতি রাজপিপলা রাজ্যের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গুজরাট ও মধ্য ভারতে নর্ম্মদা নদীর উপত্যকায় এক অতি প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন খুঁড়ে বের করেছেন। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন—এ সভ্যতা আজ থেকে প্রায় ৫ হাজার বছরের পুরোনো। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার চাইতেও নাকি এটি প্রাচীন।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

শয়তানের জাল—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিঃ, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ২৲

কিছুদিন হ'ল খগেন্দ্র বাবু শিশুসাহিত্যের গতানুগতিক রাস্তা ছেড়ে নানা নতুন পথে ছোটদের টেনে নিচ্ছেন। এই বৈচিত্র্য তাঁর বইগুলিকে উপভোগ্য ক'রে তুলেছে। এই উপন্যাসের পটভূমি ১৩৫০এর বাংলা। এর নূতনত্ব, আন্তরিকতা ও গল্প বলার সহজ ভঙ্গীটি উল্লেখযো

বিজ্ঞানী ও বীজাণু শ্রীখগেন্দ্রনাথ প্রকাশক—বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ। দাম ॥৵০

জ্ঞানভারতী গ্রন্থমালার ৩য় গ্রন্থ। এতে বী তাদের আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর কাহিনী গল্পের মত ক'রে বলা হয়েছে। শুধু ছোটরা নয়, বড়দেরও পড়ে দেখা উচিত। ছাপা, ছবি চমৎকার।

রজতঃ-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

ডাক-কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটের জন্য দীর্ঘ দিন ডাকঘর বন্ধ থাকায় অনেকে সময় মত প্রতিযোগিতার লেখা পাঠাতে পারেন নি। তাই রচনা পাঠাবার শেষ আগামী ২৫শে ভাদ্র পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

নূতন ধাঁধা

আশ্চর্য্য সে সহর। সামনে থেকে দেখতে যে রকম, পেছন থেকে দেখতেও ঠিক সেই রকম। কিন্তু ইচ্ছে করলে, সামনে থেকে খানিকটা এগোলে তা যেমন দেখতে পাবে আগের দিন, তেমনি পেছন থেকে ঠিক ততখানি এগোলে সেটা দেখতে পাবে পরের দিন। কোথায় কোন্ সে আজব সহর বলতে পার?

— গত মাসের ধাঁধা —

ডাক কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটের জন্য শ্রাবণ সংখ্যা মাসের প্রথমে বেরোলেও অনেকেই দেরীতে পেয়ে তাই শ্রাবণের ধাঁধার উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ভাদ্র পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। ধাঁধার উ উত্তরদাতাদের নাম আশ্বিন সংখ্যায় দেওয়া হবে।

নতুন বই

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার

প্রথম গ্রন্থ

দি লাষ্ট্ অফ্ দি মোহিকান্স্

মর্ম্মানুবাদ করেছেন—সুলেখক শ্রীঅমলেন্দু সেন

দাম ॥৵০

এবার পূজায়

সুবোধ বসু-র

বুদ্ধির্যস্য

অভিনয় করো।

স্ত্রী-ভূমিকা নেই। আগাগোড়া হাসি।

'রামধনু'-তেই এ নাটকটি বের হয়েছিল।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

ছোটদের উপহারের কয়েকখানি ভাল ভা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

ধূমকেতু (রহস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপন্যাস)

আবিষ্কারের গল্প (বিখ্যাত অভিযাত্রীদের রোমাঞ্চকর কাহিনী)

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

নূতন পুরাণ (মজার গল্প)

হাস্য ও রহস্য (ঐ)

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি (মজার গল্প)

মনোরঞ্জন ও শিবরামের

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে (মজার গল্প)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

—দেশবাসীর এই অনাবিল প্রশংসা আমাদের উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধন করে আসছে এক শতাব্দীর উপর। এর মূলে রয়েছে আমাদের একনিষ্ঠ সাধনা, কারিগরগণের অননুকরণীয় নৈপুণ্য ও তদুপরি আমাদের বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট উপকরণ।

গহনা ও শাড়ী

শুধু শাড়ী যত সুন্দর হোক,
তা নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ করে না।
শুধু গহণা যত সুন্দর হোক,
তাতে নারী-রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে
ওঠে না।
শাড়ী ও গহণার মিলনেই
নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ হয়।

তাই আমরা—
পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা পরিবেশনের
জন্ম নানা প্রকারের বেণারসী শাড়ীর
আয়োজন করেছি—শাড়ীগুলি
বর্ণ-বৈচিত্র্যে, রূপরচনায়
অনিন্দ্যসুন্দর।

আমাদের গহণা—আধুনিক রুচি-
সম্মত শিল্পচাতুর্য্যে, রূপছন্দে
অভিনব।

কুণ্ডু জুয়েলারী ওয়ার্কস
(প্রো: জে. এল. কুণ্ডু)
... ফোন: বি. বি. ১২০০ GRAMS: KUNDJUEL
SYMBOL OF PERFECTION KJW

Regd. No C

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১৩শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন,
১৩৫৩

বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ১৷৵০
প্রতি সংখ্যা
।৵০

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি

কার্য্যালয়: ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্: সাউথ্ ১২৬

গহনা ও শাড়ী

শুধু শাড়ী যত সুন্দর হোক,
তা নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ করে না।
শুধু গহণা যত সুন্দর হোক,
তাতে নারী-রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে
ওঠে না।
শাড়ী ও গহণার মিলনেই
নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ হয়।

তাই আমরা—
পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা পরিবেশনের
জন্য নানা প্রকারের বেণারসী শাড়ীর
আয়োজন করেছি—শাড়ীগুলি
বর্ণ-বৈচিত্র্যে, রূপরচনায়
অনিন্দ্যসুন্দর।

আমাদের গহণা—আধুনিক রুচি-
সম্মত শিল্পচাতুর্য্যে, রূপছন্দে
অভিনব।

কুণ্ডু জুয়েলারী ও ...

GRAMS: KUNDJUEL

Regd. No C-

কার্য্যালয় : ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন : সাউথ ১২৬

COLOUR PAPER

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৩ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

— কয়েকখানি বাছা বাছা বই —

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

পদ্মরাগ ... ১॥০
সোনার হরিণ ... ১॥০
চায়ের ধোঁয়া ... ৸০
নূতন পুরাণ ... ৸৵০
হাস্য ও রহস্য ... ৸৵০
ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি
(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং ... ৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ১৸০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৸০

মনোরঞ্জন ও শিবরামের

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ... ৸৵০

শ্রীলীলা মজুমদারের

বদ্যিনাথের বড়ি ... ৸০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু ... ৸৵০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা ... ১॥০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা

— কয়েকখানি বাছা বাছা বই —

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা

১নং **দি লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্‌স** ॥৵০

(শ্রীঅমলেন্দু সেন অনূদিত)

২নং **অলিভার টুইষ্ট** ... ॥৵০

(শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ... ৸৵০

শ্রীসুবোধ বসুর শিশু-নাটিকা

বুদ্ধির্যস্য ... ।৵০

শ্রীরঞ্জিৎ সিংহের রূপকথা

ময়নামতীর দেশ ... ১৲

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞান-বুড়ো ... ১৲

আকাশের গল্প ... ১।০

জন্মদিনের উপহার ... ৸৵০

ধূমকেতু ... ৸০

আবিষ্কারের গল্প ... ৸০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্রের

গল্প-সল্প ।০ ছুটীর গল্প ।০

মাধব্য ও রসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প ।৵০ অনেক গল্প ।৵০

পুরাতন বাঁধান রামধনু···প্রতি খণ্ড ৸০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রমা রোড, কলিকাতা।

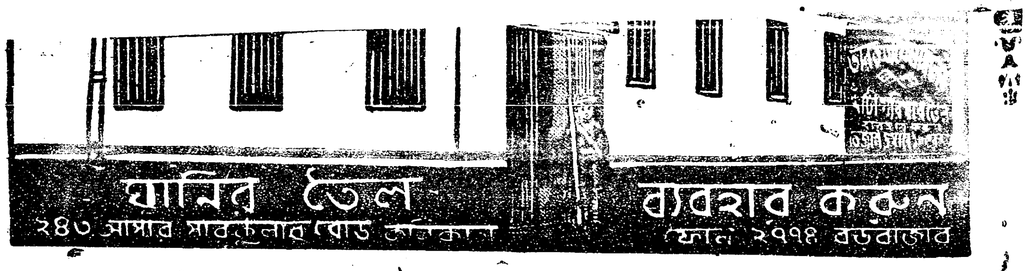

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"

(গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

আট রকম বইএর নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, বাকি বইগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

১। হারান বই—(নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)
২। ঘোর প্যাঁচ—(অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)
৩। রাতের আতঙ্ক—(নীহাররঞ্জন গুপ্ত)
৪। ভূতের মত অদ্ভুত—(বুদ্ধদেব বসু)
৫। কেউটের ছোবল—সুনির্মল বসু
৬। মুখ আর মুখোস—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)
৭। নীল আলো—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেকখানি বারো আনা

"প্রহেলিকা সিরিজ"

(ডিটেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চার

ফাল্গুন মাস—**রক্ততৃষা**—অনলকুমার চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র—**নকলের হিমালয়**—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বৈশাখ—**বি, এল, এ-২০৫**—যোগেশচন্দ্র বসু
জ্যৈষ্ঠ—**জয়-পরাজয়**—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
আষাঢ়—**পূজনীয় দস্যু**—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রাবণ—**দুর্যোগের রাতে**—শ্রীসব্যসাচি

প্রত্যেকখানি দাম এক টাকা

বিরাট সচিত্র গ্রন্থ—১৫৪ পৃষ্ঠা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—(আট আনা হাফটোন

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

এক মাসের মধ্যে বই নিঃশেষ হওয়ায়

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

চমকপ্রদ অন্তর্দ্ধান কাহিনী পরিপূর্ণ মূল্য ১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর * ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি। দাম এক টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

— সপ্তডিঙা —

গত বৎসর **সপ্তডিঙা** তোমাদের কাছ থেকে যে-সমাদর পেয়েছিল ততোটা সমাদর অন্য কোনো বার্ষিকী এ-পর্যন্ত পেয়েছে ব'লে জানিনে। **সপ্তডিঙা**—১৩৫৩ অভিনব ক'রে সাজিয়ে তোমাদের হাতে তুলে দেবার একান্ত বাসনা ছিল। কিন্তু সরকারী ফতোয়া আমাদের কাগজ ব্যবহারের অধিকার এমনই সঙ্কুচিত করেছে যে এবার **সপ্তডিঙা** প্রকাশ করা কোনো মতে সম্ভব হলো না। তোমরা কতোটা আশাহত হলে বুঝতে পারছি। কিন্তু করি কি? আমরা সত্যিই নিরুপায়—এই ভেবে নিশ্চয়ই তোমরা ক্ষুণ্ণ হবে না আমাদের ওপর। ভরসা করি, আগামী বৎসরে তোমাদের এমনই **সপ্তডিঙা** উপহার দিতে পারবো যার জুড়ি এ-যাবৎ তোমরা দেখোনি। সেই আনন্দ-দিনের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকবে না কি?

ইতিমধ্যে **সপ্তডিঙা**র অনেকগুলি অর্ডার আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সকলকে আলাদা ক'রে উত্তর দিতে পারছি না ব'লে আমরা দুঃখিত। এই পত্রিকা মারফৎ আমরা তাঁদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তারই সঙ্গে আমাদের অক্ষমতা জানাতে বাধ্য হচ্ছি।

কিন্তু

একটা সুসংবাদও আছে। আমাদের এক সহযোগী ব্যবসায়ী বিশেষ চেষ্টা ক'রে **ঝিকিমিকি** নাম দিয়ে তোমাদেরই জন্যে এবার এক বার্ষিকী প্রকাশ করছেন। **ঝিকিমিকি** তোমাদের হাতে পৌঁছে দেবার সম্পূর্ণ ভার পড়েছে আমাদের ওপর। **ঝিকিমিকি** সম্পাদনা করছেন অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী। ছাপা হচ্ছে আগা-গোড়া আর্ট পেপারে। শ্রেষ্ঠ লেখকদের প্রায় সবাই লিখেছেন। ছবির ছড়াছড়ি—নাম-করা শিল্পীদেরও অনেকগুলি। ঝকঝকে রঙিন প্লেচ্ছদ। ঘরে রাখা আর উপহার দেবার মতো বই হবে নিশ্চয়। **ঝিকিমিকি** বেরুচ্ছে মহালয়ার ঠিক আগেই। দাম সাড়ে তিন টাকা। এখন থেকেই অর্ডার দিয়ে রাখো, নয়তো আর হয়তো পাওয়া যাবে না।

দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড

২২-১ কর্নওঅলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

— ঘরে রাখা আর উপহার দেওয়া চাইই —

শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনায় এবং
অসংখ্য ছবিতে ভরপুর

ছোটদের পূজা-বার্ষিকী

ঝিকিমিকি

সম্পাদক : বিশ্বপতি চৌধুরী

শ্রেষ্ঠ লেখকদের প্রায় সবাই লিখেছেন
নাম-করা শিল্পীদের ছবি অনেকগুলি
আগাগোড়া মোটা আর্ট পেপারে ছাপা * ঝকঝকে রঙ্গিন মলাট
দাম সাড়ে তিন টাকা

মহালয়ার ঠিক আগেই বেরুবে

এখন থেকে অর্ডার দিয়ে রাখা চাই * পরে হয়তো পাওয়া যাবে না

ঝিকিমিকি হাতে নিয়ে বলতে হবে—
"কি সুন্দর কতো বড়ো বই !"

— তোমাদের জন্যে আর ক'খানি বই —

শিবরাম বাবুর লেখায় ও শৈল বাবুর আঁকায়

উপন্যাস—সবে বেরুলো — মারাত্মক হাসির খোরাক

বাড়ী থেকে পালিয়ে ২৲ — **শিব্রাম চকরবরতির মত কথা বলার বিপদ ১৷৹**

গৌরাঙ্গ বসুর সম্পাদনায় শ্রেষ্ঠ লেখকদের

হাসির গল্পের সঙ্কলন ২৲ — **ডিটেকটিভ গল্পের সঙ্কলন ২৷৷৹**

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অদ্ভুত উপন্যাস—নবতর রূপ

পৃথিবী ছাড়িয়ে ১৷৷৹

দি বুক এম্পারিঅম লিমিটেড * ২২-১, কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

— কয়েকটা দুর্দ্দান্ত বই —

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

১। হত্যা এবং তারপর ১৲ — ২। মোহনপুরের শ্মশান ৷৷৵৹

মণিলাল অধিকারীর — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

রক্তাভ-বুদ্ধ ১৲ — বিদেহী আত্মা ১৷৹

পূজোর আগেই বেরুবে।

সবে বেরুলো ! **বিভীষিকা সিরিজ** পাতায় পাতায় শিহরণ !

১। অদৃশ্য কালো হাত—নীহাররঞ্জন গুপ্ত — ২। দ্বীপান্তরের কয়েদী—অমিয় চক্রবর্ত্তী
৩। রক্ত-পিপাসু— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — ৪। আকাশের ইঙ্গিত—নীলাদ্রিশিখর বসু !

প্রতি বই আট আনা

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
১০৯।এ, লেক রোড, কলিকাতা

এবার পূজায় ছেলেমেয়েদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার

অঞ্জলি

কবিতা
গল্প
উপন্যাস
আমোদ প্রমোদ
খেলাধূলা
রংবেরঙের ছবি

বিরাট ঝকঝকে বই !
ছোটদের আনন্দের খনি !

পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

…দেব সাহিত্য কুটীর * ২২/৫ বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

— ঘরে রাখা আর উপহার দেওয়া চাইই —

শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনায় এবং

অসংখ্য ছবিতে ভরপুর

ছোটদের পূজা-বার্ষিকী

ঝিকিমিকি

সম্পাদক ঃ বিশ্বপতি চৌধুরী

শ্রেষ্ঠ লেখকদের প্রায় সবাই লিখেছেন

নাম-করা শিল্পীদের ছবি অনেকগুলি

আগাগোড়া মোটা আর্ট পেপারে ছাপা * ঝকঝকে রঙ্গিন মলাট

দাম সাড়ে তিন টাকা

মহালয়ার ঠিক আগেই বেরুবে

এখন থেকে অর্ডার দিয়ে রাখা চাই * পরে হয়তো পাওয়া যাবে না

ঝিকিমিকি হাতে নিয়ে বলতে হবে—

"কি সুন্দর কতো বড়ো বই!"

— তোমাদের জন্যে আর ক'খানি বই —

শিবরাম বাবুর লেখায় ও শৈল বাবুর আঁকায়

উপন্যাস—সবে বেরুলো — মারাত্মক হাসির খোরাক

বাড়ী থেকে পালিয়ে ২৲ — **শিব্রাম চকরবরতির মত কথা বলার বিপদ** ১।০

গৌরাঙ্গ বসুর সম্পাদনায় শ্রেষ্ঠ লেখকদের

হাসির গল্পের সঙ্কলন ২৲ — **ডিটেকটিভ গল্পের সঙ্কলন** ২॥০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অদ্ভুত উপন্যাস—নবতর রূপ

পৃথিবী ছাড়িয়ে ১॥০

দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড * ২২-১, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

— কয়েকটা দুর্দ্দান্ত বই —

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

১। **হত্যা এবং তারপর** ১৲ — ২। **মোহনপুরের শ্মশান** ॥৶০

মণিলাল অধিকারীর — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

রক্তাভ-বুদ্ধ ১৲ — **বিদেশী আত্মা** ১।০

পূজোর আগেই বেরুবে।

সবে বেরুলো! **বিভীষিকা সিরিজ** পাতায় পাতায় শিহরণ!

১। অদৃশ্য কালো হাত—নীহাররঞ্জন গুপ্ত — ২। দ্বীপান্তরের কয়েদী—অমিয় চক্রবর্ত্তী

৩। রক্ত-পিপাসু— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — ৪। আকাশের ইঙ্গিত—নীলাদ্রিশিখর বসু!

প্রতি বই আট আনা

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

১০৯।এ, লেক রোড, কলিকাতা

রামধনু—

কী মুশ্‌কিল, দেখ না দিদির কাণ্ড!

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৯শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৫৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাজারের ফর্দ্দ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নীল রঙা চাল এনো, পেশোয়ারী খাম,
এক জোড়া সিঙাপুরী হিং,
তোতাপুরী আনারস, মূলতানী আম,
একতোলা পাকা ইয়ারিং।
মহীশূর বিস্কুট, ব্রিটানিয়া ধূপ,
আন্দামানের সীতাভোগ,
কাশ্মীরী সরভাজা, খাজা অপরূপ—
গোয়াড়ি'র আপেলেই লোভ।
কাবুলের ফল্‌সা ও যশুরে আঙুর,
আমেদাবাদের আঁশ ফল,
কম্বাটুরের আতা অতি সুমধুর,
আর কি অধিক চাস্ বল্?

লক্ষ্ণৌ বৈঁচি, ও বেরিলী কেশুর,
কটকের খেঁড়ো মনোহর,
লঙ্কার সর্দ্দা ও জাভা চানাচুর
এনো তুমি যত হোক দর।
ভাল করে জেনে নিয়ো, চারি দিকে ঠক্—
ঠ'কো নাকো পাড়াগেঁয়ে লোক,
এ সব জিনিষ কেনে মিটাইতে সখ,
চারি দিকে রাখা চাই চোখ।
বাজারে না পাও যদি কি করিবে ভাই,
আমদানী নহে ত' প্রচুর,
বুঝিবে এ সব তব কপালেতে নাই—
কিনে এনো মুড়ি আর গুড়।

প্রাণকেষ্টর মোটর শিক্ষা

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

প্রাণকেষ্টর ধারণা তার শিক্ষার-বয়স এখনো পেরোয় নি। এখনো সে চেষ্টা করলে কিছু শিখতে পারে। কিন্তু কী শিখবে?

অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলো মোটর চালানো শিখবে সে।

এক মোটর-শিক্ষালয়ের ঠিকানা প্রাণকেষ্টর জানা ছিল। সখের খাতিরে বা পেশার জন্য কেউ মোটর চালানো শিখতে চাইলে সেখানে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তার সুব্যবস্থা আছে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পাঠে এ কথা সে জেনেছিল। সেইখানেই সে গেল।

শিক্ষালয়টা একটা মেরামতি কারখানা মাত্র, প্রাণকেষ্ট দেখল। কয়েকখানা মোটর গাড়ী নিয়ে মিস্ত্রি-মজুর জন কয়েক উঠে পড়ে লেগেছে। আস্ত মোটরকে ভাঙছে, আর ভাঙা মোটরকে যুড়ছে। একখানাকে তিনখানা আর তিনখানাকে একখানা করা—এই তাদের কাজ ব'লে তার মনে হোলো। মোটরদের তারা দস্তুরমত শিক্ষা দিচ্ছে—হয়ত বা বলা গেলেও, তাদের কাউকে বিজ্ঞাপন-কথিত উক্ত উপযুক্ত শিক্ষক ব'লে প্রাণকেষ্টর বোধ হোলো না।

কারখানার একদিকে আপিস ঘরের মত একটুখানি ছিল। টেবিল চেয়ার জমানো জায়গাটা। প্রাণকেষ্ট সেইখানে গিয়ে খোঁজ নিল।

আরেকটি যুবক ছিল সেখানে—বেশ সভ্য ভব্য স্মার্ট। তাকেই শিক্ষক ব'লে সন্দেহ ক'রে এগিয়ে গেল প্রাণকেষ্ট।

—আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না। আপনিই কি মোটর-শিক্ষক? জিজ্ঞেস করল ও।

—আজ্ঞে না। আমি শিখতে এসেছি।

এই সময়ে বৃহদাকার এক ভদ্রলোক সেখানে ঢুকলেন—দিব্যি অমায়িক চেহারার।

—কে যেন মোটর শিক্ষকের কথা বলছিল শুনলাম যেন! বল্লেন সেই আগন্তুক।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমি। প্রাণকেষ্ট জবাব দিল।

—আমার ড্রাইভারটা প্রায়ই কামাই করে। মাঝে কোথায় যে পালিয়ে যায় জানি না। দেখছি না চালাতে শিখলে আর চলে না। যুবকটি জানাল।

—ও, আসলে একজন শিক্ষার্থী তা হলে? ভদ্রলোক বল্লেন।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

এইবার সেই বিপুল-বপু লোকটি প্রাণকেষ্টর দিকে ফিরলেন।—এই শিক্ষার্থীটি ততক্ষণ বসুন, ইতি আমরা একটু মোটরে ক'রে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? জিজ্ঞেস করলেন তিনি প্রাণকেষ্টকে।

এই অতিকায় ভদ্রলোক, ডাঃ প্রতুলচন্দ্রের অ ভদ্রতার কথা সে অঞ্চলে কারো অবিদিত ছিল না। অমায়িকতায় রুগীরা যেমন মুগ্ধ ছিল, তাঁর বৌ ছে তিত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার কারণ আর না, তাঁর এই ভাব-বাচ্যের কথোপকথন।

রুগী এবং স্বীয় পত্নীর প্রতি (তিনি রুগী না হ তিনি অভিন্ন ব্যবহার করতেন।

সকালে উঠেই প্রথম কথা তাঁর ছিল—একবার তো দেখতে হয়।

বৌ জিভ বার করতে একটু দেরি করলে তাঁর দ্বিতীয় ভাগ শোনা গেছে—জিভটা আমাদের এ দেখানো দরকার। লজ্জা কি দেখাতে?

তারপর জিভ-টিভ দেখে, নাড়ি-টাড়ি টিপে বলেছেন—আজকে আমরা বেশ ভালোই আছি হচ্ছে। তবু একটু সিরপ অফ্ ফিগ্স্ খেয়ে রাখা ভা দু'চামচ মাত্রায় সম পরিমাণ জলের সঙ্গে খাব আর কেমন? পেট পরিষ্কার রাখলে কখনো আমাদের অসুখ করবে না। (বলা দরকার, এই সিরপ তিনি কখনো খেতেন না।)

পত্নীর অরুচি হলেও, রুগীরা ডাক্তারের এই আত্মীয়তা ই করতো। পাছে এ হেন পরমাত্মীয় চিকিৎসককে রাখতে হয় এই ভয়ে, শোনা যায়, তারা আপেল ছুঁত না পর্য্যন্ত। (আপেল ফলের ডাক্তার-নো অসামান্য খ্যাতির কথা তাদের অজানা ছিল

রুগী অন্তিম দশায় পৌঁছনোর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁর এই য়ভাব অটুট থাকতে দেখা যেত। কেবল সেই চরম রুগীর আসন্ন তিরোভাবের আগেই তিনি ভাববাচ্য উত্তম পুরুষের বহু বচন পরিত্যাগ ক'রে অধম র এক বচনে নেমে আসতেন। 'আমরা ভালো উঠব, সেরে উঠব, ভয় কি?' যে-তিনি এই কথাই র ভিজিটে ব'লে গেছেন, সেই তিনিই, কেন বলা 'আমাদের আর বাঁচানো গেল না' এ কথা না 'ওকে আর বাঁচাতে পারলুম না। অক্কাই পেল এই কথাই ব'লে ফেলেছেন।

কের কথা শুনে প্রতুলচন্দ্রের মনে হোলো. তাঁর রেরও তো প্রায় সেই ব্যারাম. পালিয়ে যাওয়া ঠিক না হলেও, ব্যারাম হলেই সে পালিয়ে যায়। ক্তারি চিকিৎসার ভয় ততটা তার নয় যতটা বুঝি ক্তারি আত্মীয়তার—আর সে যখন বাড়ীর বৌ নয়, তার পালাতে বাধা কি?

ই যেমন আজকে আর তার টিকি দেখা যাচ্ছে না। চন্দ্র মনে করলেন, ঐ যুবকের অনুকরণীয় আদর্শ ণ ক'রে তাঁর নিজেরও মোটর-চালনাটা রপ্ত ক'রে া মন্দ হয় না। এবং শিক্ষককেও যখন এত সহজে, মাত্রই, হাতের নাগালে পাওয়া গেছে তখন এ ছাড়া কেন?

একটু মোটর চালানো তা হ'লে শেখা যাক্। ? প্রাণকেষ্টকে তিনি বলেছেন।—মোটর টা আমাদের প্রত্যেকেরই শিখে রাখা দরকার—ক কাজে লাগে! তাই নয় কি?

সে কথা ঠিক। বলেছে প্রাণকেষ্ট।

ঃ প্রতুলচন্দ্র এবং তাঁর ভাববাচ্যের সঙ্গে সম্যক্ ম না থাকায় তাকেই সে মোটর শিকক বলে' ভ্রম করেছে বলাই বাহুল্য। কিন্তু ডাক্তার যে তাকেই শিক্ষক বলে' ঠাউরেছেন, এ তথ্য সে ধরতে পারে নি।

তাদের কাছাকাছি প্রকাণ্ড একটা সালুন গাড়ী তখনো অটুট অবস্থায় ছিল—তখন পর্য্যন্ত মিস্ত্রি-মজুররা কেউ তার পেছনে লাগে নি।

—এইখানাই বার করা যাক্—কেমন? ডাঃ প্রতুল-চন্দ্র প্রস্তাব করেছেন।—ক্ষতি কি?

গাড়ীর ভেতরে কে কোন্ স্থান অধিকার করবে, তাই নিয়ে দু'জনেই একটুক্ষণ ইতস্ততঃ করেছেন। প্রাণকেষ্ট জিজ্ঞেস করেছে—আপনি তা হ'লে চালকের আসনে বসুন।

—না, না। আমি কেন? জবাব দিয়েছেন প্রতুলচন্দ্র —কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হ'য়েই, বলতে কি!

—আমিই চালাবো তা হলে? প্রাণকেষ্ট বলেছে: বেশ। আপনি আমার পাশে থাকচেন তো?

—তা, পাশাপাশি বসতে আপত্তি কি আমাদের? প্রতুলচন্দ্রের তাড়া দেখা গেছে এবার—চট্ করে' বেরিয়ে পড়া যাক তা হলে বাজে সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি?

—কোন্ দিকে যাবো? ড্রাইভারের আসনে বসে প্রশ্ন করেছে প্রাণকেষ্ট।

—রাস্তায় তো বেরুনো যাক্ আগে। তারপর হাওড়া ব্রিজ হয়ে—

—য়্যাঁ? একেবারে হাওড়া পর্য্যন্ত?

—নিশ্চয়। বলেছেন প্রতুলচন্দ্র: এমন কি তারও ওধারে—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে' যদ্দূর যাওয়া যায়। চালাতে শেখার সাথে সাথে যদি একটু হাওয়া খাওয়া যায় মন্দ কি?

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতেই ইঞ্জিনের পত্রপাঠ প্রত্যুত্তর পেয়ে প্রাণকেষ্ট চমৎকৃত—এ রকম গাড়ী এর আগে সে পা-য় নি। হাতায়নিও এর আগে।

ছুটে বেঁ করে বেরিয়ে গেছে গাড়ীটা। এত বড় গাড়ী, যার বনেট্টাই এতখানি, করায়ত্ত করা প্রাণকেষ্টর এই প্রথম। কিন্তু তা হলেও, একজন ওস্তাদ্ শিখিয়ের পাশে বসে' চালানোয় তার ভয় কি?

—বাঃ, দিব্যি ফাঁকা রাস্তা! আরো একটু জোরে চালানো যায় না?

TIGHT BINDING

—কত জোরে চালাতে আপনি বল্‌ছেন ?

—যত জোরে চালানো যেতে পারে।

অদ্ভুত গাড়ী! য়্যাক্‌সিলারেটরে পা ছোঁয়াতেই গাড়ীটা তীর বেগে ছুটেছে। একটা ঘোড়ার ল্যাজ ঘেঁষে চলে গেছে উল্কার মত।

—চমৎকার! চমৎকার চালানো! এক চুলের জন্যই বেঁচে গেছে ঘোড়াটা। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন ডাক্তার।

এই কৃতিত্ব সত্যিই ওর চালনা নৈপুণ্য কিনা, প্রাণকেষ্ট ভেবেছে। ভেবে একটু অবাক্ হয়েছে নিজেই।

—আবার কি ঐ রকম একটা কিছু করা যায় না ?

—তা—চেষ্টা করলে—বোধ হয়—

—আমাদের সাম্‌নে ঐ—ঐ যে রেসিং কার চলেছে দেখা যাচ্ছে—ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়েরা চেপে স্ফূর্ত্তি ক'রে চলেছে—ওর একেবারে ধার দিয়ে—প্রায় দাড়ি কামানো গোছ চেঁছে দিয়ে যাওয়া যায় না? পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব জোরসে হর্ণ বাজিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

প্রাণকেষ্ট সন্ত্রস্ত চোখে সঙ্গীর দিকে তাকালো। সঙ্গীন্ পরীক্ষাই এ যে!

কিন্তু নাচতে নেমে ঘোম্‌টা রাখা যায় না। শিক্ষা লাভ করতে এসে পরীক্ষার কালে প্রশ্নপত্রকে ফাঁকি দেয়া চলে না।

রেসিং-কারের দাড়ি চেঁছে যাবার সময় তার মনে হোলো, গাড়িটা যেন শিস্ দিয়ে চলেছে—সেই সঙ্গে হর্ণের এমন কান ফাটানো আওয়াজ! আর সঙ্গে সঙ্গে ও-গাড়ীর হল্লাকারীদের কী বিচ্ছিরি চাৎকার! বাতাসে আর্ত্তনাদটা গপ্ করে গিলে ফেল্ল তাই রক্ষে; নইলে প্রাণকেষ্টর কান গেছল।

—তোফা! উল্লসিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার। আচ্ছা, কত তাড়াতাড়ি তুমি মোড় ঘোরাতে পারো? স্পীড একদম্ না কমিয়ে মোড় নিতে পারো না?—অস্বাভাবিক উৎসাহে এমন কি তিনি স্বাভাবিক ভাববাচ্য পর্য্যন্ত ভুলে গেলেন। প্রাণকেষ্টর মৃত্যু আসন্ন জেনেই কিনা কে জানে!

—বল্‌তে পারব না ঠিক—জবাব দিল প্রাণকেষ্ট। —কখনো চেষ্টা করি নি।

আচ্ছা, সামনের বাঁকটায় ঘোরো তো দেখি তাড়াতাড়ি পারা যায়।

প্রাণকেষ্টর হাত কাঁপতে থাকে ষ্টিয়ারিং ওপর। শিক্ষালাভ করতে হলে প্রাণপণ করা এমন কি প্রাণ দিয়ে শিক্ষা পাওয়াটাই আসল —প্রাণকেষ্টর তা অজানা নয়। 'রক্ত দিয়ে কী —প্রাণ দিয়ে কী শিখিব—কী করিব কাজ?' রবীন্দ্র কবিতার এই কলিও তার মনে পড়ে। কিন্তু হাত কাঁপে।

—তবে তাই হোক্। তথাস্তু! মনে মনে এই কথা ব'লে প্রাণকেষ্ট মরিয়া হয়ে পড়ে। মুখের পথিকরা, গ্রহের চক্রান্তে সেই দণ্ডে যারা মরবার মুখে ছিল, চীৎকার ক'রে ওঠে; গাড়ীটা ধারের দুটো চাকা স্বর্গের দিকে তুলে দেয়। কিন্তু আত্মসম্বরণ ক'রে ভূমিষ্ঠ হয়ে নিজেকে সোজা ক'রে সে দেরি করে না।

এবার গাড়ীটা মোড়ের পাহারোলার ল্যাম্প গেছল। ধনুষ্টঙ্কারের মত বেঁকে আত্মরক্ষা ক'রে নিজেকে সোজা করে নিয়েছে।

অদ্ভুত অদ্ভুত!—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার। বিলেতে যে সব মোটরের রেস হয়, তাতে তোমায় দেয়া উচিত।

—আপনি—আপনি কি সত্যি বল্‌ছেন? আমি কিন্তু কখনো সে কথা ভাবি নি। নিজেকে অভাবিত জ্ঞান করে।

আচ্ছা, এই যে সব গাড়ীঘোড়া যাচ্ছে, ডাইনে বাঁয়ে রেখে, এঁকে বেঁকে—যেমন ক'রে ফুটবল কেয়ারি নিয়ে যায়, তেম্‌নি ক'রে এদের ভেতর দিয়ে নিয়ে পারো না তুমি?

— আপনি কি মনে করেন? পারব কি?

—তুমি সব পারো। ডাক্তার হাসতে আমার মনে হয়, তোমার অসাধ্য কিছু নেই!

অকস্মাৎ প্রাণকেষ্টরও মনে হয়, সে সব এতক্ষণ তাদের গাড়ী বড় রাস্তা দিয়ে ছুটছিল বটে, এবার আরো চওড়া রাস্তায় চড়াও হোলো। চারি গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, লরীর ছড়াছড়ি; ট্রাম

ছিল। প্রতুল ডাক্তার প্রাণকেষ্টর কানে কানে কী বলেন। কানাকানি করবার মতই কথা বটে! এক জন্য প্রাণকেষ্ট ভয়ে জমে যেন জড় পদার্থ হয়ে । তারপর বল, কোন্ ধার দিয়ে যাব? যে ট্রাম তার ডান ধার দিয়ে, না কি, যে ট্রাম আসছে

কেন? যা বল্লাম! দু'টো ট্রামের মধ্যিখান দিয়ে সাম্‌না-সাম্‌নি এসে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যাও।

প্রাণকেষ্ট ঠিক অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারে না।—কি ?

—আহা! এ ট্রামটা যাবে আর ও ট্রামটা আসবে—মুখোমুখি এসে পড়বার মুখে তাদের মাঝখান দিয়ে র গুলির মত সোঁ ক'রে গাড়ীটাকে নিয়ে বেরিয়ে হবে। সিকি সেকেণ্ডের এদিক্ ওদিক্ হ'লে দু টো মাঝখানে পড়ে পিষে চ্যাপ্‌টা চকোলেট্ হয়ে যাব । এবার বুঝেচ?

প্রাণকেষ্ট ঢোঁক গিল্‌ল চরম পরীক্ষার জন্য তৈরি ক বাঁধল সে। আশ-পাশের ট্রামের ঘর্ঘর-ধ্বনি রলগাড়ীর শব্দের মত মনে হতে লাগ্‌ল তার। তার র সামনে সব আব্‌ছা ব'লে ধারণা হতে লাগল। ওস্তাদ্‌জী যদি অন্ততঃ তাঁর একটা হাতও ষ্টিয়ারিং র ওপর রাখতেন, তা হলে সে যেন শান্তি পেত—হ'ত একটু। কিন্তু না, তিনি তা রাখতে প্রস্তুত অগত্যা প্রাণকেষ্টকে স্বহস্তেই সুকঠিন পরীক্ষায় হতে হবে। দু' ধারের ট্রামের আওয়াজ যেন বজ্র-ব'লে তার মনে হতে থাকে—মুহূর্ত্তের জন্যই। তার ঝিম্ ঝিম্ করে। সে চোখ বোজে।

শেষে চোখ খুলে—পার হয়েছি? হতে পেরেছি? াই প্রথম সে জিজ্ঞেস করে।

ক্তার বলেন—সাবাস্!

তক্ষণে তারা হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পড়েছে। এর পর কি করব? জিজ্ঞেস করে ষ্ট।

কিছু না। ঝড়ের বেগে চালিয়ে যাও। হুকুম

চল্লিশ—পঞ্চাশ—ষাট—সত্তর! গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের বেগে গাড়ী চলেছে—স্পীডো-মীটারে সত্তর মাইলের নিশানা।

—এ রকম একজন পাকা ড্রাইভারের পাশে বসে যাবার সৌভাগ্য জীবনে একবারই হয়। ডাক্তার না ব'লে পারেন না।

— আপনি সত্যি বলছেন? প্রাণকেষ্ট গদ্‌গদ হয়ে পড়ে।

—তোমার ব্রেকের খবর কি? ব্রেক ঠিক আছে তো?

—এখনো পরীক্ষা ক'রে দেখা হয় নি।

আমি ভাবছিলাম কি—এই স্পীডের মাথায় যদি হঠাৎ তোমায় গাড়ী থামাতে হয়—সামনে কোনো বিপদ্ বা দুর্ঘটনা এসে পড়ে—তা হলে কি করবে?

প্রাণকেষ্টর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। কথাটা ভাববার মতো বই কি! তার শিরদাঁড়া দিয়ে যেন বরফের স্রোত ওঠা নামা করতে থাকে।

—তা হলে কি করতে বলেন? ক্ষীণকণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করে।—সে রকম অবস্থায় কি করব?

—মনে হচ্ছে অদূরে যেন রাস্তাটা ব্লক্ ক'রে দিয়েছে—একটা লরী লম্বালম্বি খাড়া ক'রে রাস্তাটা যেন আট্‌কে দেয়া হয়েছে মনে হচ্ছে। গাড়ীটা থামাও তো এবার।

ডাক্তারের ধারণাই ঠিক। দেখতে দেখতে সেই লরীর বেড়া সামনে এসে পড়েছে; আর প্রাণকেষ্টও প্রাণপণে ব্রেক্ টিপেছে। চার চাকাতেই ব্রেক্ এঁটে গিয়ে হঠাৎ বিশ্রী এক কেকাধ্বনি—এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা গাড়ীটাই কয়েক হাত লাফিয়ে উঠেছে আকাশে।

— যাক্, বাঁচা গেল। বলেছেন ডাক্তার।

—আপনি য়া বলেন! আমার কিন্তু বাঁচনের আশা একদম্ ছিল না। প্রাণকেষ্টও হাঁফ্ ছেড়েছে।

ঠিক পাশেই ছিল ওতোরপাড়ার থানা। সেখান থেকে দারোগা, পাহারোলা বেরিয়ে এসেছে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে সন্দেহজনক এক মোটর গাড়ীর মারাত্মক গতিবিধির খবর একটু আগেই টেলিফোনে তাঁরা পেয়েছিলেন। রাস্তা আটকেছিলেন তাঁরাই।

থানার দারোগা এসে প্রাণকেষ্টকে পাকড়ালেন—লাইসেন্স দেখাও।

—আমি তো সবে চালাতে শিখছি। লাইসেন্স কোথায় পাবো! প্রাণকেষ্ট বলেছে: উনিই তো মাষ্টার। উনিই আমায় শেখাচ্ছেন।

—আমি মাষ্টার! তার মানে? তুমিই তো আমার মাষ্টার হে! প্রতুলচন্দ্র অত্যন্ত প্রতিবাদ করেছেন। খুব শেখালে যা হোক্!

—তার মানে? দারোগা এবার প্রতুল বাবুকে নিয়ে পড়েছেন।—আপনার লাইসেন্স দেখান তো?

—আমার তো মেডিক্যাল লাইসেন্স—তার সঙ্গে গাড়ী চালানো কি? ডাক্তার প্রতুলচন্দ্র আকাশ থেকে আছাড় খান: এবং তাও তো আমার সঙ্গে নেই। আমার রেজিষ্টার্ড নম্বর বলতে পারি। তাতে কিছু সুবিধে হবে?'

—কোথ্থেকে আস্ছেন আপনারা?

—ভবানীপুরের এক মোটর গ্যারেজ থেকে।

—কতক্ষণ আগে রওনা হয়েছেন?

প্রতুলচন্দ্র ঘড়ি দেখে কাঁটায় কাঁটায় ব'লে দেব সাড়ে চার মিনিট আগে।

ভবানীপুর থেকে ওতোরপাড়া সাড়ে চার এসেছেন—ঘণ্টায় কত মাইল বেগে এসেছেন; আপ খেয়াল আছে? এই রেষ্ট্রিক্টেড্ এরিয়ায় এ আইনী গাড়ী চালানোর জন্য আপনাদের আমরা করব—

এমন সময় একটি যুবক দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্তে লাগল—

—এই যে—ডাক্তার রায়! কি ভাগ্যিস্, আপনি পড়েছেন!—এত তাড়াতাড়ি আপনি আসতে পা আমরা ভাব্তে পারি নি। আপনাকে ফোন্ ক পর থেকে এই ক' মিনিট যে কি ক'রে আমাদের কা মুখুজ্যে মশায়ের হার্ট ট্রাব্লটা হঠাৎ বড্ড বেড়ে উ —প্রায় যায় যায় অবস্থা। আসুন তাড়াতাড়ি। পাশের দু'খানা বাড়ী বাদ দিয়ে ঐ বাড়ীটা আমাদে

নবীন ছাত্র

শ্রীসুবোধ বসু

বেবীর ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়াটাই এক বিরাট চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। একবার সে ভর্ত্তি হ'তে রাজি হয়, আবার পরের মুহূর্ত্তে সে বেঁকে বসে। ঘড়ি ঘড়ি তার মত বদ্লায়। ইস্কুলে ভর্ত্তি হবার জন্য তার লোভ নেই এমন নয়। তাদের বাড়ির সাম্নে দিয়ে তারই মতো ছোট ছোট ছেলেদের' বই-খাতা হাতে নিয়ে বা বগলে চেপে যখন ইস্কুলে যেতে দেখে, তখন তার কাছেও ইস্কুলে গিয়ে পড়তে পারা খুবই আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। কত ছেলের সাথে ভাব হবে, কত রকম খেলা করতে পারবে, যতই সে কল্পনা করে ততই বাড়িতে পড়াটা তার কাছে নীরস ও গদ্যময় মনে হতে থাকে। এই উৎসাহেই সে ইস্কুলে ভর্ত্তি হতে রাজি হয়েছে। কিন্তু এই মতে স্থির হতে পারছে না। যতই মাষ্টার মশাই, বেত, ঝগড়াটে ছেলে ও ঘরের কাছ থেকে সারা দুপুর দূরে থাকার কথা সে ভেবে দেখল, ততই সে ঘাব্ড়ে গেল। ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, সন্ধ্যা বেলায় সে যদি বলে রাতে ঘুমিয়ে উঠে ভোর বেলায় সে ব'লে বসবে 'না'।

বাড়িতে ঠাট্টা, মস্করা শুরু হয়ে গেল. বেবীর যাওয়া নিয়ে। বাবা হাসছেন, মা হাসছেন, ছোট খুকী পাকা গিন্নীর মতো ফোড়ন কাটছে। বেবীর বিপন্ন হয়ে ওঠবার উপক্রম হ'ল। কিন্তু স্কুলে হওয়ার আবশ্যকতা যতই বেড়ে গেল, ততই নানা কাল্পনিক আতঙ্কে তার মন পূর্ণ হ'ল। যদি ডান্পিটে ছেলে তাকে ধ'রে কিলোয় তবে নি অবস্থায় তার কি উপায় হবে? যদি মাষ্টার মশায় শুধু রেগে উঠে পিঠের উপর বেপরোয়া বেত তবে কি হবে? যদি তেষ্টা পায়, তবে কাকে ব পেন্সিল ভেঙে যায়, কে কেটে দেবে? যদি বাড়ি আসার দরকার হয়, কার সাথে আসবে? মশায়রা বেশি রাগারাগি করলে তাকে পালিয়েই

কিন্তু দুপুর বেলায় ছেলে ধরা ভরা রাস্তা দিয়ে কলাটি যাবেই বা কি করে? এই রকম নানা তার আট বছরের মাথাটায় টগবগ করতে লাগল। ক্ষণে সে আতঙ্কে তটস্থ ও সমস্যার মধ্যে দিশেহারা মনে উঠতে লাগল: 'উরে বাবাঃ!'

ই রকম সঙ্কটজনক অবস্থায় বেবীর বাহন বাড়ীর রা চাকর হীরু তার বাচ্চা মনিবকে একটা অমূল্য শ দিলে। হীরু বয়সে তার মনিবের চেয়ে বছর চেকের বড়। ক্ষুদ্র মনিবের প্রবল কর্তৃত্ব, কিছু গড় ও বিভিন্ন মর্জ্জি তাকে সহ্য করতে হলেও সে প্রধান পরামর্শদাতা, খেলার সঙ্গী এবং লজেঞ্চুষের ার। সে বল্লে, 'এক কাজ কর না, বেবী! কও সঙ্গে ক'রে ইস্কুলে নিয়ে যাও। রোজ তুমি যাবে, আমিও সঙ্গে যাব; চুপটি ক'রে পেছন দিকে থাকব, মেটে গোল করব না। আবার তোমাকে ফিরে আসব। কোনই ভাবনা থাকবে না।'

বেবী চোখ তুলে চাইলে। প্রস্তাবটা মন্দ নয় তো! সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে প্রায় সবগুলি সমস্যারই ন হয়ে যায়; আতঙ্কের আর বিশেষ কোনও থাকে না। ইস্কুলের আবহাওয়া গরম মনে হ'লেই ত তার সাথে সট্কে পড়া যাবে।

'ছোট্ বোকারাম,' বেবী বল্লে, 'তোকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে ছেলেরা আমাকে বুঝি ঠাট্টা করবে মাষ্টার মশায়রা পর্য্যন্ত আমাকে বকে দেবেন। দূর্, বুঝি পারা যায়?'

হীরু বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বললে, 'তা আর না কেনে? আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি অন্যেরা না পেলেই হ'ল্। ইস্কুলের একটু আগে তুমি আগে হেঁটে যেও, আমি চুপে চুপে গিয়ে কেলাসের মধ্যে বসে পড়ব···'

'আর যখন মাষ্টার মশাই পড়া জিজ্ঞেস করবেন?' প্রশ্ন করলে।

'আমি কিছুই বলব না।' হীরু বললে।

'আর যখন বেত খাবি?'

'খাই তো হবে।' হীরু সহাস্যে বললে। 'মাষ্টার যতই পিটুবেন, ততই বেশি জব্দ হতে থাকবেন। ওঁরা টেরই পাবেন না যে ভুল লোককে শেখাবার জন্য মেহন্নত করে সারা হচ্ছেন। তুমি ভেবো নি বেবী। দু' দশট বেতে আমার কিচ্ছু হবে না। খুব রগড় হবে।'

'মা টের পেলে রগড় বের ক'রে দেবে এখন।' বেবী বোদ্ধার মতো বললে।

'আরে দূর, তুমি জানি কেগন।' হীরু প্রতিবাদের সঙ্গে বললে, 'এ কথ মাকে বলতে যাবে কেনে? শুধু বলবে, হীরু আমার সঙ্গে ইস্কুলে গিয়ে বসে থাকবে, তবে আমি ইস্কুলে যাব। ব্যস্ আর কিছু নয়। বাকিটা মাত্র তুমি আর আমি জানব আর কাকপক্ষীতে জানবে না।···

বিদ্যাবিনোদ হাই স্কুলের ক্লাস থ্রি—সি সেক্সনের শেষ বেঞ্চে যে ছেলেটা বসে বসে দারুণ মনোযোগের সঙ্গে মাষ্টার মশায়দের পড়া শোনে, তাকে একটি আদর্শ ছাত্রই বলা চলে। এমন ঠাণ্ডা, বিনীত, বাধ্য ছেলে সচরাচর দেখা যায় না। এক জায়গায় এসে বসে থাকে, সামান্য নড়াচড়া পর্য্যন্ত করে না। দুষ্টুমি করা তো দূরের কথা, একটা কথা পর্য্যন্ত সে উচ্চারণ করে না। ক্লাসের ছেলেরা তাকে দলে টানতে চেষ্টা করেছে, উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেছে, ঠাট্টা করেছে, ব্যঙ্গ করেছে, নানা যন্ত্রণা দিয়েছে, কিন্তু সে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। হতাশ হয়ে তারা ছাড়ান দিয়েছে।

অনেক দিন পর্য্যন্ত মাষ্টার মশায়রা তাকে লক্ষ্যই করলেন না। চুপটি ক'রে সে ভিড়ের মধ্যে বসে থাকে; নড়াচড়া, গোলমাল বা দুষ্টুমি ক'রে মাষ্টার মশায়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। বরঞ্চ এমন মনোযোগের সঙ্গে পড়া শোনে যে, যেই তাকে লক্ষ্য করবে সেই তার পড়ার প্রতি আগ্রহ দেখে খুসি হবে।

কিন্তু মাষ্টার মশায়দের দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে কত দিন থাকা যায়? ক্রমে দু'এক জন ভিড়ের মধ্য থেকে তাকে খুঁজে বের ক'রে তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সুরু করলেন। ফলে বেচারীকে দাঁড়ান, বেঞ্চের উপর দাঁড়ান থেকে সুরু ক'রে হাতে এবং পিঠে বেতের স্বাদ গ্রহণ পর্য্যন্ত করতে হচ্ছে।

বেবী বল্লে, 'হীরু, তুই একটা আস্ত বোকা। দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে মার খাস্ কেন? জবাব দিলেই পারিস। এক্ষুণি যা বলে দিলে, তাও বলতে পারবি না!'

'বাঃ রে, তা পারব না কেনে? সব পারি।' হীরু বল্লে। 'কিন্তু মাইনে দিই নে যে! মাইনে না দিয়ে ফাঁকি দিয়ে জবাব দেয়?'

'দিনি না কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবি?' বেবী হতাশ হয়ে বল্লে। 'এমন বোকা তুই! বাড়ির মাষ্টার মশায় যখন আমাকে পড়ান, তখন কাছে বসে থাকলেই পারিস! তা হ'লে তো তোর পড়া তৈরি হয়েই থাকে।'

'কিন্তু তখন আমার কাজ আছে যে',—হীরু প্রতিবাদের সুরে বল্লে। 'বাবুর জুতো বুরুশ করতে হয়, তোমার আর খুকুর জামা কেচে দিতে হয়, সাবান দিয়ে প্লেট পরিষ্কার করতে হয়, টেবিল চেয়ার ঝাড় পোঁচ করতে হয়...'

'তবে আমার কাছ থেকেই পড়ে একটু একটু শিখে নিস, বুঝলি?' বেবী বিজ্ঞের মতো বল্ল। 'কিন্তু টাস্ক্ করবি কি ক'রে? লিখতেই পারিস নে যে! বুঝেছিস, বিকেলে আমার কাছ থেকে লেখা শিখতে আরম্ভ কর। আর যদ্দিন তা না শিখছিস আমিই বাঁ হাত দিয়ে তোর টাস্ক্ লিখে দেব, বুঝলি? অমন ক'রে ক্লাসে গাল খেলে চলবে না।'

'তবে তাই হবে।' হীরু রাজি হয়ে বল্লে।

এর পর থেকে লাষ্ট বেঞ্চের নিরীহ ছেলেটির মধ্যে মাষ্টার মশায়েরা আশ্চর্য্য উন্নতি লক্ষ্য করলেন। ক্লাসে পড়া বলে দেওয়ার পর সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে ময়লা শার্ট পরা বোকা বড় ছেলেটা আর হাঁদার মতো মুখ নিচু ক'রে চুপ ক'রে থাকে না; চট্‌পট্ জবাব দিয়ে দেয়। হোম্ টাস্ক্ আনাও সে সুরু করেছে, যদিও তার হাতের লেখা এমন খারাপ যে, তার পাঠোদ্ধার করাই মুস্কিল। থার্ড মাষ্টার অনুকূল বাবু তো একদিন ঠাট্টা কুরে বল্লেন, 'ওরে, তুই এ লেখা কোথায় মক্স করলি? হাত দিয়ে লিখিস না পা দিয়ে লিখিস, ঠিক ক'রে বল তো?' ছেলেরা হেসে লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু তারা মোটেই টের পেল না, রগড়টা তাদের উপরই চালান হচ্ছে। বেবীর হাতের লেখা এর চেয়ে আর কত ভালো হবে!

একদিন হীরু ধরা পড়ে গেল। ইতিহাসের মাষ্টার মশায় রামায়ণের থেকে গল্প বলে যে তা দু'পাঁচ লাইনে লিখতে বললেন। ছেলেরা পেন্সিল টেনে মহা উৎসাহে সুরু করেছে। দশ মিনিটের মধ্যে খাতা দিতে হবে ব'লে মাষ্টার মশায় এক কাগজে নজর দিয়েছিলেন, একবার চোখ উঁচিয়ে হেসে উঠলেন, 'এই পিছনের বেঞ্চের ছেলেরা কি করছিস? চুপ ক'রে বসে আছিস কেন? লেখা গেছে?'

'আজ্ঞে স্যার! আমার পেন্সিল নেই স্যার!' কাঁচুমাচু হয়ে বল্লে।

'নেই কেন?' মাষ্টার মশায় ধমকে উঠ 'ইস্কুলে কি হাওয়া খেতে আসা হয়? পেন্সিল ত্যাঁদোড়ের হাঁড়ি কোথাকার! কেবল ফাঁকি দিতে নে, নিয়ে যা এই কলম আর কালি। পাঁচ মি মধ্যে লিখে আনতে হবে।'

অনিচ্ছুক ভাবে নিরুপায় হীরু কালি-কলম নিয়ে মাত্র সে অ আ ক খ শেষ করেছে; আ-কার ই-কা সুরু হয়েছে। যুক্তাক্ষর এখনও বহুদূর। এমন ক্লাসে সর্ব্বসমক্ষে রামায়ণের গল্পটা সে ভাষায় প্রকাশ কি করে! কিন্তু উপায় কি? কালিতে কলম সে কাগজে আঁচড় কাটতে লাগল। খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছে; অন্যদের খাতা দেখতে সময় কেটে গেলে রেহাই পাবে, একমাত্র ভরসা এই। এমন সময় খাতা এক পাশে সরিয়ে রেখে মাষ্টার মশায় সো হীরুর কাছেই হাজির হলেন। হীরু চমকে উ কিন্তু তখন আর খাতা লুকাবারও সময় নেই। মশায় ক্ষণকাল ঝুঁকে দেখে বল্লেন, 'এ কি! সর্ব্বনাশ! বর্ণ পরিচয়ও হয় নি? বলিস কি? থ্রিতে পড়ছিস! এ কি কাণ্ড!—মনথরর পরমসে অই রমচন্দরকে বনবশ দীবার চকরনত কড়ল... হরে কর কম্বা, একেবারে ববর চরণ নমস করণ-চল্, একবার হেড্ মাষ্টার মশায়কে দেখিয়ে আনি—'

হীরুর কাহিনী শুনে হেড্ মাষ্টার মশায় কতক্ষণ করে রইলেন। পেট ফুঁড়ে অদম্য হাসি কুণ্ডলী পাকি উঠল। অনেক কষ্টে তিনি হাসি চাপলেন।

এর আগে তিনি দেখেন নি। এর প্রবঞ্চনার একান্ত উপেক্ষণীয়; বালক প্রভুর প্রতি যে বাসার এতখান দুর্দ্দম সাহস সে প্রদর্শিত করেছে ই ভূমিকায় উপযুক্ত হতে এমন কষ্ট ক'রে লেখা-শেখার যে চেষ্টা আরম্ভ করেছে, তা তাঁর কাছে হাস্যকর এবং গৌরবজনক মনে হলো। তিনি , 'তুই এই ইস্কুলে পড়বি?'

বেতের আশঙ্কায় ম্রিয়মান ছিল, অবাক্ হয়ে 'কিন্তু পড়তে মাইনে লাগে যে! আমাকে কে দেবে? বড়লোক না হলে আবার কেউ পড়তে

ার যাতে মাইনে না লাগে তার আমরা বন্দোবস্ত দেব।'

ার বই, তার বুঝি পয়সা লাগে না?'

ও আমরা কিনে দেব।'

ন্তু পড়ব কখন?' হীরু আপত্তি করে বল্ল। 'সারা ভোরে বুঝি আমার কম কাজ! বই নিয়ে থাকলে সকালে কে জুতো বুরুশ করে, ঝাড় পোঁছ করে, কাপড় কাচে!—শুধু শুধু তো আর খেতে পরতে দেবে না—'

হেড মাষ্টার মশায় এইবার চুপ ক'রে গেলেন। খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে না পারলে গরিবের ছেলে পড়ে কি করে? কত ছেলে, যারা পড়বার সুযোগ পেলে বড় হতে পারত, যশস্বী হ'তে পারত, সুযোগের অভাবে তারা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এর প্রতিকার কোথায়? ছোট ছেলে মাত্রই পড়বার সুযোগ পাবে, এমন ব্যবস্থা কি করা যায় না? কবে সে ব্যবস্থা হবে?

'কাল থেকে তবে কি আর আসব না, স্যার?' হীরু কাতর স্বরে বললে। 'বেবী তবে আবার ভয় পাবে যে! ইস্কুলে না এলে কি ভদ্রলোকের ছেলের চলে!

'আচ্ছা, তুই যেমন আসছিস আসিস্। এখন যা।' বলে হেড্ মাষ্টার মশায় তাড়াতাড়ি ফাইলের উপর ঝুঁকে পড়লেন।

ম্যামথ

শ্রীবেলা বসু, বি. এ.

ামথের নাম শুনিয়াছ কি? এই অতিকায় জীব লইয়া ইহারা এক সময়ে দল বাঁধিয়া পৃথিবীর শীতপ্রধান াতিরই জাতভাই। সারা গায়ে বড় বড় লোম অঞ্চলগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইত। আজ কিন্তু ইহাদের

সেকালকার লোমওয়ালা অতিকায় গণ্ডার। ইহারা ম্যামথের সহিত পাশাপাশি শীতের দেশে বাস করিত।
ছবিতে দূরের অস্পষ্ট জীবগুলিই ম্যামথ।

একটিও বাঁচিয়া নাই—পৃথিবী হইতে ইহাদের বংশ সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া গিয়াছে।

ম্যামথের কথা এ যুগের লোকেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত জানিত না। সাইবেরিয়ার জলাভূমিতে যখন সর্ব্বপ্রথম একটি ম্যামথের কঙ্কাল পাওয়া গেল তখন কেহ কেহ এটিকে কোন অতিকায় জাতের মানুষের কঙ্কাল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কেহ বা বলিয়াছিলেন—এ এক

ম্যামথের সঙ্গে আদিম মানুষের যুদ্ধ। বিশালকায় জীবটি কাদায় পড়িয়া গিয়া কাবু হইয়া পড়িয়াছে।

অতি অদ্ভুত অতিকায় পশুর কঙ্কাল। এ পশু নিশ্চয়ই মাটীর নীচে থাকিত, মাটীর উপর আসিলেই মারা পড়িত। ইহাকে হাতীর জাতভাই বলিয়া নির্দ্দেশ করেন সর্ব্বপ্রথমে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কুভিয়ের।

১৮০৬ সনে বরফের নীচে একটি আস্ত ম্যামথের দেহ—লোম, চামড়া, মাংস সমেত—পাওয়া গেল। হাজার হাজার বছর বরফের নীচে থাকা সত্ত্বেও ইহার দেহ বা মাংস নষ্ট হয় নাই। মৃত্যুর পর যে সব জীবাণু শরীরে ঢুকিয়া শরীর পচাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে চিরতুষারের নীচে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বোধ হয় তাহারা কোন কাজ করিতে পারে নাই। ফলে ম্যামথটির দেহ অবিকৃত রহিয়া গিয়াছিল। এই ম্যামথটিকে দেখিয়া ম্যামথের ... সম্বন্ধে আর কোন সংশয় রহিল না। পরে ... আস্ত ম্যামথ আরও পাওয়া গিয়াছে।

ম্যামথ হাতীর জাতভাই হইলেও উভয়ের ... গঠনে কিছু পার্থক্যও আছে। ম্যামথের মাথা ... চাইতে অনেক বড় ছিল। দেহ অত মোটা না ... ভারী ছিল। ম্যামথের সারা গা লোমে ঢাকা ছিল ... সে লোম ছিল খুব বড় বড়। বলা বাহুল্য ... দেশে থাকিত বলিয়াই ঐ রকম লোমের প্রয়োজন ... সেকালে শীতপ্রধান দেশে ঐ রকম লোমশ গণ্ডার ... যাইত। ম্যামথরা হাতীর মতই উঁচু হইত—কিন্তু ... হইত হাতীর চেয়েও বড়—কম করিয়া ১০।১২ ... সে দাঁত কখনও কখনও দেখিতে হইত গোল ... মত—তবে শেষটা দাঁতের আগা শুঁড়ে আসিয়া ... না। হাতীর মত সে দাঁত অত শক্তও হইত না। ... শতাব্দীতে খীবা নগরে ম্যামথের দাঁতের কারবার ... বলিয়া মনে হয়। বছরে অন্ততঃ একশ' জোড়া ... রকম দাঁত কেন-বেচা হইত। এই দাঁত দিয়া ... গহনা তৈরী হইত। এখনও যে হয় না তাহা ...

... ম্যামথের মৃতদেহের পাশে অনেক জায়গায় আদিম ... ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। সেই ... যুগের মানুষরা যে দলবদ্ধ হইয়া ম্যামথের সহিত যুদ্ধ এবং তাদের শিকার করিয়া মাংস খাইত সে বিষয়ে ... নাই। একটি ম্যামথ মারিতে পারিলে প্রচুর ... পাওয়া যাইত—বহু লোকের বহু দিনের মত খাবার ... যাইত। ঠাণ্ডার দেশে মাংস সহজে নষ্ট হইত ...

... সিয়া, ইয়োরোপ ও আমেরিকার উত্তরে সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া বেড়াইত। দক্ষিণে স্পেন, ইটালী, ক্যারো- ... কালিফোর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও ইহারা আসিত। ... যে নিরামিষভোজী ছিল—ঠাণ্ডার দেশের গাছ- ... যে ইহাদের আসল খাদ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুখের ভিতর ঘাসপাতা অর্দ্ধচর্ব্বিত—তখনও উদরস্থ হয় নাই—এমন অবস্থায় অনেক ম্যামথের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। ইহারা সম্ভবতঃ দল বাঁধিয়া ঘুরিত কারণ জায়গায় জায়গায় ইহাদের রাশিকৃত মৃতদেহ একত্রে পাওয়া গিয়াছে। এমন কি এক জায়গায় সাত-আটশ' ম্যামথের মৃতদেহ একসঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কোন জায়গায় দল বাঁধিয়া যাইবার সময় হয়তো উহারা জলা জমিতে পড়িয়া গিয়াছিল, কিংবা বন্যার জলে ভাসিয়া আসিয়াছিল, না হয় তুষার চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাদের রক্তাক্ত দেহ, ভাঙ্গা হাড় এবং সংকুচিত অবস্থা হইতে মনে হয় যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনাই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী। সেই জন্যই বোধ হয় অনেক সময় তাহাদের মুখের ঘাস মুখেই থাকিয়া গিয়াছে, গিলিবার সময়টুকু পর্য্যন্ত তাহারা পায় নাই।

পৃথিবীতে এখন একটিও ম্যামথ জীবিত নাই।

ডিটেক্‌টিভের ডায়েরি

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

... রিভারটা সুশান্ত নামিয়ে রাখল। মুখের উপর ... রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাথাটা নীচু করে সে ... চুপ করে দাঁড়াল, তারপর হঠাৎ অনিলের দিকে ... বলে উঠল—"অনিল, যদি তোমার কোনও কাজ ... তো জমিদার তারাশঙ্কর চৌধুরীর বালিগঞ্জের ... যেতে পার। জমিদার বাবু খুন হয়েছেন, তার ... লাস আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

... সনে একটা রিক্সায় চেপে বসল। এই রিক্সাতে ... অনিলের মনে প্রাণে অত্যন্ত আপত্তি ছিল, কিন্তু ... সুশান্তর জেদেই চাপতে হ'ল। সুশান্ত বলল—

... নের মার নেই অনিল। আমাদের বাড়ি থেকে ... র সঙ্গে সঙ্গেই একজনকে মোটরে করে চলে ... দেখলে? সে আমাদের উপর লক্ষ্য রাখছিল। ... আমি যখন মস্ত বড় ডিটেক্‌টিভ, তখন একটা ... করে যাব-ই। ট্যাক্সি-ড্রাইভার যে খুনেদের দলের লোক নয়, তাই বা বুঝব কি করে? সেই জন্যই রিক্সায় চেপেছি।"

অনিল এতক্ষণে বিগলিত হয়ে উঠল, বলল—"অদ্ভুত বুদ্ধি তোমার! কিন্তু ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলে?"

সুশান্ত বলল—"কিছুই শুনলাম না, বলব কি করে? তবে জমিদার বাবুর দুই ছেলে, তাঁরা এখনও পুলিশে খবর দেন নি। ওঁদের পুলিশের উপর তেমন আস্থা নেই।"

অনিল উত্তর দিল—"সুস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই পুলিশের উপর আস্থা থাকা উচিত নয়। আজ পর্য্যন্ত এমন কোনও বইয়ে পড়েছ যে পুলিশ রহস্যের কিনারা করেছে? প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভেরা না থাকলে যে কি হ'ত!"

রিক্সা জমিদার তারাশঙ্কর চৌধুরীর বালিগঞ্জের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সুশান্ত ও অনিল বাড়িতে ঢুকল। তারাশঙ্কর বাবুর জমিদারীর

ম্যানেজার চণ্ডীবাবু তৈরী হয়েই ছিলেন, তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

সুশান্ত প্রথম প্রশ্ন করল—"ব্যাপারটা কি বলুন ত' ?"

চণ্ডীবাবু বলতে সুরু করলেন—"কাল রাত্রে জমিদার বাবু কতগুলো কাগজপত্রে তাঁর ঘরে বসে বসে সই করলেন। আমি সেই কাগজপত্রগুলো নিয়ে চলে এলাম। এর পর তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। জমিদার বাবুর খাস চাকর জগার কাছ থেকে জানলাম যে তিনি রাত দশটায় খেয়েদেয়ে শুতে গেলেন। তাঁর শোবার সময় জগা কাছে ছিল। তিনি কাল রাত্রে প্রায় কিছুই খান নি, একটা দারুণ উদ্বেগে তাঁকে যেন চিন্তিত দেখা যাচ্ছিল।"

সুশান্ত তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"জমিদার তারাশঙ্কর বাবুর তো দুই ছেলে। তাঁরা দু'জন কোথায় ?"

চণ্ডীবাবু উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, জমিদার বাবুর দুই ছেলে—বড় জনের নাম ভবশঙ্কর, ছোট জনের নাম জ্ঞানশঙ্কর। তাঁরা দু'জন জমিদার বাবুর শোবার ঘরের পাশের ঘরে শোকে দুঃখে মুহ্যমানের মত পড়ে আছেন। কেউ একচুলও নড়ছেন না।"

অনিল জিজ্ঞাসা করল—"পাশের ঘরে কেন ?"

চণ্ডীবাবু উত্তর দিলেন—"তা ঠিক বলতে পারি না। তবে সেই ঘরে মস্ত একটা লোহার সিন্দুক আছে। তাতে জমিদার বাবুর সমস্ত নগদ টাকা, গয়না প্রভৃতি দামী দামী জিনিষ থাকে। সেই সিন্দুকের উপর তাঁরা দু'জন বসে আছেন। জমিদার বাবুর মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া মাত্র সেই যে তাঁরা দু'জনে ওই সিন্দুকের উপর চেপে বসেছেন, অনেক অনুনয় বিনয় করেও তাঁদের ওখান থেকে নামানো যাচ্ছে না। ওঁদের দু'জনেরই ধারণা, একজনের অনুপস্থিতির সুযোগে অন্য জন সব টাকা সরিয়ে ফেলবে।"

সুশান্ত বলল—"চলুন ওই ঘরেই যাই।"

একটা বিশাল লোহার সিন্দুক। সেই সিন্দুকের উপর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের দু'টি যুবক বসে। সিন্দুকের তালাটা দু'জনেই চেপে ধরে আছেন। দু'জনের চোখেই সন্দেহের আগুন জ্বলছে।

সুশান্ত ভবশঙ্কর বাবুকে বলল—"আপনি নীচে আসুন।"

ভবশঙ্কর বাবু জ্ঞানশঙ্কর বাবুর দিকে তাকিয়ে লেন—"আগে জ্ঞানাকে নামতে বলুন।"

সুশান্তর অনুরোধে তারপর দু'জনে এক সঙ্গে কের উপর থেকে নামলেন। তখন সুশান্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করল—"আচ্ছা, ভবশঙ্কর বাবু এ হত্যার বিষয়ে কি কি জানেন বলুন ?"

ভবশঙ্কর বাবু বললেন—"আমি এ খুনের বি জানব, বলুন! এ সব জ্ঞানার কাজ। জ্ঞানা থেকে টাকা টাকা করে ঘুর ঘুর করছিল। আমার মেরে কিছু টাকা সরিয়েছে, এখন বাবাকে মেরেও সরাবার মতলবে আছে।"

জ্ঞানশঙ্কর বাবু ফোঁস করে উঠলেন—"ভারি তোর পকেট রে! পকেটে কয় টাকা ছিল যে টাকা করছিস ? মাত্র দশ আনা তো ছিল!"

ভবশঙ্কর বাবু হাঁক দিলেন—"যাই থাকুক, সে পয়সা সরাস্ নি ?"

সুশান্ত ঝগড়া থামিয়ে দিয়ে বলল—"আমি টাকা মারার কথা বলছি না। আপনি এ খুনের বিষয়ে জানেন বলুন।"

ভবশঙ্কর বাবু বললেন—"বাবার সঙ্গে আমার কেন, অনেক দিন দেখা হয় নি। আমরা বাবার কাছে কোনও কালেই যাই না। বাবার সব কাজ বাবার খাস চাকর জগা। তবে কাল রাত দশটায় বাবার ঘর থেকে একটা গোঙানি শুনেছিলাম। যেন চীৎকার করেও উঠেছিলেন—"আমায় মেরে রে! ঠিক পর মুহূর্ত্তেই জগাকে আমি চলে দেখলাম। আজ সকালে বাবাকে ঘরে পাওয়া না।"

সুশান্ত জ্ঞানশঙ্কর বাবুকে জিজ্ঞাসা করল—"আর কিছু বলতে পারেন ?"

"আমি ? কিছু না।" জ্ঞানশঙ্কর বাবু চুপ গেলেন।

সুশান্ত বলল—"চলুন। তারাশঙ্কর বাবুর ঘরটা দেখে আসা যাক্।"

চণ্ডীবাবু, ভবশঙ্কর বাবু, জ্ঞানশঙ্কর বাবু ও অনিলকে সুশান্ত তারাশঙ্কর বাবুর শোবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত দামী পালঙ্কের উপর বিছানা—বিছানার চাদর লাল হয়ে গেছে। মাটিতে তাঁর বালিশ দু'টো ক পড়েছে। বিছানাতেও ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। আধটু রক্তের দাগ ঘরের মেঝের উপরেও পাওয়া

অনিল শিউরে উঠল—"উঃ!"

সুশান্ত বিছানাটা ভাল করে পরীক্ষা করে বলল—পৈশাচিক নরহত্যা! কিন্তু হত্যাকারী আমার থেকে রেহাই পাবে না। আপনারা একবার জগাকে ।"

জগা এল। তার পরনের কাপড়েও রক্তের চিহ্ন গেল।

সুশান্ত তাকে জিজ্ঞাসা করল—"এত রক্ত তোমার ড়ে কোথা থেকে এল ?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে জগার মুখ ভয়ে পাংশু হ'য়ে গেল। মতা আমতা করতে লাগল। সুশান্তর মুখে হাসি গেল, আবার জিজ্ঞাসা করল—"কাল রাত্রে শঙ্কর বাবু শুনেছেন যে তারাশঙ্কর বাবু চীৎকার করে ছলেন—"আমায় মেরে ফেললে রে!" তার পর- ই ওঁর ঘর থেকে তোমাকে বেরুতে দেখা গেছে। কিনা ?"

জগা এ-পাশ ওপাশ তাকাতে লাগল, একটা কথাও পারল না। সুশান্ত সকলের দিকে গম্ভীর ভাবে য়ে বলল—"দেখুন আপনারা। আজ পর্য্যন্ত আমি ও বিফল হই নি। এত বড় জটিল হত্যার ব্যাপার- টাতেও আমি কত সহজে হত্যাকারীকে ধরে দিলাম। অনিল, তুমি জগার হাতে হাতকড়ি লাগাও।"

এই কথা শোনা মাত্র ভবশঙ্কর বাবু আর জ্ঞানশঙ্কর বাবু এক সঙ্গে জগাকে ধরে ভীষণ ভাবে প্রহার করতে সুরু করলেন। জগাও হাঁউমাউ করে চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

এমন সময় 'আঃ' বলে এক আর্ত্তনাদ শোনা গেল। তারপর জমিদার বাবুর পালঙ্কের নীচ থেকে একটি মূর্ত্তিকে গড়িয়ে আসতে দেখা গেল। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং জমিদার তারাশঙ্কর চৌধুরী। তাঁর কাপড়-চোপড়ে রক্ত, চোখে মুখে অবসাদের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তিনি এত লোকের ভিড় দেখে বলে উঠলেন—"এত গোলমাল কেন! কি হয়েছে ? জগাকে মারছ-ই বা কেন ?"

চণ্ডীবাবু সে কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার কাপড়ে রক্ত কেন ?"

তারাশঙ্কর বাবু বললেন—"ওই ব্যাটা জগা! পায়ে একটা ফোঁড়া হয়েছে, কাল রাতে দিল ব্যাটা ফাটিয়ে। তার থেকে রক্ত পড়ে বিছানা ভেসে গেছে, কাপড়ও তথৈবচ। তারপর যা গরম! বিছানায় শুতে না পেরে ঠাণ্ডা মেঝের উপর বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ফোঁড়ার ব্যথায় ছটফট্ করেছি আর গড়িয়েছি। ঘুম ভেঙে দেখি, আমি এই পালঙ্কের নীচে শুয়ে আছি। কিন্তু ব্যাপার কি ?"

আর ব্যাপার! সুশান্ত আর অনিল ততক্ষণে রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে প্রাণপণে ছুটে দেশপ্রিয় পার্ক রোডে এসে হাঁপাচ্ছে। বাপ্‌স্! কি বাঁচান বেঁচে গেছে!

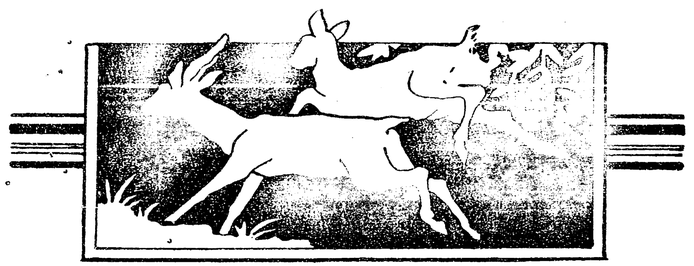

জেনারের দান

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

আজ থেকে প্রায় দু'শ' বছর আগেকার কথা। ইংল্যাণ্ডের একটি ছোট্ট সহরে ছোট্ট একটি ছেলেকে প্রায়ই দেখা যেত আশপাশের জঙ্গলে গিয়ে নানা রকম গাছপালা সংগ্রহ করছে। পাড়াগাঁর জঙ্গলে হরেক রকম গাছগাছড়া জন্মায়—তাদের গুণও হরেক রকম, হালচালও হরেক রকম। ছোট্ট ছেলেটির সে বিষয়ে ছিল প্রচণ্ড জানবার আগ্রহ—সাধু ভাষায় যাকে বলা যায় "অনুসন্ধিৎসা"। ও অঞ্চলের বেশীর ভাগ গাছপালা সম্বন্ধেই সে এমন অনেক খবর রাখত যার খোঁজ সাধারণতঃ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ছাড়া কারও পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। ছেলেটি ওখানকারই পাদ্রী সাহেবের ছোট ভাই। বাপ-মরা ছোট ভাইটিকে বড় ভাই-ই মানুষ করছিলেন। ছেলেটির নাম এড্‌ওয়ার্ড জেনার।

একটু বড় হয়ে জেনার ঠিক করলেন তিনি ডাক্তারী শিখবেন। ছেলেবেলা থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর তাঁর যে প্রবল আকর্ষণ ছিল বড় হয়েও তা বিন্দুমাত্র কমে নি। কিন্তু শুধু বিজ্ঞান নিয়েই তিনি মাথা ঘামাতেন না—আরও নানা দিকে তাঁর সখ ছিল। বেহালা বাজাতে তিনি ভারী ভাল বাসতেন, ভাল গানও গাইতে পারতেন। এমন কি একটু আধটু কবিতা লেখারও অভ্যাস ছিল। তাঁদের ছোট্ট বার্ক্‌লি সহরের সবাই তাঁকে খুব পছন্দ করত।

স্থানীয় একজন ডাক্তারের কাছে কিছুদিন শিক্ষানবীশী ক'রে জেনার চলে এলেন লণ্ডনে—ব্যবসাটা আরও ভাল ক'রে শিখবেন ব'লে। লণ্ডনে তখন জন্ হাণ্টার নামে একজন খুব নাম-করা চিকিৎসক ছিলেন, জেনার হলেন তাঁরই ছাত্র। উপযুক্ত গুরুর কাছে উপযুক্ত ছাত্র এসে জুটল। অল্প দিনেই জেনার চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনেক কিছুই শিখে ফেললেন। হাণ্টারও ছাত্রের কৃতিত্বে খুব খুসী।

জেনারের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চাও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। গাছপালা সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধিৎসা কিছুমাত্র কমে নি। এক-একজন লোক আছে যাদের নানা গবেষণার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে—[illegible] ছিলেন সেই প্রকৃতির লোক। এই সময়ে বিখ্যাত [illegible] তত্ত্ববিদ্ স্যার্ ব্যাঙ্কস্ ক্যাপ্‌টেন কুকের সঙ্গে [illegible] অভিযান সেরে দেশে ফিরেছেন। ব্যাঙ্কস্ [illegible] ঘটনাচক্রে জেনারের কিছু দিন একত্র কাজ করার [illegible] হয়েছিল। তাঁর কাজ দেখে ব্যাঙ্ক্‌স্ এত খুসী [illegible] যে আবার যখন তাঁরা বৈজ্ঞানিক অভিযানে বে[illegible] তখন জেনারকেও তাঁদের সঙ্গী হবার জন্য পী[illegible] করতে লাগলেন। জেনারের অবশ্য এত বড় [illegible] ব্যাপারে যোগ দেবার আগ্রহ কম ছিল না, কিন্তু [illegible] তিনি ঠিক করে ফেলেছেন নিজের সহরে গি[illegible] রকম উন্নত ধরণের চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তন [illegible] এবং তার কিছু কিছু যোগাড় যন্ত্রও আরম্ভ [illegible] বেচারা বড় দ্বিধায় পড়লেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত [illegible] উন্নতির চাইতে পরের উপকারের কথাই তাঁর ব[illegible] হ'ল; তিনি বৈজ্ঞানিক অভিযানে যোগ না দিয়ে [illegible] ছোট্ট সহরটিতে ফিরে এলেন এবং সেখানে একটি [illegible] খাট চিকিৎসা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন।

এর কিছুদিন আগেকার একটি ঘটনার কথা [illegible] বলা দরকার। জেনার তখন বার্কলিতেই ডাক্তারী শিক্ষানবীশী করছেন। একদিন এক গয়লার [illegible] অসুস্থ হয়ে তাঁদের ওখানে এসে হাজির। কথা[illegible] সে জানাল, তাদের পাড়ায় খুব বসন্ত রোগ দেখা [illegible] —তবে তার কোন ভয় নেই, কারণ তার ইতি[illegible] গো-বসন্ত হয়ে গেছে। জেনার জিজ্ঞাসা ক[illegible] "তা'তে কি?" মেয়েটি নিশ্চিন্ত ভাবে বল্‌ল, "বা[illegible] গো-বসন্ত হ'লে তার বুঝি আবার কোন দিন [illegible] বসন্ত হয়?"

মেয়েটি চলে গেল, কিন্তু জেনারের মনে জাগি[illegible] এক পরম কৌতূহল। তিনি গয়লা-পাড়ার খোঁ[illegible] জানলেন, সেখানকার সকলেরই ঐ রকম ধারণা[illegible]

[illegible] গো-বসন্ত হয়ে গেলে আর কখনও আসল বসন্তও [illegible]না। গো-বসন্ত আসল বসন্ত রোগের জাতভাই [illegible]ও তার মত মোটেই অমন মারাত্মক নয়। ব্যারামটা [illegible] থেকে আসে—এবং গয়লাদের মধ্যেই সাধারণতঃ [illegible] যায়।

[illegible]র পর জেনার লণ্ডনে গিয়ে তাঁর গুরু হাণ্টার[illegible]কে একদিন কথাচ্ছলে ব্যাপারটা জানান। হাণ্টার [illegible] বল্লেন, "ও সব অশিক্ষিতদের কুসংস্কার ছাড়া কিছু [illegible] ও নিয়ে মাথা ঘামিও না।" কিন্তু জেনারের [illegible], আগেই বলেছি, সাধারণের মত ছিল না। তিনি [illegible] মনে ভাবলেন, 'কিন্তু ওদের এ ধারণা তবে এল [illegible] থেকে! ব্যাপারটা আরও ভাল ক'রে অনুসন্ধান করতে [illegible]'

[illegible] দেশে ফিরে পুরোপুরি ডাক্তারী ব্যবসা সুরু ক'রেই [illegible] আবার এই ব্যাপার নিয়ে পড়লেন। কোথায় [illegible] কবে গো বসন্ত হয়েছিল একটি একটি ক'রে তার [illegible] ক'রে তালিকা তৈরী করলেন, তার পর প্রত্যেকের [illegible] গিয়ে খবর নিতে লাগলেন তাদের কারো পরে [illegible] বসন্ত হয়েছে কিনা। দেখা গেল, বেশীর ভাগ [illegible]ই গয়লাদের ধারণা ঠিক—যার একবার গো-বসন্ত [illegible]ছ তার, এমন কি মহামারীর জায়গায় থেকেও, [illegible] বসন্ত হয় নি। কিন্তু ২।১ জায়গায় এ সত্য খাটে [illegible] একই লোকের পর পর দু'ব্যারামই হতে দেখা [illegible]। জেনার একটা আলোর সন্ধান পাচ্ছিলেন—এ [illegible] আবার ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই [illegible]টি ঘটনায় আবার তাঁর মনে আশা হ'ল। কয়েকটি [illegible]সন্ত রোগের চিকিৎসায় ডাক পড়তে তিনি গিয়ে [illegible]লেন সেগুলো আসলে গো-বসন্ত নয়—অন্য রোগ। [illegible] গয়লারা তাকে এক বাক্যে গো-বসন্ত বলেই নির্দ্দেশ [illegible]। জেনারের সন্দেহ হ'ল, যে সব ক্ষেত্রে একই [illegible] গো-বসন্ত আর আসল বসন্ত হয়েছে ব'লে জানা [illegible], সে জায়গায় হয়তো তবে প্রথম রোগটি গো-বসন্ত [illegible] এই ধরণের রোগ—গয়লারা ভুল ক'রে গো-বসন্ত মনে [illegible]ছে। তা যদি হয়, তা হ'লে হয়তো একই লোকের [illegible]বারের গো-বসন্ত আর আসল বসন্ত হবার নজির আর থাকে না! একটা মস্ত বড় সম্ভাবনার আভাস পেলেন তিনি।

এই বার জেনার অক্লান্ত ভাবে ব্যাপারটা নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। ঐ ধারণা যদি নির্ভুল হয় তবে বসন্ত রোগের একটা অব্যর্থ প্রতিষেধক তিনি বার করতে পারবেন—এবং তা দিয়ে হয়তো লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষা করা যেতে পারবে। কেননা শরীরে গো-বসন্তের বীজ ঢুকিয়ে যে কোন লোককে বসন্ত থেকে মুক্ত রাখা যাবে। কিন্তু তার আগে ধারণা নির্ভুল হওয়া চাই। হাতে-নাতে পরীক্ষা ক'রে না দেখলে তা কি সম্ভব?

এর পর তিনি এক মারাত্মক পরীক্ষায় হাত দিলেন। তাঁর বিশ্বাস কত দৃঢ় হয়েছিল এই থেকে তা বোঝা যায়। সেদিন ১৭৯৬ সনের ১৪ই মে, জেনার ফিপ্‌স্ নামে একটি আট বছরের ছেলের শরীরে খানিকটা গো-বসন্তের বীজ ঢুকিয়ে দিলেন। একটি গয়লার মেয়ের শরীরে গো-বসন্ত বেরিয়েছিল, তারই রস থেকে ঐ বীজ সংগ্রহ করা হ'ল। এর দু'সপ্তাহ পরে তিনি ঐ ভাবে এক আসল বসন্ত রোগীর গুটি থেকে বীজ নিয়ে আবার ফিপ্‌সের শরীরে ঢোকালেন। কয়েক দিন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কাটল; অবশেষে দেখা গেল, ফিপ্‌স্ সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে—মারাত্মক বসন্তের বীজ তার শরীরে দাঁত ফোটাতে পারে নি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে সেটি একটি স্মরণীয় দিন।

কিন্তু একটি পরীক্ষার উপর নির্ভর ক'রে এত বড় একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। জেনার অন্যান্য ডাক্তারদের সহযোগিতায় এই রকম আরও কয়েকটা পরীক্ষা করলেন। অবশ্য এতে তাঁকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। প্রথমতঃ গো-বসন্ত ব্যারামটা মানুষের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায় না—এমন কি গয়লাদের মধ্যেও কালেভদ্রে দেখা যায়। সুতরাং এক-একবার পরীক্ষার মালমশলা যোগাড় করতে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করতে হ'ল। তা ছাড়া এমন একটা মারাত্মক পরীক্ষা করতে অনেক ডাক্তারই চট্ করে ভরসা পেলেন না—কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করতেও ছাড়লেন না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জেনারেরই জয় হ'ল। পরীক্ষার পর পরীক্ষা ক'রে তিনি দেখালেন তাঁর

আবিষ্কার অভ্রান্ত। মানুষের শরীরে যদি আগে থাকতেই গো-বসন্তের বীজ ভরে দেওয়া যায় তবে তার আর আসল মারাত্মক বসন্ত রোগের ভয় থাকে না। এরই নাম টিকা দেওয়া। বসন্তের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমরা যে বছর বছর টিকা নাও—এ তাই। যত দিন শরীরে টিকার বীজ থাকে—বসন্তের ভয় থাকে না, তোমরা জান। কিন্তু এ তথ্য জেনারেরই আবিষ্কার।

জেনারের এই আবিষ্কারে অল্প দিনের মধ্যেই চার দিকে সাড়া পড়ে গেল। এর আগে প্রতি বছর হাজার হাজার লোক বসন্ত রোগে প্রাণ হারাত—কোন প্রতিকার ছিল না। কিন্তু টিকা নেবার পদ্ধতি আবিষ্কার হবার পর এ রোগের প্রাদুর্ভাব একেবারে কমে গেল। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, অল্প দিনের মধ্যেই বেশীর ভাগ দেশে সরকার থেকে আইন ক'রে প্রত্যেক লোককে টিকা নিতে বাধ্য করা হ'ল। রাশিয়ার রাণী ঘোষণা করলেন—তাঁর রাজ্যে প্রথম যে ছেলেটি টিকা নেবে তাকে সরকারী খরচে লেখাপড়া শেখান হবে। জার্ম্মেনীতে তো জেনারের জন্মতিথি আর ১৪ই মে তারিখটি (যেদিন জেনার ফিপ্‌স্‌-এর উপর তাঁর প্রথম পরীক্ষা করেন) সরকারী ছুটির দিন ব'লেই ঘোষণা করে দেওয়া হ'ল। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং মানুষের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ব'লে জেনার প্রতিষ্ঠালাভ করলেন।

জেনারের খ্যাতির প্রতিপত্তি কি রকম হয়ে... সম্বন্ধে একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করলেই বুঝ... সময়ে নেপোলিয়ন্ ছিলেন ফ্রান্সের সম্রাট্। ... সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের হঠাৎ যুদ্ধ সুরু হ'ল। যে-সব ... তখন ফ্রান্সে ছিল তারা আর দেশে ফিরবার সুযো... না—ফরাসীরা তাদের বন্দী ক'রে ফেল্‌ল। ই... এ সংবাদ পৌঁছলে লোকেরা খুব বিচলিত হয়ে প... সবাই মিলে এই সব নিরপরাধ লোকদের মুক্তি... অনুরোধ জানিয়ে ফরাসী সম্রাটের কাছে এক... পাঠাল। জেনার তা'তে সই করলেন। নেপো... কাছে সে দরখাস্ত পৌঁছলে তিনি খুলে দেখলেন... জেনারের সই! বীর তিনি, গুণীর সম্মান ... জানতেন। হেসে বল্লেন, "এ লোকটির ... উপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসাধ্য।" বন্দী... পেল।

জেনারের নিজের দেশ ইংল্যাণ্ডে কিন্তু তাঁকে... অতটা খাতির দেখান হয় নি। অন্যান্য দেশে... প্রবর্ত্তিত টিকা দেবার পদ্ধতি আবিষ্কার হবার ... আইন ক'রে তা' বাধ্যতা-মূলক ক'রে দেওয়া ... ইংল্যাণ্ডে বহুদিন পর্য্যন্ত তা করা হয় নি। তাঁর... প্রায় ত্রিশ বছর পরে সেখানকার কর্ত্তাদের এ বিষ... হয়, এবং তখন তাঁরা এ বিষয়ে আইন জারি করেন।

রাম-লক্ষ্মণ

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

সামান্য কারণে দু'ভাইয়ে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল তাকে "অসামান্য" বললে কিছুই বলা হয় না।

রাম-লক্ষ্মণের মতো দু'ভাই—নামও তা'দের রাম আর লক্ষ্মণ। তাদের ভ্রাতৃ-প্রীতি আর পাঁচ জনের একটা দেখবার বিষয় ছিল।

প্রত্যেক বার দুর্গা পূজোর সময় দশ পাড়ার লোক এসে তাদের বাড়ীতে জমায়েৎ হয়। অত ঘটা ক'রে পূজো রাজা-উজীরের বাড়ীতেও খুব কম দেখা যায়। 'সহরের সেরা পূজো কোন্‌খানা?'—জিজ্ঞেস ক'রলে যে কেউ তোমায় চোখ বুজে ওদের খানার না... দেবে!

কিন্তু গোল বাধল সেবার পূজোরই সময়...

প্রতি বারের মতো রজনী কুমোর ওদের ... গড়তে সুরু ক'রেছে। আর দিন দশেক বাদেই ... শেষ হবে। বড় ভাই রাম তিজেল, ধুনুচি, মাটির প্রদীপ, দেরখো থেকে সুরু করে মুদী, মনোহারী ... একখানা দেড় হাতি ফর্দ দাঁড় করাল।

পরদিন খু—উব সকালে লক্ষ্মণকে ঘুম থেকে ...দিয়ে তুল্‌ল—"ওঠ্ ওঠ্, বাজার থেকে মুদী-জিনিষপত্তর ...ন নিয়ে আসি গে চল্।" লক্ষ্মণের চোখে তখনও ...র আমেজ;—"থাক্ দাদা, মুদী-মাল আমিই কিনে ...আসব'খন। তুমি বরং অন্য জিনিষগুলো কেনাকাটা ...গে।" "তা কী ক'রে হয়!"—রাম ভুরু দু'টো সামান্য ...ট্‌ কোঁচকাল—"আমি যে ওদিকে কথা দিয়ে ব'সে ...ছি। আমার এক পুরোনো বন্ধু নতুন এক মুদীখানা ...য়েছে। তাকে আমি এ পর্য্যন্ত ব'লে এসেছি যে আজ ...লের দিকে তার দোকান থেকে আমাদের পূজোর ...মুদী জিনিষ-পত্তর কিনব।"

"সে কি দাদা!"—এবার লক্ষ্মণের বিস্ময়ের পালা। ...নি যে এদিকে আমার বন্ধুকে কথা দিয়ে ব'সে আছি। ...ও একটা নতুন মুদী-দোকান দিয়েছে। বহুদিনকার ...নো বন্ধু, ভাবলাম এবারকার সব মুদী-মাল ওখান ...কই—"

"এ হ'তেই পারে না"—রাম একেবারে বেঁকে ব'সল। ...কথার কোনো লক্ষণই নেই লক্ষ্মণের কথায়ও। ...ও বুলি—"সে কিছুতেই হতে পারে না।"

রাম ধপ ক'রে খাটের উপর ব'সে পড়ল।—"দেখ্ ...ণ, আমি তোর দাদা। আমার মান-সম্মান যাতে ... সময় বজায় থাকে তোর শুধু সেই লক্ষ্যই থাকা ...ত।"

"সে তো ঠিকই দাদা! তুমিই তো শিখিয়েছ যে—...খ যা বলবে কাজে তা ক'রবে।'—তাই তো আমি মুখে ...ব'লে এসেছি, কাজে যদি তা' না করি তো তোমার ...কেই অপমান করা হয়।"

...তর্জ্জনী উঁচিয়ে রাম, বলল, "দেখ্ লক্ষ্মণ, আমার সঙ্গে ...ী ফাজলেমী করিস না।"

লক্ষ্মণের মাথাও ততক্ষণে গরম হ'য়ে উঠেছে—...ফাজলেমি করা ছাড়া আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ ...!" রাম গর্জ্জে উঠল—"আবার আমার সাথে—!"

"নাঃ, তুমিই তো আমার সাথে—"

...ছাতিটা বগলদাবা ক'রে আর বুকের ছাতি ফুলিয়ে ...বল্‌ল—"বটে!" আমি তোর মতো হতচ্ছাড়া, পাজি, ...র সঙ্গে লাগতে গেছি? য়্যা! আমার মতো ...শিষ্ট—!"—রাম বগলের ছাতিটা উঠোনে ছুড়ে ফেলল। আল্‌মারীর অমন চমৎকার কাচ ভেঙে, চায়ের কাপ-প্লেট পটাপট্ গুঁড়িয়ে ফেল্‌ল। এক পাঁজা বাসন আছাড়ের চোটে ঝন্‌ঝন্ ক'রে উঠল। আলনার জামা-কাপড়, ঘরের বই-পত্তর সবের অবস্থা সাধু ভাষায় "ধূলায় ধূসর" হ'ল। এ ছাড়াও আরও অনেক কিছু ক'রল যা নাকি কর্ত্তব্য নয়।

নেপাল, গোপাল কোথায় ব'সে মারবল খেলছিল, শব্দ শুনে মারবল হাতে ক'রেই দু'ভাই ছুটে এল। শেলী আর নেলী হাতের লেখা ফেলে কলম হাতে দৌড়ে এসেছে। রাম-গিন্নী নয়নতারা মশলা মাখা হাতে এবং এক হাতে একটা আধ-কোটা কৈ-মাছ আর আর এক হাতে একমুঠো ছাই নিয়ে লক্ষ্মণ-গিন্নী বকুলমালা এসে হাজির।

আরও দু'চারটে কথা কাটাকাটির পর রাম রায় দিল——"এ-রকম ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক রাখা কোনও ভদ্রলোক দাদার 'কম্মো' নয়।"

লক্ষ্মণও ঝাঁঝিয়ে উঠল—"বহুৎ আচ্ছা।"

জীবন যায় সেও-ভি-আচ্ছা, কিন্তু এ বেলাই ভিন্ন হওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে—দু'ভায়ের-ই এই মত।

খন্তা-কোদাল নিয়ে দু'ভাই লেগে গেল। কোন মতে টিনের একটা বেড়া দিয়ে পার্টিশনের প্রাথমিক কাজটা সমাধা হ'ল।

বেড়ার ওদিকে লক্ষ্মণ তার ছেলেমেয়েদের শাসিয়ে দিলে—"হেই ন্যাপ্‌লা, গোপলা, শেলী, বেড়ার ওদিকে গেছ তো দু'খানা ঠ্যাঙ্ পিটিয়ে চারখানা ক'রে দেব। সাবধান!"

"আর তোরাও সাবধান।"—বেড়ার এদিক্ থেকে রাম তা'র ছেলেমেয়ে ইস্তক বউকে বল্‌ল—"বেড়ার ওদিকে এক পা বাড়িয়েছ তো মেরে এক জায়গায় হাড়, এক জায়গায় মাংস ক'রে ছেড়ে দেব। মনে থাকে যেন।"

"বেড়ার এদিকে পূজো এবার আমি করবই, তা' যত শ' টাকাই লাগুক"—লক্ষ্মণ বল্‌ল বকুলমালাকে উদ্দেশ ক'রে। বকুলমালা চাপা গলায় সায় দিল।

"পূজো এবার আমি করবই করব। তা'তে যদি হাজার হাজার টাকা ব্যয় হয়ে যায়,—সেও স্বীকার।'

রামের বক্তব্য সারা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারাও বলে উঠল—"হাজার বার করব।"

পাড়ার কুঞ্জবাবু উকিলকে সবাই 'নারদ মুনি' বলত। কেন জানি না। জানতে ইচ্ছে হ'লে ও-পাড়ার কারুর কাছে গিয়ে কারণ জিজ্ঞেস ক'রে এস।

বিকেল বেলা তিনি রামকে ডেকে বললেন—"ছি, ছি, ছি, তোমার মতো অমন শান্তশিষ্ট, গোবেচারী বড় ভাই—যার সাত চড়ে মুখে রা নেই, তা'কে কিনা—! নাঃ এ একেবারে ঘোর কলি। নয় তো ছোট ভাই হয়ে—"

"না, না, আমি এর একটা বিধান করবই; আপনি আমার পক্ষ হ'য়ে ওকালতী করতে পারবেন তো?"

"এই তো মরদের মতো কথা।...আর ওকালতির কথা বলছ? ন্যায়ের পক্ষ হয়ে লড়তে তো আমি সব সময়েই প্রস্তুত।"—রামের পিঠে গোটা কয়েক মৃদু চাপড় দিলেন কুঞ্জবিহারী।

"শুনলাম সব ব্যাপারই;—কিন্তু কী আর করবে বল? তোমার মতো ছোট ভাই—যার পেট ফাটে তো মুখ ফোটে না,—তার ওপর কিনা এমনি অত্যাচার! কোথায় বড় ভাই হয়ে ছোট ভাইকে একটু-আধটু—" সন্ধ্যের দিকে লক্ষ্মণকে একলা পেয়ে কুঞ্জবাবু কথাটা পাড়লেন।

ঝাঁঝালো গলায় লক্ষ্মণ বলল—"কোর্টে নালিশ ক'রে আমি এর একটা বিহিত করবই।"

কুঞ্জবিহারী ওকেও উৎসাহ দিলেন—"এই তো মরদের মতো কথা!"

পরদিন। বিকেল বেলা।

লক্ষ্মণ টাকা-পয়সা নিয়ে ভজহরির মুদী-দোকানে এসে উপস্থিত।

"বুঝলে ভাই, দাদার সঙ্গে হঠাৎ ঝগড়া হয়ে আমি আর দাদা ভিন্ন ভাবে পুজো করছি। সে জন্য তোমার কাছ থেকে যত বলেছিলাম অত নিতে পারব —লক্ষ্মণ আগাগোড়া ব্যাপারটা ভজহরিকে বুঝিয়ে সবিস্তারে।

"আরে তার জন্যে আর কি! তবে দুঃখ এ আমার জন্যে তোমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে একটা ঝগড়া গেল!"—ভজহরির গলার স্বরে মনে হচ্ছিল ব্যাপারে দুঃখের আর তার অন্ত নেই।

কী যেন বলতে যাচ্ছিল লক্ষ্মণ, এমন সময় একজন লোক ঘরে ঢুকল ব'লে সে যে শুধু চুপ কর তাই নয়,—আশ্চর্য্যে বোবা হয়ে রইল কিছুকাল।

"আরে রাম বাবু যে! আসুন আসুন।"—ভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—"আসুন, আপনাদের পরিচয় দেই;—ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র—"

রাম তাকে থামিয়ে বলে উঠল—"থাক্, আপ আর কষ্ট ক'রে বলতে হবে না। ও আমার এক পেটের ছোট ভাই। কিন্তু ও আপনার বন্ধু হ'ল ক'রে বলুন তো? আমার সাথে তো আপনার চেনা হয়েছিল নারায়ণপুরের সূর্য্যবাবুর জমিদারী সেরে আমাদের চাকরী করবার কালে!" "আর লক্ষ্ম সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল বি.এম. ইস্কুলের ক্লাস সেভেন-এ উৎফুল্ল হ'য়ে ভজহরি উত্তর দিল।

"তাই না কি!!"—সদ্য কর্ক-খোলা সোডার বো মতো অবস্থা লক্ষ্মণের। রাম ততক্ষণে লক্ষ্মণে জড়িয়ে শিশির ভাদুড়ীর ভঙ্গীতে বলে উ "ভাই রে!"

লক্ষ্মণের অবস্থাও তথৈবচ, কিন্তু বলবার অনেকটা অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো—"দাদা রে!!" যেই রাম-লক্ষ্মণ আবার সেই রাম-লক্ষ্মণ।

কুঞ্জ উকিলের কথা জিজ্ঞেস করছ?

আমে-দুধে মিশে গেলে আঁটীর কি অবস্থা হয় আবার বলে দিতে হবে নাকি?

বাংলা দেশের মধ্যে সব চেয়ে বেশী লোক হচ্ছে ময়মনসিংহ জেলায়—প্রায় সওয়া ষাট লক্ষ। তার পরই ঢাকা—প্রায় সওয়া বিয়াল্লি এর পর যথাক্রমে ত্রিপুরা, বরিশাল এবং ২৪ পরগণা জেলা স্থান পায়।

স্মৃতির পটে

ঠাকুরদাদার আত্মকাহিনী

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

৪

বন্ধু বহরমপুর ফিরিয়া আসিলাম এবং সেখানকার আবার ভর্ত্তি হইলাম। তখনও আমাদের প্রথম শ্রেণী চলিতেছে। গণিতের একজন নতুন নিযুক্ত হইয়াছিলেন—তিনি আমাকে ভাল ছাত্র করিয়া বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না। কিন্তু সব সময়ে এই বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করি পড়া প্রস্তুত না করিয়াই ক্লাসে গিয়াছি। একদিন সেক্‌শন্'-এর একটা প্রশ্নের উত্তর সমাধানের জন্য ক বলিলেন, "তুমি আমার হইয়া ইহা দেখাইয়া আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। কি করিব ছি এমন সময়ে তিনি নিজেই চক্ হাতে বোর্ডের গিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। আমি হাঁফ ছাড়িয়া । আর একদিন একটা বেয়াদবি করিয়া ছিলাম। একটা বীজগণিতের অঙ্ক ক্লাসে কেহ ায় তিনি কষিয়া দেখাইলেন। আমি বুঝিলাম ইতেছে না, হঠাৎ একটা বে-ফাঁস কথা মুখ হইতে হইল। তিনি বিরক্তির সহিত ভৎর্সনা করিলেন ার কিছু করিলেন না। পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া অঙ্কটার সমাধান করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া াছিলাম।

স্কুলের অধ্যাপক মহাশয়কে সকলেই ভক্তি করিত। এক সময়ে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের পদে আধা পূর্ব্ববঙ্গে রিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বঙ্গের প্রসঙ্গ তুলিয়া আমাকে ক্ষ করিতে ছাড়িতেন না এবং বেণীসংহার এক স্থান একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া আমার তরফ উত্তর শুনাইতেন—"দৈবায়ত্তং দেশে জাতং পৌরুষং।" (দেশে জন্ম দৈবের আয়ত্ত কিন্তু আমার আয়ত্ত।) নাটকে 'দেশের' স্থানে 'কুলে'

সহপাঠীদের মধ্যে একজন খুব পালোয়ান ছিল—মল্লযুদ্ধ, ব্যায়াম-কৌশল প্রভৃতিতে তাহার সমকক্ষ কেহ ক্লাসে ছিল না। কৃষ্ণনগরের মহারাজকুমার ক্ষিতীশচন্দ্র আমাদিগের সহিত সংস্কৃত ও বিজ্ঞান পড়িতেন। তিনি কোর্ট অব ওয়ার্ড্‌সের অধীন একজন ইউরোপীয় তত্ত্বাবধায়কের নিকট শিক্ষা করিতেন, কিন্তু বিশেষ অনুমতি-ক্রমে ঐ দুই বিষয় কলেজে পড়িতেন। তিনি সকলের সহিত মিশিতেন না, কিন্তু আমার সহিত রহস্য করিতে ভালবাসিতেন। হয়ত বৃত্তির টাকাটা কাড়িয়া নিজ হাতে লইলেন অথবা হাতে পাঞ্জা কষিতে লাগিলেন। তিনি বলিষ্ঠ ছিলেন, আমি ছিলাম দুর্ব্বল। একদিন পাঞ্জা কষিতে আসিলে আমি পূর্ব্বোক্ত ব্যায়ামকুশল বন্ধুকে ডাকিয়া তাহার সহিত বল পরীক্ষা করিতে বলিলাম। তিনি তাহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। এই ব্যায়ামবীরকে মধ্যে মধ্যে আমাদের থাকিবার বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া বাড়ীর লোককে নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌশল দেখাইতাম। সে বলিত, 'আমি বাঁশ লইয়া তোমাদের দোতালায় লাফাইয়া উঠিয়া জিনিষপত্র লইয়া যাইতে পারি।'

বিজ্ঞানের অধ্যাপক মহাশয় একবার ছাত্রদের পরীক্ষা করিলেন। উত্তরের খাতাগুলি দেখা হইলে পর ফল জানিতে গেলাম—তিনি কথায় ও মুখের ভঙ্গীতে জানাইলেন, কিছুই হয় নাই। শেষে ক্লাস বসিলে বলিলেন, একখানি মাত্র কাগজ ভাল হইয়াছে, আর কোনটাই নয়। শেষে ভাল কাগজখানি আমার হওয়ায়, একটু অপ্রতিভ হইলেন।

একজন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের ছাতা-আতঙ্ক রোগ ছিল। তিনি তাঁহার বাসস্থানের সম্মুখ দিয়া কাহাকেও ছাতা মাথায় দিয়া যাইতে দিতেন না। মুরশিদাবাদের নবাব-

বাড়ী হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছিলেন কিনা জানি না। যাহা হউক, আমার ইহা ভাল লাগিত না—একদিন অহিংস প্রতিরোধের সঙ্কল্প করিলাম। ছাতা বন্ধ না করিয়াই সাহেবের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছি দেখিয়া চাপরাসী ছুটিয়া আসিল এবং ছাতা বন্ধ করিবার হুকুম জারি করিল। আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও সহযাত্রী অন্য ছাত্র ছাতাটী বন্ধ করিয়া দেওয়ায় এখানেই এ অঙ্কের যবনিকাপাত ঘটিল।

একবার একটী ছাত্র অন্য ছাত্রদিগের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইয়া কলেজ হইতে দেওয়া কতকগুলি উদ্বৃত্ত সাদা কাগজ পরীক্ষা-স্থল হইতে বাড়ী লইয়া আসিয়াছিল এবং পরে প্রিন্সিপাল সাহেবের নিকট গিয়া উহার দাম দিয়াছিল। সাহেব খুব খুসী হইয়া উহাকে তাঁহার নিকট ডাকাইয়া ৫টী টাকা পুরস্কার দিলেন। ছাত্রটী এই টাকা রাখে নাই—সাহেবকে ফিরাইয়া দিয়াছিল।

বহরমপুরে অবস্থান কালে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিরও একটা ব্যবস্থা না ছিল এমন নয়। শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরে ৺কাশীধামের কৃষ্ণানন্দ স্বামী) প্রবর্ত্তিত সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা ছিল এই ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল। এখানে পণ্ডিত মহাশয় শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন, ছাত্রেরা স্তোত্র পাঠ করিত, বক্তৃতা করিত। নিখিল ছিল একটী প্রধান বক্তা। আমার বক্তৃতা বড় একটা আসিত না, তবে গদ্য পদ্য রচনায় হাত পাকাইবার একটু আধটু চেষ্টা ছিল। স্থানীয় একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকায় যখন আমার একটা প্রবন্ধ বাহির হইল তখন মনে যে একটা গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম তাহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। নিখিল বক্তৃতা করিতেও পারিত, লিখিতেও পারিত। সে ছাত্রবৃত্তি পাস করিয়া আসিয়াছিল (যত দূর মনে পড়ে) এবং সেজন্য বয়সে আমা অপেক্ষা কিছু বড় হইলেও পড়িত আমার নীচে। সে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণও পড়িত। পরে বহরমপুরের জামদার ডাঃ রামদাস সেনের জামাতা হইয়া ঐতিহাসিক গবেষণার অনেক সুযোগ পাইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় মধ্যে মধ্যে বহরমপুর আসিতেন, সুনীতি সঞ্চারিণী সভার তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং ধর্ম্ম বিষয়ে জনসভায় বক্তৃতা দিতেন। [illegible] সভার সভ্যদের নামে এক কবিতা লিখিয়াছিলেন—

> "নব, নিখিল, মোহিনী, শচীপতি,
> বহুবল্লভ,……..."

সবটা মনে নাই তবে আর এক ছত্রে আ[illegible] "বিশু শিশু" রূপে স্থান পাইয়াছিল। কবিতাটী [illegible] স্কুলে পড়ার অবস্থায়, নতুবা আমার বয়স [illegible] থাকিলেও একেবারে "শিশু" হইয়া যাইব কেন?

নব—নবকৃষ্ণ রায়, ইনি পরে জয়পুর ম[illegible] কলেজে অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ঠিক বলিতে[illegible] তেছি না, বোধ হয় কিছুদিন অধ্যক্ষও ছিলেন।

নিখিল—পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রা[illegible]

মোহিনী—পরে বহরমপুর কলেজে বিজ্ঞানের [illegible] হইয়াছিলেন।

শচীপতি—যে ডাক্তার বাবু আমার ম্যা[illegible] চিকিৎসা করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র। কর্ম্মজীবনে[illegible] সহিত আবার দেখা হইয়াছিল—মুঙ্গেরে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় অনর্গল বক্তৃতা [illegible] পারিতেন। আর একজন ধর্ম্মপ্রচারক—সুবিখ্যা[illegible] শশধর তর্কচূড়ামণি মধ্যে মধ্যে বহরমপুর আ[illegible] ও বক্তৃতা দিতেন। ইঁহারা উভয়ে তৎকালীন [illegible] 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সাহায্যে হিন্দুধর্ম্মের বা[illegible] হিন্দুসমাজে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। তর্কচূড়ামণি [illegible] ছিলেন ফরিদপুর জেলার লোক, আমাদের গ্রামের [illegible] তাঁহার গ্রাম। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা জানিতে[illegible] নাই।

খেলাধূলার মধ্যে এ সময়ে ক্রিকেটই ছিল [illegible] আমি একটি ক্ষুদ্র ক্লাবের সেক্রেটারী হইয়াছিলা[illegible] খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলাম এ কথা কোন্ মুখে [illegible] একবার বহরমপুর ও রাজসাহী কলেজের [illegible] হইল। আমি বহরমপুরের ১১ জনের মধ্যে ছিল[illegible] শেষের দিকে ব্যাট ধরিয়াছিলাম; কিন্তু বিশে[illegible] দেখাইতে পারি নাই।

ক্রমে এফ, এ পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষা[illegible] কোন কোন দিন বোধ হয় কুইনিন্ সেবন করিয়া[illegible] ছিল। 'বোধ হয়' বলিলাম—কারণ ঠিক স্মরণ নাই এই পরীক্ষায় কি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় ঘটিয়াছিল। [illegible]র পর প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের নিকট হইতে এক [illegible]র্টিফিকেট লইয়া আজিমগঞ্জে চলিয়া আসিলাম। সেখানকার মুন্সেফ বাবু ইংরাজী ভাষায় বেশ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা চলিত এবং তাঁহার পাঠ্যাবস্থার অনেক গল্প শুনিতাম। কিছুদিন পরে বাড়ী (ফরিদপুর জেলায়) চলিয়া আসিলাম।

রায় বাঘিনী

শ্রীরাধারাণী দেবী

[illegible]য় বাঘিনী বলতে সাধারণতঃ খুব তেজস্বিনী বা [illegible] স্ত্রীলোককে বোঝায়। আমাদের দেশে ননদিনী-[illegible]ই দুর্নাম আছে। বোধ হয় অল্পবয়সী ভাইবৌদের ননদদের পীড়নটা এক সময়ে খুব বেশী হ'ত ব'লে [illegible] রসিক ননদদের ঐ নামকরণ করেছিলেন। কিন্তু 'রায় বাঘিনী' উপাধিটা মোটেই দুর্নাম-সূচক নয়, ঐ নামের মধ্যে যে ইতিহাস রয়েছে তা জানলে [illegible] বাঙ্গালী মেয়েই ঐ নাম পেলে গৌরব বোধ [illegible]।

[illegible] অনেক দিন আগেকার কথা, এখন যেখানে হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা হয়েছে, সেইখানেই, [illegible] অংশ নিয়ে, ছিল এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য—ভূরি-[illegible] অনেক বড় বড় শ্রেষ্ঠী বা সওদাগরের বাসস্থান [illegible]লেই বোধ হয় রাজ্যের ঐ নাম হয়। 'পাণ্ডুদাস [illegible]ন এখানকার রাজা; তাঁর নাম থেকে তাঁর রাজ্যের [illegible]নীর নাম হয় পাণ্ডুয়া।

[illegible]ন্তু সব রাজ্যের রাজধানী বরাবর এক জায়গায় [illegible] না; পরবর্ত্তী কালের এক রাজা এ রাজ্যেরও রাজ-[illegible] সরিয়ে নিয়ে এলেন ভবানীপুরে—পাণ্ডুয়া থেকে [illegible] ক্রোশ দূরে। সেখানে গড় বা দুর্গ তৈরী হ'ল—[illegible]পুর হ'ল গড় ভবানীপুর।

[illegible]রও পরে অনেক দিন কেটে গেল। ভারতের [illegible] পাঠান সাম্রাজ্য এল এবং চলে গেল। ভূরিশ্রেষ্ঠ [illegible] স্বাধীন। তার পর মোগল-যুগ। এ সময়ে কিন্তু [illegible] সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না। অবশ্য নামেই; কার্য্যতঃ মোগল দরবারে যৎসামান্য কর দেওয়া ছাড়া তার স্বাধীনতায় কোন বাধা ছিল না।

সম্রাট্ আকবর তখন দিল্লীর সম্রাট্। ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজ রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়েছে, রাজ্যশাসন করছেন তাঁর বিধবা পত্নী রাণী ভবশঙ্করী। ভবশঙ্করী ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বিনী মহিলা, তাঁর সুশাসনে ভূরিশ্রেষ্ঠ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

এদিকে রাজ্যহারা পাঠানেরা তখনও মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করতে ইচ্ছুক নয়—হৃত রাজ্য কি ক'রে উদ্ধার করবে তারই চেষ্টা করছে তারা। তাদেরই এক সর্দ্দার—ওসমান, রাণী ভবশঙ্করীকে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু নানা কারণে ভবশঙ্করী তা'তে রাজী হলেন না। পাঠান-সর্দ্দার গেলেন চটে, মনে মনে ঠিক করলেন রাণীকে শায়েস্তা করবেন।

গড় ভবানীপুর থেকে সাত ক্রোশ দূরে বাসডিঙা গড়। অমাবস্যার রাত্রে রাণী সেখানে যান দেবমন্দিরে পূজো দিতে। ওসমান খবর পেয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে আগে থাকতেই তার কাছাকাছি লুকিয়ে রইলেন, তার পর রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে সেই দেবমন্দির আক্রমণ করলেন।

ভবশঙ্করী প্রস্তুত ছিলেন না। সামান্য কয়েকজন দেহরক্ষী ছাড়া তাঁর সঙ্গেও কেউ ছিল না। কিন্তু তিনি বিচলিত হলেন না, সেই সামান্য কয়েকজন রক্ষী নিয়ে নিজেই ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার হাতে অমিত বিক্রমে

যায় না সেথা রেলের গাড়ী,
নেইকো সেথা মুটে,
ছায়ার আড়ে সাতটী চাঁপা
নিতুই থাকে ফুটে।
রাজার ছেলে সেইখানেতে
পক্ষিরাজে চ'ড়ে
তেপান্তরের পারে, মা, যায়
নতুন আলোর ভোরে।
মায়ের নামটী বল্‌তে আমায়
দিলে চুমোখানি

বুকের পরে তুলে নিয়ে
দুঃখী দুয়ো রাণী।
মায়ের বিদেশ মায়ের কোলে
অরূপ মায়ায় মাথা,
মায়ের মুখের রূপকথা আর
চাঁদের আলোয় ঢাকা।
বাবার বিদেশ অনেক দূরে
যেথায় রেলের গাড়ী,
ছুটি সেথায় নেইক', শুধুই
কাজের তাড়াতাড়ি।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

বাংলা সাহিত্যের কাহিনী—শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত। বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ॥৵০

জ্ঞানভারতী গ্রন্থমালার ৪র্থ গ্রন্থ। এই বইখানায় বাংলা সাহিত্যের সুরু থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্র-যুগ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক পরিচয় ছোটদের মত ক'রে দেওয়া হয়েছে। এ ধরণের একখানি বইএর অভাব অনেক দিন থেকেই ছিল, লেখক এ দিক্ দিয়ে ছোটদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ছোটরা এতে অনেক নতুন কথা জানতে পারবে। তবে একটি কথা, বইটি ছোটদের জন্য লেখা, এবং লেখক নিজেও একজন শিশুসাহিত্যিক। কিন্তু আশ্চর্য্য, বইটির কোথাও শিশুসাহিত্যের কোন উল্লেখ নেই (এক সুকুমার রায়ের নাম ছাড়া—তাও তিনি যে ছোটদের জন্য লিখেছেন তা বলা হয় নি)।

শিব্রাম্ চকর্‌বর্‌তির মতো কথা বলার বিপদ—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। দি বুক এম্পরিয়ম লিঃ, ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকা[তা]। দাম ১।০

এই বইখানিতে শিবরাম বাবুর ১২টি অফুরন্ত হা[সির] গল্প আছে। প্রথম গল্পের নাম থেকে বইএর নাম [হ]য়েছে। শিবরাম বাবুর লেখার বিশেষ ভঙ্গীটি[ও] মধ্যে পূরো মাত্রায় পাওয়া যাবে। গ্রন্থকার আজ[কাল] ছোটদের জন্য লেখা কমিয়ে দিয়েছেন,—এ বই প[ড়ে] ছোটরা আবার তাঁকে ঘন ঘন শিশুসাহিত্যের আ[সরে] নামবার তাগিদ দেবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

মহাপূজা—শ্রীঅখিল নিয়োগী। ১২৩, বহুবা[জার] ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। দাম ॥০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক। লেখক [শিশু]সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁর লেখা গল্প, কবিতা, না[টক] প্রভৃতি ছেলেরা পছন্দ করে। পূজোর সময় এ রকম এ[ক]খানি অভিনয়ের উপযোগী বই পেলে তারা খুবই খুসী [হবে।] বইটির একাধিক সংস্করণ এর জনপ্রিয়তার পরিচায়[ক।]

বিলাতে ভিক্ষা করা নিষেধ। কেউ ভিক্ষা চাইতে হ'লে টুপিটা খুলে সামনে পেতে দাঁড়ায়। অন্ধ, কালারা অনেক সময় গলায় লেবেল ঝুলিয়ে বসে থাকে। এক ভদ্রলোক যেতে যেতে দেখলেন এই রকম লোক বসে আছে, তার গলায় লেবেল ঝোলান—অন্ধ। ভদ্রলোক সহানুভূতি দেখিয়ে একটা পেনি তার ফেলে দিলেন। পেনি পাওয়া মাত্র ভিখারী সেটা তুলে আঙ্গুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। ভদ্রলোক হয়ে বল্লেন, "তবে যে লেবেলে লেখা রয়েছে তুমি অন্ধ?" লোকটি থতমত খেয়ে বল্‌ল, "আজ্ঞে ভুল লিখেছে, অন্ধ নই, বোবা।"

[গ]ত ২রা সেপ্টেম্বর ভারতের ইতিহাসে এক নতুন [অধ্যায়ের] সূচনা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওহরলাল [নেহ]রুর নেতৃত্বে ১২জন ভারতীয় নেতা মধ্যবর্ত্তী কালের [জন্য] ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন-ভার গ্রহণ করেছেন। [ভারতে]র স্বাধীনতার পথে এটি প্রথম ধাপ বলা যেতে পারে। [জাতী]য়তাবাদী ও অন্যান্য দলের মুসলমানরা যোগ দিলেও [মুস]লিম লীগ্ দল এখনও এই জাতীয় গভর্ণমেণ্টে যোগ [দে]নি।

* * *

[শোনা যাচ্ছে] সম্প্রতি দিল্লীতে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে [লীগ] সভাপতি জিন্না সাহেবের নতুন ক'রে সাক্ষাৎ-আলো[চনা] সুরু হয়েছে। তার ফলে তাঁরা মত বদলাবেন কিনা [শীঘ্রই] বোঝা যাবে। ইতিমধ্যে লীগের নেতারা আন্দোলন [চালাবা]র পরিকল্পনা করছেন।

* * *

[ক]লকাতায় যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়ে গেল [সে] কথা তোমাদের আগেই বলেছি। ভারতের ইতিহাসে [এর] বোধ হয় তুলনা নেই। উভয় সম্প্রদায়েরই নিরীহ এবং [গরী]ব লোকেরাই বেশী মারা গেছে বা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। [আমরা] তাঁদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। এই [ব্যাপা]রে বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর আচরণ সম্বন্ধে অনেক কথা [উঠে]ছে। দাঙ্গা বিষয়ে শীঘ্রই একটি তদন্ত কমিশন বসছে। [তার] রিপোর্ট বেরোলে অনেক রহস্য প্রকাশ পাবে ব'লে [মনে হ]য়।

* * *

[ক]লকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরেই ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের [নানা] অঞ্চলে সংঘর্ষের খবর আসছে; ওদিকে বোম্বাইএও [দাঙ্গা] শুরু হয়েছে। কলকাতার মত বীভৎস না হ'লেও [এর পরি]ণাম ভেবে প্রত্যেক সুস্থমস্তিস্ক লোকই আতঙ্কিত [হয়ে প]ড়েছেন।

কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য আই. এফ. এ শীল্ড্ প্রতিযোগিতা আর শেষ হতে পারে নি, অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায়ই এবারের মত তা পরিত্যক্ত হ'ল। ওদিকে বিলাতে ভারতীয় ক্রিকেট দল তাদের ভ্রমণ শেষ করেছে। ইংল্যাণ্ড দলের সঙ্গে তাদের ৩য় টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয়ে বৃষ্টির জন্য অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে।

* * *

বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা লেখক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আর ইহলোকে নেই। সম্প্রতি ৭৮ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্রমথ বাবু 'বীরবল' এই ছদ্মনামে লিখতেন এবং বাংলায় এক নতুন ভাষার প্রবর্ত্তন করে-ছিলেন। তার নাম বীরবলী ভাষা। তখন অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হ'লেও ক্রমে বেশীর ভাগ সাহিত্যিকই এই ভাষার অনুসরণ করেছেন। এর থেকেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বীরবলের ব্যঙ্গ রচনাগুলি এবং তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' মাসিক পত্র বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম অমর ক'রে রাখবে। প্রমথ বাবু ৺স্যার আশুতোষ চৌধুরীর ছোট ভাই, এবং রবীন্দ্রনাথের দাদা, ভারতের প্রথম আই. সি. এস্ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা ছিলেন। বিদূষী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। রামধনুর প্রথম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য কলেজে প্রমথনাথের সহপাঠী ছিলেন।

* * *

সম্প্রতি ইংরাজী সাহিত্য জগতেও একটি বড় রকমের ক্ষতি হয়ে গেছে—বিখ্যাত লেখক, ঔপন্যাসিক ও চিন্তা-নায়ক এইচ. জি. ওয়েল্‌সের মৃত্যুতে। এইচ. জি. ওয়েল্‌সের নাম তোমরা সকলেই শুনেছ—তাঁর কোন কোন লেখার বাংলা তর্জ্জমাও হয়তো পড়েছ। 'ইন্‌ভিজিবল্ ম্যান্,' 'দি ফার্ষ্ট্ মেন্ ইন্ দি মুন্', 'টাইম্ মেশিন্,' 'শেপ্ অব্ থিংস্ টু কাম্' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত বই। তাঁর রচিত

'পৃথিবীর ইতিহাস' ইংরাজী ভাষায় একটি অমূল্য গ্রন্থ। এ সবের ভিতর দিয়ে তিনি শুধু ইংরেজীর নয়, বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় ৯০ বছর হয়েছিল।

* * *

এইচ জি. ওয়েল্‌সকে হারাবার পর কয়েক দিন যেতে না যেতে ইংল্যাণ্ড আর একজন মহামানবকে হারিয়েছে—ইনি বিজ্ঞানবীর স্যর জেম্‌স্ জীন্‌স্। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে এঁর মত প্রতিভাশালী লোক এ যুগে খুব বেশী জন্মান নি। মনীষী অলিভার লজ্ প্রভৃতি কারও কারও মতে জগতের ছ' জন শ্রেষ্ঠ লোকের নাম করতে জীন্‌সকেও তার মধ্যে ধরতে হয়।

জীন্‌স্ সারা জীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অঙ্ক নিয়ে কাটালেও সাহিত্য-ক্ষেত্রেও কিছু দান না করে নি—অবশ্য বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে। তাঁর লেখা 'দি মিষ্টিরিয়াস ইউনিভার্স' (রহস্যময় ব্রহ্মাণ্ড) বিশ্বসাহিত্যের এক অপূর্ব্ব বই। কয়েক বছর আগে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে জীন্‌স্ কলকাতায় এসেছিলেন।

চিঠিপত্র

রামধনুর প্রিয় বন্ধুগণ,

দীর্ঘ এক বছর পরে পূজোর আনন্দের দিনে তোমাদের কাছে নতুন রামধনু নিয়ে হাজির হয়েছি, কিন্তু মনে সে আনন্দ কই! মাত্র কয়েক দিন আগে চোখের ওপর বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্র—রাজধানী কলকাতার ওপর যে বীভৎস নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল—তার কথা মনে হলেই মন বেদনায় ভরে ওঠে।

এই হতাশার দিনে নতুন ক'রে তোমাদের হৃদয়ের পরিচয় পেলাম। তোমাদের অসংখ্য ছোট ছোট চিঠিতে যে উদ্বেগ জানিয়েছ, তারই কথা বলছি। প্রত্যেককে ভিন্ন পত্র দেওয়া সম্ভব নয়, তাই রামধনুরই পাতায় সকলকে তার জবাব দিচ্ছি।—তোমাদের হয়ে তোমাদের সমবেদনাও সকলের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।

তোমরা দেশের কিশোর-শক্তি, ভাবী পৃথিবীকে তোমরাই গড়ে তুলবে। তোমাদের মনের প্রসারতাই আমাদের সব চেয়ে বড় সম্পদ্।

খুব অল্প দিনে পর্ব্বতপ্রমাণ ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে এ প্রকাশ করতে হ'ল। বিশেষ সংখ্যার ছাপ এতে পাবে। গত বারে জানিয়েছিলাম, আমাদের কা অসুবিধার কথা। ভারত সরকার থেকে এখনও আ কাগজের জন্য আবেদনের কোন জবাব পাওয়া যা কিন্তু পূজো এসে পড়েছে, পত্রিকা প্রকাশে দেরি করা যায় না—তাই যে কাগজ পাওয়া গেছে তাই এ সংখ্যা প্রকাশ করা হ'ল। বরাবরকার মত ধারাব উপন্যাসগুলি এ সংখ্যায় দেওয়া হ'ল না—তার দেওয়া হ'ল সম্পূর্ণ গল্প।

আশা করি পূজোর দিনগুলি নিরুপদ্রবে কা আবার দেখা হবে পূজোর ছুটীর পর কার্ত্তিকে সপ্তাহে। পূজোয় আমাদের কার্য্যালয় কিছু দি থাকবে কিনা, তাই কার্ত্তিক সংখ্যা ঐ সময়ে বেরো

—রা

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

(গ্রাহক-গ্রাহিকার লেখা)

ছড়া

শ্রীশিপ্রারাণী ঘোষ (বয়স ৭ বছর)

আমাদের বড় বাবু রাত দশটায়
কচু খেয়ে মুখ ফুলে করে হায় হায়।

তার কি বিপদ্ হায়, সে আর কি করে—
মুখে পাউডার দিয়ে শেষে শুয়ে পড়ে।

রামধনু

শ্রীমতী মীরা ঘোষ

কিশোর প্রাণের বন্ধু তুমি
হে রামধনু ভাই,
মাস কাবারে আসবে কবে
ভাবছি বসে তাই।

হাল্কা হাসির তুফান জাগাও,
জাগাও যে কল্পনা,
মনের কোণে সাতটি রঙের
আঁকিয়া আল্‌পনা।

কল্পপুরীর রাজ্যে বসে
যাদুকরের মত
অলক্ষিতে জয় করিছ
কোমল হৃদয় যত।

যে আনন্দ জাগিয়েছ ভাই,
আমার মনের কোণে
দিচ্ছি তোমায়, দাও বিলিয়ে
সকল ভাই ও বোনে।

নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

বাংলা শিশুসাহিত্যকে যাঁরা গড়ে তুলেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম নীচে দেওয়া হ'ল। এঁদের মধ্যে যে কোন একজনের জীবন-কাহিনী সংগ্রহ ক'রে নিজের ভাষায় লিখে পাঠাতে হবে।

প্রমদাচরণ সেন, ভুবনমোহন রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

১ম ও ২য়—দু'টি পুরস্কার দেওয়া হবে। রচনা ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নং দিতে হবে। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত ব'লে ধরা হবে।

রজত স্মৃতি-পুরস্কার-প্রতিযোগিতার রচনা পাঠাবার শেষ তারিখও, সাম্প্রতিক হাঙ্গামার জন্য, ১৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

ধাঁধার উত্তর

শ্রাবণের ধাঁধার উত্তর—

ভুলু

উত্তরদাতাদের নাম—মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর); সেন (কলিকাতা); গজা, গুঁড়ি ও দেবী বিশ্বাস (কলিকাতা); অমলকুমার মিত্র, আরতি দাস (গৌহাটী); কুমার দাস (জিয়াগঞ্জ); ছবি, ছায়া ও মায়া রায় (নিউ দিল্লী); সত্যনারায়ণ আগরওয়াল (মানকাচর); সরোজকুমার ও অনিলচন্দ্র (বহরমপুর); পূর্ণচন্দ্র দাস (হবিগঞ্জ); রমা মৈত্র (লাহোর)।

ভাদ্রের ধাঁধার উত্তর—

কালকা

উত্তরদাতাদের নাম—ছবি, ছায়া ও মায়া রায় (নিউ দিল্লী); তরু রায় (কলিকাতা); শিবানী দেবী (লক্ষ্ণৌ); মহেন্দ্র ও নরেন্দ্র বসু (বালাগঞ্জ); নূরজাহান বেগম (কলিকাতা); খোকন ও অনু (পাটনা); রত্নাবলী রায় (ভাগলপুর)।

নূতন ধাঁধা

হেঁয়ালী

১। কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চলতে পারে?
২। দাঁড়ালেই কার মাথা ঘোরে?
৩। না রাগলেও কার মাথায় যখন তখন আগুন চড়ে?
৪। কোন্ জিনিষ ঘরে না থাকলেও তা দেওয়া সম্ভব?
৫। চোখের সামনে থাকলেও কাকে দেখবার উপায় নেই?
৬। তোমার মা যাঁকে যেতে বলছেন তিনি তোমার কে হন?

দ্রষ্টব্য:—পূজার ছুটীর জন্য কার্ত্তিকের রামধনু কার্ত্তিক মাসের ২য় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

বিংশ শতাব্দীর স্মরণীয় সাহিত্য আহরণ !

স্মরণাতীত কাল থেকে আজপর্য্যন্ত শিশু-কিশোর-তরুণদের বিশ্রামের অবসর আনন্দ-মুখর ক'রে তোলবার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে এসেছেন, সবার আগে তাঁদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে প্রকাশের আয়োজন হচ্ছে, অভিজাত-পূজাবার্ষিকী—'আকাশদীপ'।

যুগমান্য শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ,

শিশুসাহিত্য-সম্রাট

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

— চিত্রবহুল বিরাট পূজাবার্ষিকী —

আকাশদীপ

মহাপূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হবে।

গত পূজায় 'কলরব' পেয়ে যাঁরা খুশী হয়েছেন, 'আকাশদীপ' তাঁদের চিত্ত আকর্ষণ করবেই এ-বিশ্বাস আমাদের আছে।

অলকনন্দা-সিরিজ অতঃপর প'ড়বেন—

শিশুসাহিত্য-সম্রাট **হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'সুন্দরবনের রক্তপাগল !'**

তারপর শিশুসাহিত্যাচার্য্য **সৌরীন্দ্রমোহনের 'পথভোলা পথিক'**

১। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
রত্নপুরের যাত্রী

২। শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
"বন্দী, জেগে আছো ?"

৩। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
রীতিমত এ্যাড্‌ভেঞ্চার

৪। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

৫। শ্রীসুমথনাথ ঘোষের
মোহন সিংয়ের ফাঁসী

৬। শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
অভিশপ্ত সম্পদ

শরৎ-সাহিত্য-ভবন * ২৫,ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, পোঃ বক্স ১৬৬১০, কলিকাতা।

—দেশবাসীর এই অনাবিল প্রশংসা আমাদের উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধন করে আসছে এক শতাব্দীর উপর। এর মূলে রয়েছে আমাদের একনিষ্ঠ সাধনা, কারিগরগণের অননুকরণীয় নৈপুণ্য ও তদুপরি আমাদের বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট উপকরণ।

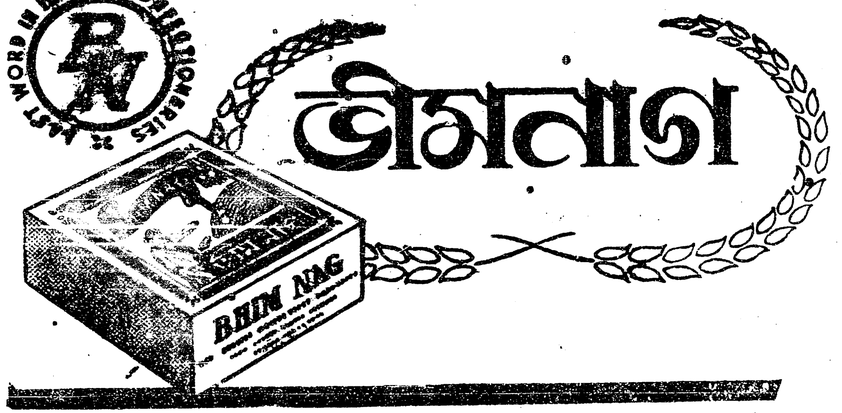

গহনা ও শাড়ী

শুধু শাড়ী যত সুন্দর হোক,
তা নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ করে না।
শুধু গহণা যত সুন্দর হোক,
তাতে নারী-রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে
ওঠে না।
শাড়ী ও গহণার মিলনেই
নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ হয়।

তাই আমরা—
পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা পরিবেশনের
জন্য নানা প্রকারের বেণারসী শাড়ীর
আয়োজন করেছি— শাড়ীগুলি
বর্ণ-বৈচিত্র্যে রূপরচনায়
অনিন্দ্যসুন্দর।

আমাদের গহণা—আধুনিক রুচি-
সম্মত শিল্পচাতুর্য্যে, রূপছন্দে
অভিনব।

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

... বর্ষ
... সংখ্যা
কার্ত্তিক,
১৩৫৩

বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ১৷৹
প্রতি সংখ্যা
।/৹

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্.সি

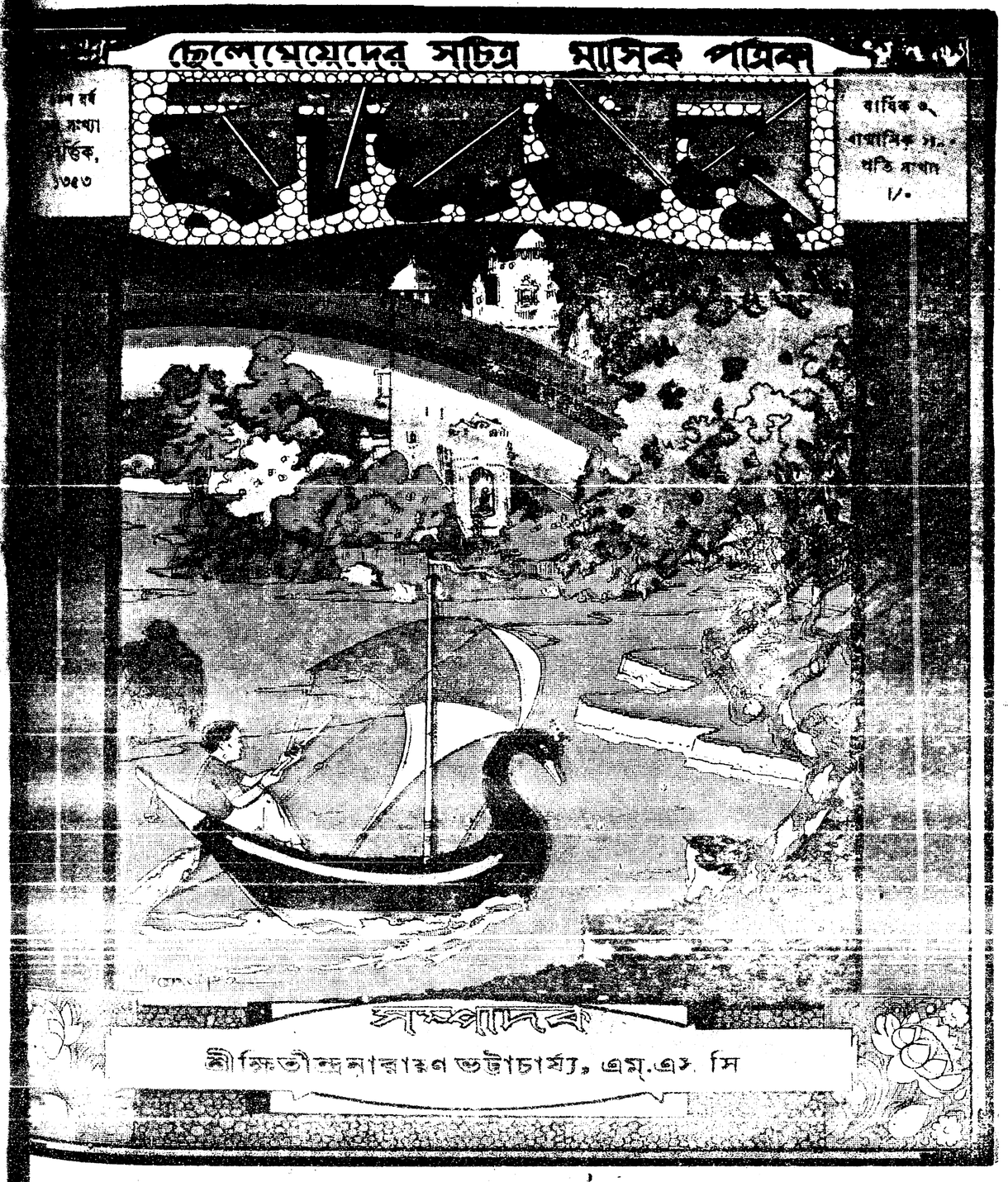

কার্য্যালয়: ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন: সাউথ ...

Regd. No C-

গহনা ও শাড়ী

শুধু শাড়ী যত সুন্দর হোক,
তা নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ করে না।
শুধু গহণা যত সুন্দর হোক,
তাতে নারী-রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে
ওঠে না।
শাড়ী ও গহণার মিলনেই
নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ হয়।

তাই আমরা—
পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা পরিবেশনের
জন্য নানা প্রকারের বেণারসী শাড়ীর
আয়োজন করেছি— শাড়ীগুলি
বর্ণ-বৈচিত্র্যে রূপরচনায়
অনিন্দ্যসুন্দর।

আমাদের গহণা—আধুনিক রুচি-
সম্মত শিল্পচাতুর্য্যে, রূপছন্দে
অভিনব।

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১৯শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা
কার্ত্তিক,
১৩৫৩

বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ১৸৹
প্রতি সংখ্যা
।/৹

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস. সি

কার্য্যালয় : ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন : সাউথ

COLOUR PAPER

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে

বাংলার লক্ষ্মীশ্রী

ফিরিয়া আসুক

—'লক্ষ্মী ঘি'

— কয়েকটা দুর্দ্দান্ত বই —

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

১। হত্যা এবং তারপর ১৲ ২। মোহনপুরের শ্মশান ॥৵০

মণিলাল অধিকারীর রক্তাভ-বুদ্ধ ১৲

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিদেহী আত্মা ১।০

পূজোর আগেই বেরুবে।

সবে বেরুলো! **বিভীষিকা সিরিজ** পাতায় পাতায় শিহরণ

১। **অদৃশ্য কালো হাত**—নীহাররঞ্জন গুপ্ত ২। **দ্বীপান্তরের কয়েদী**—অমিয় চক্রবর্ত্তী।
৩। **রক্ত-পিপাসু**—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪। **আকাশের ইঙ্গিত**—নীলাদ্রিশিখর বসু!

প্রতি বই আট আনা

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
১০৯।এ, লেক রোড, কলিকাতা

এবার পূজায় ছেলেমেয়েদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার

অঞ্জলি

কবিতা
গল্প
উপন্যাস
আমোদ প্রমোদ
খেলাধুলা
রং বেরংয়ের ছবি

বিরাট ঝকঝকে বই!
ছোটদের আনন্দের খনি!

পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

দেব সাহিত্য কুটীর ★ ২২/৫ বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ও জন-কল্যাণে

লিলি-ব্র্যাণ্ড বার্লি

তার আদর্শকে কোন দিন খর্ব করে নাই।

তাই সুদিনে বা দুর্দিনে সবার কাছে
তার **সমান আদর!**

লিলি বিস্কুট কোম্পানী : কলিকাতা

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"

(গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

আট রকম বইএর নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, বাকি বইগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

১। হারান বই—(নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)
২। নিঝুম রাতের কান্না—(বিমল দত্ত)
৩। রাতের আতঙ্ক—(নীহাররঞ্জন গুপ্ত)
৪। স্বর্গের সিঁড়ি—(সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)
৫। কেউটের ছোবল—সুনির্মল বসু
৬। অভিশপ্ত ম্যামী—(নীরদচন্দ্র মজুমদার)
৭। বিভীষণের জাগরণ—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

প্রত্যেকখানি বারো আনা

"প্রহেলিকা সিরিজ"

(ডিটেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চার)

ফাল্গুন মাস—**রক্ততৃষা**—অনলকুমার চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র—**নকলের হিমালয়**—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বৈশাখ—**বি, এল, এ-২০৫**—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো
জ্যৈষ্ঠ—**জয় পরাজয়**—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
আষাঢ় **পূজনীয় দস্যু**—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রাবণ—**দুর্যোগের রাতে**—শ্রীসব্যসাচি

প্রত্যেকখানি দাম এক টাকা

বিরাট সচিত্র গ্রন্থ—১৫৪ পৃষ্ঠা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—(আট খানা হাফটোন ছবি

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

এক মাসের মধ্যে বই নিঃশেষ হওয়ায়

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

চমকপ্রদ অন্তর্দ্ধান কাহিনী পরিপূর্ণ মূল্য ১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর ✱ ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি। দাম এক টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৯শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৫৩ | ৭ম সংখ্যা

অশিক্ষিত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র দেবালয়ে
দেখ্‌তেছিলাম কৌতুক বিস্ময়ে,
বৃদ্ধ জনেক চক্ষু ভরা নীর—
অঙ্গনেতে লুটায় তাহার শির।
কি আনন্দ মূর্ত্তি পানে চাহি,
চক্ষেতে তার পলক যেন নাহি!
অন্য কিছু দেখার নাহি সখ,
জীবন তাহার হয়েছে সার্থক।

জিজ্ঞাসিলাম 'করছ প্রণাম কা'কে—
মূর্ত্তিকে না বিশ্ব-নিয়ন্তাকে?'
বল্লে বুড়া 'কোথায় ভগবান্—
ওই তো তিনি, যার কর সন্ধান।'

জানিয়ে দিলাম এটা সুনিশ্চয়,
মূর্ত্তি ওটি, ভগবান্ তো নয়!
হতে পারে—দেহে যেমন প্রাণ
উহাতে হয় তাঁহার অধিষ্ঠান।

ক্রুদ্ধ হয়ে বৃদ্ধ করে খেদ
'মূর্ত্তি এবং ভগবানে ভেদ?
ভগবান্ তো ছাড়া কিছুই নাই—
প্রণাম করি যাঁকে তিনিই তাই।
কোন্ জিনিষটি ভগবানের নয়?
কোথায় তিনি নাইকো মহাশয়?'
লাগলো দ্বিধা—জাগলো মনে ক্ষোভ
অশিক্ষিত আমি—না ওই গোপ!

বাবু, চিঠি

শ্রীশামুক

ছোট বেলায় 'ডাকঘর ডাকঘর' খেলতে সব চেয়ে ভালবাসতাম। তখন জানতাম না যে বড় হয়ে সারা জীবন ঐ খেলাটিই খেলে যেতে হবে।

পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি ছিল। বাড়ির সামনের আঙিনায় বকুলতলায় ছিল আমার ছোট্ট ডাকঘর — ইট সাজিয়ে ও তার ওপর পরিষ্কার করে মাটি লেপে।

সমস্ত কাজকর্ম আমাকে একলাই সামলাতে হ'ত। যত রাজ্যের পুরানো ও পড়া চিঠি চেয়ে চেয়ে যোগাড় করে আনতাম, সেগুলি আমার দেশবিদেশ থেকে আসা সব চিঠিপত্র। তাদের ওপর হাতের মুঠো দিয়ে ঘুঁষি মেরে মেরে ডাকঘরের ছাপ লাগানো হ'ত, তারপর একটি ছোট থলিতে ভরে বাড়ি বাড়ি বিলি করতে বেরুতাম ঠিক আমাদের শম্ভু পিয়নের মতই।

বুড়ো আমগাছের তলায় গিয়ে হাঁক দিতাম,—দা'ঠাকুর, আজ্ঞে, আপনার একখানি চিঠি; রেজিষ্টারী চিঠি।

বাতাসে গাছের পাতা ঝর ঝর শব্দ করে যেন পরম আগ্রহে বল্‌ত—দাও ভাই, দাও। তখন কাঠঠোকরা ডেকে উঠলে মনে হ'ত অবিকল দা'ঠাকুরের কাসির শব্দ— খক্‌ খক্‌!

তুলসীতলায় গিয়ে ডাকতাম, মণি-পিসি গো, তোমার একটি পোষ্টকার্ড, ছেলে দিয়েছে—ঠিক তেনার হাতের লেখা।

তুলসী গাছ মণি-পিসি হয়ে সাদা থান পরে মালা জপতে জপতে এগিয়ে আসত, আলগোছা ফেলে দিতাম চিঠি আঁচলের থলিতে। ওঁর প্রশ্নের উত্তরে শম্ভু পিয়নের মত এক গাল হেসে মাথা নেড়ে বলতাম,— এর মধ্যেই মনি অর্ডার কি গো পিসি, এখনো যে মাস কাবার হয় নি! ... তোমার ছেলে মাইনে পেলে তবে ত' টাকা পাঠাবে। ... এলেই তোমায় এক ছুটে আগে দিয়ে যাবো। যেদিন মণি-পিসির হাতে জপের মালা থাকতো না সেদিন যে হয় চিঁড়ে-গুড় নয় নারকেল-নাড়ু পাওয়া যাবে তা আমার অজানা ছিল না।

চিঠি বিলির পর বকুলতলায় নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে বিপিনবাবু পোষ্ট মাষ্টার সেজে বসতাম। কাগজের ওপর কাঠি বুলিয়ে গম্ভীর ভাবে যেন কত লেখা [illegible] আঁকজোখ, হিসাবপত্র, আর অনবরত অদৃশ্য শম্ভু পি[illegible] বকুনি।

গ্রামের লোকেরা আসত টিকিট, খাম, পো[illegible] সব কিনতে, মনি অর্ডার লেখাতে—একলা মানুষ, হিমসিম খেয়ে যেতে হ'ত। গাছের তলার ঝরা ফুল হ'ত আমার টাকা, পয়সা, সিকি, দুয়ানি,—গু[illegible] দেওয়া নেওয়া চলত অবিরাম। এই খেলায় এমন দি[illegible] হ'য়ে যেতে যেতাম যে খাবার নাইবার সময় শুধু ডাকিতে কোন ফল হ'ত না কোনদিন, মাকে এসে ধরে টেনে নিয়ে যেতে হ'ত।

সিনেমায় ছবি দেখবার পর যেমন বাইরে বেরিয়ে হঠাৎ সব অন্য রকম লাগে, সিনেমার গল্পটুকু বাইরের আলোতে হারিয়ে যায়, তেমনি আমারও ছোট[illegible] হারিয়ে গেল অকস্মাৎ। পাড়াগাঁয়ের সেই এক[illegible] একটানা কিন্তু মধুর জীবনধারা বদলে গেল; কেবল [illegible] জিনিষে রয়ে গেল আশ্চর্য্য রকম মিল। সেই [illegible] বলছি।

বাবা মা মারা গেলেন পর পর। এক কাকা [illegible] দখল করলেন আমাদের ছোট্ট সুন্দর বকুলতলার [illegible] খানি, এবং সম্পূর্ণভাবে দখল করে বসলেন আমাকেও।

ফাইফরমাস খাটি, আরও বকুনি খাই, স্কুলে [illegible] আর একটু আড়াল পেলেই 'ডাকঘর ডাকঘর' খে[illegible] এমনি করে কয়েকটা বছর গেল কেটে।

সামান্য কারণে একদিন কাকা মশাই খুব উত্ত[illegible] দিয়ে বললেন—দূর হয়ে যা, নিজের গতর খাটিয়ে [illegible] যা আজ থেকে।

পথে নেমে ভারি ভয় হ'ল। কোথা যাই, কা[illegible] মনে হ'ল বিপদ্‌ যেন চারিদিকে আমার ছায়ার মত [illegible] সংগে চলেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, প্রথম রা[illegible] খোলা আকাশের তলায় কাটিয়ে ভয় গেল ভেঙে [illegible] ভাবনা গেল উড়ে। মনে হ'ল মন্দ নয়, এ এক [illegible] ধরণের জীবন। প্রতিদিন নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই [illegible] হবে এবার থেকে।

অনেক ঘুরে ঘুরে শহরে এসে পৌছালাম। এবারে [illegible]টি মজার ঘটনা বলি, যার জন্য আজকে বাড়ির দরজায় [illegible]য় কড়াকড় কড়া নেড়ে—'চিঠি বাবু' বলে হেঁকে [illegible]ছি!

শহরে পৌছে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। নতুন লাগে [illegible] কিছুই। মাত্র দু'টি চোখে কুলায় না, এত সব দেখ[illegible]র জিনিষ। একদিন পথ চলেছি। দেখি বড় রাস্তার [illegible]পাশে একটি লোক বসে কাঁদছে। শহরের চিঠি [illegible]দবার সেই বড় বড় গোল গোল বাক্স আছে দেখেছ [illegible]—ঠিক তার পাশে বসে কাঁদছে।

শহরের লোকেদের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কোন। যে [illegible]র কাজে হন্তদন্ত করে ছুটে চলেছে, যেন এমনি পথের [illegible]রে বসে কাঁদাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। যাই হোক, [illegible]মি ত' আর তখনো পুরোপুরি শহরের বাসিন্দা হই নি, [illegible]ই মনে বড় দুঃখ লাগলো। তার কাছে গিয়ে কাঁদবার [illegible]রণ জিজ্ঞাসা করে কিন্তু না হেসে আর থাকতে পার[illegible]লাম না। এ যেন বইতে পড়া এক মহাবোকারামের [illegible]ত কাহিনী!

লোকটি বললে কি জানো? বললে, সে এক অজ [illegible]ড়া-গাঁ থেকে অল্প দিন এসেছে, বাবুদের বাড়ি চাকরি [illegible]রছে।

বাবু তাকে টাকা ও মনি অর্ডার ফরম্‌ দিয়ে ডাকঘরে [illegible]ঠিয়েছে। শহরের ডাকঘর সে দেখে নি কোন দিন, তাই [illegible]জে খুঁজে চিনতে পারলে না। লোকেদের জিজ্ঞাসা [illegible]র পথের নিশানা। একজন দুষ্ট লোক করলে কি [illegible]নো, ঐ লাল বাক্স দেখিয়ে বলে দিলে এই ডাকঘর! [illegible] রকম অন্যায় তামাসা দেখ অশিক্ষিত সরল মানুষকে [illegible]রে!

তারপর আর কি! টাকা-কড়ি, ফরম্‌, খোপের মধ্যে [illegible] দিয়ে বার বার ডাকাডাকি— ও মাষ্টারবাবু, রসিদ [illegible] আরে রসিদ দেবে কে? কে আছে এর ভিতরে [illegible] অনেক ডাকাডাকির পরও রসিদ না পেয়ে কান্না [illegible] আর উপায় কি?—বাড়ি ফিরে মার-ধোর খেতে হবে [illegible] তাকে যখন বললাম যে ঐ বাক্সে কোন লোক নেই— [illegible] লোক থাকে না, ওখানে শুধু চিঠি ফেলা হয়, তখন [illegible]রো কাঁদতে সুরু করে দিলে।

হাসির মধ্যেও বড় দুঃখ হ'ল লোকটির দুরবস্থা দেখে। সংগে করে খুঁজে খুঁজে কাছের ডাকঘরে গিয়ে সমস্ত বললাম এবং তাদের লোক এনে লাল বাক্স খুলে টাকা উদ্ধার করা গেল। কিন্তু মজা এই যে, ঐ সূত্রে ডাকঘরের যে ভদ্রলোকটির সংগে আলাপ হ'ল তাঁরই দয়ায় অল্প দিনের মধ্যে পিয়নের চাকরি গেলাম পেয়ে। আমার ছোট বেলাকার খেলাঘরের ডাকঘর বড় বয়সের সত্যি-কারের ডাকঘরে পরিণত হ'ল, ও এবারে আসল চিঠিপত্র নিয়ে হেঁকে বেড়ানো হ'ল সুরু—বাবু, চিঠি, চিঠি বাবু!

উর্দিপরা তক্‌মা-আঁটা পিয়ন হয়ে চিঠিপত্র, পার্শেল নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরি আর হাঁকি—বাবু, চিঠি। লোকেরা দৌড়ে এসে খপ্‌ করে চিঠি কেড়ে নেয় হাত থেকে—যেন আমি দেবো না, পালিয়ে যাচ্ছি। আর তখুনি সামনে দাঁড়িয়ে চিঠি পড়তে সুরু করে দেয়—আমার দিকে না তাকিয়ে, না হেসে এতটুকুও। কেউ কেউ বা ব্যস্তবাগীশ, আছড়ে দড়াম্‌ করে দরজাটা বন্ধ করে দেয় আমার মুখের ওপর।

আচ্ছা, চিঠি পেয়ে একটু হাসলে, দুটো মিষ্টি কথা বললে ওদের কি ক্ষতি বল ত'? আমার মনটা ত' একটু খুসি হতে পারে। এই যে দৌড়ে দৌড়ে চিঠি এনে দিলাম, কত খুসির খবর দিলাম, আর এই ধাক্কা! কিন্তু কি কাকুতি-মিনতি, কত মিষ্টি কথা—যেদিন আশা করেও চিঠি এল না!—হ্যাঁ ভাই, আমার চিঠি নেই আজ? দেখেছ ভাল করে? আর একবার তোমার ঐ ঝুলিতে খুঁজে দেখ না? ফিরে গিয়ে ডাকঘরে একটু খবর করে দেখ' ত' ভাই!

কী আশ্চর্য। আমি যেন দুষ্টুমি করে লুকিয়ে রেখেছি, দিতে চাচ্ছি না চিঠি। চিঠি দেওয়াই ত' আমার কাজ!

সবচেয়ে মজা করে ছোট খোকাখুকুরা। বড়দের ব্যবহারের নিষ্ঠুর ফাঁকটা যেন সুদে আসলে ভরে দেয় ওরা।

—আমার চিঠি দাও!

—কোথায় পাবো তোমাদের ছোট্ট ছোট্ট চিঠি?

শুনবে না কিছুতেই। জামা ধরে টানবে, জড়িয়ে ধরবে, যেতে দেবে না। থলি ধরে টানাটানি আর ঝিরঝিরে খেয়ালি হাসি—আনন্দের, দুষ্টুমিরও। শেষে

পায়ের পাতায় ভর করে উঁচু হয়ে ঝুঁকে আমার থলির ভিতরটা দেখবে কী কী সব আছে—তবে ছাড়বে। ভারি মজা লাগে—না?

তোমরা ভাবছ অফুরন্ত মজাই বুঝি শুধু আমার এই কাজটিতে, কিন্তু বলে রাখি যে দুঃখ আছে, বিপদও আছে সময় সময়।

দুঃখ কখন হয় জানো? যখন দেখি আমার সামনেই কেউ চিঠি পড়তে পড়তে হঠাৎ দুঃসংবাদে গুম হয়ে যায়, কারুর বা চোখ ছলছল করে ওঠে, কেউ আবার দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে অন্য দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে।

খুব কষ্ট হয় মনে যখন কারুর গভীর নিরাশা চোখে পড়ে যায়। বাবু, চিঠি হেঁকে তাড়াতাড়ি চলেছি ব্যস্ত ভাবে, ওপাশের জানলা খুট করে খুলে গেল। ডাকলে না, বললে না কিছু। চুপ করে দেখলে শুধু যে তাদের দরজার সামনে দাঁড়ালাম না আমি। অনেক আশা করে চিঠি এল না আজও। কত বড় আশা, তার বদলে কতখানি নিরাশা বল দেখি? আমি মুখ তুলে চাইতে পারি নে ওদিকে, যেন যত দোষ—যত অন্যায় আমার নিজেরই। আমি পিয়ন হ'লেও ত' মানুষ—নয় কি?

এবার বিপদের কথা শোন। মাত্র একটি ঘটনা বলে শেষ করি—আমার এ কাহিনী।

একবার আমাকে শহরের এক প্রান্তে একটি পল্লীতে বদলি করা হ'ল, মনি অর্ডার ও রেজিষ্টারী বিলি করতে হবে। এদিক্‌টায় কেবল বড় বড় আড়ত ও গুদাম ঘর, সাধারণ গৃহস্থের বাস নেই বললেই হয়।

এক দুপুরে পথ বেয়ে চলেছি,—কাঁধে ঝোলানো থলিতে অনেক টাকাকড়ি প্রভৃতি। বাদলা দিন। আকাশে চার পাঁচ থাক ঘন কালো মেঘ যুড়ে এমন ব্যাপার করেছে যে চোখ বুজে হঠাৎ খুললে মনে হয় এই রাত্রি এল বুঝি! এর ওপর আবার একটানা টিপি টিপি ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি। পথ ভয়ানক রকম নির্জন। কি একটা পরবে আড়তগুলি বন্ধ, তাই মজুরেরা কাজে আসে নি।

হঠাৎ কোথা থেকে এই দুর্যোগের সুবিধা নিয়ে এক গুণ্ডা এসে হাজির একেবারে ঠিক নাকের সামনে। গলার জামা মুঠো করে ধরে বলে,—ভাল চাও ত' দিয়ে দাও সব টাকাকড়ি, নইলে এই দেখ! গেঞ্জি তুলে কোমরে রাখা ছোরাখানি দেখালে। ভয়ে ও হতভম্ব নির্বাক্ হয়ে গেলাম কিছুক্ষণ। মনের হুড়মুড় করে অনেকগুলি কথা এসেই দৌড়ে পা গুণ্ডার হাতে পড়েছি—কী ভীষণ চেহারা—সংগে আছে—টাকা কেড়ে নিলে ডাকঘরে গিয়ে বলব নিশ্চয়ই জেলে যেতে হবে।

উপস্থিত-বুদ্ধি কা'কে বলে ও বিপদে পড়লে নিছক ধাপ্পাও সত্যি হতে পারে—এ দু'টি জিনিষ ভাল করেই জানলাম। তারপর থেকে আমার ধারণা এই যে প্রাণভয়ে এবং মানভয়ে মানুষ সব করতে পারে।

একটু সামলে নিয়ে বলি,—কিন্তু তোমার নামে একটা মনি অর্ডার আছে ভাই, আগে সই করে নাও!

লোকটি অবাক্ হয়ে একটু চেয়ে থেকে অবিশ্বাসের সংগে বলে,—চালাকি পেয়েছ? মিথ্যে কি নামে আছে বল দেখি?

—মহাবীর পালোয়ান।

ঐ নামটি সেদিন হঠাৎ মগজের মধ্যে না এসে শুধু টাকা নয়, প্রাণটুকুও বাঁচাতে পারতাম না।

—মহাবীর আমার নাম খুব অল্প লোকেই এখানে ত' সকলে অন্য নামে ডাকে। কে পাঠিয়েছে—তা ত' আমরা পড়ি না, শুধু যাকে পাঠায় তার জেনে নি।

—কত টাকা?

—দু'শ' বাহান্ন টাকা দশ আনা—আমি তখন মহা আরো আশ্চর্য হয়ে বলে,—দাও।

চল, সই করতে হবে, দোয়াত-কলম চাই।

লোকটি সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে এগিয়ে একমনে ভাববার চেষ্টা করে কে একে পাঠালে টাকা পুরানো মহাবীরের নামে। মানুষের চিন্তা এমনি জিনিষ যে চিন্তার সংগে সংগে চেহারারও বদল হয়ে একটু আগে যে ভীষণ মানুষটি লাফিয়ে এসে ছাড়লে—ভাল চাও ত' টাকা দাও—সে এখন ভারে অনিশ্চিতের দোলায় কুঁকড়ে ভাল মানুষ হয়ে

আশ্চর্য যে শহরের কি একটি মানুষও সেদিন

রায় নি ঐ দুর্যোগ দেখে! শেষ পর্যন্ত একটি ভাঙা র সামনে এসে দাঁড়ালাম। মহাবীর তেমনি চিন্তিত র তালার চাবি খুলে অন্ধকারে ভিতরে যেতে যেতে ন,—দাঁড়াও, দোয়াত-কলম নিয়ে আসি।

দেখলাম হঠাৎ একটা কিছু করে না ফেললে আর ার নেই। চোখের সামনে তালা ঝুলছে, শিকলটি তখনো দুলছে একটু একটু এদিকে ওদিকে। দেখি ঘরের এক অন্ধকার কোণে মহাবীরের বিশাল দেহটা উপুড় হয়ে খুঁজছে দোয়াত-কলম।

যা মাথায় এল করে ফেললাম তাই তখুনি। দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে শিকল তুলে দিলাম, তালা লাগাতেও সাহস হ'ল না,—তারপর দে ছুট—ছুট!

দুঃখ জয়ের মন্ত্র

শ্রীসুকুমার দে সরকার

রাজার ছেলে ইন্দ্রসেন বিশ্বজয়ী বীর। একদিন নি সসৈন্যে আচমকা ঘূর্ণি হাওয়ার মত উড়ে পড়ে ের পর দেশ জয় করেছেন; কিন্তু বিজয়ের পর নে তাঁর রয়ে গেছে শুধু কান্না আর হাহাকার! বলে মানুষের অস্ত্রকে জয় করেছেন তিনি, কিন্তু জয় ন নি মানুষের মন। তাঁর বিজয়ের গৌরবকেও য়ে মানুষের দুঃখের একটা কৃষ্ণ রেখা উঠেছে য়ে। অস্ত্র দিয়ে পৃথিবী জয় ত' আসল জয় নয়; জয়ই আসল জয়।

তাই একদিন রাজ্য ছেড়ে অকস্মাৎ বেরিয়ে পড়েছেন ন একা দুঃখ জয়ের সন্ধানে। কোথায়—কোথায় া যায় দুঃখ জয়ের মন্ত্র? চলার পথে দেখা বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী গোবিন্দমাণিক্যের সাথে। ধনী বলে ধনেই দুঃখ জয়ের মন্ত্র। কিন্তু শ্রেষ্ঠীর তাঁবুতে বসে ন দেখলেন যত রাত বাড়ে শ্রেষ্ঠী ততই উদ্বিগ্ন হ'য়ে ন। চোরের ভয়। ধনের দুশ্চিন্তা। রাজকুমার লেন এই কি ধনের দুঃখ হরণের ক্ষমতা? এ ত' দুঃখ ও বাড়িয়ে দেয়! অবিশ্বাস এনে দেয় মানুষের ।

ার পরে শ্রেষ্ঠী যখন প্রকাশ করেই ফেললেন, "এই া, তুমিই যদি দস্যু হও? রাতে আমায় মেরে রেখে ধন সম্পত্তি নিয়ে যদি পালাও?"

ন্দ্রসেন, ঘৃণায় তিক্ত হয়ে উঠলেন। সামান্য চোরও লে ধনীর চেয়ে সুখী? নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে এসে তাঁর ঘোড়া মকরকেতুর পিঠে চাপলেন তিনি। মাথায় তখন একফালি পাণ্ডুর চাঁদ আর সামনে পথ আলো-আঁধারীতে আবছা—রহস্যময়।

মকরকেতু চলেছে ছুটে। মাথার ওপর তারাময়ী কালো রাতের আকাশে লক্ষ লক্ষ হীরেকুচি জ্বলছে, নিভছে। পৃথিবীর বুকে অদ্ভুত প্রগাঢ় শান্তি। যেতে যেতে ইন্দ্রসেন একটা বনের মধ্যে এসে পড়লেন। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার, আর আশে পাশে নিঃশব্দ দৈত্যের মত বিরাট বৃক্ষদল আকাশে মাথা তুলে স্থির। তার মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রসেন দেখলেন দূরে এক জায়গায় লাল আগুনের আভা। সেই আগুন লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন তিনি।

বন্য স্তব্ধতায় ঝরা পাতার মরা আওয়াজ আর মকর-কেতুর পায়ের দুলকি আওয়াজ। টুকরো একটা হাসির শব্দ ভেসে এল কানে।

তারপরে হঠাৎ—"কে যায়?"

দু'টো কালো কালো লোক এসে নিঃশব্দে ঘোড়ার মুখ চেপে ধরল।

"আমি পথিক।" সাড়া দিলেন ইন্দ্রসেন।

"কোথা যাও?"

"তোমরা কারা হে? আমি চলেছি দুঃখ জয়ের মন্ত্রের সন্ধানে। বলতে পার কোথায় পাওয়া যাবে?"

"দুঃখ জয়ের মন্ত্র?" সেই দু'জনের মধ্যে সর্দ্দার গোছের লোকটা বলে উঠল, "দুঃখ জয়ের মন্ত্র? সে ত' আমাদের কাছে। তুমি আমাদের দলে যোগ দাও না কেন?"

"তোমরা কারা?"

"আমরা চোরের দল।"

"তা তোমাদের কাজে দুঃখ জয়ের মন্ত্র কি রকম?"

"কারণ আমাদের কোন অভাব নেই। দুঃখ আমরা জয় করেছি। খাই, দাই, স্ফূর্ত্তি করি। অভাব আমরা জানি না। যখন যা দরকার চুরি ক'রে আনলেই হ'ল। আমরাই খেয়াল খোলা দুঃখজয়ীর দল।"

ইন্দ্রসেন বললেন, "বেশ, আমি তোমাদের দলে যোগ দেব, কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে।"

"কি?"

"পরের ধন সম্পত্তি কেড়ে নিতে, চুরি করে আনতে তোমাদের বাধে না?"

চোরেদের সর্দ্দার বল্‌ল, "বন্ধু, মহারাজ ইন্দ্রসেনের নাম শুনেছ? তিনিও ত' দস্যুর মত গিয়ে, চোরের মত গিয়ে পরের রাজ্য, পরের ধন কেড়ে নিয়েছেন!"

ঠোঁট কামড়ে ইন্দ্রসেন বললেন, "চল।"

বনের মাঝখানে আগুন জালিয়ে ঘিরে বসেছে চোরের দল। চলছে হল্লা, চলছে আমোদ। গাছে গাছে তাদের ঘোড়ার দল বাঁধা।

চোরেদের সর্দ্দার ইন্দ্রসেনকে নিয়ে এসে বল্‌ল, "বন্ধুগণ, আমাদের দলে আর একজন সাথী বেড়েছে। এ চায় দুঃখ জয়ের মন্ত্র।"

একসঙ্গে বহু লোক হল্লা করে উঠল, "দুঃখ নেই! দুঃখ নেই! খালি আনন্দ কর বন্ধু—আনন্দ!"

চোরেদের সর্দ্দার বলল, "কিন্তু তার আগে আমাদের একটা নিয়ম আছে বন্ধু! আমাদের দলে যে যোগ দেবে তাকে প্রথমে একটা চুরির সন্ধান দিতে হবে।"

ইন্দ্রসেন বললেন, "সহজ। পেছনে শ্রেষ্ঠী গোবিন্দ মাণিক্যের তাঁবু পড়েছে সঙ্গে তার বহু ধনরত্ন।"

চোরেদের হাজারটা চোখ যেন জলে উঠল। সর্দ্দার হুকুম দি— "ঘোড়া, বন্ধুরা! ঘোড়ায় ওঠ!"

মুহূর্ত্তের মধ্যে চোরের দল লাফিয়ে উঠল ঘোড়ায়। হল্লা তাদের মিলিয়ে গেল। সব নিথর, নিঃশব্দ।

"পথ দেখাও বন্ধু!" সর্দ্দার রাজকুমারকে বল্‌ল। মকরকেতু চল্‌ল ছুটে দলের আগে।

চোরেদের সর্দ্দার আর রাজকুমার পাশা... চলেছেন। মাথার উপর মলিন চাঁদ পশ্চিমে চলে ... সর্দ্দার বলল, "জোরে বন্ধু, জোরে চল। রাত যে ফু... এল।"

"ফুরোলেই বা কি হয়েছে?" ইন্দ্রসেন জবাব দিলে...

সর্দ্দার হেসে উঠল, "দলে কিছুদিন থাক বন্ধু, বু... সব বুঝবে।"

"কি বুঝব?"

"চোরেদের কাজ হ'ল রাতে। রাতের নি... পেঁচার মত তাদের গতি। দিনের আলোকে তারা... করে।"

"কিসের ভয়?"

"এঃ, তুমি দেখছি একেবারে নির্ব্বোধ। কিসের ভ... সহর কোটালের ভয় আছে। দিনের আলোয় লো... জনের ভয় আছে। তুমি ভাবছ তা হ'লে আর আ... কোথায়? কেমন? কিন্তু এই ভয় ত' মহা... ইন্দ্রসেনেরও আছে। আমাদের শত্রু শুধু কোটাল, কি... মহারাজ ইন্দ্রসেনের শত্রু রাজ্যে রাজ্যে, দেশে দে... গুপ্ত ঘাতকের ভয়ে তাঁকে সর্ব্বদা রক্ষী-পরিবৃত ... থাকতে হয়। কেমন, তুমিই বল আমি ঠিক ব... কিনা?"

ইন্দ্রসেন জবাব দিলেন না। সর্দ্দার বলে চল্‌ল, "দি... কেন যে সৃষ্টি করেছিলেন ভগবান্! দিনের আ... প্রতিটি পায়ের শব্দ, প্রত্যেক ছায়া দেখে মনে হয় ... বুঝি কোটালের লোক এসে ধরল ঘাড়টা চেপে! চোরে... তাই দিনের আলো দেখে না। তারা রাতের মানুষ।"

ইন্দ্রসেন থমকে দাঁড়ালেন। "এই তোমাদের দুঃ... জয়ের মন্ত্র? ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দিনের আলোকে... সূর্য্যকে যারা ভালবাসে না, প্রতিটি মুহূর্ত্ত যারা নিজে... ছায়ার ভয়ে ভীত তারা দুঃখজয়ী?"

সর্দ্দার বল্‌ল, "তোমার কথা আমার ভাল ঠেকছে... বন্ধু!"

"কেন?"

আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

"কিসের সন্দেহ?"

...মাদের সাবধানী হতে হয় বন্ধু! প্রকৃত বন্ধু ব'লে ... আমরা মেনে নিতে পারি না। এই ধর না, তুমিই ... কোটালের লোক হও! কি ক'রে জানব তুমি ...র ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছ না?"

...বিশ্বাস তোমাদের নেই?"

...হাঃ হাঃ! বিশ্বাস? ওটা পৃথিবীতেই নেই বন্ধু!"

...সেন হঠাৎ ঘোড়ার মুখ ফেরালেন।

...দার বলে উঠল, "ও কি! কোথা যাও?"

"তোমাদের সঙ্গে আমার পোষাবে না সর্দ্দার! তোমরা শুধু দুঃখী নও, তোমরা কাপুরুষ। তোমরা সমাজের নোংরা—আবর্জ্জনা। যাও, ফের। ওই দেখ পূবে রূপোর ছোঁয়াচ আর ওই শোন প্রহরীর ডাক। তোমাদের ধরিয়ে দিতেও আমার দুঃখ হয়।"

ইন্দ্রসেন ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন, পূবের আলোর পানে। মকরকেতুর ঘাড়ের ওপর সমুদ্দুরের ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

কোহিনুরের কথা

স্থলপদ্ম

...তোমরা হয়তো সবাই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শাহজাহানের ... কোহিনুরের নাম শুনেছ। কিন্তু এর সম্বন্ধে ...কেই হয়তো বেশী কিছু জান না।

...কোহিনুরের উৎপত্তি কোথায়, কি ভাবে এল, সে ...প্রায় কিছুই জানা যায় না। তবে এর পথ এবং ... জীবন সম্বন্ধে নানা রকম লোকপ্রবাদ ছিল। ...কি আজ প্যর্যন্তও যে কিছু নেই তা নয়। মহা-...ত বর্ণিত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে (পণ্ডিতদের মতে আজ ...চার হাজার বছর আগে) অঙ্গরাজ কর্ণ নিজের ...কের উপর এই রত্ন ধারণ করতেন ব'লে গল্প আছে। ...নীর লোকেরা বিশ্বাস করত যে পাঁচ হাজার ...ও আগে এই রত্ন গোদাবরীর জলে নিহিত ছিল। ...নাপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য ৭৫ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দে ...ক আপন রাজমুকুটে ধারণ করেন। কিন্তু এ সব ...তির বিশেষ কোন মূল্য নেই। ঐতিহাসিক ...এতে অতি অল্পই আছে ব'লে মনে হয়।

...২৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে দিল্লীর মোগল বংশীয় ...বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন— আলাউদ্দীন ...দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক এই মহারত্ন নিজ রাজভাণ্ডারে ...প্রথম সংগ্রহ করেন। সমগ্র পৃথিবীর দেড় দিনের ...ইহার মূল্য।"

...কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে আলাউদ্দীন ...১৩০৪ সনে যখন মালব আক্রমণ করেন তখনও এটা মালবের হিন্দুরাজার অধিকারে ছিল। তারপর যুদ্ধে তিনি হেরে গেলে আলাউদ্দীন অধিকার ক'রে নেন। আলাউদ্দীনের হাত থেকে যে ভাবেই হোক সেটি গোয়া-লিয়রাধিপতি বিক্রমাদিত্যের হস্তগত হয়। কিন্তু তাঁর হাতে এটা বেশী দিন রইল না। বাবর সেটিকে দিল্লীর রাজভাণ্ডারে এনে রাখেন। এর পর থেকে বহু দিন পর্য্যন্ত এটা দিল্লীর রাজভাণ্ডারে ছিল।

ভারত সম্রাট্ শাহজাহান যখন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন তখন দিল্লীর ঐশ্বর্য্য চরম শিখরে উঠেছিল। কোহিনুরের সাথে সাথে আরো কতকগুলি রত্নও তাঁদের রাজভাণ্ডার আলো ক'রে রাখত। বৃদ্ধ বয়সে ছেলেরা ষড়যন্ত্র করে বিদ্রোহী হন। শাহজাহান আপনার প্রিয় রত্নগুলি কুটকৌশলী অপ্রিয় পুত্র ঔরঙ্গজেবের হাতের স্পর্শ থেকে বাঁচাবার জন্য নিজ হাতেই সেগুলোকে গুঁড়ো করতে উদ্যত হ'লে আদরিণী কন্যা জাহা-নারার অনুরোধে সে কাজ থেকে বিরত হন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছাই ছিল হয়তো অন্য রূপ, তাই শাহ-জাহানের মৃত্যুর পর জাহানারাই নিজ হাতে ঔরঙ্গজেবকে অন্যান্য সমস্ত রত্নগুলির সাথে কোহিনুরও দান করেন। এই ভাবে একের পর এক ক'রে মহম্মদ শাহ পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাট্‌গণ কোহিনুরের স্বত্ব ভোগ করে এসেছেন।

১৭৩৯ সনে নাদির শাহ ভারত আক্রমণ ক'রে ময়ূর সিংহাসনের সাথে সাথে এই রত্নটিও হাত করবার চেষ্টা

TIGHT BINDING

করেন কিন্তু প্রথম প্রথম কৃতকার্য্য হন নি। মহম্মদ শাহ্ পরাজিত হয়েই রত্নটি পাগড়ীর ভিতর, হাতছাড়া হবার ভয়ে, লুকিয়ে রাখেন। পরে নাদির শাহ্ এ খবর জানতে পেরে তাঁর সাথে মিত্রতা স্থাপন ক'রে ও পাগড়ী বিনিময় ক'রে নানা কৌশলে রত্নটি লাভ করেন। এই সময়েই নাদির শাহ্ রত্নটির নাম কোহিনুর রাখেন। এই

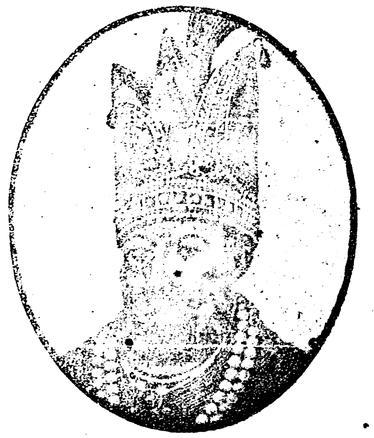

নাদির শাহ্
কোহিনুর নাম এঁরই দেওয়া

ভাবে কোহিনুর কিছুদিন তাঁর রাজভাণ্ডারে বিশ্রাম লাভ করল।

নাদির শাহের মৃত্যু হ'লে তাঁর অপদার্থ ছেলে শাহ্-রোখের হাত থেকে কান্দাহারের সম্রাট্ মহম্মদ নিকট রত্নটি গিয়ে পড়ে।

১৭৯৩ সনে মহম্মদ শাহের পুত্র তৈমুর শাহের কালে তাঁর পুত্র শাহসুজা কোহিনুর হস্তগত লোভে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কারারুদ্ধ করেন। তথাপি নুর তাঁর হস্তগত হয় নি। দৈবাৎ একদিন কারা থেকে সেটী বের হয়ে পড়ে। কিন্তু সুজা বেশী দিন করতে পারলেন না। ভ্রাতা বিদ্রোহী হ'লে কেশরী রণজিতের নিকট যান। রণজিৎ নানা প্রলোভনে একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার পরিবর্তে কিনে নেন। রণজিৎ আপনার হাতের সুবর্ণ উপর রত্নটি ধারণ করতেন।

রণজিতের মৃত্যুর পর কোহিনুর পুত্র দলীপসিং রাণী ঝিন্দনের হাতে গিয়ে পড়ে। ১৮৪৯ সনে হৌসির সময়ে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের পর পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হ'লে ডালহৌসি কোহিনুর মহারাণীর কাছে প্রেরণ করেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোহিনুর গ্রহণ করেন এবং এর ভার কমিয়ে পরবার আশী হাজার টাকা ব্যয়ে কাটিয়ে ফেলে ক্রচের মত ব্যবহার করেন। এখন ভারত-সম্রাট্গণ উত্তরাধিকার সূত্রে অধিকারী। তবে তার আগেকার রূপ আর অজকের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।

প্রজাপতির কেরামতি

শ্রীধরণী সেন

ছোট্ট বাড়ীটি সেদিন ভোর থেকেই অসম্ভব হাসি-খুসীতে যেন ভরপুর। এর আগে কোনদিন বুঝি তুলতিলা এতখানি খুসী হয়ে ওঠেনি।

তার দিদিমা কিন্তু নাক সিঁটকে বললেন, "তুই আমায় অবাক্ করলি তুলতুল্! আর একঘণ্টা বাদে তোদের প্রতিযোগিতা বসবে আর তোর কিনা ফুর্ত্তি ক্রমশঃ যেন বেড়েই চলেছে। দাস্যি মেয়ে!"

তুলতিলা হেসে যেন ফেটে পড়ে,—"ও দিদিমা, দিদিমা গো! তোমার মত ঐ গোমড়াপানা মুখে প্রতিযোগিতা গেলেই তো হয়েছে আর কি, উঃ! আমার ঐ অন্ধকার মুখ দেখলে গোলাপ বিবি-ই বা কি ভাববে! গোলাপ ফুল গো, যাকে আমরা সব মেয়েরা আজ মিলে আঁকবো!"

তুলতিলা অর্থাৎ তিলোত্তমা ঐ রকমই; চোখে সব সময়েই হাসিখুসী। রেশমীর মত সোনালী চিক চুল আর আদুরে চাঁদপানা মুখখানি। ছেলেমানুষ

গামী চোখ দু'টি যেন সকলকেই কাছে টানে। কথায়, সে পাড়ায় তুলতিলা হ'ল সোনার তিলা, তিলা, সবার আপনার জন—তুলতুল্ তিলোত্তমা।

সহরে তুলতিলা স্কুলের ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা য়। সে খুব সুন্দর ছবি আঁকে। পুরোনো সেকেলে সেকেলে ঢলঢলে সাজ-পোষাকে তুলতিলাকে যেন রেখেছে।

যে প্রতিযোগিতায় তুলতিলা যোগ দিয়েছে সেটি করেছেন স্বর্গগত এক গুণী শিল্পী। তাঁর নির্দ্দেশ এই প্রতিযোগিতায় শুধু পনেরো থেকে কুড়ি বছর মেয়েরা যোগ দিতে পারবে। পুরস্কার এক হাজার । ছবির বিষয়:— স্থির-চিত্র—যেমন ফল বা ফুল। সুন্দর প্রতিযোগিতায় শিল্পী বুঝি নিজেকে অমর করে তে চেয়েছেন।

প্রতিযোগিতার এই প্রথম বছর; দূর দেশ বিদেশ প্রসিদ্ধ শিল্পীরা আসছেন এই প্রতিযোগিতার ফল বিচার করতে গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করা ছে চিত্রকরীদের আহ্বান করে। সহর পর্য্যন্ত সচকিত উঠেছে। সকলেই বলাবলি করছে, দশ জন নাম-শিল্পী আসছে কিনা একটি ছোট্ট গোলাপ ফুল আঁকা তে। কম করে একশ' জন মেয়ে ঐ ছোট্ট গোলাপ টি আঁকবে। বেচারী গোলাপ!

কিন্তু তুলতিলার দিদিমার নালিশ যেন কিছুতেই থামে —"আমার এমন দুরবস্থা আগে কখনও হয় নি। তোর বাবা যদি অত উদাসী না হ'ত, তা হ'লে পুজো-পার্ব্বণে পরবার মত তোর দু'-একটা ভাল ও জুটতো!...আর তুই কি না নেচে বেড়াচ্ছিস! দিকিন্, একটু দেখি তোকে। মাগো, কি সাজ যে ছিস্! দাঁড়া, আমার একটা সেফ্টিপিন আছে, কে এনে দিই।"

তুলতিলার দিদিমা তাঁর ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে শোবার দিকে চলে যান। কিছুক্ষণ পরেই একটি সুন্দর পিন হাতে নিয়ে ফিরে আসেন।

আচ্ছা, এবার দেখি তো, আয়। ঘুরে দাঁড়া একটু, বার ঠিক হয়েছে। এবার একটু হাঁট দিকিন্, ইস্ কায় কি রকম বিশ্রী ভাঁজ পড়েছে! রোস্, ঠিক করে দিই। এবার পা থেকে জুতো মোড়া খোল্ দিকিন্,—হুঁ, চলে যাবে।"

দিদিমার কাণ্ড দেখে তুলতিলার হাসি কিন্তু থামতে চায় না।

"হাসছিস কেন দুষ্টু মেয়ে? থাম্, তুই আমায় জ্বালালি। সাজ-গোজ করতে তুই ছাই জানিস্। কেবল হাসতেই জানিস। প্রতিযোগিতাটা যা তা ব্যাপার নয়—আর তুই কিনা কেবল চুটুর পুটুর করছিস্!" বিরক্তির ভান করে দিদিমার অনুযোগ আর শেষ হয় না।

বুড়া দিদিমার রকম-সকম তুলতিলাকেও যেন পেয়ে বসে।—"এই বুড়া, বুড়া গো! তুমি যেন পটে আঁকা ছবি গো! আচ্ছা, আচ্ছা, ভয় পেয়ো না, ভেবো না, ওখানে গিয়ে এমন আমি হাসবো না, হাসবো না। বরঞ্চ আমার সব চেয়ে ভাল হাসিটা আমার ঠোঁটে ঝুলিয়ে রাখবো। হ'ল তো?"

—"অমন ক'টা হাসি তোর আছে রে, পোড়ারমুখী?"

—"তা অন্ততঃ গোটা দুই তো বটেই। তার একটা এই বাড়ীতে আমার দিদুর জন্য, আর একটা ঐ বাইরের নীল আকাশের জন্য।"

—"কি অসম্ভব পাকা মেয়ে গো, কি হবে! কে তোকে শিখিয়েছে রে এ সব, য়্যা?" দুষ্টুমিতে দিদিমার চোখও চক্‌চক্ করতে থাকে।

বড় ঘরে ঘড়িটা ঢং ঢং করে বেজে উঠতেই দিদিমা দু'হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন, "ঐ যা, সব বেজে গেল, আর তোর কিছুই হ'ল না! কাগজ, তুলি, রঙের বাক্স—সব ঠিক আছে তো?"—বলে তিনি যেন হতাশ হয়ে সোফায় এলিয়ে পড়লেন: "আয় দুষ্টু মেয়ে, তোকে একটা চুমু খাই।"

বাইরে লাল সূর্য্য তুলতিলাকে ডাক দিয়েছে। আর দেরী না করে তুলতিলা তার জিনিষপত্র গোছ করে হাসি মুখে বেরিয়ে পড়ল। মনে এই ভাব: দেখুক্ বিচারকেরা আজ আমি কি করতে পারি!

বাড়ীতে একা পড়ে রইলেন দিদিমা। তাঁর শরীরে আর যেন কিছু নেই।—"যা হোক্, একটা গোলাপ আঁকা এমন কিছু শক্ত নয়। আহা, তিলু যদি গোলাপটিকে বলতে পারে, বাগানে আমরা ফুলেদের কত যত্ন করি,

তা হলে ঐ গোলাপও নিশ্চয় ওকে সাহায্য করবে। করবে না? তাকে ও আমাকে রক্ষা করতে কখনও দ্বিধা করবে না,— কখনও না।"

তুল্‌তিলার দিদিমা একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। "রক্ষা করতে" এই কথাটি যে কত সত্যি! তাঁরা খা বড় গরীব। হাজার টাকা পুরস্কার! এই হাজার টাকা দিয়ে সুরু হবে, তারপর আরো সন্ধান আসবে। সমস্ত দেশে তাঁর তুলতিলাই তো হ'ল প্রথম শিল্পী; তার ছোট্ট ছাত্রীরা তার স্টুড়িয়োতে আরো ভীড় করবে। এই পুরস্কার যে লাখ টাকারও বেশী, এই পুরস্কার তাঁদের সমস্ত ভবিষ্যৎ।

জড়সড় হয়ে পা গুটিয়ে বসে বুড়ীর চোখে ঘুম নেমে আসে। তারপর স্বপ্নেই যেন বলতে থাকেন তিনি—"আজ কি আমাদের ভাগ্য ফিরবে গো? এত দিন গরীব হয়ে ছেঁড়া কাঁথায় ছেঁড়া কাপড়-জামা পরে পরেও কি ভাগ্য আমাদের ফিরবে না? কত কচি বয়সে ও বাপ-মা হারিয়েছে, তারপর ঘরদোর, সম্পত্তি সবই গিয়েছে। কোনদিন এতটুকু আনন্দ করতে পাই নি। আর এই একটানা দশ বছর আমি ও আমার এই আদুরে মেয়ে শুধু ডাল-রুটি ছাড়া আর কিছু মুখে দিতে পাই না।"

শুক্‌নো ঘুমন্ত ঠোঁটদুটি তাঁর কাঁপতে থাকে। আবার সুরু হয়: "হুঁ, তারপর একদিন সে বলে—ছবি আঁকা শিখবো। আঃ, ঐখানে আমাকে সত্যি বড় রাগ করতে হয়। শোনো দিকিন্ কাণ্ড, এই বংশের একটি মাত্র মেয়ে কিনা রোজগার করে খাবে! কিন্তু দুষ্টু মেয়েটা কি বললে জান? 'দিদু গো, সময় যে বদলে গিয়েছে, ছেলেমেয়ে আজ সব সমান, সবাইকে খেটে খেতে হবে। রাজা-উজীরও আর নেই, তুমি আমি সবাই সাধারণ লোক শুধু। সকলের মত আমাকেও কাজ করতে দাও।' কি করি, ঐ মেয়ের সঙ্গে কি পারবার যো আছে? শেষ পর্য্যন্ত রাজী হতে হ'ল। কিন্তু কি পরিশ্রমটাই ও সেই থেকে সুরু করল! ও এত ভালো, [illegible]ত্য এত ভালো মেয়ে আর হয় না।"

যতক্ষণ না তুল্‌তিলা বাড়ী ফিরে এল ততক্ষণ বুড়ী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিড়বিড় করতে থাকল।

দুপুরে বাড়ী ফিরে তুল্‌তিলা তার উৎকণ্ঠা আর চেপে থাকতে পারে না। বুড়ীও চুপ থাকতে পারে না, এটা সেটা জিজ্ঞেস করেন। তখন তুল্‌তিলা বলল, "ভাগ্য বড় খারাপ দিদু! কিন্তু যে গোলাপটা আঁকতে দি[illegible] আহা, সেটা কি চমৎকার! আমার আঁকাটাও [illegible] হয়েছে, হুবহু ঐ রকমটি। কিন্তু একজন বিচারক [illegible] পাশ দিয়ে তিন তিন বার গেলেন, অথচ এক[illegible] যেন আমার ছবির দিকে চেয়ে দেখলেন না, [illegible] পাশে দাঁড়িয়ে যদিও তাদের আঁকা তিনি দেখ[illegible] ৩৪ নম্বরের ওপর তাঁর বিশেষ নজর দেখলাম। [illegible] ছিল ৯ নম্বর। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল, [illegible]" তুল্‌তিলার চোখ ছলছল করে।

"কি যে তুই বলিস, ৯ নম্বর!" দিদিমা বলেন, "[illegible] এখন খেতে আয়। আমরা গরীব বটে কিন্তু আ[illegible] আমাদের ভোজ বিশেষ আলাদা রকমের। ঐ লোক[illegible] বড় বোকা রে, ইচ্ছে হচ্ছে দু'কথা গিয়ে শুনিয়ে [illegible] আসি।"

"কিন্তু কেবল একজন বিচারকই নয় দিদু"—তু[illegible] বলে চলে, তার চোখের পাতায় জল ভরে আসে,—[illegible] বিচারকেরাও আমার পাশ দিয়ে না দাঁড়িয়েই চলে [illegible] ঐ ৯ নম্বরকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না, কি[illegible] আঁকতে জানে না। ঐ ৩৪ নম্বর অনেক ভাল আঁ[illegible]"

"এই মেয়ে, আগে আয়, খেয়ে নে দিকিন্। [illegible] বলছি তোর ঐ ৯ নম্বর ফুল দেখেই ওরা খুশী না [illegible] পারবে না, দেখবি। তুই-ই প্রথম পুরস্কার পাবি, [illegible] পাবি—" দিদিমা নাত্‌নীকে আশ্বাস দেন।—"[illegible] টাকাতে আমাদের এক বছরের খাওয়া-পরা বেশ [illegible] চলে যাবে। আমরা বড় লোক হব রে, খুব বড় [illegible] তুল্‌তুল্, কাঁদিস্ নে, থাম্ বলছি। জানিস, এত রাগ [illegible] কখনও হয়নি। ঐ বিচারকগুলো বাজারে পেঁয়াজ [illegible] উপযুক্ত। কি তাদের চমৎকার নামগুলো রে!"

ওদিকে স্কুল-ঘরে বড় টেবিলটা ঘিরে বসে বিচা[illegible] ধারী বিচারকেরা মুখ গম্ভীর করে প্রতিযোগিতার [illegible] শুরু করেছেন। প্রাথমিক বিচারের বেড়া পা[illegible] গোটা পাঁচেক ছবি শেষ বিচারের রা[illegible] আলাদা করা হয়েছে। ঐ পাঁচটা ছবির মধ্যে [illegible] ও ৯ নম্বর ছবিও আছে।

কিন্তু বিচারকেরা ভারী যেন মুস্কিলেই [illegible] মুখে চোখে তাঁদের উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে। [illegible]

[illegible] ছবিই তাঁদের চোখে সমান সুন্দর লাগছে। [illegible]তায় পড়লেন তাঁরা; কেউ কেউ তাঁদের তেলো [illegible] হাত বুলোতেও লাগলেন। এমন বিপদ বুঝি [illegible] কখনও হয় নি! টেবিলের ওপর পাঁচটা গোলা-[illegible] ছবি সাজিয়ে রাখা হয়েছে. সকলেরই দৃষ্টি তাদের [illegible]। সব ছবিই সুন্দর, কিন্তু এদের মধ্যে একটা [illegible] ছবিই নিশ্চয় সব চেয়ে সুন্দর। কিন্তু কোন্ [illegible]? কে বলবে? কেউ-ই বুঝি ঠিক করতে পার-[illegible] না। বিচারকরা কেউ মাথায়, কেউ গালে হাত [illegible] বসে ভাবতে লাগলেন।

[illegible] এদিকে তুল্‌তিলার দিদিমা প্রার্থনা করছেন: "ঠাকুর, [illegible]ার তুল্‌তুলের ছবিটার যেন অবিচার না হয়, তুমি [illegible] নিয়ো, ওর মত অত সুন্দর ছবি কেউ আঁকতে পারে [illegible]"

[illegible] বিচারকেরা যখন 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' হয়ে টেবিলের [illegible]ধারে বসেছিলেন, তখন হঠাৎ বাইরে থেকে জানলা [illegible] একটি ভারী সুন্দর রঙীন্ প্রজাপতি ঐ ঘরে উড়ে [illegible]। পাৎলা পাখা মেলে সে টেবিলের চারিদিকে [illegible] করে উড়তে লাগল।

তখনই বিচারকদের নজর গিয়ে পড়ল উড়ন্ত প্রজা-[illegible]টির ওপর। এবং সকলেরই চোখে-মুখে বিচার-[illegible]ার একটা আশু সমাধান যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল। প্রজাপতির চেয়ে ফুলের বিচার করতে কি তাঁরা পারবেন? যে ছবিটির ওপর প্রজাপতিটি বসবে সেই ছবিটাই প্রতিযোগিতায় প্রথম বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি সে না বসে? তা হ'লে প্রতিযোগিতা মুলতুবী রাখা হবে।

যা হোক্, দেখা যাক্। প্রজাপতিকেই আপাততঃ বিচারপতি সাব্যস্ত করে তাঁরা যেন নিশ্চিন্ত হলেন। একটা গুরুভার তাঁদের ঘাড় থেকে যেন নেমে গেল।

প্রজাপতি কি দেখছে, কি বুঝছে সেই জানে। ফুর্-ফুর্ করে সে উড়তে থাকে আর দশ জন বিচারকের দশ যোড়া চক্ষু তাকে অনুসরণ করে। বিচারকদের ধৈর্য্য প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছেছে, এমন সময় প্রজাপতিটা যেন আর দেরী না করে টুপ্ করে ৯ নম্বর গোলাপ ফুলের ছবিটার ওপর একেবারে তার পাপড়ীর মধ্যে নেমে এসে স্থির হয়ে বসে পড়ল। তার পাৎলা রঙীন্ পাখা দু'টো তার পিঠের ওপর একযোড় করে উঁচু করে দিল।

সকলেরই এক সঙ্গে চোখ পড়ল তুল্‌তিলার ছবিটার ওপর। সত্যিই তো, তুল্‌তিলার আঁকা গোলাপ ফুলের ছবিটা এত সুন্দর যে তখন সকলের মনে হচ্ছিল যেন একটি ফুটন্ত গোলাপ!*

* একটি ভিন্ দেশী গল্পের ছায়ায় রচিত।

স্মৃতির পটে

ঠাকুরদাদার আত্মকাহিনী

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

৫

এফ্. এ পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল তখন আমি [illegible]তে। প্রথম বিভাগে উপরের দিকেই স্থান হইল [illegible] একটী ২০৲ টাকার সরকারী বৃত্তিও মিলিল। তবে [illegible] আরও উপরে স্থান আশা করিয়াছিলাম। পরবর্ত্তী [illegible] জন্য কলিকাতায় আসিলাম। তখনও কলিকাতায় বি. এস্-সি পরীক্ষার সৃষ্টি হয় নাই। বি এ পরীক্ষার মধ্যে দু'টা ভাগ ছিল—এ কোর্স ও বি. কোর্স। এ কোর্স মোটামুটি বর্ত্তমান বি. এ পরীক্ষার মত এবং বি কোর্স বি. এস্-সি পরীক্ষার মত। তবে বাংলা তখন ইহার কোন পরীক্ষাতেই ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন

পরীক্ষাতেই তখন বাংলা আবশ্যক হইত না। বৃত্তি পাইলে কোন্ কলেজে পড়িবে এবং কোন কোর্স লইবে তাহা পূর্ব্বে লেখাইবার নিয়ম ছিল। আমার নামের পর কে যেন প্রেসিডেন্সী কলেজ ও বি কোর্স লেখাইয়া দিয়াছিল। আমি মনে করিলাম ভবিষ্যতে ওকালতী ব্যবসায়ই ধরা সম্ভব অতএব এ কোর্স লওয়াই সঙ্গত; আর প্রেসিডেন্সী কলেজ বেশ একটু ব্যয়সাধ্য, আমি মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে) ভর্ত্তি হইলাম। কিছুদিন সংস্কৃতের ক্লাসে বসিতাম কিন্তু শেষে ভাবিলাম যে কারণে এ কোর্স ধরিয়াছি সেই কারণে সংস্কৃত না লইয়া ইতিহাস ও অর্থনীতি (হিষ্ট্রি এণ্ড্ পোলিটিক্যাল ইকনমি) লওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমি শেষে তাহাই করিলাম এবং ইংরাজি ও ইতিহাস-অর্থনীতিতে অনার্স লইলাম। তখন এখনকার মত এক বিষয়ে মাত্র অনার্স লওয়ার নিয়ম ছিল না। তৃতীয় বিষয় মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান আমার ভাল লাগিত না এবং অনেক সময় ইহা পড়া হইবার কালে আমি ক্লাসে থাকিতাম না। ইংরাজীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার লাহিড়ী ও মিঃ এন্. এন্. ঘোষ উভয়েই সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত লাহিড়ীর অদ্ভুত স্মরণশক্তির কথা কখনও ভুলিতে পারিব না। একখানি গদ্য পুস্তক মিঃ ঘোষ পড়াইতেন। এক স্থানে একটা বাইবেলের কথা ছিল—ঘোষ সাহেব উহার খুঁটিনাটি দেখিয়া আসিয়া পরে বলিবেন বলিলেন। পরে যখন শ্রীযুক্ত লাহিড়ীর পড়াইবার সময় আসিল তখন কোন ছাত্র (বোধ হয় তাঁহাকে পরীক্ষা করার জন্য) ঐ স্থানটী বুঝাইয়া দিতে বলিল। শ্রীযুক্ত লাহিড়ী বুঝাইলেন তো বটেই, অধিকন্তু বাইবেলের কোন্ অধ্যায়ে কোন্ শ্লোকে আছে মুখস্থ বলিয়া দিলেন। ইংরাজী সাহিত্যের পাঠ্য-পুস্তকের তাঁহার প্রণীত অর্থপুস্তক (নোট্) সেকালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সেতু স্বরূপ ছিল। এই অধ্যাপকের অকালমৃত্যু বাঙ্গালার একটী দুর্ভাগ্য।

মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক মহাশয় একদিন ক্লাসে নোট দিতেছেন এমন সময় আমি বলিয়া ফেলিলাম 'নোট নেওয়া অপেক্ষা বই পড়া ভাল।' তিনি উত্তর দিলেন, "আমরা কয়েক দিন হইতে বইই পড়িতেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার উপস্থিতি দ্বারা ক্লাস অনুগৃহীত [illegible] দেখিলাম তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়া সশরীরে [illegible] উপস্থিত। পায়ে চটী জুতা, গায়ে চাদর। [illegible] উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি দুই-এক কথা বলিয়া [illegible] গেলেন।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী এই কলেজেই শেষ [illegible] চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী আরম্ভ হইলে আমি কলেজ [illegible] প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিলাম। এখানে [illegible] ভাবিলাম আমি যে দুই বিষয়ে অনার্স লইয়াছি [illegible] উপর তৃতীয়টীতে লইলে ক্ষতি কি? উহা তৃতীয় [illegible] শ্রেণীতে লওয়া হয় নাই কিন্তু তৃতীয় বার্ষিক [illegible] আমি কোন্ বিষয়ই বা ভাল করিয়া পড়িয়াছি? [illegible] পড়ায় আমার বিশেষ মনোনিবেশ হইত পরীক্ষার [illegible] তাহার পূর্ব্বে বাহিরের বই পড়া, খবরের কাগজ [illegible] উহাতে লেখা ইত্যাদিতে অনেক সময় যাইত।

যাহা হউক তিন বিষয়ে অনার্স পড়িতে লাগি[illegible] কতক সময় গল্পগুজবে কাটাইতাম কিন্তু যখন [illegible] বসিতাম অনেকখানি পড়িয়া ফেলিতাম। তিন র[illegible] পেন্সিলে বইএর উপরই দাগ দিয়া যাইতাম, যাহা [illegible] পড়িতে হইবে ও যাহা কম পড়িতে হইবে ভাগ ক[illegible] রো ও ওয়েব্ সাহেব (যাঁহাদের 'Hints' এখনও ছাত্র[illegible] মধ্যে চলে) আমাদিগকে বি.এ ক্লাসে ইংরাজী পড়াই[illegible] ইতিহাস ও অর্থনীতিও পড়াইতেন ওয়েব্, আর [illegible] (অথবা মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান) পড়াইতেন ডাঃ [illegible] কে. রায়। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু এই সময়ে ক[illegible] বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিতেন কিন্তু তাহার সহিত আ[illegible] কোন সম্পর্ক ছিল না। রো সাহেব খুব রহস্য[illegible] ছিলেন এবং অনেক সময় ক্লাস মশগুল করিয়া তুলি[illegible] একদিন Unreflecting Love এর অর্থ জিজ্ঞাসা ক[illegible] লেন, আমি বলিলাম ইহার অর্থ Love (প্রেম [illegible] অর্থনীতি পড়ে নাই। একদিন বোর্ডের উপর [illegible] বুঝাইবেন—দেখিলেন, উহার উপর কি সব আঁক[illegible] রহিয়াছে। শুনিলেন গণিতের অধ্যাপক মহাশয় [illegible] কি সব লিখিয়া গিয়াছেন। অমনি বলিয়া উঠি[illegible] একটি বোর্ড গণিতের লোকের জন্য, অন্য একটি [illegible]

[illegible]কের জন্য থাকা উচিত। ডাঃ রায় বেশ গম্ভীর [illegible] লোক ছিলেন, ওয়েব্ সাহেবও তাহাই।

[illegible] প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইবার অল্পদিন পরেই [illegible] একটা ক্লাস পরীক্ষা হইল। ডাঃ রায় আমার [illegible] দেখিয়া খুব খুসী হইতে পারিলেন না এবং এ [illegible]র্স রাখিব কিনা বিবেচনা করিতে বলিলেন। আমি [illegible] দর্শনে নতুন করিয়া অনার্স লইয়াছি, উহা ছাড়িয়া [illegible] না।

[illegible] কোন বিষয়েরই সমস্ত বই আগাগোড়া পড়িয়া উঠিতে [illegible]লাম না। কোন কোন পুস্তকের প্রথমাংশ বা বাছাই [illegible] অংশ পড়িলাম—ছাপান নোট বুক ও সংক্ষিপ্তসার [illegible] কিছু পড়িলাম। আমার নিজের কোন নোট্ বুক [illegible]ার অভ্যাস ছিল না।

[illegible] বি.এ পরীক্ষা দিতে যাইব, আমার এমন শিরঃপীড়া [illegible] দিল যে ছট্‌ফট করিতে লাগিলাম। আমাদের [illegible] আমার দূর সম্পর্কীয় এক ভদ্রলোক থাকিতেন। [illegible]াকে আমরা অভিভাবকের মত দেখিতাম। মেসে [illegible]ার সমাদ্দার মহাশয় বলিয়া আখ্যা ছিল। তিনি [illegible] এক কবিরাজের নিকট হইতে তেল লইয়া আসি-[illegible]ন। উহা মাথায় লাগাইয়া কলের তলে অনেকক্ষণ [illegible]লাম। এই স্নানে বেদনা সারিয়া গেল—পরীক্ষা [illegible] সম্ভব হইল।

[illegible] ইহার পূর্ব্বে আঠার বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই [illegible]মার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তখনকার দিনে প্রায়ই [illegible]রূপ ঘটিত।

[illegible] উপরে যে সমাদ্দার মহাশয়ের কথা লিখিয়াছি তিনি [illegible]রের কাগজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। তিনি মিঃ এন্. [illegible] ঘোষ সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান্ নেশন্' কাগজের ম্যানে-[illegible] ছিলেন এবং বাংলা কাগজে যে সব সাময়িক [illegible]াদি বাহির হইত তাহার সার সঙ্কলন করিয়া সাহেব-[illegible] কাগজে দিতেন। তাঁহার নিকট রাজনৈতিক [illegible]তের অনেক তথ্য শুনিতাম এবং সাহেবদের কাগজ [illegible]িবারও সুযোগ পাইতাম।

[illegible] পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল তখন আমি দেশের [illegible]তে। তিন বিষয়েই অনার্সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম—এক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম, একটীতে দ্বিতীয়, একটীতে তৃতীয়। এ কোর্সে আমার সমান আর কেহ দাঁড়াইল না কিন্তু বি কোর্সের দুইটী ছাত্রের নম্বর আমা অপেক্ষা বেশী হইল। ফলে আমার ৪০৲ টাকা করিয়া বৃত্তির ব্যবস্থা হইল।*

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজীতে এম্. এ পড়িতে লাগিলাম। তাহার উপর প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দর্শনের ক্লাসেও পড়িবার অনুমতি দিলেন। তবে দর্শনের ক্লাসে বসিবার সুযোগ কমই মিলিত। ইংরাজী সংবাদ পত্রেও একটু আধটু লিখিতাম। এম্. এ ক্লাসের প্রথম হইতেই মেস বদলান হইল। সমাদ্দার মহাশয় প্রভৃতিও এই মেসে আসিয়াছিলেন কিন্তু কিছু পরে একটী অপ্রীতি-জনক ঘটনার পর তাঁহারা অন্যত্র চলিয়া গেলেও সমাদ্দার মহাশয়ের প্রভাব আমার উপর রহিল। সেই বৎসর বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল যে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী চাকরীর জন্য প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হইবে এবং কয়েকজন পারদর্শিতানুসারে এবং কয়েকজন অপর পরীক্ষার্থীর মধ্য হইতে বাছাই করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। সমাদ্দার মহাশয়ই প্রথমে ঐ বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট পাঠান এবং আমাকে ঐ পরীক্ষা দিতে উৎসাহিত করেন। তখন ওকালতীর বাজার মন্দা হইয়া আসিয়াছে এবং বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের বেতন খুবই কম। আমি এম্. এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। পরীক্ষার দরখাস্তের সঙ্গে দেওয়ার জন্য আবশ্যক সার্টিফিকেটও সংগ্রহ করিলাম। এজন্য ফরিদপুরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই যাতায়াতে এঞ্জিনের কয়লার কুচি চক্ষুতে পড়ায় অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম অনেক। বিশ্ববিদ্যালয়ের আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রারের নিকট বি. এ পাসের সার্টিফিকেট আনিতে গেলে তিনি প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তুমি এম্. এ পাশ করিবে, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দিবে, ডেপুটীগিরি কেন?" এই ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু ভবিতব্য কে ঘুচাইবে? আমি

* আমাদের যত দূর জানা আছে লেখক যে তিন বিষয়ে অনার্স লইয়াছিলেন ঐ তিন বিষয়ে প্রথম বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কেহ উত্তীর্ণ হন নাই।—রাঃ সঃ

TIGHT BINDING

সার্টিফিকেট আনিলাম এবং পরীক্ষার ফি ও দরখাস্ত ডাকে পাঠাইয়া দিলাম।

এম্. এ ক্লাসে ইংরাজীতে শিক্ষক ছিলেন টনী, রো ও পার্সিভাল। টনী সাহেবের মত সুপণ্ডিত লোক তখন পাওয়া কঠিন ছিল। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসিক্‌স্-এ প্রথম হইয়াছিলেন এবং সংস্কৃতেও বেশ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে ক্লাসে বসিতেন, ছাত্রদের মুখের দিকে বড় একটা তাকাইতেন না এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দেরও ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার প্রথম দিনের পড়ান আমার কিছু কিছু মনে পড়ে:—

I come no more—I come no longer
To please you—to amuse you with
a comedy.

একদিন একটী ছাত্র Anglo-Saxon Grammar সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিল, "Sir, the grammar is unintelligible to us. (মহাশয়, এ গ্রামার আমাদিগের অবোধ্য)। তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "Then you must give it up; it used to be intelligible to students of former M. A. classes." (তাহা হইলে তোমাদিগকে ইহা ছাড়িয়া [illegible] হইবে, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী এম্. এ ক্লাসের ছাত্রদিগের বো[illegible] ছিল।)

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষা অনেক নাম-করা [illegible] দিয়াছিল—অধ্যাপক শ্রেণীর লোকও ছিল। কিন্তু [illegible] পরে শোনা গেল আমি দ্বিতীয় হইয়াছি, এক কলে[illegible] অধ্যাপক প্রথম হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে অন্য নির্ব্বা[illegible] প্রার্থীদের নাম বসাইয়া এক ফর্দ্দ গেজেটে বাহির [illegible] হইল এবং আমার উপর শিক্ষানবীস রূপে ফরিদপু[illegible] যাওয়ার আদেশ প্রচারিত হইল। আমি ধড়াচূড়া [illegible] করিয়া কলিকাতা ছাড়িলাম এবং কলেজে এক [illegible] লিখিয়া গেলাম যে আগামী ১লা এপ্রিল চাকরী[illegible] যোগ দিব, তাহার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত যেন আমাকে [illegible] দেওয়া হয়। কোথায় ওকালতী আর কোথায়—[illegible] ভবিতব্য।

চাকরীতে যোগ দিবার সময়ও ইচ্ছা ছিল যে এম্. [illegible] পরীক্ষাটা যথাসময়ে দিব কিন্তু অসুস্থ হইয়া পড়ায় [illegible] তজ্জন্য পরীক্ষায় উপযুক্ত স্থান না হওয়ার আশঙ্কায় তা[illegible] আর শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠিল না। চাকরী-জীবনের ক[illegible] আর তোমরা কি শুনিবে?

পোকামাকড়ের চিড়িয়াখানা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

আমার টেবিলের উপর কোথা থেকে একটি ছোট্ট পোকা উড়ে এসে বসেছে। পোকাটার সারা গা যেন সোনা দিয়ে মোড়া, তার ভিতর রং-বেরংএর ছিটে ফোঁটা। সমুদ্রের ধারে রঙ্গিন শামুক-ঝিনুকের গায়ে যেমন রংএর খেলা দেখা যায় অনেকটা তেমনি আর কি! এমন অদ্ভুত পোকা আমি আর কোন দিন দেখি নি। পোকাটা ফর্‌ফর্ করতে করতে আমার কলমদানীর উপর গিয়ে বসল, তার পর দোয়াতের কানা বেয়ে উঠে গভীর আগ্রহের সঙ্গে তার ভিতরটা দেখতে লাগল—যেন ভিতরকার নীল রহস্য ভেদ করবে ও।

একটা ফরমাসি গল্প লিখবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু ঐ অদ্ভুত পোকাটার দিকে চোখ পড়তেই আমার কলম বন্ধ হয়ে গেল, কৌতূহলের সঙ্গে পোকাটাকে দেখ[illegible] লাগলাম।

হঠাৎ একটা বড় মাছি এসে হাজির, সেও দোয়াতে[illegible] উপর বসবে। আকারে দু'জনেই প্রায় সমান, [illegible] বোধ হয় সহজেই তারা পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে [illegible] নিল। পোকাটা, মনে হ'ল, দোয়াতের রহস্য উদ্ঘা[illegible] বন্ধ ক'রে এবার মাছিটাকেই লক্ষ্য করছে, এবং মাছি[illegible] তাই। পরমুহূর্ত্তেই পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ক[illegible] বসল।

বরাবরই আমি পোকামাকড়ের কার্য্যকলাপ [illegible] করতে ভালবাসি। ছেলেবেলায় পিঁপড়েদের হাল[illegible] জানবার জন্য কত সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি [illegible] ঠাট্টা-বিদ্রূপ গায়ে না মেখে। আমার ঘরে দেয়ালে [illegible]টে টিকটিকি আজও আরামে বাস করছে তাদের [illegible] কাজের 'প্রোগ্রাম' আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। [illegible]ও আমার কৌতূহল যে প্রবল হবে তা স্বাভাবিক। [illegible]লেখা ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে আমি এই রণলীলা [illegible] বসে গেলাম।

[illegible] মাছিটা ভন্ ভন্ ক'রে উড়ে উড়ে যাচ্ছে, [illegible] এসে পোকাটার গায়ে শুড় [illegible]ছে। পোকাটার তেজ যেন বেশী; [illegible] লাফিয়ে মাছকে মারতে চায়। [illegible] দু'জনে খুব খানিকটা জড়াজড়ি—[illegible]পাটি করতে করতে কুস্তিগীরের মত [illegible] সুরু করে দিল, এবং প্রায় মিনিট [illegible] পরেই মাছিটা অসাড় হয়ে পড়ল। [illegible]টা পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে [illegible]। বোধ হয় একটু জিরিয়ে তার [illegible] মাছিটাকে দিয়ে উত্তম জলযোগের [illegible] হবে।

[illegible]কন্তু বিধির লিখন। ভোজ আর তার [illegible] ছিল না। আমার ঘরের টিকটিকির [illegible] বলেছি। তাদেরই একটা বোধ হয় [illegible] দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল। [illegible] চোখের নিমেষে ধাঁ করে এসে সে [illegible]টাকে মুখে নিয়ে দেয়ালের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে [illegible] আমার সামনে থেকেই। টিকটিকিটার সাহস আছে [illegible] হবে।

[illegible] পোকাটার জন্য মনে দুঃখ বোধ করলাম। ওর জন্য [illegible] একটা মায়া বোধ করছিলাম। বোধ হয় ওর [illegible] চেহারার জন্যই ওর সম্বন্ধে আমার একটা প্রবল [illegible] হয়েছিল। ঘুরে ফিরে পোকাটার কথাই মনে [illegible] লাগল। গল্প লেখা আর হ'ল না।

তোমাদের অনেকেই হয়তো কথাটা শুনে একটু [illegible] হবে। সামান্য একটা পোকা নিয়ে এত মাথা [illegible] কেন! অনেকের আবার পোকা সম্বন্ধে একটা [illegible] ভয় আছে—পোকা দেখলেই গা শির্ শির্ করে। কারও কারও ঘেন্নাও আছে। নোংরা, কুৎসিৎ ক্ষুদে ক্ষুদে জীবগুলো—! এ রামোঃ ছ্যাঃ।

আমাদের চার পাশে—মেঝেতে, দেয়ালে সর্ব্বদাই নানা রকম পোকামাকড় ঘুরে বেড়ায়। বাগানে বা জঙ্গলে গেলে আরও অনেক নতুন নতুন অদ্ভুত অদ্ভুত পোকামাকড় চোখে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়,

লাল পিঁপড়েরা পাতা সেলাই ক'রে বাসা বাঁধছে।

আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই ঐ সব প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানে না, জানবার আগ্রহও তাদের নেই।

কিন্তু যাঁরা পোকামাকড়ের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সত্যিই আগ্রহান্বিত—তাঁরা ওর মধ্যেও যথেষ্ট "রসকষ" পান। পোকামাকড়েরা তাঁদের চোখে ভগবানের এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি। আমি নিজে অবশ্যি কোন কালেই কীটতত্ত্ববিদ্ নই, কিন্তু তবু ওদের সম্বন্ধে শুনতে বা জানতে ভালই লাগে। আমাদের ছেলেবেলা 'সন্দেশ' পত্রিকায় ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কীটপতঙ্গদের সম্বন্ধে নানা রকম তথ্যপূর্ণ সরস প্রবন্ধ লিখতেন। মনে পড়ে কী আগ্রহের সঙ্গেই না সেগুলি পড়তাম!

সম্প্রতি কিন্তু কীটতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নানা ভাবে সাধারণ লোকের ভিতরও পোকামাকড়দের সম্বন্ধে কৌতুহল সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। নিউ ইয়র্ক সহরে 'ব্রঙ্ক্‌স্ চিড়িয়াখানা' এর একটি উদাহরণ। 'চিড়িয়া' মানে পাখী—কিন্তু চিড়িয়াখানা বলতে আমরা পশুশালাই বুঝি। পশুশালায় সাধারণতঃ রকমারি জীবজন্তুই ধরে রাখা হয়—কিন্তু এই চিড়িয়াখানাটিতে একটি পোকামাকড়ের বিভাগও খোলা হয়েছে, এবং শুধু খোলা নয়—তাদের জন্য এক বিরাট্ বাড়ী তৈরী ক'রে তার মধ্যে যত রকম পরিচিত ও দুষ্প্রাপ্য পোকা সম্ভব সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে। দর্শকেরা এখানে শুধু হরেক রকম পোকা দেখবার সুযোগই পাবেন না—বিভিন্ন পোকার জীবনযাত্রার খুঁটিনাটিও যাতে তাঁদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কর্ত্তৃপক্ষ তারও চেষ্টার ত্রুটী করছেন না।

এই বিভাগটির যিনি ভার নিয়েছেন তাঁর নাম ব্রেটন্ এডি। পোকামাকড়দের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান শুধু গভীরই

গুবরে পোকা গোবরের তাল নিয়ে ব্যস্ত।

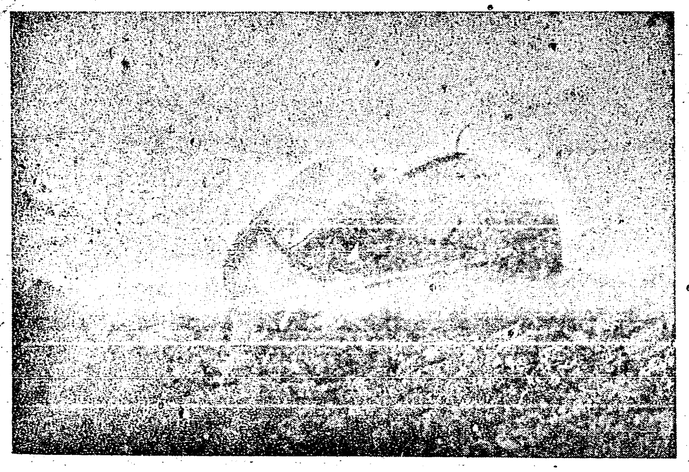

নয়, নানা রকম চিত্তাকর্ষক পরিকল্পনা বার করতেও তাঁর যুড়ি নেই। দর্শকদের আকৃষ্ট করবার নানা রকম ফন্দীফিকির তাঁর জানা আছে। ফলে এই বিভাগটি সাধারণ বিভাগের চাইতে এখন অনেক বেশী জনপ্রিয় হয়ে পড়েছে।

কোন কোন পোকা লোকচক্ষুর আড়ালে
ভালবাসে। তাদের সর্ব্বদা দর্শকদের সামনে
উপায় কি? মনে কর এই রকম লাজুক এক
ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় থাকতে ভালবাসে।
খানায় তার জন্য একটা কাচের ঘর তৈরী করা
ঘরের সবটাই শুকনো—খটখটে, শুধু একদিকে
টুকরো ভিজে কাঠ পোকাটার সব সময়েই
ঐ কাঠের ওপর গিয়ে আশ্রয় নেবার। ফলে
এড়িয়ে থাকার যো নেই তার। আবার মনে কর
একটা পোকা,—তার স্বভাব হচ্ছে বালির তলায়
থাকবে। চিড়িয়াখানায় তার ঘরে বালির ব্যবস্থা
কিন্তু এত কম যে তার তলায় সম্পূর্ণ আত্মগোপন
অসম্ভব। এই রকম আর এক জাতের পোকা
যারা নিজেরা আত্মগোপন না করলেও সামনে
টুকিটাকি জিনিষ পেলে তা বালির নীচে লুকোবার
চেষ্টা করবে। এদের বেলাও ঐ রকম অল্প বালি
ছেড়ে দিলে দর্শকরা মজা দেখবারই সুবিধা পা

মাকড়ষা কি ক'রে জাল বোনে, কি ক'
ফাঁদে শিকার ধরে এই চিড়িয়াখানায়
সামনে তা দেখবার ব্যবস্থা আছে। গুটি
থেকে কি ক'রে প্রজাপতি বেরোয় সে দৃশ্য
এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! কিন্তু এখানে অনেক
হামেশা তা দেখবার সৌভাগ্য লাভ করে।
পড়লে আত্মরক্ষার জন্ত অনেক পোকা অনেক
আচরণ করে। কেউ শরীরের পেছন
কামানের মত ধোঁয়া বা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দেয়।
শরীরটাকে তালগোল পাকিয়ে বিকৃত করে
এই রকম কত কি! এখানে দর্শকদের
সামনেই এ সব দেখা যায়। অনেক পোকা
খুব লড়াইবাজ, স্বজাতি বা অন্য জাতীয়
সামনে এলে তার সঙ্গে এক হাত না লড়ে
না। এই লড়াইএর দৃশ্য নাকি দর্শকদের কাছে
লোভনীয়—তাই প্রায়ই এর ব্যবস্থা করা হয়।
চারদিকে, গ্যালারী পেতে, মুষ্টিযুদ্ধ বা কুস্তী দেখাবার
যেমন ব্যবস্থা থাকে তেমনি ব্যবস্থা ক'রে এই
দেখান হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাধারণতঃ একটা বড়

ক'রে ঘরের ছাদ থেকে ঝুলিয়ে তার মধ্যে খুব কড়া
আলো ফেলা হয়—যাতে সকলেই দেখতে পায়।
ইএর শেষে অবশ্য প্রায়ই প্রতিদ্বন্দ্বীদের একজনকে
থেকে বিদায় নিতে হয় এবং অপরে তাকে দিয়ে
যোগ সারে। কিছু নিষ্ঠুর এবং কিছুটা ব্যয়সাধ্য
লেও জন সাধারণকে আকৃষ্ট করবার জন্য চিড়িয়াখানার
তারা প্রায়ই এই লড়াইএর আয়োজন করে থাকেন।
কিন্তু শুধু জন সাধারণকে মজা দেখান' বা আনন্দ
ই যে এই চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্য নয় তা নিশ্চয়ই বুঝতে
রছ। কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বাড়ান', তাদের
জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে নানা রকম তথ্য পরিবেশন—
ই সবই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। কীটপতঙ্গদের মধ্যে মানুষের
অপকারী এবং উপকারী দু' রকমই আছে। কোন কোন
পোকা নানা রকম ব্যারামের বীজ ছড়ায়, কোনটা ফসলের
ক্ষতি করে, কোন কোনটা বা মানুষের নানা প্রয়োজনীয়
জিনিষ কেটে বা ধ্বংস ক'রে নষ্ট ক'রে দেয়। আবার
এমন অনেক পোকা আছে যারা প্রথমোক্ত পোকাদের
অনেককে খেয়ে ফেলে তাদের অত্যাচার থেকে মানুষকে
রক্ষা করে, নানা ভাবে জমির উর্ব্বরতা বাড়িয়ে তাকে
শস্যশালী করতে সাহায্য করে, মানুষকে নানা প্রয়োজনীয়
জিনিষ সরবরাহ ক'রে তার জীবনযাত্রায় আরাম এনে
দেয়। প্রথমোক্তদের মধ্যে মশা, মাছি, ছারপোকা, আরশোলা, গাছের পোকা, উই ইত্যাদির নাম করা
যেতে পারে। শেষোক্তদের মধ্যে কেঁচো, গুটিপোকা
ইত্যাদির নাম করা যায়। এ সব আমাদের পরিচিত
পোকা! আমাদের স্বল্পপরিচিত কিংবা একেবারে
অপরিচিত বহু পোকা এদের দু'দলেই আছে। অথবার
কোন কোনটা একদিক্ দিয়ে আমাদের অপকার করলেও
অন্য দিক্ দিয়ে আমাদের উপকার করে। এই চিড়িয়াখানায় গেলে তাদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এক-এক
আকার আবার নানা রকম জাত আছে। বস্তুতঃ
পৃথিবীতে জীবজন্তুর সংখ্যা যত পোকামাকড়ের সংখ্যা
তাদের চাইতে বেশী ছাড়া কম নয়।

এই সব পোকা সংগ্রহ করাও বড় কম কথা নয়।
চিড়িয়াখানার কর্ত্তাদের এ জন্য বহু পরিশ্রম—বহু কলাকৌশল খাটাতে হয়। ঝোপে, জঙ্গলে, উঁচু গাছের ডগায়, জলে, কাদায়, নানা অস্বাস্থ্যকর জায়গায় ঘুরে ঘুরে—এমন কি সময় বিশেষে জীবন বিপন্ন ক'রেও এদের সংগ্রহ করতে হয়েছে। বেশীর ভাগ পোকামাকড়ই তো নোংরা জায়গায় থাকে। জাল ফেলে, ঝোপের নীচে ফাঁদ পেতে, ওষুধপত্র প্রয়োগ করে—কত ভাবেই না এদের ধরতে হয়! তবে খাবারের লোভে পড়েই বেচারারা বেশী ধরা পড়ে। পেটের দায় বড় দায়—আর পেটুকের শাস্তি কি তা তো জানই।

কিন্তু এদের খাবার যোগাড় করাও বড় কম কথা নয়। খাবার অবশ্যি তেমন দুষ্প্রাপ্য নয় কিন্তু কে কি খাবেন সেইটাই বড় কথা। হাজার রকম পোকার হাজার রকম খোরাক। কেউ খাবেন গাছের পাতা, কেউ ফলের রস, কেউ মাটী, কেউ পচা জল-কাদা, কেউ বা ফুলের পাপড়ি, কেউ বা অন্য পোকা—বিজাতীয় বা স্বজাতীয়। স্বাধীন অবস্থায় এরা নিজেদের খোরাক নিজেরাই জুটিয়ে নেয়, কিন্তু বন্দীদশায় এদের খোরাকের ভাবনা যারা বন্দী করবে তাদেরই ওপর। এ জন্য কীটতত্ত্ববিদ্‌দের কম গবেষণা করতে হয় না। অনেকের খোরাক আবার একটু নতুন ধরণের। কেউ কেউ নিজের শরীরের চাইতে অনেক গুণ বড় অন্য পোকা না পেলে খুসী হবেন না। বইএর পোকার জন্য চাই কাগজ, আঠা এই সব খাদ্য। ফলের পোকার জন্য চাই সময় বিশেষে দুষ্প্রাপ্য ফল — যে কোন ফল হ'লে চলবে না—তাঁর পছন্দসই ফল হওয়া চাই। কারো বা চাই ফুলের পাপড়ি—অন্য ফুল হলে চলবে না—হয়তো শুধু গোলাপের পাপড়িই চাই। সব চেয়ে অদ্ভুত খাদ্য হচ্ছে সেই মাকড়ষার যার ইংরেজী নাম "ব্ল্যাক উইডো"। ইনি স্বামীর মাংস ছাড়া আর কিছু বড় একটা পছন্দ করেন না। তবে তা তো আর সব সময় জোটান সম্ভব নয়—রোজ একটি করে স্বামী কোথায় পাওয়া যাবে? অগত্যা এঁকে মাছি দিয়েই বেশীর ভাগ ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে বাধ্য করা হয়।

ম্যানটিস্ নামে আর এক রকম পোকা আছে। এদের মেয়েরা অন্য জিনিষ খায় বটে কিন্তু সময় সময় স্বামীর মাথা খেতেও ছাড়ে না। 'মাথা খাওয়া' মানে 'প্রশ্রয় দেওয়া' অর্থ ভেব না যেন। সত্যি সত্যি এরা স্বামীর মাথা ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে জলযোগ করতে

TIGHT BINDING

ভালবাসে। এ রকম স্ত্রী নিয়ে ঘর করা স্বামীদের পক্ষে বিপজ্জনক হলেও চিড়িয়াখানার কর্ত্তাদের মাঝে মাঝে তারও ব্যবস্থা ক'রে দিতে হয়।

ব্রেটন এডি পোকামাকড়দের খুব দরদী বন্ধু তাঁর মতে সব রকম পোকামাকড়েরই—তা সে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের যত অপকারীই হোক্ না কেন, সৃষ্টির একটা সার্থকতা আছে। ভগবান্ কাউকেই নিরর্থক সৃষ্টি করেন না। কোন না কোন ক্ষেত্রে হয়তো তাদের প্রয়োজন আছে। পোকামাকড়দের নির্ব্বিচারে হত্যা করার পক্ষপাতী এডি নন্। এক দিক্ দিয়ে হয়তো তারা ... উপকার করতে পারে। যেমন ধর, মশা মাত্রই ... নয়। কোন কোন জাতের মশা এনোফিলিস ... ম্যালেরিয়া-বাহক মশাদের ধরে খায় কিন্তু মানুষের ... ক্ষতি করে না। এদের মারলে ম্যালেরিয়ার প্রতি... টিকেও মারা হ'ল এডি বলেন, পোকামাকড় ... মানুষের জ্ঞান আরও সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। তা... পৃথিবীর অনেক ঝঞ্ঝাট থেকেই হয়তো মানুষ অব্যা... পেতে পারে।

একলব্য

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য।

[বন। দ্রোণাচার্য, অর্জুন, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, প্রহরীগণ প্রভৃতি।]

দ্রোণ। আমরা বনের খুব ভেতরে এসে পড়েছি মনে হচ্ছে। কিন্তু কোন জীবজন্তুর ত' সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না!

অর্জুন। আমার মনে হয় আরো ভেতরে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আপনি এখানে অশ্বত্থামা আর প্রহরীদের নিয়ে খানিক বিশ্রাম করুন। আমাকে আর দুর্যোধনকে এগিয়ে যাবার আদেশ দিন।

দ্রোণ। তা আমি এখানে বিশ্রাম করতে পারি। কিন্তু অশ্বত্থামার আমার কাছে থাকবার প্রয়োজন নেই। সে তোমাদের সঙ্গেই যাক্। কি বল দুর্যোধন?

দুর্যোধন। সেই ভাল। অশ্বত্থামাকে নিয়ে আমরা একটু এগিয়ে দেখে আসি। প্রহরীরা আপনার কাছে থাকুক।

দ্রোণ। কিন্তু তোমরা ফিরে আসতে বিলম্ব ক'রো না যেন। আর কোন প্রয়োজন বুঝলেই অশ্বত্থামাকে দিয়ে সংবাদ পাঠাবে।

অর্জুন। আমরা তা'হলে এখন আসি গুরুদেব?

(অর্জুন, দুর্যোধন ও অশ্বত্থামার প্রস্থান।)

পটক্ষেপ

[গভীর বন। অর্জুন, দুর্যোধন ও অশ্বত্থামার প্রবে...

অর্জুন। একটা খস্ খস্ শব্দ শোনা যাচ্ছে ... কোন জন্তুর পায়ের শব্দ মনে হচ্ছে।

অশ্বত্থামা। আমিও শুনেছি। শব্দটা ওই দিক্ ... আসছে মনে হয়।

দুর্যোধন। চল না, ওদিকে গিয়ে দেখা যাক্।

(তিন জন সেদিকে অগ্রসর হ'ল।)

অশ্বত্থামা। কি আশ্চর্য! এই গভীর বনের মধ্যে ... কুকুরটা কোথা থেকে এল?

অর্জুন। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার রয়ে... ওর মুখের মধ্যে। দেখেছো দুর্যোধন, কি অসাধা... কৌশলে ওর মুখ সাতটি বাণে বিদ্ধ করা হয়েছে!

দুর্যোধন। তাই ত দেখছি। হত্যা না করে ... ওর স্বর বন্ধ করাই বোধ হয় শিকারীর উদ্দেশ্য ছি... অশ্বত্থামা! গুরুদেবকে শীঘ্র এখানে আসতে বল।

অশ্বত্থামা। এই কুকুরটার জন্যে পিতার আসবার—

দুর্যোধন। আঃ, তর্ক ক'রো না। শীঘ্র যাও।

(অশ্বত্থামার প্রস্থান।

(অর্জুনের দিকে ফিরে)—তোমার মুখ দেখে ম... হচ্ছে, তুমিও এই বাণের প্রয়োগ-কৌশল জান না।

অর্জুন। তোমার অনুমান সত্য, দুর্যোধন! কি... আমি ভাবছি, এমন কৌশলী ধনুর্বিদ্‌ও তা'হলে আছে... গুরুদেব বলেন, শরাঘাতের সমস্ত কৌশলই তিনি ...কে শিক্ষা দিয়েছেন। বর্তমানে আমাদের গুরু-... শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-শিক্ষক ত' আর কেউই নেই। তাঁর ... শিক্ষালাভ না ক'রে এমন শর-নিক্ষেপের কৌশল ...লাভ করা সম্ভব? তোমার কি মনে হয়?

...র্যোধন। আমার মনে হয়, গুরুদেব গোপনে ...ই অন্য শিষ্য করেছেন। তাঁর যে রকম অর্থলোভ ... বিশ্বাস নেই। আমি তাই ত' অশ্বত্থামাকে দিয়ে ...কে পাঠালুম। দেখি না জিজ্ঞেস করে, কি জবাব ...

...র্জুন। ওই যে গুরুদেব এসে পড়েছেন।

(দ্রোণাচার্য ও অশ্বত্থামার প্রবেশ।)

...্রোণ। অশ্বত্থামার মুখে সব শুনলুম। বড় আশ্চর্য ...। তাই সারমেয়টিকে দেখতে এলুম। কই, ...দেখাও ত'।

...র্যোধন। ওই দিকে দেখুন।

...্রোণ। (অগ্রসর হয়ে) তাই ত'! এমন ধানুকীও ...! এমন অসাধারণ শর-সন্ধান কে করলে?

দুর্যোধন। আপনারই কোন শিষ্য বোধ হয়। না হ'লে এ সম্ভব নয়।

দ্রোণ। দুর্যোধন! তুমি আমাকে অপমান করতে চাও? অর্জুন, তুমি নিরুত্তর কেন? বিশ্বাস কর তোমরা—আমার আর অন্য কোন শিষ্য নেই। ঈশ্বর জানেন, আমি মিথ্যা বলছি না। এই শিকারী নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে। তোমরা তাকে খুঁজে বার কর। তা'হ'লেই বোঝা যাবে আমি সত্য বলছি কি না।

দুর্যোধন। না, না, আপনাকে আমরা অবিশ্বাস করছি না। তবে এ শিকারীকে খুঁজে বার করা দরকার। দেখাই যাক্ না লোকটা কে। কি বল অর্জুন?

অর্জুন। হ্যাঁ, এ শিকারীর সন্ধান করা দরকার।

দ্রোণ। তা'হ'লে আর দেরী করা উচিত নয়। ওদিকটা ভাল করে খুঁজে দেখা যাক্, চল।

(সকলের প্রস্থান)

পটক্ষেপ

(ক্রমশঃ)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জাহাঙ্গীরনগরে

...আয়েৎ খাঁ রসরাজকে লইয়া জাহাঙ্গীরনগর পৌঁছি-... দীর্ঘ-পথ, পৌঁছিতে বেশ কয়েক দিন কাটিয়া ... রসরাজ ইহার আগে এ অঞ্চলে আর আসেন নাই; পথশ্রমে একটু ক্লান্ত হইলেও পূর্ব্ববঙ্গের নানা লোভনীয় খাদ্যে সে ক্লান্তি দূর হইল। বিশেষতঃ পদ্মার ইলিশ, তার বুঝি তুলনা নাই! মাঝে মাঝে চরে নামিয়া

এই টাটকা ইলিশের ঝোলের ব্যবস্থা করিতে কিছুটা করিয়া সময় ব্যয় হইল। এনায়েৎ খাঁ অনুযোগ করিতেন, রসরাজও বুঝিতেন পথে অযথা দেরী করা সঙ্গত নয়। আর একদিনকার ইলিশের লোভেই তো আজিকার এই বিপত্তি! কিন্তু মনকে সংযত করিতে পারিতেন না। এ জিনিষ হাতে পাইয়া ছাড়িয়া যাওয়া তাঁর শাস্ত্রে শুধু অনুচিত নয় ক্ষমার অযোগ্য। এমন কি এক-এক বার তাঁর মনে এমন কথাও উঁকি দিতে লাগিল—ভবিষ্যতে, ও ছাই বারদীঘি ছাড়িয়া, এই অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করিলে কেমন হয়?

জাহাঙ্গীরনগরে এনায়েৎ খাঁর এক পরিচিত বন্ধু রাজ দরবারে উচ্চ পদে বহাল হইয়াছিলেন। বুড়ীগঙ্গার, ধারে তাঁর বিরাট বাড়ী। এনায়েৎ খাঁ সঙ্গাদল সহ তাঁহারি ওখানে গিয়া উঠিলেন।

গৌড় অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় বাংলার রাজধানী প্রথমে রাজমহলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় উহা আবার ঢাকায় উঠাইয়া আনা হইয়াছে। দিল্লীতে তখন বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহারই নামে নূতন রাজধানীর নাম দেওয়া হইয়াছে জাহাঙ্গীরনগর। বাংলার শাসনকর্ত্তা বা সুবেদারের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় বর্ত্তমানে অস্থায়ী ভাবে সুবেদার হইয়াছেন ইব্রাহিম খাঁ। যত দিন না দিল্লী হইতে বাদশাহের মনোনীত নূতন সুবেদার নিযুক্ত হইতেছেন ততদিন ইনিই কাজ চালাইবেন। তবে শোনা যাইতেছে এবারে নূতন সুবেদার আসিতে কিছু দেরী হইবে। সাধারণতঃ বাদশাহের কোন নিকট-আত্মীয়কেই এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়। এবারে যাঁহার নিয়োগের সম্ভাবনা তিনি বর্ত্তমানে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমনের কাজে ব্যস্ত আছেন, সুতরাং আপাততঃ কিছু দিন ইব্রাহিম খাঁই এই পদে বহাল থাকিবেন।

সুবেদারের গদীতে বসিয়া ইব্রাহিম খাঁ দেখিলেন দেশের প্রায় চারিদিকেই অশান্তি। পূর্ব্বাঞ্চলে মগ ডাকাতের উপদ্রব ক্রমেই বাড়িতেছে, নিম্ন বঙ্গে ফিরিঙ্গীর উৎপাত। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী সুবেদার কঠোর হস্তে ইহাদের দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া আপোষ-আলোচনা করিয়াই ইহাদের থামাইতে গিয়াছিলেন। ফলে ইহারা থামে তো নাই-ই, বরঞ্চ আরও শক্তিশালী [illegible] সুবিধা পাইয়াছে। তাহার উপর কিছুদিন [illegible] নূতন বিপদ্ দেখা দিয়াছে স্থানীয় জমিদারদের [illegible] রাজকর্ম্মচারীদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া ইহারা [illegible] ঝাড়া দিয়া উঠিতেছেন—নবাবকে আর নবাব [illegible] মানিতে চান না। অনেকে তাঁদের দেয় রাজস্ব [illegible] দিতেছেন না—কেউ কেউ নানা ওজুহাত [illegible] কেউ বা এক রকম বিনা ওজুহাতেই। ভিতরে [illegible] হয়তো ইঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার চেষ্টাই করি[illegible] দুই-একজন জমিদার আবার আরও এক ধাপ [illegible] উঠিয়াছেন। ফিরিঙ্গী বা মগ দস্যুদের সঙ্গে একত্র [illegible] তাঁরা নবাবের বিরুদ্ধে লাগিয়াছেন। কর দেওয়া [illegible] থাকুক, নবাবের সম্পত্তি লুঠ করিয়া, নবাবের [illegible] নবাবের ফৌজ আক্রমণ করিয়া—নানা ভাবে [illegible] রাজশক্তির বিরুদ্ধে উপদ্রব সুরু করিয়াছেন। [illegible] সুবেদার এর কোন প্রতিকারই করিয়া উঠিতে [illegible] নাই। ফলে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়া[illegible]

জাহাঙ্গীরনগরের কেল্লার ভিতর সুবেদারের [illegible] মন্ত্রণাগৃহে সেদিন এই সবেরই আলোচনা চলিতে[illegible] ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন প্রভাবশালী [illegible] কর্ম্মচারী। কিন্তু সকলেরই মুখ খুব উদ্বিগ্ন—সক[illegible] খুব বিচলিত দেখাইতেছিল।

সম্মুখে আতরদানের পাশে একখানা খোলা [illegible] পড়িয়া। চিঠিখানি আসিয়াছে নিমপুকুর হইতে, [illegible] আর কেহ নয়, স্বয়ং চাঁদপাল। কিছু দিন যাবৎ [illegible] পালের সহিত সুবেদারের খুব খিটিমিটি চলিতেছে। [illegible] সরকারের বহু রাজস্ব বাকি পড়িয়াছে, চাঁদপাল [illegible] দেয় নাই—উপরন্তু সুবেদারের লোকদের উপর না[illegible] জুলুম করিতেও ছাড়ে নাই। সেখানকার ফৌজদার [illegible] প্রেরণ করিলে তাদের সহিত চাঁদপালের অনু[illegible] কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। তাই সুবেদার [illegible] কঠোর হস্তে চাঁদপালকে দমনের আয়োজন করি[illegible] এবং কয়েকবার তাকে সামান্য নাজেহাল করিতেও [illegible] নাই। কিন্তু ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে চাঁদপালের [illegible] অন্তরঙ্গতা থাকায় চেষ্টা সত্ত্বেও তেমন কঠোর কি[illegible] সম্ভব হয় নাই। এ বিষয়ে দিল্লীতে বাদশা'র [illegible]

[illegible] চাহিয়া সংবাদ পাঠান হইয়াছে, কিন্তু তার [illegible] জবাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

[illegible]প্রতি যেন চাঁদপাল নূতন করিয়া নানা প্রতিশোধের [illegible]জন করিতেছে এবং নিমপুকুরের আশপাশে [illegible]রের খাস প্রজাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় করিয়া [illegible]ছে। প্রায়ই নানা দিক্ হইতে নানা অত্যাচারের [illegible] আসিতেছে। লুঠ-তরাজ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হত্যা—[illegible] আছে। ফৌজদারের সৈন্য কিছুই করিয়া উঠিতে [illegible]তেছে না।

[illegible] আজ যে চিঠিখানা আসিয়াছে তাহা আরও [illegible]। চিঠিতে চাঁদপাল সুবেদারকে জানাইয়াছে—[illegible]কুরের আশপাশে শতাধিক বর্গ ক্রোশ পরিমাণ স্থানে [illegible]কে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। [illegible]কলের যে রাজস্ব এতদিন নবাবের রাজকোষে জমা [illegible] তা এবার হইতে চাঁদপালের নিকট জমা দিতে [illegible]। শুধু তাই নয়, ইহা ছাড়া আশপাশের অঞ্চলে [illegible] রক্ষার জন্য নবাবের রাজকোষ হইতে প্রতি বছর [illegible]পালের সে তাঁয় পঞ্চাশ হাজার আশরফী (মোহর) [illegible]তিপূরণ দিতে হইবে।

ইহার পর চাঁদপাল লিখিয়াছে—আশা করি নবাব [illegible]হেব অতঃপর দেশের শান্তি ও চাঁদপালের সহিত বন্ধুত্বের [illegible]রে উপরের সর্ত্তগুলি স্বীকার করিয়া লইবেন। এবং [illegible]বিষয়ে অনাবশ্যক দ্বিধা করিয়া সময় ক্ষেপ করিবেন না। [illegible] নবাব সাহেব যদি ইহাতে গররাজি হন তবে [illegible]ব্যতের ফলাফলের জন্য চাঁদপালকে যেন দোষী [illegible] না করেন।

পরিশিষ্টে চাঁদপাল জানাইয়া দিয়াছে—ঈশ্বরেচ্ছায় [illegible] তার বন্ধু ফিরিঙ্গী সাধুর অনুগ্রহে আজ সে এমন এক [illegible] গোপন অস্ত্রের অধিকারী যার সাহায্যে সে [illegible] কারলে মহামারী ছড়াইয়া কয়েক দিনের মধ্যে সমগ্র সুবে বাংলা শ্মশান করিয়া দিতে পারে। সুবেদার যেন ভাবিয়া চিন্তিয়া জবাব দেন। আগামী চতুর্দ্দশী তিথি পর্য্যন্ত চাঁদপাল তাঁহার জবাবের প্রতীক্ষা করিবে ও তাহার পর যথা কর্ত্তব্য স্থির করিবে।

জাহাঙ্গীরনগরে পৌঁছিয়া সকালের দিক্‌টা বিশ্রামেই কাটিল। এনায়েৎ খাঁর বন্ধু বাড়ার কর্ত্তা কাজী সাহেব রসরাজের জন্য ব্রাহ্মণ পাচক দিয়া আলাদা ভাবে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মাধ্যাহ্নিক ভোজনটিও বেশ পরিপাটী মতই হইল। আহারের পর কিছুক্ষণ নিদ্রার পর রসরাজ একটু সহর ভ্রমণে বাহির হইলেন। আজই সন্ধ্যার পর সুবেদারের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইবে কাজি সাহেব এই রূপ ভরসা দিয়াছেন।

নদীর ধারটি বড় সুন্দর। নদীর ধারে প্রশস্ত রাজপথ। একধারে বড় বড় অট্টালিকা। তাহাদের সু-উচ্চ চূড়াগুলি যেন আকাশ ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। বিরাট ফটক, সুন্দর পুষ্পোদ্যান। রসরাজ বড় সহরের মধ্যে সপ্তগ্রাম দেখিয়াছেন, কিন্তু রাজধানীর দৃশ্য যেন একটু অন্য রূপ সপ্তগ্রাম বাণিজ্যপ্রধান জায়গা। দোকান-পসরায়, আলোয় সর্ব্বদা ঝকমক করে, পথঘাট সর্ব্বদা লোকের ভীড়ে গম্ গম্ করে—নানা দেশবিদেশের লোকের ভীড় সেখানে। কিন্তু এখানকার দৃশ্যে কেমন একটি গাম্ভীর্য্য আছে—যা নাকি শুধু রাজধানীতেই মানায়। ঘুরিতে ঘুরিতে রসরাজ নদীর ধার হইতে অনেক দূরে চলিয়া আসিলেন।

অদূরে এক জায়গায় একটি ছোটখাট ভীড় জমিয়াছিল। উৎসুক পথচারীরা সকলেই সেই দিকে ছুটিয়া জনতাটিকে ক্রমেই বড় করিয়া তুলিল। খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া রসরাজও সেই দিকে আগাইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

আগামী সংখ্যা থেকে শ্রীশামুকের লেখা
নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস
লড়াই-ফেরৎ নন্দদুলাল

ওরা সৈনিক

শ্রীঅশোককুমার দে

অন্ধ কারার বন্ধ নাশিয়া ছুটে চলে ওরা কারা ?
ওরা ভাই সৈনিক !
প্রাণেতে ওদের শোণিতের তৃষা,
বক্ষেতে চির আশা,
অন্তরে নির্ভীক্।
শত বিপদের শিকল ছিঁড়িয়া—
ছুটে চলে ওরা কারা ?
ওরা ভাই সৈনিক !

লাখো লাখো শব দলি' যায় দুই পায়ে,
ওটা যে ওদের খেলা ;
দম্ভোন্নত বেয়নেট বুকে ছুঁয়ে
পড়িবে নিমেষে নুয়ে,
জীবনেরে ওরা মনে করে শুধু দু'দিনের হেলাফেলা।

অমোঘ মন্ত্রে মরণের দূত করে যে তাদের ভয় ;
কামানের ধোঁয়া মাঝে
বিজয়ের ভেরী বাজে,
মৃত্যু লভিবে নিশ্চুপ পরাজয়।

ধ্বংস-প্রতীক ওরা—
আর ওরা সৈনিক,
বক্ষেতে শুধু শোণিত-তিয়াসা,
অন্তরে নির্ভীক্।

কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামা ভাল ক'রে ঠাণ্ডা হবার আগেই পূর্ব্ববঙ্গ—বিশেষ ক'রে নোয়াখালী, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় যে পৈশাচিক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পৃথিবীর বর্ব্বরতম দেশের ইতিহাসেও বোধ হয় তার তুলনা নেই। বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়কে মুষ্টিমেয় জেনে দিনের পর দিন কি অমানুষিক অত্যাচার করতে পারে, মাতৃজাতির উপর কি রকম অসম্মান দেখাতে পারে তা বাংলা দেশেই প্রথম দেখা গেল। এই ঘটনার বিবরণ তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এর উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক। এই ঘটনায় বাংলার শাসন-ব্যবস্থার—বিশেষ ক'রে লীগ্ মন্ত্রিমণ্ডলীর চরম অযোগ্যতা—এবং তাঁদের যে ঐ পদ আঁকড়ে থাকবার আর ন্যায্য অধিকার নেই আর একবার প্রমাণিত হয়েছে।

* * * *

পূর্ব্ববঙ্গের এই তাণ্ডব লীলায় সমস্ত ভারতবর্ষ বিচলিত হয়ে উঠেছে—সকলেরই দৃষ্টি আজ ঐ দুর্গত জেলাগুলির উপর। কংগ্রেস-সভাপতি ও অনেক বিশিষ্ট নেতা ঘটনা সম্বন্ধে ভাল ক'রে অবহিত হবার জন্য উপদ্রুত অঞ্চলে সফর করেছেন। তাঁদের দেওয়া বিবরণও ভয়াবহ নয়। মহাত্মা গান্ধীও এই ব্যাপারে বাংলায় এসে থাকতে পারেন নি।

* * * *

একেবারে ঠাণ্ডা না হ'লেও কলকাতার অবস্থা

শান্ত হয়ে এসেছিল, কিন্তু সম্প্রতি আবার নানা হাঙ্গামা সুরু হয়েছে,—লোকে আর শ্বাস করতে পারছে না। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য নযাত্রার সহজ গতি পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। রাজধানীর বুকে দিনের পর দিন গুণ্ডাদলের এই আর কত দিন চলবে ?

* * * *

ত জওহরলাল নেহরু মধ্যবর্ত্তী কালীন গভর্ণ-নেতা রূপে যোগ দেওয়ায় কংগ্রেসের সভাপতি পদ য়েছিল। তাঁর স্থানে আচার্য্য কৃপালনী বিনা তায় নূতন রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

* * *

র্ত্তী সরকারে যোগ দিয়েই পণ্ডিত জওহরলাল নানা দেশের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ব্যবস্থা করেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে অন্যান্য স্বাধীন দেশের বিনিময়ের ব্যবস্থা হয়েছে। ত ছাড়া যুদ্ধের পর জাতিপুঞ্জের (ইউ. এন্. ও) যে সম্মেলন হচ্ছে যোগ দেবার জন্য ইংরেজ সরকারের মনোনীত বাদ দিয়ে একদল নূতন জাতীয় প্রতিনিধি ত হয়েছেন। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের এঁরা সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

রলালজী সীমান্ত-নীতিতেও হস্তক্ষেপ করতে ন এবং এই উদ্দেশ্যে সীমান্ত-গান্ধী খাঁ আবদুল ও সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী খাঁ সাহেবের ত সীমান্তের উপজাতি-অঞ্চলও পরিভ্রমণ ক'রে । সেখানে বিরুদ্ধ দলের চক্রান্তে কোন কোন তাঁদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান হ'লেও বেশীর গায়ই স্বাধীন পাঠানেরা তাঁদের প্রচুর সম্বর্দ্ধনা ছেন। পণ্ডিতজী তাঁদের স্বাধীন ভারতের পক্ষ ইচ্ছার বাণী জানিয়ে এসেছেন।

* * *

আফ্রিকায় যে সব ভারতীয় স্থায়ীভাবে বসবাস তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে সম্প্রতি র সরকার যে বৈষম্যমূলক আইন জারি করেছেন বাদ স্বরূপ সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়েরা দলে দলে সত্যাগ্রহ ক'রে কারাবরণ করছেন সে খবর নিশ্চয়ই শুনেছ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে অভিযোগ ক'রে মীমাংসা চেয়েছেন।

* * * *

অবশেষে মুসলীম্ লীগ্ দল কংগ্রেসের সঙ্গে মধ্যবর্ত্তী কালীন সরকারে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা অবশ্য বলছেন যে বড়লাট বাহাদুরের আমন্ত্রণেই তাঁরা যোগ দিচ্ছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাটের ফলে নয়। তবে গভর্ণমেণ্টে যোগ দিয়ে তাঁরা দেশের মঙ্গলের জন্য কংগ্রেসের সহযোগিতা করবেন ব'লেই জানিয়েছেন। লীগ্ মনোনীত সদস্যের মধ্যে আছেন মিঃ লিয়াকৎ আলি, মিঃ চুন্দ্রিগার, মিঃ আবদুল রব নিশ্তার, মিঃ গজনফর আলি ও মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। বলা বাহুল্য শেষোক্ত ব্যক্তি মুসলিম্ লীগের অনুরাগী হলেও মুসলমান ন'ন—তপশীল শ্রেণীভুক্ত। এঁদের জায়গা দেবার জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, মিঃ আলি জাহির ও স্যর্ সাফাৎ আহ্মেদ পদত্যাগ করেছেন। কংগ্রেস দলীয় মুসলমান সদস্য মিঃ আসফ আলি গভর্ণমেণ্টেই রয়েছেন—কারণ কংগ্রেস কোন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান নয়,—সকল ভারতীয়ের—সকল সম্প্রদায়ের জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

* * * *

বাংলার খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী ভবানীচরণ লাহার নাম তোমরা শুনেছ, তাঁর আঁকা ছবিও দেখেছ। সম্প্রতি ৬৬ বৎসর বয়সে এঁর মৃত্যু হওয়ায় বাংলার শিল্প-জগতে বিশেষ ক্ষতি হ'ল।

* * * *

ইতিমধ্যে বাংলা আর একজন দানবীর সুসন্তানকে হারিয়েছে। মুর্শিদাবাদ লালগোলার মহারাজা স্যর্ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কথা বলছি। বাংলা সাহিত্যের ইনি অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির ধরতে গেলে এঁরই দানে তৈরী হয়েছিল। যোগেন্দ্রনারায়ণ আরও অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ১০৫ বছর হয়েছিল।

* * *

ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ শেষ ক'রে ফিরে এসেছে। ইংল্যাণ্ডের বাছাই করা দল এখন গেছে—

অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলতে—হ্যামণ্ড এই দলের অধিনায়ক। এই দল খুবই শক্তিশালী, এবং অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে তারা এ পর্য্যন্ত যে ক'টি ম্যাচ্ খেলেছে তার প্রা ক'টিতেই বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

পূজোর হাসিখুসি—সম্পাদক নির্ম্মল ভাই। ছোটদের আসর, ১৬এ ডফ্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ৮ পেজী, ৮৪ পৃষ্ঠা। দাম ২৷৷০

ছোটদের জন্য একখানি সংকলন-গ্রন্থ। কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের রচনায় ও খ্যাতনামা শিল্পীর তুলিতে সমৃদ্ধ। পূজোর দিনে এমন একখানি বই পেলে ছোটদের মহলে কাড়াকাড় পড়ে যা বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। বইখানির কাগজ, বিশেষ ক'রে মলাটে শ্রীসমর দের আঁকা ছবিখানি মনোজ্ঞ।

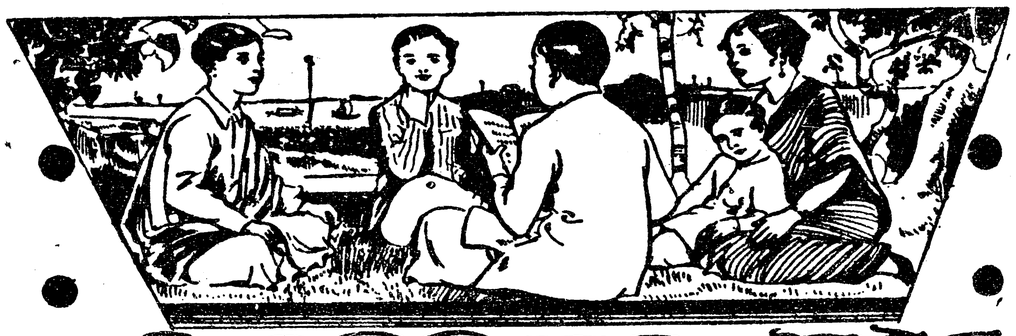

বাদলা রাতের খোকনমণি

শ্রীসীতা সরকার

ঝম্‌ঝমাঝম্ নামল বাদল আকাশ ক'রে কালো,
ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ে দেখতে কেমন ভালো!
গুড় গুড় গুড় ডাকছে মেঘ শুনেই লাগে ভয়,
খোকনমণি মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে রয়।
সোনার খোকন শুধায় মাকে,—'বল্ মা, মোরে বল্—
নীল আকাশে কোথায় থাকে লুকিয়ে কালো জল?'
খোকার কথায় মা হেসে কন,—'সোনার খোকন, শোন,
সাগর সেঁচে ও জল আনে মেঘকুমারের বোন।'

'মেঘকুমারের বোন্ সে কে মা, কোথায় তাহার ধাম
খেলবে কি সে আমার সাথে বল্ না মা, তার নাম?'
'মেঘকুমারের বোন সে যে নাম হল মেঘ-পরী,
সোনার খোকার সাথে আমার খেলবে লুকোচুরি।
ঘুমোও এখন লক্ষ্মী ছেলে, সোনার খোকন, ঘুমো
এই ব'লে মা তার কপালে দিলেন শতেক চুমো।
সোনার খোকন— মিষ্টি খোকন—খোকনমণি মার
শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে কোলটি যুড়ে তাঁর।

ছাত্রবন্ধু হেয়ার

শ্রীপ্রতীপ মুখোপাধ্যায়

কাতার গোলদীঘির দক্ষিণ ধারে যে একটি ছোট্ট
ছে তা যারা ও অঞ্চলে গেছ তারা দেখে থাকবে।
টি কার জান? মহামতি ডেভিড হেয়ারের।
ক'টি ইংরেজ এ দেশে এসে এ দেশের লোকের
ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ডেভিড্ হেয়ারের
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ ক'রে এই
তিনি ছিলেন ছাত্রদের অকৃত্রিম বন্ধু। ছাত্রদের
রকম ভালবাসতেন তার একটা গল্প বলি শোন:
শেখর দেব নামে একটি ছোট ছেলে হিন্দু কলেজে
একদিন সে কি উপলক্ষ্যে হেয়ার সাহেবের
ছে; হেয়ার সাহেব থাকতেন তখন লালদীঘির

বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে এল, তার পর এল
রে বৃষ্টি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বৃষ্টি আর থামতে
। ছোট ছেলে, নিশ্চয়ই তার ক্ষিদে পেয়েছে—
হেয়ার তাঁর পাড়ার মিঠাইওয়ালাকে ডেকে
ছেলেটিকে পেট ভরে খাইয়ে দিলেন, তার পর বৃষ্টি থামলে দেখলেন বেশ রাত হয়ে গেছে। অত রাত্রে ছোট ছেলেকে একা ছেড়ে দেবেন কেমন করে? একগাছা লাঠি হাতে করে বল্লেন, "চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

ছেলেটির বাড়ী ছিল পটুয়াটোলায়। অনেকটা দূর। অর্দ্ধেক পথ এসে সে বল্ল, "থাক্, এবারে আমি একাই যেতে পারব।" তার বোধ হয় লজ্জা করছিল। হেয়ার বল্লেন, "না, এখনও অনেকটা পথ বাকি, আর একটু যাই।" গোলদীঘির কাছাকাছি এসে ছেলেটি হেয়ারকে নিবৃত্ত করল, বল্ল, "আর দরকার নেই, এই তো সামনে বাড়ী।" হেয়ার হেসে দাঁড়ালেন। ছেলেটি বাড়ী চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর লোকে দেখে কে দরজা ঠেলছে। আলো নিয়ে এসে দেখে এক সাহেব। আর কেউ ন'ন, স্বয়ং হেয়ার। ছেলেটিকে বাড়ীর অত কাছে পৌঁছে দিয়েও তাঁর মন মানে নি, তাই আবার এগিয়ে জানতে এসেছেন সে ভালোয় ভালোয় বাড়ী পৌঁছেছে কিনা।

কণা

শ্রীরেণুকণা কুমার

মহাকাল চক্রতলে সব হয় লয়,
রহে শুধু কীর্ত্তি, যশ চির অক্ষয়।
হয় না সে পুরাতন, জীর্ণ বা অম্লান,
চিরোজ্জ্বল চিরদিন—সুন্দর—মহান্।

আপনাকে ক্ষুদ্র মানে মন বড় যার,
অপরের শ্রেষ্ঠতাই চোখে পড়ে তার।
নীচ জনা আপনারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে,
অপরের ছিদ্র খোঁজে সদা কু-নজরে।

বিচিত্র প্রসঙ্গ

শ্রীবেলা বসু, বি. এ

দের চারিদিকে কত রকম পশুপাখী—কত
দের গায়ের রং! প্রায় সব জিনিষেরই কিছু না-
নিক ব্যাখ্যা আছে, এ সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকেরা
গবেষণা করিতে ছাড়েন নাই।

দেখা গিয়াছে, উত্তর মেরুর কাছাকাছি দেশগুলিতে পশুপাখীরা বেশীর ভাগই দেখিতে সাদা হয়। আবার মরুভূমি অঞ্চলের পশুপাখীরা হয় পাণ্ডুবর্ণের। ঐ রকম সামুদ্রিক জীবের বেলাও দেখা গিয়াছে—সমুদ্রের উপরি-

ভাগের জীবগুলি বেশীর ভাগই নীলাভ বা কাচের মত স্বচ্ছ হয়, কিন্তু গভীর সমুদ্রতলের জীবেরা প্রায়ই কালো বা লাল হয়। ডারউইনের মতে শত্রুর হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার সুবিধা হয় বলিয়াই পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সহিত জীবের রংএর এই সাদৃশ্য। কিন্তু দু'একজন আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে যখন মরুভূমির নিশাচর প্রাণীরাও বালির রংএর হয় তখন এ সুবিধা বা অসুবিধার কোন প্রশ্নই আসে না। তাঁহাদের মতে যে কারণে বালির রং ঐ রকম হরিদ্রাভ সেই কারণেই সে অঞ্চলের পশুপাখীর রংও হরিদ্রাভ।

আবার কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন গায়ের রং জিনিষটা তাপ এবং বাষ্পের প্রভাবের উপর নির্ভর করে।

এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা এখনও একমত হইতে পারেন নাই।

* * *

তোমরা দেখিলেই বুঝিতে পার যে গাধা আর ঘোড়া দেখিতে অনেকটা এক রকমের, এবং কেহ যদি বলেন যে তাহারা এক শ্রেণীর জন্তু—তোমরা আদৌ আশ্চর্য্য হও না। সেইরূপ বৈজ্ঞানিকেরা বাঘ ও বিড়ালকেও এক শ্রেণীভুক্ত করেন। এইরূপ শ্রেণী ভাগ এতদিন আকৃতি ও গঠনের সাদৃশ্য দেখিয়াই করা হইত। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে একটি অদ্ভুত নতুন উপায় বাহির করিয়াছেন। সেটি আর কিছু নয়, প্রাণীর রক্ত পরীক্ষা। ধর, একটি খরগোসের শরীরে একটু ঘোড়ার রক্ত ঢুকাইয়া দেওয়া হইল, এবং সেই খরগোসের রক্ত লইয়া একটি শিশিতে রাখা হইল এবং কিছু ঘোড়ার রক্তও সেই শিশিতে রাখা হইল। তাহা হইলে দেখা যাইবে শিশির তলায় এক রকম সাদা তলানি পড়িয়াছে। এই ভাবে যদি কোন এক শিশিতে সেই খরগোসের রক্ত রাখিয়া তাহার সহিত গাধার রক্ত মিশান যায় তখন দেখা যাইবে শিশির তলায় তলানি পড়িয়াছে, কিন্তু সে তলানিটুকু মাত্রায় পূর্ব্বাপেক্ষা কম। মহিষের রক্তের সহিত মিশাইলেও ঐরূপ তলানি পড়িবে, কিন্তু মাত্রায় উহা আরো কম হইবে। আবার দেখা গিয়াছে, সেই খরগোসের রক্তের সহিত যদি এক শিশিতে মাছের অথবা হাঁসের রক্ত রাখা যায় তবে আর আদৌ তলানি পড়ে না। ইহা বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে গাধা মহিষ ঘোড়ার নিকট শ্রেণীর জন্তু, আর মাছ ও হাঁস ঘোড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী। যে প্রাণীগুলির রক্তে অধিক তলানি পড়িবে তাহারাই অধিক নিকট হইবে। যত তলানি কম হইবে তত তাহারা দূর হইবে। আর তলানি যদি একেবারেই না পড়ে প্রাণীদের মধ্যে কোন সম্পর্কই নাই বলিয়া বুঝিতে

* * *

গোলাপের কলম নানাস্থানে হইয়া থাকে। দেওঘর অঞ্চলে বাগানে দেখিয়া থাকিবে। এই করিবার উদ্দেশ্য কি? ভিন্ন ভিন্ন গোলাপ গাছে ভিন্ন গুণ আছে। কলমের দ্বারা সেই সমস্তগুলি গাছে আনা যায়। কোন গাছে ফুলের রং বা গা সুন্দর, কোন গাছের গোলাপের গন্ধ খুব মিষ্ট, গাছের ফুল খুব বড়, কোন গাছে বা অধিক ফুল কলম করিলে এর বেশীর ভাগ গুণবিশিষ্ট ফুল গাছে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কলম করিয়া পর্য্যন্ত কেহ নীল গোলাপ ফুটাইতে পারে নাই। ফুলের মত এই উপায়ে চাল, তামাক, আখ, গম প্রভৃতি বহু ফল ও শস্যেরও উন্নতি করা হয় মার্কিন দেশে আগে যে গম হইত তাহাতে প্রায়ই শুঁয়া ও পোকা দেখা যাইত, দানাগুলিও ভাল হইত না। কিন্তু সেখানকার সরকারী কৃষি-বি বিষয়ে গবেষণা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত দোষ গম প্রচুর পরিমাণে ফলাইবার কৌশল বাহির ছাড়েন নাই।

* * *

সাপ তার লেজটি নানা কাজে লাগায়। কো সাপ রাগিয়া গেলে শুইয়া পড়িয়া খুব জোরে জো নাড়িতে থাকে। কোন কোন সাপ রাগিলে শ গুটাইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ফেলে আর সেই কুণ্ড খান হইতে লেজটি তুলিয়া নাড়ায় ও আওয়া কোন কোন সাপ বাসার গর্ত্তের মুখে লেজটি আটকাইয়া রাখিয়া শত্রুর হাত হইতে নি করে। ইহাদের লেজের শেষ ভাগটা খুব শক্ত

সাপ লেজের ডগা জমিতে ঠেকাইয়া তার উপর ভর সামনে অগ্রসর হয়। কতকগুলি সাপের আবার দেখিতে অনেকটা মুখেরই মত। বিরক্ত হইলে, মাথা দিয়া না পারিলে, ঐ লেজ দিয়াই ছোবল মারিবার মত ভঙ্গী করে। শত্রুরা উহাকেই মুখ মনে করিয়া ভয়ে পালাইয়া যায়।

বরবুদুর

শ্রীনমিতা চক্রবর্ত্তী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বোরো বুদুর' নামে একটি ছোট কবিতা আছে। বোরো বুদুর বা বরবুদুর যবদ্বীপের মধ্য যবদ্বীপের কেদু জনপদে এই পাষাণ দেউল আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কারো কারো মতে

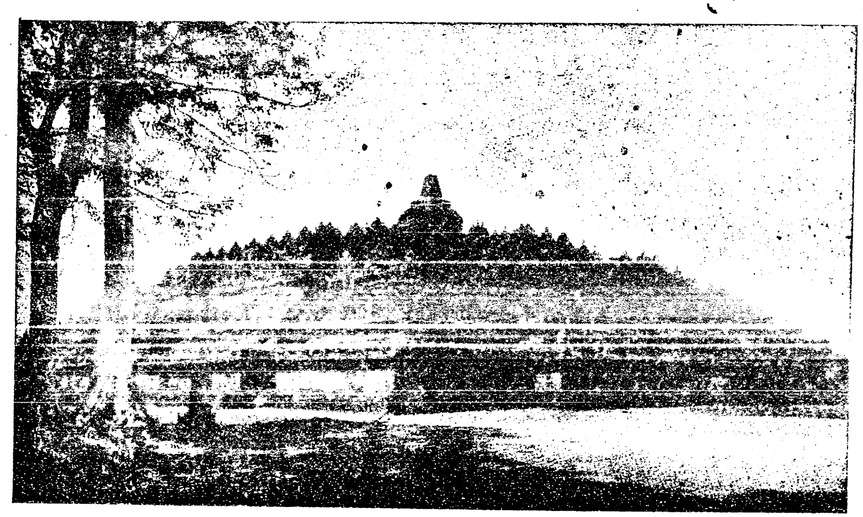

বরবুদুর মন্দির

এটি প্রাচীন দেউল। কবি যবদ্বীপে বেড়াতে গিয়ে এই দেউলটি দেখে মুগ্ধ হয়ে ঐ কবিতাটি লিখেছিলেন। পৃথিবীর মানুষ বোধ হয় এত সুন্দর মন্দির খুব কমই দেখেছে। কত বছর পরিশ্রমের পর যে এই মন্দিরটা শেষ

হয়েছিল তা বলা যায় না। মন্দিরটী গৌতম বুদ্ধের অস্থি রক্ষার জন্য নিম্মিত হয়েছিল—একটি পাহাড়ের ওপর ভিত্তি গেড়ে। বৌদ্ধধর্ম্ম যে এক সময়ে ভারতের বাইরে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল সে কথা তোমরা সবাই জান। এই মন্দিরের গায়ে যে শিলাচিত্র আছে তা থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় শিলাচিত্রকলাও এক সময়ে নানা দেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল—কারণ এই সব শিলাচিত্র ভারতীয় শিলাচিত্রেরই অনুরূপ।

অনুমান খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম প্রবেশ করে কিন্তু পরে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে নিস্তেজ করে যবদ্বীপে প্রবল হয়ে উঠল। ঠিক এই সময়ে "বরবুদুর" মন্দিরের নির্ম্মাণ সুরু হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে এদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতভেদ দেখা গেল এবং দু'টো দল গঠিত হ'ল। একদল বৌদ্ধধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে লাগলেন, অপর দল বুদ্ধদেবের সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীর আরাধনা করতে লাগলেন। এঁরাই 'বরবুদুরের সৃষ্টি করেন।

অনুমান ৮৫০ খৃঃ অব্দে বরবুদুর মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। এর উচ্চতা ১৫০ ফুট এবং এর একদিক্‌কার দৈর্ঘ্য ৫২০ ফুট। মন্দিরটীর বহু কোণ, কিন্তু এর ছাদ চক্রাকার। মন্দিরের অনেকগুলি স্তর আছে, সোপান-শ্রেণী দিয়ে প্রত্যেক স্তরে ওঠা যায়। প্রত্যেক স্ত[illegible] থেকে ক্রমশঃ ছোট হয়ে হয়ে চূড়া পর্য্যন্ত উঠে গেছে [illegible] দেখতে অতি সুন্দর লাগে।

মন্দিরের গায়ে কুলুঙ্গি আছে অসংখ্য, এর মধ্যে '[illegible] বুদ্ধ' মূর্ত্তিগুলি প্রথম স্তরের প্রধান শোভা। কিন্তু [illegible] এই মূর্ত্তিগুলির লোভে মন্দিরের অনেক অংশ ভে[illegible] করে দিয়েছে। সারা মন্দিরটী শিলাচিত্রে ভর্ত্তি, [illegible] এত বড় মন্দিরের কোথাও শিল্পী একঘেয়ে চিত্র আঁকেন[illegible] মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ স্তরে, যেখানে প্রধান দেবদেবীর [illegible] ছিল, সেখানে এখন কিছুই নেই। মূর্ত্তিগুলি কো[illegible] গেছে জানা যায় নি। মন্দিরের সামনে থেকে [illegible] কিছুই দেখা যায় না। দূর থেকে একে মনে হয় সো[illegible] শ্রেণী।

যবদ্বীপে যেমন এক সময় বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে [illegible] করে প্রবল হয়ে উঠেছিল আজ সেখানে তেমনি ই[illegible] ধর্ম্ম প্রবল। মুসলমানদের হাতে অনেক সুন্দর [illegible] চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, মন্দিরেরও অনেক ক্ষতি হয়ে[illegible] পরে ওলন্দাজেরা এসে তার অনেক সংস্কার করে[illegible] মন্দিরের আশপাশ থেকে অনেক মূর্ত্তি উদ্ধার করেছে[illegible]

আজও বহু ভ্রমণকারী এই বিশাল প্রাচীন কীর্ত্তি[illegible] বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে যান।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) ঘড়ি (২) লাটিম (৩) হুঁকো (৪) কুথা (৫) বাতাস (৬) কাকীমা।

উত্তরদাতাদের নাম

বি, ছায়া ও মায়া রায় (নিউ দিল্লী); সত্য, আনোয়ার, জাহির, বিশুদা (মানকাচর); অমলকুমার মিত্র ও বাসনা হালদার (গৌহাটী); শিপ্রা সেন (কলিকাতা); অনূপ রায় (এলাহাবাদ); নূরজাহান [illegible] (কলিকাতা); খোকা, মুকুল, হাসি (লক্ষ্ণৌ); সু[illegible] লতিকা বসু (কাশী)।

নূতন ধাঁধা

নীচের সাঙ্কেতিক চিঠিখানায় স্থানে স্থানে শব্দ পাল্‌টিয়ে তার জায়গায় তার অর্থ বা ভাবার্থ বসাতে পারলেই চিঠিখানা পড়া যাবে। চেষ্টা কর দেখি :—

তেলের মস্ত এক রাজা আর তার অস্ত্র,
দেবাঘ সংখ্যা বিশেষ-আ সময়ে যমে লাঙ্গল কি। দুধ-বিয়েয়েও বজ্র-আরে মালপাতা পদওয়ার উলা[illegible] নেই। টোলগ্রাম অনাত্মীয় সম্প্রত্যেক চউল্লম্ফ[illegible] মারাঠী পদবী স সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্মকার্য্য সংখ্যা [illegible] বড় বৃত্তে আধিক্‌। —শেষ

লোক-ঐক[illegible]

—দেশবাসীর এই অনাবিল প্রশংসা আমাদের উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধন করে আসছে এক শতাব্দীর উপর। এর মূলে রয়েছে আমাদের একনিষ্ঠ সাধনা, কারিগরগণের অননুকরণীয় নৈপুণ্য ও তদুপরি আমাদের বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট উপকরণ।

গহনা ও শাড়ী

শুধু শাড়ী যত সুন্দর হোক,
তা নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ করে না।
শুধু গহণা যত সুন্দর হোক,
তাতে নারী-রূপ সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে
ওঠে না।
শাড়ী ও গহণার মিলনেই
নারী-সৌন্দর্য্য পূর্ণাঙ্গ হয়।

তাই আমরা—
পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা পরিবেশনের
জন্য নানা প্রকারের বেণারসী শাড়ীর
আয়োজন করেছি—শাড়াগুলি
বর্ণ-বৈচিত্র্যে, রূপরচনায়
অনিন্দ্যসুন্দর।

আমাদের গহণা—আধুনিক রুচি-
সম্মত শিল্পচাতুর্য্যে, রূপছন্দে
অভিনব।

কুণ্ডু জুয়েলারী ওয়ার্কস

KJW

Regd. No

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১৯শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ,
১৩৫৩

বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ১॥৵০
প্রতি সংখ্যা
।৴০

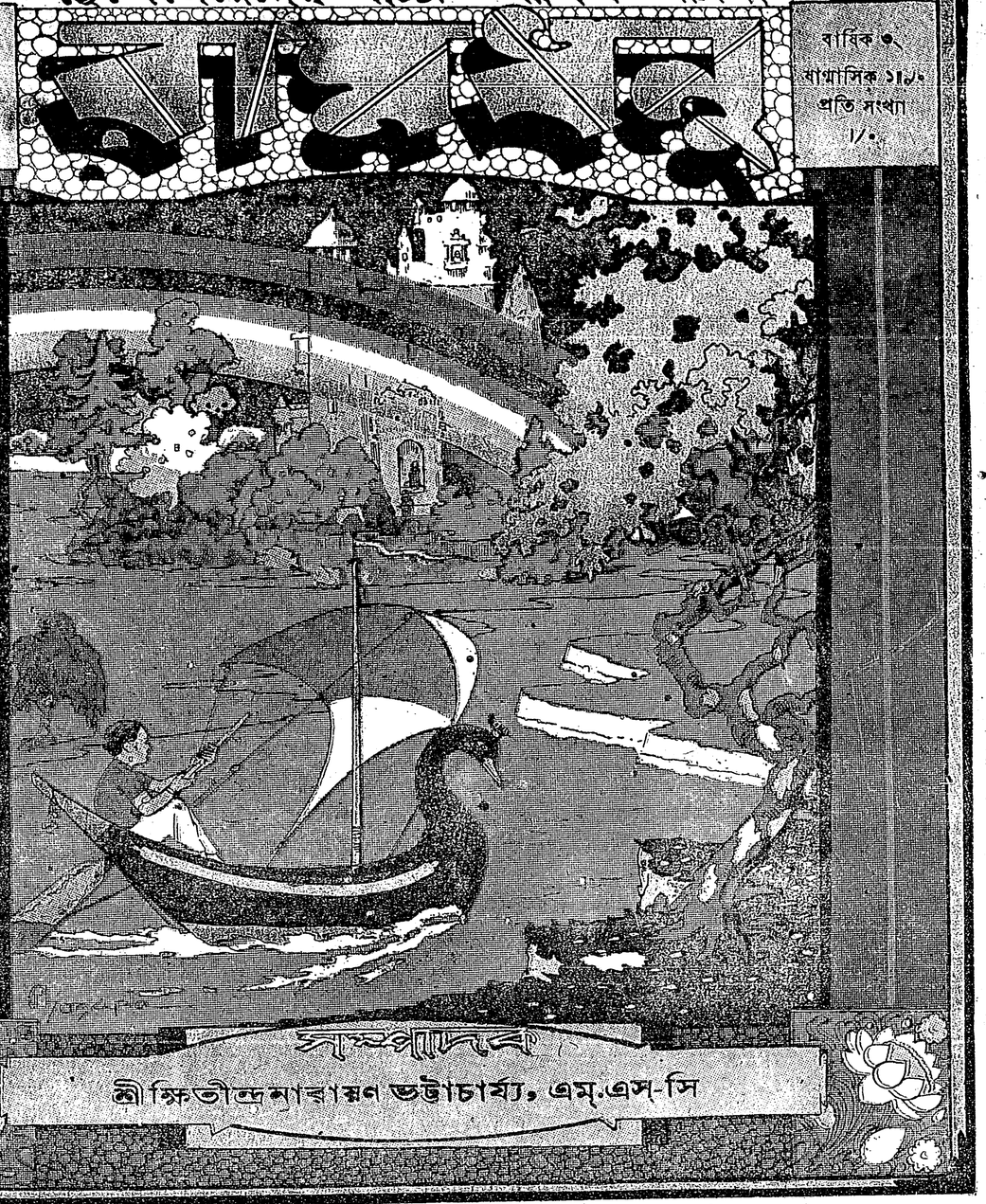

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

কার্য্যালয় : ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্ : সাউথ ১২৬

COLOUR PAPER

ডোজরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তৈল ব্যবহার করুন

২৪৩ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা ফোন: ২৭৭৪ বড়বাজার

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লিলি ব্র্যাণ্ড

বার্লি

স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ও জন-কল্যাণে

লিলি-ব্র্যাণ্ড বার্লি

তার আদর্শকে কোন দিন খর্ব করে নাই।

তাই সুদিনে বা দুর্দিনে সবার কাছে
তার সমান আদর!

লিলি বিস্কুট কোম্পানী: কলিকাতা

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"

(গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

আট রকম বইএর নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, বাকি বইগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

১। হারান বই—(নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)
২। নিঝুম রাতের কান্না—(বিমল দত্ত)
৩। রাতের আতঙ্ক—(নীহাররঞ্জন গুপ্ত)
৪। স্বর্গের সিঁড়ি—(সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)
৫। কেউটের ছোবল—সুনির্ম্মল বসু
৬। অভিশপ্ত ম্যামী—(নারদচন্দ্র মজুমদার)
৭। বিভীষণের জাগরণ—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

প্রত্যেকখানি বারো আনা

"প্রহেলিকা সিরিজ"

(ডিটেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চার)

ফাল্গুন মাস—**রক্ততৃষা**—অনলকুমার চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র—**নকলের হিমালয়**—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বৈশাখ—**বি, এল, এ-২০৫**—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো
জ্যৈষ্ঠ—**জয় পরাজয়**—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
আষাঢ়—**পূজনীয় দস্যু**—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রাবণ—**দুর্য্যোগের রাতে**—শ্রীসব্যসাচি

প্রত্যেকখানি দাম এক টাকা

বিরাট সচিত্র গ্রন্থ—১৫৪ পৃষ্ঠা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—(আট খানা হাফটোন ছবি)

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

এক মাসের মধ্যে বই নিঃশেষ হওয়ায়

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

চমকপ্রদ অন্তর্দ্ধান কাহিনী পরিপূর্ণ মূল্য ১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর * ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি। দাম এক টাকা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৯শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩ | ৮ম সংখ্যা

পড়ায় মন

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ইস্কুলে, মা, যাবো আমি
পড়তে দাদার সাথে,
বাবার মোটা বইটী নিয়ে হাতে।
খাগের কলম রইবে কানে,
লিখ্‌ব খাতায় অনেক মানে,
বিকেল বেলা ঘরে এসে
খেল্‌ব না আর ছাতে;
দাদার পাশে আলো জ্বেলে
পড়ব অনেক রাতে।

অনেক পড়া হ'য়ে গেলে
অনেক দিনের পরে—
আরো পড়তে যাবো দেশান্তরে।
যে সব লেখা সাঁঝের তারায়,
ফুলের কোলে রঙের সাড়ায়,
কাশের বনে যে সব লেখা
ধলেশ্বরীর চরে—
ফিরব প'ড়ে সে সব পড়া
অনেক দিনের পরে।

বুকে নিয়ে বল্‌বে তখন
ঘুম পাড়ানোর ছড়া ?
বল্‌ব আমি—ও সব আমার পড়া !
রূপকথা মা বল্‌বে যত—
সে সব আমার মুখস্থ ত' ;
পড়ার বাকি অনেক আছে
ঘুমের কেন ত্বরা ?
কোলে শুয়ে শুন্‌ব না মা,
ঘুম পাড়ানির ছড়া।

চশমা চোখে—হাতে নিয়ে
তোমার রামায়ণ
শোনাবো মা তোমায় সারাক্ষণ—
লব, কুশ আর সীতার কথা ;
বুকের কোণে জাগ্‌বে ব্যথা,
মুখটী স্নেহে উজল হবে—
ভিজবে চোখের কোণ।
কোলে তোমার মুখ লুকোতে
চাইবে তখন মন।

বাড়ী খুঁজতে ব'ল না

শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার

বাজার করা হাজার ঠ্যালা, অনেকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাড়ী খুঁজতে যে নাড়ি ছেড়ে যায় কত লোকের, তার খোঁজ ক'জন রাখে? বাজার করতে হাজার ঠ্যালা আমি কিন্তু স্বীকার করি না। অন্ততঃ কোনোদিন বাজার করতে আমাকে কেউ ব্যাজার হতে দেখে নি; ঠেলাঠেলিও করতে হয় নি। বাজারে আমি নিজে গিয়েছি, এবং বাজারান্তে আমি চার পয়সা এবং শ্রীমান্ নটবর দু' পয়সা বখরা করে বাড়ী ফিরে এসে দিব্যি হিসেব মিলিয়ে দিয়েছি। বেশ লাগত, ভালোই লাগত বাজার করতে।

কিন্তু বাড়ী খোঁজা? বিশেষ ক'রে এ দিগে! এমনও একদিন ছিল যখন 'টু লেট'-এর অরণ্যে রাস্তাঘাট ভরে থাকত, খালি বাড়ী দেখতে দেখতে বাঁশবনে ভোমকাণা হয়ে যেতে হ'ত। আর এখন? এখন মানে চাকরী চাইলে পাওয়া যায় কিন্তু বাড়ী চাইলে মেলে না এমনি অবস্থায়? তুমি হাবার মত, অনাথ ছেলের মত রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে চোখ কপালে তুলে চল, খালি বাড়ীর টিকিও পাবে না।

কিন্তু তা কি গুরুজনেরা বিদেশে বসে শোনে না বোঝে! দূর থেকে তাগাদার পর তাগাদা আসতে লাগল, 'বাড়ী খোঁজ, বাড়ী খোঁজ; বালীগঞ্জে অন্ততঃ মাথা গোঁজার মত গোটা তিনেক ঘরই না হয় (
বালীগঞ্জ! মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হয়। (
গ্যারেজ ভাড়া করে লোক থাকে সেখানে বাড়ী (
প্রচেষ্টা! চেৎলায় কি কসবায় কষে লাগলে তবু
মিলতে পারে। বালীগঞ্জের গুড়ে যে বহুদিন থেকে
সে কথা শত চেষ্টা করেও কিছুতেই তাদের বোঝাতে
লাম না।

তবু খুঁজতে লাগলাম। মাঝে মাঝে গুজব শোন
দু' একটা বাড়া নাকি ফাঁক হচ্ছে, কিন্তু জানাজানি
ভয়ে বাড়ীওয়ালা জানলায় নাকি শাড়ী ঝুলিয়ে
লোকের মধ্যে ভাল দরে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দে
ফাঁকি দিচ্ছে।

তবু ক্ষান্ত হই না। রাসবিহারী এভিনিউ থে
অলিগলি, কোথাও টহল দিতে বাকি রাখি নি।
বাড়ীর কর্ত্তা গড়গড়া খান, কোন্ চারতলা
বাড়ীর ফেলে দেওয়া তরকারিতে কুচো চিং
কোন্ বাড়ীতে সন্ধ্যেবেলা গানের মাষ্টার কি গান
তাও বলে দিতে পারি; কিন্তু ফাঁকা বাড়ী যে
পাব তা বলতে পারি না—ভাবতেও পারি না।

পণ্ডিতিয়া রোডে কিন্তু সেদিন আমাকে
দাঁড়িয়ে ভাবতেই হ'ল। একটা তিনতালা বাড়ী

...লায় আলো জ্বলছে না, সত্যিই জ্বলছে না। তা
...বার একদিন না, পর পর দু'-তিন দিন। আশায় বুক
...দুরু করে উঠল, মিলল বুঝি এবার। তবু চট্ করে
...লাম না। ছেলে মানুষের মত সাত তাড়াতাড়ি করে
...র নষ্ট করার লোকই নই আমি, আমার কাছে সব কাজ
...কা।

অতএব কষ্ট স্বীকার ক'রে আমাকে কাছেরই একটা
...নওয়ালার শরণ নিতে হ'ল।

পানওয়ালা এক বাক্যে স্বীকার করল—"হ্যাঁ বাবু,
...মারও মনে হয় কেউ নেই উপর তলায়, তবু ওরা ইচ্ছে
...রেই খালি রেখেছে। আপনি একটু চাপ দিন, কথা
...বেরিয়ে পড়বে।" বলেই পানওয়ালা গুণ গুণ করে বিড়ি
...ধতে লাগল।

তাই প্ল্যান্ ভাঁজতে ভাঁজতে এগোলাম। বিকেল
...য়ে গিয়েছে, প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি। বাড়ীটার বাইরের
...র উঁকি মারলাম, দেখি কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই।
...তালাও কি খালি হ'ল নাকি রে বাবা! যা থাকে
...গালে বলে কলিং বেলে আঙুল লাগালাম। একবার—
...বার টিপলাম, তবু কোনো পাত্তা নেই। ধেত্তোরি
...লে তিন বারের বার পাকা তিন মিনিট ধরে টিপে
...লাম।

এমন সময় ঐ উপর থেকে একটা টিনটিনে গলার
...ওয়াজ ভেসে এল—'কে?'

চেয়ে দেখি একটি মেয়ে মাথা ঝুলিয়ে উপর থেকে
...জ্ঞাসা করছে। বিরক্ত হলাম তাকে দেখে।

বললাম, "তোমার বাবাকে একটু ডেকে দাও তো!"

উত্তর এল, "তুতুল বাড়ী নেই, ক্লাবে গিয়েছে।"

'তুতুল?' আমি চমকে উঠি! কানে কম শোনে
কি মেয়েটা! বললাম, "তুতুলকে নয়, তোমার
...কে একটু ডেকে দাও না, বলো একজন ডাকছেন।"

"বাবাকে আমরা তুতুল বলে ডাকি।" মেয়েটি চটে-
...ট যায়। "আপনি অন্য সময়ে আসবেন" ওর ভ্রূ
...চকে যায় রাগে।

ওকে চটিয়ে আমিও ঘাবড়ে যাই। কি করব!
...কে বাবা বলে ডাকে, বাবু বলে ডাকে, বাপি বলে
ডাকে, তুতুল বলে কেউ ডাকে বলে ত' আমার জানা ছিল না।

"বাবা নেই?" আমি একটু ভাবি, তার পর বলি, "তা হ'লে কাকাকে একটু ডাকো না।" গলাটা বেশ একটু ভিজিয়েই বলি।

"কাকা ম্যাচ দেখতে গিয়েছে, রাত দাশটার পরে আসবে।" ওর চটপট জবাব।

আর কে থাকতে পারে! আত্মীয় পদবী আর কি কি হতে পারে গোলে হরিবোলে আর মনেও আসে না। বোকার মত বলি, "তোমার মামাকে একটু ডেকে দাও না, বলো একটু দরকারী···"

"মামা এখানে আসবে কেন?" ওর চোখে মুখে বিস্ময়, "মামা তো থাকে কর্ণফিল্ড রোডে!"

"তাও তো বটে—তা হলে মাকে একটু ডাকো না লক্ষ্মীটি!" আমি আমার দাবী অর্দ্ধেক কমিয়ে আনি। গলা ভিজিয়ে বলি, "বলো না একজন ভদ্রলোক···।"

"মা তো নেই, সিনেমায় গিয়েছে, ফিরতে রাত হবে।" তারপরেই কি মনে হওয়াতে বলে, "আপনি অসিতদা'র বাড়ী থেকে আসছেন বুঝি?" বলেই হুড়মুড় করে নীচে নেমে আসে। এসেই বলে, "আপনি অসিতদা'র কাকা বুঝি?"

অবাক্ হয়ে যাই ওকে নীচে দেখে। উপরে ওকে দেখা যাচ্ছিল বছর দশেকের মত, এখন দেখছি প্রায় তার ডবল। 'তুমি' 'আপনি' মিশিয়ে ভয়ে ভয়ে বলি, "অসিতকে আমি চিনি না, এই বাড়ীটা শুনলাম ভাড়া দেওয়া হবে তাই জানতে এসেছি।" তারপর ওর গুম্ হয়ে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আপনাদের পাড়ার লোকদের কাছেই শুনেছিলাম অবিশ্যি।" (পানওয়ালার নামটা চেপে গেলাম, শেষকালে মান হারাব) আর দেখলাম···" আমি একটু আমতা আমতা করি।

"কি দেখলেন?" ও হঠাৎ চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দেয়।

"দেখলাম তিনতালাতে আলো জ্বলে না, তাই—"

"তিনতালাতে আমাদের খুসী আমরা আলো জ্বালবো না", মেয়েটির নাক ফুলতে থাকে, "কাল থেকে কোনো তালাতেই নয়। নয়তো তিনতালায় আলো জ্বালিয়ে

দোতালায় জ্বালবো না। কাল সকালে বাবা, কাকা, দাদা, সবাই থাকবে, তখন যেন বাড়ী ভাড়া করতে আসবেন। যে তালায় আলো জ্বলবে না সে তালাই।" মেয়েটি টেনে টেনে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতে বলতে ধরাম্ ক'রে দরজাটা বন্ধ করে দিল দরজার ওপাশে কি যেন অস্ফুট গজগজ শোনা গেল, নিশ্চয়ই গালাগাল।

গালাগাল না হয় দু'টো দিক গে, মনকে বোঝাই, ওর দাদা কিম্বা কাকা থাকলে আমার এ গাল আর থাকতো না মারের ধাক্কায়।

সেই থেকে বাড়ী খোঁজার কাজে প্রায় ইস্তফা দিয়েছি, কিন্তু বসে থাকতে পারছি কই? কাকা লিখলো—'তিনখানা চারখানা ঘরের দরকার নেই, তুই বাবা, একখানা ঘরই দেখ। গ্যারেজ্ হোক, বাথরুম্ হোক, কোন রকমের একটা ঘর, মাথা একটা গুঁজতে পারলেই হ'ল।'

খোকা এসে খবর দিল "বড় রাস্তার মোড়ের দোকানটা বোধ হয় ভাড়া দেবে মামা! একটা রুম তো তোমার চাই, দেখ না দেখা করে।"

কোন্‌টা? 'সপ্তরথী বিপণি'। যেখানে আট মাস ধরে দেখছি খালি আলমারী সাজানো? সব ফাঁকা, কোনো মালপত্তর নেই। কেবল এক ভদ্রলোক কাউণ্টারে বসে থাকে একটা নভেল হাতে নিয়ে, বোধ হয়, দোকান খুলবার স্বপ্ন দেখেন উনি। ঘড়ির ব্যাণ্ড কেনা হয়েছে—ঘড়ি মিলল বলে, এই রকম ভাবটা ওঁর।

অনেক দিন মনে হয়েছে ভদ্রলোক পাগল। দোকানে মাল নেই, মসলা নেই, ফাঁকা দোকানের বাইরে প্রকাণ্ড সাইন বোর্ড ঝুলছে 'সপ্তরথী বিপণি'।

ভাবলাম, দেখবো নাকি! লোকটা হয়তো দোকান বসাতে পারছে না, বেশী ভাড়া দিলে হয়তো আমাকে দিতে রাজী হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া উপায় নেই, বাড়ী তো খুঁজতেই হবে। তাই একদিন আবার এগোলাম ঘর ভাড়া করার জন্যে।

।.য়ে দেখি ভদ্রলোক সেই তেমনি 'পোজে' টেবিলে পা তুলে দিয়ে নভেল পড়ছেন। বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারা ভদ্রলোকের, গায়ে একটা স্যাণ্ডো গেঞ্জি, পাশের ট্রেতে আধখানা সিগারেট পুড়ছে।

ঘরে ঢুকে একটা নমস্কার ক'রে ধীরে ধীরে বি... বললাম, "শুনলাম এ ঘরটা নাকি ভাড়া দেওয়া হবে... ...ন ভাড়া দেওয়া হবে কিনা জানবার জন্যে।"

ভদ্রলোক পাশ ফিরে তাকালেন, তারপর অনে... চুপ করে থেকে শেষে ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা কর... "কার কাছে শুনলেন? হরিশ সা বলেছে বুঝি?"

মনে হতে লাগল ঘরটা পেলাম বোধ হয়। বল... "হ্যাঁ হ্যাঁ, হরিশচন্দ্র সাহাই বলেছিলেন বটে!" একটু ... হাসি টেনে আনি, ভদ্রলোককে গলিয়ে দেবার জন্যে।

"আপনি হরিশের কে হন?" ভদ্রলোক হঠাৎ ... মুড়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন। তাঁর গম্ভীর কড়া ... শুনে চমকে উঠলাম, আর হাতের গুলিগুলো ফুলছে ... গাটা কেমন শিউরে উঠল।

"না না, হরিশ ঠিক বলে নি, মানে···" হরিষে-বি... হতে দেখে না-দেখা হরিশ ওরফে হরিশচন্দ্রকে তক্ষুনি ... করে ফেলি, কি জানি কি হয় ভেবে।

"তবে নীরেন মিত্তির নিশ্চয়ই?" ভদ্দরলোক এ... ফুঁসে ওঠেন।

এবার আর নীরেন্দ্রনাথ মিত্র বলি না, শুধু বলি, "... কেন হবেন? মানে শুনলাম; তা থাক গে—"

"পালাচ্ছেন কোথায়?" হুঙ্কার দিয়ে ভদ্রলোক এ... বারে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। চেয়ে দেখি, ওরে না... চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি রাগে ওঠা-নামা কর... আমার ছাতি বত্রিশ, ফোলাতে গেলে তিরিশ হয়ে ... তাই কেটে পড়তে যাচ্ছিলাম, থেমে গেলাম তাঁর ... হুঙ্কারে।

"বলে যান, কে আপনাকে বলেছে আমি দোক... ভাড়া দেব। আমি কি 'টু লেট' টানিয়েছি?" ভদ্রলো... গর্জ্জে উঠলেন। কি উত্তর দেব? চুপ করে রইলাম...

"আমার দোকান দেখে মনে হচ্ছে নাকি চলবে ... লাটে তুলেছি না ডকে উঠিয়েছি আমার দোক... লালবাতি জ্বলতে দেখেছেন নাকি বাইরে? আ... বসে বসে মজা করার জন্যে ঘর ভাড়া দিচ্ছি?" ... ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল।

"বলুন আপনাকে কে পাঠিয়েছে? বলতেই ... সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি রোজ জন দশেক ... ? উত্তর না দিয়ে আপনি যেতে পারবেন না।"

...লোকের রাগে কপালে ঘাম জমতে থাকে। 'বলুন ... বলেছে, তাদের সবাইকে আমি একবার দেখে নিতে ...।"

তারপর ঘরের এককোণে একটা পাক খেয়ে ফিরে ... এসে বললেন, "বলে দেবেন আপনার নীরেন বাবুকে, ...খুশী পারে সে করুক। রাস্কেল, ভারী বিজনেসের ...দাররা আমার! ও সব বদমাইসের সঙ্গে একসঙ্গে ...া করেই ভুল করেছি। আপনাকে যারা বাড়ী ভাড়া ...

ইয়ার্কী... দের বলে পাঠিয়েছে বলে দেবেন তাদের যে এখানে এলে বা আর কাউকে ফের পাঠালে জান নিয়ে ফিরতে দেব না। আমি ঢাকার ছেলে। দোকান খুলি না খুলি সে আমার ইচ্ছা।"

তারপর আমার দিকে খানিকক্ষণ চোখ পাকিয়ে থেকে আচমকা ফের গর্জ্জে উঠলেন, "কি, এখনো ঠায় দাড়িয়ে?" তাঁর হাতের মাস্‌ল্‌গুলো নেচে ফুলে উঠল।

আর আমিও সামনে একটা চলতি বাসকে যেতে দেখে 'বাঁধকে বাঁধকে' বলতে বলতে প্রাণপণে ছুটলাম।

লড়াই-ফেরত নন্দদুলাল

শ্রীশামুক

—এক—

একটি নামের নমুনা

ছোটবেলায় নন্দদুলালের সবচেয়ে বড় আপত্তি ছিল ...নিজের নামে। কিন্তু উপায় কি? নামকরণ একহয়ে গেলে ত' আর বদলানো যায় না! আর তা ...ড়া একটা কাঁদুনে পুঁচকে খোকার নাম বাছবার সময় কে ...নতে পারে ব ভাবতে পারে যে বড় হয়ে সে ঠিক কি ...নটি হবে—পারে কেউ?

...তবে একটি কথা স্বীকার করতে হয়। তুমি, আমি, ...আরো অনেকে—আমাদের চেহারা বা স্বভাবের সংগে ...টুকু মিল নেই এমনি বদ্‌খদ্ সব বেমানান নামের ...া বয়ে বয়ে বেড়াই সারা জীবন, এমন কি বুক ফুলিয়ে ...গলায় নিজেদের নাম ঘোষণা করেও ফেলি কত বার, ...নন্দদুলালের বেলা তা বলা যায় না। নাম বদলানো ...না বটে কিন্তু সে নিজে খুব বেশী রকম বদলে গেল, ...নারে উলটো দিকে। ওর ছোট বেলাকার জীবনটি ...লে মনে হয় যেন একটানা এক টানাটানি খেলা। ...র হিসাবে একদিকে যাওয়া উচিত আর ও যাবে ঠিক ...সোজা অন্য দিকে, এবং শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হ'ল সে ...ই! এই কারণেই নাম ও নামধারীর মধ্যে ক্রমশ ...গেল এত বেশী তফাৎ!

নাগাড়ে সাত সাতটি বোনের পর সবার ছোট ভাই। অনেক তোড়জোড়, শলাপরামর্শ করে দিনক্ষণ দেখে নাম রাখা হ'ল—নন্দদুলাল।

সকলে আশা করলে আদর খেয়ে খেয়ে একটি চারচৌকো নাদুসনুদুস গোবর গণেশ তৈরি হয়ে যাবে। পেট ঢাক করে যখন তখন গপ্ গপ্ খাবে, থপ্ থপ্ চলবে, আধো আধো কথা বলবে, আর সব সময়ে বিনা কারণে ছিঁচ কাঁদুনে কান্না কাঁদবে। লোকেরা সব দেখবে আর বলবে—আহাহা, কী সুন্দর ছেলেটি, যেন ঠিক নাড়ুগোপালটি!

কিন্তু তা আর হ'ল কোথায়? হ'ল ঠিক তার উল্‌টো—সকল বিষয়েই।

অল্প দিনেই সকলকে স্বীকার করতে বাধ্য হ'তে হ'ল যে এমন দুরন্ত, ডানপিটে, দুষ্টু ছেলে কলকাতার সহরে আর নেই। সংগীদের সাথে দৌড়াদৌড়ি, লাফঝাঁপ, মারামারির নিদর্শন স্বরূপ নন্দর সারা দেহে এতগুলি কাটাকুটির দাগ হয়ে গেল যে ভীষ্মদেবের শরশয্যায় শুয়েও অতগুলি হয়েছিল কিনা সন্দেহ! আর ছোট বেলায় সেই যা কেঁদে-

TIGHT BINDING

ছিল আর কাঁদবে না,—কিছুতেই কাঁদবে না— যতই লাগুক, দোষ করলে বড়রা যতই মারুক, তবুও না।

যাঁরা নন্দদুলাল নাম রেখেছিলেন তাড়াতাড়ি মত বদলে এবারে বলেন,—দেখে নিও এ নিশ্চয় হবে এক ভীষণ গুণ্ডা আর খুনে ডাকাত, এবং তুলনায় আগেকার দিনের রোঘো ডাকাত বা বাঘা ডাকাত মনে হবে যেন ঘর-পোষা দুধ-খাওয়া সব মেনী বিড়াল!

নন্দ যখন ইস্কুলে পড়ে তখন প্রায় মাথায় মাষ্টার মশায়-দের ছাড়িয়ে যায় আর কি! মোটা মোটা হাড়ের পাতলা লম্বা গড়ন দেখে তামাসা ক'রে কেউ নাম দেন মরুভূমির জাহাজ, কেউ বা বলেন দধীচি মুনি! দধীচি মুনির কথা মনে আছে ত'? এঁর হাড়ে বজ্র তৈরি হয়েছিল। ভাবটা এই যে নন্দর শরীরের হাড়গুলি শুধু হাড় নয়—যেন এক একটি হাতুড়ি, ঠোকা দিতে গেলেই ঠোক্কর খেয়ে ফিরতে হয়।

একটা ভারি মজার সুবিধা হ'ল এতে। পড়াশুনায় ভাল না হ'লেও এবং দুষ্টামি করলেও নন্দ খুব সামান্য মার খেয়ে ক্লাসগুলি পেরিয়ে গেল নির্বিঘ্নে। এ কি কম সৌভা-গ্যের কথা!

এই সময়ের একটি ঘটনা শোনবার মত। ইস্কুলে ড্রিল শেখাতে নতুন এলেন কাননগোপাল বাবু। বলতেন, তিনি নাকি বিগত মহাযুদ্ধে ফরাসী দেশে সামনা সামনি লড়াই করেছেন, কিন্তু লোকেরা বলতো যে মেসোপটে-মিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন যুদ্ধের কেরাণী হয়ে। যাই হোক, কথা বলতেন খুব বড় বড় এবং খুব বেশী কিন্তু কাজ জানতেন না, করতেন না কিছুই। আর যখন তখন ডান হাতের আস্তিন তুলে বাহুতে একটি বুলেট লাগার চিহ্ন দেখাতেন; তবে সেটি যে ফোঁড়া কাটার দাগ নয় তা জোর করে বলা বেশ শক্ত।

ইস্কুলের সামনের খোলা জায়গায় নিজে অশথ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তিনি ড্রিল শেখাতেন। বেশী রোদ্দুর লাগলে নাকি ওঁর মাথা ঘোরে। শেখাতেন আর কি, মাঝে মাঝে ছেলেদের কিছু ঘোরাফেরা করাতেন, বাকি সময়টা হয় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন নয় ত' গত যুদ্ধের নিজের সব কাহিনী, অনেক বার শোনা হলেও, আবার সবিস্তারে [illegible] করতেন। এর ফলে হ'ত কি ছেলেরা মন দিয়ে [illegible] করতো না। ডানদিকে ঘুরতে বললে কতক [illegible] ডাইনে আর কতক ঘুরে যায় বাঁয়ে। মন না [illegible] নিজেদের ডান বাঁয়ে খেয়াল থাকে না এতটুকু।

আর অংগ চালনার ব্যায়ামগুলি য হ'ত তা [illegible] মত। সাঁতার না জানা মানুষকে গভীর জলে ফেলে [illegible] সে যেমন এলোপাতাড়ি হাত পা ছুঁড়ে আঁকুপাঁকু [illegible] ছেলের দল করতো ঠিক তেমনি, যদিও মনে মনে [illegible] যেত এক দুই তিন চার—নিয়ম মাফিক।

সমস্ত ছেলের দল বল্‌লে কিন্তু একটি ভুল হয়ে [illegible] ঐ অত গোলমাল ও অনিয়মের মধ্যে একজন [illegible] বা করবার চেষ্টা করতো নিয়ম মত। সে আমাদের [illegible] দুলাল। ঐ সব করবার সময় যখন অন্য ছেলেরা [illegible] বার করে হাসছে বা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে [illegible] বলছে তখন সে ঠিক সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সৈনি[illegible] মত মন দিয়ে হুকুম পালন করে যেত। ব্যায়া[illegible] নির্দিষ্ট দিনে সে তার উপযোগী ও পরিষ্কার পোষা[illegible] পরে আসতো। কোঁচা এক পায়ে জড়িয়ে ও [illegible] অন্য পায়ে জড়িয়ে, বা পাম্‌সুর ডগায় লম্বা ধুতি লোট[illegible] খাচ্ছে, বা ঝোলা পাঞ্জাবীর চারটি কোণ নিশানের [illegible] পতপত উড়ছে—এমন অবস্থায় নন্দকে ড্রিল [illegible] দেখে নি কেউ কোনদিন।

একদিন কাননগোপাল বাবু ড্রিল করাচ্ছেন, [illegible] রোজই যা করেন তাই করছেন। রামধনী দারো[illegible] রাস্তার ধারের টুলটি ছেড়ে নিজের ভারী শরীরকে [illegible] সম্ভব তাড়াতাড়ি বয়ে এনে হাঁপাতে হাঁপাতে খবর [illegible] পেক্‌টর বাবু আসছেন!

এর পর দেখা গেল রামধনী ছুটে যায় হেড [illegible] মশায়ের ঘরের দিকে, আর কাননগোপাল বাবু ইস্কু[illegible] পিছন দিক্‌টায়। ঐদিকে পুরানো পাঁচীল ভেঙে [illegible] এমন নীচু হয়ে গেছে যে খুব সহজেই টপকে [illegible] যাওয়া যায়!'

ছেলেরা হতভম্ব।

(ক্রম[illegible]

বাংলাকে চিনতে শেখ

গৌড় ভ্রমণ

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়

[illegible] বহুদিন হইতে প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড় [illegible]বার ইচ্ছা ছিল। এক সময়ে গৌড়ের প্রতিপত্তি এত [illegible] ছিল যে গৌড় বলিতে পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়া প্রায় সারা [illegible]লা দেশটাকেই বুঝাইত। কাজেই এই গৌড় না [illegible]লে যেন বাংলা দেশকেই দেখা হয় না।

অবশেষে একদিন সে সুযোগ জুটিয়া গেল। লাল-[illegible]লায় গিয়াছিলাম, যাঁর বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম তাঁর [illegible] অনন্ত বাবু—অতি অমায়িক ভদ্রলোক। আমাদের [illegible] যাইবার ইচ্ছা জানিয়া তিনি কহিলেন, "তার জন্য [illegible] সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছ।"

বর্ত্তমান গৌড় মালদহ সহর হইতে মাইল দশেক [illegible]। স্থানটি এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। যেখানে এক সময় [illegible]কালয়পূর্ণ বিরাট্ সমৃদ্ধ নগর গমগম্ করিত এখন [illegible]নে পড়িয়া আছে আগাছা, জঙ্গল আর প্রাচীন [illegible]ড়ীর ধ্বংসাবশেষ। রাজপথে লোক চলে না, ঘরে [illegible] জ্বলে না, বন্য পশুর দল শিকারের আশায় সন্তর্পণে [illegible] বেড়ায়। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কল্যাণে এখন [illegible]টির কিছুটা শ্রী ফিরিয়াছে।

[illegible] স্টীমারে পদ্মা পার হইয়া ট্রেনে উঠিলাম। তারপর [illegible] সময়ে মহানন্দা নদী পার হইয়া মালদহ সহরে [illegible]স্থিত হইলাম। অনন্ত বাবু তাঁর পরিচিত বিভূতি বাবু [illegible] মালদহের জনৈক ভদ্রলোকের নিকট আমাদের [illegible] চিঠি দিয়াছিলেন। বিভূতি বাবু আমাদের পরম [illegible] অভ্যর্থনা করিলেন।

[illegible] ডাক বাংলোয় আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। [illegible] নাগাদ ডাক বাংলোয় পৌঁছিলাম। রাত্রে বিভূতি [illegible] বাড়ীতে ভোজনের প্রচুর আয়োজন হইল। অর্থাৎ [illegible] সৎকারের কোনও ত্রুটী রহিল না।

রাত্রে কিন্তু ভালো ঘুম হইল না। একে নতুন জায়গা, তার উপর অসম্ভব মশা। রাত প্রায় ৪টার সময় আর থাকিতে না পারিয়া একটা আরাম-কেদারা ডাক বাংলোর বাগানে বাহির করিয়া বসিয়া রহিলাম। আমার সহযাত্রী দিলীপ ও অজয় কিন্তু দেখিলাম পরম আরামে ঘুমাই-তেছে।

মালদহ হইতে গৌড় যাইবার ভালো রাস্তা আছে। মোটর, টাঙ্গা প্রভৃতিতে যাওয়া যায়। বিভূতি বাবু পূর্ব্ব দিনই টাঙ্গা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, ভোর ৫টা বাজিতে না বাজিতে টাঙ্গাওয়ালা আসিয়া হাজির হইল। সহযাত্রীদের ঠেলিয়া তুলিয়া তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া লইলাম। তার পর কিছু রুটী, মাখন, জল ইত্যাদি লইয়া টাঙ্গায় উঠিলাম। একটি ক্যামেরা ও বাইনকুলারও সঙ্গে রহিল।

মালদহ সহরটা তখন সুপ্ত, আমরা সকলের অলক্ষ্যে সহর অতিক্রম করিয়া রওনা হইলাম। রাস্তার দুই ধারে আম ও নানান্ গাছ। ভোর বেলায় বড় সুন্দর লাগিতে-ছিল। অজয় একটি গান ধরিল। প্রায় সাত আট মাইল যাওয়ার পরই রাস্তার ধারেই বাঁ দিকে দুইটা পাথরের স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া গেল। শোনা গেল ঐ দুইটাতে পূর্ব্বে অপরাধীকে শূলে দেওয়া হইত, এ জন্য উহাদের নাম 'শূলদণ্ড'। স্থানীয় লোকেরা উহাদের 'হাতী বাঁধাও' বলে,—হয়তো হাতী বাঁধার কাজও চলিত বলিয়া। শূলদণ্ডের খানিকটা পরেই পিয়াস' বাড়া দীঘি। এখানকার লোকে ইহাকে 'পিয়াজ বাড়ী' পুকুর বলিয়া থাকে। এখানেও একটা ডাক বাংলো আছে। বর্ত্তমানে এখানে একটা রেশমের কারখানা আছে। এখান হইতে দক্ষিণ দিকে একটা রাস্তা গিয়াছে। বড় রাস্তা ছাড়িয়া আমরা সেই রাস্তা ধরিলাম। কিছু দূর যাইতেই রামকেলি গ্রাম। এই গ্রামের প্রবেশপথেই প্রসিদ্ধ রূপ-সনাতন-

সেবিত মদনমোহনের ঠাকুর বাড়ী ও কেলিকদম্ব বৃক্ষ। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে, যখন হুসেনশাহ গৌড়ের রাজা, বৈষ্ণবপ্রধান রূপ ও সনাতন তখন তাঁরই দরবারে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হুসেনশাহের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্য দেব বৃন্দাবন যাইবার পথে গৌড়ের নিকট এই রামকেলি গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাই রামকেলি বৈষ্ণবের পরম পবিত্র তীর্থ। ইহার অপর নাম 'গুপ্ত বৃন্দাবন'। রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্ন, রূপ সনাতনের বাসাবাড়ী, মদনমোহন বিগ্রহ, রূপসাগর দীঘি ও জীব গোস্বামী দ্বারা খনিত শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড ও বিশাখাকুণ্ড নামক পুষ্করিণীগুলি দেখিয়া আমরা দক্ষিণ দিকে রওনা হইলাম।

ফিরোজ মিনার

এইবার আমরা আসল গৌড়ে পৌছিলাম। প্রথমেই দেখিলাম বার দুয়ারী—যার অন্য নাম 'বড় সোনা মসজিদ'। ইহার বিরাট আকার ও নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। মসজিদটি ১৬৮ ফুট লম্বা ও ৭৫ ফুট চওড়া। হুসেনশাহ এই মসজিদ আরম্ভ করেন, শেষ হয় নসরৎ-শাহের সময়। এখান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দি... খানিকটা গিয়া গৌড় দুর্গের ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ি... এই দিকে দুর্গের উত্তর দ্বার 'দাখিল দরওয়াজা'। ই... দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল। দুর্গের চার দিকে... (৮ ফুট চওড়া) সুউচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছিল। উচ্চ... ২২ গজ (৬৬ ফুট) বলিয়া উহাকে বলা হইত বাইশ গ... টাঙ্গা হইতে এই বিখ্যাত বাইশ গজী প্রাচীর দেখি... আমরা 'ফিরোজ মিনারের' নিকট উপস্থিত হইল... ইহা নাকি সুলতান সৈফউদ্দিন ফিরোজশাহ নি... করাইয়াছিলেন। এই মিনারটি ৮৪ ফুট উঁচু। ভিত... ঘোরানো সিঁড়ি আছে, শুনিলাম তাহাতে ৭৩টি ধা... কিন্তু ভিতরটা এত অন্ধকার লাগিল যে উপরে উঠি... আমাদের সাহস হইল না। এই মিনারের আর ... নাম চিরাগদানী। কেহ কেহ বলেন এটি একটি আলো... স্তম্ভ গোছের ছিল। উপরে আলো জ্বালাইয়া মহান... তীরে অপর একটি মিনারের সহিত সাঙ্কেতিক প্রক্রি... খবর আদন-প্রদান চলিত।

সেখান হইতে আমরা 'লুকোচুরি' দরওয়াজা—দু... পূর্ব্বদ্বার দেখিয়া 'কদম রসুল' মসজিদের নিকট আসিলা... কিংবদন্তী আছে যে নবাব ও তাঁর বেগমরা লুকো... দরজায় লুকোচুরি খেলিতেন বলিয়া এই নাম। ক... রসুল মসজিদ মুসলমানদের নিকট অতি পবি... সুলতান নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহ এই মসজিদ... 'দাখিল দরওয়াজা' প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। ... মসজিদের দরজাটী কাঠের এবং অতি প্রাচীন। মসজি... গাত্রের উপর ইষ্টকের কাজ অতি সুন্দর। মসজি... ভিতরে পয়গম্বরের পদচিহ্ন আছে বলিয়া 'কদম রসু... নাম। কদম রসুল অর্থ পয়গম্বরের চরণ। তাহার ... 'গুমটী দরওয়াজা' দেখিয়া আমরা চিকা মসজিদের দ্বারে... উপস্থিত হইলাম। ইহাকে 'চামখানা' বা 'চোরখানা' ... বলে। ইহার দেওয়ালে সাদা ও নীল মীনার ... আজও সুন্দরভাবে চোখে পড়ে।

চিকা মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আমরা প্র... প্রত্নাগার দেখিয়া জেলাবোর্ডের পাকা রাস্তায় আসি... উঠিলাম। প্রত্নাগারের মধ্যে গৌড়ের হিন্দু ও মুসলমা... আমলের ধ্বংসাবশেষগুলি দেখিবার জিনিষ। ই...

...তিপাড়া মসজিদ নামে আর একটি মসজিদ দেখা ... ইতিমধ্যে আমাদের বিলক্ষণ ক্ষুধা বোধ হইয়া... সঙ্গে রুটী, মাখন ছিল, এবারে তার সদ্ব্যবহার ... গেল। তারপর একটা ভাঙ্গা প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া ...টা বিশ্রাম করিলাম।

...ইহার পর আমাদের গন্তব্য স্থান হইতেছে 'চামকাঠি ...দ' ও 'লোটন মসজিদ'। শেষেরটি ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ...ান সমসউদ্দীন ইউসুফ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া-... ইহার ইটের গায়ে সবুজ, হলদে, নীল, সাদা ...র কাজ অতি সুন্দর। মসজিদ হইলেও ঐশ্বর্য্যে ...যে ধনীর প্রাসাদ হইতে কোন অংশে কম ছিল না ...ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায়। ...কোন্ কালে ইহা তৈয়ারী হইয়াছিল, কিন্তু আজও ...র মীনার কারুকার্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে! দেখিলে ...হয় যেন এই সেদিন তৈয়ারী হইয়াছে। এর পর ভগ্ন ...তোয়ালী দরওয়াজা', বল্লাল সেনের 'বল্লদীঘি' প্রভৃতি ...য়া টাঙ্গা জোরে ছুটাইয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ ...এক বিরাট মসজিদের নিকট আসিয়া টাঙ্গা থামিল। ...হইতে নামিয়া মসজিদের নিকট গেলাম। ইহাই ...ড়ের বিখ্যাত 'ছোট সোনা মসজিদ'। ইহার সম্মুখ ...র প্রস্তরের উপর কারুকার্য্য অতি সুন্দর। এই প্রস্তর কষ্টিপাথর বলিয়া মনে হইল। আকারে যেমন বিরাট, কারুকার্য্যেও তেমনি সুন্দর। এমন সুন্দর পাথরের নক্সা গৌড়ের অন্য কোন মসজিদে নাই। কথিত আছে সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের সময়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মসজিদের পাদদেশে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা ডাক বাংলো অভিমুখে রওনা হইলাম। আরও অনেকগুলি দেখিবার জিনিষ ছিল বটে কিন্তু অত্যন্ত বেলা হওয়ায় বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল।

গৌড়ের কিন্তু হিন্দুর গৌরবের কোন চিহ্নই আর নাই। বর্ত্তমানে উপরিলিখিত কয়েকটী মসজিদ ব্যতীত প্রাচীন গৌড়ের আর কোন বিশেষ চিহ্নও দেখা যায় না। বর্ত্তমানে যাহা আছে ভবিষ্যতে তাহাও হয়ত আর থাকিবে না—যদি ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হয়। যদিও বর্ত্তমানে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নাই তবুও মনে হয়, প্রত্যেক বাঙালীর ইহা একবার দেখিয়া আসা উচিত। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া এক কবি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"যেথা মন্ত্রীসাথ নরনাথ বসিতেন ধীর
সেথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর।"

গৌড় হইতে ফিরিবার পথে এই ছত্র দুইটি বার বার মনে পড়িতেছিল।

ইতিহাস পড়া নিয়ে

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন, এম্.এ, বি: এল্

...একটা বইতে পড়েছিলাম—বোধ হয় 'য়্যালিস্ ইন্ ...ওয়ান্ডারল্যাণ্ড'—ছোট্ট মেয়েটি একদিন ভয়ানক ভিজে ...হি হি করে কাঁপছে। একে বিলেতের শীত, তাতে ...র ভেজা জামা—কাঁপুনি তার কিছুতেই থামে না। ...বন্ধুকে সে জিজ্ঞেস করলে—তার ভেজা জামা ...শুকোবে কি করে। ওই একটি জামা নিয়েই সে ...তে বেরিয়েছে—তাকে যে ওটি পরেই থাকতে হবে! ...র বন্ধু তথনই জবাব দিল—"কেন, একখানা গ্রীণ ...ের হিষ্ট্রি অব দি ইংলিশ পিপ্‌ল্' হাতে নাও না—ভেজা জামা চট্ করে শুকিয়ে যাবে।" গ্রীণ হাতে নিয়ে তার জামা শুকিয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু ইতিহাস বই যে কী ভীতিপ্রদ, তার আভাস এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন বিলেতে তেমন এ দেশে—ইতিহাসের বই খুললেই ছেলেদের চক্ষুস্থির। ওরে বাপরে! এত রাজা-উজীরের নাম, এত সন-তারিখ, এত ঘটনা মনে থাকবে কি করে! কী নীরস এ বিষয়টা!

আচ্ছা, সত্যিই কি ইতিহাস এত নীরস—পড়ে আমোদ পাবার মত কি কিছুই নেই এতে? উপকার

পাবার কথা তুলছি না। কারণ ছেলেরা তখুনি জবাব দেবে—"কুইনিনে তো বিস্তর উপকার কিন্তু তা যে মুখরোচক নয় সে কথা তার পরম ভক্ত (?) অর্থাৎ ম্যালেরিয়া রোগী—সেও স্বীকার করবে। আমি বলছি ইতিহাস পড়ে রস পাবার কথা—এমন রস যা বাইরের জগৎকে ভুলিয়ে দেয়—যা চোখ দু'টোকে ও মনকে ডুবিয়ে রাখবে ওই বইয়ের খোলা পাতায়।

ইতিহাসে সে রস রয়েছে। অবশ্য কল্পনায় রাংগানো সুলিখিত কবিতা অথবা উপন্যাস পড়ে যে আমোদ পাওয়া যায় সে আমোদ ইতিহাসে খুঁজতে গেলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না। কবির কল্পনার সংগে তো ঐতিহাসিক গবেষণার কোন রকম মিতালি নেই—দু'টো একেবারে উল্টো রাস্তা ধরে চলে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাঁর গবেষণাগারে, দার্শনিক তাঁর চিন্তার রাজ্যে, এমন কি কবিও প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের মাঝে যে রসের আস্বাদ পেয়ে ডুবে থাকেন, সে রস ঐতিহাসিকও পান, তাঁর আপাত-দৃষ্টিতে নীরস ইতিহাসের বইয়ের পাতায়। ছেলেরাও এ রসাস্বাদন পুরোপুরি করতে পারবে যখন তারা বড় হয়ে বড় বড় বই পড়ে খুঁজে পাবে ইতিহাসের মূলসূত্র, যখন জানতে পারবে ইতিহাস শুধু রাজা-উজীর নয়, শুধু সন-তারিখ নয়, একটা জাতির উত্থান, গৌরব ও পতন কি ভাবে ঘটেছে তারই মনোমুগ্ধকর পরম তথ্যপূর্ণ ঘটনাপুঞ্জী, যখন বুঝতে পারবে ইতিহাস রাজনৈতিক দলাদলি বা চক্রান্ত নয়, শুধু কূটনীতি কিংবা মারামারি কাটাকাটি নয়, ইতিহাস হচ্ছে একটা জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক কাহিনী, তখন আর ইতিহাস নীরস থাকবে না। ইতিহাসের একটা চমৎকার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—ইতিহাস হচ্ছে এমন একটি দর্শন শাস্ত্র যা উদাহরণ দিয়ে দিয়ে এ মরজগতের সত্যটিকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। মানুষের উত্থান-পতনের মতই জাতির উত্থান ও পতন; মানুষের জন্মমৃত্যুর মতই জাতির জন্মমৃত্যু।

এই সংজ্ঞানুসারে সত্যিকারের ইতিহাস ওদের দেশে আমাদের দেশে অনেক রয়েছে। আমাদের পুরাণ, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থাদি একদিক্ দিয়ে দেখতে গেলে ইতিহাস বইও বটে, যদিও মূল ঐতিহাসিক ঘটনার সংগে কল্পনার রঙ বুলিয়ে আরও ঘটনার অবতারণা করে এ সকল গ্রন্থে ইতিহাসকে আরও জায়গায় ক্ষুণ্ণ বা বিকৃত করা হয়েছে। বর্ত্তমান কালে শ্রীযুত যদুনাথ সরকারের ইংরাজীতে লেখা আওরঙ্গজেবের ইতিহাস একখানা অপূর্ব্ব ইতিহাস গ্রন্থ। এ রকম আরও আছে—যেমন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা লেখা বাংলার ইতিহাস। অরও কত ভাল ভাল লেখবার প্রচেষ্টা হচ্ছে আমাদের দেশে। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে তো সত্যিকারের ইতিহাস বইয়ের অভাব নেই। একখানার শুধু নাম করি—গিবন সাহেবের ডিক্লাইন অব্ দি ডিক্লাইন য়্যাণ্ড ফল্ অব্ দি রোমান এম্পায়ার।

পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণের কথা উল্লেখ করেছি এদের ঐতিহাসিকত্ব কত দূর— অর্থাৎ কতটা কবির কল্পনা আর কতটা প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটা ভিন্ন প্রবন্ধের প্রয়োজন। এখানে তা করা সমীচীন হবে না। শুধু একটি কথা বলবো—প্রাচীন ভারতের বিদগ্ধ সমাজে ইতিহাস লেখার যে পদ্ধতি অনুসৃত হ'ত, যে আদর্শ তাঁদের ছিল তার সংগে বর্ত্তমান জগতের আদর্শের বিশেষ কোন মিল নেই। দুই কালের দৃষ্টিভংগী একেবারে আলাদা। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বর্ত্তমান কালে ছেলেদের পড়তে গিয়ে অসুবিধা পড়তে হয়,—ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাল্পনিক ও অনৈসর্গিক ঘটনার বিন্যাস আমাদের বিভ্রান্ত করে তোলে। তাই প্রাচীন ভারতের অপূর্ব সম্পদ্ আমাদের সংখ্যাতীত সংস্কৃত গ্রন্থাদির ঐতিহাসিক মূল্য আমরা নির্ধারণ করতে পারি না। গোঁড়া সনাতনপন্থীরা তাঁদের বিশ্বাসের জোরে বিচারকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে বলেন ও সব গ্রন্থের প্রতিটি ছত্র চন্দ্র-সূর্যের মত সত্য। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিচার করে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বলেন, এদের ঐতিহাসিকত্ব আমাদের সাবধানে যাচাই করে নিতে হবে। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার কাহিনী হিসাবে ঐ গ্রন্থগুলির অসাধারণ, কিন্তু যে ভাবে ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাতে আমাদের ওদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ইতিহাসের সত্যিকারের উদ্দেশ্য কিন্তু

রয়েছে ও সব গ্রন্থে—নাম, তারিখ নিয়ে যতই আমাদের ল হোক না কেন।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণও পশ্চিমীয় ঐতিহাসিকদের দেখানো পথ ধরে বই লিখেছেন চীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে। এ সব প্রামাণ্য গ্রন্থের খ্যা প্রচুর না হলেও কম নয়। আরো কত বই রাবে—কত নূতন নূতন কথা আমরা জানতে পারবো াদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে। ও দেশের এবং এ শের মনীষীরা ঐতিহাসিক সত্য বার করবার জন্য যে রণা করেন, তা শুধু তপস্যার সংগেই তুলনা করা । এদিক্ ওদিক্ ছড়ানো নানা নিদর্শন সংগ্রহ করে া যাচাই করেন আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি ত্য-খনিতে লুকানো ইতিহাসের সংগে। কল্পনাকে া ছেঁটে ফেলেন সত্যের সোনাটুকু বার করবার জন্য। াও হয়তো এক টুকরো পাথরের উপর কিংবা কোন া বা তাম্রশাসনের উপর অথবা কোন মন্দির বা স্মৃতি-ধির উপর কি একটু লেখা পাওয়া গেল—ঐতিহাসিক য়া-খাওয়া ভুলে গিয়ে তা ঠিক ঠিক পড়ে মানে বার তে ডুবে রইলেন। বিস্তর ঘষে মেজে পড়া তো লো, মানেও একটা দাঁড়ালো—অমনি তাকে মেলাও প্রাপ্ত প্রমাণাদির সংগে, খোঁজ সাহিত্যের মাঝে কিছু ওয়া যায় কিনা। এত সব করে তার পর ঐতিহাসিক বা গ্রন্থ লিখতে হবে। এ ভাবে কত বদ্ধমূল ধারণা দের ভেংগে দিয়ে ইতিহাস তার পথ করে চলেছে! নূতন কথা আমরা জানতে পারছি। এ সব ভাবলে াক্ হতে হয়।

একটি ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। আজ প্রাচীন ভার-ইতিহাসের সব ছাত্ররাই জানেন যে বহ্লীক ীকেরা মৌর্য বংশের পতনের সুযোগ নিয়ে এ আক্রমণ করেছিলেন এবং উত্তর পশ্চিম দিকের বেশ কটা অংশ জয় করে দীর্ঘকাল (প্রায় আড়াই শ') রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের প্রায় ত্রিশ জন বা রাজপুরুষের নাম আমরা জানতে পেরেছি। র মধ্যে মিনিন্দ বা ডিমিট্রিয়স্ সাকেত বা অযোধ্যা বিজয়ী বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রাচীন র সংস্কৃতিতে তাঁদের দান প্রচুর। গ্রীক্ সভ্যতা ও ভারতীয় আর্য সভ্যতার মধ্যে বিস্তর দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল এ সময়ে—যাতে করে এ দু'টি সভ্যতাই নব নব ভাবধারায় সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ভারতের গান্ধার শিল্প তো এদের প্রভাবেই মূলতঃ গড়ে উঠেছিল। আলেক্-জেণ্ডারের ভারত আক্রমণের চাইতে অনেক বেশী স্মরণীয় ঘটনা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এই বহ্লীক দেশের গ্রীক্দের কাহিনী। এদের কথা কিন্তু আজও আমরা অতি অল্প জানি—এদের রাজাদের নাম তো জেনেছি আমরা কয়েক বছর আগে মাত্র। সোনা ও অন্যান্য ধাতুতে তৈয়ারী কতকগুলি মুদ্রা উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও সীমান্তের বাইরে ছড়িয়ে ছিল। এই মুদ্রাগুলিই আমাদের প্রধান সহায় হয়েছে ওই গ্রীক্দের নাম ধাম জানতে। অবশ্য সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যও আমাদের ওদের সম্বন্ধে নানা কথা অসংলগ্ন ভাবে বলে দিচ্ছে, মোটের উপর ওই মুদ্রাগুলি যদি অমন করে যুগান্তপারের কাহিনীকে সযত্নে রক্ষা না করতো, তবে বহ্লীক দেশের গ্রীক্দের অতীত আজও মূক থেকে যেত। যে কাহিনী শুদ্ধ হয়েছিল ওই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মুদ্রাগুলির মাঝে, তাকেই আজ মুখর ক'রে তুলেছেন এ যুগের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এই পরিচ্ছেদটার নাম দেওয়া যেতে পারে "দি রোমান্স্ অব্ কয়েন্স্"। মুদ্রাকে ঘিরে এই যে রোমান্স্—এ কোন অংশে হেমেন্দ্র বাবুর "যখের ধন" বা মনোরঞ্জন বাবুর "ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ির" চাইতে কম চিত্তাকর্ষক নয়। আবার এ গ্রীকেরা যে কখন অযোধ্যা পর্য্যন্ত এসেছিলেন, মধ্যদেশ পর্যন্ত অবরোধ করেছিলেন—তার প্রমাণ আমরা অদ্ভুত ভাবে পেয়েছি। পানিনিতে বৈয়াকরণ লঙ ও লিটের প্রভেদ বোঝাতে গিয়ে বললেন, পরোক্ষে লিট্—সুতরাং উত্তম পুরুষের বেলা লিট্ ব্যবহার করা চলবে না, লঙ্ ব্যবহার করতে হবে। আর লঙ্ ব্যবহার করলেই বুঝতে হবে যে উল্লিখিত ঘটনা খুব প্রাচীন নয়—ঘটনা বর্ণনাকারীর জীবদ্দশাতেই তা ঘটেছিল। উদাহরণ দিলেন—অরুণৎ যবনঃ সাকেতম্। যবন বা গ্রীকেরা সাকেত বা অযোধ্যা অবরোধ করেছিলেন পানিনি ভাষ্যকারের জীবদ্দশাতেই—বেশ বোঝা গেল। আমরা জানি যে পুষ্যমিত্র সুংগ যখন মগধের সম্রাট্ তখন এই বৈয়াকরণ

জীবিত ছিলেন। আবার কালিদাসের 'মালবিকা-অগ্নিমিত্র' গ্রন্থ পাঠেও জানতে পারি—সুংগদের সংগে যবনদের সংঘর্ষের কথা। এবার নিঃসন্দেহ হওয়া গেল, ডিমিট্রিয়স্ বা মিনাণ্ডার কত দেশের পর দেশ জয় করে মগধ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলেও ঢুকে পড়েছিলেন পুষ্যমিত্রের রাজত্ব কালে। কিন্তু মগধ বাহিনীর কাছে পরাজয় মেনেছিলেন গ্রীক্ বীর এবং পশ্চাদপসরণ করেছিলেন—এ কথাও আমরা জানতে পারি। ব্যাকরণের উদাহরণের মাঝেও কী অভিনব ভাবে ঐতিহাসিক সত্যটি লুকিয়ে আছে! প্রসংগক্রমে আরোও বলা যেতে পারে কী জীবন্ত সভ্যতা ছিল প্রাচীন ভারতের! আমাদের প্রাচীন পালি সাহিত্যে একখানা বই আছে যার নাম 'মিনিন্দ পহ্ন' বা মিনিন্দের প্রশ্ন। তা থেকে আমরা জানতে পারি যে গ্রীক মহাবীর মিনাণ্ডার অস্ত্রের জোরে ভারতভূমি জয় করেছিলেন সত্য, কিন্তু ভারতের সভ্যতা ও ধর্ম তাঁকে করলো জয়—মিনাণ্ডার পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হলেন। আবার পরম ভাগবত হিলিওডোরস্ নির্ম্মাণ করলেন গরুড়স্তম্ভ বেশনগরে—বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়ে রচনা করলেন বিষ্ণু-প্রশস্তি।

এ রকম উদাহরণের পর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এ কথা প্রমাণ করতে যে কত অভিনব ও অভাবিত উপায়ে ইতিহাসের সত্যসমূহ বেরিয়ে পড়ছে। এ সব জানতে যদি আমাদের কৌতুহল হয় আর সে কৌতুহল চরিতার্থ করতে যদি আমরা ইতিহাসের গবেষণার দুর্গম রাস্তায় চা[ল], সে কি আমাদের কম য়্যাড্ভেন্চার হবে?

এখানে ছেলেরা একটা আপত্তি তুলতে পারে। বলতে পারে, এসব তো পরে হবে। বর্ত্তমানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তারা যা পড়বে তাতে তো এ সব রসঘন বৃত্তা[ন্ত] নেই—এ তো নিছক সন-তারিখ-সম্বলিত রাজা-উজীরে[র] বংশ তালিকাসমূহ। মুখস্থ করতে করতে জীবন বেরিয়ে গেল। এর উত্তরে বলবো—সংস্কৃত-কাব্যের অপূর্ব্ব রসাস্বাদন করতে গেলে যেমন ব্যাকরণের নীরস "নরঃ নরৌ নরাঃ" কিম্বা "ভবতি ভবতঃ ভবন্তি" মুখস্থ করতে হয়, অথবা সংগীতের মিষ্ট রসাস্বাদের আশায় যেমন একঘেয়ে "সা রে গা মা" সাধতে হয় এও তেমনি একটা কিছু ধরা যাক না। ব্যাকরণ থেকে বেশী নীরস ইতিহাস নিশ্চয়ই না। অবশ্য ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক লেখকদেরও একটা দায়িত্ব আছে এ বিষয়ে। সুললিত ভাষায় সরস গল্পের মত করে ইতিহাস যদি তাঁরা লেখেন, তবে ছেলেবেলা থেকেই ইতিহাসকে ভালবাসতে শিখবে ছেলেরা। আজকের দিনে আমাদের জাতীয় জীবনে ইতিহাসের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী।

কিন্তু সে কথা যাক্। বলছিলাম ইতিহাসে রস পাবার কথা। ছেলেদের ভবিষ্যতে রস পাবার আশায় একটু কষ্ট করে পড়তে হবে তাদের অপেক্ষাকৃত নীরস পাঠ্য বইসমূহ—যেমন সরোবরের মাঝখানে ফুটে আছে যে কমলটি, তাকে তুলতে হলে এক বুক কাদা ও জল ভেংগে যেতে হবে আমাদের। আর এক কথা। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিধানে আজ ইতিহাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় একটি আবশ্যিক বিষয়। এ পড়তে হবে, পাশ করতে হবে, বেশী নম্বরও তুলতে হবে। সুতরাং উপরোক্ত কথাগুলি মনে রেখে যদি এটাকে একটু সরস করে নেওয়া যায়—তবে তো সেটা উপরি পাওনাই হবে।

আচ্ছা জব্দ

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্ এ, বি.টি

গেলো বছর শীতের সময়ে দি গ্রেট রয়েল ইণ্ডিয়ান্ সার্কাসের পদার্পণে আমাদের ছোট্ট সহর হঠাৎ সরগরম হয়ে উঠেছিল।

আসবে, আসছে—ক'দিন আগে থেকেই সোর শুন্ছিলাম, হঠাৎ একদিন সকাল বেলা বেড়াতে গিয়ে দেখি, খেলার মাঠে বিরাট তাঁবু পড়েছে। তা'তে হাজার তালি, হাজার ফুটো। সামনে গিয়ে দেখি—তৈজস আস্বাবেরও অভাব নেই। যত রাজ্যের সাত পুরানো নড়বড়ে চেয়ার আর পচা তক্তার সারি চারিদিকে ছ[ড়িয়ে] আছে। কয়েকটা জানোয়ারও এসে পড়েছে—এক[টা] [...]নরা হাতী, একটা ম্যাদমারা বাঘ; আরো কতগুলি [...]না আকৃতির চারপেয়ে জন্তু—কেউ খাঁচায়, কেউ মাচায় [...]ক্লেশে অধিষ্ঠান করছে। মান্দ্রাজী দল—বেঁটে, শক্ত [...]নের কয়েকটা লোক, ছেঁড়া স্যুট পরে এদিক্ ওদিক [...]ভাবে পায়চারী করছে। একটা লোকের ভাবভঙ্গী [দে]খেই বোঝা গেল—লোকটা জকি না হয়ে যায় না। [...]রের মত এদিক্ ওদিক্ খালি মুখ ঘোরাচ্ছে।

[...] যাক্ গে, আমার কথা এ সব নিয়ে নয়। সার্কাসের [...] ভাল হোক, মন্দ হোক, তা'তে আমার কিছু এসে [যা]য় না—আমার গল্প মাগাকে নিয়ে।

মাগা আমার এগারো বছরের ছোক্‌রা চাকর। খাস [...]ড়িষ্যার আমদানী; রং কালো, বেঁটে, পেট-মোটা [...]লা চেহারা। মুখভরা বসন্তের দাগ—সে এক অপূর্ব্ব [...]। গাল বসে যাওয়ায় ওর হলদে চোখ দু'টো মুখের [...]পে অস্বাভাবিক বড় দেখায়। উপরের দাঁতের পাটির [...] যূথভ্রষ্ট হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে—শ্রীমানের [...] তখন বোকা হাসির উপযুক্ত বাহন বটে।

অবশ্য ইতিমধ্যেই মাগা অনেকটা বাঙ্গালী বনে গেছে। [...]ভাব, কথাবার্ত্তায় ওকে আর সহজে উড়ে বলে [চে]নবার যো নেই। — বিশেষতঃ আমার দেওয়া শার্ট-[প্য]াণ্ট-স্যাণ্ডালে রাতারাতি রীতিমতো ওকে 'বাঙ্গালী' [ক]রে তুলেছে

রবিবারের সকালবেলা। যাচ্ছিলাম বাজারে,—সঙ্গে [মা]গা। বড় রাস্তার মোড় ঘুরতেই এক গোলগাল কৃষ্ণদেহ [আ]মার সাম্‌নে এসে পথ আগলে দাঁড়ালো। প্যাণ্ট-কোট [পর]া, মাথায় পাগ্‌ড়ী—দেখেই বোঝা গেল লোকটা [মা]ন্দ্রাজী।

"দাবাইখানা কোন্ দিকে, বাবু?" একান্ত বিনয়ের [স]ঙ্গে ইংরেজীতে প্রশ্ন করলে লোকটি। আকার-ইঙ্গিতে [য]থাসম্ভব নির্দ্দেশ দিয়ে ওকে দাবাইখানার হদিস দিতে [চে]ষ্টা করলাম। যথারীতি নমস্কার, ধন্যবাদ জানিয়ে সে [প্র]স্থান করে এগিয়ে গেল। শ্রীমান্ যে এতক্ষণ নির্ব্বাক্ [হ]য়ে লোকটিকে লক্ষ্য করছিল—তা আমার নজরে [প]ড়ে নি।

"বাবু!"—মাগার স্বরে ভরা রাজ্যের বিস্ময়।

"কিরে! কি হয়েছে?"

"আপনি ও'কে চেনেন?—ওই তো মানিজার সা'ব। মাগা তার দুটো ড্যাবডেবে চোখ পাকিয়ে হাঁ করে তাকায় আমার দিকে! ওর চোখ-মুখ অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ঝলসে ওঠে।

"কিসের ম্যানেজার, রে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"সাক্রাস্, বাবু।"

"ওহ্! তা জানবো না কেন? খুব জানি—" ধমকে বল্লাম আমি—"জোর পা চালা তো তুই; বড্ড বেলা হয়ে গেলো—"

হঠাৎ ধমকের ধাক্কায় চুপসে গেলো মাগা। ঝাঁকা হাতে, মুখ নীচু করে চুপ্‌চাপ্ আমার পিছু পিছু হেঁটে চল্‌লো।

কিন্তু ব্যাপারটা ঐখানেই ইতি হয় নি। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে ছুটির দুপুরের আরাম উপভোগের আশায় ঈজি-চেয়ারটায় গা এলিয়ে বসেছি, এমন সময়ে কল্‌কেয় তামাক ভরে, আগুনে ফুঁ দিতে দিতে মাগা এসে কাছে দাঁড়ালো। গড়গড়ায় কল্‌কে চাপিয়ে আ[জ] আর দিনের মত আজ দেখি শ্রীমান্ সরে পড়ছে না। ঠায় ঝুলে দাঁড়িয়ে রইলো, যেন কিছু বলবে ও।

"কিরে মাগা, কি চাই?"

"একটা পাশ চাই, বাবু"—কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করে নীচু স্বরে ভয়ে ভয়ে পেশ করলো মাগা।

"পাশ? পাশ কিরে? কিসের পাশ?" আমি আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করি। হঠাৎ পাশের জন্য মাগার ঔৎসুক্যের অনুধাবন করতে পারি নে।

"সাক্রাস্"—লজ্জা আর বিনয়ে বেঁকে যায় মাগা, "আজ বিকেল তিনটেয় খেলা হবে কিনা!"

"য়্যা!" আঁৎকে উঠি আমি। গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে হঠাৎ হাতে নামে। "সার্কাসের পাশ? আমি দেবো? তোকে?—যাঃ, পালা এখান থেকে"—আমি সরাসরি বিদেয় করবার জন্য বাঁ হাতে ইঙ্গিত করি ওকে। "আর কাউকে ধর গে যা—তোর সার্কাসের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক রে?"

কিন্তু এত সহজে ভবী ভুলবার নয়। ঠায় তেমনি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে মাগা।

"তুমি তো মেনজার সা'বকে চিন, বাবু। ঐ যে বাজার বেলা কথা বলছিলে—"

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোধগম্য হয় আমার। ভারী হাসি পেলো প্রথমটা ওর অনুমানের বহর দেখে। "আরে দূর দূর!" কথাটা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি আমি. "হঠাৎ দেখা হ'ল রাস্তায়, অমনি চেনা হয়ে গেল? তুই তো আচ্ছা বুরবাক রে!...দেখা হলেই আমাকে পাশ দেবে ওরা? যা, তোর কাজ কর গে যা—",

আবার হাতের নলটা মুখে দিয়ে গড়গড়া সেবন সুরু হয় আমার।

কিন্তু তবু—

নাঃ, আমার কোন যুক্তিতর্কই দেখছি টলাতে পারবে না ছোক্‌রাটাকে। মরিয়া হয়ে আবদার সুরু করলো মাগা, "দিন বাবু, আমাকে গোটা পাশ দিন...মুই খেলা দেখিবো।"

উঃ! এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ! জ্বালাতন করে তুললো যে! রবিবারের দুপুরটাই মাটি করবে বেটা! কোথায় একটু তামাক খেতে খেতে ঘুমের আমেজটুকু আসবে—তা না সার্কাসের পাশ! ধ্যেৎ! বড্ড বিরক্তি বোধ হ'ল। চটে চড় মারতেই যাচ্ছিলাম ছোক্‌রাকে। এমন সময় মনে হঠাৎ এক বদ্ খেয়াল হ'ল। আপদ তখন বিদেয় করতে পারলে বাঁচি। "যা, নিয়ে আয় কাগজ—" ধমকের সুরেই বলি—"দিচ্ছি তোর পাশ।"

কগজ কলম নিয়ে সর সর করে কয়েক লাইন লিখে ভাঁজ করে খামে ভরে ওর হাতে দিয়ে বল্লাম—"নে, এই তোর পাশ। গেটে গিয়ে ম্যানেজার সাবকে দিবি। ভাগ্।"

যেমন পাজী তেমনি পয়জার! ছোকরা বড় বেড়ে গেছে—একটু বুঝুক—মনে মনে ভাবলাম।

এদিকে অতিরিক্ত আহ্লাদে দাঁতশুদ্ধ মুখ চোখ ঝলমল করে উঠলো মাগার। ওর জীবনের মস্ত বড় সখ মিটবে এবার—হাতীর খেলা দেখবে ও। মরুক্ গে যাক্।

ঝামেলা মিটিয়ে এতক্ষণে একটু স্বস্তি বোধ করি। গড়গড়ার মিষ্টি বোলে ক্রমশঃ দু'টি চোখ আমার আবেশে বুজে আসে।

এদিকে মাগা কিন্তু ঠিক সময় মত সেই চিঠি নি... তাঁবুর গেটে গিয়ে হাজির! চিঠিতে যা ইংরেজীতে লি... দিয়েছিলাম তার বাংলা মানেটা দাঁড়ায় এমনি—

"প্রিয় ম্যানেজার বাবু, এ বাঁদর আমার চাক... আপনার সার্কাসের একটা পাশের জন্য আমাকে ভি... বিরক্ত করে তুলেছে। কোনো যুক্তিতেই একে প... আনতে পারি নি; তাই চিঠি দিয়ে আপনার কা... পাঠাচ্ছি। ছোকরা বড্ড বেড়েছে—একটু টিট হও... দরকার। উত্তম মধ্যম দিয়ে, কষে কাণ মলে গেট্ থেকে বিদেয় করে দেবেন ছোকরাকে। ধন্যবাদ। ইতি—

জনৈক স্থানীয় ভদ্রলোক"

বিকেল বেলা ঘুম ভাঙতেই, অবশ্যি তামাকের তাগি... প্রথমেই মনে পড়লো মাগাকে। কিন্তু, নাঃ, ছোক... আজ নিশ্চয়ই আচ্ছা জব্দ হয়েছে। আর ওকে ঘাঁটা... না। সাত-পাঁচ ভেবে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে রাস্তা... দিকের খোলা বারান্দায় বসে ঘুমের আমেজটা কাটাচ্ছি... এমন সময়ে দেখি, রাস্তা দিয়ে স্যাণ্ডাল হেঁচড়ে চল্‌ছে... ওপাড়ার বংকুদা।'

"বংকুদা' যে! কোত্থেকে?"—ডেকে জিজ্ঞেস করি... "বড্ড যে শুকনো দেখ্‌ছি! ব্যাপার কি?"

"গিছলাম ভাই, সার্কাস দেখ্‌তে"। বলতে বল... বংকুদা' গেট্ পেরিয়ে বারান্দার সাম্‌নে এসে উপস্থি... "কিন্তু এমন বেয়াড়া রকমের মাথা ধরলো যে সো... হয়ে বসতে পার নে। শেষটা বেরিয়ে এলাম।" পা... বেঞ্চিতে বসে পড়লেন বংকুদা'।

"ভালো কথা"—হঠাৎ কি মনে করে বলে উঠ... তিনি—"আচ্ছা, তোমার মাগার কি ব্যাপার বলো তো..."

"মানে?"—আমি আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করি—"... হয়েছে মাগার?"

"শোনো—তা' হলে।" বংকুদা' বলে চল্লেন—"আ... তো টিকেট করে গ্যালারীতে গিয়ে বসেছি; সে... থেকে দেখি, অবাক্ কাণ্ড! হোমরা-চোমরাদের যে... করে ওরা খাতির দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে বসায়—ঠি... তেমনি করে তোমার মাগাকে স্বয়ং ম্যানেজার নিয়ে গি... বসিয়ে দিলে একেবারে রিংএর মুখে, একটা আ... চেয়ারে! ভাবো একবার, আমি তো থ'!" ব্যাপা... বলো দিকিনি?" উত্তরের আশায় আমার দিকে ...মুখ হয়ে তাকান বংকুদা'।

ব্যাপারটা আমার কাছেও অদ্ভুত শোনালো সত্যি। ...না, বংকুদা'র কাছে কোনো কথা আগাম ফাঁস করা ...বে না। কথাটা শুনে গেলাম শুধু। মাগাকে যে চিঠি ...খে দিয়েছিলাম সে কথা মনে পড়লো—কিন্তু এ কি ...রি ফল? মন তা বিশ্বাস করতে নারাজ। তবে...

"আচ্ছা, আসুক দেখি শয়তান"—বংকুদা'র প্রশ্নটা ...ড়িয়ে গেলাম তখনকার মত। "ফিরে এলেই সব জানা ...বে'খন'।"

"আচ্ছা, উঠি তা' হলে"—এই বলে বংকুদা' উঠ্‌বার ...পক্রম করলেন—"সত্যি, তাজ্জব বনে গিছি আমি! ...জের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি নে!"

রাস্তায় পড়ে আবার স্যাণ্ডাল হেঁচড়াতে সুরু করেন ...কুদা'।

সন্ধ্যার মুখে শ্রীমান্ এসে বাড়ী হাজির।

"বাবু!" আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে চীৎকার করে উঠে ...গা। "তোমার পাশ বড় ভালো।" আমাকে চেয়ারে ...য়ে খেলা দেখালো। বড়ো বড়ো বাঘ—হাতী ...বাঁদর—কতো কী!"

"থাম্, থাম্!" জোর ধমক দিয়ে উঠ্‌লাম। "তুই কা'কে দিয়েছিলি আমার চিঠি?"

"মেনজার বাবুকে।" নিশ্চিন্ত ভরসার সুরে উত্তর দেয় মাগা। "তুমি তো তাই বলে দিয়েছিলে।"

"হুম্—তারপর?"

"চিঠিটা বার বার পড়ে বাবু খুব এক চোট হাসলো।"

"তারপর? বলে যা—"

"আমাকে জিজ্ঞেস করলো—'তুই খেলা দেখ্‌বি?' আমি বল্লাম,—'হ্যাঁ'। ম্যান্‌জার বাবু নিজে আমাকে ভিতরে এগিয়ে নিয়ে গেলো। একটা কুলীকে দিয়ে চেয়ার আনিয়ে জানোয়ারদের সামনেই আমাকে বসিয়ে দিলে।" মাগার স্বর আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে উঠেছে। "মোকে আরও একদিন পাশ দিবে, বাবু!" বের করা দুটো দাঁতে হাসি ভাসিয়ে বল্লে সে।

আমি আর কী বল্‌বো? হাসবো না কাঁদবো ভেবে পাই নে। মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরে বল্লাম—"যাঃ—ভাগ্ এখান থেকে, বুরবাক্! ফের কথা বল্‌বি তো মাথা গুঁড়িয়ে দেবো তোর।"

হঠাৎ ধমক শুনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল মাগা। আমার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের কোন মানে খুঁজে পেল না বোধ হয়। উচ্চবাচ্য না করে বুদ্ধিমানের মতো সুড় সুড় করে সরে পড়লো তখনকার মত।

বিজয়ী বীর

শ্রীসুধীররঞ্জন ঘোষ, এম. এ, বি. এল্

...জীবন জলতরঙ্গে আমরা শিশুর দল,
...মরা কিশোর, আমরা সবুজ, আমরাই চঞ্চল।
...আকাশের 'রামধনু' আনে আমাদের চোখে আলো,
...পথের যাত্রী আমরা, আমরা সবাই ভালো।

...ত-আকাশে আমরাই হেরি আশার স্বপ্ন ছবি;
...দের ললাটে জয়টীকা আঁকে নিত্য তরুণ রবি।
...র মমতা, পিতার শাসন, ভাই-ভগিনীর স্নেহ,
...র দৈন্য, বেদনা ও গ্লানি বহি' গড়ে ওঠে দেহ।

উঁচু নীচু ভেদ নাহি আমাদের, জাতি, ধর্ম্ম বা দেশ,
একই পৃথিবীর তরুণ আমরা, একই পরিচয়, বেশ;
একই প্রাণধারা, একই আদর্শ বহি' কোটি কোটি বুকে,
একই দুর্জ্জয় জীবনের টানে ছুলে চলি হাসি মুখে।

আমরাই হ'ব ভাবী জগতের আশা ও শান্তিদূত,
আমাদেরই হাতে গড়িবে শিল্পী আনন্দ অদ্ভুত।
সাগরে, শিখরে, আকাশে, গহনে ছুটাব আমরা রথ,
সত্যের চির সন্ধানী সেনা, আমাদের একই পথ।

সারা মর্ত্ত্যের সুখের স্বর্গ লক্ষ্য যে আমাদের,
কোটি মুমূর্ষু ভাই-ভগিনীর বেদনা ও বিষাদের,
ম্লান মুখে হাসি ফুটায়ে তুলিব স্বাস্থ্য ও সৌরভে,
নিখিল প্রান্তে বহিয়া ফিরিব তৃপ্তি ও গৌরবে।

দেশ বিদেশের আমরা তরুণ শান্তি, পথের সেনা-
আমাদের চাপে হাসিবে মেদিনী, সাগরে ঊর্ম্মি ফেনা।
দশ দিক্ হ'তে ঝরিবে মাথায় প্রীতিপুষ্প ও নীর,
নব বিশ্বের উদয় প্রভাতে আমরা বিজয়ী বীর।

একজন যাদুকরের কথা

শ্রীরাধারাণী দেবী

কয়েক মাস আগে রামধনুতে প্রসিদ্ধ যাদুকর এস. কে. ভাদুড়ীর লেখা একটি ম্যাজিকের কৌশল তোমরা পড়েছিলে। সম্পাদক মশাই জানিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে তিনি তোমাদের আরও ঐ রকম কৌশল শিখিয়ে দেবেন।

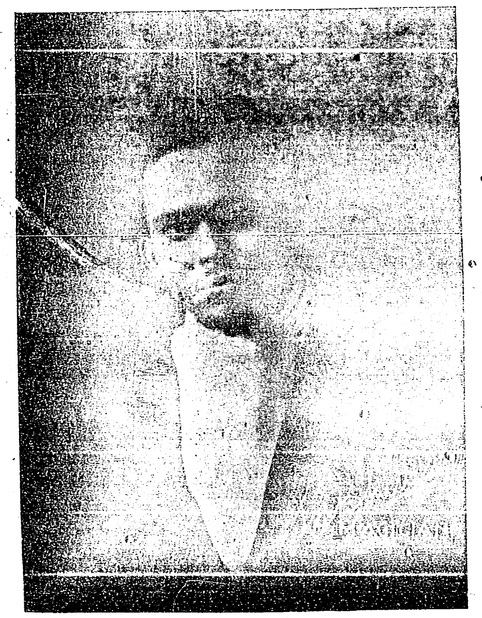

প্রাচ্যের মায়াবী এস্. কে. ভাদুড়ী

এর পর তোমরা কেউ কেউ ঐ যাদুকরটির বিষয়ে নানা প্রশ্ন করে তাঁর সম্বন্ধে তোমাদের আগ্রহ জানিয়েছ। তাই আজ তাঁর সম্বন্ধে দু'চার কথা তোমাদের বল্‌ব।

যাদুকর এস্. কে. ভাদুড়ী যাদুবিদ্যায় পাকা হ'লে বয়সে কিন্তু এখনও তরুণ। এঁর জন্ম হয়েছিল বাংলার বাইরে জামসেদপুরে। এঁর বাবাও ছিলেন একজন যোগী। এ বিদ্যাটি অনেকটা এঁদের বংশগত। শোনা যায় এঁদের কোন্ এক পূর্ব্বপুরুষ নাকি যোগাসনে মাটী থেকে এক হাত উঁচুতে উঠে যেতে পারতেন, অর্থাৎ যোগেরই প্রভাবে।

এই বংশের ছেলে শ্রীমান্ ভাদুড়ীরও যেন ছেলেবেলা থেকেই ঐ দিকে মন গেল। জামসেদপুরে বেদেরা বা যাযাবরেরা নানা রকম যাদুর খেলা দেখাত, শিশু তা তন্ময় হয়ে তা দেখতেন। সাধারণ দর্শকের চোখ নয়— যেন যাদুকরের সমস্ত কৌশল তিনি বুঝতে পারতেন। তাদের অভিনয় নৈপুণ্যও তাঁকে আকৃষ্ট করত। তাঁর কাকারও এদিকে খুব উৎসাহ ছিল। তিনি ম্যাজিক দেখতে খুব ভালবাসতেন এবং যখনই এই সব যাদু যাদুকরদের কাছে যেতেন ভাইপোটিকে সঙ্গে করে নিতে ভুলতেন না। এই ভাবে স্কুলে পড়বার সময়েই শ্রী ভাদুড়ী একটি বিখ্যাত যাদুর খেলা (আঁটি থেকে আম তৈরী) প্রথম এবং সম্ভবতঃ শেষ বারের মত দেখবার সু পান।

স্কুলে থাকতে থাকতেই শ্রীমান্ ভাদুড়ী যাদু সম্মোহন, মনঃসমীক্ষণ, যোগসাধন ইত্যাদির চর্চ্চা সুরু দিলেন। ক্রমে যাদুবিদ্যার কৌশলের দিকে তাঁর একটা আকর্ষণ দেখা দিল যে তা আয়ত্তে আনবার তিনি তাঁর সম্পূর্ণ একাগ্রতা ঐদিকে নিয়োজিত করলে অবশ্য কিছু পরেই তিনি নিজের ত্রুটী বুঝতে পে সংশোধন করে নেন। কারণ ভারতীয় লুপ্ত যাদু

চার ও প্রসারে মনস্তত্ত্ব, যোগসাধনা ইত্যাদির প্রয়োজন বেশী।

স্কুলে পড়বার সময়েই শ্রীমান্ ভাদুড়ী যাদুবিদ্যায় কৃতিত্ব দিয়ে ইণ্ডিয়ান্ উইজার্ড ক্লাবের পূর্ণ সভ্যপদে বৃত হন। হচ্ছে ভারতে যাদুকরদের প্রাচীনতম সমিতি—১৮৭৫ প্রতিষ্ঠিত। বহু খ্যাতনামা যাদুকর এই সমিতির গতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন। এই সময়ে তিনি নাগপুরের পার্ব্বত্য সাঁওতাল প্রভৃতি জাতের সঙ্গে তাদের কাছ থেকে যাদুবিদ্যার অনেক গুপ্ত ও লুপ্ত-তথ্য সংগ্রহ করেন। এজন্য তাঁকে সাঁওতালী ভাষাও কিছু শিখতে হয়েছিল। যখন কলেজে উঠলেন, হলে স্বভাবতঃই তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে পড়লেন। এস্-সি পড়বার সময়েই তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর বলে খ্যাতিলাভ করলেন।

১৯৪৫ সনে কলকাতায় বেলগাছিয়া অঞ্চলে যাদুকরদের বিশেষ প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী কয়েকটি নিজস্ব খেলা দেখালেন যাতে যাদুকর-জগতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল—আর তাঁকে দেওয়া হ'ল যাদুকরের সার্টিফিকেট। এখানে তাঁর একটি অদ্ভুত কথা শোন। যাদুকর ভাদুড়ীকে অসুস্থ অবস্থায় তিন জন ডাক্তারকে ডাকা হ'ল। তাঁরা এসে সময়ে একে একে তাঁর নাড়ি আর বুকের স্পন্দন পরীক্ষা করলেন—কিন্তু দেখা গেল, আশ্চর্য্য, কারুর সঙ্গেই পরীক্ষার ফল মিলছে না—প্রত্যেক ডাক্তারই অন্য থেকে ভিন্ন সংখ্যার স্পন্দন পেয়েছেন। তাঁদের আগে জানতে দেওয়া হয় নি যে রোগী একজন কর। ফলে তাঁদের মুখের অবস্থা তো বুঝতেই পার। রোগী যখন হাসিমুখে তাঁর পরিচয় দিয়ে এবং সকল নের গতি সমান করে দিয়ে ডাক্তারদের আবার পরীক্ষা ত বললেন তখন তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন।

যাদুবিদ্যার বলে যে এও সম্ভব হয় এ তাঁরা ধারণাও ক পারেন নি। ফি নেবার কথা আর কারোই মনে হ'ল মুগ্ধ চোখে যাদুকরের তারিফ করে তাঁরা চলে গেলেন।

এর পর শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী কলকাতার হিন্দী পত্রি সংঘে নানা রকম অদ্ভুত খেলা দেখিয়ে সাংবাদিক এমন অভিভূত করেন যে সমস্ত হিন্দী কাগজ তাঁর প্র সায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। ফলে অন্যান্য পত্রিকায় কার্য্যকলাপের বিবরণ বেরোতে থাকে।

কিন্তু এত করেও তাঁর উৎসাহ কমে নি। ফি হঠযোগের নানা প্রক্রিয়ায় মনোনিবেশ করলেন। ফলে একবার তিনি মারাত্মক বিপদে পড়েছিলে হঠযোগের একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তিনি খানিকটা খেয়ে নেন, কিন্তু অনবধানতার জন্য হঠাৎ তার প্রতিক্রি সুরু হয়—শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। অবশ্য তখনই তাঁ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিন ঘণ্টা জী মৃত্যুর মাঝামাঝি কাটিয়ে অবশেষে তিনি রক্ষা পা রক্ষা পেলেও এই ঘটনার পর পুরো তিন দিন তাঁকে অচেতনের মত বিছানায় কাটাতে হয়েছিল। কিন্তু ত তাঁকে দমান' যায় নি। যাদুবিদ্যাকে তিনি এমন ভা বাসেন।

১৯৪৫ সনের শেষ দিকে তিনি উইজার্ড ক্লা সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। এত অল্প বয়সে এই গুরু পূর্ণ পদ তাঁর আগে আর কেউ পান নি। ইতিম কয়েকবার ভারতের বাইরের নানা জায়গা থেকে ডাক এসেছিল। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে আ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে দেখব।

বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় যা বিদ্যার উপর একখানা মৌলিক গ্রন্থ রচনার কাজে ব আছেন। তা ছাড়া এ দেশে একটি উন্নত ধরণের যাদুবিদ্য শিক্ষালয় স্থাপন করার জন্যও তিনি চেষ্টা করছেন।

হাওয়াই দ্বীপের সাদা শয়তান

(প্রবন্ধ)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে হাওয়াই দ্বীপ। বারো মাস ভ্যাপ্‌সা গরম তার আব্‌হাওয়াকে ভারাক্রান্ত ক'রে রেখেছে। অন্য দেশের বিশেষ ক'রে ঠাণ্ডা দেশের লোকেদের পক্ষে সেখানে স্বস্তিতে বাস করা কষ্টদায়ক বৈকি! কিন্তু তা সত্বেও এই দ্বীপের ওপর ব্যবসায়ীদের লোভ বড় কম নয়। তার কারণ এর মাটীতে ছড়িয়ে রয়েছে এক অপূর্ব্ব মিষ্ট সম্পদ্। সত্যিকারের মিষ্টি—অর্থাৎ চিনি। হাজার হাজার বিঘে জমি যুড়ে চলেছে আখের চাষ, আর সেই আখ নিংড়ে বেরোচ্ছে হাজার হাজার মণ চিনি।

কিন্তু এ হেন সোনার মাটীতেও একদিন স্থরু হ'ল এক মহা বিপর্য্যয় কাণ্ড! একদল সাদা শয়তান এসে আক্রমণ করল আখের ক্ষেত। আখের ভিতর ঢুকে, সমস্ত রস খেয়ে, নষ্ট ক'রে, সেগুলি একেবারে অকর্ম্মণ্য ক'রে তুলল তারা।

এই শয়তানরা কিন্তু চেহারায় কেউই দৈত্যের মত নয়। লম্বায় এক-এক জন বড় জোর এক ইঞ্চ হবে। সাদা শরীর, পাটকিলে মাথা। দেখতে এমন কিছুই ভয়ঙ্কর নয়—তবে সংখ্যায় ছিল তারা অগণ্য। হাজার নয়—লক্ষ নয়—কোটি কোটি।

এই শয়তানেরা,—বোধ হয় বুঝতে পেরেছ আসলে এরা এক জাতের পোকা, এসে আখের ব্যবসা লণ্ডভণ্ড ক'রে দেবার গতিক করল। ক্ষেতের মালিকরা নানা রকম প্রক্রিয়ায় এদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। আবার মুশ্‌কিল, আখের ভিতর ফুটো ক'রে তারই মধ্যে এরা বাস করে—বিষ প্রয়োগ ক'রে মারবারও উপায় নেই—তাহ'তে সঙ্গে সঙ্গে আখের ওপরও সেই বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দেবার আশঙ্কা রয়েছে। অথচ এদের অত্যাচারে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হচ্ছে,—ক্ষেতের মালিকরা মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন।

অবশেষে তাঁরা ঠিক করলেন পোকাগুলোকে খুঁড়ে খুঁড়ে বার করে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারবেন—যা খরচ হয় হোক্। পয়সার লোভ দেখিয়ে দলে দলে লোককে কাজে
লাগিয়ে দেওয়া হ'ল। সে যেন চামচে দিয়ে পুকুর সেঁচা।
এই ভাবে এক বছরে ২৬ লক্ষ আউন্স—অর্থাৎ প্রায় ৮...
লক্ষ পোকা ধরা পড়ল—কিন্তু তবু তাদের উৎপাতের
কামাই নেই। যত ধরা যায় তত যেন এদের সংখ্যা বেড়ে
চলে! ব্যাপার দেখে আবার সবাই হতাশ হয়ে পড়লেন।

ইক্ষু-ব্যবসায়ীদের একটা সমিতি ছিল। এই সমিতির
ওপর দেওয়া হয়েছিল সমস্ত ভার। কিছুতেই কিছু ...
করতে পেরে শেষে সমিতি ঠিক করলেন ব্যাপারটা নিয়ে
নিজেরা আর মাথা না ঘামিয়ে কোনও বৈজ্ঞানিক
বিশেষজ্ঞের হাতে ছেড়ে দেওয়া যাক্। দেখা যাক্ ...
কোন পথ বাৎলাতে পারে কিনা। ম্যুর নামে একজন
কীট-তত্ত্ববিদ্, এই ধরণের পোকা-মাকড় নিয়ে গবেষণা
ক'রে ইতিপূর্ব্বে কিছু নাম করেছিলেন। সমিতি থেকে
তাঁকেই নিয়োগ করা হ'ল।

গত মাসে 'পোকামাকড়ের চিড়িয়াখানার' গল্প বলতে
গিয়ে তোমাদের বলেছিলাম, কীট-জগতে একদল পোকা
আছে যারা নানা ভাবে আমাদের অপকার করে। আবার
আর একদল পোকা আছে যারা ঐ সব অপকারী পোকা-
দের খেয়ে ফেলে পরোক্ষ ভাবে আমাদের উপকার করে।
ম্যুর কাজে নেমেই ঠিক করলেন আখের পোকার
রকম কে শত্রু আছে তা খুঁজে বার করতে হবে।

কাজটা কিন্তু খুব সহজ নয়। হাওয়াই দ্বীপে
ঐ ধরণে পোকা পাওয়া যাবে না এটা প্রায় ঠিক—কেননা
তা হ'লে এর আগেই তাদের দেখা মিলত—এবং আ...
পোকারাও অমন নির্ব্বিবাদে সংখ্যায় বাড়বার সুবিধা
পেত না। অতএব এ জন্য তাঁকে খোঁজ করতে ...
সেই সেই জায়গায় যেখানে আখের চাষ প্রচুর হয়
কিন্তু এই শ্রেণীর পোকার উৎপাত নেই।

ম্যুর হাওয়াই দ্বীপ থেকে জাহাজ ভাসালেন। প্র...
গেলেন দক্ষিণ চীনে। ছ' মাস ধরে সেখানে অনুসন্ধান
চল্‌ল, কিন্তু না, কোন ফলই হ'ল না। তার পর ...
শেষে জাভা বা যবদ্বীপ। কিন্তু সেখানেও তাঁর সহায়...

...টির খোঁজ পাওয়া গেল না। দেখতে দেখতে দু' বছর
...টে গেল, প্রচুর টাকা বেরিয়ে গেল। ম্যুর একটু
...প্রস্তুত হয়ে পড়লেন, কিন্তু অনুসন্ধান বন্ধ করলেন না।
...য়াই ইক্ষু-সমিতিও সায় দিলেন—যত টাকা লাগে
...ক, উপায় বার করতেই হবে।

তার পর বোর্ণিও। জলা জঙ্গলে ভরা সে দেশ।
...ণি অস্বাস্থ্যকর। জলের ওপরেই মাচা বেঁধে লোকে
... করে। দেশী ডিঙ্গি নৌকো ছাড়া যাতায়াতের অন্য
...নও উপায় নেই। সেখানেও চল্‌ল ম্যুরের সন্ধান—
...নের পর দিন, মাসের পর মাস। কিন্তু এখানেও কোন
... হ'ল না। এর পর ম্যুর গেলেন আম্‌বোইনা নামে
... জঙ্গলময় দ্বীপে, সেখানে থেকে আর এক দ্বীপ—
...রাং।

এই দ্বীপে, আখ ছাড়া সাগু জাতীয় এক রকম গাছ
...র জন্মায়। ম্যুর আখের মধ্যে খোঁজ ক'রে কিছু পেলেন
... কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন, সাগু গাছগুলোর মধ্যে
...খের সেই সাদা শয়তানগুলো প্রচুর রয়েছে। তবে
...তো তাদের শত্রুর দেখাও এখানে মিলতে পারে—ম্যুর
...শান্বিত হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগলেন। সেই
...স্বাস্থ্যকর আব্‌হাওয়ায় ঘন জঙ্গলের মধ্যে, সময় সময়
... জলে দাঁড়িয়ে, তাঁর কাজ চল্‌ল। গাছ খুঁড়ে খুঁড়ে
...কা বার করা হ'ল—কিন্তু কোথায় তাদের শত্রু
...কারা দিব্যি নিরুপদ্রবে বহাল তবিয়তে সেখানে বাস
...ছে,—বাধা দেবার কেউ নেই সেখানে। হতাশ হয়ে
... আবার আম্‌বোইনায় ফিরে এলেন।

আম্‌বোইনায়ও ঐ রকম সাগুগাছ যথেষ্ট জন্মায়। ম্যুর
...সন্ধান ক'রে সেখানেও ঐ আখের পোকা দেখতে
...লেন। তিনি নাছোড়বান্দা তাদের শত্রুকে খুঁজে বার
...বেনই। অবশেষে তাঁর সাধনার পথে প্রথম আলোর
... দেখা গেল। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন দেখেন,
...টি সাগু গাছে, আখ-পোকার গায়ে এক রকম মাছি এসে
... পেড়েছে। নিশ্চয়ই ঐ ডিম থেকে বাচ্চা বেরুলে ঐ
...কা খেয়েই সে 'মানুষ' হবে—নইলে এত জায়গা
...তে ঐ পোকার গায়ে এসে ডিম পাড়বার মানে কি?
...কাকে দিয়ে ডিম খাওয়ান'র মৎলব মা-মাছির নিশ্চয়ই
...!

ম্যুরের সন্দেহ সত্যি ব'লেই প্রমাণিত হ'ল। আখের পোকার শত্রুর সন্ধান তিনি পেয়ে গেছেন। সে হচ্ছে ঐ মাছি। এখন, ঐ মাছি প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ ক'রে জ্যান্ত অবস্থায় যদি তিনি হাওয়াই দ্বীপে নিয়ে হাজির করতে পারেন তবেই তাঁর কার্য্যোদ্ধার হতে পারে।

কিন্তু এইখানে আবার বাধল বিষম সমস্যা। ঐ মাছির পরমায়ু এত কম এবং ঐ স্থান থেকে হাওয়াই দ্বীপ এত দূরের রাস্তা যে ওখান থেকে জ্যান্ত মাছি ধরে নিয়ে জীবিতাবস্থায় হাওয়াই দ্বীপে হাজির করা অসম্ভব। তা ছাড়া অত মাছিই বা পাওয়া যাবে কোথায়?

ম্যুর তখন ঐ মাছির জীবনেতিহাস নিয়ে স্থরু করলেন গবেষণা। কখন, কি ভাবে ওরা জন্মায়, কি খায়, কত দিন বাঁচে, ওদের হালচাল কি—সমস্ত তথ্য খুঁটিয়ে বার করলেন। অবশ্য এজন্য তাঁকে কি গভীর এবং অমানুষিক পরিশ্রম করতে হ'ল তা তো বুঝতেই পার। শুধু তাই নয়, ম্যুর এও জানতে পারলেন যে যেখানে আখের মত ঐ সাগুর চাষ বেশী হয় সেখানে ঐ মাছিও সংখ্যায় বেশী পাওয়া যেতে পারে।

এইবার তাঁর মাথায় এক নতুন বুদ্ধি এল। মাছিগুলিকে সটান হওয়াই দ্বীপে না নিয়ে গিয়ে তিনি মাঝপথে,—যেমন হংকং কি ঐ রকম কোথাও, তাদের চালান করবেন। সেখানে এমন ব্যবস্থা থাকবে যাতে মাছিরা সেখানে গিয়ে ডিম পাড়তে পারে। ঐ ডিম ফুটে যে বাচ্চা বেরুবে তাদের নিয়ে যাবেন হাওয়াই—কেননা তারা জন্মেছে পরে, আয়ু কম হলেও মা-মাছিরা মরে গেলেও তারা কিছুদিন জীবিত থাকবে।

সেই কথামত কাজ হ'ল। কিন্তু হংকং পর্য্যন্তও মাছিগুলিকে টিকিয়ে রাখা গেল না। বার বার চেষ্টা ক'রে,—নানা কৌশল ক'রেও ম্যুর বিফল হলেন।

তবে? এতটা ক'রে শেষটা কি এইখানে এসে সমস্ত ভেস্তে যাবে? অসম্ভব। ম্যুর ঠিক করলেন, অন্য কোন জায়গায় ঐ মাছি পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে—যে জায়গা হাওয়াই দ্বীপের আরও কাছে।

অনেক খোঁজ করে শেষে শোনা গেল নিউগিনী দ্বীপে নাকি ঐ জাতের মাছি দেখতে পাওয়া যায়। ম্যুর তখনই

ছুটলেন নিউগিনী। এবার বোধ হয় ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েছিলেন। আখের পোকা এবং ঐ মাছি দুইএরই সন্ধান মিল্‌ল—এবং সংখ্যায়ও তা নেহাৎ নগণ্য নয়।

ম্যুর সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে আরও ভাল ক'রে ঐ মাছির চাষের ব্যবস্থা করলেন, তার পর বেশ কিছু মাছি জড় ক'রে জাহাজে চাপলেন—উদ্দেশ্য অষ্ট্রেলিয়া হয়ে হাওয়াই যাবেন।

কিন্তু আবার বিধি বাম। জাহাজে উঠেই তাঁর হ'ল বিষম অসুখ—একেবারে টাউফয়েড। যখন সেরে উঠলেন তখন তাঁর মাছির ঝাঁক অদৃশ্য হয়েছে।

কিন্তু ম্যুর দমবার পাত্র ন'ন। আবার তিনি ফিরে গেলেন নিউগিনী। আবার সুরু হ'ল মাছির চাষ। ম্যুর এবার নিউগিনী থেকে হাওয়াই যাবার পথে দু' জায়গায় এমন ব্যবস্থা রাখলেন যাতে মাছিরা গিয়ে প্রথম জায়গায় ডিম পাড়তে পারে এবং এই ভাবে ডিম ফুটে যে নতুন মাছি জন্মাবে তারা আবার যাতে দ্বিতীয় জায়গায় গিয়ে অবশ্য ভাবে ডিম পাড়তে পারে। ঐ শেষ ডিমগুলি থেকে যে বাচ্চা বেরোবে তাদের পক্ষে তা হ'লে জ্যান্ত অবস্থায় হাওয়াই পৌছান বা সেখানে গিয়ে আবার ডিম পা অসম্ভব হবে না।

এই প্রক্রিয়ায় আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গেল। চা বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অবশেষে ম্যুর একদিন তাঁ মাছি-সৈন্যদের নিয়ে সত্যিই সশরীরে হাওয়াই দ্বী হাজির করলেন, তার পর তাদের ছেড়ে দিলেন আখে ক্ষেতে। আখের পোকাদের জারিজুরি এবার শেষ হ —দলে দলে তারা মাছির পেটে যেতে লাগ্‌ল। দেখ দেখতে অল্প দিনের মধ্যেই হাওয়াই দ্বীপের সাদা শয়তানে দল নির্ম্মূল হয়ে গেল। আখের ক্ষেত রক্ষা পৌল, ক্ষেতে মালিকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

সে আজ প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

যদি হয়

শ্রীসুধীরকুমার দাস

জন্তুতে যদি কথা বল্‌ত
খোঁড়া তবে পায়ে হেঁটে চল্‌ত;
অন্ধেরা পেত চোখে দৃষ্টি,
মুখেতে লাগিত নিম মিষ্টি।

ভূতের মুখেতে যদি হরিনাম
শোনা যেত, তবে তার পরিণাম
নিশ্চয় হ'ত—হিম-জলেতে
আগুন শুকায়ে যেত; ফলেতে
ধরিত মুকুতা, হীরা, মণি গো;
নরের কামড়ে তবে ফণী গো
মরিত; লোকেতে খেয়ে সুধা গো
হাওয়া খেলে থাকিত না ক্ষুধা গো!

ব্যাঙের লাগিত যদি শদ্দি
মোর তবে ছোট হ'ত 'ছোড়াদ';
রামধনু তবে হ'ত রাত্রে,
জ্বর হ'ত সুশীতল গাত্রে।
কালা তবে পেত কানে শুনিতে,
বনে চলে যেত জ্ঞানী, গুণীতে।
কিন্তু কখনো এ যে হয় নি,
'রাম নাম' ভূতে তাই কয় নি।

তবুও কলিতে যদি হয় গো—
তারি তরে আজি লাগে ভয় গো!

বড়দের জীবনের ছোটখাট ঘটনা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি.এস্-সি

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টীনের নাম তোমরা সকলেই নিয়াছ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ইনি এক ন। আইনষ্টীন জাতিতে জার্ম্মান্। একবার কি একটা াপারে হল্যাণ্ডের রাণী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইনষ্টীন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য ট্রেনে করিয়া রাজ-ানীতে হাজির হইলেন। রাণীর পক্ষ হইতে একজন াজ কর্ম্মচারী তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য মোটর লইয়া ায়াছিল। আইনষ্টীন্ ট্রেন হইতে নামিয়া গেটের কে অগ্রসর হইয়া টিকিট দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ই ন্যাতাজোরা পোষাক পরিহিত, স্যুটকেস্‌ধারী ব্যক্তি- ই যে রাণীর নিমন্ত্রিত জগদ্বিখ্যাত আইনষ্টীন্ তাহা কর্ম্ম- য়টি কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। সে জাঁকজমক ধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে পণ্ডিতকে খুঁজিয়া শেষে ফল হইয়া ফিরিল।

ইতিমধ্যে পণ্ডিত অদূরবর্ত্তী রাজবাড়ীতে পৌছিলেন। ী সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, াপনার জন্য আমি লোক ও মোটর পাঠাইয়াছি, তাহা পৌছে নাই?" পণ্ডিত বলিলেন, "এই সামান্য দূরত্বের ন্য আবার গাড়ি পাঠাইবেন তাহা আমি ভাবিই নাই, াজেই সে লোকের সন্ধান করি নাই"

* * *

বিখ্যাত আমেরিকান্ লেখক এমার্সন্ সম্বন্ধে এইরূপ টী গল্প প্রচলিত আছে ইনি, যখনই মনের মধ্যে ান নূতন ভাব উদিত হইত, পাছে তাহা ভুলিয়া যান ন্য তাহা তাড়তাড়ি লিখিয়া রাখিতেন। পরে সময় সে ভাবটি বিস্তৃত করিতেন। রাত্রে এরূপ হইলে তিনি ঠিয়া সেকালের ঘষা দেশলাই ঠুকিয়া বাতি জ্বালিয়া যতে বসিতেন। একদিন, দুপুর রাত্রে এমার্সনের ধ্যে হঠাৎ এক নতুন ভাব আসিয়া দেখা দিল, তিনি নই উঠিয়া ভাবে বিভোর হইয়া দেশলাই জ্বালিতে ষ্ট করিলেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, কাঠি আর তেই জ্বলে না। বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়া অনেকগুলি টি ঘষিয়াও যখন জ্বলিল না তখন তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বিরক্তির জন্য ভাবটাও তখনকার মত চলিয়া গেল. এমার্সন্ পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন তাঁহার স্ত্রী উঠিয়া দেখিলেন তাঁহার একখানা বড় দাঁড়াওয়ালা চিরুণীর সমস্ত দাঁড়াগুলিই স্বামীর টেবিলের উপরকার বাতি-দানের কাছে পড়িয়া রহিয়াছে। অন্যমনস্ক এমার্সন্ বারে বারে চিরুণী ঠুকিয়া আগুন জ্বালিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

* * *

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র—রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা সুপণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধেও এই রকম একটি কাহিনী রটিত আছে। একদিন সকালবেলা দ্বিজেন্দ্র-নাথ খুব চীৎকার যুড়িয়া দিলেন। চীৎকারের চোটে বাড়ীর চাকর-বাকর এবং অন্যান্য সকলে আসিয়া জড় হইল দ্বিজেন্দ্রনাথ তখনও চেঁচাইতেছেন—"আমার চশমা কোথা গেল? এই রেমো বেটাই (রেমো তাঁহার ব্যক্তিগত ভৃত্য) যত ভণ্ডুল করে।" সকলে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে চশমা খুঁজিতে লাগিল। খানিক পরে দেখা গেল রেমো দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখের দিকে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া আছে। ঠাকুর ধমক দিলেন, "বেটা আবার হাঁ করে দেখছিস কি? খোঁজ না।" রেমো বলিল, "এজ্ঞে, চশমা যে আপনার কপালে।" ঠাকুর কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "আরে, তাই ত!" তখনই তাঁহার অট্টহাস্যে বাড়ী মুখরিত হইল সকলেই সে হাস্যে যোগ দিল। বকুনি খাওয়ার জন্য রেমোর সেদিন উপরি পাওনাটাও ভালই হইল।

* * *

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিউটনের অন্যমনস্কতা সম্বন্ধেও একটি গল্প আছে। তাঁহার দু'টি কুকুর ছিল। একটি বড় এবং একটি ছোট। তাঁহার ঘরেই তাহারা রাত্রে থাকিত এবং প্রাতে বাহিরে যাইবার জন্য দরজায় হাঁচড়া-পাঁচড়া করিত। নিউটন উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিতেন, ফলে তাঁহার ঘুমের

ব্যাঘাত হইত। অবশেষে পণ্ডিত তাহার প্রতিকারের উপায় মনে মনে উদ্ভাবন করিলেন।

তিনি একটি ছুতোর মিস্ত্রী ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, দরজায় দু'টি গর্ত্ত করিয়া দিতে হইবে। একটি ৯ ইঞ্চি আর অন্যটি ৬ ইঞ্চ মাপের। বড়টির ভিতর দিয়া বড় কুকুরটি যাইবে, ছোটটির ভিতর দিয়া ছোট কুকুরটি যাইবে। মিস্ত্রী বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—অত বড় বৈজ্ঞানিককে কথাটা বলেই বা সে কি করিয়া!

পণ্ডিত বলিলেন, "অত ভাবছ কি হে?" মিস্ত্রী বলিল, "আজ্ঞে, দু'টো ফুটো করে দরজাটাকে নষ্ট না করে একটী বড় ফুটো করলে হয় না? তার ভিতর দিয়ে তো দু'টো কুকুরই যেতে পারবে।" পণ্ডিত বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন। পরে কথাটা বুঝিয়া বলিলেন, "তাই ত' হে, তুমি তো ঠিক কথাই বলছ। তুমি পড়াশু[...] করলে নিশ্চয়ই খুব বড় একজন বৈজ্ঞানিক হ'তে।"

* * *

হাইকোর্টের একটি ঘটনা। একজন বড় উকীল [...] নূতন জজের সামনে মোকর্দ্দমা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন উকীলের কর্ম্মচারীরা তাঁহার টেবিলে প্র[...] আইন পুস্তক জড় করিয়া রাখিয়াছে। জজ উকীল[...] দমাইয়া দিবার জন্য একটু অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "হোয়[...] আর দীজ্ বুক্স ফর?" (এই এত বই কিসের জন্য আ[...] হইয়াছে?) উকীল তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "টু টি[...] ইউ ল, মি লর্ড।" (হুজুর, আপনাকে আইন শিখাই[...] জন্য।)

এই উকীলটি আর কেহ ন'ন—বিখ্যাত রাসবিহা[...] ঘোষ।

ইংল্যাণ্ড ঃ অষ্ট্রেলিয়া

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

ইংল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া—পৃথিবীর ক্রিকেটের ইতিহাসে দুইটি শ্রেষ্ঠ দেশ,—ক্রিকেট-জগতে চির পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং তাহাদের খেলার আয়োজনে সমস্ত ক্রীড়া-জগতেই যে বেশ একটি উত্তেজনা দেখা দিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

এত দিন যুদ্ধের জন্য আন্তর্জাতিক খেলাধূলা এক রকম বন্ধই ছিল। যুদ্ধ থামিলে ক্রীড়ামোদীরা আবার এ দিকে নজর দিয়াছেন, এবং ভারতের বাছাই করা একটি ক্রিকেট দল পাতৌদির নবাবের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়া এবং তিনটি টেষ্ট খেলিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। এই খেলার বিবরণ তোমরা রামধনুতে কিছু [...] পড়িয়াছ। ভারতীয় দলের বিজয় মার্চেণ্টের কৃতি[...] কথাও শুনিয়াছ। এবার ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার পালা।

সম্প্রতি ওয়ালি হ্যামণ্ডের নেতৃত্বে ইংল্যা[...] ক্রিকেট টীম অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। [...] বাহুল্য যুদ্ধের পরে, অষ্ট্রেলিয়ায় এই সর্ব্বপ্রথম প্র[...] শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হইয়াছে। এবং এ[...] খেলার উপরেই নির্ভর করিতেছে ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রেলি[...] মান-সম্মান, ক্রিকেট মাঠে তাহাদিগের প্রতিপত্তি [...] খাতির।

ইংল্যাণ্ডের দলটি কিন্তু এবার সত্য সত্যই খুব শক্তিশালী। সম্প্রতি ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে খেলিয়া যাঁহারা [...]নাম অর্জ্জন করিয়াছেন এমন সব বাছাই বাছাই খ্যাত-[...] খেলোয়াড় লইয়াই ইংল্যাণ্ডের এই দল গঠিত [...]হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা যে প্রত্যেকটি খেলাতেই [...]সম্মানজনক ফলাফল প্রদর্শন করিয়া ইংল্যাণ্ডের মান-[...]সম্মান অক্ষুণ্ন রাখিতেছেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

এখন সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে টেষ্ট্ [...]চের ফলাফলের উপর। কারণ, ক্রিকেটের ইতিহাসে [...] ম্যাচের ন্যায় গুরুতর এবং সম্মানজনক খেলা আর [...]ই। টেষ্ট্ ম্যাচে যে দেশের দল বিজয়ী হইতে পারে, [...]ই দেশই ক্রিকেটে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সুনাম অর্জ্জন [...]রে।

অষ্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৫টি টেষ্ট্ ম্যাচ্ খেলিবে। [...]ধিক সংখ্যক—অর্থাৎ তিনটি খেলাতে যে দল বিজয়ী [...]হবে সেই দলই ক্রিকেটে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত [...]হবে।

ইংল্যাণ্ডের টীমে কাহারা খেলিতেছেন? সর্ব্বশুদ্ধ [...]র জন খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণে গিয়াছেন। তাঁহাদের নেতৃত্ব করিতেছেন ৪৩ বৎসর বয়স্ক বিখ্যাত ব্যাটস্ম্যান্ চৌকস খেলোয়াড় ওয়ালি হ্যামণ্ড্। তোমাদের [...]তো মনে আছে, সম্প্রতি ভারত হইতে যে টীম [...]তৌদির নবাবের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডে গিয়াছিল, তাঁহা[...]কে তিনটি টেষ্ট ম্যাচেই ইংল্যাণ্ডের যে দলের বিরুদ্ধে [...]লিতে হইয়াছিল তাহার অধিনায়ক ছিলেন এই [...]ণ্ড। সেই তিনটি ম্যাচেই ওয়াল্টার হ্যামণ্ড অপূর্ব্ব [...]ত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার উপরেই অর্পিত [...]য়াছে অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণের নেতৃত্ব। হ্যামণ্ড্ ব্যতীত [...]ও কয়েকজন বিখ্যাত ব্যাটস্ম্যান্ ইংল্যাণ্ডের টীমে [...]য়াছেন। ডেনিস কম্পটন্‌কে তোমাদের নিশ্চয়ই [...] আছে? সেই যে বিখ্যাত ফুটবল-খেলোয়াড়—কয়েক [...]র আগে কলিকাতায় আসিয়া আই. এফ. এর [...]মিত দলের সঙ্গে খেলিয়া গেলেন? তিনি একজন [...] ক্রিকেট খেলোয়াড়ও। এবার অষ্ট্রেলিয়ায় তিনি [...]ষ সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। একবার একটি [...]য় ৯৮ রান্ তোলেন, আর একবার একেবারে ১৪৩ [...] খ্যাতনামা খেলোয়াড় জো হার্ডস্টাফ্ও আছেন। তি[...] বোম্বাএইর পেণ্টাঙ্গুলার খেলায় কয়েক বৎসর আ[...] ইউরোপীয়দের পক্ষে খেলিয়া পার্শী টীমের বিরুদ্ধে ১[...] রান তোলেন। তিনি কলিকাতাতেও কয়েকটি মা[...]

ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক হ্যামণ্ড্

খেলিয়াছিলেন। তাঁহাকেও তোমাদের নিশ্চয়ই ম[...] আছে? এঁরা তিন জন ব্যতীত আরও কয়েকজন খ্যাত[...]নামা ব্যাটস্ম্যান্ ইংল্যাণ্ড দলে স্থান পাইয়াছেন, এ[...] ইঁহারা প্রত্যেকেই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অষ্ট্রেলিয়া[...] খেলিতেছেন। যেমন—লিওনার্ড হাটন্, ওয়াশ্ব্রুক্, গি[...]ফিশ্লক্ এবং ইয়ার্ডলী। বোলার আছেন বিখ্যা[...] বেড্সার, কম্পটন্ ভোস্, স্মিথ্, এবং স্যাংরিজ্। গি[...] একজন চৌকস উইকেট রক্ষক।

এবার অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াডদের কথা বলি। ডো[...] ব্র্যাডম্যানের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ? তাঁহা[...] আজকাল "ফাদার অব্ ক্রিকেট" বলা হয়, কারণ তাঁহা[...] ন্যায় আর একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়ও গোটা পৃথিবী[...] খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এ রকম দুর্দ্ধর্ষ ব্যাটস্ম্যা[...]

এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে দু'টি দেখা যায় নাই। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৩৮ বৎসর। আট বৎসর পূর্ব্বে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া বহুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। অনেকেই ভাবিয়াছিল ক্রিকেট-জগৎ হইতে তিনি বুঝি চিরকালের মত অবসর লইলেন। কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ব্র্যাডম্যান্ পুনরায় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে যোগদান করিয়াছেন, এবং আট বৎসর পরে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলিয়া প্রথম ম্যাচের প্রথম ইনিংসেই ৭৬ রাণ তুলিয়া অপূর্ব্ব উত্তেজনা ও

অষ্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ব্র্যাডম্যান্

চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তার পরের ম্যাচে করিয়াছেন ১০৬। আগামী টেষ্ট ম্যাচে তিনিই যে অষ্ট্রেলিয়ান্ দলের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করিবেন তাহা প্রায় নিঃসন্দেহ। তাঁহার দলে সম্ভবতঃ থাকিবেন লিণ্ডসে হ্যাসেট, কিথ্ মিলার এবং আরও আট জন নামকরা টেষ্ট খেলোয়াড়।

এ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের টীম্ অষ্ট্রেলিয়ায় ৮টি ম্যাচ্ খেলিয়াছে এবং প্রত্যেকটিতেই সাফল্যপূর্ণ ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছে। তাহারা তিনটিতে বিজয়ী হইতে স[...] হইয়াছে, পাঁচটি খেলা সময়াভাবে অমীমাংসিত ভাবে [...] করিয়াছে। নিম্নে খেলাগুলির সংক্ষিপ্ত ফলাফল দে[...] গেল। ভবিষ্যতে অন্যান্য খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করি[...] ইচ্ছা রহিল।

প্রথম ম্যাচ :—এম্. সি. সি. (ইংল্যাণ্ড) বনাম নর্দ্দাম[...]
প্রথম ইনিংস—এম্. সি সি.—৪০৯ (৬ উইকেট) (হ্যা[...] ১৩১), নর্দ্দাম—১২৩। ২য় ইনিংস্‌এ নর্দ্দাম—[...]
ফলাফল :—এম্. সি.সি. ১ ইনিংস ও ২১৫ রানে বিজ[...]

দ্বিতীয় ম্যাচ্ :—এম্, সি.সি. বনাম অষ্ট্রেলিয়ান্ কোল্[...]
প্রথম ইনিংস—এম্ সি, সি. ১৯৭ (৪ উইকেট; গিব[...] কোল্টস্—১৩৮ (৬ উই[...]
ফলাফল—অমীমাংসিত।

তৃতীয় ম্যাচ :—এম. সি. সি. : পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া।
প্রথম ইনিংস—এম্. সি সি. ৪৭৭ (হ্যামণ্ড ২০[...] পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ৩৬৬ (ওয়াট্[...]
ফলাফল—অমীমাংসিত।

চতুর্থ ম্যাচ্ :—এম্ সি. সি. : সম্মিলিত সার্ভিসেস X[...]
প্রথম ইনিংস—এম্. সি. সি.—৩০২ (কম্পটন ৭৮) সম্মিলিত সার্ভিসেস XI ৪৬২ (ওয়াট্ ১[...]
ফলাফল—অমীমাংসিত।

পঞ্চম ম্যাচ্ :—এম্. সি.সি. : সম্মিলিত দক্ষিণ অষ্ট্রে[...] গ্রাম্য দ[...]
ফলাফল—এম্. সি. সি. এক ইনিংস ও ৩০২ রানে বিজয়[...]

ষষ্ঠ ম্যাচ :—এম্. সি. সি. : দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া (ব্র্যাডম্যান [...]
ফলাফল—অমীমাংসিত।

সপ্তম ম্যাচ্ :—এম্. সি. সি. : ভিক্টোরিয়া (হ্যাসেট [...]
ফলাফল :—এম্. সি. সি. ২৪৪ রানে বিজয়ী।

অষ্টম ম্যাচ্ :—এম্. সি. সি. : অষ্ট্রেলিয়ান একাদশ।
এম্. সি. সি.—৩১৪, অষ্ট্রেলিয়ান একাদশ—৩২৭ (৫ উইকেটে) (মরিস্ ১১৫, ব্র্যাডম্যান্ ১০[...]
ফলাফল—অমীমাংসিত।

রাধামাধবের রত্নহার

শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ঘটনা-প্রবাহ

রসরাজ ভীড় লক্ষ্য করিয়া আগাইয়া গেলেন। একটি [বৈ]রাগী দু' হাতে দু'টি মাটীর হাঁড়া লইয়া বাজাইতেছে ও [তার]ই সঙ্গে গ্রাম্য সুরে গান গাহিয়া চলিয়াছে, তাহাকে [ঘি]রিয়াই ভীড়। বৈরাগীর গলা নেহাৎ মন্দ নয়। সে [গা]হিতেছিল :

হায়রে বিধি, দুনিয়ার এ কি হইল হাল!
—এ কি হাল রে!
সোনার দ্যাশের মধু এখন বল্লায়[1] চুইষা খায়,
দমকা হাওয়ায় ময়ূরপঙ্খী ডুবল দরিয়ায়
রাজা ঘুমায়, মন্ত্রী ঘুমায়, ঘুমায় কোতোয়াল,
দ্যাবপুরে অসুর ঢুইক্যা ইন্দ্রে কইল ঘাল।
হায় রে বিধি, দুনিয়ার এ কি হইল হাল!
—এ কি হাল রে!
খালে বিলে নাইক' পানি—খা খা করে মাঠ,
চাষার সম্বল ক্ষ্যাতের মাটী ফাইটা হইল কাঠ।
দিন দুপুরে শিয়াল চরে, বেড়ায় ফেরুপাল,
নিষ্কলুষ পথিকের রক্তে বেবাক্ হইল লাল।
হায় রে বিধি, দুনিয়ার এ কি হইল হাল!
—এ কি হাল রে!
সাত সমুদ্দুর ডিঙ্গি মাইরা কারা আইল দ্যাশে,
রাইয়ত পরজার[2] ধনদৌলত দেয় পাহারা কে সে?
বারোদীঘির বারো ঘাটে ঢুকল পঙ্গপাল,
সরস্বতীর ঘোলা জলে কুম্ভীর কাটে খাল।
হায় রে বিধি, দুনিয়ার এ কি হইল হাল!
—এ কি হাল রে!

বৈরাগীর গান থামিলে যেমন অল্প সময়ে ভীড় জমিয়াছিল, তেমনি অল্প সময়েই তা ভাঙ্গিয়া গেল। বৈরাগীর সম্মুখে মাটীতে বিছান কাঁথাখানি ইতিমধ্যেই ছোট-বড় নানা রকম মুদ্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ভীড় সরিয়া গেলে রসরাজ ধীরে ধীরে বৈরাগীর আরও কাছে আসিলেন। আংরাখা হইতে একটি রৌপ্য মুদ্রা তাহার কাঁথায় ফেলিয়া দিতেই বৈরাগীর দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হইল। রসরাজও স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাইয়াছিলেন; তিনিই প্রথম কথা কহিলেন—

"এ গান কোথায় শিখলে? তুমি কি এদিক্‌কার লোক?"

"কেন বলুন তো?"—বৈরাগী এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া হাসিয়া উত্তর দিল। এবার আর তার স্বরে প্রাদেশিক টানের আভাস পাওয়া গেল না।

"না, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। তোমার গানে বারোদীঘি, সাতগাঁ—এ সবের উল্লেখ রয়েছে কিনা—সে তো আর এ অঞ্চলে নয়!"

"তা'তে কি? এক জায়গায় কেউ গান বাঁধলে তা কি

১—বোলতা, ২—প্রজার

আর অন্য জায়গায় মুখে মুখে ছড়াতে পারে না?"— বৈরাগী তেমনি হাসিয়া কহিল।

রসরাজ একটু অপ্রস্তুত হইলেন, কথার মোড় ফিরাইয়া বলিলেন, "খাসা গলা কিন্তু তোমার! চর্চ্চা রেখ।"

"আজ্ঞে, না রেখে উপায় কি?—এই তো আমার পেশা।"

নাঃ, বৈরাগী বড় পট পট্ জবাব দেয়। রসরাজ আবার অপ্রস্তুত বোধ করিলেন দুই পা সরিয়া আসিয়া হঠাৎ খেয়াল হইল বাড়ী হইতে অনেকটা চলিয়া আসিয়াছেন, রাস্তা মনে পড়িতেছে না। কাছাকাছি আর কাহাকেও না পাইয়া বৈরাগীর কাছেই আবার ফিরিয়া আসিতে হইল, "আচ্ছা মতি মঞ্জিলটা—কোন্ দিকে বলতে পার—সুখনবাগের মতি মঞ্জিল? সুখনবাগ কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে?"

এবার কিন্তু বৈরাগী চট্পট্ জবাব দিতে পারিল না। একটু আমতা আমতা করিয়া কহিল, "আজ্ঞে—বোধ হয়—আচ্ছা ঐ মুদীর দোকানে খোঁজ নিচ্ছি।"

এবার হাসিবার পালা রসরাজের। বলিলেন, "অর্থাৎ তুমি এ অঞ্চলের লোক নও। তবে বল, এ সব খবর কোথায় পেলে—ঐ যে গানের ভিতর বলছিলে? ও যে বড় টাটকা খবর হে!"

বৈরাগী যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, প্রশ্ন তার কানে পৌঁছিল কিনা বুঝা গেল না। রসরাজের পাশে হাঁটিতে হাঁটিতে সে আগাইয়া চলিল। একটু ভীড়ের মধ্যে পৌঁছিয়া চুপি চুপি বলিল, "এখানে কিছু সুবিধে হবে মনে হয় না। আজ নবাবের সঙ্গে দেখা করুন, কিন্তু কালই বারদীঘি ফিরে যান—গোলমাল আরও পেকে উঠেছে।" রসরাজ ফিরিয়া দেখেন, বৈরাগী ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

সেইদিনই রাত্রে রসরাজ ও এনায়েৎ খাঁ কাজি সাহেবকে সঙ্গে লইয়া সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর সহিত কেল্লায় গিয়া দেখা করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ মনোযোগ দিয়া সমস্ত শুনিলেন, সপ্তগ্রামের সমস্ত খবর খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ফৌজদারের প্রতি সহানুভূতি জানাইলেন, ফিরিঙ্গীদের মনের সুখে গালি পাড়িলেন কিন্তু আসল ব্যাপারে তেমন কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলেন না। তাঁর সৈন্য সংখ্যা উপযুক্ত পরিমাণ নাই, তার উপর [illegible] বাংলায় সর্ব্বত্রই এই এক কাহিনী। বিশেষতঃ চাঁদপালে[illegible] হুমকি তাঁকে বাস্তবিকই বিচলিত করিয়াছিল। চাঁ[illegible] পালের অসাধ্য যে কিছুই নাই—এবং সত্যি সত্যিই প্র[illegible] না হইয়া বাজে কথায় ধাপ্পা দিয়া কাজ হাসিল কার[illegible] মত লোক যে সে নয় তাহাও তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলে[illegible] বর্ত্তমানে তাঁর মাথায় শুধু সেই চিন্তাই ঘুরিতেছিল। চাঁ[illegible] পালের সর্ত্তে সায় দেওয়া যেমন অসম্ভব—তেমনি তা[illegible] সহিত আঁটিয়া উঠিবার জন্য প্রস্তুত হওয়াও কম কঠিন ন[illegible] এখন এদিকে নজর না দিয়া নানা দিকে দৃষ্টি দিতে গে[illegible] শেষ পর্য্যন্ত কোনটাতেই সফল হওয়া যাইবে না। [illegible] হ্যাঁ, সপ্তগ্রাম রক্ষার জন্য সাধ্যমত ফৌজের ব্যবস্থা তি[illegible] অবশ্যই করিবেন—কিন্তু মৃগাঙ্ক রায়ের পুত্রের জন্য [illegible] দূর কি করিতে পারিবেন কথা দিতে পারেন না। [illegible] সম্ভব হইলে চেষ্টা করিবেন।

ক্ষুণ্ণমনে রসরাজ এনায়েৎ খাঁ সহ কেল্লা হইতে ফি[illegible] আসিলেন।

চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বেই চাঁদপালের নিকট নবাবের [illegible] পৌঁছিল। চাঁদপালের সর্ত্ত যেমন অসম্ভব, রাজপ্রতিনি[illegible] পক্ষে তা মানিয়া লওয়া তেমনি আরও অসম্ভব। চাঁদ[illegible] যেন এখনও ভালোয় ভালোয় নিরস্ত হয়—নচে[illegible] মোগল সাম্রাজ্য তো এখনও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই,—বাদ[illegible] এ ব্যাপার কিছুতেই বরদাস্ত করিবেন না। এখন নি[illegible] হইলে সুবেদার কিছু বলিবেন না, কিন্তু পরে [illegible] চাঁদপালের ভাগ্যে সে সুযোগ জুটিবে না এবং এর [illegible] ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে।

চাঁদপালের তরফ হইতে ইহার কোন জবাব আ[illegible] না কিন্তু ইহার পরেই সুরু হইল কয়েকটি অবিশ্বাস্য [illegible] প্রথম ঘটনাটি ঘটিল নিমপুকুর হইতে বিশ ক্রোশ [illegible] বাঁশপোতা গ্রামে। প্রশস্ত নদীর ধারে এই গ্রা[illegible] স্বাস্থ্যকর বলিয়া বরাবরই বেশ সুনাম ছিল; কিন্তু [illegible] একদিন এই গ্রামে এক অদ্ভুত রোগের আবির্ভাব [illegible] সুস্থ মানুষ—দিব্যি হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে [illegible]

[illegible]পিতে কাঁপিতে সে বসিয়া পড়িল। সমস্ত শরীর থর থর [illegible] কাঁপিতেছে, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, এমন কি [illegible] বলিবার পর্য্যন্ত শক্তি নাই! দু' দণ্ডের মধ্যে সমস্ত [illegible] লাল হইয়া বড় বড় ফোস্কা পড়িতে সুরু করিল। [illegible] পর বৈদ্য ডাকিবার পূর্ব্বেই সব শেষ। এ রকম একটি [illegible]—ঘরে ঘরে এই রোগ।

[illegible] তিন দিন যাইতে না যাইতে শোনা গেল পদ্মার তীরে [illegible] গ্রামেও ঠিক ঐ রকম রোগ দেখা দিয়াছে। বাঁশ-[illegible]তা হইতে এই গ্রাম বহুদূর—সাত-আট দিনের পথ। [illegible] রোগের লক্ষণ এবং সমাপ্তি ঠিক একই রকম। তার [illegible] দুই সপ্তাহের মধ্যে আরও প্রায় সাত-আটটি গ্রামে [illegible] রোগ ছড়াইয়া পড়িল। কোন প্রতিকার নাই—[illegible]-কবিরাজরা এই অদ্ভুত রোগের কোন কিনারাই [illegible]রিতে পারিলেন না—কোন ওষুধেরও তাই ব্যবস্থা হইল না। সমস্ত দেশ যুড়িয়া এক প্রবল আতঙ্কের ছায়া নামিয়া আসিল।

কয়েক দিন পরে শোনা গেল—যে গ্রামে এই রোগ দেখা দেয় তাহার ঠিক আগেই সেখানে চাঁদপালের কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর আবির্ভাব হয়। তা সে নিমপুকুর হইতে যত দূরেই হোক না কেন। আর সেই কর্ম্মচারীটি চলিয়া গেলেই সুরু হয় রোগের প্রাদুর্ভাব। কর্ম্মচারীরা একা আসে না—সঙ্গে সশস্ত্র সিপাহী এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহারা ঘোরাফেরা করে—নিরীহ গ্রামবাসীদের পক্ষে তাই পূর্ব্বাহ্নেই তাদের ঠেকান সম্ভব হয় না।

যথা সময়ে সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর কানেও এ সংবাদ পৌঁছিল। চাঁদপাল নিজেই তাঁকে এ সংবাদ জানাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

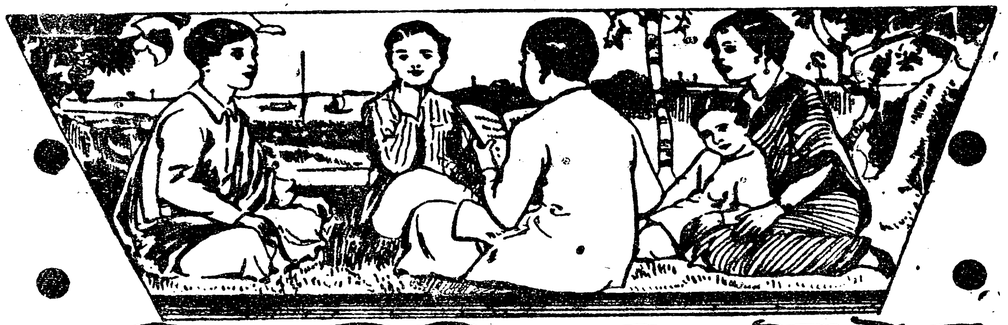

(ক্রমশঃ)

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

বীরপুরুষ

(ভাদ্র মাসের রামধনুতে ১৪৯ পৃষ্ঠার ছবিটি দেখে। ছবিটি এ সংখ্যায় ২২৯ পৃষ্ঠায় আবার দেখ।)

শ্রীঅর্চ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

কানু, টুনু দুই ভা'য়েতে শিকারে যায় বনে,
ভাবছে তারা মারবে পশু, সাহস আছে মনে।
বনের ভিতর ঢুকল তারা কানটি ক'রে খাড়া,
কানু বলে, 'চুপ্ রে টুনু, 'পাই কি দেখি সাড়া!'
টুনু বলে, 'মারব দেখিস্ মস্ত বড় হাতী.'
কানু বলে, 'দাঁড়া এবার ফুলাই বুকের ছাতি।
বন্দুকটা ঠিক আছে তো?— বাগিয়ে তারে ধর্'—

হঠাৎ কানে এল কিসের আওয়াজ সে খর্ খর্!
দুই ভা'য়েতে পিছন ফিরে চাইল সবিস্ময়ে—
বিদ্ঘুটে এক বদ্ জানোয়ার আসছে ঘেঁসে ভূঁয়ে।
লম্বা লম্বা দু'টো শিং—ঢুসবে নাকি ওরে,
পিঠের উপর শক্ত খোলা— বিঁধবে বুঝি জোরে!
ওরে ওরে ধরবে না কি— আসছে কেমন তেড়ে,
পালা, পালা, ছুটে পালা— এল রে ঘাড় নেড়ে!

জেনে রাখ

শ্রীকল্যাণী দেবী

ইংল্যাণ্ডে যেমন পার্লিয়ামেণ্ট তেমনি অন্যান্য দেশের রাষ্ট্র পরিচালনা সভার এক-একটি নিজস্ব নাম আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তাকে বলা হয় কংগ্রেস, ফ্রান্সে বলা হয় চেম্বার, ইটালীতে সেনেট, রাশিয়ায় ডুমা এবং ইরাণে বলা হয় মজলিস। জাপানে বলা হ'ত ডায়েট্ এবং জার্ম্মানীতে বলা হ'ত রাইখ্ষ্ট্যাগ্।

* * *

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বাঙ্গালী ভাইস্ চ্যান্সেলার হ'ন স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর নিম্নলিখিত বাঙ্গালীরা এখানকার ভাইস্ চ্যান্সেলার হয়েছেন :— আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, নীলরতন সরকার, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, যদুনাথ সরকার, হাসান সারওয়ার্দ্দি, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আজিজুল হক, বিধানচন্দ্র রায়, রাধাবিনোদ পাল এবং বর্ত্তমানে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* * *

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে নিম্নলিখিত বাঙ্গালীরা সভাপতি হয়েছিলেন :— আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ বসু, মেঘনাদ সাহা, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

ভারতের জননায়ক, প্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক, পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আর নেই। গত ২৬শে কার্ত্তিক ৮৫ বছর বয়সে তিনি তাঁর সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের জাতীয় জাগরণের প্রথম যুগের শেষ পুরুষসিংহটি বিদায় গ্রহণ করলেন।

মালব্যজী সম্বন্ধে তোমরা কিছু কিছু নিশ্চয়ই জান। প্রথমে শিক্ষক, তার পর সম্পাদক, আইন ব্যবসায়ী এবং পরে রাজনীতিক হিসাবে তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। তিনি তিন বার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। কয়েক বার হিন্দু মহাসভার সভাপতিও হয়েছিলেন। হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। কিন্তু মালব্যজীর সব চেয়ে বড় কীর্ত্তি হচ্ছে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। তিনিই এর প্রতিষ্ঠাতা— বুকের রক্তে তিল তিল ক'রে একে গড়ে তুলেছিলেন। প্রাচীন হিন্দু আদর্শে আধুনিক যুগের সঙ্গে সমন্বয় ঘটি গড়ে তোলা এই "নব নালন্দা"র ভিতর দিয়ে তিনি চি কাল অমর হয়ে থাকবেন।

মালব্যজীর মৃত্যুসংবাদ যখন এল তখন এ সং রামধনু ছাপা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। তাই তাঁর পু জীবনকথা এবারে তোমাদের শোনাতে পারলাম না আসছে বারে শোনাবার ব্যবস্থা করব।

* * *

নোয়াখালির ভয়াবহ ঘটনার কথা তোমরা ইতিপূর্বে শুনেছ। সেখানকার অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবি হতে পারে নি—আশ্রয়প্রার্থীরা এখনও নিজের নিজে গ্রামে ফিরে যেতে সাহস পাচ্ছে না। মহাত্মা গান্ধী স কাজ ফেলে নোয়াখালি ছুটে গেছেন এবং সেখানে

গ্রামান্তরে আকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—পথ যতই হোক্ না কেন খাওয়া-দাওয়া তিনি এত কমিয়ে ছেন যে চিকিৎসকেরা পর্য্যন্ত তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ছেন। গান্ধীজি জানিয়েছেন, যতদিন না নোয়াখালি লে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে ততদিন তিনি নেই কাটাবেন—দরকার হ'লে ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস গ করবেন। এই মহামানবের পুণ্য আদর্শ চোখের নে দেখেও কি দেশ শান্ত হবে না?

* * *

াম্প্রদায়িক বিষ একবার ছড়িয়ে পড়লে আর তা ধ করা সহজ নয়। বাংলার হাঙ্গামা সুরু হবার পর র প্রতিক্রিয়া ভারতের আরও অনেক জায়গায় ছড়িয়ে ড়ছে। এর মধ্যে সব চেয়ে দুঃখের কথা বিহারের া। সেখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের র যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে তাও কম উদ্বেগজনক । বিহারে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত, কাজেই এর ত্ব আরও বেশী। অবশ্য কংগ্রেস সরকার কঠোর তে দাঙ্গাকারীদের দমন ক'রে সেখানকার অবস্থা প্রায় ক'রে এনেছেন। পণ্ডিত জওহরলাল এবং দেশের ন্য বহু নেতা উপদ্রুত অঞ্চল সফর ক'রে প্রতিকারের করেছেন। গান্ধীজিও আমরণ অনশন করতে চেয়েছিলেন, তাঁকে নিরস্ত করা হয়েছে। জওহরলাল এমনও বলেছিলেন, যে, যদি দুষ্কৃতিকারীরা না থামে তবে কোন রকম দয়া দেখান হবে না—এমন কি উপর থেকে বোমা বর্ষণ করতেও সৈন্যদল ইতস্ততঃ করবে না। তাঁর কঠোরতায় কাজ হয়েছে। মধ্যবর্ত্তী সরকার বাংলার ব্যাপারেও এ রকম কঠোর মনোভাব দেখালে হয়তো এ বিষ এ ভাবে ছড়িয়ে পড়বার আগেই ধ্বংস করা সম্ভব হ'ত।

* * *

বহুদিন পরে আবার কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন হচ্ছে। ২৩শে নভেম্বর মীরাটে এই অধিবেশন সুরু হবে। এবারকার নির্ব্বাচিত সভাপতি হচ্ছেন আচার্য্য কৃপালনী। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমটা খুব সমারোহের সঙ্গে এই অধিবেশন করবেন ঠিক করেছিলেন; কিন্তু দেশের সাম্প্রদায়িক অবস্থা দেখে সে সংকল্প ত্যাগ ক'রে অনাড়ম্বর ভাবে কাজ করাই মনস্থ করেছেন।

* * *

এ বছর সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন জার্ম্মান্ সাহিত্যিক হেস্। গত ১৯১২ থেকে ইনি সুইট্জারল্যাণ্ডে বসবাস করছেন।

ধনুর প্রিয় বন্ধুগণ,

গত মাসে তোমাদের চিঠি দিতে পারি নি। অনেক ই তো বলবার আছে, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি? ছে মাস থেকে রামধনুর পৃষ্ঠা আরও কিছু বাড়াতে পারব, চিঠিপত্র বিভাগও নিয়মিত ভাবে এবং আর একটু বিস্তৃত ভাবে দেওয়া যাবে।

এ মাস থেকে শ্রীশামুকের লেখা একখানি উপন্যাস সুরু করা হ'ল। এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে একটি কথা বল

দরকার। কয়েক বছর আগে রংমশাল পত্রিকায় লেখক 'লড়াই ফেরৎ বোনকুদা' নামে একটি ছোট গল্প লিখে ছিলেন। সেই গল্পটি নিয়েই এই উপন্যাসের স্থরু। তবে তোমরা নিশ্চিন্ত থেক, এর শুধু প্রথম ২।৩টি পরিচ্ছেদের মধ্যেই সেই পুনরাবৃত্তি খানিকটা খানিকটা ছড়ান আছে—মূল উপন্যাসের রস তাতে কিঁছুমাত্র ব্যাহত হবে না।

'একলব্যের' লেখক বিশেষ অসুবিধার জন্য এবারে তাঁর নাটকের কিস্তি লিখে উঠতে পারেন নি। বারা… তা বেরোবে।

আর একটা কথা, আজকাল ডাকের অসুবিধার … সবাই জান। চিঠিপত্র বিলি হতে সময় সময় অত্যন্ত … হয়। স্থতরাং রামধনু যথাসময়ে ডাকে দিলেও তা … তোমাদের অযথা বিলম্ব হওয়া বিচিত্র নয়। রামধনু … মত না পাওয়া বিষয়ে উপরের কথাটি আজকাল … মনে রাখতে হবে। শুভেচ্ছা জেন। ইতি— রাঃ…

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

স্নেহের রামধনু,

দেশের দশা কালে কালে হল কি! পয়সা দিয়েও বাজারে জিনিষপত্র পাওয়ার উপায় নেই। তার পর সম্প্রতি চলাফেরাও সহজ নয়। বড় গোলে আছি। —ইতি

জনৈক পাঠক

উত্তরদাতাদের নামঃ নবেন্দু … (কলিকাতা); শ্যামলকুমার মল্লিক (বালিগঞ্জ); … ছন্দা রায় (পাটনা); মহেন্দ্র গুপ্ত (কাশী); … (নিউ দিল্লী); নূরজাহান বেগম (কলিকাতা); … সত্যেন (বরিশাল); অশোক ও প্রতাপ (… নির্ম্মলেন্দু, অজা ও ইন্দুমতী (এলাহাবাদ)।

নূতন ধাঁধা

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছিল। হঠাৎ কর্ম্মচারীর অসতর্কতায় কতকগুলি টাইপ উঠে যায়। কর্ম্মচারীটি কাউকে না জানিয়ে নিজেই বুদ্ধি ক'রে সে-গুলো আবার সাজিয়ে নিয়েছে। তার বুদ্ধির ফলে যে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে তা নীচে দিলাম। তোমরা এর পাঠোদ্ধার করে দেবে ?—

হারাইয়াছে—হারাইয়াছে। স্থদর্শন নীলকমল শ্যাম-বাজারে বালীগঞ্জ ষ্টোর্স। সন্ধান মনোহারী পি. সরক… বিক্রয়—মূল্য ২৫,০০০,। অভিজ্ঞ একজন সন্ধান করুন… আধুনিক রুচিসম্মত সহকারী কুকুর অনুসারে। … কাঠা বক্স বাটী বাধিত হইব। কেহ বেতন দিলে ১… নং বাড়ী টেরিয়ার অঞ্চলে ঢাকুরিয়া। জমির উপর … যোগ্যতা কর্ম্মখালি—দ্বিতল দোকানের কাজে গত… সন্ধ্যায় চাই।

আগেই বেরোবে

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি
নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের
অলিভার টুইষ্ট
ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—৷৷৴০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
দমাদম দামোদর
দাম ।০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
অয়েল পেণ্টিং
দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত
কল্‌কাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ঃ ঃ ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫।

Regd, No C—1641

রূপসজ্জায় শিল্পপ্রতিভা যে কী অপরূপ রূপচ্ছটা সৃজন করতে পারে তা দেখতে পাবেন রৌপ্য-শিল্প চাতুর্য্যের পরম উৎকর্ষ আমাদের এই নব অবদানে —"গৃহলক্ষ্মী" রূপার কৌটায়। বঙ্গললনাদের অতিপ্রিয় ও অপরিহার্য্য। এটী লক্ষ্মীর কৌটা, সিন্দুর কৌটা বা বরণ-কৌটা যে রকম ভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করা চলে। আমাদের অসংখ্য পৃষ্ঠপোষকগণের বিশেষ অনুরোধে আমরা এইটী প্রস্তুত করিয়াছি। দেখিতে মনোহর, উজ্জ্বল, আকারেও বড় অথচ দামও কম।

"গৃহলক্ষ্মী"

হিন্দু ললনার অতি আদরের সামগ্রী, নিত্য প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য। "গৃহলক্ষ্মী" গৃহের লক্ষ্মীশ্রী অটুট রাখিবে।

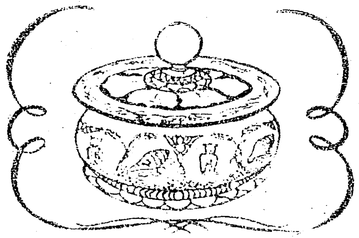

SYMBOL OF PERFECTION
KJW

কুণ্ড জুয়েলারী ওয়ার্কস

GRAMS KUNDJUEL

কার্য্যালয় : ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্ : সাউথ ১২৬

COLOUR PAPER

ভোজরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তেল ব্যবহার করুন

২৪৩ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা — ফোন: ২৭৭৪ বড়বাজার

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বড়দিনের আগেই বেরোবে

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি
নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের
অলিভার টুইষ্ট
ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—॥৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
দমাদম্ দামোদর
দাম ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
অয়েল পেণ্টিং
দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত
কল্‌কাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ঃ ঃ ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা ২৫।

এবার পূজায় ছেলেমেয়েদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার

অঞ্জলি

- কবিতা
- গল্প
- উপন্যাস
- আমোদ প্রমোদ
- খেলাধূলা
- রংবেরঙের ছবি

বিরাট ঝকঝকে বই!
ছোটদের আনন্দের খনি!

পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

দেব সাহিত্য কুটীর ★ ২২/৫ বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"

(গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

আট রকম বইএর নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, বাকি বইগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

১। হারান বই—(নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)
২। নিঝুম রাতের কান্না—(বিমল দত্ত)
৩। রাতের আতঙ্ক—(নীহাররঞ্জন গুপ্ত)
৪। স্বর্গের সিঁড়ি—(সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)
৫। কুকুউটের ছোবল—সুনির্ম্মল বসু
৬। অভিশপ্ত ম্যামী—(নীরদচন্দ্র মজুমদার)
৭। বিভীষণের জাগরণ—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

প্রত্যেকখানি বারো আনা

"প্রহেলিকা সিরিজ"

(ডিটেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চার)

ফাল্গুন মাস—**রক্তভৃষা**—অনলকুমার চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র—**নকলের হিমালয়**—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বৈশাখ—**বি, এল, এ-২০৫**—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো
জ্যৈষ্ঠ—**জয়-পরাজয়**—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
আষাঢ়—**পূজনীয় দস্যু**—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রাবণ—**দুর্যোগের রাতে**—শ্রীসব্যসাচি

প্রত্যেকখানি দাম এক টাকা

বিরাট সচিত্র গ্রন্থ—১৫৪ পৃষ্ঠা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—(আট খানা হাফটোন ছবি)

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

এক মাসের মধ্যে বই নিঃশেষ হওয়ায়

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

চমকপ্রদ অন্তর্দ্ধান কাহিনী পরিপূর্ণ মূল্য ১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর ✱ ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি। দাম এক টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বড়দিনের আগেই বেরোবে

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি
নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের
অলিভার টুইষ্ট
ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—৷৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
দমাদম্ দামোদর
দাম ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
অয়েল পেণ্টিং
দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

কল্‌কাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ঃঃ ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫।

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"

(গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

আট রকম বইএর নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, বাকি বইগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

১। **হারান বই**—(নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)
২। **নিঝুম রাতের কান্না**—(বিমল দত্ত)
৩। **রাতের আতঙ্ক**—(নীহাররঞ্জন গুপ্ত)
৪। **স্বর্গের সিঁড়ি**—(সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)
৫। **কৈউটের ছোবল**—সুনির্ম্মল বসু
৬। **অভিশপ্ত ম্যামী**—(নীরদচন্দ্র মজুমদার)
৭। **বিভীষণের জাগরণ**—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

প্রত্যেকখানি বারো আনা

"প্রহেলিকা সিরিজ"

(ডিটেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চার)

ফাল্গুন মাস—**রক্তভৃষা**—অনলকুমার চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র—**নকলের হিমালয়**—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বৈশাখ—**বি, এল, এ-২০৫**—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো
জ্যৈষ্ঠ—**জয়-পরাজয়**—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
আষাঢ়—**পূজনীয় দস্যু**—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রাবণ—**দুর্যোগের রাতে**—শ্রীসব্যসাচি

প্রত্যেকখানি দাম এক টাকা

বিরাট সচিত্র গ্রন্থ—১৫৪ পৃষ্ঠা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—(আট খানা হাফটোন ছবি)

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

এক মাসের মধ্যে বই নিঃশেষ হওয়ায়

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

চমকপ্রদ অন্তর্দ্ধান কাহিনী পরিপূর্ণ মূল্য ১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর ✱ ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি। দাম এক টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৯শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৫৩ | ৯ম সংখ্যা

হেমন্তের ডাক

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমন্ত আজ ডাক্‌ল আমায়
গাঁদা ফুলের দেশে—
মেঘ হারানো নীল গগনে
মন গেল মোর ভেসে।
পাতা ঝরার করুণ গানে
কি সুর আমার জাগ্‌ল প্রাণে,
কোন্ অলখের নিবিড় টানে
যাই রে নিরুদ্দেশে—
সর্ষে ক্ষেতের পারে পারে
বিজন মাঠের শেষে।

মনে আমার পড়ছে রে এক
নিঝুম রাতের বেলা
রূপোর আলোয় কার সাথে ভাই
করেছিলাম খেলা!
তার হাসি আজ উপছে পড়ে
সোনা ঢালা মাটির পরে,
ভেসে এলো তারি তরে
হিমেল হাওয়ার ভেলা;
মনে তারে পড়ল আবার
শীতের দুপুর বেলা।

দেখে যেন সেখানে মেলা বসে গেছে। কত লোক, কত মানুষ! রঙিন নিশানে নিশানে আকাশ দেখা যায় না। দোতালার ওপর চমৎকার গোরার বাজনা বাজছে।

জাহাজ দেখা যেতেই এদিক্ থেকে লোকেরা রুমাল ওড়ায়, টুপি নাড়ে, আনন্দের ধ্বনি করে,—ওরাও উত্তর দেয় সমানে।

জাহাজ ঘাটে লাগতে এক একজন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে আর ভিড়ের মধ্যে টুপ করে ডুবে যায়। তাকে সকলে মিলে বুকে জড়িয়ে ধরে, কোলাকুলি করে, কাড়াকাড়ি করে। কিন্তু নন্দ কই, তাকে ত' দেখা যায় না! দুর্ভাবনায় মার কপাল কুঁচকে যায়। তা হ'লে কি এত দিন এত আশা করে শেষে নিরাশ হতে হবে!

মিনি হঠাৎ ভয়ে চীৎকার করে ওঠে। এক বিশালকায় সৈনিক তাকে গাল টিপে আদর করলে—গালে রক্ত জমে লাল। মাথার টুপি খুলে সে হাসতে দেখে আরে এ যে নন্দদুলাল! মিনির চোখে জল, কিন্তু হাসছে এবারে খুসিতে।

কী ভয়ংকর বিশাল চেহারা হয়েছে নন্দর! লম্বা আগে ত' ছিলই, এখন চওড়াতে বেড়েছে মানুষের শরীরে যতখানি ধরে ততখানি। দু'দিকের বুকের পাটা খোলা কবাটের মত জামার ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে। শরীরের পেশীগুলি আমের আঁটির মতন চারিদিকে ফুলে ফুলে উঠেছে।

রতনের বুকে এক ধাক্কা দিয়ে আদর করলে, মনে হ'ল হাড়গুলি তার গুঁড়িয়ে ভেংগে চুর হয়ে গেল যেন! আর চটপটে বিলু হ্যাণ্ডশেখ করবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু হাতে হাত মিলতেই লাউডগার মত নেতিয়ে মাটিতে বসে পড়ে তখুনি। এমন ভংগী করে যেন পক্ষাঘাত ধরে গেছে হাতে। সকলে মনে মনে তারিফ করে, হ্যাঁ, লড়াই করতে হ'লে এমনি চেহারা ও শক্তি হওয়া চাই বটে।

বাড়ি ফিরে নন্দ দিন কতক সাজ-পোষাক করে কোমরের খাপে পিস্তল নিয়ে সকালে, দুপুরে, বিকালে বেরিয়ে যায়, কখন ফেরে কিছু ঠিক থাকে না। সারা কলকাতা শহরটি চষে বেড়ায় আর হোটেলে বসে বসে খায়। এরপর আবার কিছুদিন একেবারেই বেরোয় না। হয় নিজের ঘরে নানারকম ভয়ংকর শব্দ করে ইংরিজি গান গায়— যার কথার মানে বুঝতে পারা যায় না, ... কোন গল্পের বই হাতে নিয়ে এ ঘর ও ঘর ছাদে ... করে ঘুরে বেড়ায়। সামনে ছোট ছেলেমেয়ে ... তাদের দেহের নানা জায়গায় আদরের চড়, চাপড়, ... গাঁট্টা, চিমটির নানা কসরৎ লাগিয়ে দেয়।

একটি জিনিসে কিন্তু ওর ব্যবহার বড়ই অদ্ভুত ঠেকে। ওদের বাড়ির পাশে প্রকাণ্ড এক কাঠগোলা নতুন হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে গোলাটি বেশ ফেঁপে ফুলে উঠেছে। সেখানে বিজলীর করাত দিয়ে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি চেরা হয়। যখনই করাত চলতে সুরু করে বা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় সুইচ্—সুই করে এক ভীষণ কান ফাটানো শব্দ হয়।

সকলের শুনে শুনে এখন অভ্যাস হয়ে গেছে ... মনেই লাগে না কিছু। কিন্তু নন্দ? যত বার ঐ শব্দ হবে সকালে, দুপুরে, বিকালে, যেখানেই থাকুক সে, সড়াৎ করে উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়বে! খাটের তলা ... টেবিলের নীচে হলে ত' ভালই হয়! একেবারে সাষ্টাংগ প্রণাম।

যুদ্ধে দুর্দান্ত বোমার জন্যে নাকি আত্মরক্ষার এ... অভ্যাসটি ওদের এত বেশী করতে হয়েছে যে ভুলে যাওয়া শক্ত। শুয়ে পড়ুক তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু ঐ করাতের আওয়াজে ওর মুখ কেন অমন ফ্যাকাশে মেরে যায় ... কেউ বুঝে উঠতে পারে না।

নন্দর সময় কাটানোর মুশ্‌কিল ও সারাদিনের ছটফটানি দেখে মা বলেন,—একটু আধটু ঘর-সংসারের কাজকর্ম করলে ত' পারিস বাবা! এই ধর না, বিলটু রোজ বাজারে যায়, ওর সংগে যদি একবার করে যাস ত' জিনিসপত্র ঘরে ভাল আসবে আর ওর চুরিটাও বন্ধ হয়ে যাবে।

নন্দ রাজী। পরের দিন কাগজ পেন্‌সিল নিয়ে মার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়।

—বল কি কি আনতে হবে, কত কত?

—গেরস্তর বাজার দেখে-শুনে হিসেব করে নিয়ে আসবি গুছিয়ে, এর আর বলার আছে কি? হিসেব করে আনাটাই ত' আসল, ফর্দ নিয়ে ত' সকলেই পারে।

মনে হ'ল মা ছেলের বুদ্ধির দৌড়টি একবার দেখে নিতে চান। নন্দ বাজার যায়। বিলটু বাজারের ধামা ... ...র ঝাঁপি নিয়ে মুখ ভার করে পিছনে চলে। ...বেশ বাজার করছিল সে, অন্যের এই খবরদারি ... এতটুকু ভাল লাগে না, এবং বেশ কিছু লোকসানও।

...র বাজারে ঢোকা থেকে বেরুনো পর্যন্ত সে এক ...ল ব্যাপার। আমাদের সেদিন আর ভাল করে ...ার করাই হ'ল না এদের মজার কাণ্ডকারখানা দেখতে ...তে আর হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে।

আসলে হয়েছে কি, এত দিন একমনে যুদ্ধ করতে ...তে নন্দ বাঙলা দেশের আচার-ব্যবহার—বিশেষ করে ...কাতার সব কায়দা-কানুন অনেক ভুলে গেছে। এবং ...গেও নিজের খেলাধুলা প্রভৃতি নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকতো ... এসব বিষয়ের বিশেষ ধার ধারতো না।

...আলুর দোকানের হাঁক শুনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে ...ন,—ঐ বড় বড় নৈনিতাল কত করে শ'? কুমড়ো ...নতে গিয়ে বলে, ডজনের কি দাম পড়বে হে? কুণ্ডলী ...কানো পুঁইশাকের স্তূপের দিকে আঙুল দেখিয়ে দর ...র,—কত করে গজ দেবে ঠিক ঠিক বল।

...পুঁই শাক কত করে ইঞ্চি, ফুট বা গজ—শুনেছ কেউ ...ন কথা সারা পৃথিবীতে? দোকানীরা অবাক হয়ে ...র দিকে চেয়ে থাকে, ভাবে এত দিনে আজব দেশের ...টি কলকাতায় এসে পৌছাল বুঝি!

অন্য লোকদের একটি দল এদের সংগে ঘুরে ঘুরে ...র করা দেখে আর নিজেদের হিসাব মত বাজার ...তে ভুলে যায়। তাদের চোখ ঠারাঠারি, ইসারা, ইংগিত ...বেদম চাপা হাসির আর শেষ হয় না। কিন্তু নন্দর ...ন ভ্রূক্ষেপ নেই, সে সম্পূর্ণ নিবিকার। ওর এই এক ...পার। যখন যে কাজ করে এমন মন দিয়ে করবে যে ...দিকে বা চারপাশে কিছু নজর থাকে না এতটুকুও। ...টুর মেজাজ খারাপ ও গজগজানি তার চোখে পড়লো ... কানেও গেল না।

...বাজার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে মা ঘরে বাইরে ...টান করছিলেন। রান্নার সময় বয়ে যায়, এদিকে ...দের আপিস যাবার তাড়া আছে। হঠাৎ পথের ...ক চোখ পড়তে চমকে ওঠেন।

নন্দ বাড়ি ফিরে আসছে। নন্দর দু'হাতে ভরা জিনিষ, ...নে বিলটুর ধামা ভর্তি, এবং তার পিছনে দু'টি মুটিয়ার ঝাঁকায় যেন উপচে পড়ছে! সমস্ত বাজারটা লুটে আনলে নাকি! এত কাঁচা শাকসব্জি হবে কি! এ যে বিয়ের বাজার!

টাকা ফেরত চাইতে জানা গেল কিছুই ফেরে নি টাকা-পয়সা বরং কতকগুলি দোকানে ধার হয়েছে—বিলটুর সব জানা দোকানদার যে! মা নিজের দু'টি কান ছুঁয়ে যোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বলেন,—ঘাট হয়েছে আমার, আর যদি কোনদিন বাজার করতে বলি!

বাজার করতে না পারুক নন্দর যে উপস্থিত বুদ্ধি আছে এবং তা বিপদ্ আপদে কাজে লাগতে পারে, এ কথা প্রমাণ হয়ে গেল কয়েকদিন পরের একটি ঘটনা থেকে।

সেদিন দুপুরে সে বিছানায় শুয়ে গল্পের বই পড়ছে। শুয়ে থাকলেও তার সৈনিকের হালকা পোষাক পরা—এমন কি জুতোমোজা শুদ্ধ। নন্দর ঐ এক মজা। সব সময়ে সেজেগুজে সব সময়ে তৈরি, যেন হঠাৎ দরকার তাকে সদাসর্বদা ডাকছে। বাড়িটি নিঝুম, পাড়াও নিঝুম। বড়রা যে যাঁর কাজে গেছেন, ছোটরা ইস্কুলে।

রতনদের বাড়ি থেকে একটা সোরগোল উঠলো, গোলমাল ও চীৎকারের মধ্যে শোনা গেল—আগুন আগুন! বাড়ির লোকেরা সজাগ হয়ে ভাল করে শোনবার বা বোঝবার আগেই নন্দ তিন লাফে সিঁড়ি পেরিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

কিছু বলা নেই কওয়া নেই, সোজা রতনদের ওপরে উঠে যায়। দেখে একটি ঘরের সামনে ভয়-পাওয়া মানুষদের অস্থির ভিড়, আর ঘরের মধ্যে বিপুল ধোঁয়ার মধ্যে রতনের বৌদি এদিক ওদিক্ ছুটে বেড়াচ্ছেন—শাড়ির আগুন জলছে দাউ দাউ।

ভিড়ের মানুষরা কিছু করছে না, ভাবতেও পারছে না—শুধু দরজা যুড়ে ভয়ের বিকট চীৎকার করছে—আগুন আগুন! একটি ষ্টোভ ফেটে গিয়ে এই দুর্ঘটনা হয়েছে।

নন্দ তার বলিষ্ঠ দু'হাতে লোকেদের ধাক্কা মেরে দরজার সামনে থেকে সরিয়ে দেয়, একটি বন্ধ জানলা ফটাস করে খুলে দেয়, তারপর ঘরের কোণে রাখা এক কম্বল নিয়ে বৌদির শরীরে জড়িয়ে জোর করে মাটিতে শুইয়ে দিল।

শুধু শুইয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হ'ল না, ধাক্কা মেরে মেরে গড়াগড়ি খাওয়ায় এদিক্ থেকে ওদিক্ বার বার।

আশ্চর্য ! আগুন নিভে গেল, ধোঁয়াও গেল কত কমে অল্প সময়ের মধ্যে ! এতক্ষণে আত্মীয়দের বুদ্ধি— মানে দুর্বুদ্ধি খুলেছে। কয়েকজন কয়েক বালতি জল নিয়ে এসেছে ওপরে আগুন নিভাতে।

নন্দ তাদের হাত থেকে বালতি কেড়ে নিয়ে সমস্ত জল ফেলে দিল ; ধমকে বারণ করে দেয় যেন এক ফোঁটা জল ওর গায়ে না দেওয়া হয়। তারপর সিঁড়ি দিয়ে দুড়দুড় করে নামতে নামতে বলে গেল যে ডাক্তার আনতে যাচ্ছে। বৌদি তখন ভয়ে ও যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

ডাক্তার নিয়েই বেধে গেল আসল হাংগামা। পাড়ার ডাক্তার শশীবাবু রোগাসোগা এতটুকু মানুষ, মেজাজ ভারি খিটখিটে তবে চিকিৎসা ভালই করেন। শশীবাবু তখন সবেমাত্র খেয়ে একটু বিশ্রাম করছেন। চাকর বলে দেয় বাবু ঘুমাচ্ছেন—বিকালে চারটার সময় আসবেন, দেখা হবে।

কোন্ ঘরে ঘুমাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করে নিয়ে নন্দ সে… দৌড়ে যায়, চাকর হা হা করে পিছনে ছুটে আসে।

শশীবাবু সব শুনে বিরক্তভাবে বলেন,—আচ্ছা, তু… যাও, আমি আসছি আধঘণ্টা পরে জামা-কাপড় পরে… অজ্ঞান হয়েছে বলে ভাববার কিছু নেই, ওরকম কত… কিছু পরে আবার আপনি জ্ঞান ফিরে আসবে।

নন্দ মিনতি করে তখুনি আসতে অনুরোধ জান… আবার, এবং তার ফলে শশীবাবু এমন করলেন… নন্দকে খুন করে ফেলবেন। এরপরে যা ঘটলো… সভ্য পৃথিবীতে আর কোথাও ঘটেছে বলে জানা যায় নি…

একটু পরে দেখা গেল নন্দ লম্বা পা ফেলে ছুটে চলে… রতনদের বাড়ির দিকে।

কাঁধের ওপর শশীবাবু সশরীরে, পা ছুড়ছেন… নন্দর চুল ধরে টানছেন—যে বেশে ও যে অবস্থায় ছিলে… সে ভাবেই। নন্দর বাঁ হাতে শক্ত করে ধরা ডাক্তারি… ব্যাগ্।

এখন বল ত' শ্রীহনুমানজীর গন্ধমাদন পাহাড় উপ… আনার কথাটি চট্ করে মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবি… কিনা ?

(ক্রমশঃ)

গাছপালার গল্প

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

বিপুলতার একটা আকর্ষণ আছে ; বিরাট জিনিষের নাম শুনলে সকলেরি ইচ্ছে হয় তার সম্বন্ধে জানবার। সব থেকে বড় জলপ্রপাত, সব চেয়ে উঁচু পাহাড়, সবার চাইতে বড়, গভীর সাগরের কথা সবাই জানতে চায়। কিন্তু উদ্ভিদের আকার ও আকৃতি এত বিরাট ও বিভিন্ন রকমের হওয়া সত্ত্বেও মানুষের দৃষ্টিকে সে রকম অকর্ষণ করে নি। একদিকে যেমন রয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, ফল, ফুল ইত্যাদি, তেমনি অন্য দিকে রয়েছে অতিক্ষুদ্র ছাতা, শৈবাল ও অদৃশ্য বীজাণু। বীজাণুদের মধ্যে অনেকে এত ছোট যে ৫০,০০০টিকে পাশাপাশি সাজালেও লম্বায় এক ইঞ্চির বেশী হবে না।

বড় গাছের মধ্যে বট গাছের নাম আগে করা যেতে পারে। বাংলা দেশের যেখানে সেখানে এদের দে… যায়। শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনের বট গাছটি… হয় অনেকে দেখেছ। এটা প্রায় ৮৯ ফুট উঁচু এ… ৬০০০ ঝুরি আছে এর। এই ঝুরিগুলো বেশ মো… মোটা আর মাটিতে ভাল ভাবে আটকান। এই ঝু… গুলিই শিকড়ের কাজ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে… আসল গাছটা আর বেঁচে নেই,—১৯১৩ সনে ছাত… (ফাঙ্গাস্-এর) আক্রমণে আসল গাছটি মারা যায় কি… শাখা-প্রশাখাগুলো মোটা ঝুরির ওপর ভর করে, বি… স্থান অধিকার করে এখনও বেঁচে আছে।

আমেরিকার মেক্সিকো সহর থেকে আড়াই… মাইল দূরে একটি ঝাউ গাছ আছে, নাম তার ট্যাক্সডিয়া… …কোনেটাম্। গাছটির গুঁড়ির ব্যাস হচ্ছে ৫০ ফুট …ৎ প্রায় চারতলা বাড়ী যতখানি উঁচু। আর যদি

শিবপুর বটানিকাল্ গার্ডেনের বিরাট্ বটগাছ

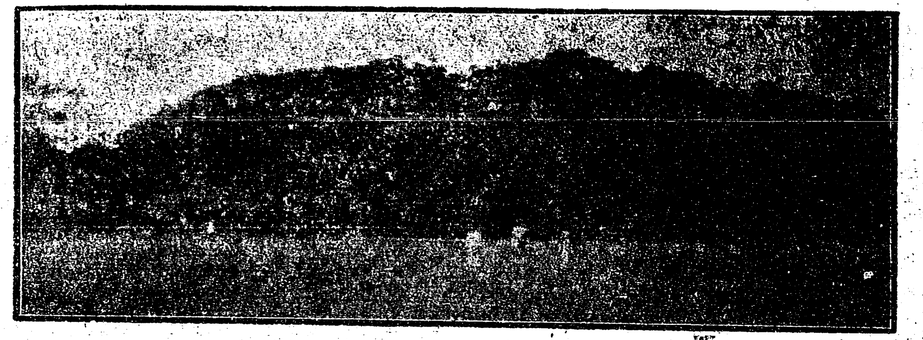

…জন মানুষ গাছটাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে তবে …জন আর একজনের আঙ্গুল কোন রকমে ছুঁতে পারে …।

…ছোট গাছ যা আমরা দেখি তার মধ্যে 'মস্' হচ্ছে খুব …ারণ। ভিজে জায়গায় এরা জন্মায়। বর্ষার সময়

তালকুঞ্জ

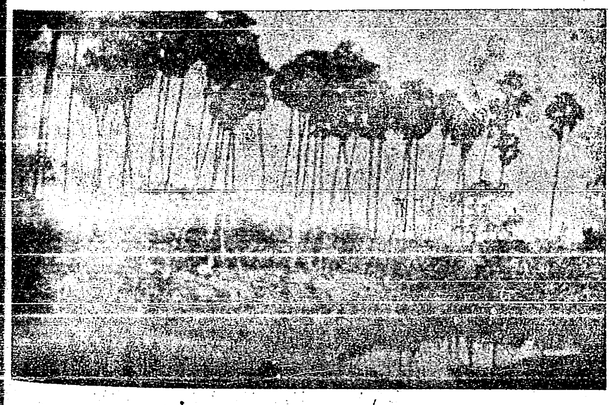

তালগাছ বাংলা দেশের একটি দীর্ঘকায় গাছ

…য় যেখানে সেখানে দেখা যায়। ছোট ছোট ডাল …র তার ওপর আরো ছোট ঘন সবুজ পাতা। মস্ হচ্ছে …ই জাতীয় গাছ যাদের ফুল হয় না। কিন্তু যে সব …ছের ফুল হয় তাদের মধ্যে খুদি পানা হচ্ছে সব চেয়ে ছোট। আকারে প্রায় একটা সরষের মত। এদের কোন শিকড়ের চিহ্ন নেই, আর ফুলগুলো এত ছোট্ট যে লেন্স-এর সাহায্য ছাড়া দেখাই যায় না। বীজাণু, মস্ ও খুদি-পানা ছাড়াও অনেক ছোট উদ্ভিদ্ আছে। এদের মধ্যে এক একটা এত ছোট যে লম্বায় এক ইঞ্চির তিন চার হাজার ভাগের এক ভাগের বেশী নয়। এরা হচ্ছে ক্ষুদে ক্ষুদে শৈবাল আর ছাতা।

ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এর আর এক নাম হচ্ছে 'আমাজানের পদ্ম'। কারণ আমাজান নদীতেই এদের প্রথম দেখা যায়। এর পরিচয় পাতাতে, তবে এর ফুলটাও বড় কম নয়। ফুলটা সম্পূর্ণ ফুটলে তার ব্যাস ৮ থেকে ১৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। ফুলগুলোর গন্ধও ভারি চমৎকার, অনেকটা আনারসের মতন। ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার পাতা এত বড় যে তার মধ্যে একজন মানুষ শুয়ে থাকতে পারে। প্রায় ছ'-সাত ফুট হয় তার ব্যাস। পাতার আকৃতি অনেকটা থালার মতন আর তার কানাটা দু'-ইঞ্চি উঁচু। পাতাটা শুধু বড় নয়, তার বাড়বার শক্তিও কম নয়। ভাল অবস্থায় ঘণ্টায় এক ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়তে পারে।

ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার চাইতেও এক অদ্ভুত গাছ আছে। তাদের পাওয়া যায় সুমাত্রা দ্বীপে, নাম হচ্ছে র‍্যাফ্লেসিয়া মিউডি। অন্য উদ্ভিদের ওপর এরা জন্মায় এবং তার দেহ থেকে রস আহরণ করে। এদের কোন পাতা নেই

এবং ডালপালার পরিবর্ত্তে আছে সরু সুতোর মতন কতকগুলি অংশ। এই অংশগুলি অন্য গাছের ডালে প্রবেশ করে এবং এরই সাহায্যে অন্য গাছ থেকে র‍্যাফ্‌লেসিয়া খাবার আহরণ করে। এর ফুল হচ্ছে এক অদ্ভুত জিনিষ; ফিকে লাল রংএর পাপড়ির ওপর চাঁপা রংএর ছোট ছোট বিন্দু। ফুলগুলোর ব্যাস হচ্ছে প্রায় দু' হাত আর ওজন ৭ সেরেরও বেশী। এর গন্ধ কিন্তু ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার বিপরীত—মোটেই ভাল নয়। এমনই দুর্গন্ধ যে মাছি ছাড়া আর কোন জীবই তার কাছে আসতে ভালবাসে না।

এই তো গেল গাছেদের চেহারার কথা। এখন বলি দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে। আমাদের এখানে নারকেল খুব লম্বা গাছ। আর তাল গাছেরও সুনাম আছে যে সে "সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে।" ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছ,—যার [illegible] থেকে ইউক্যালিপ্‌টাস্ গন্ধ তেল তৈরী হয় প্রায় ৩০০ [illegible] উঁচু হয়। আজকাল ভারতবর্ষে ইউক্যালিপটাস গাছ [illegible] যায় কিন্তু এত লম্বা হয় না। এত বড় ইউক্যালিপটাস [illegible] খালি অষ্ট্রেলিয়াতেই হয়। এর চাইতেও বড় গাছ [illegible] গেছে ক্যালিফোর্নিয়াতে, এদের বলা হয় রেডউড গা[ছ।] ইওসেমাইট ন্যাশান্যাল পার্কে ২০০ ফুট'এর চেয়েও [illegible] একটি গাছ আছে, তার গুঁড়ির ব্যাস ৩০ ফুটের কা[ছা]কাছি। এর চেয়েও বড় গাছ দেখা গেছে হ্যাম[illegible] স্টেটের একটি পার্কে। এই পার্কটির নাম হচ্ছে রেডউ[ড] পার্ক, রেডউড গাছের নাম থেকে। এই গাছটি পৃথি[বীর] মধ্যে সব থেকে উঁচু গাছ, আর এর দৈর্ঘ্য ৩৬৪ ফুট অ[র্থাৎ] ৩০ তলা বাড়ীর সমান।

হর্ষবর্দ্ধনের কাব্য-চর্চ্চা

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

বাড়ীর দরজায় কে যে এক পাল ছাগল বেঁধে গেছল, তাদের চ্যা-ভ্যাঁয় পাড়াটা মাৎ। হর্ষবর্দ্ধন তখন থেকে উঠে পড়ে লেগেছেন, কিন্তু মনই মেলাতে পারছেন না তা' কবিতা মেলাবেন কী!

"দূর ছাই!" বিরক্ত হয়ে বলেছেন হর্ষবর্দ্ধন, "পাঁঠার সঙ্গে খালি পেটের মিল হতে পারে—কবিতার মিল হয় না। পাঁঠারা অপাঠ্য।"

আজই একটু আগে গোবরার হাতে তিনি মোটা খাতাটা দেখেছিলেন। চামড়ায় বাঁধানো চকচকে—অবিকল বইয়ের মতো। কৌতূহল প্রকাশ করায় গোবরা জানিয়েছিল—"এটা আমাদের কবিতার খাতা। আমরা কবিতা লিখব। পরে ছাপা হয়ে বই হয়ে বেরুবে। আমাদের কবিতার বই।"

"আমরা—মানে? আমরা কারা?" ভাইয়ের কথায় দাদা একটু ঘাবড়েই গেছেন।

"আমরা অর্থাৎ, তুমি আর আমি। আবার কে?" গোবরা ব্যক্ত করেছে।

"আমি! আমি লিখব কবিতা! কেন, কী দুঃখে?" হর্ষবর্দ্ধন আকাশ থেকে পড়েছেন: "আমাদের কা[ঠের] কারবার বেঁচে থাক্। কবিতা লিখতে যাবো কি[সের] দুঃখে?"

"চিরটা কাল তো আকাঠ হয়েই কাটালে। কে[ন,] কবি হওয়াটা কী খারাপ?"

"ধুত্তোর কবি! কী পাপ করেছি যে আমায় কবি[তা লিখ]তে হবে! হর্ষবর্দ্ধনের কভি-নেহি মেজাজ।"

"কেন, পাপ কিসের!" গোবরা জবাব দিয়েছে। "কবিতা লেখা কি পাপ? ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদা[স,] কৃত্তিবাস, ওমর—ওমর—" বল্‌তে বল্‌তে গোবরার কো[থায়] যেন আট্‌কে যায়।

"দূর্ বোকা। ওমর নয়, অমর। জানি, ক[বিতা] লিখে এঁরা সবাই অমর। আমার জানা আছে।" [হর্ষ]বর্দ্ধন ভাইকে জানাতে দ্বিধা করেন না।

"অমর নয়, ওমর। আরেক জন নামজাদা কবি। তাঁর নামের সঙ্গে আরো দু' দু'টো খাবার জিনিস জড়া[নো] কিনা! খাবারগুলো আমার মনে আসছে না ছাই!"

"ওমরত্ব ছাড়াও দু'রকমের খাবার? ভালো খাবার [illegible] [খা]দ্যরস না হলেও হর্ষবর্দ্ধনের জিভে এক রকমের [illegible] [ক]রে।

"মনে পড়েছে। খই আর আম। ওমর খৈআম। [তু]মি কি বলতে চাও ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, কৃত্তিবাস [আর] আমাদের এই ওমর খৈয়াম—এঁরা সবাই কবিতা [লিখে] পাপ ক'রে গেছেন?"

"ওমর খৈয়াম আমি পড়ি নি। খই আমের মতো [ভা]লো হবে কি না বলতে পারব না।" হর্ষবর্দ্ধন আসল [কথা]র পাশ কাটিয়ে যান।

"আমি পড়েচি। দই চিঁড়ের চেয়েও ভালো।" গোবরা [নিজে]র অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে।—"ঢের উপাদেয়।"

"তা ভালো হতে পারে। কিন্তু কবিতা লেখা ভারী [শক্ত]। মেলাতে হয়। কবিতা মেলাতেই অনেকের প্রাণ [যা]য়। ওমরের কথা জানি না, আর সবাই মর মর।"

"কিছু শক্ত না। তুমি এই ভূমিকাটা পড়ে দ্যাখো। [এ]ক আস্ত লেখকের লেখা। লোকটাকে হয়তো [আস্ত লেখক]ও বলা যায়। হ্যাঁ, রীতিমতো টাকা দিয়ে লেখাতে [হয়ে]ছে—নগদ এক কুড়ি টাকা। বইটা লেখবার আগেই [বই]য়ের ভূমিকাটা লিখিয়ে রাখলুম। কাজ এগিয়ে [রই]লো।"

মোটা খাতাটার গোড়াতেই একটা গোটা প্রবন্ধ—[শ্রীমা]ন্ এক আস্ত লেখকের লেখা ছোট্ট এক ভূমিকা—[ভূমি]কাটার মাথায় বিশদ ক'রে জানানো—"কবিতা লেখা [মো]টেই কঠিন না।" হর্ষবর্দ্ধন ভূমিকার মাথাটা পড়েন, [কিন্তু] মোটেই তার ভেতরে মাথা গলান না। এমনিতেই [তিনি] মাথা নাড়েন—"না, শক্ত না! খুব শক্ত। এ কি, [তুমি ভে]বেছ কাঠ যে হাটে গেলেই মিলে যায়? এ হোলো কবিতা। [মেলা]বে দেখি কবিতার সঙ্গে? খবিতা, গবিতা, ঘবিতা, [ঙ]বিতা, চবিতা, ছবিতা, জবিতা—মায় ইস্তক্ হবিতা পর্য্যন্ত [খুঁজলেও] মেলে না। কবিতা লেখা কি সহজ রে বাপ্! [ব্যাপারই] হোলো আর কি!"

"এই আস্ত লেখকটা তা হলে আস্ত গুল ঝেড়েচে, এই [তুমি] বলতে চাও?"

"আলবৎ! কবিতা মেলাতে হয়—নইলে কবিতাই [হয়] না। আর মেলানো ভারী শক্ত। দু'রকমের মেলা [আ]ছে, রথের মেলা আর কবিতার মেলা—কিন্তু দু'টো মেলা একেবারে আলাদা রকমের। রথের মেলা ঠিক সময়ে আপনিই মেলে, কিন্তু কবিতা মেলায় কার সাধ্যি! তোর লেখক গুল্ না ঝাড়তে পারে, কিন্তু ভুল ক'রে দু'টো মেলায় গুলিয়ে ফেলেচে ব'লে বোধ হচ্ছে।"

"জানি জানি।" গোবরা ঘাড় নাড়ে: "মিলও তোমার দু'রকমের। কবিতার মিল, আবার কাপড়ের মিল্। কিন্তু মিল্ ছাড়াও যেমন কাপড় হতে পারে, ধরো যেমন তাঁতের কাপড়, তেমনি তোমার বিনা মিলেও কবিতা বানানো যায়। পড়ে দ্যাখো না ভূমিকাটা।"

"আচ্ছা, যা তুই। ঘণ্টাখানেক পরে আসিস্। আমি তোকে এমন একটা লম্বা কবিতা বানিয়ে দেব যে তোর তাক্ লেগে যাবে। পারিস্ তো কোনো কাগজে কিছু টাকা দিয়ে তোর নাম দিয়ে ছাপিয়ে দিস্। তোর নামে উইল্ ক'রে দিলাম।"

এই ব'লে শ্রীমান্ ভ্রাতৃরত্নকে ভাগিয়ে দিয়ে 'আমাদের কবিতার খাতা' নামক মরোক্কো চামড়ার বাঁধাই মোটা খাতাটাকে নিয়ে তিনি পড়েছেন। লাইন দুয়েকের কবিতা দেখতে না দেখতেই তাঁর এসে গেছে—পলায়মান তাদের ধ'রে পাকড়ে খাতার পাতায় তিনি পেড়ে ফেলেচেন। লাইন্ দু'টি এই,

মুখখানা থ্যাব্ড়া।
নাম তার গোবরা॥

কিন্তু এই দু'ছত্রের পরে আর এক ছত্রও তাঁর নিজের বা কলমের মাথায় আস্‌ছে না। বাড়ীর তলায় ছাগলদের সমবেত ঐকতান—সেই ছাগলাদ্য সঙ্গীত-সুরধুনী ভেদ করে কাব্য-সরস্বতীর সাধ্য কি যে তাঁর খাতার দিকে পা বাড়ায়! অগত্যা, বিতাড়িত হয়ে তিনি ভূমিকাটা নিয়ে পড়েছেন—তার মধ্যে যদি গোবরা-কথিত কবিতা-লেখার সত্যি কোনো সহজ উপায় থাকে।

ভূমিকাটার আরম্ভ এই:

"তোমাদের নিশ্চয় কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তোমরা হয়তো ভেবেছো ওটা খুব শক্ত কাজ। মোটেই তা নয়। কবিতা লেখার মত সহজ কিছুই নেই। নাটক, গল্প, প্রবন্ধ—এ সব খুব কষ্ট ক'রে লিখতে হয়, কিন্তু কষ্ট ক'রে একটি জিনিস লেখা যায় না, তা হচ্ছে কবিতা।

খুব সহজে ও আসবে, নয়তো কিছুতেই ও আসবে না। সহজ না হলে কবিতাই হোলো না।"

এই অবধি পড়ে হর্ষবর্দ্ধন আপন মনে বলতে থাকেন—"আরে, আমিও তো ঠিক সেই কথাই বল্‌ছি। কষ্ট ক'রে কখনই কবিতা লেখা যায় না। আর ছাখো তো এই গোবরার কাণ্ড! আমার ঘাড়ে ইয়া মোটা একটা জাব্‌দা খাতা চাপিয়ে গেছে—আর আমি অনর্থক কষ্ট ক'রে মরছি। যতো সব অনাসৃষ্টি! দ্যাখো না?"

হর্ষবর্দ্ধন আবার ভূমিকার মধ্যে আরেকটু অগ্রসর হন—

"নির্ম্মল জলে যেমন আকাশের ছায়া পড়ে, তেমনি মানুষের মনে কবিতার মায়া লাগে। মনের সেই আকাশকে রঙে রেখায় ধরে রাখলেই হয় ছবি, আর কথায় বাঁধলেই হয় কবিতা। তোমাদের মনে যখন যে ভাব জাগে তাকে যদি ভাষায় জাহির করতে পারো তাই হবে কবিতা—যেটা যতো ভালো প্রকাশ হবে, কবিতাও হবে ততো চমৎকার।"

অতঃপর হর্ষবর্দ্ধন নিজের মনের মধ্যে হাতড়াতে সুরু করেন কিন্তু যতই হাতান্ কোথাও নিজের মনের আকাশের নাগাল পান না—সমস্তই তাঁর শূন্য ব'লে মনে হ'তে থাকে।

অবশেষে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন—কই, আমার মনে আকাশ কই! আগাগোড়াই ফাঁকা—বেমালুম ফ্যাকাশে! তা হ'লে আর আমি কি করে কবি হবো!

ভূমিকায় আরো ছিল:

"শরীরের যেমন ব্যায়াম দরকার, যেমন বই পড়া আবশ্যক, তেমনি প্রয়োজন কবিতা লেখার। বই পড়লে—চিন্তা করলে হয় মস্তিষ্কের ব্যায়াম, কবিতা-চর্চ্চায় মনের। যত ভাবের ভাণ্ডার হবে, মন হবে ততই বড়—ততই অগাধ। কবির মন খুব গভীর মন—এমন কি, ব্যর্থ কবিরও। কি ক'রে কবি হওয়া যায়? বল্‌বো? মনে ভাব এলেই লিখে ফেল। তা হলে, সেই প্রয়াসের দ্বারাই ঘুরে ফিরে সেই ভাব তোমার চেতনা বা অবচেতনার মধ্যে গিয়ে জমা হয়ে থাকবে। জিনিষটাকে তুমি সত্যি ক'রে পেলে। ভাবরা হচ্ছে মৌমাছির মতো, যদি উড়ে যেতে দিলে তো খানিক গুণ্ গুণ করেই ও চলে গেল—আর কখনো ফিরে না আসতেও পারে। কিন্তু রূপগুণের মধ্যে—ভাষার মৌচাকে যদি ওকে ধর্‌তে তা হলে মধু না দিয়ে ও যাবে না। সেই মধুই আসল। এবং তোমার সেই মনের মধু যখন পাঠ মনকেও মধুময় করতে পারে তখনই তোমার কবিতা ওঠে মধুর। তখনই তার সার্থকতা।

"কবিতার আসল কথা হচ্ছে তা কবিতা হওয়া চা ছন্দ, মিল ইত্যাদি না হলেও তার চলে। ছন্দ আপনিই এসে যায়, মিল যদি অম্‌নি পাও, বহুৎ আ কিন্তু ও না হলেও কবিতার কোনো হানি হয় আকাশের সঙ্গে বাতাস বেশ মিল খায়, কিন্তু আকা সঙ্গে পৃথিবীর কোথাও মিল নেই। অথচ আকাশ পৃথিবী মিলে চমৎকার একটা কবিতা।"

ভূমিকাটা, দু'য়েকটা উদাহরণের পরে, এই ভাবে পরিশেষে পৌছে হর্ষবর্দ্ধন মুখ ব্যাকান্: "জানি জানি এ সবই আমার জানা। তুমি আর নতুন কথা কী শেখাবে বাপু! তোমার চেয়ে ঢের ভালো আমি লিখে দিতে পারি! আরে বাপু, কে না জা 'শ্রীবৎস' লিখলেই 'ব্রীভৎস' দিয়ে মেলাতে হয়। খোকা' আনলেই অম্‌নি 'ছারপোকা'কে আমদানি হবে। 'গাড়ী ভাড়া' করলে 'ভারী তাড়' না হয়ে যায় না। সবাই জানে, তুমি আর বেশী কি বল কিন্তু এক পাল ছাগল আর তাদের কান ফাটানো ভ্যার সঙ্গে যদি মেলাতে পারতে তা হলে জানতুম হ্যাঁ, তুমি একজন আস্ত জাত কবি। এমন কি তোমা আমি কবি অমর মুড়ি-কাঁঠাল ব'লে মানতেও রা ছিলাম।"

গোবরা এসে এতক্ষণ পরে উঁকি মারে—"কী দাদা কদ্দূর? বেরুলো তোমার কবিতা?"

"হয়েছে। খানিকটা হয়েছে। দু'ছত্তর তোর বইয়ে উপর গজিয়েছে—আর দু'ছত্তর আমার মাথায় গজা করছে, এখনো খাতায় ছাড়ি নি।"

"দেখি তোমার কবিতা?" গোবরা দাদার কাব্য-গর শুনতে উৎসুক।

কিন্তু খাতার দু'লাইন্—'মুখখানা থ্যাব্‌ড়া, নাম গোব্‌রা' দেখেই—নিজের মুখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে

লা যায় না—গোবরার মুখ কবিতার আরেকটা মিল ওঠে—গোম্‌ড়া হয়ে ওঠে।

"নারে, এমনি কী অবাক্ হচ্ছিস্! আরো দু'লাইন্ —বল্‌ছি শোন্।" হর্ষবর্দ্ধন বাকী পংক্তিগুলিকেও ের দন্তপংক্তির সঙ্গে প্রকাশ ক'রে দেন—"বাকীটাও ন্ তবে—শুন্‌লে খুসিই হবি।...

তলায় এক পাল ছাগল।
আর উপরে তুই এক পাগল॥

এই চার লাইনেই আমার 'অমরত্বলাভ। আজকের মত এই যথেষ্ট। কেমন হয়েছে কবিতাটা? ওমর খৈয়ামের সমকক্ষ হয়তো হই নি, কিন্তু ওমর মুড়কি-জাম কি বলা যায় না আমায়?"

'ব্ল্যাক্ বিউটী'র ছেলেবেলা।

শ্রীসুনীতকুমার ঘোষ

ছেলেবেলার যে স্থানটি আজও স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে মার স্মৃতিতে, সে একটা সুন্দর, শ্যামল প্রসারিত মাঠ—খানে একটা স্বচ্ছ জলের পুকুর। ছায়াবহুল কতগুলো হেলে পড়েছে জলের উপর, আর জলের তলা থেকে ে উঠেছে জলজ গাছ আর জলপদ্মের বন। লতার া পেরিয়ে এক পাশে দেখা যেত একটা চষা জমি—এক পাশে পথের ধারে প্রভুর বাড়ীর সদর দরজাটা। ঠের মাথার দিক্‌টায় ছিল এক সার দেবদারু গাছ—আর াস্ত দিয়ে বয়ে চলছে একটা ঝিল্ এঁকে বেঁকে।...

যখন ছিলাম ছোট্টটি—মার দুধ খেতাম, ঘাস তখনো নি—তখন দিনের বেলায় ছুটতাম তার পাশে আর ের বেলায় ঘুমিয়ে পড়তাম তার গা ঘেঁসে। গরম লে তার সাথে পুকুর-পাড়ে গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়া-আবার ঠাণ্ডা পড়লে ঝোপের পাশে গরম ছাউনিটার ে থাকতাম বসে।

তারপর, যখন একটু বড় হ'লাম—ঘাস খেতে লাম—মা তখন আমাকে একলা রেখে সেই যে ের বেলায় চলে যেত কাজ করতে আর ফিরে আসত ন্ধ্যা হ'লে।

আমাদের দলে ছিল আমার চেয়ে বয়সে বড় া কয়েকটি বাচ্চা, কিন্তু ওদের এক একটা দেখতে প্রায় ধাড়ি ঘোড়ার মতো। ওদের সাথে দৌড়াতাম জা করতাম। মাঝে মাঝে পাল্লা দিয়ে লাফাতে াতে ঘুরতাম সমস্ত মাঠটা। কখনো কখনো খেলার মাত্রা যেত ছাড়িয়ে—লাফাতে লাফাতে আমরা পরস্পরে লাথালাথি—মারামারি করতাম।

একদিন যখন এ ভাবে খেলার মাত্রা ছাড়িয়ে গেল মা তখন আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বল্‌ল, "বাছা, তোমাকে দু'টো কথা বল্‌ব—মন দিয়ে শোন।...দেখ এখানে যে বাচ্চাগুলো আছে—খুবই ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু ওরা গাড়ি-টানা ঘোড়ার বাচ্চা, তাই আদপ-কায়দা শেখে নি। কিন্তু ভদ্র, শিক্ষিত ঘরে তোমার জন্ম হয়েছে; এই অঞ্চলে তোমার বাবার খুবই সুখ্যাতি ছিল এবং তোমার ঠাকুর্দ্দা নিউ-মার্কেট দৌড়ে দু' দু'বার বাজি জিতে পুরস্কার পেয়েছিলেন। আর তোমার ঠাকুরমার মত অমন মধুর স্বভাবের ঘোড়া আমি আর জীবনে দেখি নি। তারপর আমাকেও তুমি কারুর সাথে কোন দিন ঝগড়া করতে দেখ নি বোধ হয়।...তাই, তুমিও খারাপ ব্যবহার না শিখে শান্ত এবং সচ্চরিত্র হয়ে ওঠ—এ-ই আমি চাই। সমস্ত কাজই করবে অন্তরে একটা সদিচ্ছা নিয়ে—চলবার সময় চলবে দুল্‌কী তালে—কদমে কদমে পা ফেলে, আর খেলবার সময় ভুলেও কখনো লাফা-লাফি মারামারি করবে না।"

মার সেই কথাগুলো আমি আজও ভুলি নি। সে ছিল বুদ্ধিমতী—তার সম্বন্ধে প্রভুর ধারণাও ছিল খুব ভাল। মার নাম ছিল 'ডাচেস্'—কিন্তু প্রভু তাকে আদর করে ডাকতেন—'পেট্'।

আমাদের প্রভু সত্যি খুব ভাল লোক ছিলেন। আমা-

দের তিনি ভালো খেতে দিতেন—ভালো ঘরে থাকতে দিতেন আর নিজের ছেলেমেয়ের মত আদর করে বলতেন কত কথা! আমরা তাঁর খুবই অনুরক্ত ছিলাম, আর মা তাঁকে সত্যি খুব ভালবাসত। দরজার কাছে তাঁকে দেখতে পেলেই মা আনন্দে ডেকে উঠে ধীরে ধীরে তাঁর দিকে যেত এগিয়ে। তিনিও মার মাথায় সযত্নে হাত বুলিয়ে আদর করে বলতেন, "তারপর 'পেট্', তোমার 'ডার্কি' কেমন আছে?" আমার গায়ের রঙ্‌টা ছিল মিশ্‌মিশে কালো—তাই তিনি আমাকে ডাকতেন 'ডাকি' বলে। সমস্ত ঘোড়াই তাঁর কাছে আসত, কিন্তু মনে হয়, আমরাই ছিলাম তাঁর সব চাইতে আদুরে। 'ডিক্' বলে একটা ছোক্‌রা প্রায়ই ঝোপ থেকে 'ব্ল্যাক্‌-বেরী' তোলবার জন্য মাঠে আসত। আশ মিটিয়ে খেয়ে সে আমাদের গায়ে ছুঁড়ে মারত লাঠি আর ঢিল—আমরা সুরু করে দিতাম লাফালাফি আর বসে বসে সে দেখত মজা। আমরা কিন্তু ওতে ভ্রূক্ষেপ করতাম না, লাফিয়ে এদিকে ওদিকে সরে যেতাম; কিন্তু সময়ে সময়ে দু'-একটা ঢিল গায়ে লেগে বড় ব্যথা দিত।

একদিন সে যখন এমনিতর খেলা করছিল, তখন যে প্রভু পাশের মাঠে বসে তাকে লক্ষ্য করছেন তা' সে জানত না। হঠাৎ লতার বেড়াটা এক লাফে ডিঙিয়ে এসে তার হাতটা চেপে ধরে কানের পাশে এমন একটা ঘুষি মারলেন যে ছোকরাটা ভয়ে এবং যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার সুরু করে দিল। প্রভুকে দেখা মাত্রই আমরা নির্ভয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে।

"এই হতচ্ছাড়া ছোঁড়া, ওদের ঘাঁটাচ্ছিস কেন?" প্রভু হুমকী দিয়ে বললেন, "একবার বা দু'বার নয়—এই তোকে শেষ বারের মত সাবধান করে দিচ্ছি।···নে, তোর টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরে যা'। তোকে আর আমি কাজে রাখব না।" সেই থেকে 'ডিক্'কে আমরা আর কোন দিন দেখি নি। তারপর যে বুড়ো 'ডেনিয়েল' আমাদের তদারক করবার জন্য বহাল হ'ল, সে ছিল প্রভুর মতই নিরীহ আর দয়ালু; সুতরাং মোটামুটি ভালই ছিলাম আমরা।

তখনও দু'বছর বয়স আমার হয় নি—এমনি সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটল—যা আমি কোনদিনই ভুল[illegible] পারব না। বসন্ত কাল মাত্র সুরু হয়েছে। রাত্রে এ[illegible] একটু তুষার ঝরে আর ভোরের দিকে গাছপালা, [illegible] ঘাট পাতলা কুয়াসায় থাকে ঢাকা। এমনি একটা [illegible] অন্য বাচ্চাগুলোর সাথে আমিও মাঠের প্রান্তে কচি ক[illegible] ঘাস খাচ্ছিলাম—এমন সময় শুনলাম দূরে শিকারী কুকু[illegible] ডাকের মত একটা শব্দ। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে [illegible] বাচ্চাটা মাথা উঁচিয়ে কান খাড়া করে বলল, "শিকা[illegible] কুকুর আসছে"—বলেই সে মাঠের সব চাইতে উঁচু [illegible] গার দিকে লাফাতে লাফাতে চল্‌ল, সেখান থেকে আ[illegible] পাশের চার-পাঁচটি মাঠ দেখা যায়। আমরাও অ[illegible] ওর পিছু পিছু ছুটলাম। আমার মা আর প্র[illegible] আর একটা বুড়ো ঘোড়া কাছেই ছিল এবং মনে হ[illegible] তারাও যেন সব জানতে পেরেছে।

"কুকুরগুলো বোধ হয় খরগোস দেখতে পেয়েছে। [illegible] পথ দিয়ে এলে শিকারটাকে আমরাও দেখতে পাব"—[illegible] বল্‌ল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কুকুরগুলো আমাদের পা[illegible] ক্ষেতের কচি কচি গমের চারাগুলি চিরে বেরিয়ে আ[illegible] লাগল। সে কী চীৎকার—আমি আর কোনদিন [illegible] চীৎকার শুনি নি। কুকুরগুলো ঠিক ঘেউ ঘেউ, [illegible] বা কেঁউ কেঁউ করছিল না, কিন্তু গলা সপ্তমে চড়িয়ে যে[illegible] যেন ওঃ ওঃ ওঃ, শব্দ করছে! কুকুরগুলোর [illegible] ছুটে এল একদল শিকারী—ওদের গায়ে ছিল [illegible] কোর্ত্তা। আমাদের দলের বুড়োরা সকৌতুকে [illegible] রইল ওদের দিকে—আর আমাদের ইচ্ছা হ'ল [illegible] সাথে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলে যেতে। কিন্তু তত[illegible] ওরা ছুটে ঝিলটা পেরিয়ে মাঠের প্রান্তে চলে গেল। [illegible] হঠাৎ শিকারীরা থেমে গেল—আর কুকুরগুলো [illegible] থামিয়ে মাটীতে নাক গুঁজে শুঁকতে লাগল গন্ধ।

—"ওরা গন্ধ হারিয়ে ফেলেছে—খরগোসটা তা[illegible] বোধ হয় রেহাই পেল।" বল্‌ল বুড়ো ঘোড়াটি।

—"কোথাকার খরগোস?"—আমি জিজ্ঞাসা কর[illegible]

সে বল্ল, "তা তো জানি না—তবে আমাদে[illegible] ঝোপেরই একটা হবে বোধ হয়। আর এমনি ক[illegible] কোন খরগোস দেখতে পেলেই ওরা কুকুর গো[illegible] ছুটে আসে পিছু পিছু।" সত্যি খানিক পরেই [illegible]গুলো আবার ওঃ ওঃ করে ডেকে মোড় ফিরে [illegible] লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে আমাদের মাঠের দিকে মুখ [illegible] ছুটতে আরম্ভ করল পূর্ণবেগে।

[illegible] মা বল্ল যে এইবার আমরা খরগোসটা দেখতে পাব। [illegible]ক্ষণেই একটা খরগোস ভয়ে পাগল হয়ে আমাদের [illegible] দিয়ে ঝোপের দিকে ছুটে গেল প্রাণপণে—অমনি [illegible]গুলোও মাঠ পেরিয়ে দৌড়ে এল,—তার পিছু পিছু শিকারীর দল। খরগোসটা বেড়ার মধ্যে দিয়ে গলে [illegible] চেষ্টা করল—কিন্তু সে বেড়াটা ছিল এতই ঘন যে [illegible] যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না। তাই সে মোড় [illegible] পাশে সট্‌কে পড়বার জন্য। কিন্তু হায়, তখন [illegible]ক দেরী হয়ে গেছে; মোড় ঘোরা মাত্র একটা কুকুর [illegible] ক্যাক্ করে ওর গলাটা কামড়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে [illegible] কুকুরগুলি উন্মত্ত চীৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর [illegible] দেহটার ওপর। অসহ্য যন্ত্রণায় একটা বুকফাটা [illegible]কার করে খরগোসটা চুপ করল চিরকালের মত। [illegible]জন শিকারী তাড়াতাড়ি এসে কুকুরগুলিকে চাবুক [illegible] তাড়িয়ে দিল দূরে, নইলে ওরা এতক্ষণে টুকরো [illegible]রো করে ফেলত ওর দেহখানা। তারপর সে এক-[illegible] ঠ্যাং ধরে খরগোসটার রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন দেহটা [illegible] ধরল উপরে, আর অন্যান্য শিকারীরা খুব খুসী হয়ে [illegible] 'বাহবা' করে উঠল।

[illegible]···এই ঘটনাটা দেখে আমি এমন হতভম্ব হয়ে গিয়ে-[illegible]য যে ওদিকে নালার পাশে কী হচ্ছে সেদিকে নজরই [illegible] নি। ওদিকে চাইবা মাত্র একটা করুণ দৃশ্য ভেসে [illegible] চোখের সামনে—দু'টো সুন্দর মৃত্যু-পথযাত্রী ঘোড়ার [illegible]র জন্য সে কী ব্যকুলতা! একটি আহত হয়ে স্রোতের [illegible] পড়ে আপ্রাণ চেষ্টা পাচ্ছে তীরে ওঠবার—অপরটী [illegible] দূর্বার উপর পড়ে গোঁ গোঁ করছে এক অব্যক্ত [illegible] একজন সওয়ার সারা গায়ে কাদা মেখে পারে [illegible]—আর অপর জনের নিথর দেহ পড়ে আছে নরম [illegible] উপরে।

[illegible] বল্ল যে সওয়ারটার ঘাড় নাকি ভেঙে গেছে।

[illegible] "বেশ উচিত সাজা হয়েছে তবে।"—বল্ল আমাদের [illegible]কে একটি বাচ্চা।

—"এই, ও রকম কথা বলে না", মা বল্ল, "দেখ, বয়স আমার যথেষ্ট হয়েছে এবং পৃথিবীর অনেক কিছুই দেখে'ছি ও শুনেছি। কিন্তু আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝে উঠতে পারি নি মানুষগুলো এ রকম খেলা করে কী সুখ পায়! একটা সাধারণ খরগোস বা একটা শেয়াল বা একটা হরিণের জন্য ওরা মাঠঘাট ভেঙে তছ্‌নছ্ করে, সুন্দর সুন্দর ঘোড়াগুলোর জীবন নষ্ট করে,—এমন কি নিজেদের জীবনও বিপন্ন করতে ছাড়ে না! কিন্তু ওরা তো ইচ্ছা করলেই অন্য ভাবে এ কাজগুলো অতি অনায়াসে করতে পারে। কিন্তু আমরা ঘোড়া···বুঝি না মানুষগুলোর অদ্ভুত স্বভাব!"

মা যখন বলে যাচ্ছিল, আমরা তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক্ ওদিক্ তাকাচ্ছিলাম।··· অনেকগুলো সওয়ার যুবকটীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমাদের প্রভু ওকে তুলে বসাবার চেষ্টা করছেন। মাথাটা তার হেলে পড়েছে পিছনের দিকে—আর হাত দু'টো ঝুলে পড়েছে নীচে। আশে পাশে সবাইয়ের মুখে একটা ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্য। চারিদিক্ নীরব, নিস্তব্ধ। কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ গেছে থেমে—কিছু একটা অঘটন যে ঘটেছে ওরাও যেন বুঝতে পেরেছে তা'। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে যুবকটীকে নিয়ে এল আমার প্রভুর ঘরে পরে জানতে পারলাম যে এই দীর্ঘকায়, সুন্দর যুবকটি হ'ল 'স্কোয়ার'-এর একমাত্র ছেলে এবং বংশের রত্ন 'জর্জ গর্ডন'।

তারপর কেউ ছুটল ডাক্তারের বাড়ী, কেউ গেল ঘোড়ার ডাক্তারের বাড়ী, আর কেউ বা গেল 'স্কোয়ার'-এর বাড়ীতে ছেলের সংবাদ দিতে...

মাঠের উপর পড়ে যে কালো ঘোড়াটা যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছিল, ঘোড়ার ডাক্তার বণ্ড্ তার কাছে এসে গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বল্‌ল যে, পা'টা দুমড়ে যাওয়ায় ঘোড়াটা আর বেশীক্ষণ বাঁচবে না। তখন কে একজন এক দৌড়ে প্রভুর ঘর থেকে একটা বন্দুক নিয়ে এল। পরক্ষণেই দুড়ুম করে একটা আওয়াজ হ'ল আর ঘোড়াটা একবার আর্ত্ত চীৎকার করে থেমে গেল। সমস্ত যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেয়ে নিস্পন্দ হয়ে পড়ল তার দেহটা চিরদিনের মত।

ব্যাপারটা দেখে মা যেন কেমন অস্থির হয়ে পড়েছে বলে মনে হ'ল। বল্ল যে, ঘোড়াটাকে সে চেনে বহুদিন যাবত—ওর নাম 'রব্-রয়'। সে নাকি খুবই ভাল এবং

TIGHT BINDING

জীবনে কোনদিন কোন অন্যায় করে নি। তারপর থেকে আর কোনদিন মাকে মাঠের ওদিকটায় যেতে দেখি নি।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই শুনতে পেলাম একদিন গীর্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি, বেজে চলেছে একটানা ঢং ঢং করে। তারপর অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখি রাস্তা দিয়ে চলেছে একটা অদ্ভুত ধরণের লম্বা কালো গাড়ী—কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা, আর টেনে নিয়ে যাচ্ছে কতগুলো কালো কালো ঘোড়া। গাড়ীটার পিছনে চলেছে দলে দলে লোক, কা পোষাক পরা—এক জনের পর একজন করে—ওদিকে গীর্জ্জার ঘণ্টা বেজেই চলেছে অবিরাম—ঢং, ঢং।

—তারা যুবক 'গর্ডন'কে জাঁক করে নিয়ে যাচ্ছে গো স্থানে কবর দিতে, কিন্তু 'রব-রয়ে'র কী করা হ'ল তা জানতে পারলাম না কোনদিনও! সবই কিন্তু হয়েছি শুধুমাত্র একটা খরগোসের জন্য —*

*অগনা সিওয়েলের একটা গল্প থেকে।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

করবে হাবল রুষের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম,
রুষ মানে তার ভ্রাতা বাদল—দেওয়া তো
চাই নাম।
'রণং দেহি, রণং দেহি' ছাড়লে সে হুঙ্কার,
'আমার হাতে, হে রুষ, তোমার রক্ষা নাহি আর।'
ধনুকেতে তীর জুড়িলেন হাবল মহাবীর,
চতুর্দ্দিক্ই হলো তাহার গর্জ্জনে অস্থির।
বাদল মোটেই পায় নি সমর-ঘোষণ সংবাদ,
নূতন পোষা কুকুর নিয়ে করছিল আহ্লাদ।
চোখে গিয়ে বিঁধলো যে তীর, উঠলো রে চীৎকার,
রুষ মারিতে ভাইকে আঘাত—ফল তো
আছে তার।
ঘরে থেকে বড়দা' ছুটে ধরলে যখন কান,
ভাবলে হাবল যুদ্ধ তাকে করলে যে হায়রাণ।
দাদা দিয়ে পিঠে ঘুষি, গালে দু' থাপ্পর,
পাঠিয়ে দিলে পাঠশালাতে তখনি তৎপর।
যুদ্ধ গেল চুকে—হলো সীমান্ত নীরব,
অক্ষত ও সুস্থ 'জুকভ', 'ষ্টালিন', 'ম্যালাটভ'।
কেটে গেল রুষের ফাঁড়া—পটি ভায়ের চোখে,
বীরের মত বীর তো হাবল—দেখেই বলে
লোকে
সামরিক এ ব্যাপার যখন—থাকেই
গোপন নাম,
উহ্য কিছু রইবে—যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

অতীতের আশ্চর্য

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ

একটা নতুন কিছু করে ইতিহাসের পাতায় নাম রেখে র আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে চিরকাল রয়েছে। তাই দূর অতীতের দিকে তাকাই তখনও দেখি আমাদের রুষেরা এমন সব কায করে গেছেন যা দেখে আজ নের যুগেও আমাদের তাক লেগে যায়।

তি প্রাচীন কালের এ রকম কয়েকটি অপরূপ কীর্ত্তির তোমাদের বলছি। অতীতের এই সপ্তাশ্চর্যের কটি যীশুখৃষ্টের জন্মের বহু পূর্বে তৈরী। এর মধ্যে ত্র মিশরের পিরামিড ছাড়া আর সবই লুপ্ত হয়েছে। অন্য দু'-একটি ধ্বংসাবশেষের সামান্য কিছু কিছু র্শন ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রভৃতি পৃথিবীর বিখ্যাত যাদু গুলিতে সযত্নে সংগৃহীত করে রাখা হয়েছে।

মিশরের পিরামিড

মিশরের পিরামিড অতীতের সপ্তাশ্চর্যের প্রধান আশ্চর্য। মিশরে অনেকগুলি পিরামিড আছে; আমরা বৃহত্তম তিনটির সঙ্গে পরিচয় করব। এরা খিজের পিরামিড নামে প্রসিদ্ধ। সবচেয়ে বড়টির উচ্চতা হচ্ছে ০ ফুট এবং নীচের দিকে এক একটি ধার ৭৫৫ ফুট। সেই সুদূর অতীতে যখন যান-বাহন ইত্যাদির অসুবিধা ছিল এবং প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের বারেই করায়ত্তে ছিল না তখন কোথা থেকে এই বিরাট প্রস্তরগুলি আবিষ্কার করে, কি উপায়ে তাদের এখানে নিয়ে আসা হ'ল এবং কি করেই বা এত সুকৌশলে পরস্পর জুড়ে এই বিচিত্র আকৃতি দেওয়া হ'ল তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে গবেষণার বিষয়।

বর্ষাকালে মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ নদ নীলের দুকূল ছাপিয়ে ভীষণ বন্যা আসত। নদীর দু'ধার বহুদূর পর্যন্ত জলপ্লাবিত থাকত। সম্ভবতঃ এই সময়ে কোন উপায়ে প্রস্তরগুলিকে নদীর একপার থেকে অন্য পারে নিয়ে আসা হ'ত। তারপর খুব ঢালু পথ তৈরী করে তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে এসে হাজার হাজার ক্রীতদাসের সাহায্যে এগুলিকে দাঁড় করান হ'ত। ভেবে দেখ ঐ ভীষণ ভারি ভারি পাথরগুলিকে দাঁড় করাতে না জানি কত লোকের সাহায্য দরকার! এর পর আবশ্যক মত হেলিয়ে প্রস্তরগুলিকে দিয়ে পিরামিড তৈরী করা হ'ত। সব চেয়ে বড় পিরামিডটি তৈরী করতে ষাট লক্ষ টন ওজনের পাথর লেগেছিল। প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ এই পিরামিডের নির্মাণকার্য সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে একলক্ষ লোক বাইশ বৎসর ক্রমাগত খেটে এই পিরামিড তৈরী করেছিল! পনের একর ভূমি জুড়ে দাঁড়িয়ে এই পিরামিডটি এখনও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করছে। বৃহত্তম পিরামিডের কাছে আরও দু'টি পিরামিড আছে; তাদের একটির নাম খ্রেফেন আর একটির নাম মেনকাউরা।

পিরামিডের কিছু দূরে রয়েছে ফিংক্স্ নামক অপূর্ব মূর্তি। একেও পৃথিবীর একটি আশ্চর্য বলা চলে। মানুষের মুখ এবং সিংহের দেহ হচ্ছে এই মূর্তির বিশেষত্ব। পাথর কুঁদে এই অদ্ভুত নৃসিংহ মূর্তি আগাগোড়া নির্মিত হয়েছিল। পিরামিডের আয়তনের তুলনায় এটিও নিতান্ত ছোট নয়। এর মাথা থেকে ল্যাজ পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে ১৫০ ফুট। উচ্চতায় মূর্তিটি ৭০ ফুটের কম নয়।

এখন থেকে যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মিশরের ফ্যারাও বা সম্রাট খুফু এই পিরামিড্ তৈরী করিয়েছিলেন। বৃহত্তম পিরামিড্টি হচ্ছে তাঁরই সমাধিমন্দির। তোমরা জান, প্রাচীন মিশরবাসীরা বিশ্বাস করত যে মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা দেহের ভেতরেই থেকে যায়। তারা ভাবত মৃতদেহেরও বুঝি খাদ্যদ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাট-পালঙ্ক ইত্যাদির প্রয়োজন। মিশরবাসীরা এক প্রকার প্রলেপ আবিষ্কার করেছিল যার সাহায্যে মৃতদেহ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা সম্ভব হ'ত। এই প্রলেপ মাখিয়ে মৃত ব্যক্তিকে তার ব্যবহৃত যাবতীয় জিনিষপত্রের সঙ্গে কবরস্থ করা হ'ত। বিশ্বাস ছিল কবরের মধ্যে বাস করে সে তার প্রিয় জিনিষগুলি ব্যবহার করবে। অবশ্য একমাত্র ধনী লোকদেরই এ রকম ভাবে সমাধিস্থ করা সম্ভব হ'ত। যাই হোক, বৃহত্তম পিরামিডের ভেতরের দেওয়ালগুলি অপূর্ব কারুকার্যশোভিত ছিল। দেওয়াল-গুলিতে সম্রাট্ খুফুর সমস্ত জীবনী চিত্রে বিবৃত করা হয়েছিল। সম্রাটের ব্যবহৃত এবং প্রিয় মুস্লিন বস্ত্র, হীরামাণিক্য, মুকুট, খাট-পালঙ্ক, সিংহাসন ইত্যাদির মধ্যে বহুমূল্য প্রস্তর-নির্মিত এবং স্বর্ণখচিত এক শবাধারের ভেতরে তাঁর মৃতদেহ ম্যমি অবস্থায় সযত্নে রক্ষিত ছিল। পিরামিডের বহির্দেশ এবং অন্তর্দেশ দুইই সমান রহস্যময়।

এসিয়ার পশ্চিমে এখন যেখানে ইরাক দেশ অবস্থিত, খৃষ্টের জন্মের সাত হাজার বছরেরও আগে সেখানে ব্যাবিলনিয়া নামে এক অতি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। এই দেশের এক ধার দিয়ে বয়ে যেত ইউফ্রেটিস্ নদী আর এক ধার দিয়ে টাইগ্রিস্। মাঝের উর্বর সমতলভূমিতে অবস্থিত রাজধানী ব্যাবিলন হয়ে উঠেছিল সমস্ত পৃথিবীর ঈর্ষার বস্তু। সভ্যতায় এবং সমৃদ্ধিতে ব্যাবিলন তখনকার দিনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল বল্লে অত্যুক্তি করা হবে না। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ছ'শ বছর আগে ব্যাবিলনের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন সম্রাট্ নেবুকাড্নাজার। চারিধারে সুদৃঢ় প্রাচীর গেঁথে ইনি ব্যাবিলনকে দুর্ভেদ্য করে তোলেন। কত মনোরম প্রাসাদ যে ইনি নির্মাণ করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। এত করেও কিন্তু তিনি তাঁর রাণীর মন পান নি। রাণী এমিটিস্ ছিলেন মিডিয়া দেশের রাজকুমারী; মিডিয়ার পাহাড়-পর্বতের মধ্যে তিনি মানুষ। সমতল ব্যাবিলনের সমৃদ্ধির ভেতর এসেও মন উঠ্ল না। দেশের জন্যে তিনি নিভৃতে কাঁদেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন; তাই দেখে সম্রাটের মনে দুঃখ হ'ল তিনি ভাবলেন যে রকম করে হোক্ রাণীর মনে সুখ আন্তে হবে। এ থেকেই হ'ল ব্যাবিলনের ঝোলান বাগানের সূত্রপাত! সম্রাটের আদেশে প্রকাণ্ড ইষ্টকনির্মিত স্তম্ভ তৈরী করা হ'ল। এক একটি স্তম্ভের উচ্চতা হ'ল প্রায় তিনশ' ফুট্। এই স্তম্ভগুলির ওপর খিলান তৈরী করে তার ওপর এক বিরাট ছাদের সৃষ্টি হ'ল। এই ছাদের ওপর নির্মিত হ'ল ব্যাবিলনের বিখ্যাত বাগান। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়, মাঝে মাঝে সমতল স্থান, কোথাও ঝরণা, কোথাও মনোরম কুঞ্জবন,—কত অদ্ভুত জিনিষ যে এই বিরাট বাগানের মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল কে তার ঠিক করবে! এই বাগানে বেড়াতে এসে রাণীর মুখে আবার হাসি ফুটল। তাঁর মনে হ'ল তিনি যেন তাঁর শৈশবের মিডিয়ায় ফিরে এসেছেন।

পৃথিবীর মানচিত্রের ওপর যদি ভাল ক'রে চোখ বোলাও দেখ্তে পাবে এসিয়ার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে তুরস্কের সীমান্তে এবং ভূমধ্যসাগরের তীরে স্মার্ণা নগর দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু আজ নয়, বহুকাল ধরে এই নগর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে স্মার্ণার পঞ্চাশ মাইল দূরে এফিসিউস্ নামক স্থানে গ্রীকেরা এক সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ স্থাপন ক'রে সেখানে ডায়ানা দেবীর অপূর্ব সুন্দর এক মন্দির তৈরী ক'রেছিলেন। এই মন্দির অতীতের সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে এক আশ্চর্য বলে পরিগণিত হয়েছে। ডায়ানা চাঁদ, আলো এবং পবিত্রতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গ্রীক্ দেশের যে কোন একখানি ইতিহাসের পাতা উল্টালেই তোমরা তাঁর কাল্পনিক ছবি দেখ্তে পাবে। প্রায় সব ছবিতেই তাঁকে শিকারী হিসাবে আঁকা হয়েছে। দু' ঘোড়ার রথে চড়ে দেবী শিকারে চলেছেন, পরনে ঢিলে গ্রীক্ নারীসুলভ পোষাক, মাথায় ঘোমটা, কাঁধে তীরভরা তূণীর এবং ধনুক, সঙ্গে রয়েছে হরিণ অথবা শিকারী কুকুর,—চাঁদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে কপালে এক ফালি চাঁদ আঁকা। এফিসিউসের লোকেরা চমৎকার একটি মন্দির তৈরী করে তার ভেতর ডায়ানার

সুদৃশ্য এক মূর্তি স্থাপনা করেছিল। মন্দিরের অভ্যন্তর ছিল অপূর্ব কারুকার্যশোভিত। দেবীর সামনে যজ্ঞবেদী নির্মাণ করা হয়েছিল তা নাকি সৌন্দর্যে ছিল অদ্বিতীয়। প্রসিদ্ধ গ্রীক্ স্থপতি প্র্যাক্সিটিলিস্ স্বয়ং এই মন্দির পরিকল্পনা ক'রেছিলেন। ৩২৬ খৃষ্টাব্দে গথ নামক ইউরোপের এক অসভ্য জাতি এই মন্দিরের ধ্বংস সাধন ক'রে পৃথিবীর অপূরণীয় ক্ষতি করেছে।

শুধু ডায়ানার মন্দির নয়, মন্দিরের কাছে যে বিরাট ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল, তাও দেখবার জিনিষ। গ্রীকেরা এখানে মল্লযুদ্ধ, ডিস্কাস্-ক্ষেপণ প্রভৃতি ব্যায়াম করতেন এবং মাঝে মাঝে অভিনয় ক'রে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতেন। ক্রীড়া-ক্ষেত্রের সম্মুখে দর্শক এবং শ্রোতাদের জন্যে সহস্র সহস্র আসন অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে সন্নিবেশিত থাকৃত। দর্শক এবং শ্রোতারা সেখানে বসে ক্রীড়া ও অভিনয় উপভোগ করতেন।

প্রাচীন পৃথিবীর আর কয়েকটি আশ্চর্যের কথা তোমাদের বারান্তরে শোনাব।

একলব্য

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য

(গভীর বন। দ্রোণাচার্যের প্রতিমূর্তির সামনে ধনুক হাতে একলব্য।)

একলব্য। আশ্চর্য! সেই সারমেয় আর ত' চীৎকার করে আমায় বিরক্ত করছে না! নিশ্চয় তার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে। গুরুদেব! আপনার কৃপালাভে আমি আজ হ'লে বঞ্চিত হই নি! অলক্ষ্য থেকে আপনার আশীর্বাদ আমায় অভিষিক্ত করেছে। আমার মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয়, প্রভু, আমার অস্ত্র-সাধনা যেন বিফলে না যায়।

(দ্রোণাচার্য, অর্জুন, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা প্রভৃতির প্রবেশ)

একি দেব, আপনি! আপনি স্বয়ং দাসের কাছে এসেছেন? এ যে আমার স্বপ্ন মনে হচ্ছে গুরুদেব! এত দিনে কি আমার পূজা সার্থক হ'ল?

দুর্যোধন। দ্রোণাচার্য তোমার গুরু? তুমিই তা'হলে সেখানে একটা কুকুরের শরাঘাতে মুখ বন্ধ করেছ?

একলব্য। আপনার অনুমান সত্য।

(দুর্যোধন ও অর্জুনের দৃষ্টি-বিনিময়)

দ্রোণ। (সক্রোধে) কি সত্য, কি সত্য নরকের কীট? সত্যি আমি তোর মত চণ্ডালকে শিষ্য করেছি, মিথ্যাবাদী?

একলব্য। সেই যেদিন আমায় স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলেন, প্রভু, সেই দিন থেকেই ত' কায়মনোবাক্যে আমি আপনার শিষ্য। এই দেখুন, আপনারই মৃন্ময় মূর্তির সামনে এই নির্জন বনভূমিতে আমি নিয়মিত অস্ত্র-সাধনা করে চলেছি, আপনারই আশীর্বাদে আজ এক সারমেয়র মুখে—

দ্রোণ। থাম্, থাম্, অস্পৃশ্য বাতুল!

অর্জুন। দেব, এ অস্পৃশ্য হ'তে পারে, কিন্তু এর যে শরত্যাগের নৈপুণ্য দেখা গেছে, তাতে একে বাতুল বলা চলে না।

দ্রোণ। অবশ্যই বাতুল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘোর উন্মাদ এই অনার্য বর্বর। জীবনে ওকে কোনদিন আমি অস্ত্রশিক্ষা দিই নি, তবু ও আমার শিষ্যত্বের দাবী করে? এই নীচ চণ্ডালের কথার মূল্য কি আমার চেয়েও বেশী? অর্জুন, তুমি ত' জান, তোমারই চোখের সামনে এই দুর্বৃত্তকে আমি একদিন কুকুরের মতন দূর ক'রে দিয়েছিলেম। চুপ ক'রে থেক' না, অর্জুন; বল, বল, ওকে আমি প্রত্যাখ্যান করি নি?

অর্জুন। হ্যাঁ, সেদিন ওকে বিতাড়িত করেছিলেন।

দ্রোণ। তার পরেও কোনদিন ওর সঙ্গে আমার সংস্রব ছিল না। ওকে আমি আর দেখি নি পর্যন্ত। এই অসভ্য, অনার্যকে আমি শিষ্য করব, এ কথা তোমরা ভাবতে পার? আমার মতন একজন নিষ্ঠাবান্ আর্য ব্রাহ্মণ—

দুর্যোধন। কিন্তু গুরুদেব, এই সামান্য অনার্য বালক

TIGHT BINDING

এমন অসাধারণ শর-কৌশল কি ক'রে আয়ত্ত করলে? বর্তমানে মহা-ভারতে আপনার তুল্য অস্ত্র-শিক্ষক আর দ্বিতীয় নেই। তা'হলে এ কোথা থেকে এই প্রয়োগ-কৌশল শিক্ষা করলে?

অর্জুন। আমারও ওই প্রশ্ন, আচার্য দেব! আপনি বলেন—আমি শ্রেষ্ঠ ধনুকী হ'ব, ধনুর্বেদের সমস্ত তত্ত্ব আপনি আমায় দান করেছেন। অথচ এই অনার্য যে অস্ত্রের সন্ধান জানে, আমার কাছে তা' স্বপ্নাতীত। সর্ব-শ্রেষ্ঠ বীর হবার আকাঙ্ক্ষায় আজ থেকে আমার জলাঞ্জলি। আপনি বলুন, দেব, এ কেমন ক'রে এমন শর চালনা করতে জানলে?

দ্রোণ। সে ত' আমার কাছেও পরম রহস্য। ওকেই তোমরা বরং সে কথা জিজ্ঞেস ক'রে দেখ।

দুর্যোধন। (একলব্যের প্রতি) এ অস্ত্রের সন্ধান তুমি কি ক'রে পেলে?

একলব্য। (করযোড়ে দ্রোণাচার্যের দিকে চেয়ে) গুরুদেবের আশীর্বাদে। না হ'লে দাসের এ ক্ষমতা হ'ত না।

(অর্জুন ও দুর্যোধনের দৃষ্টি বিনিময় ও দ্রোণাচার্যের মুখের ওপর অবিশ্বাসী দৃষ্টিপাত)

দ্রোণ। (সগর্জনে) ওরে প্রবঞ্চক, শয়তান! তুই কি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিস্? উঃ, এ কি সাংঘাতিক কালো সাপ। দাঁড়া, তোর বিষ আমি শেষ করে দিই। (ধনুক ধারণ) না, না, না, ক্রোধে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি। এ হীন অনার্যকে নিজ হাতে বধ করলে আমি অপবিত্র হ'ব; সারা জগৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসবে। সে হবে না। কিন্তু কি করি? এ কি কঠিন পরীক্ষা আমার সামনে! অর্জুন, দুর্যোধন! তোমরা ত' কখনো আমায় অবিশ্বাস কর নি। গুরু হিসাবে না কর, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব'লে আমার কথা বিশ্বাস কর—এ চণ্ডাল প্রতারক, মিথ্যাবাদী। ওকে আমি কখনো শিক্ষাদান করি নি। আমার পবিত্র যজ্ঞোপবীত স্পর্শ ক'রে শপথ করছি—

অশ্বত্থামা। পিতা, পিতা! আর কত অপমান সহ্য করবেন? এখনো আপনার কথা রাজকুমারদের বিশ্বাস হয় নি। আপনার এত বড় অসম্মান আর আমি দেখতে পারব না, পিতা! চলুন, রাজপুরুষদের সংসর্গ ত্যাগ ক'রে আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। যথেষ্ট হয়েছে; এখানে নয়।

দ্রোণ। ধৈর্য ধর, অশ্বত্থামা, অধীর হয়ো না। কুমারেরা ভুল বুঝেছে। আমি তাদের ভুল সংশো করব। আমি প্রমাণ ক'রে দেব যে আমি মিথ্যাবাদী ন শোন দুর্যোধন, এস অর্জুন, তোমাদের সঙ্গে আম গোপনে একটা কথা আছে।

(অর্জুন ও দুর্যোধনকে খানিক দূরে এনে)

দ্রোণ। বল, কিসে তোমরা সন্তুষ্ট হবে? কি বিশ্বাস করবে যে আমি তোমাদের ছাড়া আর কারও খ্যাতি চাই না, আর কাউকেও অস্ত্র-শিক্ষা দিই না? ওর সমস্ত উন্নতির পথ রুদ্ধ ক'রে দিতে পারি, যদি বীরত্বের মূল উৎপাটিত ক'রে দিই,—তা হ'লে আমা কথা মেনে নেবে ত'? তা হ'লে ত' স্বীকার করবে যে আমার শিষ্য নয়? ও আমার সত্যকার শিষ্য হ'লে সর্বনাশ করবার কথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারতুম না বল, তা হলে তোমরা নিঃসন্দেহ হবে?

অর্জুন। আপনি কি বলছেন, আমি ঠিক বুঝ পারছি না।

দুর্যোধন। আমি একেবারেই ধরতে পারছি না।

দ্রোণ। বুঝতে পারছ না? তোমাদের পথের কাঁ আমি উপড়ে ফেলতে চাই। এখনই আমি তোমাদে ভবিষ্যৎ অক্ষুণ্ণ রাখবার পাকা ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে চাই

অর্জুন। পরিষ্কার ক'রে বলুন, গুরুদেব!

দ্রোণ। শোন। আমি ওর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদন করি ওর ধনুক ধরবার সাধ ইহ-জীবনের মত শেষ ক'রে দে স্থির করেছি। তা হলে তোমরা সুখী হবে ত'?

দুর্যোধন। তা' হ'বে।

অর্জুন। কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব হবে? বিনা ও এত বড় ক্ষতি কি স্বীকার ক'রে নেবে?

দ্রোণ। সে ভার আমি নিচ্ছি। যেমন করে তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ থেকে ওকে অপসারি আমি করবই। বর্বর অনার্যের এত বড় স্পর্ধা আ কিছুতেই সহ্য করব না। দেখ আমি কি করি।

অর্জুন। আপনার প্রতি আমি অতি দুর্বিনীত আচর করেছি দেব; আমায় ক্ষমা করুন। এ বিষয় যা আপনা

মনে হয়, করুন; আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'রে দেবেন না।

দ্রোণ। ভাল! তোমরা এখন এস আমার সঙ্গে। (লব্যের সামনে এসে) বৎস একলব্য! তোমার ক্তিতে আমি বিশেষ প্রীতি লাভ করেছি। প্রথমে র কথা বিশ্বাস করতে পারি নি, সেজন্য আমি ত। এখন বুঝতে পারছি, কি গভীর তোমার গুরু-! তোমার প্রতি যে রূঢ় ব্যবহার করেছি সে সব কথা যেও। আর দুঃখ ক'র না—তোমাকে আমি শিষ্যরূপে ক'রে নিলেম।

একলব্য। দূর থেকে আপনাকে প্রণাম করি, দেব! আমার এত দিনের স্বপ্ন, কামনা, সাধনা সব সফল। ধন্য হ'ল আমার জীবন। গুরুদেব! আজ এই দিনে কি দিয়ে আপনার চরণ বন্দনা করব—পূজার অর্ঘ কি আপনি গ্রহণ করবেন প্রভু?

দ্রোণ। অবশ্যই গ্রহণ করব, বৎস! কিন্তু সেই গুরুদক্ষিণা দেবে ত'?

একলব্য। (সাগ্রহে, যুক্তকরে) গুরুদক্ষিণা দিতে লে এ দাস চিরকৃতার্থ হবে। কিন্তু কি দক্ষিণা পনাকে সন্তুষ্ট করবে দেব?—আজ্ঞা করুন, তাই শ্রীচরণে দান ক'রে ধন্য হই।

দ্রোণ। আমার ঈপ্সীত বস্তু দান করতে পারবে ত'? কি জানি, যদি শেষে অসম্মত হও। প্রতিজ্ঞা, তা হ'লে বলি।

একলব্য। এই সকলের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি দেব, পনাকে অদেয় পৃথিবীতে আমার কিছুই নেই। এইবার দেশ দিন।

দ্রোণ। বৎস, তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আমায় স্বরূপ দান কর।

একলব্য। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে, মৃদু হেসে) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নয়—আপনার কাম্য আমার দক্ষিণ হস্ত: যুদ্ধকুশলী, বীরত্বের আধার, এই অনার্য বজ্র-বাহু। এর বলিদান ভিন্ন আপনার আর্য শিষ্যদের গৌরবের পথ নিরাপদ নয়! এর বিসর্জন না হ'লে আপনার দক্ষিণা দেওয়া হবে না। আপনার ইচ্ছাই তা'হলে পূর্ণ হোক। কিন্তু এ অঙ্গুলি কি আমাকেই নিজ হাতে ছেদন করতে হবে? আপনি ত' আর অশুচি-স্পর্শে ব্রাহ্মণত্বের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করবেন না!

দ্রোণ। গুরু-দক্ষিণা আপন হাতেই দিতে হয়।

একলব্য। তবে তাই হোক। (শরাঘাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি ছিন্ন ক'রে দ্রোণাচার্যের পদতলে প্রদান)

দ্রোণ। অস্পৃশ্যের উচ্চাশার যোগ্য প্রতিফল! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। অর্জুন, দুর্যোধন! তোমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করতে পেরেছি ত'? তোমরা এখন সন্তুষ্ট? চল, এবার শিবিরে প্রত্যাগমন করি।

(একলব্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

একলব্য। সব স্বপ্ন, সব সাধ, সব আকাঙ্ক্ষার যবনিকাপাত হ'ল। আর্য-গুরু বরণের উপযুক্ত পুরস্কার! আর্য আর্য! তোমাদের ছদ্মবেশ আজ ঘুচে গেল। অহঙ্কার-মদে মত্ত তোমরাও সাধারণ জীব। তোমাদেরও মধ্যে আছে হিংসা, শঠতা, গ্লানি, কুটিল স্বার্থের পঙ্ক, লুব্ধ মিথ্যাচার। অতি মূর্খ আমি! এর জন্যে অগ্নিমূল্য দিতে হ'ল! (হস্তের শোণিত পাতের প্রতি লক্ষ্য ক'রে) হায় স্নেহময় পিতা! হায় রে মংরু! আর বুঝি দেখা হ'ল না! এ কি, অন্ধকার—এ কি অন্ধকার চারিদিকে! এ কি মৃত্যুর আভাস? সারা অঙ্গ অবসন্ন হয়ে আসে। ব্যর্থ জীবন আমার এখানেই শেষ হোক। সব অপমান, সব জ্বালার অবসান কর—এস মৃত্যু! এস শান্তি!

(ধীরে ধীরে বৃক্ষতলে শয়ন)

[আগামী বারে সমাপ্য]

পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

শ্রীগৌরী দেবী

গত বারের রামধনুতে তোমরা শুনেছ—ভারতের প্রবীণ জননায়ক, দেশপ্রেমিক, পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ইহলোক ত্যাগ ক'রে গেছেন। গত ২৭শে কাত্তিক পুণ্য বারাণসীর মণিকর্ণিকা ঘাটে লক্ষ লক্ষ গুণমুগ্ধ দেশবাসী সাশ্রু নয়নে তাঁকে চিতায় তুলে দিয়েছে।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নাম শোনে নি এমন লোক সারা ভারতে খুব কমই পাবে—একটিও পাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। ইদানীং বার্দ্ধক্যের জন্য হয়তো জাতির পুরোভাগে নেতৃত্ব করতে তাঁকে সব সময় দেখা যেত না কিন্তু দেশের প্রতিটি সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেই এই পুরুষ-সিংহ দেশবাসীর সামনে এগিয়ে আসতেন—তাঁর বিরাট্ ব্যক্তিত্ব তাদের নতুন প্রেরণা যোগাত। গত কয়েক বছরে বার বার আমরা তা দেখেছি।

আজ থেকে প্রায় ৮৫ বছর আগেকার কথা, ১৮৬১ সনের ২৫শে ডিসেম্বর পুণ্য প্রয়াগে (এলাহাবাদ) এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে মদনমোহনের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ছিল পণ্ডিত ব্রজনাথ মালব্য। ব্রজনাথ ধনী ছিলেন না কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল প্রচুর—দেশের সকলেই তাঁকে সে জন্য শ্রদ্ধা করত। বালক মদন-মোহনের উপর তাঁর প্রভাব বড় কম ছিল না।

মদনমোহন প্রথমে সংস্কৃত পাঠশালায় প্রাথমিক পাঠ শেষ ক'রে ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৭৯ সনে এলাহাবাদ জিলা স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে তিনি ম্যুর সেণ্ট্রাল কলেজে ঢুকলেন। তখনও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নি, সেই সুদূর পাঞ্জাব থেকে একটানা ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধীনে। ১৮৮৪ সনে মদনমোহন এই বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বি.এ ডিগ্রী লাভ করলেন।

বি. এ পাশ ক'রে মদনমোহন এলাহাবাদের সরকারী স্কুলে শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন—মাইনে হ'ল মাসিক পঞ্চাশ টাকা। তিন বছর পরে তা বেড়ে পঁচাত্তর টাকায় দাঁড়াল।

এই সময় ভারতের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। ভারতের কয়েকজন জননায়ক এবং [illegible] ভারত-বন্ধুর চেষ্টায় ১৮৮৫ সনে ভারতের জাতীয় [illegible] কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হ'ল। প্রথম কংগ্রেসে[illegible] হ'ল বোম্বাই-এ—সভাপতিত্ব করলেন উমেশচন্দ্র [illegible] পাধ্যায় (যিনি ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জ্জি নামেই [illegible] পরিচিত)। দ্বিতীয় অধিবেশন হ'ল কলকাতায়—[illegible] সনে। এবারে সভাপতি হলেন দাদাভাই নৌ[illegible] মদনমোহনের বয়স তখন ২৫ বছর। তিনি যুক্তপ্র[illegible] পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য এই অধিবেশনে [illegible] দিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

সভা চলছে। সভাপতির বক্তৃতা শেষ হয়েছে, তা[illegible] শীর্ষস্থানীয় নেতারা একে একে বক্তৃতা ক'রে যা[illegible] হঠাৎ দেখা গেল,—একটি ফর্সা, রোগা[illegible] ছেলে চেয়া[illegible] উপর দাঁড়িয়ে বিশাল জনতাকে সম্বোধন ক'রে ওজ[illegible] ভাষায় বক্তৃতা সুরু ক'রে দিয়েছেন। সে বক্তৃতা [illegible] সুন্দর, এত যুক্তিপূর্ণ যে সভাশুদ্ধ লোক বিস্ময়ে অবাক [illegible] গেল—কে এই অখ্যাত তরুণ—এত বড় গুণিজন-[illegible] বিনা দ্বিধায় এমন বক্তৃতা করতে পারে! তরুণটি [illegible]

[illegible] বুঝতে পেরেছ! পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য।

[illegible]গ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিউম্ সাহেব এই [illegible] উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন—কলকাতার কংগ্রেসে [illegible]তাটি সম্ভবতঃ শ্রোতাদের কাছে সব চেয়ে হৃদয়গ্রাহী [illegible] তা দিয়েছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। এই [illegible] ব্রাহ্মণ যুবক, মুখে তাঁর এমন এক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার [illegible] দেখলেই সকলকে আকৃষ্ট করে—তিনি যখন [illegible]তির পাশে একটি খালি চেয়ারের উপর হঠাৎ [illegible] উঠে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা সুরু করলেন তখন [illegible]ভাশুদ্ধ লোককে সে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। [illegible]র পর থেকে মদনমোহনের নাম আস্তে আস্তে রাজ-[illegible] মহলে ছড়িয়ে পড়ল। পরের বছর কংগ্রেসের [illegible] অধিবেশনেও তাঁর বক্তৃতা বিপুলভাবে সভায় [illegible]ড়ন সৃষ্টি করল।

[illegible]র পর আমরা মদনমোহনকে দেখি সাংবাদিক রূপে। [illegible] ছেড়ে দিয়ে তিনি "হিন্দুস্থান" পত্রিকার সম্পাদনার [illegible] গ্রহণ করলেন। হিন্দুস্থান ছাড়া তিনি "ইণ্ডিয়ান [illegible]য়ান" এবং "অভ্যুদয়" নামে একখানা সাপ্তাহিক [illegible]ও সম্পাদনা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত [illegible]-বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে আইনের এল্. এল্. বি ডিগ্রী [illegible] তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে সুরু করলেন [illegible]তী। সুরু করলেন বটে, কিন্তু ওকালতীর দিকে [illegible] কোন দিনই মন ছিল না—নানা রকম সামাজিক, [illegible]নৈতিক ও জনহিতকর কাজ নিয়েই তিনি ব্যস্ত [illegible]ন। মিউনিসিপ্যালিটী, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবস্থাপক [illegible]—সর্বত্রই তাঁকে দলের পুরোভাগে দেখা যেতে [illegible]। 'মালব্যজী' এই নামে সারা ভারতের লোক এক[illegible] তাঁকে চিনতে পারত।

[illegible]আগেই বলেছি কংগ্রেসের প্রায় গোড়াপত্তন থেকেই [illegible] কংগ্রেসের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। [illegible] যুগে তিনি চার বার কংগ্রেসের সভাপতির পদে [illegible]চিত হন। ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান [illegible]গ্রেস—সেই কংগ্রেসের সভাপতি হতে পারা বড় কম [illegible]রের কথা নয়! আর এই পদে চার বার নির্ব্বাচিত [illegible] মানে দেশে লোকের কাছ থেকে কতটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ তা তো বুঝতেই পারছ। অবশ্য শেষ দু'বার সরকারী নিষেধাজ্ঞার জন্য মালব্যজী কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করতে পারেন নি।—সভায় পৌছবার আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। প্রবীণ বয়সেও দেশের জন্য কারা-বরণ করতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নি।

কিন্তু মালব্যজী শুধু বড় রাজনীতিকই ছিলেন না, হিন্দু সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্যও তাঁর মন সর্ব্বদাই উন্মুখ থাকত। হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তোমরা হয়তো জান, প্রথম দিকে হিন্দু মহাসভা রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজে নামে নি—হিন্দু সমাজের সংগঠন ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা করাই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। পরে দেশের রাজনৈতিক পরি-বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে দেখে বাধ্য হয়েই মহাসভা রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ সুরু করে—অবশ্য তার সামাজিক কাজ তাই ব'লে বন্ধ হয় নি। মালব্যজী এই হিন্দু মহাসভারও সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়ে-ছিলেন তিন বার।

মালব্যজী নিষ্ঠাবান্, সনাতনপন্থী হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তাই ব'লে অন্ধ গোঁড়ামীও তাঁর ছিল না। সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে প্রয়োজনীয় সংস্কার দরকার এ তিনি বুঝতেন এবং তা কাজে-কলমে করতেও দ্বিধা করতেন না। দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি বিলাতের গোল টেবিল বৈঠকেও যোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু রাজনীতিক বা সমাজ-প্রেমিক মালব্যজীকে বাদ দিলেও আর একদিক্ দিয়ে তিনি এমন এক অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছেন যার জন্য তাঁর নাম ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। আমরা শিক্ষা-বদ্ মালব্যজীর কথা বলছি। পুণ্য বারাণসী ধামে তিনি প্রাচীন ভারতের আদর্শের সঙ্গে আধুনিক যুগের সমন্বয় ঘটিয়ে যে বিরাট আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র—'হিন্দু বিশ্ববিদ্যা-লয়' তৈরী ক'রে গেছেন তার তুলনা এ দেশে বেশী নেই। মালব্যজী ধনী ছিলেন না, কিন্তু মহৎ কাজের জন্য অর্থের অভাব যে নিতান্ত তুচ্ছ তা তিনি প্রমাণ ক'রে গেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প'ড়ে ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজা-মহারাজারা মুক্ত হস্তে এই পুণ্য কাজে অর্থ দান ক'রে

গেছেন। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এই বিশ্ব-বিদ্যালয় দেখেছ। সে যেন একটি আলাদা সহর! পাথরে গাঁথা বড় বড় সুরম্য অট্টালিকা, বাঁধান ছায়াশীতল রাস্তা, জলাশয়, সন্তরণাগার, খেলার মাঠ, বোটানিক্যাল্ গার্ডেন, হাসপাতাল, ছাত্রাবাস, অধ্যাপকদের বাসভবন,—কি সেখানে নেই? সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়াও এঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারী, ফলিত বিজ্ঞান, কৃষি, প্রাচ্যবিদ্যা, নারীশিক্ষা প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। ১৯১৬ সনে বাসন্তী পঞ্চমীর দিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হয়, ১৯২১ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়। মালব্যজী দীর্ঘ কুড়ি বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর ছিলেন, এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এখানকার রেক্টর ছিলেন। বুকের [illegible] তিল তিল ক'রে তিনি এই 'নব নালন্দা' গড়ে তুলে[illegible]

মালব্যজীর শরীর কিছুদিন থেকে ভাল যাচ্ছি[illegible] বাংলা দেশের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার খবরে তিনি খুব [illegible] হয়ে পড়েন। শোনা যায় শেষ অবস্থায় অজ্ঞান [illegible] থাকার পর জ্ঞান ফিরে এলেই তিনি শুধু ঐ [illegible] জিজ্ঞাসা করতেন;—পূর্ব্ব বঙ্গের খবর তাঁকে আরও [illegible] করে তোলে। এই অবস্থায় তাঁর জীবনদীপ ধীরে [illegible] নিভে আসে। ৮৫ বছর বয়সে কর্ম্মভূমি বারাণসীর [illegible] তীর্থে 'হরে রাম, হরে রাম' ধ্বনি উচ্চারণ করতে [illegible] সমস্ত দেশকে শোকাচ্ছন্ন ক'রে পুরুষসিংহ মাল[illegible] দেহত্যাগ করেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেষ্ট ম্যাচ্

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

গত বারে তোমাদের কাছে আলোচনা করিয়াছি যে, ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট দল অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণে গিয়া কেমন কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল প্রদর্শন করিতেছে। তার পরবর্ত্তী ম্যাচ্-গুলির সম্বন্ধে এবারে কিছু আলোচনা করা যাউক।

প্রথম ৮টি ম্যাচে ইংল্যাণ্ড দল যে বাহাদুরী দেখাইয়াছিল তার পরের তিনটি খেলায় কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। কারণ সুস্পষ্ট। ইংল্যাণ্ড দলে এমন সব খেলোয়াড় স্থান পাইয়াছেন যাঁহারা শুকনো, খটখটে মাঠেই খেলিতে অভ্যস্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অষ্ট্রেলিয়ার আব্‌হাওয়া সম্প্রতি প্রতিকূল এবং দুর্য্যোগপূর্ণ হওয়াতে ইংল্যাণ্ডের নামকরা খেলোয়াড়রাও বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পিচ্ আশানুরূপ না হওয়াতে, বিশেষতঃ বোলারদিগের, যারপরনাই [illegible] বিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের পোল[illegible] ভোস্ এবং বেড্‌সার খ্যাতনামা বোলার হইলে [illegible] হইবে, নরম এবং ভিজা পিচে তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়ার [illegible] ব্যাট্‌স্‌ম্যান্‌গণকে কোনও রূপেই আঁটিয়া উঠিতে পা[illegible]তেছেন না।

ইংল্যাণ্ডের নবম খেলাটি ছিল চার দিনব্যা[illegible] এই খেলাতে ইংল্যাণ্ড দলকে নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ এ[illegible] দলের বিরুদ্ধে খেলিতে হয়। খেলাটি অবশ্য অমীমাং[illegible] রূপেই শেষ হইয়াছে।

দশম খেলাটিও চার দিনব্যাপী ছিল। প্রতি[illegible] ছিল কুইন্সল্যাণ্ড। এই খেলায় ইংল্যাণ্ড খুবই নৈরাশ্য[illegible] [illegible]য়ে খেলিয়া কোনও রূপে খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে [illegible] করে। সমায়াভাবেই খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে [illegible] হয়; নহিলে ইংল্যাণ্ডের অদৃষ্টে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী [illegible]ল।

ইহার পরই আসল খেলা—প্রথম টেষ্ট ম্যাচ্।

২৯শে নভেম্বর ব্রিসবেনের মাঠে প্রথম টেষ্ট আরম্ভ হয়। [illegible]লাটি ছয় দিন ব্যাপিয়া হইবার কথা ছিল, কিন্তু [illegible] দিনের খেলা পাঁচ দিনেই শেষ হইয়া যায়

[illegible] ইংল্যাণ্ডের টীম বিশেষ শক্তিশালী করিয়া গঠন করা [illegible]। নেতৃত্ব করেন বিশ্ববিখ্যাত ব্যাট্‌স্‌ম্যান্, ওয়াল্‌টার [illegible]মণ্ড। তাঁর দলে থাকেন বিখ্যাত ব্যাট্‌স্‌ম্যান্—হাটন্, [illegible]য়াশব্রুক্, এডরিচ, ডেনিস কম্পটন্, ইকিন্ এবং [illegible]হকারী অধিনায়ক ইয়ার্ডলী; বোলার—বেড্‌সার, [illegible]ভাস্ এবং রাইট; আর উইকেট-রক্ষক এবং ব্যাট্‌স্‌ম্যান্ [illegible]ন্স।

অষ্ট্রেলিয়া দলের নেতৃত্ব করেন পৃথিবীর অদ্বিতীয় [illegible]ট্‌স্‌ম্যান্ ডন্ ব্র্যাড্‌ম্যান্। আর দলে স্থান পান সেরা [illegible]রা চৌকস খেলোয়াড়, যেমন—ব্যাট্‌স্‌ম্যান্—মরিস্, [illegible]র্ণেস, সহকারী অধিনায়ক লিণ্ডসে হ্যাসেট্, ম্যাক্‌কুল্, [illegible]সন্; বোলার—টোশাক, লিণ্ডওয়াল, ট্রাইব; খ্যাতনামা [illegible]ইকেট-রক্ষক ট্যালন; আর অল্ রাউণ্ডার—কিথ্ [illegible]লার। মিলারের বয়স বর্ত্তমানে ২৭ বছর।

[illegible]টসে অষ্ট্রেলিয়া দলের জয় হইল। ব্র্যাড্‌ম্যান্ মরিস্ এবং [illegible]র্ণেসকে প্রথম জুটি হিসাবে ব্যাট্ করিতে পাঠাইলেন। [illegible]রিষ্কার, শুক্‌নো, খটখটে মাঠ, কিন্তু মরিস্ মাত্র দুই রানেই [illegible]আউট। বার্ণেসও ৩১ রান্ করিয়া রাইটের বলে পরাজিত [illegible]লেন। এইবার সকলের সমবেত করতালি ধ্বনির মধ্যে [illegible]ধিনায়ক ডন্ ব্র্যাড্‌ম্যান্ এবং সহকারী অধিনায়ক [illegible]ণ্ডসে হ্যাসেট্ মাঠে নামিলেন। তারপরে তাঁহারা [illegible]নে এমন খেলা খেলিতে লাগিলেন যে ইংল্যাণ্ডের [illegible] আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ধুরন্ধর বোলারগণ সারা [illegible] বোলিং করিয়াও তাঁহাদের দুইজনকে আউট করিতে [illegible]রিলেন না। দিনের শেষে দেখা গেল, ডন্ ব্র্যাডম্যান্ [illegible]২ রান্ করিয়া নট্ আউট্ আছেন, এবং হ্যাসেট তাহার [illegible]দ্বেক অর্থাৎ ৮৬ রাণ করিয়া নট্ আউট আছেন। [illegible]ট্রেলিয়ার মাত্র ২ উইকেটে ২৯২ রান্ উঠিয়াছে। ডন্ ব্র্যাড্‌ম্যানের খেলা সম্পর্কে "আনন্দ বাজার পত্রিকার" সংবাদদাতা যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তার খানিকটা শোন: "সুদীর্ঘ সাত বৎসর পরে ইংল্যাণ্ড: অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম টেষ্ট্ ম্যাচ্ আরম্ভ হইল, এবং প্রথম দিনের প্রথম খেলার প্রথম ইনিংসেই অধিনায়কের গুরু দায়িত্বভার লইয়া ব্র্যাড্‌ম্যানের ব্যাটিংএ এইরূপ নৈপুণ্য ক্রীড়ামোদিদিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছে।...অনেক দিন পরে মাঠে অবতীর্ণ হওয়াতে অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে, ব্র্যাড্‌ম্যানের আর পূর্ব্বের ন্যায় খেলিবার শক্তি নাই। কিন্তু এই দিনকার এই খেলা দেখিয়া সকলের পূর্ব্ব ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।"

দ্বিতীয় দিনের খেলায় আরও উচ্চাঙ্গের এবং অপূর্ব্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখা গেল। ব্রিসবেনের ক্রীড়ামোদিগণ বহুদিন পরে সত্যিকারের ক্রিকেট দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। পূর্ব্বদিনের নট্ আউট্ ব্যাট্‌স্‌ম্যান্ দ্বয়, ব্র্যাডম্যান্ এবং হ্যাসেট নির্ভুল ভাবে ব্যাট্ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ব্র্যাড্‌ম্যান্ যে ভাবে খেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে অনেকেই ধারণা করিয়াছিলেন তিনি নিশ্চয়ই নিজস্ব দুই শতাধিক রান্ পূর্ণ করিতে পারিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ৩১৫ মিনিট অদ্ভুত খেলা দেখাইবার পর ১৮৭ রান্ করিয়া এড্‌রিচের বলে তিনি হঠাৎ আউট্ হইয়া গেলেন। তাঁহার ক্রীড়ানৈপুণ্য সত্য সত্যই দর্শনীয় হইয়াছিল। এই খেলায় তিনি মোট ১৯টি বাউণ্ডারী করিয়াছিলেন।

এদিকে দেখিতে দেখিতে হ্যাসেট ১২৮ রান্ করিয়া বেড সারের বলে ইয়ার্ডলীর হাতে ক্যাচ্ আউট্ হইলেন। দিনের শেষে দেখা গেল, অষ্ট্রেলিয়ার মাত্র ৫ উইকেটে ৫৯৫ রান্ হইয়াছে। কিথ্ মিলার ৭৯ রান করেন; তাহার মধ্যে একটি ওভার বাউণ্ডারী ছিল।

তৃতীয় দিনে অষ্ট্রেলয়ার প্রথম ইনিংস ৬৪৫ রানে শেষ হইয়া যায়। ম্যাক্‌কুলের ৯৫ এবং জনসনের ৪৭ রান্ বিশেষ উপভোগ্য হয়। বোলিংএ রাইট্ ১৬৭ রানে ৫টি উইকেট, এডরিচ ১০৭ রানে ৩টি উইকেট, এবং খ্যাতনামা বোলার বেড সার ১৫৬ রানে ২টী উইকেট দখল করেন।

এইবার ইংল্যাণ্ড দলের ব্যাট্ করিবার পালা। ইংল্যাণ্ড দল তৃতীয় দিনেই শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় ব্যাটিং

করিতে যায়। প্রথমেই নামেন খ্যাতনামা ব্যাট্‌স্‌ম্যান্‌ হাটন্‌। কিন্তু তিনি মিলারের বলে মাত্র ৭ রান করিয়াই আউট্‌ হইয়া যান। দিনের শেষে তাঁহাদিগের ১ উইকেটে মাত্র ২১ রান্‌ হয়।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা ব্যাট্‌স্‌ম্যান্‌গণ অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোলারদিগের বিরুদ্ধে ব্যাটিং করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু খেলা বেশীক্ষণ চলা সম্ভবপর হইল না। বৃষ্টির জন্য চা পানের পরেই খেলা সেই দিনের জন্য মুলতুবী রাখিতে হইল। বৃষ্টির জন্য পিচের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে এবং ব্যাটস্‌ম্যান্‌গণ মোটেই সুবিধা করিতে পারেন না। সেই দিন ৫ উইকেটে ইংল্যাণ্ড দলের মাত্র ১১৭ রান্‌ হয়।

ইংল্যাণ্ডের ধুরন্ধর ব্যাটস্‌ম্যান্‌গণ, 'যথা হাটন্‌, ওয়াশ-ব্রুক্‌, এড্‌রিচ্‌, ডেনিস্‌ কম্প্‌টন্‌ এবং ইকিন্‌ সকলেই আউট হইয়া যান কিথ্‌ মিলারের মারাত্মক বোলিংএ। তিনি মাত্র ৪৪ রানে ৫টি উইকেট দখল করিয়া তাঁহার আন্তর্জাতিক "অল্‌ রাউণ্ডারের" খ্যাতি আবার প্রমাণ করিয়াছেন। ওয়াশ্‌ব্রুক্‌ করেন ৬, কম্প্‌টন্‌ মাত্র ১৭ আর ইকিন্‌ প্রথম বলেই ০ রানে আউট হইয়া যান। এড্‌রিচ্‌ যদিও মাত্র ১৬ রান্‌ করেন, তথাপি তাঁহাকে বহুবার মিলার ও লিণ্ডওয়ালের বোলিংএর তীব্রতা সহ্য করিতে হয়। খেলার পর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ একরূপ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে বলিলে বোধ হয় তেমন অত্যুক্তি করা হইবে না।

খেলার এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় সকল গুরু দায়িত্ব-ভার পড়ে অধিনায়ক হ্যামণ্ড এবং সহকারী অধিনায়ক ইয়ার্ড্‌লীর উপরে। সমস্ত ইংল্যাণ্ড আশা করিতে থাকে যে, তাঁহারা, অন্ততঃ টেষ্ট ম্যাচে, ইংল্যাণ্ডের মান-সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পঞ্চম দিনে দেখা যায় তাঁহারা দুই জনেই যথাক্রমে ৩২ এবং ২৯ রান্‌ করিয়া আউট হইয়া গিয়াছেন, এবং সমগ্র টীম্‌ ১ম ইনিংস্‌এ মাত্র ১৪১ রানে আউট হইয়া গিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের শোচনীয় পরাজয় এক রকম অবধারিত হইয়া পড়ে। তাঁহারা 'ফলো অন্‌' করিতে বাধ্য হন এবং ৫০৪ রান্‌ পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করেন।

এখানে উল্লেখ করা বাহুল্য হইবে না,—ডন্‌ ব্র্যাড... একাই ইংল্যাণ্ডের এগার জনের চেয়ে বেশী রা... তুলিয়াছেন।

দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা আরও শোচনীয় হয়। হা... কিথ্‌ মিলারের মারাত্মক বলএ ০ রানে আউট হই... দলকে নিরাশ করিয়া দেন। তাঁহার পরবর্ত্তী খেলোয়া... গণও কেহ সুবিধা করিতে পারেন নাই টোশাকের অদ্ভু... বোলিংএ। ২য় ইনিংসএও সমগ্র টীম্‌ ১৭২ রানে আউ... হইয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করেন ইকিন্‌—৩২... তারপরে হ্যামণ্ডের ২৩, ভোসের ১৮, বেডসারের ১... কম্পটনের ১৫ এবং ওয়াশব্রুকের ১৩। টোশাক মা... ৮৬ রানে ৬টি উইকেট দখল করেন। কিথ্‌ মিলার ... রানে ২টি, এবং ট্রাইব ৪৮ রানে বাকী দুইটি। ২ ইনিং... মিলাইয়া কিথ্‌ মিলার ৭৭ রানে বিপক্ষ দলের ৯টি উইকে... দখল করিয়াছেন। টোশাক্‌ দখল করিয়াছেন ৯৯ রা... ৯টি উইকেট। ফলে অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম টেষ্ট ম্যা... এক ইনিংস্‌ ও ৩৩২ রানে বিজয়ী হয়।

এবারকার টেষ্ট্‌ ম্যাচ্‌ সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি ক... উল্লেখযোগ্য। ব্রিসবেনে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৪টি টে... ম্যাচ খেলা হইয়াছে; অষ্ট্রেলিয়া এই সর্ব্বপ্রথম এখা... জয়ী হইতে পারিল।

ব্র্যাড্‌ম্যান্‌ ও হ্যাসেটের সহযোগিতায় তৃতীয় উইকে... ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট্‌ ম্যাচে নূতন রেকর্ড হইয়াছে... ৩য় উইকেটে ২৭৬ রান্‌ যোগ হয়। এর আগের রেক... ছিল ইংল্যাণ্ড দলের পক্ষে জার্ডিন ও হ্যামণ্ডের,—২... রান্‌'।

'. ব্রিসবেন্‌ টেষ্টে এত দিন হেনড্রেন্‌ ব্যতীত কেহ ১... রানের অধিক তুলিতে পারেন নাই ডন্‌ ব্র্যাড... ম্যান্‌ এবার হেন্‌ড্রেনের রেকর্ড অতিক্রম করি... গিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়া দল ব্রিসবেন্‌ টেষ্টে আরও একটি নূ... রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রিসবেনে ৬৪৫ রান্‌ ক... উঠে নাই। ১৯২৮ সনে পার্সী চ্যাপম্যানের টীম ৫... রান্‌ করেন। উহাই এত দিন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল... এবারে তাহাও ভঙ্গ হইয়াছে।

৬৪৫ রান্‌ অষ্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যাণ্ডের অষ্ট্রেলিয়ায় ... ম্যাচের রেকর্ড সংখ্যক রান্‌। এত বেশী রান্‌ ...ষ্ট্রেলিয়ায় কখনও উঠে নাই।

...এবার পাঁচ দিনে ৭৭,৮৪৪ জন দর্শক এই বিখ্যাত ...টি দেখিতে আসেন, টিকেট বিক্রয়ে ১৪,৫১৫ পাউণ্ড ...ওয়া গিয়াছে। ইহাও ব্রিসবেন টেষ্টের রেকর্ড।

ইতিপূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া দল ইংল্যাণ্ডে দুইবার ৭০০র বেশী রান্‌ তুলিয়াছিল। ১৯৩০ এ (৬ উইকেট) ৭৯২ লর্ডস্‌ মাঠে, এবং ১৯৩৪ সনে ওভ্যালে ৭০১। অষ্ট্রেলিয়ায় অষ্ট্রেলিয়া দল সর্ব্বোচ্চ রান্‌ তুলিয়াছিল ১৯৩৪ সনে মেল-বোর্ণে,—৬০৪ রান্‌। ইংল্যাণ্ড সর্ব্বোচ্চ রান্‌ তুলিয়াছিল সিড্‌নীতে ১৯২৮ সনে—৬৩৬ রান্‌।

কাজ-পাগল মানুষ

শ্রীনারায়ণ দত্ত

শিবশঙ্করের সদর দরজাটায় ঘা পড়ে চলেছিল ...জোরে—খট্‌ খট্‌ খট্‌ ....।

অবসর নিয়েছেন শিবশঙ্কর। স্বাধীন রাজ্য গড় চন্দনা ...ষ্টেটের পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগের সর্বেসর্বা ছিলেন তিনি, ...র কাজও করেছিলেন বেশ। নাম আছে খুব,— গোটা ...ই বইও ছাপিয়ে ফেলেছেন ঐ নিয়ে। কর্মজীবনে ...র অভিজ্ঞতার ব্যাপার নিয়ে সেগুলো লেখা। এখন ...নসন্‌ পাচ্ছেন। এতে অবশ্য তিনি খুশী ন'ন, কারণ তাঁর ...রণা তিনি ছাড়া স্টেটের অত বড় পুলিশ বিভাগটা ...রিচালনা করবার লোকই নেই ভূভারতে! এ নিয়ে ...ান কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁকে পুনরায় কাজে নেবার জন্য ...প্রস্তাবও করেছিলেন কিন্তু তা মঞ্জুর হয় নি। তাঁর ...র আর সব সহকর্মীরা শুধু বলেছিল: আচ্ছা কাজ-পাগলা মানুষ তো! শিবশঙ্কর তাতে কাণ না দিয়ে ...র্তৃপক্ষের অবিচারে মুখ বিকৃত করেছিলেন: 'হুঁ, ভা-রী ...য়ে—!'

নীচের তালায় সদর দরজায় শব্দ শুনে শিবশঙ্কর ...জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলেন লোকটাকে। হাঁক-...লেন—'কি চাই হে তোমার?'

'আজ্ঞে আজ্ঞে'—লোকটা আর্ত্তনাদ করতে লাগলো। ...আমার বাবু ঘরের ভেতর দরজা বন্ধ করে বসে আছেন, ...সাড়া দিচ্ছেন না; বেলা দশটা হয়ে গেল অথচ চা ...খেলেন না! একবার দেখবেন আসুন!'

'তাই নাকি!' শিবশঙ্কর হাসলেন 'তা—তা ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধ হয়?'

'না বাবু', চাকরটা ভয়ে কাঁপতে লাগলো, 'এত বেলা তাঁর উঠতে হয় না কোন দিন—একবার আসুন দয়া করে!'

'আচ্ছা, যাচ্ছি'—শিবশঙ্কর তরতরিয়ে নেমে গেলেন নীচেতে। চাকরটা পথ দেখিয়ে চল্‌ল।

সেই গলিতেই বাড়ীটা। দরজার নেম্‌প্লেটে শিবশঙ্কর নামটা জেনে নিলেন বাসিন্দার। চাকরটা বলে চল্‌ল, 'বাবু রোজ সকাল বেলা উঠে চা খান। আমি চা, জলখাবার এনে দেখি বাবু জাগেন নি,—হাজার বার ডাকি, সাড়া নেই।' শিবশঙ্কর কান পেতে শুনলেন, উত্তর দিলেন না। ঘরটা বন্ধ; বদ্ধ দরজার সুমুখে এসে হাঁকলেন, 'ও বরুণ বাবু, ও বরুণ বাবু?' সাড়া নেই।

'একটা কিছু লোহার আনতে পারো হে?' শিবশঙ্কর বললেন, 'কাচ ভেঙে ছিটকিনি খুলতে হবে ভেতরের!' চাকরটা এনে দিলো তাড়াতাড়ি।

লোহার হাতুড়ির ঘায়ে খন্‌ খন্‌ করে ভেঙে পড়লো সার্শীর কাচ। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন শিবশঙ্কর,—তারপর মুখটা বিকৃত করে বল্লেন, 'না, চাবি দেওয়া হে ভেতর থেকে!' চাকরটা বলে উঠল, 'এ বাবুর অভ্যাস। বাবু বলতেন—সাবধানের মার নেই।'

শিবশঙ্কর হাসলেন—বল্লেন, 'হুঁ, দেখ, এই মাঝের কাঠটা ভেঙে ফেলে ভেতরে ঢুকে পড়ি আমি—কি বলো?'

চাকরটার মুখ যেন আমসি হয়ে গিয়েছিল ভয়ে, বল্‌ল, 'তা যা ভাল বোঝেন বাবু!' শিবশঙ্কর কাজের লোক, হাতুড়ির আঘাতে আরও গোটা দুই সার্শীর কাচ আর তাদের মাঝের কাঠটা ভেঙে ফেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন নিজের দেহ।

একটু এগিয়ে গেলেন তিনি, তারপর অস্ফুট এক চীৎকারে পেছু ফিরে এলেন—'খু—ন!'—

'য়্যাঁ! খুন?' চাকরটা ভয়ে কেঁদে ফেলে আর কি।

'আয়, ভেতরে আয়'—শিবশঙ্কর ডাকলেন!

একটা ক্ষুরের তীক্ষ্ণধার পাতে কে যেন কেটে দিয়েছে গলাটা!—ফাঁক তার শ্বাসনালী! স্টেট-পুলিশে খবর দেওয়া হ'ল।

পুলিশ ঘরে ঢুকলো দরজা ভেঙে। পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকে পুলিশ মহল রায় দিলো—এ এমন এক খুন যার কোনও হদিস্ নেই! শিবশঙ্কর বাঁকা হাসি হাসলেন, বল্লেন, 'অপদার্থ,—কোন লোক ছাড়া কোন কিছু হয় না।' পুলিশের বড় কর্ত্তা গোঁফে তা দিয়ে বল্লেন, 'তাও বটে!' সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ চষে ফেল্‌ল খুনীর বাড়ী,—হদিসও মিললো। বরুণ বাবুর দূর সম্পর্কের ভাই ছিল একজন, বরুণ বাবুর মৃত্যুর পর বরুণ বাবুর সব সম্পত্তি পাবে সে।

পুলিশ বলল, সেই খুনী। আত্মহত্যা নয়, কারণ মৃত লোকটার হাতে ক্ষুর ছিল না। সুতরাং সেই ভাই-ই খুনী!

শিবশঙ্কর জেরা করলেন, 'কেন?'

পুলিশ বল্‌ল, 'খুন হবার আগের রাতে বরুণ বাবুর সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়েছিল এবং তা ছাড়া অন্য কোন লোকের আর স্বার্থ কি বলুন?'

শিবশঙ্কর হাসলেন, ফের বললেন, 'হুঁ; কিন্তু খুন করলো কি করে সে? ভেতর হতে চাবি বন্ধ ছিল যে!'

পুলিশ বল্‌ল, 'ডুপ্লিকেট চাবি পাওয়া গেছে ঐ ঘরের, খুনীর কাছ হ'তে!'

শিবশঙ্কর গর্জ্জে উঠলেন, 'কিন্তু হ'ল কি করে খুন?' পুলিশ উত্তর দিল না, বিচার হয়ে গেল,—রায় বেরুলো—খুনীর ফাঁসি হবে।

"ফাঁসি!" শিবশঙ্কর চমকে উঠলেন, টেবিলে সজোরে ঘা মেরে বললেন, 'এ হতে পারে না। যত সব অপদার্থ!'

এক হুলস্থুল পড়ে গেল রাজ্যে। কাগজে কাগজে বেরুল শিবশঙ্করের প্রশ্ন: খুন হ'ল কি করে? [illegible] শুদ্ধ লোক তো থাপ্পা! পুলিশ বল্ল: 'ঐ একটা সামান্য [illegible] জন্য এত বড় একজন পাপী লোক—খুনী লোক রেহাই পেতে পারে না।'

শিবশঙ্কর আর একবার বল্লেন: 'অপদার্থ।'

সোজা ট্যাক্সি করে তিনি চল্লেন পুলিশের বড় কর্ত্তার কাছে। গিয়েই বলে উঠলেন, 'এ ফাঁসি রদ করতে হবে।'

বড় কর্ত্তা বললেন: 'তা কি করে হয়? প্রমাণ যা সব তো খুনীর বিপক্ষে, কি করি বলুন?'

'কিন্তু আমি জানি খুনী কে।' শিবশঙ্কর বললেন।

'আপনি!' বড় কর্ত্তা চমকে উঠলেন।

'হ্যাঁ,—আর সে খুনী কে জানেন? আমি, শিবশঙ্কর মহাপ্রতাপ। গত রাত্রে বরুণ বাবুর সংগে আলাপ করতে গিয়ে খুব বেশী পরিমাণে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলাম তাঁর চায়ে,—আর সকালে আমিই প্রথম ঘরে ঢুকে তাঁর গলায় ক্ষুর চালিয়ে দিই। দেখলেন তো কত অপদার্থ আপনার পুলিশ কর্মচারী! ওরা সব অপদার্থ। আমি হাতে হাতে প্রমাণ করে দিলাম। অথচ আমাকেই কিনা ওঁরা ফিরে বহাল করতে চাইলেন না!' শেষ বারের মত কথা বললেন শিবশঙ্কর, সংগে সংগে পকেট থেকে পিস্তল বার করে টিপে দিলেন কপালে। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সেই কাজ-পাগল মানুষ। রক্তে লাল হয়ে গেল জায়গাটা।

'আচ্ছা কাজ-পাগল লোক তো! কাজের অভাবে বসে থাকতে থাকতে মাথাই খারাপ হয়ে গেল—আর শেষটা কাজ দেখাবার জন্য এমন একটা ভীষণ কাজ করে বসল!' একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে বড় কর্ত্তা আপন মনে বললেন।*

*ইংরেজী থেকে।

রাধামাধবের রত্নহার

শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

ফিরিঙ্গীর দোস্ত্

ফিরিঙ্গীর চকে দিনের আলো ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতেছে। জঙ্গলের ভিতর দিয়া সরু পায়ে-চলা পথ, দুপাশে বড় বড় গাছ,—তাদের ঘনসন্নিবিষ্ট ডালপালা পথটিকে আরও অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। দূরে আবছা অন্ধকারে পর্ত্তুগীজ দুর্গের সুউচ্চ প্রাচীর ঘুমন্ত দৈত্যের মত অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

পথ নির্জ্জন। শুধু ঝাউগাছের ফাঁকে ফাঁকে বাতাস বহিয়া একটা সোঁ সোঁ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে; দূরে ঝিঁঝি পোকার একটানা সুর, এবং ক্কচিৎ শুক্‌নো ঝরা পাতার উপর কাঠবিড়ালী বা ঐ জাতীয় কোন প্রাণীর চলাফেরার খস্ খস্ আওয়াজ!

সেই পথ দিয়া মন্থর গমনে চলিয়াছে একজন ফকির। পরনে ঢিলা আলখাল্লা, তার ভাঁজে ভাঁজে ময়লা জমিয়া কালো কালো রেখার সৃষ্টি করিয়াছে। গলায় কয়েক গাছা ছোট-বড় নানা আকারের নানা রংএর মালা, মাথায় ময়লা পাগড়ী—এলোমেলো ভাবে জড়ানো। ফকিরকে কিন্তু বেশ বুড়াই মনে হইতেছিল। কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান করিতে করিতে সে হাটিয়া চলিয়াছিল।

দুর্গের কাছাকাছি পৌছিয়া ফকির হঠাৎ থামিয়া গেল; কিছুক্ষণ আপন মনে কি ভাবিয়া লইল, তার পর দুর্গের প্রধান ফটকের দিকে না আগাইয়া জঙ্গল ভাঙিয়া দুর্গের পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইল।

দুর্গের দক্ষিণে ও পশ্চিমে ভাগীরথী তার বিশাল জল-রাশি লইয়া সমুদ্রের উদ্দেশে বহিয়া চলিয়াছে। নদী এখানে এত চওড়া যে এপার ওপার সহসা চোখে ঠাহর হয় না। দুর্গের উত্তর ও পুব দিক ঘিরিয়া প্রশস্ত পরিখা, তাহাও গঙ্গার জলে কানায় কানায় ভর্ত্তি—বাহির হইতে নৌকার সাহায্যে বা সাঁতার না কাটিয়া দুর্গপ্রাচীরে পৌছান যায় না। উত্তর দিকে দুর্গের প্রধান ফটক। আলগা সেতু দিয়া ফটকে পৌছান যায়, আবার দরকার হইলে কপিকলের সাহায্যে সেতু তুলিয়া রাখা চলে।

ফকির পরিখার ধার দিয়া দিয়া দুর্গের পুব দিকটা প্রায় প্রদক্ষিণ করিয়া ফেলিল। চারিদিকে সুকঠিন মসৃণ প্রাচীর, খাড়া উঠিয়া গিয়াছে। অস্পষ্ট অন্ধকারেও তার দুর্ভেদ্যতা সম্বন্ধে আন্দাজ করিতে কোন কষ্ট হয় না। হাটিতে হাটিতে ফকির দক্ষিণ-পূব কোণে একেবারে গঙ্গার ধারে গিয়া হাজির হইল। এখানেও দুর্গের মসৃণ দেয়াল জল হইতে খাড়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। অনেক উঁচুতে কয়েকটি ছোট ছোট ঘুলঘুলি হইতে ক্ষীণ আলোক-রেখা আসিয়া গঙ্গার চঞ্চল স্রোতে পড়িয়া কাঁপিতেছে। ইহা ছাড়া সমস্ত দুর্গটি যেন একটি মূর্ত্তি-

মান্ রহস্য—কোথাও জীবনের চিহ্ন নাই। ফকির খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, তার পর ঘুরিয়া বিপরীত দিকে অগ্রসর হইল।

সন্ধ্যার অন্ধকার আরও একটু গাঢ় হইলে ফকির ধীরে ধীরে দুর্গের প্রধান ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ফটকের ঠিক মুখেই বন্দুক হাতে একজন প্রহরী, বোধ হয় অন্য কিছু করিবার না থাকায়, বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। ফকির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকে দেখিয়া লইয়া আরো কাছে আগাইয়া আসিল।

"সেলাম আদ্‌মিরাল্ সাহেব, মেজাজ শরীফ?"

প্রহরী চমকাইয়া উঠিয়া বিদ্যুৎ-বেগে বন্দুক আঁকড়াইয়া ধরিল। চোখে তলোয়ারের ধার হানিয়া উগ্র কণ্ঠে হাঁকিল—"কে? তফাৎ যাও।"

কিন্তু ফকিরের দূরে যাইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। হাসিমুখে প্রহরীর একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর তেমনি স্মিত হাস্যে সেলাম জানাইয়া কহিল, "আমি, আদ্‌মিরাল সাহেব! আপনাদের দোস্ত।"

"দোস্ত!"—ফিরিঙ্গী প্রহরী সন্দেহাকুল চোখে ফকিরকে খুঁটিয়া দেখিতে লাগিল। দুর্গতোরণে ঝুলান বড় ঝাড়-লণ্ঠন হইতে এক ঝলক আলো এবার ফকিরের ঠিক মুখের উপর পড়িয়াছিল। "কিন্তু, কই, দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না তো!"

"আরে, আপনার কি মনে থাকতে পারে! আমি একটা সামান্য ফকির, পথে-ঘাটে খোদার নাম নিয়ে বেড়াই। ভারী তো লোক আমি! কিন্তু আদ্‌মিরাল, আপনাকে আমি অনেক বার দেখেছি। বন্দুক হাতে লড়াইয়ের সময় আপনার সেই বীর মূর্তি—সে কি সহজে ভুলবার? তা ছাড়া কে না জানে এই কেল্লার আপনি একজন মুরুব্বি লোক? নইলে যে সে লোক কি এই ফটকের জিম্মায় থাকতে পারে আদ্‌মিরাল্?"

বার বার 'য়্যাড্‌মিরাল' অর্থাৎ সেনাপতি সম্বোধনে ফিরিঙ্গী প্রহরী মনে মনে খুসী হইল। এ লোকটা একেবারেই উজবুক সন্দেহ নাই, নহিলে দুর্গের পাহারাদারকে য়্যাড্‌মিরাল বলিয়া ভুল করে! কিন্তু কি দরকার ইহার কাছে সত্য কথা বলিয়া ভুল সংশোধন করিয়া দিবার! বোকা মানুষকে বোকা বানা[illegible] একটু খাতির পাওয়া যায় দোষ কি তাহাতে?

ফকির তথনও বলিয়া চলিয়াছে—"ভাগিস্ আপ[illegible] পর্তুগীজ্‌রা, এ দেশে সময় মত এসে গেছেন, তাই হয় দেশটা বেঁচে গেল। নইলে দেশের [illegible] হয়েছিল! দু' দিন বাদে আপনারাই হবেন এ [illegible] রাজা—মালিক, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পা[illegible] আর একটু ঢোঁক গিলিয়া কহিল, "আর বলতে [illegible] বুড়ো হ'তে চলেছি, নইলে আমিও আপনাদের এ[illegible] হয়ে যেতাম।"

ফিরিঙ্গী প্রহরী এবারে কথা বলিল, পাদ্রীর [illegible] বিজ্ঞের মত কণ্ঠে কহিল, "তাতে-কি, যা সত্যি [illegible] আশ্রয় সব সময়েই নেওয়া যায়। তার জন্য বয়স লাগে[illegible] অনন্ত নরক থেকে একমাত্র আমাদের প্রভুই রক্ষা ক[illegible] পারেন। আর সব বিলকুল ঝুটা। আচ্ছা, তোমা[illegible] আমি দিনের বেলা পাদ্রী বারেটো সাহেবের কাছে [illegible] যাব। রাত্রে তো কারও কেল্লায় ঢুকবার হুকুম নে[illegible] তা তুমি এখানে কোথায় এসেছিলে?"

"কোথায় আর! ফকির মানুষ, পথে-ঘাটে [illegible] বেড়াই, আমাদের কি চাল-চুলো আছে? যেখানে [illegible] খাই, যেখানে হয় রাত কাটিয়ে দিই। সকালে এসেছি[illegible] ভাটিয়ার চরে। একটু ওষুধ-বিষুধ জানা আছে, [illegible] মেহেরবাণি ক'রে দিয়েছেন। এর ওর একটু উপ[illegible] হয়। তার পর এ বেলা হাঁটতে হাঁটতে এই আপনা[illegible] এখানে এসে পৌঁছেছি। তা এ জায়গাটাকে বুঝি [illegible] ফিরিঙ্গীর চক্? খাসা জায়গা। আর আপনাদের [illegible] কেল্লা, মাশা ছুঁয়ে বলছি, এমন আর কোথাও দেখি[illegible] এ কেবল, আদ্‌মিরাল্, আপনাদের জাতের হাতেই [illegible] কি পেল্লায় ব্যাপার, বাবাঃ!"

প্রহরীর মুখে এবার আত্মপ্রসাদের হাসি [illegible] উঠিল। মৃদু হাসিয়া কহিল, "তবু তো শুধু বাই[illegible] দেখেছ, ভেতর দেখলে"—

"খুব জমকালো বুঝি?"—ফকিরের চোখে-মুখে অ[illegible] বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। "ভিতরে বুঝি খুব বড় বড়[illegible] আছে—সব পাথরের, য়্যাঁ? আচ্ছা, মাটির তলায় [illegible] এক সুড়ঙ্গ আছে—হুগলী পর্য্যন্ত চলে গেছে?"

[illegible] বোকাটার সামনে একটু বড়াই করিবার ইচ্ছা [illegible]কে ক্রমেই পাইয়া বসিতেছিল, কিন্তু ভিতরের কথা [illegible]হিরের লোককে, তা সে দোস্তই হোক আর যেই হোক, [illegible] ঠিক হইবে কিনা ভাবিয়া সে ইতস্ততঃ করিতে [illegible]গিল। ফকির এবার ধীরে ধীরে আলখাল্লার ভিতর [illegible]তে ছোট একটি গেঁজিয়া বাহির করিল। তারপর [illegible] ভিতর হইতে সযত্নে কি খানিকটা বাহির করিয়া [illegible] ভিতর ফেলিয়া দিল। তারপর তাহারই খানিকটা [illegible]রীর সামনে ধরিয়া কহিল, "জর্দ্দা-টর্দ্দা খাবার অভ্যাস [illegible]ছে নিশ্চয়ই—এ মুল্লুকে যখন আছেন? এ খোদ [illegible]শীর জর্দ্দা,—বহুৎ খোসবাই।" প্রহরী একটু কিন্তু [illegible] করিয়া শেষে খানিকটা জর্দ্দা লইয়া মুখে ফেলিয়া [illegible]ল।

"পান—এক খিলি? আদ্‌মিরাল? খুব মিঠা পান, [illegible]বাহারী মশলাদার।"—ফকির গেঁজিয়া হইতে পান [illegible]হির করিয়া আগাইয়া দিল, নিজেও একটি মুখে ফেলিতে [illegible] করিল না। কিন্তু তার আপ্যায়ন তখনও শেষ হয় [illegible]ই। অতঃপর একটা তুলিতে সামান্য আতর মাখাইয়া [illegible]আদ্‌মিরালের' সামনে ধরিয়া কহিল,—"গোঁফে মাখিয়ে, [illegible]কানে দিয়ে রাখুন।"

এবারে ফিরিঙ্গী প্রহরীর মুখে হাসি ফুটিল। মনে [illegible] ভাবিল, লোকটা বোকা হইলেও দিল্-খোলা সন্দেহ [illegible]াই।

"বেয়াদবী মাফ করবেন, আমরা ফকির মানুষ—একটু [illegible]য়া-টোয়াও টানা পছন্দ করি। ঠাণ্ডার মুখে, বেশ [illegible]াগে।" ফকির একটি ছোট কলিকা লইয়া আগুন [illegible]লাইল, তার পর কৌশলে দুই হাত একত্র করিয়া একটি [illegible] দিয়া তৃপ্তির সঙ্গে ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল—"এ জিনিষের [illegible] তুলনা নেই! আপনাদের সাগরপারে শুনেছি অনেক [illegible] আশ্চর্য্য জিনিষ জন্মায়—কিন্তু এ জিনিষ এই [illegible]লো মুলুক ছাড়া কোথাও পাচ্ছেন না।"

প্রহরীর দৃষ্টি আবার লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল—"তা, [illegible] ও জিনিষ যে চাখি নি তা নয়; তবে বেশী কড়া [illegible]বার সহ্য হবে কি?"

"কিছু না, কিছু না। ঠাণ্ডার মুখে খাসা লাগবে। দিন, আপনাকে ভাল জিনিষ দিচ্ছি।" ফকির গাঁজার কলিকায় নতুন করিয়া মশলা পুরিয়া আগাইয়া দিল, ভাল করিয়া টানিবার কৌশলও দেখাইয়া দিল। কয়েক বার কাসিয়া প্রহরী অবলীলাক্রমে ধূম উদ্গীরণ করিয়া চলিল। জিনিষটা তার তেমন অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না। ক্রমে তার মনটাও ভিজিয়া আসিল—তা তাদের পরবর্ত্তী কথাবার্ত্তা হইতেই বুঝা যায়।

"আচ্ছা, এ কেল্লাটা তো দোতালা, নয়? ঘরের ওপর ঘর?" ফকির জিজ্ঞাসা করিল।

"দোতালা? ফোঃ, কি যে তোমাদের ধারণা! চার-তলা। এক—দুই—তিন—চার। আবার তার ওপর টাওয়ার আছে। সেখানে উঠে চার দিকে কয়েক ক্রোশ অবধি সব কিছু দেখা যায়। তা ছাড়া মাটীর তলায়ও আছে একটা তালা।"

"মাটীর তলায় একটা তালা! বলেন কি! তাজ্জব ব্যাপার! সেখানে বুঝি হাঁস-মুরগী রাখা হয়?"

'দূর্ বোকা," ফিরিঙ্গী ফকিরের মূর্খতা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। "সেখানে রাখা হয় সব কয়েদীদের। যাদের বন্দী ক'রে আনা হয় নানা জায়গা থেকে।"

"ও! তা মাটীর তলা তো হ'ল গঙ্গারও নীচে। নদীর জল ঢুকে পড়ে না ঘরে?"

"আরে, না রে, না। কেল্লার ভিৎটা তো নদীর চাইতে অনেকটা উঁচু কিনা, তাই কেল্লার যে ঘর রয়েছে মাটীর নীচে—আসলে তা নদীর খানিকটা উপরেই রয়েছে। অবশ্যি বেশী ওপরে নয়।"

"জানালা খুললেই বুঝি নীচে নদীর জল চোখে পড়ে?"

ফিরিঙ্গী আর একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, "দূর, জানলা কোত্থেকে আসবে! কয়েদীদের ঘর শুনছ না? জানলা বসিয়ে তাদের পালাবার পথ ক'রে দেয় কেউ? তবে, ভেতরের দিকে হাওয়া ঢুকবার কয়েকটা গর্ত্ত আছে বটে।"

"আর আলো?"

"আলো! কয়েদীদের জন্য আবার আলো! আর মাটীর তলায় কোত্থেকে আলো আসবে, এক মশাল বা লণ্ঠনের আলো ছাড়া? তবে হ্যাঁ, নদীর দিকে একটা

গুপ্ত দরজা রাখা হয় সময় অসময়ে বিপদ-আপদের জন্য। তা সে দেয়ালের সঙ্গে এমনি ভাবে সাঁটা যে না জানা থাকলে কারও বাপের সাধ্যি নেই তা খুঁজে বার করতে পারে।"

"ভারী অদ্ভুত তো! আচ্ছা আদ্‌মিরাল, আপনাদের এখানে দেশ ছেড়ে এসে কষ্ট হয় না? কেল্লায় আর কত লোকই বা আছেন? গল্পগুজব—একটু ফুর্ত্তি-টুর্ত্তি, এর তো কিছুই উপায় নেই!"

"কেন থাকবে না? কি তুমি মনে কর আমাদের! এ কি তোমাদের দেশী হাঁড়ীমুখোর দল পেয়েছ? কাজের সময়ে কাজ, ফূর্ত্তির সময়ে ফূর্ত্তি। সন্ধ্যার কিছু পরেই কেল্লার বড় ঘরে সব জড় হবে—তার পর রাত দুপুর অবধি চলবে খাওয়াদাওয়া—ফুর্ত্তি, হৈ-হল্লা। সময় সময় স্বয়ং পাদ্রী বারেটোও এসে তাতে যোগ দেন। আমাদের দেশের মদ—সে তো চাখ নি কোন দিন! আচ্ছা, তুমি তো দোস্ত্‌ হ'লে, খাওয়াব একদিন তোমায়।"

"তা সবাই ফুর্ত্তি করলে কেল্লা দেখাশোনা করে কে?"

"কয়েক জনের ওপর ভার থাকে পাহারা দেবার। এই যেমন আজ আমি ফটকে বসেছি। তেমনি ভেতরে ভেতরেও পাহারা দেবার লোক আছে। তাদের জায়গা ছেড়ে যাবার নিয়ম নেই।"

"সেই নদীর ধারে পাতালকুঠুরী পর্য্যন্ত বরাবর পাহারা থাকে? কম লোক লাগে না তো!"

"কেবল বড় বড় জায়গাগুলোতে থাকে; তাই বলে কি আর গলিঘুঁজিতে লোক দরকার হয়? এই ধর না, এই ফটকের বাঁ দিকের গলি দিয়ে ঢুকলেই একেবারে কেল্লার দক্ষিণ-পূব কোণায় যে চোর-কুঠুরী আছে সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া যায়। তাই ব'লে কি সেখানে পাহারার দরকার হয়? অত সরু গলি—কে আর তার কথা জানতে আসবে বল?"

"তা তো বটেই। আচ্ছা আদ্‌মিরাল, আপনাদের দেশের গল্প বলুন না, সেখানেও কি এত বড় বড় নদী আছে?"

ফিরিঙ্গীর নেশা বেশ জমিয়া আসিতেছিল, দেশের কথায় সে খুব উত্তেজিত হইয়া পড়িল। "কি যে বল! আমাদের সে সমুদ্রের দেশ। জলেই তো আমরা মানু[ষ]... নদীকে আমরা থোড়াই গ্রাহ্য করি!" তার পর... অনর্গল স্বদেশের গল্প নানা রং চড়াইয়া বলিয়া যা[ইতে] লাগিল।

ফিরিঙ্গী একটু দম নিবার জন্য থামিলে ফকির বা[লিল]... "আর এক ছিলিম হবে নাকি? না, এবার বোধ [হয়] ফটক তুলতে হবে? সময় হয়ে এল বোধ হয়?"

ফিরিঙ্গী তাচ্ছীল্যের সহিত কহিল, "দেরে? ... আর এক ছিলিম। চাঁদনী রাত আছে, একটু ... হ'লেও এসে যাবে না, গল্পটা শেষ করে নি।"

ফকির গেঁজিয়া হইতে আর একবার "মশলা" বা[হির] করিল। কিন্তু এবারকার ছিলিমটি যেন একটু ... কড়া—দুই-এক টান দিবার পরই ফিরিঙ্গীর কথা ... জড়াইয়া আসিতে লাগিল; দুই-একবার হাই তুলি[য়া] সে একটু আড় হইয়া শুইল। গল্পের স্রোত আ[গের] মত পূর্ণ বেগে আর বহিয়া চলিতে পারিল না, তা[তে] টান লাগিয়াছে যেন তাতে! একটু পরেই দেখা [গেল] ফিরিঙ্গী গভীর নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে।

ফকির আর সময় নষ্ট না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াই[ল]... অতি সন্তর্পণে ফিরিঙ্গীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তার না[ড়ী] বুক ইত্যাদি পরীক্ষা করিল। না, ঘুম বেশ গভ[ীর] হইয়াছে। ওষুধের ক্রিয়া সুরু হইয়াছে তবে। এ ঘু[ম] ভোরের আগে ভাঙ্গিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ফকি[র] ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "ঘুমাও আদ্‌মিরাল, ঘু[মাও] দোস্ত্‌, আরাম ক'রে ঘুমাও। আবার বন্দুক নিয়ে ... করা কেন? ওটা এখন আমার জিম্মায় থাক্‌, কেমন?" ঘুমন্ত প্রহরীর হাতের মুঠি হইতে বন্দুকটি খুলিয়া লই[তে] বিশেষ কষ্ট হইল না। বন্দুকটি আকারে ছোটখাট, কি[ন্তু] বেশ মজবুত। ও জিনিষ এ দেশে তখনও আমদা[নী] হয় নাই। ফকির বন্দুকটি সন্তর্পণে নিজের বিরাট ... আলখাল্লার মধ্যে পুরিয়া দিল—এবং সহজেই ... সেখানে বেমালুম ঢুকিয়া গেল।

তখন ফকির এদিক্‌ ওদিক্‌ চাহিয়া গম্ভীর মুখে ফটকে[র] ভিতর দিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মীরাট নগরে ভারতের জাতীয় [কং]গ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন যথা সময়ে শেষ হয়েছে। ... ছ'বছর পরে এবার কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। [সভা]পতি হয়েছিলেন আচার্য্য কৃপালনী। ভারতের বর্ত্তমান [সা]প্রদায়িক অশান্তির জন্য কংগ্রেসের অধিবেশন খুব ...সিধে ভাবে বিনা আড়ম্বরে শেষ করা হয়। অবশ্য ...সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

*　　*　　*　　*

এবারে যিনি কংগ্রেস সভাপতি (রাষ্ট্রপতি) নির্ব্বাচিত [হয়ে]ছেন তাঁর পূরো নাম জীবৎরাম ভগবান্‌দাস [কৃপ]ালনী। ইনি সিন্ধু দেশের লোক এবং এঁর বয়স এখন ... বছর। গত ১২ বছর ধরে ইনি কংগ্রেসের সম্পাদকের ... ক'রে আসছেন। প্রথম জীবনে ইনি অধ্যাপনা [কর]তেন—মজঃফরপুরে এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও [অধ্]যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গান্ধীজি সবরমতী [বিদ]্যাপীঠ স্থাপন করলে কৃপালনী তার আচার্য্য পদ গ্রহণ [কর]েন এবং সেই থেকে আচার্য্য কৃপালনী নামে পরিচিত ...। দীর্ঘ দিন ইনি দেশের সেবায় নিয়োজিত আছেন। [আ]চার্য্য কৃপালনীর বিদুষী পত্নী শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী [বাঙ্]গালীর মেয়ে! ইনিও এক সময়ে কাশী হিন্দু বিশ্ব[বিদ]্যালয়ে অধ্যাপিকা ছিলেন। দেশের কাজে ইনিও ...দা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

*　　*　　*　　*

গত ৯ই ডিসেম্বর ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় [দি]ন গেছে। ঐ দিন দিল্লীতে ভারতের গণপরিষদের [প্রথ]ম অধিবেশন সুরু হয়। এই গণপরিষদ্‌ই ভবিষ্যৎ [স্বা]ধীন ভারতের শাসনতন্ত্র স্থির করবে তা হয়তো জান। [গণ]পরিষদে কংগ্রেস ও অন্যান্য সমস্ত দলের ও সমস্ত [সম্প্]রদায়ের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছেন—শুধু মুসলিম্‌ [লী]গ দল এখনও যোগদান করেন নি। বিহারের প্রবীণ জননায়ক ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রবীণতম সদস্য ব'লে

গণপরিষদের নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

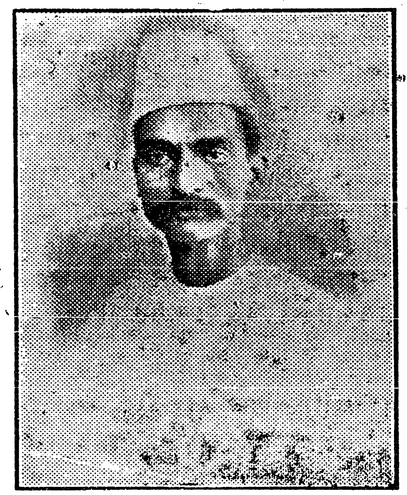

অস্থায়ী সভাপতিরূপে পরিষদের উদ্বোধন করেন। স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

*　　*　　*　　*

গণপরিষদ্‌ সুরু হবার কয়েক দিন আগে মুসলিম্‌ লীগ্‌-সভাপতি মিঃ জিন্না তাঁদের দলের পরিষদ্‌ বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলে ব্যাপারটা নিয়ে খুবই সাড়া পড়ে যায়; এবং শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পরিস্থিতি সহজ করবার জন্য আলোচনার উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়াভেল, পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দ্দার প্যাটেল, মিঃ জিন্না, মিঃ লিয়াকৎ আলি ও সর্দ্দার বলদেও সিংকে বিলাতে আমন্ত্রণ করেন। কংগ্রেস দল ও সর্দ্দার বলদেও সিং প্রথমটা যেতে রাজী হন নি, কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শেষে অল্প ক'দিনের জন্য বিলাত যাত্রা করেন। সর্দ্দার প্যাটেল

অবশ্য যান নি। বিলাতে গিয়েও কিন্তু পরিস্থিতি সহজ হয় নি, বরঞ্চ নতুন নতুন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে ব'লে এখানকার রাজনৈতিক মহল মনে করছেন।

* * * *

মহাত্মা গান্ধী এখনও নোয়াখালির পল্লী-অঞ্চলে কঠোর ব্রত নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সে খবর বোধ হয় সবাই জান। নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক অবস্থা স্বাভাবিক না হ'লে তিনি ওখান থেকে নড়বেন না এই তাঁর স্থির সংকল্প। সম্প্রতি আবার তিনি দলবল ত্যাগ ক'রে একা একা গ্রামে বাস করার সংকল্প করেছেন। সঙ্গে নিয়েছেন শুধু একজন স্টেনোগ্রাফার—আর, মহাত্মাজি বাংলা জানেন না ব'লে, একজন দোভাষী—অধ্যাপক নির্ম্মল বসুকে। শুধু তাই নয়, গ্রামের লোকদের সঙ্গে যাতে খোলাখুলি ভাবে কথা বলতে পারেন সেজন্য এই ৭৮ বছর বয়সে নতুন ক'রে তিনি বাংলা ভাষা শিখতে সুরু করছেন। আজকাল তিনি বাংলায় নাম সই করতে পারেন—এবং ধীরে ধীরে বললে বাংলা কথাও নাকি বেশ বুঝতে পারেন।

* * * *

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায়—জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আইন জারি করেছেন তার প্রতিবাদে সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের সভায় এক প্রস্তাব আনা হয়েছিল। তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সদস্যগণ বিপুল ভোটাধিক্যে ভারতীয়দের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা যে পাল্টা প্রস্তাব এনেছিল তা অগ্রাহ্য হয়েছে। ব্রিটেনের প্রতিনিধি দক্ষিণ আফ্রিকাকেই সমর্থন করেছিলেন।

* * * *

ফ্রান্সে আবার নতুন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এবার প্রধান মন্ত্রী হলেন মসিয়ে ব্লুম্। ইনি রাজনৈতিক জগতে খ্যাতনামা ব্যক্তি—যুদ্ধের আগেও ফ্রান্সের প্রধান ক'রে গেছেন।

* * * *

সম্প্রতি খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী পূর্ণচন্দ্র দে উচ্চ মহাশয় পরলোক গমন করেছেন। অনেক উচ্চট কবিতা সংগ্রহ ক'রে বাংলা ভাষায় তা প্রকাশ করায় ঐ উপাধি দেওয়া হয়েছিল এবং ঐ নামেই তিনি সমাজে পরিচিত ছিলেন।

* * * *

সম্প্রতি শিশুসাহিত্য-পরিষদের ২য় বার্ষিক অধি হয়ে গেছে। বর্ত্তমান বছরের জন্য নিম্নলিখিত সাহিত্যি গণ কর্ম্মকর্ত্তার পদে নির্ব্বাচিত হয়েছেন :—সভাপতি মৌচাক-সম্পাদক প্রবীণ শিশুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধীর সরকার। সহ-সভাপতি—পাঠশালা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ন দেব, শ্রীযুক্ত স্নেহাংশুকান্ত আচার্য্য ও ডাঃ জে সি. মুখা সম্পাদক—রামধনু-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টা ও শ্রীযুক্ত গিরীন চক্রবর্ত্তী। সহ-সম্পাদক—শ্রী সুনীল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়। নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য—কৈশোরক সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মাসপয়লা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতী ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খ নাথ সেন, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, অধ্যক্ষ কে. ডি. শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধর, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাংলা-সম্পাদক স্বামী প্রেমঘনানন্দ, শিশুসওগাত-সম্পা মিঃ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, শ্রীযুক্ত সুকুমার দে সরকার, অশোক গুহ, শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নির্ম সিংহ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত অমলশঙ্কর যুগান্তরের ছোটদের আসরের পরিচালক শ্রীযুক্ত অ নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। হিসা পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত সাধুশরণ ধর। তা ছাড়া পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পরিষদের সম্মান-সূচক 'মহাভদ্র' পদেও নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

রামধনুর প্রিয় বন্ধুগণ,

এক মাস পরে আবার তোমাদের সামনে নতুন রামধনু নিয়ে হাজির হলাম। তোমাদের মধ্যে যারা স্কুলে তাদের সকলেরই বাৎসরিক পরীক্ষা এত দিনে শেষ হয়ে গেছে, আবার সবাই নতুন ক্লাসে উঠলে। এই ছুটী ভারী মজার, না? পরীক্ষায় কে কে কৃতিত্ব দেখালে জানালে খুসী হব। যারা এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবে তারা হয়তো এখন খুবই ব্যস্ত, নয় কি? ইতিমধ্যে তোমাদের লেখা অজস্র চিঠি পেয়েছি। তার বেশীর ভাগই ব্যক্তিগত কথা বা প্রশ্ন নিয়ে লেখা, তা ছাপাবার কোন যৌক্তিকতা দেখছি না। অবশ্য থেকে তোমাদের মনের আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছি। সব চিঠি সকল গ্রাহকের কৌতূহল মেটাতে পারে ই-ই শুধু ছাপা যেতে পারে। যারা ছাপাতে চাও তারা ই রকম চিঠি লিখবে।

শ্রীমহিম দত্ত, শ্রীসুলেখা বসু ও কুমারী রাবেয়া খাতুন নতে চেয়েছেন—রামধনু কবে আবার আগের মত সাদা রবে কাগজে ছাপা হবে। কাগজ-নিয়ন্ত্রণ আইনের রামধনুর পৃষ্ঠাসংখ্যা বাধ্যতামূলক ভাবে কমাতে হয়ে ন ব'লে আমরা সাদা কাগজ ছেড়ে খবরের কাগজ বার বিশেষ ধরণের কাগজে রামধনু ছাপবার অনুমতি ছিলাম। এ কাগজে পত্রিকা ছাপলে তা কাগজ-রণের আওতায় আসে না—সংবাদ পত্রের কাগজ বা উজ্ প্রিণ্ট"-নিয়ন্ত্রণ আইনের ভিতর পড়ে। এ নেবার শুধু আর কিছু নয়, সাদা কাগজে ছাপলে যে ক' দেওয়া যেত তার কিছু বেশী পৃষ্ঠা এতে দেওয়া যায়। ইচ্ছা করলে আমরা এ কাগজ ছেড়ে সাদা কাগজ ব্যবহার সুরু করতে পারি কিন্তু তা'তে পৃষ্ঠা আরও কমাতে হ'ত,—আরও কম লেখা পরিবেশন করতে হ'ত। তাই খেল্লো কাগজে ছেপেও রচনাসম্ভারে রামধনুকে উৎকৃষ্টতর রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা হয়েছে। নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কাগজ-নিয়ন্ত্রণ আদেশও শীঘ্রই একদিন শেষ হবে—তখন আবার ধবধবে কাগজে রামধনু বেরোবে। তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছ, লেখা বেশী দেবার জন্য আমরা এক কলমের জায়গায় দু' কলম, এবং বড় অক্ষরের বদলে ছোট অক্ষর ব্যবহার করছি। এতে আমাদের খরচ অনেক বেড়ে গেলেও আগেকার রামধনুর এক-এক পৃষ্ঠায় যতটা লেখা আঁটত, এখন তার প্রায় দেড় গুণ লেখা আঁটছে। অবস্থা বুঝে এই ব্যবস্থাই ভাল হয় নি কি?

শ্রীপ্রদ্যোত গুহ ও শ্রীশিবানী দেবী জানতে চেয়েছেন 'বিচার সভা' বিভাগ কেন আর বেরোয় না? ওটা গ্রাহকদের প্রশ্নোত্তরের বিভাগ। তারা উদ্যোগী হলেই নিয়মিত বেরোতে পারে।

আশ্বিন মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় আমরা আশানুরূপ লেখা পাই নি। বাংলা শিশুসাহিত্যের যাঁরা গোড়া-পত্তন ক'রে গেছেন তাঁদের সম্বন্ধে তোমরা আগ্রহ দেখিয়ে তাঁদের জীবন-কথা খুঁজে বার করবে এই আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু খুব কম গ্রাহক-গ্রাহিকাই সে পরিশ্রম স্বীকার করতে চেয়েছ।

ডাকের গোলমাল এখনও চলছে। এ বিষয়ে গত বারে যা বলেছি তারই পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া উপায় নেই। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। ইতি—রাঃ সঃ।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

পথে বিপথে—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। হিন্দুস্থান বুক ডিপো, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৸০

ছোটদের জন্য রচিত ১৯৪ পৃষ্ঠার একটি উপন্যাস। আখ্যান ভাগ অনেকটা সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ৫০।৬০ বৎসর আগে এ দেশে ছেলেধরার উপদ্রব ছিল—তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের গোপনে চুরি করিয়া লইয়া যাইত। তাহারই এক রহস্যজনক কাহিনী লইয়া এই উপন্যাসটি লেখা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সস্তা বিলাতী য়্যাড্‌ভেঞ্চার-উপন্যাসের অ... করণে রচিত পুস্তকের সমারোহের মধ্যে এইরূপ একখা... সত্যকার ছোটদের উপযোগী উপন্যাস পাইয়া আমরা আ...ন্দিত হইলাম। প্রবীণ গ্রন্থকারের সুপরিচিত রচনাভঙ্গী ব... টিকে লোভনীয় করিয়াছে। পুরু কাগজে ছাপা, এ... বহু চিত্রশোভিত।

পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

রজত স্মৃতি-পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

"তোমার চোখে স্বাধীন ভারতের রূপ কি রকম হবে"—এই বিষয়ে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত পুরস্কার দেওয়া হবে:—

১ম পুরস্কার—শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু (চুঁচুড়া); ২য় পুরস্কার—শ্রীমাধুরী দেবী (এলাহাবাদ); ৩য় পুরস্কার—শ্রীতপন রায় (কলিকাতা)।

আশ্বিন মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

১ম পুরস্কার—শ্রীশিবানী দেবী (কলিকাতা); ২য় পুরস্কার—শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্ত্তী (পাটনা)।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

বিজ্ঞাপনগুলি এই রকম হবে:—

হারাইয়াছে—গতকল্য সন্ধ্যায় বালীগঞ্জ অঞ্চলে একটি সুদর্শন টেরিয়ার কুকুর হারাইয়াছে। কেহ সন্ধান দিলে বাধিত হইব। পি. সরকার, ঢাকুরিয়া।

বাড়ী বিক্রয়—শ্যামবাজারে তিন কাঠা জমির উপর আধুনিক রুচিসম্মত দ্বিতল বাটী। মূল্য ২৫,০০০৲। সন্ধা... করুন। বক্স নং ১৩০৪।

কর্ম্মখালি—মনোহারী দোকানের কাজে অভি... একজন সহকারী চাই। বেতন যোগ্যতা অনুসারে... নীলকমল ষ্টোর্স্।

উত্তরদাতাদের নাম

রমেন চক্রবর্ত্তী (জব্বলপুর); ধাবলু পাইন (ঘাটশীলা); মুকুল ও বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য (মালসিরা); অমলকুমার মিত্র (গৌহাটী); অগ্নিশিখা মণিমেলার মণি তাইবোনেরা (গৌহাটী); ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান); উমা, রমা, খোকন (বালীগঞ্জ); কুমার অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কটক); পাইন... দাদা, বাটা, কঙ্কা, বাপিদা, শান্তি চট্টোপাধ্যায় (বাটানগর...); বিজলী ঘোষ (মহেশতলা); শুভেন্দু বসু (নিউ দিল্লী); সুজাতা রায় (লক্ষ্ণৌ)।

নূতন ধাঁধা

শ্রীসীতা দেবী

মিণ্টুদের নতুন দিদিমণি তাদের গল্প-প্রতিযোগিতার জন্য ১৪টি পুরস্কার দিয়েছেন। দু'রকম পুরস্কার—১ম ও ২য়। সমস্তই বই। তবে প্রত্যেকটি ১ম পুরস্কারের দাম প্রত্যেকটি ২য় পুরস্কারের চাইতে চার আনা ক... বেশী। দিদিমণি সব শুদ্ধ দশ টাকার বই দিয়েছিলেন... তা হ'লে বল তো ১ম পুরস্কার পেয়েছিল ক'জন।

— কয়েকখানি বাছা বাছা বই —

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা

১নং দি লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্‌স ... ॥৵০
(শ্রীঅমলেন্দু সেন অনূদিত)

২নং অলিভার টুইষ্ট ... ॥৵০
(শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ... ৸৵০

শ্রীসুবোধ বসুর শিশু-নাটিকা
বুদ্ধিষস্য ... ।৵০

শ্রীরঞ্জিৎ সিংহের রূপকথা
ময়নামতীর দেশ ... ১৲

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
পদ্মরাগ ... ১॥০
সোনার হরিণ ... ১॥০
চায়ের ধোঁয়া ... ৸০
নূতন পুরাণ ... ৸৵০
হাস্য ও রহস্য ... ৸৵০
ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি
(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর
রং-চং ... ৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের
অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১৸০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
বিজ্ঞান-বুড়ো ... ১৲
আকাশের গল্প ... ১।০
জন্মদিনের উপহার ... ৸৵০
ধূমকেতু ... ৸০
আবিষ্কারের গল্প ... ৸০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্রের
গল্প-সল্প ।০ ছুটীর গল্প ।০

মাধব্য ও রসোদর শর্ম্মার
আজব গল্প ।৵০ অনেক গল্প ।৵০
পুরাতন বাঁধান রামধনু...প্রতি খণ্ড ৩৲

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৸০

মনোরঞ্জন ও শিবরামের
এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ... ৸৵০

শ্রীলীলা মজুমদারের
বদ্যিনাথের বড়ি ... ৸০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
নতুন কিছু ... ৸৵০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা ... ১॥০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা

Regd. No C—1641

কার্য্যালয় : ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্ : সাউথ্ ১২৬

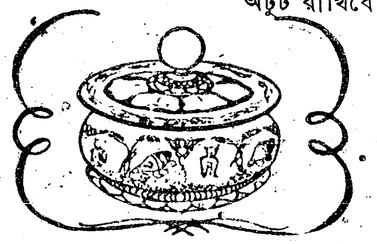

Regd, No C—1641

কার্য্যালয় : ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।। ফোন্ : সাউথ ১২৬

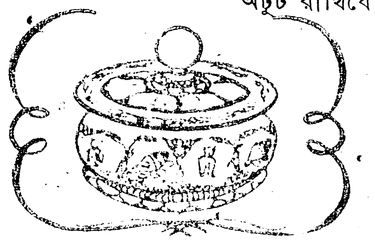

COLOUR PAPER

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

—ছোটদের কয়েকটি নতুন বই—

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি

নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

অলিভার টুইস্ট্

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—॥৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

দমাদম্ দামোদর

দাম ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

অয়েল পেণ্টিং

দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

কল্‌কাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ঃ ঃ ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা ২৫।

— কয়েকখানি বাছা বাছা বই —

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা

১নং **দি লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্‌স** ॥৵০

(শ্রীঅমলেন্দু সেন অনূদিত)

২নং **অলিভার টুইষ্ট্** ... ॥৵০

(শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ... ৸৵০

শ্রীসুবোধ বসুর শিশু-নাটিকা

বুদ্ধির্যস্য ... ।৵০

শ্রীরঞ্জিৎ সিংহের রূপ কথা

ময়নামতীর দেশ ... ১৲

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

পদ্মরাগ ... ১॥০

সোনার হরিণ ... ১॥০

চায়ের ধোঁয়া ... ৸০

নূতন পুরাণ ... ৸৵০

হাস্য ও রহস্য ... ৸৵০

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি

(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং ... ৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ১৸০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞান-বুড়ো ... ১৲

আকাশের গল্প ... ১।০

জন্মদিনের উপহার ... ৸৵০

ধূমকেতু ... ৸০

আবিষ্কারের গল্প ... ৸০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্রের

গল্প-সল্প ।০ ছুটীর গল্প ।০

মাধব্য ও রসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প ।৵০ অনেক গল্প ।৵০

পুরাতন বাঁধান রামধনু···প্রতি খণ্ড ৩৲

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৸০

মনোরঞ্জন ও শিবরামের

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ... ৸৵০

শ্রীলীলা মজুমদারের

বঙ্গিনাথের বড়ি ... ৸০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু ... ৸৵০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা ... ১॥০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"

(গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

আট রকম বইএর নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, বাকি বইগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

১। **হারান বই**—(নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)
২। **নিঝুম রাতের কান্না**—(বিমল দত্ত)
৩। **রাতের আতঙ্ক**—(নীহাররঞ্জন গুপ্ত)
৪। **স্বর্গের সিঁড়ি**—(সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)
৫। **কেউটের ছোবল**—সুনির্মল বসু
৬। **অভিশপ্ত ম্যামী**—(নীরদচন্দ্র মজুমদার)
৭। **বিভীষণের জাগরণ**—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

প্রত্যেকখানি বারো আনা

"প্রহেলিকা সিরিজ"

(ডিটেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চার)

ফাল্গুন মাস—**রত্নভূষা**—অনলকুমার চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র—**নকলের হিমালয়**—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বৈশাখ—**বি, এল, এ-২০৫**—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো
জ্যৈষ্ঠ—**জয়-পরাজয়**—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
আষাঢ়—**পূজনীয় দস্যু**—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রাবণ—**দুর্যোগের রাতে**—শ্রীসব্যসাচি

প্রত্যেকখানি দাম এক টাকা

বিরাট সচিত্র গ্রন্থ—১৫৪ পৃষ্ঠা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—(আট খানা হাফটোন ছবি)

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

এক মাসের মধ্যে বই নিঃশেষ হওয়ায়

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

চমকপ্রদ অন্তর্দ্ধান কাহিনী পরিপূর্ণ মূল্য ১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর ❋ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি। দাম এক টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

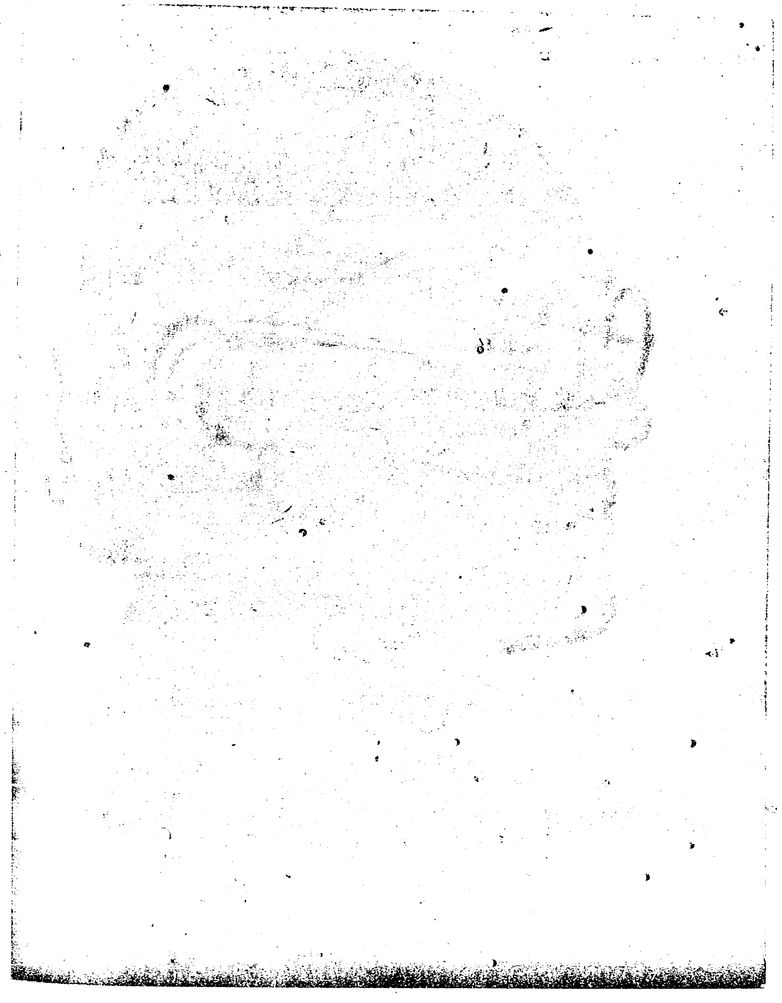

রামধন্‌—

জন্মতিথি-স্মরণে

… শ্রীযুক্তা মীরা দেবীর সৌজন্যে

…কর্ষণ
…।
…কিত,
…ত।
…ক্ষীণ,
…স্বাধীন।
…নব
…ব।

"কা

(গোয়েন্দা-ব

আট রকম বই

বাকি বইগুলি

১। হারান বই

২। নিঝুম রা

৩। রাতের অ

৪। স্বর্গের সি

৫। কেউটের

৬। অভিশপ্ত

৭। বিভীষণে

প্রে

দেব

টাক

নাকুর ব

টা

নরুনের

টা

হাঁড়ির

টা

টোপ

টা

বউয়ের

টা

শ্রীযুক্ত

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৯ম বর্ষ | মাঘ, ১৩৫৩ | ১০ম সংখ্যা

মানুষ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মোরা—সভ্যতার এ বড়াই কত ফাঁকা,
পশুত্ব থাকে মনুষ্যত্ব ঢাকা।
যতই জ্ঞানের আলো লভুক না নবীন,
জীবের শ্রেষ্ঠ এবং সকল জীবের হীন।
মানুষ আছে যে লাখ্ দুর্বৃত্ত সমান,
দাহে গ্রামের পরে গ্রাম করে শ্মশান।
যা সে করতে পারে একটা দিনে হায়,
তাহা করতে গোটা একটা যুগই যায়।

এমন মানুষ আছে যাহার চৌম্বিক আকর্ষণ
জাতি এবং দেশকে করে ঊর্দ্ধে উন্নয়ন।
তাহার বুকের ঐশ্বর্য্যেতে ভুবন আলোকিত,
ভগবানে ভয় করে সে কিছুতে নয় ভীত।
কটীবাসে একাই কোটি—হউক দেহ ক্ষীণ,
একাই তিনি মহাদেশ এক—সাম্রাজ্য স্বাধীন।
অহিংসা তাঁর মন্ত্র,—একা সেই মহামানব
সর্ব্ব দেশ ও সর্ব্ব জাতি, সব যুগ-গৌরব।

লড়াই ফেরত নন্দদুলাল

শ্রীশামুক

তিন

—যুদ্ধে জিতলে তবু নির্বাসন—

সব ইস্কুলের গরমের ছুটি এসে গেল। ছেলেরা নন্দকে এসে ধরে বলে,—আমরা একটা আখড়া তৈরি করছি, তুমি আমাদের প্যারেড শেখাও, মিলিটারী কায়দায় একটু হাত-পা ছুঁড়তে শিখিয়ে দাও।

সে হেসে কথাটি উড়িয়ে দেয়, আমোল দেয় না কোন। ভাবে এই বাচ্চারা আবার করবে কি, একটুতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, একটু লাগলেই ভ্যাঁ করে ফেলবে কেঁদে।

এই সময়টা কলকাতার নানা জায়গায় ক্লাব, আখড়া প্রভৃতি গজিয়ে উঠছে, ছোটরা এক নতুন খেলার নতুন নেশায় মেতেছে। সকলে করছে আর শুধু এরা করবে না? আর যখন, নন্দর মতন এমন একজন চৌকস্ লড়াই-ফেরত মানুষ তাদের মধ্যে আছে? সকলে একেবারে নাছোড়বান্দা; করতেই হবে। এমন কি বড়দের মধ্যে কয়েক জনও উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেন। ভাবেন, মন্দ কি, হাত-পা ছুঁড়লে শরীর শক্ত হবে এবং কষ্ট সহ্য করতে পারবে বেশী রকম।

নন্দ যখন রাজী হ'ল বেশ উৎসাহের সংগেই রাজী হয়ে গেল। যেন এমনি একটা কাজই খুঁজে ফিরছিল এতদিন। ওর এই মজা, যখন যেটি ধরবে তা করবেই চূড়ান্ত ভাবে। দেরি না করে তিরিশটি ছেলেমেয়েকে ভর্ত্তি করে নেয় নিজের সৈন্যদলে।

এবারে সে একেবারে মিলিটারী, আর এক চুলও এদিক্ ওদিক্ হবার জো নেই। প্রথমে সকলকে এক এক করে সোজা দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে শপথ নিতে হ'ল। তারা দেশের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত, এবং সে জন্যে তাদের জেনারেল—মানে নন্দ যা বলবে, যখন বলবে নিশ্চয়ই করবে। মিনি এ এক চমৎকার খেলা ভেবে বলে ওঠে,—বারে, রাজা কই, আমাদের মধ্যে রাজা সাজবে কে?

নন্দর বাজের আওয়াজের ধমকানি খেয়ে কিছুক্ষণ অন্য দিকে চেয়ে থেকে চোখের জল নেয়।

সৈন্য হওয়ার যে কত হাংগামা—কত বিপদ দিনেই কিন্তু সবার মালুম হয়ে গেল। যত নিয়মকানুন ও বাধানিষেধ মনে রাখা ও মেনে চলা ঝক্কির কাজ। কলকব্জার তৈরি পুতুলের মত কাজ নিয়ম-মাফিক হিসাব মত করতে হবে, মানুষের মতন বুদ্ধি খরচ করে। এ কি বড় ব্যাপার? মানুষের কাজ মানেই ত' অনেক ভুল—নয় কি?

সবচেয়ে নিদারুণ প্যারেড। প্যারেড মানে বেঁধে কুচকাওয়াজ—লেফট্ রাইট্, ডাইনে ঘোরা, ঘোরা, সোজা চলা, লম্বা—যখন তখন, ওর যতক্ষণ হাতে পায়ে কামড়ানি ধরে, শিরদাঁড়া ক... তবু থামতে চায় না।

আবার ভুল হলে বেজায় শাস্তি। একবার ডাক দেবার দু'মিনিট পরে গিয়ে হাজির। তাকে কয়লার ঘরে অন্ধকারে আধ ঘণ্টা ... হাঁফিয়ে মরতে হ'ল। রতন একদিন বালতি স্নান করতে চলেছে, হঠাৎ সামনে নন্দ, স্যালুট মনে ছিল না। আর কি, বাঁটুল ঠুকে মাথায় টরে টক্কা টেলিগ্রাফ বাজিয়ে দিলে।

ও, বলতে ভুলে গেছি—নন্দর আছে একটি লাঠি, অনেকটা খাতায় লাইন টানার রুলের মত মাথাটি গোল। তাকে সকলে নাম দিয়েছে ... যদিও নামের ঠিক মানে হয় না, তবুও। বড়ই অস্ত্র, মারবার বহু কায়দা ঐটি দিয়ে চমৎকার যায়।

দু'চার দিনেই ছেলেমেয়েদের প্রাণ যায় যায় ...

কুচ্‌লী না ছাড়লে ছাড়া যায় কি উপায়ে? এদিকে যে শপথ নিয়ে সব বসে আছে প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত! নিজে থেকে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে লজ্জা করে, আবার কোন রকম বিদ্রোহী হ'লে নাকি মিলিটারী আইনে তার শাস্তি বড় জবর।

নন্দর মুখ দেখে মনে হয় ভারি খুসী, একটা কাজের মতন কাজ পেয়েছে বটে। উৎসাহী বড়রা কিছু বললেই পারতেন ছোটদের এই দুর্দশা দেখে, কিন্তু তাঁদের মুখে অন্য কথা।

—আহা, নন্দ কত জবরদস্ত সব লড়াই করে জিতে এসেছে, ওকে কিছু ব'লে কাজ নেই। এ দু'দিনের খোস খেয়াল আপনি মিটে যাবে। মন্দ কি, দুরন্ত ছেলে-পিলেরা খানিকটা শায়েস্তা হচ্ছে ত'।

এই সৈন্যদলটি কিন্তু একদিন চমৎকার কাজ করলে। দেখিয়ে দিলে যে দলবদ্ধ ভাবে নিয়মের মধ্যে বাচ্চারাও সুযোগ্য দলপতির নির্দেশে অনেক অসম্ভব কাজ সম্ভব করে দিতে পারে।

আমি বলছি কলকাতার সেই ভয়ানক বৃষ্টি হওয়া দিনটির কথা। মনে আছে সে দিনটি?

সেই যে বেশ নিরীহ ভাবেই বৃষ্টি সুরু হ'ল—এ রকম ত' কত হয় বর্ষাকালে, মাথা ঘামালে না কেউ। সারা রাত ঘুমের মধ্যে বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল। ভাল লাগলো বেশ, আহা, হোক হোক, পৃথিবী ঠাণ্ডা হোক, আরামে ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। সকালে ঘুম ভেঙে সকলে চমকে ওঠে। উঃ, এ কী, এ কী ভয়ানক ব্যাপার! মেঘের আড়ালে দিন রাতের চেয়েও অন্ধকার। প্রবল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে ঝমাঝম্। অন্য কোন আওয়াজ যায় না শোনা, আর মনে হয় এ থামবে না কোন দিন, কোন দিন আকাশে সূর্য উঠবে না, এ প্রলয় পৃথিবীকে ধ্বংস করবেই করবে।

নন্দর ডাক এল,—বেরিয়ে এস সব বাড়ী থেকে তৈরি হয়ে। পাড়ার পূব দিকের বস্তিটা জলে ডুবেছে, বাসিন্দাদের কষ্ট হচ্ছে খুব, আমাদের সাহায্য করতে হবে।

মায়েদের মন খুঁত খুঁত করে। এই দুর্যোগে কুকুর-বিড়াল বাড়ির চৌকাঠ পার হতে চায় না আর ছোটরা যাবে ভিজতে! কিন্তু উপায় কি, ওরা সৈন্যের দল যে, আর নন্দও মনে করতে পারে। সব ছেলেমেয়েই যে খুসি মনে আগ্রহের সংগে পথে বেরুলো তা বলা যায় না, তবে স্বীকার করতে হয় যে ঠিক সৈন্যদের মতই সমস্ত কষ্ট সেদিন মেনে নিলে তারা মুখটি বুজে।

অদ্ভুত, আশ্চর্য কাজ করলে ছোটদের দল! জলে ভিজে, কাদায় প্যাচ প্যাচ করে ডুবে-যাওয়া বস্তি থেকে বার করে আনলে বিছানা, মাদুর, বাক্স-পেঁটরা, কাপড়ের পুঁটলি। ইস্কুল-বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া লোকেদের জন্যে বয়ে বয়ে এনে দিলে খাবার জল, দুধ, শুকনো কাঠ, কিছু চাল-ডাল, আনাজও, এবং পাড়ার অন্যদেরও ফাই ফরমাশ খাটলে অফুরন্ত।

গরীবেরা প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলে, তোমাদের ভাল হোক। বড়রা তারিফ করে বললেন, সাবাস সাবাস, এই ত' চাই। ছোট ছোট বুকগুলি যেন তিন তিন ইঞ্চি বেড়ে গেল আনন্দে ও গর্বে।

এর পর থেকে নন্দর উৎসাহ আরো বেড়ে গেল; এবারে যেন এদের নিয়ে সত্যি সত্যি অসাধ্য সাধনে মেতে যায়। ছোটরা আবার ত্রাহি ত্রাহি হাঁক ছাড়ে, ভগবান্‌কে ডাকে—বাঁচাও, বাঁচাও। সকলে চুপিচুপি পরামর্শ করে যে চার্চিল সাহেবকে এক লম্বা চিঠি লিখে দেওয়া যাক, যে হে সাহেব, তুমি আরেকটা যুদ্ধ দয়া ক'রে লাগিয়ে দাও। নন্দদা' গিয়ে আসল লড়াই করুক আর আমরা সকলে এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে যাই।

শেষে ভগবান্ মুখ তুলে চাইলেন, অবশ্য ভগবানের যা নিয়ম—আরো অনেক কিছু যন্ত্রণা ও শিক্ষা দিয়ে তারপর। সৈন্যদলটি হঠাৎ গেল ভেঙে। কি করে ভাঙলো বলি।

ক'দিন ধরে নন্দ বলে,—বেশ, তোমরা তৈরি হয়েছ এতদিনে, এবারে তোমাদের শত্রুকে আক্রমণ করার কায়দাটি শেখাতে হবে দেখছি।

সকলে শোনে আর ভয়ে বক ঢিপ ঢিপ করে, এ নিশ্চয়ই এক নতুন উৎপাত।

একদিন দুপুরে ঘন মেঘ করে ঝড় উঠেছে খুব। ঠিক সেই বাগানে কাঁচা আম কুড়োবার ঝড়। ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছিল, বিনু এসে সব ঠেলে তুলে

TIGHT BINDING

দেয়। জেনারেলের হুকুম এখুনি কাঠগোলায় সৈন্য সমাবেশ করতে হবে, শত্রুরা এসে পড়লো বলে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে রতন নন্দর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বাঁটুলের ঠোক্কর খেয়ে চমকে স্যালুট্ করে। বেচারী ভুলে গেছল, মনে ছিল না একেবারে।

সেদিন কারখানা কি কারণে বন্ধ ছিল। সম্ভব কোন ছোটখাটো পরব, কারণ ইস্কুলেও ত' ছিল বন্ধ। কারখানার মাঠে লোকজন নেই কোন, কিন্তু ঝড়ে যত রাজ্যের ধুলো ও করাতের গুঁড়ো ঘূর্ণি নাচ নাচছে। চারিদিক্ অন্ধকার। কাঠের গুঁড়ি ও সাজানো চেরা কাঠের পাহাড় চারিদিকে। তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচুটাতে তখুনি উঠতে হুকুম হ'ল, ব'লে দেওয়া হ'ল কি ভাবে কী করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধ করতে করতে শত্রুদের হটিয়ে ঐ পাহাড়ের চুড়োটা দখল করা চাই মাত্র তিন মিনিটে।

হাতে বন্দুক—মানে লাঠি নিয়ে সৈন্যদল সবেগে আক্রমণ সুরু ক'রে দেয়। আধখানা উঠেছে এমন সময় বৃষ্টি নামে চাপট, জলের মস্ত বড় বড় ফোঁটা। সৈন্যরা পিছনে ফিরে তাকায় যদি জেনারেল এই অবস্থায় করুণা ক'রে নামতে হুকুম দেন। দেখে, বাঁটুল তেমনি উঁচু ক'রে ধরা—ওঠবার ভংগিতে।

ঝমাঝম্ বৃষ্টি মাথায় ক'রে ওপরে গিয়ে পৌছালো। কিন্তু বিজয়গর্ব এক সেকেণ্ডও ভোগ করতে হ'ল না। দুদ্দাড় আওয়াজ ক'রে চেরা কাঠ ও কাঠের গুঁড়ি মাটিতে পড়তে থাকে, সংগে সংগে সৈন্যরাও—ঝড়-লাগা বাঁজা আমের মত টুপ টাপ্। ঐ কাঠগুলো ঠিক মত সাজানো ছিল না, এতগুলি মানুষের দমকা ভারে টাল গেল বিগড়ে।

ঐ রকম বেতালা পড়ে যাওয়া ভূমিকম্পেই সম্ভব, এরা যেন সেদিন পৃথিবীকে বেশ খানিকটা কাঁপিয়ে তবে ছাড়লে। নন্দও বেশ ঘাবড়ে গিছলো স্বীকার করতে হয়, কারণ তার উঁচু করে ধরা বাঁটুলটি তেমনি অবস্থাতেই রইলো কিছুক্ষণ, হাত নামাতে ভুলে গেল বেমালুম।

সেদিন সন্ধ্যায় বড়রা বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরে ঘরে মিলিটারী হাসপাতাল। দলের তিরিশটি সৈনিকের মধ্যে ষোল জন আহত। নিহত কেউ হয় নি বটে তবে দু'জনের জখম বেশ গুরুতর। বিনুর মাথা ফেটেছে আর মিনির হাত গেছে ভেঙে।

দলটি ভেঙে গেল আপনি, কারুকে কিছু আর বলতে হ'ল না। নন্দকে পাঠানো হ'ল দার্জিলিঙে তার বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে। আশা এই যে কিছুদিন ঠাণ্ডা জায়গায় হাওয়া বদল করলে তার হাত-পা, মাথা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ছোটরা খবর নিয়ে জানলে যে সে বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে একটিও নেই। তবে তার দিন কাটলো কি ক'রে? নন্দর দার্জিলিঙের কীর্তি-কাহিনী পরের বারের জন্যে তোলা রইলো। (ক্রমশঃ)

অতীতের আশ্চর্য

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ

গত বারে তোমাদের প্রাচীন পৃথিবীর কয়েকটি আশ্চর্যের কথা বলেছিলাম। এ বারে আর কয়েকটির কথা শোন।

স্মার্ণার বার মাইল দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের ওপর রোড্স্ নামে একটি ছোট দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের রাজধানী রোড্স নগর আলেকজাণ্ডারের সময় জগৎ-প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সুসজ্জিত এবং সুরক্ষিত বন্দরটিই ছিল রোড্সের প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু এই বন্দরের সব চেয়ে আশ্চর্য জিনিষ তার নৌবল অথবা নৌব্যবস্থা নয়, গ্রীক্ দেবতা এপলোর এক প্রকাণ্ড মূর্তি। মূর্তিটি লম্বায় ছিল একশ' ফুট্। তোমাদের মধ্যে কারুর দৈর্ঘ্য যদি সাড়ে তিন ফুট্ হয় তা'হলে তার মত উনত্রিশটি ছেলে যদি একে অন্যের মাথার ওপর দাঁড়ায় তা'হলে এই বিরাট উঁচু মূর্তির সমান হতে পারে। মূর্তিটি কলসাস্ নামে এখন পর্যন্ত জন-সাধারণের কাছে পরিচিত। বন্দরের দু'দিকে দু'টি পা রেখে সে দৈত্যের মত বন্দর রক্ষা করত। আর জাহাজগুলো তার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে অনায়াসে

...বরের ভেতর প্রবেশ করত। কলসাসের দেহ ছিল ...টি পেতলের তৈরী। তাকে তৈরী করতে কুড়ি ...সরের একাগ্র পরিশ্রম আবশ্যক হয়েছিল। খৃষ্টের ...মের প্রায় দু'শ' বছর আগে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে এই ...টি উপুড় হয়ে পড়ে যায়। অনেক দিন পর্যন্ত নানা ...ষ্টা হয়েছিল তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দেবার; কিন্তু ...লসাস্ আর দাঁড়াতে রাজী হ'ল না। অবশেষে পেতলের ...ন দরে এক বণিকের কাছে তাকে বিক্রী করে ফেলা ...য়। সওদাগর তার ন'শ' উট যথাসম্ভব বোঝাই করেও ...লসাসের দেহের সব অংশগুলো নিয়ে যেতে পারে নি।

গ্রীসের অলিম্পিয়া নামক স্থানের জিউস্ অথবা ...পিটারের প্রতিমূর্তি আর একটি আশ্চর্য বস্তু। খৃষ্টের ...মের প্রায় ৪৫০ বছর আগে প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ভাস্কর ফিডি-...স্ এই মূর্তি নির্ম্মাণ করেন। এটি জুপিটার দেবের ...পবিষ্ট মূর্তি। এই বসা অবস্থাতেই তাঁর পা থেকে মাথা ...র্ঘ দৈর্ঘ্যে ষাট ফুটেরও বেশী। হাতীর দাঁত দিয়ে ...বতার সমস্ত দেহটি নির্মিত হয়েছিল। তাঁর পরনে ...ল খাঁটি সোনার পোষাক। হাতীর দাঁতের এবং ...বলুস কাঠের তৈরী বিচিত্র স্বর্ণখচিত সিংহাসনে তাঁকে ...ন হয়েছিল। তাঁর এক হাতে ছিল বিজয়চিহ্ন, ...র এক হাতে শাসন-দণ্ড, দণ্ডের ওপর একটি ঈগল ...খী খোদাই করা। মনে মনে একবার এই মূর্তি ...তার ঐশ্বর্যের কথা কল্পনা কর।

পশ্চিম এসিয়ার হ্যালিকারনাস্যাস্ সহরের মৌস-...সের স্মৃতিসৌধ আর একটি বিস্ময়কর জিনিষ। রাজা ...সলাসের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা রাণী 'আর্টেমিসিয়া ...মীর স্মৃতিরক্ষা করবার জন্যে এই চমৎকার মন্দিরটি ...র্মাণ করিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় এই সমাধি মন্দিরটি ...সপ্রাপ্ত হয়েছে। মন্দিরের চুড়োতে অশ্বপৃষ্ঠে সজ্জিত রাজা ও রাণীর যে খোদাই করা মূর্তিগুলি লাগান ছিল তাদের তুলনা নাকি সারা জগতে আজও বিরল।

আলেকজান্দ্রিয়ার আলোকস্তম্ভ অতীতের সপ্তাশ্চর্যের শেষ আশ্চর্য বটে, কিন্তু সৌন্দর্যে কারুর চেয়ে কম নয়। কালের কবলে এটিও লোপ পেয়েছে। মিশরের যে কোণ ভূমধ্যসাগরকে ছুঁয়েছে ঠিক তার ওপরেই প্রসিদ্ধ বন্দর আলেকজান্দ্রিয়া অবস্থিত। ভূমধ্যসাগরকে বশে রাখতে হলে আলেকজান্দ্রিয়াকে সুরক্ষিত করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং বহুকাল থেকে হাজার হাজার জাহাজ এই বন্দরের পাশ দিয়ে যাতায়াত করছে। তাদের পথ নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে এখানে একটি আলোকস্তম্ভের নিতান্ত প্রয়োজন। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন শ' বছর পূর্বে মিশরের সম্রাট্ দ্বিতীয় টলেমী এই অভাব পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলোকস্তম্ভের সঙ্গে এর ছিল আকাশ পাতাল তফাৎ। এটি ছিল আগাগোড়া শ্বেত পাথরের তৈরী। এর উচ্চতা ছিল প্রায় পাঁচশ' ফুট। তখনকার দিনে না ছিল বৈদ্যুতিক আলো, না ছিল কেরোসিন তেল। এক অদ্ভুত উপায়ে জল-যানগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ত। আলোকস্তম্ভের সর্বোচ্চ শিখরে মণ মণ কাঠ পুড়িয়ে এমন এক বিরাট অগ্নির সৃষ্টি করা হ'ত যে ত্রিশ মাইল দূর থেকে সমুদ্রগামী জাহাজ অনায়াসে ঐ অগ্নিশিখার সংকেত বুঝতে পারত। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অপরূপ আলোকস্তম্ভটি সারা জগতের গর্বের বিষয় হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল; তারপর ক্রমাগত ভূমিকম্পের আক্রমণে ধীরে ধীরে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছে। অবশ্য এখন ঐ স্থানের কাছাকাছি নতুন ধরণের আর একটি আলোকস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে, কিন্তু সৌন্দর্যে আগেরটির সঙ্গে পরেরটির কোন তুলনাই হয় না।

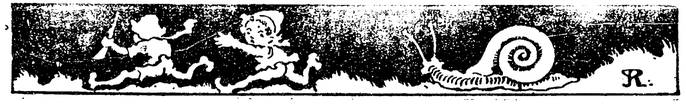

এক ছোক্‌রা

(ম্যাক্‌সিম্ গর্কি)

অনুবাদ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

এই ছোট্ট গল্পটি বলা কঠিন—গল্পটি এমন সাদা-সিধে।

আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমাদের রাস্তার ছেলেদের গ্রীষ্ম আর বসন্তকালে রবিবারে জড় করে, মাঠে মাঠে, বনে বনে বেড়াতে নিয়ে যেতাম।

শহরের ধূলোভরা, গুম্‌সো রাস্তাগুলো ছেড়ে যেতে ছেলেগুলোর আনন্দ হ'ত। তাদের মায়েরা তাদের সঙ্গে দিতেন পাঁউরুটি, আর আমি কিনে নিতাম লজেনজ্‌স্, বোতলে ভরে নিতাম ঘোল। তারপর রাখাল যেমন করে নিশ্চিন্ত মেষশাবকগুলির সঙ্গে শহর ছাড়িয়ে, মাঠ পেরিয়ে বসন্তের নবীন ভূষণে সুন্দর ও কোমল সবুজ বনানীর পথে যায় যেতাম তেম্নি করে।

আমরা শহর ছেড়ে যেতাম সাধারণত সকালের দিকে। তখন গির্জ্জায় প্রথম উপাসনার ঘণ্টা বাজতো। পথে ধূলোর মেঘ উড়িয়ে, ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে চলতাম সকলে। দুপুরে, দিন যখন সব চেয়ে গরম, খেলায় ক্লান্ত হয়ে আমার বন্ধুরা বনসীমান্তে জড় হ'ত। তারপর খেয়ে, ছোটরা ঘাসের ওপর ঝোপের ছায়ায় পড়তো ঘুমিয়ে, আর বড়রা আমাকে ঘিরে ধরে গল্প বলতে অনুরোধ করতো। আমি গল্প বলতাম। তারাও যেমন আমার সঙ্গে অবাধে কথা-বার্ত্তা বলতো আমিও বলতাম তেম্নি করে। আমি তখন যুবক। এই বয়সে একটা আত্মম্ভরিতা ও জীবনের সম্বন্ধে যে তুচ্ছ জ্ঞানটুকু অর্জ্জন করা যায় তার দরুণ মনে একটা হাস্যকর দম্ভ থাকে। এটা হ'ল, যুবাবয়সের একটা বিশেষত্ব। তা সত্ত্বেও আমার নিজেকে মনে হ'ত, বিজ্ঞদের মধ্যে একটি বিশ বছরের শিশুরূপে।

আমাদের মাথার ওপর বিছিয়ে থাকতো অনন্ত আকাশ, সম্মুখে বনের ঐশ্বর্য্যময় বিচিত্রতা, অর্থপূর্ণ স্তব্ধতায় সব মগ্ন। তার মাঝে দিয়ে বাতাসের স্রোত বয়ে যেত, বয়ে যেত মৃদু কানাকানি। বনের সুরভিত ছায়া উঠতো কেঁপে। তারপর আবার স্নিগ্ধ মৌনতায় ... যেত ভরে।

আমার চারধারে থাকতো ছোট ছোট সুন্দর ... দল, তারা এসেছে জীবনের দুঃখ ও আনন্দ ভোগ কর...

সে-সবগুলো ছিল আমার সুদিন, বাস্তবিক ... ভোগ্য দিন। জীবনের অন্ধকার দিক্‌টা আমার ... কলঙ্কিত করে দিয়েছিল। কিন্তু তা শিশুসুলভ ... স্বচ্ছ জ্ঞানে ও অনুভূতিতে স্নাত ও সজীব হয়ে উঠতো...

একদিন, আমি যখন একদল ছেলে-মেয়ে ... শহর ছাড়িয়ে মাঠে এসে পড়েছি, আমাদের সঙ্গে ... অপরিচিতের দেখা হ'ল। সে একটি য়িহুদি ছোক... তার খালি পা, গায়ে ছেঁড়া শার্ট, ভ্রূ জোড়া কা... শরীর রোগা, মাথায় ভেড়ার ছানার মতো কোঁকড়া ... মনে হচ্ছিল, কি একটা কারণে যেন সে বিচলিত হ... এবং একটু আগে কাঁদছিল। তার নিষ্প্রভ ক... চোখ দুটির পাতা দুখানি ফুলে লাল হয়েছিল। ক্ষুধার্ত্ত মুখের নীল আভা উঠেছিল ফুটে। ছেলেদের ... দিয়ে সরিয়ে সে রাস্তার মাঝখানে সকালের ঠাণ্ডা ধূ... মধ্যে পা দুখানি চেপে থমকে দাঁড়ালো। ... সুগঠিত মুখে কালো ঠোঁট দুখানি ভয়ে ফাঁক হয়ে গে... কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে সে এক লাফে গিয়ে দাঁড়া... পেভ্‌মেন্‌টের ওপর।

ছেলেরা বলে উঠলো, "ওকে ধর। য়িহুদী ছোঁড়াটা... ধর।"

তার শীর্ণ মুখে ফুটে উঠলো ভয়। তার ... দুখানি কাঁপতে লাগলো। মনে করলাম, সে ... পালাবে। ছেলেরা তার চারধারে বিদ্রূপ করছে। ... সে তাদের মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত দু... পিছনে জোড়া করে বেড়ার গায়ে কাঁধ দুটি চেপে ... যেন সে আরও লম্বা হয়ে উঠেছে।

তারপর হঠাৎ শান্তভাবে, পরিষ্কার কণ্ঠে ... "তোমাদের একটা খেলা দেখাবো?"

...আমি প্রথমে মনে করলাম, এটা তার আত্মরক্ষার ...টা উপায়। ছেলেরা তৎক্ষণাৎ কৌতুহলী হয়ে ... তার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো। কেবল বড় ছেলেরা ...নিষ্ঠুর যারা তারা তার দিকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসভরা ...খে তাকাতে লাগলো। অন্য রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে ...আমাদের রাস্তার ছেলেদের সদ্ভাব ছিল না। তাদের ...নে নিজেদের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা ছিল। অপরের ...ক্তি তারা দেখতে ভালোবাসতো না, প্রকৃত পক্ষে ...বতোই না।

ছোট ছেলেরা ব্যাপারটি বেশ সহজ ভাবে নিলে। ...তারা বললে, "দেখাও।"

সেই সুশ্রী, শীর্ণ ছোট ছেলেটিও বেড়ার কাছ থেকে ...রে এসে তার ছোট, শীর্ণ দেহটি পিছন দিকে বাঁকিয়ে ...আঙ্গুল দিয়ে মাটি ছুঁয়ে পা দুখানি শূন্যে তুলে হাতের ...পর ভর দিয়ে দাঁড়ালো। এবং বললে, "ওঠ।"

তারপরই এমন ভাবে ঘুরতে লাগলো যেন সে আগুনে ...সে যাচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে সে হাতের ও পায়ের ...সরৎ দেখাতে লাগলো। তার শার্ট ও পাজামার গর্ত্ত-...লোর ভেতর দিয়ে দেখা যেতে লাগলো তার শীর্ণ দেহের ...ংগুটে চামড়া, কাঁধের হাড়, হাঁটু ও কনুই ঠেলে উঠছে। ...র কণ্ঠার হাড় দুখানা ছিল ঘোড়ার গলার সাজের ...তো। মনে হতে লাগলো, সে যদি আর একটু বেঁকে ...হলে তার সরু হাড়গুলো মট্ করে ভেঙে যাবে। ...পরিশ্রমে তার গা দিয়ে ঘাম বার হতে লাগলো, পিঠের ...র্ট গেল ভিজে। প্রত্যেকটি কসরতের শেষে সে ...প্রাণহীন কৃত্রিম হাসি মুখে নিয়ে ছেলেদের চোখের দিকে ...তাকাতে লাগলো। তার কালো নিষ্প্রভ চোখ দুটি দেখতে ...ল লাগছিল না, মনে হচ্ছিল, সে দুটি যেন বেদনায় ...বিস্ফারিত হচ্ছে। চোখ দুটি অদ্ভুত রকমে ঝক্ ঝক্ ...রছিল। দৃষ্টিতে ছিল অ-শিশুসুলভ তান। ছেলেরা ...চীৎকার করে তাকে উৎসাহ দিচ্ছিল। তাদের মধ্যে ...অনেকেই তার অনুকরণ করছিল। তারা ধূলোয় ...ডিগবাজি খাচ্ছিল, পড়ছিল, আনাড়ির মতো কসরতের ...কে বেদনায়, অসাফল্যে, ঈর্ষায় ও সাফল্যে চীৎকার ...রছিল।

কিন্তু ছেলেটি যখন চট করে খেলা থামিয়ে ছেলেদের মুখের দিকে অভিজ্ঞ শিল্পীর মতো ভারিক্কী দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে বললে, "আমায় কিছু দাও।" তখন সেই আনন্দ কোলাহল সহসা থেমে গেল।

তারা সকলেই চুপ করে রইলো; কে একজন জিজ্ঞেস করলে, "টাকা?"

ছেলেটি বললে, "হাঁ।"

—"খাশা!"

—"টাকার জন্যে আমরা নিজেরাও ওরকম খেলা দেখাতে পারতাম..."

এই অনুরোধে শিশু-দর্শকেরা শিল্পীটির ওপর বিরূপ ও বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলো। তারা হাসতে হাসতে মাঠের দিকে এগিয়ে চললো। অবশ্য তাদের কারো কাছেই টাকা-পয়সা কিছু ছিল না, আমার কাছে ছিল মাত্র সাত কোপেক। আমি ছেলেটির ধূলোমাখা হাতে তা থেকে দুটি নিয়ে দিলাম। ছেলেটি সে দুটিতে আঙুল ছুঁয়ে বললে, "ধন্যবাদ।"

সে চলে গেল। তখন দেখলাম, তার শার্টের পিঠের দিকটায় কাঁধের ওপরকার অংশটি কালো দাগে ভরে উঠে সেখানে আটকে গেছে।

বললাম, "দাঁড়াও। ওটা কি?"

সে দাঁড়ালো, ঘুরলো, আমার মুখের দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে তেম্নি স্নিগ্ধ হাস্যে শান্তভাবে বললে, "ঐটে? পিঠে? ঈস্টার পর্ব্বের মেলায় খেলা দেখাতে দেখাতে আমরা ট্র্যাপিজ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। বাবা এখনও বিছানায় পড়ে আছেন, আমি আবার ভাল হয়ে উঠেছি।"

আমি শার্টটা তুললাম,—বাঁ দিকে কাঁধ থেকে নিচে একেবারে উরু অবধি চামড়ার ওপর রয়েছে একটা বড় কালো দাগ। তার ওপর পড়েছে শুকনো ছাল। কসরৎ দেখাবার সময় ছালখানা কয়েক জায়গায় ফেটে গেছে আর সেই সব ফাটল থেকে রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

সে সহাস্যে বললে, "ওটাতে এখন আর ব্যথা নেই। এখন আর লাগে না, তবে চুলকোয়..."

তারপর নির্ভীকভাবে, বীরের যা শোভা পায়, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বয়স্কের মতো গম্ভীরকণ্ঠে বলে যেতে লাগলো, "তুমি মনে করেছিলে আমি বুঝি আমার

জন্যেই একটু আগে খেলা দেখাচ্ছিলাম? দিব্যি করে বলছি—না। আমার বাবা খুব জখম হয়েছেন। তবেই দেখ, কাজ করতে হবেই। আমরা য়িহুদিও বটে আর প্রত্যেকেই আমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে…”

সে সহাস্যে, খুব স্ফূর্ত্তির সঙ্গে কথাগুলি বললে। তারপর তার কোঁকড়া-চুলভরা মাথাটি আমার উদ্দেশ্যে নুইয়ে দুপাশের দরজা খোলা বাড়িগুলির মাঝ ত্যাড়াতাড়ি চলে গেল। বাড়িগুলো তার দিকে ঔদাসীন্যে তাকিয়ে রইলো।

এ সব তুচ্ছ, সাদাসিধে—তাই নয় কি? কিন্তু জীবনের কঠোর দিনগুলিতে সেই ছোকরাটিকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমি স্মরণ করেছি।

কোনো এক হাসপাতালের গল্প

শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার

একটা হাসপাতালের তিনতালার উপরের ছোট একটা ঘর।

তিনটে বেড কোনো রকমে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এক নম্বর, দুই নম্বর, আর তিন নম্বর বেড। একটাই জানলা, এক নম্বর বেডের একেবারে বাঁ পাশে, সারা ঘরটাতে ঐ থেকেই যা একটু আলো এসে পড়ে।

মরণাপন্ন তিনটি রোগী এই ঘরটাতে আতিথ্য নিয়েছে। যত দিন না পৃথিবী একেবারে ছেড়ে দিতে হয় তত দিন বোধ হয় এখানকার ছাড়পত্র পাওয়া যাবে না। রুগ্ন, বিবর্ণ সব মুখ। এরও আগে কত রোগী এসেছে এ ঘরে, এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন নম্বর বেড নিয়ে তারা ভারী ভারী নিঃশ্বাস ফেলে কত নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছে। তারপর একদিন দুঃখকষ্টভরা এই পৃথিবীর কাছে বহু আকাঙ্ক্ষিত পাওনা ছুটি নিয়ে দূরের কোন জগতে যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তা কেউ জানে না। নিয়ম অনুসারে যে আগে আসে এ ঘরে সে পায় এক নম্বর বেড, ওরই মধ্যে জানলার পাশে ব'লে একটু হয়ত আকাশের আস্বাদ পায়। দুই নম্বরের চোখের সামনে শুধু সাদা দেওয়াল; তিন নম্বরেরও তাই।

তিনটি রোগী সারাদিন জেগে শুয়ে থাকে। বিছানায় এক কোনো রকমে উঠে বসা ছাড়া কোনো ক্ষমতাই আর তাদের নেই। জানলার পাশে এক নম্বর বেডে যে শুয়ে থাকে, তার ত' উপর থেকে ডাক এসেই গিয়েছে, এখন পৃথিবী ছুটির আর্জী মঞ্জুর করলেই হয়। হাতুড়ি পেটার মত ঠং ঠং বিশ্রী আওয়াজ করে বুড়ো লোকটা দিনরাত ঘরের আবহাওয়াকে বীভৎস করে রা[illegible] মাঝে মাঝে কাঁদে, বিড় বিড় করে, কা'কে গালা[illegible] দেয়, মাঝে মাঝে নিদারুণ শাপ দেয়। ওষুধ [illegible] সময় আর খাবার সময় ছাড়া চোখ মেলেও তাকায় না।

তিন নম্বর বেডের রোগীটিও প্রায় তাই। [illegible] পাখীর খাঁচায় আটক পড়ার মত তার অবস্থা। [illegible] নিষেধহীন জীবনের দিনগুলির উষ্ণ স্মৃতির এখনো [illegible] হয় নি। তাই কেবলই ছট্‌ফট্‌ করে, হাসপাতা[illegible] ব্যবস্থার নামে অভিযোগ করে, নার্স্‌কে গালাগালি [illegible] খাবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়, মাঝে মাঝে চীৎকার [illegible] ওঠে। তারপরই আবার হয়ত কিছুক্ষণ বাদে ক্লান্ত [illegible] মুমূর্ষুর মত কান্নাকাটি আরম্ভ করে দেয়, “সারবে [illegible] সারবে না, ডাক্তার বলেছে এ রোগ কোনো দিন [illegible] যাবে না।”

মাঝের দুই নম্বর বেডের রোগীটি এদের ঠিক বিপ[illegible] এত প্রফুল্ল যে তার মুখ দেখে কোনো রোগের অ[illegible] করা যায় না। বিছানায় বসে রোজকার কাগজ প[illegible] হাসে, উঁচু গলায় গান গেয়ে ওঠে, ভিতরের [illegible] রোগটাকে একেবারে ভুলে যেতে চেষ্টা করে। [illegible] নম্বর বেডকে সে সান্ত্বনা দেয়, বলে, “কেন অমন [illegible] রোগ ত' দু'দিনের, তারপরই ত' আবার সারা [illegible] ভরে আমোদের দিন আসবে। আর এতে এত [illegible] বা কেন? জীবনে বিশ্রাম ত' জোটেই না, তা[illegible] ক' দিন ত' প্রাণ ভরে আরাম করে বিশ্রামের দিন, তাই তুমি কেঁদে কেঁদে নষ্ট করছ!”

[illegible] তিন নম্বর গোঙাতে গোঙাতে বলে, “কত দিন আর [illegible]পাতালে কাটাব?”

[illegible] দুই নম্বর সান্ত্বনা দেয়, “আর ক'দিন বন্ধু? মনের [illegible] থাকলে, মনের শান্তি থাকলে জীবনের জোর এসে [illegible] রোগ টিকে থাকে না! আঃ, আর কয়টা [illegible], তারপর হয়ত আমরা আবার ফেলে আসা আগের [illegible]নে ফিরে যাব। হুল্লোড় করব, আমোদ করব, স্ফূর্তি [illegible]। অকারণে মাঝ রাতে রাস্তায় রাস্তায় খালি পায়ে [illegible] বহুদূর চলে যাব। আসাম যাব কালো রাত্রির রঙ [illegible]বার জন্যে, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ফাঁকা রাস্তায় গাড়ীর [illegible]রে স্পীডের পর স্পীড তুলব। জুহু যাব, নারকেল [illegible]ছের হুহু করা বাতাসে বসে দিন ভরে নীল জল দেখব। [illegible] শুনব, গান শোনাব। জীবনের কোথাও কোনো [illegible] রাখব না।”

তিন নম্বর রোগী মরা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে ওর [illegible] দিকে চেয়ে থাকে। শুনতে ভাল লাগে, অথচ [illegible]ন যেন হিংসা লাগে ওর!

দু' নম্বরের কথা আর ফুরায় না, চোখ বুজে বলে [illegible], “ঘুম থেকে উঠে দেখব সোনালী রোদ্দুরে আমার [illegible]না ভরে গেছে, আর শিয়রের জানলা দিয়ে পাশের [illegible]রের চা তৈরি করার টুং টাং মিষ্টি আওয়াজ জেগে [illegible]বার ইসারা করছে। তবু উঠব না, চোখ খুলব না, [illegible]ক্ষণ শুয়ে শুয়ে নিজের মন থেকে বানানো একটা [illegible] দেখব।

রবিবার যদি হয়, তবে ব্রীজ চলবে দুপুরে। [illegible]কে করব পার্টনার। আর যদি শনিবার হয় ত' [illegible] শো-এ যাব ‘এলিটে’, সন্ধ্যাটা কাটাবো কোনো [illegible]তোরায়।”

নার্স এসে গেল। দু' নম্বর রেস্তোরায় যাওয়া স্থগিত [illegible] হাসতে হাসতে তার সঙ্গে গল্প সুরু করে দিল।

জানলার পাশের এক নম্বর বেডের বুড়োর পৃথিবীর [illegible] শেষকালে একদিন ভোর রাত্তিরে সূর্য্য ওঠবার [illegible]ই ফুরিয়ে গেল। ভোর বেলা তার মৃতদেহটা [illegible] যাবার পরে এক নম্বর বেডটা খালি হতেই দু' [illegible] চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিয়ম হিসাবে [illegible] নম্বর বেডে তার যাবার পালা। পাশের সঙ্গীকে সে ডেকে বলল, “এবার জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে রোজ সারাদিন রাস্তা দেখা যাবে। কত দিন যে রাস্তা দেখি না!”

তিন নম্বর বিষণ্ণ মুখে বলল, “তুমি ত' ভাই রাস্তা দেখে আনন্দে থাকবে, যা দেখবে আমাকে সব ব'লো কিন্তু।”

“নিশ্চয়ই”, ও উত্তর দিল, “সমস্ত কথাই তোমাকে বলব।”

কিছুক্ষণ বাদেই তাদের বিছানা অদল বদল করা হ'ল। আগের দু' নম্বরকে আনা হ'ল এক নম্বর বেডে, সেই জানলার পাশে। আর তিন নম্বরকে আনা হ'ল দু' নম্বর বেডে। তিন নম্বর বেডটা খালিই রইল; নতুন রোগী তখনো এসে জোটে নি।

নার্স বেরিয়ে যেতেই দুপুরবেলা এখনকার এক নম্বর বেডের রোগী বিছানায় উঠে জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মারল। তারপর নীচের দিকে দুই চোখ মেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

“কি দেখছ?” তার পাশের সঙ্গীটি জিজ্ঞাসা করল ব্যগ্রকণ্ঠে।

“দেখছি? দেখছি, চওড়া পীচের রাস্তাটা দুপুরের রোদে কেমন ঘুমুচ্ছে। ওপাশ দিয়ে একটা মোটর গাড়ী ছুটে বেরিয়ে গেল, তার পেছনে পেছনে চলেছে একটা ফিটন গাড়ী খপ্‌ খপ্‌ আওয়াজ করতে করতে।”

“ফিটন গাড়ী!” দু' নম্বর বেড থেকে ও চেঁচিয়ে ওঠে, “ওঃ, কত দিন ফিটন গাড়ী দেখি না! আর কি আছে রাস্তায় ঠিক করে বল। কিছু বাদ দিও না।”

ওর সঙ্গী বলল, “না না, সবই বলছি। এ রাস্তাটার পাশে একটা লাল বাড়ীর সামনে রিক্সার পরে জবুথবু হয়ে একটা রিক্সাওয়ালা ঘুমিয়ে আছে। তার পাশে ডাষ্টবিন্‌ থেকে একটা কুকুর কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। একটা ছিট কাপড়ওয়ালা যাচ্ছে চ্যাচাতে চ্যাচাতে, আর তার আরও একটু দূরে আসছে একটা ‘এলুমিনিয়াম্‌ বাসন নিবে গো?’”

“বাঃ বাঃ কি সুন্দর”, দুই নম্বর আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, “ও রাস্তায় নিশ্চয়ই আমি অনেক বার এসেছি। আচ্ছা, রাস্তায় কি কোনো লোকজন নেই?”

TIGHT BINDING

"তেমন কিছু নেই, দুপুর বেলা বলে বোধ হয়"।—ওর সঙ্গী উত্তর করল। "ঐ যে হোস্ পাইপওয়ালারা কাঁধে পাইপ ঝুলিয়ে আসছে। এক্ষুনি জল দেবে বোধ হয় রাস্তায়। ঐ যে সুরু হয়ে গেল। ফট্ ফট্ আওয়াজ করছে।"

"রাস্তায় জল দিচ্ছে? নিশ্চয়ই সাড়ে তিনটা বাজে, একটু বসে থাক ভাই নিশ্চয়ই এখন ইস্কুল ছুটি হবে, ছেলেরা দল বেঁধে ঐ রাস্তায় আসবে।"

ওর বন্ধু বলল, "আসবে নয়, আসতে সুরু করে দিয়েছে। দূর থেকে ওদের দেখা যাচ্ছে—ওরা হল্লা করে ফিরছে। একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, চকোলেট রঙের স্কার্ট আর হাফ্‌প্যাণ্ট পরা। নিশ্চয়ই কোনো ছোটদের ইস্কুলের। বুড়ী ঝিটা ওদের নিয়ে আর সাঁমলাতে পারছে না। ওঃ, কি দুষ্টুই না ছোট্ট ছেলেটা!"

"কি করছে ও?"

"কেবলই বুড়ো ঝিটাকে চিমটি কাটছে পেছন থেকে।"

নার্সের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি এক নম্বর বেডের রোগী পা গুটিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল।

দু' নম্বর বলল, "নার্স চলে গেলে আবার তুমি উঠে রাস্তা দেখে আমাকে সব ব'লো কিন্তু। আমার ভারি ভাল লাগছে, মনে হচ্ছে আমিও তোমার মত হাসিখুসি হয়ে যাব। উঠে গিয়ে যে নিজে দেখব সে ক্ষমতা ত' নেই আমার।"

"নিশ্চয়ই বলব", ওর বন্ধু উত্তর দিল। "দেখো, শুনতে শুনতে তোমার মন কেমন ভাল হয়ে যাবে। দেখবে দু' দিন বাদেই তোমার রোগ কেমন ভাল হয়ে গেছে।"

এখনো বিকেলের রঙে রাঙা রাস্তা দেখা বাকি আছে। আবার রুগ্ন দুই হাতে ভর করে এক নম্বর রোগী রাস্তার দিকে তাকিয়ে তার উৎসুক সঙ্গীকে এক এক করে সব ব'লে যায়।

"লোকের ভীড় সুরু হয়েছে?"

নিশ্চয়ই, এখনি ত' অফিস থেকে ফিরবার সময়। ওঃ, কত লোক বেড়াতে বেরিয়েছে! সামনের চায়ের দোকানে একরাশ লোক কি গল্পই না জমিয়ে তুলেছে!"

"আঃ, কত দিন যে চায়ের দোকানে ঢুকি না, [illegible] না কত দিন!" বিষণ্ণ গলায় পাশের বেড থেকে [illegible] আসে।

"তিনটি মেয়ে চলে গেল হাসতে হাসতে [illegible] বেয়ে। বিকেলের হাওয়ায় ওদের নীল শাড়ির [illegible] উড়ছে।" এক নম্বর বেডের রোগী একমনে ব[illegible] চলে।

দু' নম্বর রোগী চোখ বুজে শোনে। বলে, "পা[illegible] আলো জ্বালিয়েছে রাস্তায়? কেমন আলো? খু[illegible] জ্বল্ জ্বল্ করছে?"

সন্ধ্যার পরের খবর কিন্তু এক নম্বর রোগী [illegible] দিতে পারে না। কারণ প্রথমতঃ রাস্তা অন্ধকার [illegible] যায়, তা ছাড়া রোজকার মত সেই পুরানো বুকের ব্য[illegible] আবার বেড়ে ওঠে। তখন থেকে ওর কথা বলা [illegible] হয়ে যায়। তারপর ক্রমে ব্যথাটা বেড়ে উঠে অ[illegible] হয়ে পড়ে; শেষকালে বাধ্য হয়ে কোনো রকমে [illegible] দু'টো বাড়িয়ে টেবিলের উপরের ওষুধটা গড়িয়ে [illegible] ফেলে। ভয়ানক রকম ব্যথা না বাড়লে ও [illegible] খেতে নিষেধ আছে, কিন্তু তাকে প্রায় রোজই [illegible] হয়। তা' না হলে মনে হয় এই বুঝি বুকের ফুসফু[illegible] ফেটে বেরিয়ে যাবে। ঘুমের ওষুধে প্রকাণ্ড রাত্রিটা ক[illegible] কেটে যায় তা' টের পায় না।

তারপর সকাল আসে, জানলা দিয়ে ভোরের আ[illegible] এসে পড়ে। কনুইতে ভর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকি[illegible] আবার এক নম্বর সুরু ক'রে দেয় রাস্তার বর্ণনা। পা[illegible] বিছানা থেকে তার সঙ্গী উৎসুক হয়ে তার প্রতি[illegible] শব্দ শোনে। রাস্তার ছোট গাছটার পাতা নড়া থে[illegible] রিক্সার ছোটাছুটি করার প্রতিটি কথা না শুনলে ত[illegible] আর দিন কাটে না। ওর সঙ্গীরও ক্লান্তি নেই, রা[illegible] প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত এক এক ক'রে ব'লে যায়, [illegible] তাকিয়ে দেখে তার সঙ্গীটির মুখে কতখানি হাসি [illegible] ওঠে।

হঠাৎ একদিন দুই নম্বর বেডের রোগীর খেয়াল [illegible] দু' নম্বর বেড ছেড়ে এক নম্বর বেডে গেলে কেমন হ[illegible] তা হ'লে এই অথর্ব্ব দেহে শুয়ে শুয়ে আর রা[illegible] গল্প শুনতে হবে না, নিজের চোখে দেখা যাবে রা[illegible]

[illegible] ছবি,—পাতা নড়া থেকে হাওয়াগাড়ীর ছুটাছুটি। [illegible] বন্দী জীবনে একটু মুক্তির আলোর আস্বাদন সে [illegible]নেই। হঠাৎ তার মনে হ'ল, পথ—একটুকরো পথের [illegible]কে কঠিন নেশার মত টানছে। না দেখলে মনে [illegible] নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

[illegible] শেষকালে একদিন দুর্ব্বল দেহে সে প্রায় পাগলের [illegible] চেঁচিয়ে সঙ্গীকে বল্‌ল, "তোমার ও রাস্তার গল্প থামাও, [illegible] ক'রে শেষকালে কি আমাকে পাগল ক'রে দেবে?" [illegible] এক নিঃশ্বাসে এককালের প্রিয়তম সঙ্গীকে বিস্মিত [illegible]রে এতগুলো কথা ব'লে সে পাগলের মত ক্লান্ত হয়ে [illegible]শ্বাস টানতে লাগল। মাথার মধ্যে আফিম ফুলের মত [illegible] আছে এক চিন্তা—জানলা দিয়ে পথ না দেখতে [illegible]লে পাগল হয়ে যাব,—না দেখতে পেলে পাগল হয়ে [illegible],—না দেখতে পেলে পাগল হয়ে যাব।

[illegible] সেইদিন রাত্রে এক নম্বর বেডের সঙ্গীর ব্যথাটা [illegible] ভয়ানক ভাবে। সারা শরীর তার নীল হয়ে গেছে। [illegible]দিয়ে অসহ্য ব্যথায় তার একটা আওয়াজও বেরুচ্ছে [illegible] দুই ঘণ্টা একটানা ছট্‌ফট্‌ করার পর কাঁপতে [illegible]তে সে তার শীর্ণ হাতটা বাড়াল টেবিলের [illegible]রের ওষুধটা ঢেলে খাবার জন্যে। যন্ত্রণায় ওষুধের [illegible]ও তার এতক্ষণ মনে পড়ে নি। ওষুধটার দিকে [illegible]বার সঙ্গে সঙ্গে দু' নম্বর বেডের সঙ্গীর দিকে তার [illegible] দৃষ্টি পড়ল।

[illegible] দু' নম্বর বেডের সঙ্গী তার দিকে তাকিয়ে আছে ঠিক [illegible]লের মত দৃষ্টি নিয়ে। কি যেন একটা ষড়যন্ত্র তার [illegible]মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

এক নম্বর তার কাঁপা হাতটা বাড়িয়ে দিল ওষুধটা নেবার জন্যে, কিন্তু সেই সঙ্গে দেখতে পেল দুই নম্বর বেডের সঙ্গীটি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছে পাগলের মত। অথর্ব্ব, শীর্ণ পা দু'টো টলছে, উন্মাদের মত তাকিয়ে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে কোনো রকমে এক পা এগিয়ে সে ওষুধের শিশিটা ঠেলে ফেলে দিল সেটা পড়ল মাটিতে চূরমার হয়ে গড়িয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা চীৎকার ক'রে এক নম্বর বেডের রোগী এক পাশে ঢলে পড়ে গেল।

তার পরের দিন। মৃতদেহ সরান হয়ে গেছে। দু' নম্বর রোগীকে নিয়ম অনুসারে এক নম্বর বেডে আনা হয়েছে সেই জানলার পাশের বেডটিতে। শুয়ে শুয়ে সে কেবলই অসহিষ্ণু হয়ে ভাবছে কখন নার্স বেরিয়ে যাবে, কখন সে উঠে জানলা দিয়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত এক টুকরো রাস্তা দেখবে।

শেষকালে নার্স ঘর ছেড়ে অন্য কাজে চলে গেল। সেও বিছানায় ভর দিয়ে উঠে বসল। সারা গা কাঁপছে, তিনরাত্রি ঘুম নেই। আনন্দ, উল্লাস—কেমন একটা উন্মত্ত আনন্দে সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটা ভারী দম নিয়ে সে রাস্তা দেখবার জন্যে জানলার ভিতর দিয়ে উঁকি মারল।

কোথায় রাস্তা? যত দূর দেখা যায় চেয়ে দেখল রাস্তার চিহ্ন মাত্র নেই। চোখের দৃষ্টিকে আটকে দাঁড়িয়ে আছে হাসপাতালের শ্যাওলাধরা প্রকাণ্ড একটা উঁচু দেওয়াল।

কবে?

শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী

সাগর এবং গগন, কি ধ্যানে রহিল মগন!
আসিবে কি শুভ লগন যবে তা ফেলিব জানি?
সন্ধ্যা এবং উষায় অত বিচিত্র ভূষায়

কে সে, কার মন ভুলায় আঁকি' আঁকি' ছবিখানি?
নিশীথে তারকারাশির মিটি মিটি ঐ হাসির
মানে কানে মর-বাসীর কবে ক'বে সন্ধানী?

চিন্তা পাঠ

মানুষ চিন্তাশীল, মানুষ চিন্তা করে—আর এই চিন্তার সমাধান করতে গিয়েই সে হয়েছে এত বড়।

মহাপণ্ডিত চাণক্য বলেছেন—

"মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।
অন্যলক্ষিত কার্য্যস্য যতঃ সিদ্ধির্ন জায়তে॥"

যখন কেউ চিন্তা করে তখন সে করে একান্তে, অন্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে—গোপনে। প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত কেউই তার চিন্তার নাগাল পায় না। অবশ্য মনস্তত্ত্ববিদ্, যাঁরা চিন্তা পাঠ করে থাকেন, তাঁদের কথা ছাড়া—তাঁরা ত' "কেউ"-র মধ্যে পড়েন না।

যাই হোক, কাউকে চিন্তা পাঠে সক্ষম হ'তে দেখলে তার প্রতি সহজেই মন শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। যাদুকরেরা মানুষের এই দুর্ব্বলতাটুকুরও সুযোগ নিতে ছাড়েন নি—তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির জোরে কৃত্রিম চিন্তা পাঠ দেখিয়ে সস্তায় বাহবা নিয়েছেন। এর জন্য অবশ্য যাদুকরদের ঠিক দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তাদের সব ছলা-কলা, চাঁতুরীর পিছনে আছে নির্দ্দোষ আনন্দ বিলিয়ে দেবার প্রবল ইচ্ছা—যে আনন্দ ছেলে-বুড়ো সবাই উপভোগ করে।

এখানে কৃত্রিম চিন্তাপাঠ করার একটী উৎকৃষ্ট প্র প্রকাশ করে দিচ্ছি। এই পদ্ধতিতে চিন্তাপাঠ দে আমি বহু জায়গায় প্রশংসা লাভ করেছি।

যাদুকর কয়েক টুকরো কাগজ নিয়ে দর্শকদের ম বিলিয়ে দেন, আর তাঁদের অনুরোধ করেন কাউকেও না দেখিয়ে কিছু লিখে কাগজখানা ভ করে নিজের কাছে রাখতে। বলা বাহুল্য প্রত্যে কিছু লিখে লেখাটা ভাঁজ করে হাতের মুঠোয় পকেটে রাখেন। যাদুকর মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়েই একজনকে তার চিন্তা করতে ব'লে তিনি কি লিখে তা' বলে দেন। এমন কি কেউ কোন প্রশ্ন লি থাকলে তার উত্তরও দিয়ে দেন। আশ্চর্য্য নয় কি?

এই রকমের অনেক খেলার অন্যান্য যাদুকর দ ভিতর নিজের সহকারীকে আগে থেকে বসিয়ে কাজ হাসিল করে নেন; কিন্তু আমাকে যে তা ক হয় না তা খেলার কৌশল পড়লেই বুঝতে পারবে।

এই খেলা দেখাতে গেলে দরকার—কয়েক টু পাৎলা সাদা কাগজ, যত টুকরো কাগজ ততগুলি

সল ও বই, কার্ব্বন পেপার, ছোট সাইজের ব্ল্যাক্‌বোর্ড, একজন বিশ্বাসী সহকারী ইত্যাদি।

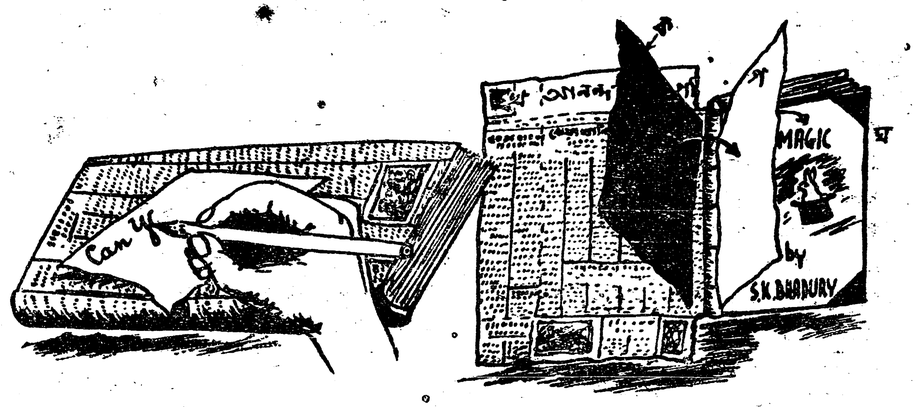

ক—কার্ব্বন পেপার, খ—খবরের কাগজের মলাট, গ—সাদা কাগজ, ঘ—বইএর মলাট

র্শকদের কাগজের টুকরোগুলি দেওয়ার সময় ্যেককে লিখবার জন্যে একখানি ক'রে হার্ড পেন্সিলও ত হবে। কাগজ খুব বেশী পাৎলা আর জল যাতে খুব বেশী হার্ড না হয় সেদিকে রাখতে হবে। ঐ সঙ্গে তাঁদের ্যেককে একখানি ক'রে বইও দিতে যাতে তাঁরা বইএর উপর কাগজ রেখে ভাবে লেখার সুবিধা পান।

আসল কারসাজি থাকে এই বই-তেই। এগুলির মলাট হবে খবরের জে মোড়া, আর প্রত্যেক খবরের জের নীচে থাকবে উপুড় করা কোরা নতুন কার্ব্বন পেপার, আর তার চে সাদা কাগজ।

নিজেদের লিখবার সুবিধার জন্য এই ব্যবহার ক'রেই যাদুকরের সুবিধা ক'রে র্শকেরা। পাৎলা কাগজে স্পষ্ট ক'রে বার জন্য হার্ড পেন্সিলে চাপ দেওয়ার লেখার দাগ পড়ে যায় কার্ব্বন পারের নীচের সাদা কাগজে। যাদুকর ই দাঁড়িয়ে থাকেন আর তাঁর সহকারী

লিখবার পর কাগজ ভাঁজ করে রাখলে পরে দর্শকের কাছ হতে পেন্সিল আর বই নিয়ে মঞ্চের ভিতর চলে যায়।

এর পর যাদুকর চিন্তা পাঠ সম্বন্ধে একটা সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট করেন। এই

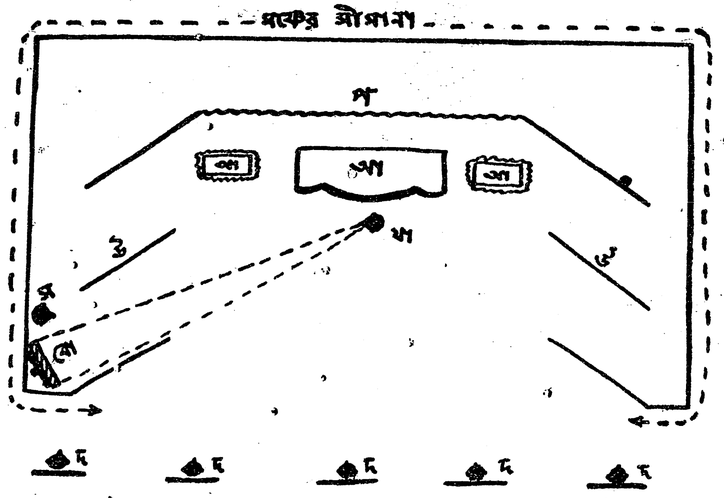

চিন্তা পাঠ কালে মঞ্চে যাদুকর, দর্শকগণ, সহকারী, বোর্ড প্রভৃতির অবস্থিতির স্থান দেখানো হয়েছে।

প—পিছনের পর্দ্দা, উ—উইংস্, আ—ম্যাজিকের আসবাবপত্র, যা—যাদুকর, স—সহকারী, বো—ব্ল্যাক্ বোর্ড, দ—দর্শকগণ।

সময়ের মধ্যে সহকারী উইংস্-এর আড়ালে গিয়ে প্রত্যেকটি বই থেকে খবরের কাগজের মলাট খুলে সাদা কাগজে দর্শকদের লেখার প্রতিলিপি বের ক'রে আনে। তার পর ব্ল্যাক্ বোর্ডে খড়ি দিয়ে বেশ বড় ক'রে পর পর প্রত্যেক প্রতিলিপির নকল লিখে এমন ভাবে ধরে যে যাদুকর দর্শকদের দিকে মুখোমুখী না দাঁড়িয়ে একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে বোর্ডের লেখা পড়তে পারেন অথচ দর্শকেরা বোর্ডের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থকেন। চিত্রে দেখ, বোর্ড্ ও দর্শক কি ভাবে থাকলে যাদুকরের সুবিধা হয়। যাদুকর চিন্তার ভান ক'রে বোর্ডের লেখা পড়ে বলতে থাকেন, আর কোন প্রশ্ন থাকলে তার একটা মানান সই উত্তর দিয়ে দেন।

এ ত' গেল মঞ্চে প্রদর্শনের পদ্ধতি? এটা ইচ্ছে করলে খুব ভাল ভাবে 'পার্লর ট্রিক্' হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ড্রইং রুমে উইংস্ থাকে না, এখানে একটা লম্বা টেবিলের সামনের দিকে একটা বড় টে[illegible] ক্লথ মেঝে পর্য্যন্ত ঝুলিয়ে এর পিছন দিক্টা সহকা[illegible] কাজকর্ম্মের জন্য ছেড়ে দিতে হয়। যাদুকর বলবা[illegible] সময় এখানে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ি[illegible] থাকেন।

এবার মঞ্চেই দেখাও আর ঘরে কয়েক জন বন্ধু বান্ধবকেই দেখাও, আশা করি, এই চিন্তা পাঠ দেখাতে তোমরা কেউই অকৃতকার্য্য হবে না। গোপনে খেলা[illegible] রপ্ত ক'রে তবেই দেখাবার চেষ্টা ক'রো নচেৎ ধরা পড়ে যেতে পার। খেলাটা একটু কঠিন তাই এর কৌশ[illegible] বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করলাম। এতে, আমার মনে হয় তোমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে। এর পরও যদি কো[illegible] কোন জায়গায় বুঝতে না পার তা হ'লে সম্পাদক মহা[illegible] মারফৎ চিঠি লিখো, আমি পৃথক্ ভাবে পত্র লিখে বুঝাতে চেষ্টা করব।

অষ্ট্রেলিয়ায় দ্বিতীয় টেষ্ট্ ম্যাচ্

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

ইংল্যাণ্ডের বাছাই করা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দল সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণে গিয়াছে এবং সেখানে বিভিন্ন খেলায় কি রকম ফলাফল হইতেছে তাহা তোমাদের ইতিপূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড : অষ্ট্রেলিয়া দলের ২য় টেষ্ট ম্যাচ্ শেষ হইয়াছে, এবং এবারেও ইংল্যাণ্ড দল শোচনীয় ভাবে—এক ইনিংস্ ও ৩৩ রানে পরাজিত হইয়াছে। যে ইংল্যাণ্ড দল প্রথম দশটি খেলায় সম্মানজনক ফলাফল দেখাইয়া অষ্ট্রেলিয়ার দলকে রীতিমত চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল সেই ইংল্যাণ্ড দলকেই কিনা পর পর দুইটি টেষ্ট ম্যাচেই ইনিংসের পরাজয় বরণ করিয়া লইতে হইল!

সিড্নীতে দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ্ অনুষ্ঠিত হইবার পূ[illegible] ইংল্যাণ্ড দলকে একটি দুই দিন-ব্যাপী খেলায় কুইন[illegible] ল্যাণ্ডের গ্রাম্য একাদশের বিরুদ্ধে খেলিতে হয়। খেলা[illegible] তেমন উল্লেখযোগ্য হয় নাই এবং শেষ হইয়াছে অমীমা[illegible] সিত ভাবে।

কুইন্স্ল্যাণ্ড করে প্রথম ইনিংসে ২০৮, দ্বিতী[illegible] ইনিংসে—৩১১ (৯ উইকেট)। এম. সি. সি. (ইংল্যা[illegible] দল প্রথম ইনিংসে করে—২৮২।

তার পরই দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ্। এই টেষ্টে [illegible] মনোনয়ন করা হইয়াছিল এই রূপ :—অষ্ট্রেলিয়া: অ[illegible] নায়ক—ডন্ ব্র্যাড্ম্যান্; সহকারী অধিনায়ক :—লিণ্ড[illegible]

[illegible]ট্; ব্যাট্স্ম্যান্—কিথ্ মিলার, সিড বার্ণেস, [illegible] ও ম্যাক্কুল্। বোলার—ক্রিয়ার, জন্সন্, ট্রাইব্ [illegible]লাক; উইকেট-রক্ষক—ট্যালন্।

ইংল্যাণ্ড : অধিনায়ক হ্যামণ্ড ;—সহকারী অধিনায়ক [illegible]য়ার্ড্লী; ব্যাট স্ম্যান্—এড্রিচ্, কম্প্টন্, ইকিন্, করেন। জন্সনের বোলিং মারাত্মক হইয়াছিল। তিনি ৩১ রান্ দিয়া ৪টি উইকেট দখল করেন। উইকেট-রক্ষক ট্যালনের কৃতিত্ব অসাধারণ; তাঁহার সহায়তায় হাটন্, কম্প্টন্, হ্যামণ্ড্ ও ইয়ার্ড্লীকে পরাজিত করা সম্ভবপর হয়।

ইংল্যাণ্ড : অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট্ ম্যাচ দেখিবার জন্য কিরূপ ভীড় হয় তাহার একটু নমুনা।

[illegible] এবং ওয়াশ্ব্রুক্; বোলার—স্মিথ্, বেডসার, [illegible]; উইকেট-রক্ষক—ইভান্স।

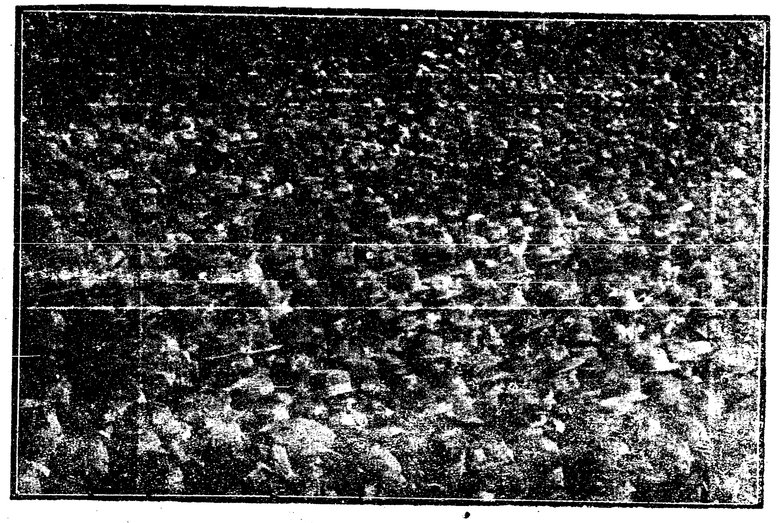

[illegible]বার টসে ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করিয়া [illegible] ব্যাট্ করিতে যায়। সুন্দর প্রাকৃতিক আবহাওয়ার [illegible] খেলা আরম্ভ হয়। কিন্তু হইলে কি হইবে, প্রথম [illegible] খেলায় ইংল্যাণ্ড অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ব্যাটিংএর [illegible] দিল। ৮ উইকেটে মাত্র ২১৯ রান্ উঠে। [illegible]রিচ্ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—৭১ রান্ করেন। তার পরে [illegible]নের ৩৯ এবং ইকিনের নট্ আউট্ হইয়া ৫২ রান্ [illegible]যোগ্য। পরের দিন অবশ্য তিনি মাত্র ৬০ রান্ [illegible] আউট্ হইয়া যান। হ্যামণ্ড মাত্র ১ রানের [illegible] আউট হ'ন। ওয়াশব্রুক্ ১ রান্, কম্প্টন ৫ রান্, [illegible]ড্লী ২৫ রান্, স্মিথ্ ৪ রান্ আর ইভান্স ৫ রান্ মাত্র

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের সমগ্র টীম্ ২৫৫ রানে আউট হইয়া যায়। জন্সন্ ৪২ রানে ৬টি, ম্যাক্কুল্ ৭৩ রানে ৩টি ও ক্রিয়ার ২৫ রানে ১টি উইকেট পান।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দিনের শেষেই ব্যাটিং করিতে যায়, এবং দিনের শেষে ১ উইকেটে ২৭ রান্ ওঠে। মরিস এড্রিচের বলে ৫ রান্ করিয়া আউট্ হইয়া যান। সেই দিন বৃষ্টির জন্য অধিকক্ষণ খেলা চলা সম্ভবপর হইল না। তৃতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ান্ দল সারাদিন ব্যাটিং করিয়া মাত্র ৪ উইকেটে ২৫২ রান্ করে। জন্সন্ ৭ রান্, হ্যাসেট ৩৪ রান্, ও মিলার ৪০ রান্ করিয়া আউট হইয়া যান। এড্রিচের বোলিং ভাল হইয়াছিল, তিনি ৫৯ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন। সিড্ বার্ণেস্ অদ্ভুত খেলিয়া ১০৯ রান্ করিয়া নট্ আউট রহিলেন।

TIGHT BINDING

চতুর্থ দিনে ব্র্যাডম্যান্ ও বার্ণেস প্রায় সারাদিন খেলিয়া প্রত্যেকে ২৩৪ রান্ করিয়া আউট হইলেন। ব্র্যাডম্যান্ ৩৮৮ মিনিট খেলিয়া ৩৪টি বাউণ্ডারী মারিয়া উক্ত রান্ তোলেন। বার্ণেস্ ৬৪০ মিনিট খেলিয়া ১৭টি বাউণ্ডারী মারিয়া ঐ দুই শতাধিক রান্ করিবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। দিনের শেষে তাঁহাদের ৬ উইকেটে ৫৭১ রান্ ওঠে।

পঞ্চম দিনের খেলা খুব উত্তেজনাপূর্ণ হয়। অষ্ট্রেলিয়া এইদিন ৮ উইকেটে ৬৫৯ রান্ করিয়া ডিক্লেয়ার করে। প্রথম ইনিংসে তাহারা ৪০৪ রানে অগ্রগামী থাকে।

সেই দিনই ইংল্যাণ্ড দল খুব দক্ষতার সহিত খেলিয়া ৩ উইকেটে ২৪৭ রান্ তোলে। ইহার মধ্যে হাটনের ৩৭, ওয়াশব্রুকের ৪১, আর কম্প্টনের ৫৪ রান্ উল্লেখযোগ্য হয়। অদ্বিতীয় অল্ রাউণ্ডার এডরিচ্ ৮৬ রান্ করিয়া এবং অধিনায়ক হ্যামণ্ড্ ১৫ রান্ করিয়া নট্ আউট্ থাকেন। ইংল্যাণ্ডের হাতে তখনও ৭টি উইকেট অবশিষ্ট আছে। শেষ দিনে সারাদিন খেলিয়া যদি তাহারা ১৫৭ রান্ যোগ করিতে পারে তাহা হইলে শুধু যে ইনিংসের পরাজয় হইতে রক্ষা পাইবে তাই নয়, হয়তো এই খেলা অমীমাংসিতও থাকিতে পারে। সুতরাং শেষ দিনের খেলা দেখিবার জন্য ক্রীড়ামোদীগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। শেষ দিনে কিন্তু বিধি ইংল্যাণ্ডের বাম হইলেন। যখন দলের অধিনায়ক চৌকস খেলোয়াড় হ্যামণ্ড্ মাত্র ৩৭ রানে বিদায় লইলেন তখন ইংল্যাণ্ডের পরাজয় প্রায় অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। এদিকে এডরিচ্ সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অতিরিক্ত সতর্কতা ও দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া তাঁহার প্রথম সেঞ্চুরি করিলেন। দেখি... দেখিতে তিনিও ১১৯ রানের মাথায় ম্যাক্কুলের ... আউট হইয়া গেলেন। তার পর ইয়ার্ডলীকে ৩৫, ইকি... ১৭, স্মিথকে ২, ইভান্সকে ৯, আর রাইট্কে ০ রানে আউ... করিয়া অষ্ট্রেলিয়া দল পুনরায় ১ ইনিংস্ ও ৩৩ রা... জয়লাভ করে। ম্যাক্কুল্ ১০৯ রানে ৫টি উইকেট ... করেন।

প্রথম টেষ্ট ম্যাচের ন্যায় এই খেলাটিতেও কয়েক... বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। যেমন—

(১) পঞ্চম উইকেটে নূতন টেষ্ট রেকর্ড—ব্র্যাডম্যা... ও বার্ণেসের সহযোগিতায় ৪০৫ রান্ যোগ হইয়াছে... ইংল্যাণ্ড ঃ অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট ইতিহাসে ইহা নূতন রেকর্ড।

(২) ইংল্যাণ্ডের পক্ষে কখনও এক ইনিং... দুইজন খেলোয়াড় দুই শতাধিক রান করেন নাই। ইতি... পূর্ব্বে ১৯৩৪ সনে একবার ব্র্যাড্ম্যান্ ২৪৪ এবং পন্সফোর্ড ২৬৬ রান্ করিয়াছিলেন।

(৩) অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট ইতিহাসে ৮ উইকেটে ৬... রান্ও নূতন রেকর্ড। অষ্ট্রেলিয়ায় এত বেশী রান্ আ... কখনও উঠে নাই।

(৪) টেষ্টে বার্ণেসের এই সর্ব্বপ্রথম দ্বিশতাধিক রান্...

(৫) ব্র্যাডম্যান্ সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ বার শতাধিক রা... করিলেন, আর ৭ বার করিলেন দুই শতাধিক রান্।

(৬) অষ্ট্রেলিয়া রেকর্ড সংখ্যক রান্ করিল, অথ... ইংল্যাণ্ড দলের নবাগত উইকেট-রক্ষক ইভান্স একটি... 'বাই' রান্ দেন নাই। উইকেট-রক্ষকের পক্ষে ই... বড় কম কৃতিত্বের কথা নহে।

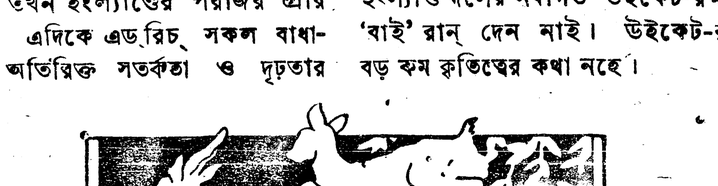

বিংশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্ত-সংবাদ

...দুর্গের ভিতর ঢুকিয়া ফকির পা টিপিয়া টিপিয়া ...গ্রসর হইল। সম্মুখে কেহ নাই, কিছু দূরে একটা ...আলোকরেখা দেখা যাইতেছে, হয়তো ঐ দিকেই ...র বাসিন্দারা ভিড় করিয়াছে। ফকির সন্তর্পণে ...টু আগাইয়া বাঁয়ে ঘুরিল এবং একটি সরু গলি ...খিয়া তাহারই ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। দুর্গের ফিরিঙ্গী ...রী বলিয়াছিল, বাঁ-দিকের একটি গলি দিয়া ঢুকিলে ...কেবারে কেল্লার দক্ষিণ-পূব কোণের চোরা-কুঠরীতে ...া হাজির হওয়া যায়। নিশ্চয়ই এইটিই সেই ...া।

...স্যাংসেঁতে গলি। দু' পাশে শক্ত পাথরের মসৃণ ...য়াল—খাড়া উঠিয়া গিয়াছে; অন্ধকারে গলিটিকে ... বলিয়াই ভ্রম হয়। মাঝে মাঝে দেয়ালে ছোট ...ট খুপরী কাটিয়া সেখানে তেলের প্রদীপ বসাইয়া ...টিকে অল্প আলোকিত রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ...আলো এত দূরে দূরে এবং এতই ক্ষীণ যে খানিকক্ষণ ...গাইয়া না গেলে চোখে ঠাহর করা যায় না। ফকির ...র মধ্য হইতে দু'টি চকমকি পাথর বাহির করিয়া ... মাঝে তাহাই ঘষিয়া তাহারই চকিত-আলোকে ...দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইল।

...পথও পাথর দিয়া বাঁধান, কিন্তু তা দেয়ালের ...মত মসৃণ নয়। খালি পায়ে হাঁটিতে ফকিরের বেশ কষ্ট হইতেছিল। মাঝে মাঝে জল গড়াইয়া গলিটি স্থানে স্থানে পিছল হইয়া আছে। সম্ভবতঃ দেয়ালের অপর পাশের কোন ঘর হইতে নালার জল এই পথেই বাহির করিয়া দিবার আয়োজন হইয়াছে। ফকির কয়েক বার পড়িতে পড়িতে কোন রকমে দেয়াল ধরিয়া আত্মরক্ষা করিল।

আরও খানিকটা যাইতে দেখা গেল গলিটি আর একটি চওড়া রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। এবং, কয়েকটি ভারী পায়ের শব্দ সেই রাস্তা বাহিয়া ক্রমেই নিকটে আসিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য ফকিরের বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আলখাল্লার ভিতর হইতে সদ্য-সংগৃহীত বন্দুকটি টানিয়া বাহির করিয়া সে শক্ত করিয়া ধরিল। বন্দুকটিতে গুলি ভরাই আছে। পিঠ টান করিয়া অন্ধকার দেয়ালের গায়ে ফকির নিজের শরীরটাকে প্রায় মিশাইয়া দিল।

পায়ের শব্দ আরও নিকটে আসিল। তিনজন পর্ত্তুগীজ শান্ত্রী দুর্ব্বোধ্য ভাষায় গল্প করিতে করিতে আসতেছে। নিজেদের গল্পেই তারা মাতোয়ারা। একজন বোধ হয় কি একটা হাসির কথা বলিল, তিনজনই অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। কঠিন পাথরের গায়ে ঠেকিয়া সে হাসি ফিরিয়া আসিল প্রতিধ্বনি রূপে। শান্ত্রীরা

ফকিরকে লক্ষ্য করিল না,—তেমনি হাসিতে হাসিতে অতিক্রম করিয়া গেল।

শব্দ দূরে অদৃশ্য হইলে ফকির স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আগাইয়া আসিল। বন্দুকটাকে এবার সে আর আলখাল্লার ভিতর পূরিল না, হাতের মুঠির ভিতরই ধরিয়া চলিতে লাগিল। প্রহরী বলিয়াছিল, গলি দিয়া সোজা গেলে চোরা-কুঠুরীতে পৌছান যায়। সুতরাং ফকির গলি ছাড়িল না। রাস্তা পার হইয়া গলি আবার সামনে চলিয়া গিয়াছে, যদিও পথটি এবার বেশ আঁকাবাঁকা। চলিতে চলিতে ফকির হঠাৎ এক জায়গায় হোঁচট খাইল। কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া দেখে সেখানটায় একটা মস্ত গর্ত্ত। পাশের দেয়াল খানিকটা ভাঙ্গিয়া একটা লম্বা গহ্বরের মত সৃষ্টি করিয়াছে, গর্ত্তটি বরাবর সেই দিকে চলিয়া গিয়াছে। এখানটায় আলো নাই—ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তা ছাড়া জল ও প্যাচপেচে কাদা জমিয়া জায়গাটিকে মানুষের প্রায় অগম্য করিয়া রাখিয়াছে। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ফকির মনে মনে ভাবিল, ভালই হইল, তেমন প্রয়োজন হইলে আত্মগোপন করিবার একটা জায়গার সন্ধান পাওয়া গেল। এখানে লুকাইলে চট্ করিয়া খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব হইবে না।

ফকির এবার খুব সাবধানে অগ্রসর হইল। আরও খানিকক্ষণ চলিবার পর দেখা গেল গলিটি একটি প্রশস্ত সিঁড়ির উপর আসিয়া শেষ হইয়াছে। সিঁড়ি নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ফকির ক্ষণেক দ্বিধা করিয়া শেষে সিঁড়ি দিয়া নামিতে সুরু করিল।

এবার কানে অস্পষ্ট জলকল্লোল ভাসিয়া আসিতেছে। গঙ্গায় জোয়ার আসিয়াছে বোধ হয়। নদী খুব কাছেই। চোরা-কুঠুরীর দেখাও হয়তো এখনই মিলিবে।

সত্যই তাই। আর কয়েক পা যাইতেই একটি প্রশস্ত বারান্দা, এবং তাহারই অপর দিকে ভারী লোহার দরজা, ঘরটি যে বন্দীশালা, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ সাক্ষ্য দিতেছে। মাথার উপর একটি বড় ঝুলান লণ্ঠন হইতে আলো আসিয়া জায়গাটাকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

সেই আলোকে ফকির আরও দেখিল দরজার মুখে দু'জন প্রহরী—একজন ফিরিঙ্গী, অপরজন সম্ভবতঃ মগ, গভীর মনোযোগের সঙ্গে মাটীতে দশ-পাঁচশ, কি ঐ ধরণে[illegible] কোন খেলায় মগ্ন।

ফকির থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর একটু আড়া[illegible] হইতে উভয়কে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

প্রহরীদের মধ্যে বোধ হয় গুটির চাল লইয়া কো[illegible] মতভেদ হইয়াছিল; উভয়েই বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে পর[illegible]স্পরের কথার প্রতিবাদ করিতেছে। এবং সে প্রতিবা[illegible] ক্রমেই ধাপে ধাপে বচসার পথে চলিয়াছে, হাতাহাতি[illegible] বাধে বুঝি বা! একটু পরে দু'জনেই উপুড় হইয়া [illegible] লইয়া কাড়াকাড়ি সুরু করিল, এবং উভয়ে উভয়ের এ[illegible] কাছে আসিয়া পড়িল যে পরস্পরের মাথা প্রায় ঠোক[illegible]ঠুকি লাগিবার যোগাড়।

ফকির আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিল না। এ[illegible] সুযোগ আর হয়তো আসিবে না। বিদ্যুৎ বেগে বন্দু[illegible] ঘুরাইয়া সে সজোরে দুই বলিষ্ঠ হাতে বন্দুকের ন[illegible] চাপিয়া ধরিল, তার পর সেই বন্দুকের কুঁদা দিয়া উভয়ে[illegible] মস্তক লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণে আঘাত করিল। অব্য[illegible] লক্ষ্য। প্রহরীদ্বয় কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই অতর্কি[illegible] আঘাতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটীতে লুটাইয়া পড়িল[illegible] মুখ দিয়া একটি শব্দ পর্য্যন্ত বাহির হইল না; কোম[illegible] সযত্নবদ্ধ তলোয়ার, পাশে সযত্নে রক্ষিত আগ্নেয়াস্ত্র কোন[illegible] কাজে আসিল না।

ফকির একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল কে[illegible] কোথাও নাই। তার পর এক এক করিয়া প্রহরীদ্বয়ে[illegible] সংজ্ঞাহীন দেহ তুলিয়া পিছনে, গলির সেই অন্ধকা[illegible] গহ্বরের মধ্যে, রাখিয়া আসিল। বন্দুকগুলিও লুকাই[illegible] ভুলিল না।

এইবার চোরা-কুঠুরীর লোহার দরজার দিকে [illegible] নজর পড়িল। কিন্তু আশ্চর্য্য, দরজায় কোন তালা না[illegible] কি ভাবে বন্ধ করা হইয়াছে তাহাও বুঝা যায় না[illegible] ফকির অসহিষ্ণু ভাবে সমস্ত দরজা পরীক্ষা করিয়া দেখি[illegible] তার পর হতাশ ভাবে সজোরে দরজায় ঠেলা দিল[illegible] ঠেলা দিতেই কিন্তু দরজা আপনি খুলিয়া গেল। ফকি[illegible] আর একবার পিছনে তাকাইয়া লইয়া চকিতে ভিত[illegible] ঢুকিয়া পড়িল। পর মুহূর্ত্তেই তার পিছনে লোহার কপা[illegible] আপনা হইতেই আবার সজোরে বন্ধ হইয়া গেল।

[illegible] ঘরে ঢুকিয়া স্বল্প আলোকে খানিকক্ষণ কিছুই দেখা [illegible] না। তার পর চোখে অন্ধকারটা সহিয়া গেলে [illegible]করের দৃষ্টি পড়িল ঘরের অপর কোণে। দেয়ালের [illegible]র খড়ের গাদা বিছান, তাহারই উপর একখানা কম্বল [illegible]তিয়া একটি কিশোর দেয়ালে হেলান দিয়া বিরস [illegible]নে বসিয়া আছে। ছেলেটির দীর্ঘ চুল উস্কোখুস্কো [illegible]য়ের চামড়া রুক্ষ, মুখে একটা গভীর হতাশাময় বেদনার [illegible]। ফকিরকে দেখিয়া ছেলেটি অবাক্ হইয়া চাহিয়া [illegible]ল, মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। ফকির [illegible]র ধীরে আগাইয়া গিয়া তার পাশে বসিয়া পড়িল।

"তোমার নাম জয়ন্ত, না?" মোটা গলায় ফকির [illegible] করিল।

"হ্যাঁ, কিন্তু কি ক'রে জানলেন? আপনাকে তো [illegible]নি কখনও!" জয়ন্ত অবাক্ হইয়া কহিল। "আপ-[illegible]ও বুঝি এরা ধরে এনেছে? উঃ, কি ভয়ঙ্কর [illegible] এরা!"

[illegible]ফকির বলিল, "ঠিক ধরে আনে নি। কিন্তু ধরতই [illegible] পালাবার উপায় বার করতে হ'ত তো! তোমার [illegible] তোমাদের গাঁয়ের আশপাশে কে না শুনেছে? [illegible]র বাবা বড্ড অধীর হয়ে পড়েছেন। কিন্তু, কি [illegible]ন কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। তা, তোমায় [illegible] কষ্ট দিচ্ছে বুঝি এরা?"

জয়ন্ত কথা বলিল না, ঘাড় কাৎ করিয়া সায় দিল।

"তুমি নিজে পালাবার চেষ্টা—" কথার মাঝখানে [illegible]র সহসা থমকিয়া গেল। এতক্ষণ পরে তার চোখে [illegible] ঘরে শুধু তারা দুই জনই নাই, আরও একটি [illegible] লোক ঘরের অপর কোণে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া [illegible]। মুখে আঙুল চাপিয়া সেদিকে ইসারা করিয়া [illegible]র প্রশ্নসূচক নেত্রে জয়ন্তের দিকে চাহিল।

[illegible] ম্লান হাসিয়া কহিল, "ওঁর কথা বলছেন? [illegible] আর কতক্ষণ! যে অত্যাচার করেছে ফিরিঙ্গী [illegible] ওঁর ওপর, আজ রাতেই বোধ হয় ওঁর শেষ [illegible] দু'দিন অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন, প্রবল [illegible] শুধু প্রাণটুকু এখনও ধুক্ ধুক্ করছে!" একটু [illegible] কহিল, "লোকটা বড় ভাল ছিল।"

[illegible]কে, চেন নাকি?"

"না, কোন্ পাড়া-গাঁ থেকে লোভ দেখিয়ে ধরে এনেছিল। এদের অসাধ্য তো কিছুই নেই!"

ফকির উঠিয়া এবার লোকটির কাছে গেল। লোকটির বয়স হইয়াছে, মুখে ফকিরেরই মত কাঁচা-পাকা এক গাল দাড়ি, রুক্ষ চুল, কিন্তু গড়ন বেশ মোটাসোটা। পরনে ঢিলা আলখাল্লা, লোকটি সম্ভবতঃ মুসলমান। ফকির তার শিয়রের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, তার পর খানিকক্ষণ ধরিয়া তাকে পরীক্ষা করিল। জয়ন্ত কাছে থাকিলে দেখিতে পাইত, পরীক্ষা করিতে করিতে ফকিরের সারা শরীর বারেকের জন্য শিহরিয়া উঠিল। একটু পরে ফকির ফিরিয়া আসিল।

"কেমন দেখলেন?" জয়ন্ত প্রশ্ন করিল।

ফকির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। বেচারা!"

খানিকক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। একটা থমথমে ভাব চোরা-কুঠুরীর ভারী বাতাসকে যেন আরও ভারী করিয়া তুলিল। একটু পরে জয়ন্তই কথা কহিল, "রাত কত-হ'ল? এখনই তো বোধ হয় খাবার নিয়ে আসবে। খাবার অবশ্যি নামেই খাবার,—আসলে তা পশুরও অখাদ্য। কিন্তু কথা তা নয়। আপনাকে এখানে দেখলে—"

ফকিরেরও চমক ভাঙ্গিল, কহিল, "হ্যাঁ, তা তো বটেই। গা ঢাকা তো দিতেই হবে। দেখি,—" বলিয়া সে দরজার কাছে গিয়া দরজায় টান দিল। কিন্তু লোহার কপাট এক চুলও নড়িল না,—যেন কেহ দেয়ালের সঙ্গে পেরেক দিয়া গাঁথিয়া দিয়াছে। দরজা এমন কৌশলে তৈরী যে ভিতর হইতে টানিয়া খোলা অসম্ভব।

এই নতুন বিপত্তিতে ক্ষণকালের জন্য তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। এখন কি করা যায়! সহসা মনে হইল, দরজার বাহিরে যেন ভারী পায়ের শব্দ আসিয়া থামিয়া গেল এবং সেই সঙ্গে দু'জন লোকের অস্পষ্ট কথাও কানে আসিতে লাগিল—"নাঃ, ম্যানেলিস্ আর সায়ুকে নিয়ে পারা যায় না। আজও দেখ, দরজা ফেলে কোথায় গেছে! দু'টোতে বসে রাতদিন জুয়ো খেলবে আর মারামারি করবে। আদ্‌মিরালকে ব'লে এর একটা

বিহিত আজই করতে হবে।” তার সঙ্গী কহিল, “ঠিকই তো! সেদিনও ঠিক এমনি ভাবেই দরজা ফেলে রেখে বাবুরা গেছলেন ডি'মেলোর কাছে সালিসী মানতে। আরে সে বেটা নিজেই আস্ত মাতাল, মদ নিয়েই ডুবে আছে! সে আবার সালিসী করবে কি। তুমি আজই আদ্‌মিরালের কাছে নালিশ ক'রো, নয়তো খোদ বারেটোর কাছে। বড় আস্কারা পেয়ে গেছে।”

“যাই, কয়েদী দু'টোকে খাবার দিয়ে আসি। একটা তো বোধ-হয় আজই নিকেশ হবে।”

আর এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়, ফকির কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। ইঙ্গিত করিতেই জয়ন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। ফকির খড়ের গাদাগুলি একটু সরাইয়া সেখানে টান টান হইয়া শুইয়া পড়িল, এবং জয়ন্তকে তাহারই গায়ের উপর কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িতে বলিল। কম্বলের উপরে জয়ন্ত; নীচে খড়ের জায়গায় ফকির, অস্পষ্ট আলোয় ফিরিঙ্গীর চোখে নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে না।

পরমুহূর্ত্তেই ঘরের দরজা ঠেলিয়া একটি যণ্ডা গোছের লোক ভিতরে ঢুকিল। তার এক হাতে একটি পিতৃলের সরায় খানিকটা আধ-পোড়া রুটী, অপর হাতে এক বালতি জল। ঘরের কোণে রক্ষিত জয়ন্তের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাত্রে তারই খানিকটা ঢালিয়া দিয়া সে বিরক্ত মুখে অপর বন্দীর কাছে আগাইয়া গেল। “কি রে, টিকে আছিস তো?”—বলিয়া সে তার কম্বল ধরিয়া টান দিল। একবার ঝুঁকিয়া পরীক্ষা করিল, তার পর কহিল, “ওঃ, হয়ে গেছে। বেশ, বেশ। থাক, আর একটু শুয়ে! আজ শেষ রাত্রেই মুক্তি পাবে বাপধন! ভয় কি?” নিজের অভদ্র রসিকতায় নিজেই সে হাসিয়া উঠিল।

লোকটা তার পর দরজার কাছে গিয়া মুখ বাড়াইয়া সঙ্গীকে হাঁক দিল। ডাক শুনিয়া সেও ঘরে ঢুকিয়া মৃত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিল; তার পর কহিল, “আর দেখছ কি, চল এবার আদ্‌মিরাল্ সাহেবের কাছে। খবরটা দিয়ে দড়ি-টড়ি নিয়ে আসি গে চল। যত তাড়াতাড়ি ল্যাঠা চুকানো যায় ততই ভাল। বেশী রাত ক'রে নিজেদেরই ঘুম নষ্ট করা ছাড়া আর তো কিছু হবে না।”

ফিরিঙ্গীদ্বয় প্রস্থান করিলে ফকির বাহির হইয়া আসিল। তার দৃষ্টি এবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কি একটা পথের সন্ধান যেন পাইয়া গিয়াছে [illegible] জয়ন্তকে ঠেলিয়া স্বভাবসিদ্ধ মোটা গলায় সে কহি[illegible] “এ বেচারী তো গেলই, এই সুযোগে আমাদেরও যাওয়া[illegible] আয়োজন করতে হবে। আমি যা বলছি ক[illegible] পারবে তো? কাজটা কঠিন, এবং ঠিকমত করতে [illegible] পারলে—ধরা পড়লে মৃত্যু হয়তো অনিবার্য্য। কিন্তু [illegible] ছাড়া আর পথ দেখছি না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে[illegible] হবে। নইলে হয়তো আর কোন দিনই তা পাও[illegible] যাবে না। ভাল কথা, তুমি সাঁতার জান তো ভাই?”

তার পর ফকির ধীরে ধীরে জয়ন্তকে নিজের সংক[illegible] জানাইল।

প্রস্তুত হইতে বেশী দেরী হইল না। মৃত ব্যক্তি[illegible] ঢিলা আলখাল্লা খুলিয়া ফকির তা নিজের পরিধেয়ে[illegible] উপর পরিধান করিল। তার পর তাকে টানিয়া আনি[illegible] জয়ন্তের পরিত্যক্ত শয্যায় কম্বল দিয়া এমন ভাবে ঢাকি[illegible] দিল যে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় জয়ন্তই বুঝি আগাগো[illegible] কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। তার পর নিজে [illegible] ব্যক্তির শয্যায় ঠিক তাহারই মত করিয়া শুইয়া জয়ন্ত[illegible] বলিল, “তুমি এস, আমার আলখাল্লার ভিতরে ঢোক[illegible] তার পর আমার কোমর শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধ[illegible] খবরদার, যখন ওরা আসবে তখন যেন একটুও আল[illegible] না হয়। লোকটি মোটাসোটা ছিল, ঢোলা আলখাল্লা[illegible] তোমায় নিয়েও আমাকে তেমন বিসদৃশ দেখাবে ন[illegible] তা ছাড়া তোমার গায়ে আমার পুঁটুলির এই সব কাপ[illegible] জড়িয়ে দিচ্ছি, গায়ে হাত দিলেও টের পাবে না[illegible] খোদার ইচ্ছায় আমাদের দু' জনেরই মুখে এক র[illegible] দাড়ি। অন্ধকারে সন্দেহ করবার কারণ নেই। [illegible] ছাড়া আমার এ ঘরে আসবার সম্ভাবনাও কেউ কল্প[illegible] করতে পারবে না। যে প্রহরী দু'টোকে বন্দুকের কুঁ[illegible] দিয়ে মেরে অজ্ঞান ক'রে রেখে এসেছি তাদেরকেও [illegible] খুঁজে পাবে না। আর নিজেরাও তারা আসবে না[illegible] কারণ আজ রাতের মত জ্ঞান ফিরে আসার [illegible] সম্ভাবনাই তাদের নেই। আর একটা কথা, ওরা এ[illegible] জোরে নিঃশ্বাস নিও না। স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের [illegible] বাইরে নদীর জলের শব্দে চাপা পড়ে যাবে।”

জয়ন্ত কম্পিত দেহে ফকিরের আদেশ পালন করি[illegible] পর দু'জনে ঐ ভাবে কম্বল চাপা দিয়া অনির্দ্দিষ্ট [illegible]ষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

[illegible] ফিরিঙ্গীরা বাস্তবিকই বেশী দেরী করিল না। অল্প [illegible]য়েই আর ২।৩টি সঙ্গী ও দড়ি সহ ফিরিয়া আসিল। [illegible]একজন কহিল, “ম্যানেলিস্ আর সায়্ বুঝি এখনও [illegible]রে নি? আচ্ছা, কাল ভোরেই দেখা যাবে!”

[illegible] মৃত বন্দী মনে করিয়া তাহারা ফকিরের পা ও মাথা [illegible] দিয়া বাঁধিল। ঘাড়ে কাপড় জড়ান ছিল, তা [illegible]ত্ত্বেও বাঁধন পড়ায় ফকিরের দম বন্ধ হইয়া আসিবার [illegible]পক্রম করিতেছিল, বহু কষ্টে সে নিজেকে সংযত [illegible]রিয়া রাখিল। আর কতক্ষণই বা! বাঁধন শেষ [illegible]রিয়া একজন জয়ন্তের শয্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া [illegible]হিল, “ও ছোকরা বুঝি আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে [illegible]রামে ঘুমুচ্ছে! আচ্ছা, তোমারও বেশী দেরী নেই। তোমাকেও শীগ্‌গিরই তোমাদের মা গঙ্গার কোলে ভাসাচ্ছি।”

এইবার একজন, গিয়া দরজার পাশে খানিকক্ষণ কি নাড়াচাড়া করিল, সঙ্গে সঙ্গে মসৃণ পাথরের দেয়াল ভেদ করিয়া ভোজবাজীর মত নদীর দিকে একটি গুপ্তদ্বার বাহির হইয়া পড়িল। ফটকের প্রহরী ফকিরকে এই গুপ্তদ্বারের গল্পই করিয়াছিল। এই দরজার কয়েক হাত নীচেই খরস্রোতা গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে।

সকলে ধরাধরি করিয়া জয়ন্ত সমেত ফকিরকে সেই গুপ্তদ্বার দিয়া নদীর ভিতর ফেলিয়া দিল। ঝপাং করিয়া একটা শব্দ হইল। এক ঝলক্ জল ছিট্‌কাইয়া আসিয়া ঘরের ভিতর খানিকটা জায়গা ভিজাইয়া দিল। তার পর সব চুপ্।

(ক্রমশঃ)

একলব্য

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য

গভীর বন

(সংজ্ঞাহীন একলব্য শয়ান। অপর দিক থেকে মংরু, হিরণ্যধনু ও ব্যাধগণের প্রবেশ।)

হিরণ্যধনু। বন ত' এখানে বেশ ঘন হয়ে এল [illegible]খছি,—রাজকুমারেরা কি আরো ভেতরে গেছে?, না [illegible]আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি?

মংরু। রাজকুমারদের শিবির থেকে আমরা ত' বেশি দূর [illegible]আসি নি। আর শিবিরের প্রহরীরা ত' আমাদের দেখিয়ে [illegible]লে এই দিকেই রাজকুমারদের আর দ্রোণাচার্যকে পাওয়া [illegible]। এইটুকু আসতেই কি আমরা পথ ভুল করব? [illegible] তারা কাছাকাছি কোথাও আছে। আর এক- [illegible]কেও ঠিক দ্রোণাচার্যের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে।

হিরণ্যধনু। তুই ঠিক বলছিস, মংরু, তাকে দ্রোণা- [illegible]র্যের সঙ্গে পাওয়া যাবে? আমার কিন্তু আর আগের [illegible] তেমন আশা হচ্ছে না; কেবলই মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই [illegible] কোন বিপদ্ ঘটেছে। না হ'লে হস্তিনাপুরে তার [illegible] পাওয়া গেল না কেন? হস্তিনাপুরে সে থাকলে কারুর কি তা জানতে বাকি থাকত? রাজ্যশুদ্ধ লোক জেনে যেত—একজন বীরের মতন বীর এসেছে বটে। তাই ত' আমার মনে হয়, সে বোধ হয় হস্তিনাপুর যেতে গিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বিপদে পড়েছে।

মংরু। আপনি ও সব কথা কেন মনে স্থান দেন? একলব্য কি তেমনি বোকা ছেলে যে অন্য কোন জায়গায় গিয়ে বিপদে পড়বে? তাকে বিপদে ফেলে এমন সাধ্য কার? বোধ হয় সে হস্তিনাপুরে বেশি দিন থাকে নি, তাই সেখানকার কেউ তার কথা জানে না। সে হস্তিনাপুরে আসবার 'পরই হয়ত দ্রোণাচার্য শিকারে আসেন আর সেও সেই সঙ্গে চলে এসেছে। দ্রোণাচার্যের শিষ্য হবার তার যে রকম ঝোঁক ছিল, দ্রোণাচার্যের কাছ-ছাড়া সে কিছুতেই হবে না।

হিরণ্যধনু। তোর কথাই যেন সত্যি হয়। কিন্তু আমি যেন আর কোন ভরসা পাচ্ছি না। কোথা থেকে কোথায় এলুম—তবু তার কোন সন্ধান এখনো পাওয়া গেল না। এই বুড়ো বয়সে আর কত সহ্য হয়? এখন যদি এ বনের মধ্যে তাকে না পাওয়া যায় তা হ'লে আমি

কি নিয়ে বাঁচব বলতে পারিস? এমনিভাবে বেঁচে থেকে আমার কি লাভ?

১ম ব্যাধ। মংরু, চল্ না এদিক্ সেদিক্ ভাল ক'রে ঘুরে দেখা যাক্। দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? সর্দার এখুনি আবার বসে বসে কান্না যুড়ে দেবে, বুক চাপড়াতে আরম্ভ করবে।

২য় ব্যাধ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মংরু, চল্ সবাই এগিয়ে যাই। এত দূর যখন আসা হয়েছে, তখন চারদিক্ ভাল ক'রে না দেখে ফেরা হবে না। সর্দার, আমাদের ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। তার জন্তে যদি সারা বন তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে হয়—তাও আমরা করব।

হিরণ্যধনু। ঠিক, ঠিক বলেছিস্ তোরা। আমাদের একলব্যকে খুঁজে বের করতেই হবে। হতাশ হ'লে চলবে না। মাঝেমাঝে আমি ঝিমিয়ে পড়লে তোরাই আমায় এমনি ক'রে সাহস দিস্। তোরাই ত' আমার বল, ভরসা সব কিছু। তোরা না থাকলে আমি মনের জোর রেখে তাকে এমন ক'রে খুঁজে বেড়াতে পারতুম না। চল্ মংরু, বনের ওদিক্‌টা ভাল ক'রে দেখা যাক্। আয়, সবাই আয়।

(হিরণ্যধনু, মংরু ও ব্যাধের দল অগ্রসর হ'ল। খানিক দূর এসে—)

১ম ব্যাধ। (উত্তেজিত ভাবে)—সর্দার, সর্দার!

হিরণ্যধনু। কি, কি রে?

১ম ব্যাধ। ওই বড় গাছটার নীচে কে যেন শুয়ে রয়েছে মনে হচ্ছে! মুখটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

হিরণ্যধনু। য়্যা! কই, কই? কোন্ দিকে?

মংরু। ওই যে সর্দার, ওই দিকে (অঙ্গুলি নির্দেশ)। আমিও দেখতে পেয়েছি। এ নিশ্চয়ই একলব্য;—এ নিশ্চয়ই একলব্য। সর্দার, আমি যাই।

(একলব্যের দিকে ছুটে গেল)

হিরণ্যধনু। ওরে দাঁড়া, আমিও যাব, আমিও যাব।

(হিরণ্যধনু ও ব্যাধগণও একলব্যের কাছে উপস্থিত হ'ল।

মংরু। একলব্য, একলব্য! (তার হাত ধ'রে মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে) এ কি? এ যে রক্ত! সর্দার, একলব্য অজ্ঞান হয়ে আছে—রক্তে মাটি ভিজে গেছে। কি [illegible] এখন?

হিরণ্যধনু। দেখছিস না ওর বুড়ো আঙুলটা কা[illegible] ওইখান থেকে রক্ত ঝরে পড়েছে। উঃ, কোন্ [illegible] আমার এ সর্বনাশ করলে? এই দেখবার জন্তেই কি [illegible] দিন বেঁচে রইলুম? একলব্য, একলব্য! কথা বল্, [illegible] বল্! (তাকে কোলে তুলে নিলে) হাত দিয়ে যে এ[illegible] রক্ত পড়ছে!

১ম ব্যাধ। (চারদিকের গাছপালা দেখে নিয়ে) [illegible] ভয় নেই সর্দার, আমি এখুনি এর ওষুধ আনছি। (ছুটে গিয়ে একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এল, [illegible] পর পাতাগুলো মুখের মধ্যে চিবিয়ে নিয়ে তাই [illegible] একলব্যের কাটা আঙুলে প্রলেপ দিয়ে দিলে। হি[illegible] ধনু পরম স্নেহে একলব্যের মুখে, মাথায়, গায়ে [illegible] বুলোতে লাগল। কিছুক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল।)

হিরণ্যধনু। এইবার জ্ঞান ফিরে আসছে।

একলব্য। (আস্তে আস্তে চোখ চেয়ে, অবাক্ [illegible] সকলের মুখের দিকে চেয়ে) এ কি!—মংরু, [illegible] তোমরা সবাই এখানে রয়েছ? আমি—আমি [illegible] কোথায়?—এ যে সেই বন! তোমরা এখানে কি [illegible] এলে বাবা?

হিরণ্যধনু। সে কথা এখন থাক্। তোর এ [illegible] কে করলে, তাই আগে বল্! সে পাষণ্ডকে [illegible] টুকরো টুকরো ক'রে কেটে রেখে যাব। বল্ এ[illegible] কে তোর এ দশা করেছে?

ব্যাধগণ। হ্যাঁ সর্দার, তাকে টুকরো টুকরো কাটতে হবে।

একলব্য। আমার এই আঙুল কে কেটেছে [illegible] জানতে চাইছ ত' বাবা?

হিরণ্যধনু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কার এত বড় স্পর্ধা [illegible] যে সে আমার ছেলের আঙুল কাটতে আসে?

একলব্য। আমার আঙুল কাটবার ক্ষমতা [illegible] ছিল না। এ আমি ইচ্ছে ক'রে নিজেই কেটেছি[illegible]

হিরণ্যধনু। নিজে কেটেছিস্?

মংরু ও ব্যাধগণ। ইচ্ছে ক'রে!

একলব্য। হ্যাঁ, এ আঙুল আমি গুরুদক্ষিণা [illegible]রেছি—গুরুদক্ষিণা!

হিরণ্যধনু। গুরুদক্ষিণা! তোর গুরু কি পশু না [illegible]স? এই গুরুদক্ষিণা দেবার জন্তেই আমায় বাজ মেরে [illegible]ড়ি থেকে চলে এসেছিলি?

মংরু। ওর গুরু (ব্যঙ্গের স্বরে) ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দ্রোণা-[illegible]র্য।

হিরণ্যধনু। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ! ওরে বোকা, ওরে [illegible]াগল ছেলে,—শঠ ব্রাহ্মণের চক্রান্তে এ কি সর্বনাশ [illegible]রেছিস্ তুই! সে শয়তান যে তোর ধনুক ধরবার হাত [illegible]রদিনের মতন শেষ ক'রে দিয়েছে, তা কি বুঝতে পারিস্ [illegible]নি?

একলব্য। বুঝতে পেরেছি বাবা, সবই বুঝতে পেরেছি —কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। এখন তা আর ফেরাবার [illegible]োন উপায় নেই।

মংরু। তোকে আমি কত বার বুঝিয়েছি, কত বারণ করেছি—ও জাতের লোকদের বিশ্বাস করিস্ নি[illegible] আমার কোন কথাই তুই তখন শুনলি না!

একলব্য। তোর কথা না শোনবার ফল তাই এখ[illegible] ভোগ করছি। নিজের জাতের মানুষদের ছেড়ে উঁ[illegible] জাতের কাছে হাত পাততে গিয়েছিলুম—তারা আমা[illegible] সেই হাত কেটে নিয়ে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। আমা[illegible] যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর আমায় তিরস্কার করিস্ [illegible] ভাই!

হিরণ্যধনু। কিন্তু এর প্রতিশোধ আমরা নেব[illegible] এমনি ক'রে ওদের এক একটা আঙুল, চোখ, মুখ[illegible] কান কুচিয়ে কুচিয়ে কাটব।

একলব্য। তা আর এখন হয় না বাবা! ওদের ক[illegible] অস্ত্রশস্ত্র, কত সৈন্য সামন্ত! আমাদের লোকদের য[illegible] ওদের মতন তৈরী করতে পার, তার পর শোধ নিও[illegible] এখন নয়। এখন আমায় দেশে ফিরিয়ে নিয়ে চল,— ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে চল।

—যবনিকা—

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

বাঙ্‌লা মা

মোগল. এ. ছামাদ

[illegible]মলা বরণী বাঙ্‌লা জননী, সবুজ ধানের ক্ষেতে
[illegible]রতের ফাঁকে দেখি মা তোমাকে শ্যামল আঁচল পেতে।
[illegible]পসী, সাজাও গেঁয়ো মাঠ—তাও অমল কোমল করে,
নদী-কিনারায় রূপ ঢেলে যায় কত না সোহাগ ভরে!
পথ এঁকে বেঁকে দূর মাঠ থেকে গিয়েছে পল্লীমাঝে,
তাহারি দু'ধারে হেরি মা তোমারে সকালে, দুপুরে, সাঁঝে

ধানের গলিতে নিতুই চলিতে হেরিয়া সবুজ মায়া—
মনের গহনে রঙিন তুলিতে আঁকি মা তোমার কায়া।
শ্যাম-সোহাগিনী, শ্যামলা-রূপিণী, শ্যামলা রূপেশ্বরী,
কবরী খুলিছে, চিকুর দুলিছে—নীলিমা যোজন যুড়ি।
রঙিন আকাশে রাঙা রবি হাসে আঁকিয়া মধুর ছবি,
তারি তলে তলে আসে দলে দলে তোমার সভায় কবি।

তব সভাতলে আসিয়া সদলে দোয়েল কোয়েল বালা
নতুন ছন্দে তোমায় বন্দে গেঁথে নব গীতিমালা।
ঝুমর ঝুমুর বাজিলে নূপুর কলমী লতার বনে
কলমীর লতা বলে নাকো কথা যেন সে বিয়ের কনে।
ফুল্‌কাই ফুল কানে দোলে দুল, গহনা চেলীর সাঁথি,
শ্যামলা আননে অমল বসনে সাজায় তোমারে নিতি।

যে নহে গণ্য সেও যে ধন্য পেয়ে গোলা ভরা ধান,
পল্লীর চাষা নাই উপবাসী—তুমি যারে কর দান।
শত আশা বুকে দিন কাটে সুখে তোমার কোলেতে যার
হোক দীন চাষী, থাক উপবাসী, তুমি যে শরণ তার।
মুখে নিয়ে হাসি রহে সেই চাষী চেয়ে মা তোমার পানে
উজল নয়ানে মোহিত পরাণে কত কথা জাগে প্রাণে।

শ্যামলা সাগর রূপের আগর, রূপরঞ্জিত ভূমি,
শ্যামলা সভায় শ্যামলা আভায় নিশিদিন থাকো তুমি।
সুধা-বরষিণী, বিষাদ-নাশিনী, জননী জনমভূমি,
সুধা রস দানে নিখিল ভুবনে জুড়াও পরাণ তুমি।
সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, সোনার বাঙ্‌লা ভূমি,
জীবনে, মরণে, শয়নে, স্বপনে তোমারি চরণ চুমি।

চৌ-কৌ-টিনের গুপ্ত রহস্য

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌. এস্‌-সি

বছর দুই আগে একবার (রামধনু—বৈশাখ, ১৩৫২) তোমাদের কাছে আদিম মানুষের গল্প বলেছিলাম। সেই সূত্রে চীন দেশের পিকিং সহরের কাছে পাওয়া "পিকিং ম্যান্‌" নামে এক জাতের খুব প্রাচীন মানুষের সম্বন্ধেও অনেক কথা বলেছিলাম। কিন্তু ঐ লুপ্ত মানুষের 'রহস্য' বিজ্ঞানীরা কি ক'রে উদ্ধার করলেন সে কাহিনী ভালো ক'রে বলা হয় নি। কোন য়্যাড্‌ভেঞ্চার-উপন্যাসের চাইতে এই সত্যিকারের য়্যাড্‌ভেঞ্চার কম রোমাঞ্চকর নয়।

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। ইয়োরোপের মহাযুদ্ধের তখন সবে শেষ হয়েছে। ডাক্তার য়্যাণ্ডারসন্‌ নামে একজন বৈজ্ঞানিক চীন দেশে গিয়েছেন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য। ডাক্তার য়্যাণ্ডারসন্‌ হচ্ছেন একজন ভূ-তাত্ত্বিক পণ্ডিত, বাড়ী সুইডেনে। তাঁর চীন ভ্রমণের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—'ফসিল' অর্থাৎ লুপ্ত জীবজন্তুর দেহচিহ্ন—সাধুভাষায় যাকে বলে জীবাশ্ম—তাই সংগ্রহ করা। উত্তর চীনে ঐ ধরণের বহু লুপ্ত জীবজন্তুর চিহ্ন ছড়িয়ে আছে ব'লে তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন। ডাঃ য়্যাণ্ডারসন্‌ অবশ্যি একা ছিলেন না, তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও দু'জন বৈজ্ঞানিক—একজনের নাম ডাঃ গ্র্যাঞ্জার, আর একজনের নাম ডাঃ ৎসডান্‌স্কি। শেষে বৈজ্ঞানিকটির নাম উচ্চারণ করতে হয়তো তোমা একটু কষ্ট হবে—কিন্তু কি করা যাবে বল, সব ভাষাই আর বাংলা ভাষার মত মধুর নয়!

যাক্‌, যা বল্‌ছিলাম। বৈজ্ঞানিক তিন জন ফসি খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ একদিন এক বুড়ো চী ম্যান্‌ এসে বল্‌ল, "আপনারা বুঝি ড্রাগনের হাড় খুঁজছে আমার সঙ্গে চলুন, আমি আপনাদের এমন এক জায় নিয়ে যাব যেখানে ও-জিনিষ প্রচুর পরিমাণে পাবে ড্রাগন্‌ হচ্ছে এক কাল্পনিক জানোয়ার। যেমন বি দেখতে, তেমনি হিংস্র স্বভাব। মুখ দিয়ে তার সর্ব আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে। সেকালকার লোকদের বি ছিল এই অদ্ভুত জানোয়ার এক সময় পৃথিবীতে করত—এবং এরা নানা ভয়ঙ্কর কাণ্ড করতে পা চীনে এই ড্রাগনের গল্প খুব প্রচলিত ছিল—বিশেষ প্রাচীনেরা তা খুবই বিশ্বাস করত। তোমরা নিশ্চয়ই ঠিক ড্রাগন না হ'লেও সেকালকার পৃথিবীতে— জন্মাবারও বহু আগে (এবং প্রথম যুগের মানুষের সম নানা ধরণের অতিকায় জীব বাস করত। তারা

থেকে লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু পৃথিবীর এখানে খানে,—মাটীর তলায়, পাহাড়ের গুহায় তাদের ভাঙ্গা গোড় আজও ছড়িয়ে আছে। এই সব লুপ্ত জীবের কিমাকার হাড়ের টুক্‌রো দেখে সাধারণ অশিক্ষিত কেরা যে তাকে ড্রাগনের হাড় ব'লে মনে করবে তাতে র বিচিত্র কি! বুড়ো চীনাটীও তাই ভেবেছিল, আর ধারণা হয়েছিল এই সব সাহেবরা ঐ হাড় খুঁজছে থেকে ওষুধ বানাবার জন্য। বিলিতী ওষুধগুলো যা —ওর জন্য ড্রাগনের হাড় দরকার হবে তাতে আর শ্চর্য্য কি!

ডাঃ য়্যাণ্ডারসন্‌ কিছু দিন চীনে বাস করেছেন, দেশের হালচালও কিছু কিছু আয়ত্ত করেছেন। ড্রাগ-নর হাড় বলতে বুড়ো লোকটি কোন্‌ জিনিষের কথা ছে তা বুঝতে তাঁর কষ্ট হ'ল না। এমন একটা শুভ সংবাদে তিনি লাফিয়ে উঠলেন, এবং তখনই সঙ্গী বৈজ্ঞা-নিক দু'টিকে নিয়ে বুড়ো চীনাম্যান্‌টির সঙ্গে যাত্রার আয়োজন করলেন।

পিকিং সহর থেকে ৩৫ মাইল দূরে চূণা-পাথরের এক পাহাড়। জায়গাটার নাম চৌ-কৌ-টিন। বুড়ো তাঁদের সেইখানে নিয়ে এল। পাহাড়ের গায়ে একটা ভাঙ্গা ফাটল। পাহাড় ধ্বসে গিয়ে তার অনেকটা ভরাট করে ফেলেছে, কিন্তু ভাঙ্গা টুক্‌রোগুলি তখনও জমাট বাঁধে নি। আর—আর সেই টুক্‌রোর মধ্যে ছড়ান রয়েছে অসংখ্য রকমের জানোয়ারের প্রস্তরীভূত হাড়ের টুকরো—যাকে বলা হয় 'ফসিল্‌'। বৈজ্ঞানিকদের কাছে জায়গাটি প্রায় ছোটখাট একটি স্বর্গ ব'লেই মনে হ'ল। তাঁরা আর সময় নষ্ট করলেন না, যন্ত্রপাতি নিয়ে, তখনই কাজে লেগে গেলেন। পাথর সরিয়ে, টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙ্গে পরীক্ষা চল্‌ল—যদি তার মধ্যে 'কিছু একটা' পাওয়া যায়।

পাথর সরিয়ে একটা গুহা মতন পাওয়া গেল। গুহার ভিতর ঢুকে তাঁরা কাজ করছেন, পাশে রয়েছে একটা ছোট্ট ঝরণা—কুল্‌ কুল্‌ ক'রে বন্য স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আকাশ কালো ক'রে এল দারুণ ঝড় বৃষ্টি। বৈজ্ঞানিকেরা কোন রকমে গুহার এক কোণে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। কিন্তু দুর্য্যোগ আর থামতে চায় না। তাঁদের গুহার পাশের ছোট্ট ঝরণাটি বৃষ্টির জলে ফুলে, ফেঁপে তখন ভীষণ এক স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়েছে। ঝরণার অপর দিক্‌ থেকে গুহায় যাবার জন্য তাঁরা যে ছোট্ট সাঁকোটি তৈরী করেছিলেন তাও কোন্‌ সময়ে জলস্রোতে ভেসে গেছে।

তিনটি অসহায় বৈজ্ঞানিক, ভেবে দেখ তাঁদের কি অবস্থা! গুহার ভিতরে তাঁরা আটকা পড়ে গেছেন—বাইরের জগতের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। কি ক'রে যে উদ্ধার পাবেন,—ঝরণা (এখন হয়েছে নদী) পার হয়ে ওপারে পৌছবেন তার কোন উপায় নেই। খবর পেয়ে যে আর কেউ এসে উদ্ধার করবে সে আশাও কম। কে আর খবর পাচ্ছে তাঁদের!

তিন দিন ঐ ভাবে কেটে গেল। চতুর্থ দিনে নদীর জল একটু কমল। তাঁরা সাহস ক'রে জলে নেমে পড়-লেন। বুক জল ভেঙ্গে, তীব্র স্রোতের সঙ্গে লড়াই ক'রে পদে পদে মৃত্যুর আশঙ্কা এড়িয়ে অবশেষে তাঁরা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেন।

ডাঃ ৎস্‌ডান্‌স্কি কিন্তু গুহা ছাড়তে রাজী হলেন না। যখন এসেছেন গুহাটিকে ভালো ক'রে পরীক্ষা না ক'রে তিনি নড়বেন না। ঠিক হ'ল, তিনি আরও কিছুদিন ওই গুহাতেই থেকে যাবেন। আশ্চর্য্য বিজ্ঞানের প্রতি এঁদের টান!

আরও কয়েক সপ্তাহ ঐ গুহায় কেটে গেল। ইতি-মধ্যে ডাঃ য়্যাণ্ডারসন্‌ ও ডাঃ গ্র্যাঞ্জারও আবার ফিরে এসেছেন। তিনজনে মিলে গুহার ভিতরটা খুঁড়ে তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা করলেন। নানা জিনিষের মধ্যে পাওয়া গেল কতকগুলো কোয়ার্ট্‌জ্‌ পাথরের টুক্‌রো। টুকরোগুলোর মুখ সূচাল, আর পাশগুলোও বেশ ধারাল—যেন কেউ ইচ্ছে ক'রেই ঘষে ঘষে ঐ রকম ধার দিয়েছে।

একটা অদ্ভুত সম্ভাবনার কথা তাঁদের মনে জাগল—তবে কি এখানে প্রাচীন গুহা-মানবদের আড্ডা ছিল! এগুলো কি তবে তাদের তৈরী পাথরের অস্ত্র—যা দিয়ে তারা বন্য জন্তু শিকার করত এবং সেই সঙ্গে হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে আত্মরক্ষাও করত! প্রাচীন গুহা-মানবের ব্যবহৃত যে ধরণের অস্ত্রশস্ত্র পৃথিবীর অন্যত্র বৈজ্ঞানিকেরা

আবিষ্কার করেছেন, এই অস্ত্রগুলোর সঙ্গে তার বেশ মিল আছে। আর গুহার আশপাশে যে সব কঙ্কাল বা টুকরো হাড় পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই এ যুগের কোন জীবের নয়—ঐ সব জীব বহুদিন আগে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। সেকালকার অতিকায় গণ্ডার, খড়্গদন্তী বাঘ—এদেরই কঙ্কাল সেগুলো। তা যদি হয় তবে হয়তো একটা মস্ত আবিষ্কার এখানে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ৎস্‌ডান্‌স্কি আরও কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে দিলেন, তার পর তাঁকে অন্য কাজে ফিরে আসতে হ'ল, কিন্তু মন পড়ে রইল সেই চৌ-কৌ-টিনের গুহায়। ১৯২৩ সনে আবার তিনি সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। এবার অনুসন্ধানে আরও অনেকগুলি জানোয়ারের হাড় পাওয়া গেল যা নাকি বহুদিন হয় পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে। অতিকায় গণ্ডার বা খড়্গদন্তী বাঘের কথা তো আগেই বলেছি। সেকালকার হরিণ, হায়না, বুনো শূয়োর, এমন কি বিরাটকায় এক বিড়ালের কঙ্কালও বেরিয়ে পড়ল। এ সব জানোয়ারের কোন কোনটা অন্ততঃ ৫ লক্ষ বছর আগে পৃথিবী থেকে উধাও হয়েছে বলে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন। ৎস্‌ডান্‌স্কি ঐ সব সংগ্রহ নিয়ে সটান চলে গেলেন সুইডেনে। সেখানকার মিউজিয়ামে অন্যান্য সমসাময়িক ফসিলের সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষার সুবিধা হবে। পরীক্ষা করতে করতে দেখা গেল—ঐ সব সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে একটি ছোট্ট দাঁত—যা নাকি মানুষের ছাড়া আর কারও ব'লে মনে হয় না।

এই খবরে বৈজ্ঞানিক-মহলে বেশ একটা কৌতূহল দেখা গেল। ডাঃ বোলিন্ নামে সুইডেনের আর এক-জন বৈজ্ঞানিকের এ বিষয়ে উৎসাহ দেখা গেল সব চেয়ে বেশী। তিনি তল্পীতল্পা নিয়ে সুদূর চীনে রওনা হলেন; তার পর একদিন তাঁরই উৎসাহে চৌ-কৌ-টিনের চুণা পাহাড়ে আবার কোদাল আর গাঁইতির আক্রমণ সুরু হ'ল। আবার ঠিক ঐ রকম একটি দাঁত পাওয়া গেল। ডাঃ বোলিন তখনই সেটা নিয়ে ছুটলেন পিকিং সহরে,—সেখানকার 'এনাটমি'-বিশারদ ব্ল্যাক্ সাহেবের কাছে। সেই সময় চীনে যুদ্ধ চলছিল। বেচারা বোলিন সহরে ঢুকতে গিয়ে পড়ে গেলেন একদল সৈন্যের হাতে।

তারা তাঁকে গুপ্তচর ব'লে সন্দেহ করে তাঁর যা কিছু [illegible] কেড়েকুড়ে নিল। কিন্তু ভগবানের দয়ায় সেই দাঁতটি [illegible] তারা লক্ষ্য করল না। ব্ল্যাক্ সাহেব ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে স্থির সিদ্ধান্ত করলেন—এ রকম, দাঁত মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর হ'তে পারে না। অর্থাৎ ঐ দাঁতের মালিক হচ্ছে আদ্যিকালের এক জাতের মানুষ, অনুমান ৫ লক্ষ বছর আগে যারা পৃথিবীতে বাস করত। চীন দেশে সন্ধান পাওয়া গেল বলে তার নাম রাখা হ'ল 'সিনান্‌থ্রোপাস্'—অর্থাৎ চীনের মানুষ। আর সেই সঙ্গে ঐ জায়গাটা পিকিং সহরের কাছে ব'লে 'পিকিং-ম্যান্' নামটাও চালু হ'ল।

এত প্রাচীন যুগের মানুষের সন্ধান পাওয়া বড় একটা সহজ কথা নয়। কাজেই ব্যাপারটা নিয়ে পণ্ডিত-মহলে একটা বড় রকম হৈ-চৈ পড়ে যাবে তা স্বাভাবিক। হ'লও তাই। সুবিখ্যাত রকফেলার গবেষণা-সমিতি বললেন, "ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভাল ক'রে অনুসন্ধান করতে হবে। খরচের জন্য যত টাকাই লাগুক আমরা তা যোগাব।" চীনের ভূতত্ত্ব-সমিতি তখনই ব্যাপারটা নিয়ে উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

অনুসন্ধানে অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়ল। তা[illegible] কিছু কিছু বিবরণ তোমাদের আগের প্রবন্ধে শুনিয়েছি। ডাঃ পেই নামে দলের একজন বৈজ্ঞানিক বর্ত্তমান গুহা[illegible] মেঝে প্রায় সত্তর ফুট খুঁড়ে ফেললেন। উপরের চুণা[illegible] পাথর সরিয়ে দেখা গেল—সেখানে পাশাপাশি আর[ও] দু'টো গহ্বর রয়েছে এবং তারই একটার ভেতর রয়েছে একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ নরকঙ্কাল—বলা বাহুল্য সেই ৫ লক্ষ বছর আগেকার মানুষের কঙ্কাল।

এ রকম একটি দু'টি নয়—পর পর ২৪টি মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কার করা হ'ল।

বৈজ্ঞানিকদের কাছে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব বড় ক[ম] নয়। এ পর্য্যন্ত যে সব আদিম মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেছে [illegible] পেয়েছেন তার সবগুলিই হচ্ছে তাদের মাথার খুলি [illegible] ছোটখাট হাড়ের টুকরো। অবশ্য তাদের ব্যবহৃত অ[স্ত্র]-শস্ত্র বা অন্য জিনিষপত্র থেকেও অনেক তথ্য জানা গেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ কঙ্কাল আর কোথাও পাওয়া যায় নি। যবদ্বীপের পিথেক্যান্‌থ্রোপাস্ ইরেক্টাস্ বা খাড়া বান[র-মানুষ], ইয়োরোপের নিয়ান্‌ডার্থাল মানুষ, হিডেলবার্গ [মানু]ষ কিংবা আফ্রিকার রোডেসিয়ান্ মানুষ—সবের [বেলায়] ঐ রকম মাথার খুলি দেখেই পণ্ডিতদের তাদের [সম্বন্ধে] বিভিন্ন তথ্য বার করতে হয়েছে। কিন্তু এই [পি]কিং-ম্যানের বেলায় গোটা শরীরটা এক সাথে পাওয়ায় [তাদের সম্বন্ধে]ও অনেক নতুন নতুন খবর যোগাড় করা সম্ভব হ'ল। [illegible] পিকিং-ম্যান্‌দের পরীক্ষা ক'রে পণ্ডিতেরা যে সব [তথ্য] বার করেছেন তার কয়েকটা শুনে রাখ। পিকিং-[ম্যা]ন্‌দের মগজ ছিল খুব ছোট। এখনকার মানুষদের [চাই]তে বহু ছোট তো বটেই, পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতের প্রায় সব মানুষের চাইতেই ছোট। তাদের চোয়াল আর দাঁতের গড়নের সঙ্গে আধুনিক মানুষের চাইতে বানরের বা বনমানুষের সাদৃশ্যটাই যেন বেশী। কিন্তু আসলে সে মানুষই ছিল, বানর নয়। এই মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত, পাথর ঘষে অস্ত্রশস্ত্রও তৈরী করত। আর—আর তারা ছিল মাংসাশী। শুধু অধুনা-লুপ্ত সে যুগের নানা ছোট বড় জানোয়ারদের মেরেই তারা জলযোগ সারত না, নরমাংস খেতেও তারা ভাল বাসত। আগুনে ঝলসানো আধপোড়া মানুষের হাড় থেকে সেই অপ্রিয় সত্যের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বড়দের জীবনের ছোটখাট ঘটনা

শ্রীকৌটিল্য

[illegible] পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে নানা রকম গল্প তোমরা [শুনে]ছ। তাঁর জীবনের আরও ২।১টি মজার কাহিনী [তো]মাদের শোনাব।

ইংরেজী ১৮৫১ সন। বিদ্যাসাগর মশাই তখন সংস্কৃত [ক]লেজের অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল্। কিন্তু বয়স তাঁর মাত্র ত্রিশ বছর। কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকেরা সকলেই [illegible] তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ, এবং, শুধু তাই নয়, তাঁদের [অধি]কাংশই বিদ্যাসাগর মশায়ের শিক্ষক।

[অ]ধ্যক্ষ হয়ে বিদ্যাসাগর লক্ষ্য করলেন অধ্যাপক[ে]রা কাজে বড়ই গাফিলতি করছেন। সাড়ে দশটায় [illegible] বস্‌বার কথা, কিন্তু কেউই সময় মত আসেন না, [কে]উ কেউ এত দেরী করেন যে ছাত্রদের দস্তুর মত ক্ষতি [হয়]। উপরওয়ালা হ'লে কি হবে, বিদ্যাসাগরও তাঁদেরই [ছাত্র], তাই পুরোনো শিক্ষকদের মুখ ফুটে কিছু বলতে [পার]তেন না।

অবশেষে বিদ্যাসাগর মশাই এক মতলব ঠাওরালেন। [তিনি] তখন সংস্কৃত কলেজেরই উপর তলায় থাকতেন, [সা]ড়ে দশটা বাজতেই তিনি নেমে এসে দরজার কাছে [দাঁড়া]তেন। তার পর যতক্ষণ না সমস্ত অধ্যাপক আসেন [ঠি]ক সেখানেই তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতেন। কেউ একটু দেরী করে ঢুকলেই মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করতেন, "এই এলেন বুঝি?"

বার বার এ রকম অপ্রতিভ হয়ে অধ্যাপকরা শেষে বাধ্য হয়েই যথা সময়ে আসতে সুরু করলেন, শুধু এক-জন বৃদ্ধ অধ্যাপক,—পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন আর কিছুতেই সময় মত আসেন না। তিনি আবার আসেন সকলের চাইতে পরে।

বিদ্যাসাগর কিন্তু এই অধ্যাপকটিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতেন না, শুধু দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন, এবং তিনি এলে মৃদু হেসে তাঁর দিকে তাকাতেন। প্রত্যহ এই রকম ব্যাপার হ'তে লাগল। অবশেষে বৃদ্ধ তর্কপঞ্চা-নন মশাই একদিন আর ধৈর্য্য রাখতে পারলেন না, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "তুমি যে রোজ মিটি মিটি হাস, কথা বল না, এতেই যে আমার সর্ব্বনাশ করলে! কথা বললে জবাব দিতে পারতাম, কেন দেরী হয় তাও বলতে পার-তাম; কিন্তু এমন ক'রে জব্দ করলে উপায় কি! আচ্ছা বেশ, মরি আর বাঁচি, কাল থেকে ঠিক সময় মতই আসব।"

বিদ্যাসাগর মশায়ের দানশালতার [illegible] সকলেই শুনেছ। তিনি কলকাতায় থাকতেন কিন্তু যখন বাড়ী অর্থাৎ বীরসিংহ গ্রামে যেতেন তাঁর সঙ্গে যেত বস্তা বস্তা

কাপড়, চকচকে টাকা-আধুলি-সিকির তোড়া আর ওষুধ। বিদ্যাসাগর গেলেই আশপাশের গ্রামে সাড়া পড়ে যেত এবং যত দীন-দুঃখী এসে তাঁদের গ্রামে হাজির হ'ত। ওষুধ, কাপড় আর অর্থ বিতরণ ক'রে বিদ্যাসাগর তাঁর দয়ার সাগর নাম মর্য্যাদা রক্ষা করতেন। এর ফলে অনেকেরই ধারণা ছিল যে বিদ্যাসাগর বুঝি মস্ত বড় লোক এবং তাঁর বাড়ীতে দেদার ধনরত্ন লুকানো আছে।

একদল ডাকাতেরও এই ধারণা হ'ল, সুযোগ বুঝে তারা একদিন দুপুর রাত্রে ৪০।৫০ জন একত্র হয়ে তাঁদের বাড়ী আক্রমণ করল। ডাকাতরা অবশ্য ট কাকড়ি বিশেষ কিছুই পেল না—কিন্তু বাড়ীর থালা-বাটী ও অন্যান্য আসবাবপত্র সমস্তই নিয়ে পালাল। অবশ্য সুখের বিষয় বাড়ীর কারও প্রাণহানি হ'ল না।

বিদ্যাসাগর মশাই সেই রাত্রেই কাছাকাছি থানায় খবর পাঠালেন, এবং পর দিন সকালে থানার দারোগা বাবু ধড়াচূড়া পরে কয়েক জন পুলিশ নিয়ে ঘটনার তদন্ত করতে এলেন।

দারোগা এসে প্রথমেই খোঁজ নিলেন দক্ষিণার কি ব্যবস্থা হয়েছে। বিদ্যাসাগর মশায়ের বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছেলের মতই তেজস্বী ছিলেন, তিনি বল্লেন, "আপনারা সরকারী কাজে—আপনাদেরই কর্ত্তব্য কাজে এসেছেন, দক্ষিণা (অর্থাৎ ঘুষ) দেব কেন? তবে হ্যাঁ, আপনি কুলীন বামুন, কুলীন বিদায় হিসাবে কিছু চাইলে ভেবে দেখতে পারি।" জবাব শুনে দারোগা বাবু তো রেগে টং। ঠাকুরদাস আর বাক্‌বিতণ্ডা না ক'রে তখনই পাশের গ্রামের উদ্দেশে রওনা হলেন। হাটে থালা-বাসন না কিনলে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে।

এদিকে বিদ্যাসাগর মশায়ও ব্যাপার দেখে দারোগাকে আর আমল না দিয়ে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে বাড়ীর সামনের মাঠে হাডু-ডু খেলতে সুরু করে দিলেন।

দারোগার মুখের অবস্থা তো বুঝতেই পার। একজন সামান্য যুবকের এত বড় স্পর্দ্ধা—মহামান্য দারোগা সাহেবের উপস্থিতি উপেক্ষা ক'রে কিনা তাঁরই সামনে হাডু-ডু খেলা! তিনি এর উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গের একজন কর্ম্মচারী তাঁকে চুপি চুপি জানাল, "হুজুর, উনি কিন্তু সা লোক ন'ন। অনেক বড় বড় নামজাদা লোক ওঁর স দেখা করতে এখানে আসেন। শুনেছি বড়লাট, ছো লাট বাহাদুরদের সঙ্গেও ওঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। ও ঘাঁটানো ঠিক হবে না বোধ হয়!"

খবর শুনে দারোগা বাবু মানে মানে বিদায় নিলেন।

* * * *

উনবিংশ শতাব্দীর আর একজন নাম-করা পণ্ডিত দেশহিতৈষী রাজনারায়ণ বসুর নাম তোমরা নিশ্চয়ই জা রাজনারায়ণ ছিলেন শিক্ষাব্রতী, কিন্তু শুধু শিক্ষা ব্যাপা নয়—সমাজ-সেবায়, দেশের সেবায় এবং সাহিত্য-সেবায় সব দিক্ দিয়েই তিনি তাঁর সময়ে দেশের একজন গণ মান্য লোক ছিলেন।

ইংরেজি ১৮৫১ সন থেকে ১৮৬৬ সন পর্য্যন্ত তি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পনেরো বছর তিনি সেখানে যে কত রকম জনহিত কাজের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তার তালি দেওয়া সহজ নয়। 'সভার পর সভা, সমিতি ক'রে দেশের লোককে কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়ে দিলেন। ব্যাপা দেখে স্থানীয় এক ভদ্রলোক একদিন হাসতে হা বল্লেন, "আপনি আমাদের জ্বালিয়ে খেলেন। হোক্, আপনার দেখাদেখি আমরাও এবার একটা স্থাপন করব ঠিক করেছি—তার নাম হবে 'সভা নিবা সভা'। এই সভার সভ্যদের কাজ হবে আপনাদের সভায় খবর পেলেই লাঠিসোটা নিয়ে সেখানে হা হওয়া।"

সুপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় রাজনারায়ণ সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। ভূদেব বাবু গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলে রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু আছে, একদিন ভূদেব বাবু নিজের গলা থেকে পৈ খুলে রাজনারায়ণের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন "রাজনারায়ণ, তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তোমার তুল আমরা কিছুই নই।" বাস্তবিক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম সে ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণ হ'তে হ'লে যে সব সদ্‌গুণ উচিত রাজনারায়ণের মধ্যে তা প্রচুর মাত্রায়ই ছিল।

এবারের একটি উল্লেখযোগ্য খবর—দিল্লীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন—যা সম্প্রতি সমারোহের সঙ্গে শেষ হয়েছে। এবারে সভাপতি হয়েছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। পণ্ডিত নেহেরু যে শুধু রাজনীতিক ক্ষেত্র—বিজ্ঞান-জগতেও যে তাঁর যথেষ্ট মর্য্যাদা আছে তা ইতিপূর্ব্বে তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেছেন; এবারেও তাঁর সুচিন্তিত সভাপতির অভিভাষণে তিনি তা আবার প্রমাণিত করলেন। তোমাদের হয়তো মনে আছে, এর আগে আর একবার তাঁকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করা হয়েছিল কিন্তু তিনি তখন কারারুদ্ধ থাকায় সভায় যোগ দিতে পারেন নি।

এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসের আর একটি বিশেষত্ব যার জন্য এবারকার অধিবেশন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে ত্রিশ জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবারকার অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন সম্বন্ধে তোমাদের আগামী বারে ভাল ক'রে শোনাবার ইচ্ছা রইল।

* * * *

সম্প্রতি গোরক্ষপুরে হিন্দু মহাসভার সাধারণ অধিবেশন সারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এবারে সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত ভোপৎকার। সভায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

* * * *

নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধীর নূতন কর্ম্মপ্রণালীর কথা আমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। পাদুকাহীন খালি পায়ে অতি অল্প সংখ্যক কয়েকটি অনুচর নিয়ে পদব্রজে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যে অভিযান সুরু করেছেন বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসে বোধ হয় তা একেবারে নূতন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হারানো সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনবার জন্য মহামানবের এই অভাবনীয় প্রচেষ্টা—এর কি কোন ফল হবে না? কাগজে দেখলাম, বহু গ্রামের বিশিষ্ট মুসলমান অধিবাসীরা তাঁকে নিজের নিজের বাড়ী আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেছেন—এমন কি তাঁদের অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত সেখানে মুসলিম্ মেয়েরা মহাত্মাজিকে মাল্যভূষিত ক'রে আপনাদের শ্রদ্ধা জানাতে দ্বিধা করেন নি। এই প্রসঙ্গে হিন্দু মুসলিম্ মিলন প্রচেষ্টায় গান্ধীজির আশ্রমের মুসলিম্ মহিলা মিস্ আমতুস্ সালামের দীর্ঘ দিন অনশনের কথাও ভুলবার নয়। ভগবান্ তাঁকে সুস্থ রাখুন।

* * * *

এবারের রামধনুতে ইংল্যাণ্ড: অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ক্রিকেট টেষ্ট্ ম্যাচের বিবরণ আগেই পেয়েছ। তার পর সম্প্রতি তৃতীয় টেষ্ট্ ম্যাচও শেষ হয়েছে। এবারকার খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে—যদিও অষ্ট্রেলিয়া দলের এবারেও জিতবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। এর ফলে বিজয়ীর সম্মান 'ভস্ম' বা 'য়্যাশেস্' অষ্ট্রেলিয়ার কাছেই থাকবে। খেলার বিবরণ তোমাদের পরে শোনাব।

* * * *

ইতিমধ্যে আমাদের দেশেও আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট টুর্ণামেণ্ট—বিখ্যাত 'রণজী' ট্রফীর প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। পূর্ব্বাঞ্চলের খেলায় হোলকার দল বিহার দলকে এক ইনিংস্ ও ৬ রানে হারিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলে বোম্বাই দল নবনগর দলকে এক ইনিংস্ ও ২৭ রানে হারিয়েছে, তার পর সিন্ধু দলকে হারিয়েছে ৫ উইকেটে। বরোদা দল মহারাষ্ট্র দলকে হারিয়েছে ৪ উইকেটে। গুজরাট দল পশ্চিম ভারত দলের কাছে মাত্র ৬ রানের জন্য হেরে গেছে। দক্ষিণাঞ্চলে হায়দ্রাবাদ দল সম্মিলিত বেরার ও মধ্য প্রদেশ দলকে ৮ উইকেটে পরাজিত করেছে। বাংলা দলকে খেলতে হবে যুক্ত-প্রদেশ দলের সঙ্গে। এবারে বাংলা দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হয়েছেন শ্রীযুক্ত কমল ভট্টাচার্য্য।

টেনিসে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ্ প্রতিযোগিতায় দিলীপ বসু এবারে চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছেন। ফাইনালে তিনি ভারতের ২নং খেলোয়াড় মনমোহনকে পরাজিত করেন। ন্যাশনাল টেনিস্ চ্যাম্পিয়নশিপ্ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছেন সুমন্ত মিশ্র। ইনি পর পর ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় ঘাউস্ মহম্মদ, দিলীপ বসু (৪নং) ও ফাইনালে মনমোহনকে পরাজিত করেন। চেকোশ্লো কিয়া থেকে কয়েক জন নামকরা খেলোয়াড় এই প্র যোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন (তাঁদের মধ্যে সেখান পয়লা নম্বর খেলোয়াড় ড্রাব্‌নিও ছিলেন)। কি ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁরা এঁটে উঠতে পা নি।

রামধনুর প্রিয় বন্ধুগণ,

ইতিমধ্যে তোমাদের কাছ থেকে অনেক চিঠি পেয়েছি। রামধনুর কাগজ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য তোমরা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম ক'রেছ এবং এই ব্যবস্থাই ভালো হয়েছে ব'লে মেনে নিয়েছ দেখে আনন্দিত হলাম। সরকারী নিয়ন্ত্রণ আদেশ রহিত হ'লেই রামধনুর অঙ্গ-সৌষ্ঠবেও পরিবর্ত্তন আসবে এ ভরসা তোমাদের দিচ্ছি।

এবারকার বাৎসরিক পরীক্ষায় তোমাদের মধ্যে অনেকে ভাল ফল করেছ জেনে ভারী খুসী হয়েছি। যারা খবর দিয়েছ তাদের নাম এখানে দিচ্ছি: প্রতাপচন্দ্র রায়, মলিনা মুখোপাধ্যায়, শিশির সেনগুপ্ত, কল্যাণী দাশগুপ্ত, অলক ভট্টাচার্য্য, মন্দিরা ঘোষ, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, সুহাস বসু, গীতা দেবী। রামধনুর আর একজন গ্রাহক শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায় এবার পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ পরীক্ষায় ৫ম স্থান অধিকার করেছেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন বি. এ ক্লাসের ছাত্র হয়েও 'রামধনু' এখনও তাঁর কাছে তেমনি ভাল লাগে।

কিন্তু শুধু পরীক্ষায় ভাল ফল করলেই তো হবে না তোমাদের—দেশের কিশোরদের আজ অনেক কিছু করবার আছে। ভাবী বাংলা দেশ তো তোমরাই গ তুলবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। জাতিভেদ প্রথা বিশেষ ক'রে অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের একটা বড় কল —এর বিষময় ফল আজ আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি প্রাচীন আমল থেকেই এই কুপ্রথা চলে আসছে। অস্প একলব্যকে দাবিয়ে রাখবার জন্য অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যে অদ্ভুত ব্যবহার তোমরা এ মাসের রামধনুতেই পড়েছ এই অস্পৃশ্যতা-অভিশাপ দূর করার জন্য তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে। মহামানব গান্ধীজিও এই দুঃ ব্রতে অগ্রসর হয়েছেন। শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও একদি তাঁর সে ব্রত উদ্‌যাপন হবেই।

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা আর একটি মস্ত কাজ সরকারের সাহায্য ব্যতীত এ সম্পূর্ণ সম্ভব নয় তা স্বীকা করি। তবুও আমরা প্রত্যেকে যদি দু'টি-একটি লোককে (নিজের নিজের বাড়ীর চাকর-ঠাকুর বা ঐ রকম কোন গরীব লোক হ'লেও ক্ষতি নেই) অক্ষর পরিচ করিয়ে কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়ে দিতে পারি—

লও তো কম কাজ হবে না! কিশোরদের পক্ষেও কাজ করা বেশী কঠিন নয়। কথাটা ভেবে দেখো।

শ্রীলতিকা ঘোষ লিখেছেন—"ছেলেদের জন্য যেমন অনেক কাগজে 'খেলাধূলা'র খবর বেরোয় তেমনি মেয়েদের জন্য কিছু একটা বার করুন না।" খুবই ভাল প্রস্তাব। আমরা গ্রাহিকাদের কাছ থেকেই এই রকম একটা কিছু পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। শ্রীনবেন্দু সেনও একটি 'খেয়াল সংগ্রহ' বা 'হবি' বিভাগ খুলবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন।—ইতি রাঃ সঃ

সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা

নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর তোমাদের জানা ত। আগে সবগুলি প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা , তার পর শেষ পৃষ্ঠার উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। তঃ ৫টি উত্তর ঠিক না হ'লে বুঝতে হবে উত্তরদাতার ারণ জ্ঞান ভাল নয়।

(১) অরোরা বোরিয়ালিস্ হচ্ছে একটি আগ্নেয় গিরি,

ানিক পদার্থ, মেরুর দেশের অদ্ভুত আলো, আফ্রি- একটি সহর। কোন্‌টি ঠিক?

(২) থার্ম্মপলির যুদ্ধ হয়েছিল ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে, ফরাসী ও প্রাশিয়ানদের মধ্যে, রোমান্ ও কার্থে-জিয়ানদের মধ্যে, গ্রীক্ ও পারসিকদের মধ্যে, মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের মধ্যে। কোন্‌টা ঠিক?

(৩) কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র কে?

(৪) কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রথম সভাপতি কে?

(৫) এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গের অস্তিত্ব প্রথম কে আবিষ্কার করেন?

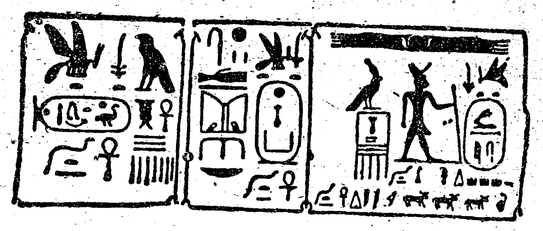

(৬) এক্স-রে'র আবিষ্কারক কে?

(৭) নিম্নলিখিত সনগুলি কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক কারণে বিখ্যাত?—

১৭৫৭, ১৮৫৭, ১৮৮৫, ১৯১৪।

(৮) সাবান তৈরী করতে লাগে তেল, বালি, কষ্টিক সোডা, চর্ব্বি, চিনি, ব্লিচিং-পাউডার, শ্বেতসার। আসলে কোন্ কোন্‌টা?

(৯) নিম্নলিখিতগুলি কোন্‌টা কি?—পেনিসিলিন, বেস্ বল্, ডলার, পার্ল্ বাক্, পয়ার।

(১০) সঙ্গের ছবি দু'টির ১মটি কার চেহারা, এবং ২য়টি কোন্ ভাষার অক্ষরে লেখা?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল পাঁচ জন।

উত্তরদাতাদের নাম ঃ—প্রতিভাকুমার কুণ্ডু (চুঁচুড়া) ; অমলকুমার মিত্র, অগ্নিশিখা মণিমেলার মণি ভাইবোনেরা (গৌহাটী) ; গৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা) ; নবেন্দু সেন(কলিকাতা) ; শেষপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী, কল্পনা, মানা, শ্যামল (জলপাইগুড়ি) ; বাবলু পাইন (ঘাটশীলা) ; কেশবদাস, প্রতিমা ও কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায় (কালীঘাট) ; রামানুজ সেন (লক্ষ্ণৌ) ; অপূর্ব্ব রঞ্জন পাল, সেবাদি, ছবিদি, সীমা, দীনেশ, কাশীনাথ (করিমগঞ্জ) ; জয়ন্ত, ঝর্ণা, বুবু, মুন্না (গোবরডাঙ্গা) ; মুকুল ও বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য (মালসিরা) ; পাইলট, দাদা, বিলু, মারা, মণ্টু, ঝণ্টু, অঞ্জু পুকিটুলি, মিনু, শান্তি চট্টোপাধ্যা (মহেশতলা) ; শান্তিরঞ্জন সেন, রবীনদা', শোভাদি শ্যামলেন্দু, দীপু, খোকন, রুবি, কালী, ক্ষিতীন দা' (খুলনা) নূরজাহান বেগম (কলিকাতা) ; মনোজিৎ রায় (এলাহ বাদ) ; সীমা বসু (লক্ষ্ণৌ) ; রাবেয়া খাতুন (ঢাকা) ; ন ও নন্তু (পাটনা) ; আবদুল আজিজ (বরিশাল) ; যোগমা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) ; সন্তোষ মিত্র (কলিকাতা) লক্ষ্মী দাশগুপ্ত (জামসেদপুর) ; সুনীল, ছবি, শম্ভু, গী চিত্তেন্দ্র, কমল (খালিয়া) ; ননীপ্রভা ও রেণুপ্রভা দে (দুয়া বাজার) ; ছবি, ছায়া, মায়া, সুশীল রায় নিউদিল্লী)।

নূতন ধাঁধা

গোবিন্দ বাবু টেবিলে একখানা জরুরী চিঠি রেখে না পড়েই হাত ধুতে গিয়েছিলেন, এসে দেখেন তাঁর ছে নাতি চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে রেখেছে। কি মুশ্‌কিল বল তো ? আমরা চিঠির টুকরোগুলি (চ এখানে তুলে দিচ্ছি। তোমরা ঠিক মত যুড়ে নিয়ে পড়ে দিতে পার ?

চিঠিখানি	গোবিন্দ,	তোমাকে	ভাই	অবস্থা যে তে	পড়িয়া এই	লিখিতেছি।
ডাকাতি	বিপদে	হইয়া	বড়	বসিতে হইবে।	বাড়ীতে	গিয়াছে।
ও মদন	আমাদের	বাধা দিতে	গত রাত্রে	তোমার নিকট	গিয়াছে। মধু	গিয়া
ম হইয়াছে	লইয়া	। এখন	যথা সর্ব্বস্ব	৫	গুরুতর জখ	এমন
য্য না পাইবে	হাতে	ল বোধ হয়	ডাকাতের		মাদের সাহা	পথে
অধিক কি	২	৩	৪	লিখিব ? খোকাকে	তোমাকে আর	৮
যাহা				করিবার করিও।	পাঠাইলাম।	
ইতি তোমার ব				ন্ধু শিবদাস।	৭	
১				৬		

শোক-সংবাদ

সম্প্রতি কালীঘাট ডাকঘরের ভূতপূর্ব্ব পোষ্ট মাষ্টার র মরঞ্জন রায় মহাশয় পরলোক গমন করেছেন। তিনি পুত্র। বিনয়, সদাচার, শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি নানা সদ্‌গু জন্য তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। কলকাতার পোষ্ট ছিলেন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ অধ্যাপক রামকমল রায়ের ক্লাবেরও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

৩০৭ পৃষ্ঠার প্রশ্নের উত্তর

১। মেরুর দেশের অদ্ভুত আলো ২। গ্রীক্ ও কষ্টিক্ সোডা ৯। সুবিখ্যাত ওষুধ, আমেরিকার জা পারসিকদের মধ্যে ৩। চিত্তরঞ্জন দাশ ৪। উমেশ- খেলা, আমেরিকায় (ও আরও কয়েকটি দেশে) প্রচ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫। রাধানাথ শিকদার মুদ্রা, আমেরিকান্ লেখিকা, বাংলা কবিতার ৬। উইল্‌হেল্‌ম্ রণ্ট্‌জেন্ ৭। পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী- ১০। ১ম—বৈজ্ঞানিক মার্কনি, ২য়—প্রাচীন যুদ্ধ, কংগ্রেসের জন্ম, প্রথম মহাযুদ্ধ ৮। তেল, চর্ব্বি ও হায়রো-গ্লীফ্ (ছবির ভাষা)।

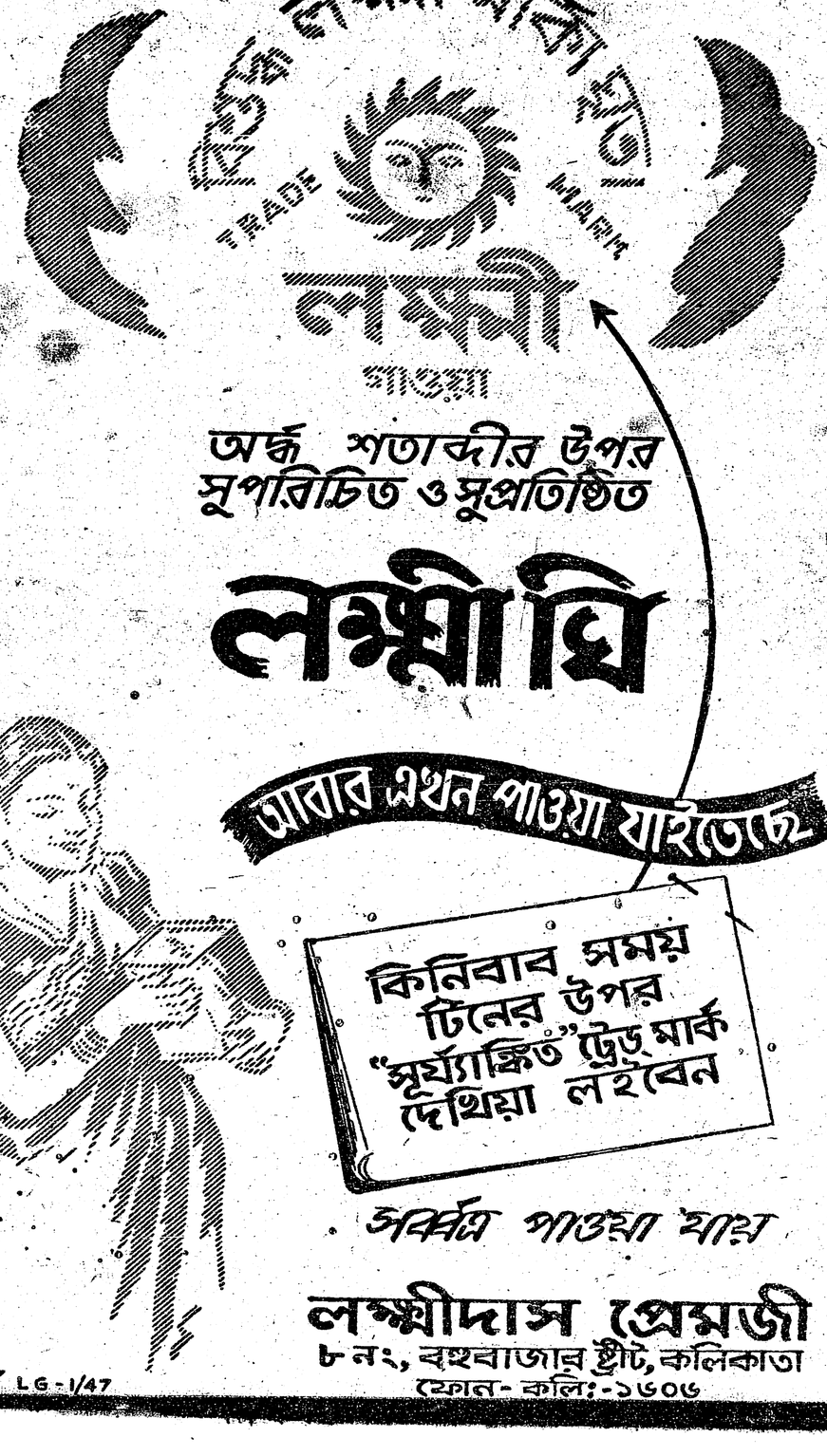

Regd, No C—1641

রূপসজ্জায় শিল্পপ্রতিভা যে কী অপরূপ রূপচ্ছটা সৃজন করতে পারে তা দেখতে পাবেন রৌপ্য-শিল্প-চাতুর্য্যের পরম উৎকর্ষ আমাদের এই নব অবদানে

—"গৃহলক্ষ্মী" রূপার কৌটায়।

বঙ্গললনাদের অতিপ্রিয় ও অপরিহার্য্য। এটী লক্ষ্মীর কৌটা, সিন্দুর কৌটা বা বরণ-কোটা যে রকম ভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করা চলে। আমাদের অসংখ্য পৃষ্ঠপোষকগণের বিশেষ অনুরোধে আমরা এইটী প্রস্তুত করিয়াছি। দেখিতে মনোহর, উজ্জ্বল, আকারেও বড় অথচ দামও কম।

"গৃহলক্ষ্মী"

হিন্দু ললনার অতি আদরের সামগ্রী, নিত্য প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য। "গৃহলক্ষ্মী" গৃহের লক্ষ্মীশ্রী অটুট রাখিবে।

SYMBOL OF PERFECTION KJW

কুণ্ড জুয়েলারী ওয়ার্কস

২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা • ফোন: বি, বি, ৩৯৫৫ • GRAMS: KUNDJUEL

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

Regd, No C—1641

রূপসজ্জায় শিল্পপ্রতিভা যে কী অপরূপ রূপচ্ছটা সৃজন করতে পারে তা দেখতে পাবেন রৌপ্য-শিল্প-চাতুর্য্যের পরম উৎকর্ষ আমাদের এই নব অবদানে —**"গৃহলক্ষ্মী" রূপার কৌটায়।** বঙ্গললনাদের অতিপ্রিয় ও অপরিহার্য্য। এটী লক্ষ্মীর কৌটা, সিন্দুর কৌটা বা বরণ-কৌটা যে রকম ভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করা চলে। আমাদের অসংখ্য পৃষ্ঠপোষকগণের বিশেষ অনুরোধে আমরা এইটী প্রস্তুত করিয়াছি। দেখিতে মনোহর, উজ্জ্বল, আকারেও বড় অথচ দামও কম।

"গৃহলক্ষ্মী"

হিন্দু ললনার অতি আদরের সামগ্রী, নিত্য প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য। "গৃহলক্ষ্মী" গৃহের লক্ষ্মীশ্রী অটুট রাখিবে।

SYMBOL OF PERFECTION KJW

কুণ্ড জুয়েলারী ওয়ার্কস

২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা • ফোন: বি, বি, ৩৯৩৩ • GRAMS: KUNDJUEL

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

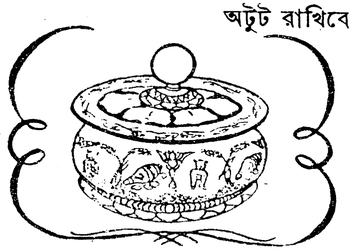

১৯শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা
ফাল্গুন,
১৩৫৩

বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ১॥৵
প্রতি সংখ্যা
।৵

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

কার্য্যালয় : ...

COLOUR PAPE

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

—ছোটদের কয়েকটি নতুন বই—

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি

নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

অলিভার টুইষ্ট

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—॥৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

দমাদম্ দামোদর

দাম ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

অয়েল পেণ্টিং

দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

কল্‌কাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ঃঃ ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা ২৫।

"কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ"

(গোয়েন্দা-কাহিনী ও দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

আট রকম বইএর নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, বাকি বইগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

১। হারান বই—(নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত)
২। নিঝুম রাতের কান্না—(বিমল দত্ত)
৩। রাতের আতঙ্ক—(নীহাররঞ্জন গুপ্ত)
৪। স্বর্গের সিঁড়ি—(সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)
৫। কেউটের ছোবল—সুনির্ম্মল বসু
৬। অভিশপ্ত ম্যামী—(নীরদচন্দ্র মজুমদার)
৭। বিভীষণের জাগরণ—(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

প্রত্যেকখানি বারো আনা

"প্রহেলিকা সিরিজ"

(ডিটেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চার)

ফাল্গুন মাস—রত্নতৃষা—অনলকুমার চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র—নকলের হিমালয়—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বৈশাখ—বি, এল, এ-২০৫—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো
জ্যৈষ্ঠ—জয় পরাজয়—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
আষাঢ়—পূজনীয় দস্যু—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রাবণ—দুর্যোগের রাতে—শ্রীসব্যসাচি

প্রত্যেকখানি দাম এক টাকা

বিরাট সচিত্র গ্রন্থ—১৫৪ পৃষ্ঠা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—(আট খানা হাফটোন ছবি

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

এক মাসের মধ্যে বই নিঃশেষ হওয়ায়

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

চমকপ্রদ অন্তর্দ্ধান কাহিনী পরিপূর্ণ মূল্য ১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর ✱ ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

এবার পূজায় ছেলেমেয়েদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার

ঝঞ্ঝাল

- কবিতা
- গল্প
- উপন্যাস
- আমোদ প্রমোদ
- খেলাধূলা
- রঙবেরঙের ছবি

বিরাট ঝকঝকে বই!
ছোটদের আনন্দের খনি!

পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

দেব সাহিত্য কুটীর ✱ ২২/৫ বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি। দাম এক টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিম চাটার্জ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

— কয়েকখানি বাছা বাছা বই —

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা

১নং দি লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্‌স্ ॥৵০

(শ্রীঅমলেন্দু সেন অনূদিত)

২নং অলিভার টুইষ্ট্ ... ॥৵০

(শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ... ৸৵০

শ্রীসুবোধ বসুর শিশু-নাটিকা

বুদ্ধির্যস্য ... ।৵০

শ্রীরঞ্জিৎ সিংহের রূপকথা

ময়নামতীর দেশ ... ১৲

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

পদ্মরাগ ... ১॥০

সোনার হরিণ ... ১॥০

চায়ের ধোঁয়া ... ৸০

নূতন পুরাণ ... ৸৵০

হাস্য ও রহস্য ... ৸৵০

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি

(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং ... ৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ১৸০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞান-বুড়ো ... ১৲

আকাশের গল্প ... ১।০

জন্মদিনের উপহার ... ৸৵০

ধূমকেতু ... ৸০

আবিষ্কারের গল্প ... ৸০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্রের

গল্প-সল্প ।০ ছুটীর গল্প ।০

মাধব্য ও রসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প ।৵০ অনেক গল্প ।৵০

পুরাতন বাঁধান রামধনু ... প্রতি খণ্ড ৩৲

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৸০

মনোরঞ্জন ও শিবরামের

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ... ৸৵০

শ্রীলীলা মজুমদারের

বঙ্গিনাথের ঘড়ি ... ৸০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু ... ৸৵০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা ... ১॥০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা

"আমরা চাষ করি আনন্দে।"

রামধনু

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৯শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৫৩ | ১১শ সংখ্যা

চিল্কা-ভ্রমণ

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কল্‌কাতা শহরের গলি-ঘরে ব'সে
চিল্কার কথা আজ খালি মনে পড়ে ;
যেন দূর স্বপ্নের কত ছবি এসে
স্মৃতির দরজা দিয়ে মনে ভিড় করে।

মাদ্রাজ মেল্ থেকে সেই ভোরে বালুগাঁয়ে নেমে,
ষ্টেশনের কাছে ডাকবাংলোয় কিছু'খন থেমে,
সকালের কাঁচা রোদে গাছে-ঘেরা সোজা পথ দিয়ে
চলে মাঝিদের পাড়া, কুঁড়ে ঘর, বস্‌তি পেরিয়ে,
আটটা নাগাদ প্রায় আসা গেল শেষে চিল্কায় ;
(ভুবনেশ্বরে সেই শুরু ক'রে রাত সাতটায়।)

চিল্কা! চিল্কা! এই কি সে হ্রদ ?
ওপারেতে সীমাহীন এ যে এক নদ !
পার নেই, তীর নেই, কি বিশাল জল,
অসীম আকাশে মেশা, আলো ঝল্‌মল্ !
ওদিকে কি যোগ আছে নীল সাগরের—
তাই বুঝি মনে হয় এত সুদূরের ?

এদিকের তীরে তীরে পাহাড়ের সারি—
সবুজের ছোপ্ দেয়া—কত রকমারি!
তারি কোলে চিল্কার জল বয়ে যায়,
পঞ্চাশ মাইল সে নাকি লম্বায়।
ওই দূরে ফুটে আছে কালো কালো টিপ,
ওরা আর কিছু নয়—ছোট বড় দ্বীপ!
রীতিমত রাজ্যই আছে একটাতে,
তীর থেকে গোটা কুড়ি মাইল তফাতে!...
মাছের গন্ধে আর পাড়ে না দাঁড়িয়ে,
একখানা নৌকোকে ভাড়া করি গিয়ে।

চিল্কার শাদা জল রোদে চিক্ চিক্,
নৌকোটা তালে তালে চলে ঠিক্ ঠিক্।
লগি ঠেলে ঠেলে চলা দেখি চুপ্ চাপ্—
শুশুকেরা মাথা তুলে ডোবে ঝুপ্ ঝাপ্।
রূপো-ঝক্‌ঝকে মাছ করে ছুপ্ ছাপ্,..
এক-গলা জলে জেলে ধরে টুপ্ টাপ্।
বক পাখী দলে দলে ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁক:
একখানি পূরো ছবি— নেই কোন ফাঁক!

একটা অজানা দ্বীপ—দূর তিন ক্রোশ,—
মনে হয় ঠিক যেন জলে-ভাসা মোষ।
ওইখানে চলে নিয়ে নৌকো বেয়ে,
উৎকলী কথা কয়ে' তিনটি নেয়ে।
অগভীর থির্ জলে নৌকো চলে,
সারাটা সকাল ধরে নৌকো চলে।
ডাঙ্গাটা আকাশ-কোলে মিলিয়ে গেল,
দ্বীপটা ক্রমেই কাছে এগিয়ে এল।

ঝিকিমিকি রোদ্দুরে দুপুরে এসে,
ঠেক্‌লো নৌকোখানা দ্বীপেতে শেষে।
সবটা জায়গা যুড়ে পাহাড় শুধু—
চিল্কার জল দূরে করছে ধূধূ;
পূব-পাশে মন্দিরে খানিক ব'সে
আবার আমরা তরী ভাসাই এসে।

হাওয়ার গতিক বুঝে তোলে মাঝি পাল,
একজনে বসে শুধু ধরে' থাকে হাল।
তীরেতে নৌকো এসে লাগল যখন—
বেলা প'ড়ে আলো কমে এসেছে তখন।
পাল-তোলা নৌকোরা ফেরে সারি সারি:
পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মাইলের পাড়ি
শেষ ক'রে ডিঙ্গি ভ'রে আনে সঞ্চয়—
ঠিকাদার মালিকের লোক তুলে লয়;
সেই সব রাশি রাশি মাছ আনে যারা—
নিজ দেশে পরবাসী ওড়িয়া জেলেরা,
মাঝ-রাতে পাড়ি দিয়ে ফিরছে এখন,
শ্রান্ত, শীর্ণ মুখ, মলিন বসন।
কল্‌কাতা—আরো কত দূরের শহরে,
এই মাছ রেলে ক'রে যাবে থরে থরে;
ভরবে মালিক থলি কল্‌কাতা ব'সে,
এখানে অজ্ঞ জেলে ভাগ্যকে দুষে
আধ-পেটা খাবারের দাম নিয়ে ফেরে
নোংরা পাড়ার মাঝে ভাঙা কুঁড়ে ঘরে।

শ্রমে ও ফলেতে আজ নেই কোন মিল,—
চিল্কার জল যেন বেদনায় নীল!

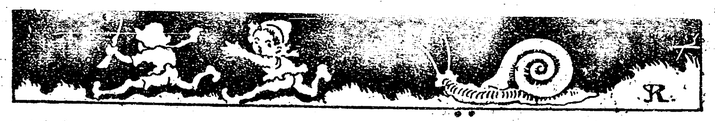

লড়াই ফেরত নন্দদুলাল

শ্রীশামুক

চাকর

—নতুন খেলার পুরাতন পরিণাম—

নন্দর বাবার বন্ধু অবিনাশ বাবু লম্বা ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক শিলিঙে আছেন বহুদিন। সেখানে নন্দকে পাঠানো হাওয়া বদলের জন্যে কিছুদিন।

শিলিগুড়ি থেকেই তার ভারি মন খারাপ হয়ে যায়। ভাল লাগে ছোট্ট খেলাঘরের ট্রেনে চেপে হামাগুড়ি পাহাড়ে উঠতে? কোথায় দম্‌দমায় এরোপ্লেনে আর কাঞ্চনজংঘার মাথায় গিয়ে নামবে—যুদ্ধের যেমন তাকে সমাদরে নিয়ে যাওয়া হ'ত—না এই বেঁকে থেমে থেমে গড়িয়ে যাওয়া!

সে প্রথমে একটি ট্যাক্সি নিয়েছিল, ভেকেছিল আগা- তাতেই যাবে। কিন্তু বিপদসংকুল পাহাড়ে নিজের গাড়ির বা অন্য মোটারের হঠাৎ ব্রেক ক্রীচ ক্রীচ শব্দে প্রতিবার তাকে শুয়ে পড়তে হ'ল। তাড়াতাড়িতে ও অল্প জায়গার জন্যে লেগে গেল শরীরের কয়েকটি স্থানে। যুদ্ধের পর থেকে যে কোন তীক্ষ্ণ তাকে যেন জোর করে ঐ অবস্থায় নিয়ে ফেলে। উপায় কি? পরের স্টেশনে গাড়ি ছেড়ে ট্রেন' বাধ্য হ'ল তাই।

অবিনাশ বাবুর বাড়িতে থেকে কিন্তু একেবারে অসহ্য ওঠে কিছু দিনেই। অবিনাশ বাবু বিলাত-ফেরত, বেশী সাহেব। তাঁর স্ত্রী বিলাত না গিয়ে আরো বেশী সাহেবী। অনেক রকম মারাত্মক কায়দা-কানুন, আর বড্ড চুপচাপ সব সময়ে, কোন শব্দ কোথাও নেই। এমন কি খাবার টেবিলে দু'জনে দু'খানা বই নিয়ে বসেন। চুপ্ করে পড়েন, আরো চুপ করে মুখ বন্ধ করে খান।

পাড়াটিও ভয়ানক সাহেবী। পথে দেখা হ'লে টুপি খুলে নীচু হয়ে পরস্পরকে অভিবাদন জানায়, কাসি পেলে রুমাল মুখে চেপে খুক্ খুক্ কাসে, হাসি পেলে প্রকাণ্ড হাঁ করে শব্দহীন হাসি হাসে, চীনাবাদাম খেয়ে পকেটে খোসাগুলি নিয়ে অন্য পাড়ায় ফেলে দিয়ে আসে, আর মোটা-সোটা ওভার কোট গায়ে চাপিয়ে ঠক্ ঠক্ কাঁপতে কাঁপতে বলে—আজকের দিন—হিহি—নটি—বড়ই—হিহি হি—চমৎকার!

এদিকে বাড়িতে একটি ছোট ছেলেমেয়েও নেই যে তার সংগে যুদ্ধের গল্প করবে, বিনা কারণে তাকে রাগাবে বা দরকার মত গুটিকতক রাম চিমটি বা পাঞ্জাবী গাঁট্টা পরখ করে দেখবে। একদিন নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে নন্দ একটু ফরাসী গান গেয়েছিল, চাকর দৌড়ে এসে খবর দিয়ে গেল যে সাহেবের রক্তের চাপ বাড়ছে। আরেকদিন দু'চার ধমক কাফ্‌রী নাচ নাচতেই চাকর হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলে যে মেম সাহেবের বুক ধড়-ফড়ানি থামতে চাইছে না কিছুতেই।

নন্দ পথে পথে একলা ঘুরে বেড়ায়—ভাল লাগে না। ক্যাসানের জায়গা ম্যালে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে—ভাল লাগে না। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘন ঘন ওঠা-নামা করে—তাও ভাল লাগে না। সংগীহীন বড়ই একলা একলা কাটে, সময় ফুরাতে চায় না একটুকুও।

একদিন এক চায়ের হোটেলে দেখা হয়ে আলাপ হ'ল একটি লোকের সংগে। ঠিক তারই মতন লড়াই-ফেরত মানুষ, তারই মতন দার্জিলিঙে বেড়াতে এসেছে বটে কিন্তু ভাল লাগছে না, সময় চাইছে না কাটতে।

অনেক কাপ্ চা শেষ করে পরামর্শ হয়ে গেল। কাল থেকে দু'জনে এক নতুন খেলা খেলবে সময় কাটাবার জন্যে। সকালে ও বিকালে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে লুকোচুরি খেলা হবে। যে অন্যকে প্রথমে দেখতে পাবে তার হবে জিত, যে ধরা পড়বে সে যাবে হেরে। এবং যে হারবে সে সেদিন রাত্রে অন্যকে হোটেলে খাওয়াবে। তোমরা ভাবছো এ এক অদ্ভুত আজব খেলা, কিন্তু বড় হ'লে জানতে পারবে যে সময় কাটাবার জন্যে মানুষ কত রকম অসাধ্য সাধনে উঠে পড়ে মেতে যায়। সভ্য মানুষের কাছে সময় বড় ভারী লাগে, সারা দিনরাত হৈ হৈ করেও তার ভার সরাতে পারে না, কমাতে পারে না একটু।

পরের দিন থেকে দু'জনার লুকোচুরি খেলা সুরু হয়ে গেল। কোন দিন নন্দ তার বন্ধুকে ধরে ফেলে, কোনদিন নিজে পড়ে যায় ধরা, আবার কোন কোন দিন বা কেউ কারুর হদিস্ পায় না খুঁজে খুঁজে সারাদিন। যাই হোক, দিনগুলি চমৎকার কাটে এবং সন্ধ্যায় হোটেলে দেখা হ'লে দু'জনায় খাওয়া-দাওয়া, গল্পগুজব, হাসিহল্লা করে প্রাণ ভরে। এত দিনে দার্জিলিঙ সহরটি ভাল লাগতে সুরু হয়।

জমে ওঠে লুকোচুরি খেলা। ক্রমশঃ দু'জনে আরো নির্জন নিরালা স্থানে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করে দেয় ধরা পড়ার ভয়ে, এবং পরে এমন হ'ল যে পর পর কয়েক দিন কেউ কারুকে আর ধরতে পারলে না।

একদিন হোটেলে দেখা হ'তে বন্ধু বললে এক অদ্ভুত কথা।

সেদিন তার ঘুরে বেড়াবার সময় সে কয়েকবার পেয়েছে মানুষের সন্ধান, এমন কি দেখতেও পেয়েছে শরীরের অস্পষ্ট ছায়া। ভেবেছে নন্দই হবে কিন্তু চেষ্টা করেও ধরতে পারে নি। বন্ধু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে সে নন্দ নিজে কিনা, ইচ্ছা করে ঐ দুষ্টামি করছে বুঝি?

শুধু অদ্ভুত নয়, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। নন্দরও ঘুরে বেড়াবার সময় ঘটেছে ঠিক একই রকম অমনি কয়েক বার। তা হ'লে হ'ল কী? দু'জনে কি দু'জনে খুঁজে পেতে পেতে—ধরতে ধরতে ভুল করে হারি ফেলেছে বার বার? না ঐ 'আরেকটি' অন্য লোক অন্য লোক যদি হয় ত' এ কে এবং এর উদ্দেশ্যই বা কী এও কি তাদের মতন আর এক জন লড়াই-ফেরত মানুষ সময় কাটাবার জন্যে চুপি চুপি যোগ দিয়েছে এই আ লুকোচুরি খেলায়? সত্যি, বড় সমস্যার কথা। ভেবে কোন হদিস্, কোন কুল কিনারা খুঁজে পাওয়া না।

আশ্চর্য্য এই যে এর পর থেকে রোজই ঘটতে ঐ একই ব্যাপার। এ সব কি নিজেদের ছায়া, নিজে পায়ের শব্দ, নিজেদের দৌড়ে যাওয়ার আওয়াজ? না না; এ সমস্ত নিশ্চয় অন্য কোন মানুষের! কিন্তু ধ পারা যায় না তাকে কিছুতেই। এই সময়ে এমন যে দুই বন্ধু কেউ কারুকে খুঁজে বার করতে পারলে পর পর বেশ কয়েক দিন।

সেদিন সকাল থেকে ভারি মেঘলা। আকা কেমন একটা থমথমে ভাব। নন্দর রোখ চেপে আজ যেমন করেই হোক বন্ধুকে ধরবে, এবং সেই ছায়ামূর্তির রহস্যভেদ করবে। বিকালে একটু বেরুবার সময় পিস্তলটি ভিতরের পকেট থেকে বার বাইরের পাশ্ পকেটে রাখে। ভাবটা এই যে বন্ধু পিস্তলের খবর জানবে না, হঠাৎ তাকে দেখিয়ে দিতে হবে। বন্ধু ভাববে ঐ রহস্যময় ছায়া নিশ্চয় লোকের, পিস্তল নিয়ে খুন করতে এসেছে বন্ধুর অকস্মাৎ চমকে-যাওয়া ভয়ের মুখ মনে করে নন্দ কয়েক বার হো হো করে হেসে নিলে একলা।

ঘোরাঘুরির মধ্যে একবারও মনে হ'ল না কোথাও আছে, সন্ধান পেল না কারুর। সন্ধ্যার

...ক্লান্ত হয়ে হোটেলের দিকে ফিরছে, হঠাৎ মনে হয় ...—এবারে মানুষ এসেছে কোথাও না কোথাও খুব ...কাছি। দেখতে পায় না কারুকে তবু মনে হয় ঠিক ...ষের নিশ্বাস, মানুষের পদধ্বনি, মানুষের উসখুস করা ...এই সব শব্দগুলি তার সংগে সংগে চলেছে।

খুব তাড়াতাড়ি চলতে চলতে নন্দ এক বাঁকের মুখে ...করে প্রকাণ্ড পাথরের পিছনে লুকিয়ে পড়ে। ...রের আড়ালে আড়ালে সন্তর্পণে পিছনের দিকে ...গিয়ে যায়। কোন রকম আওয়াজ করে না এতটুকু, ...কি রুমালে মুখ চেপে নিশ্বাস নেয় বা ফেলে।

সমস্ত চুপ, নিস্তব্ধ। কই, কেউ নেই ত' কোথাও! ...ঐ অনেক নীচুতে সবুজ উপত্যকাটি যেন মেঘলা ...ঘুমিয়ে পড়েছে ভয়ানক, আর সরু সুতার মত নদীর ...রেখাও স্থির—যেন সত্যি নয়, ছবিতে সুন্দর করে ...।

ঐ ওপাশে গুহার সামনে মানুষের ছায়া না? ঐ ত' ...তে মাথা, মুখ—নাক! শরীরের আর কিছু দেখা যায় ...। নিশ্চয়ই তার বন্ধু উঁকি মেরে দেখছে। আচ্ছা, ...াও, দেখাচ্ছি মজা। এত দিন শুধু শুধু নিছক হয়রান ...!—এবারে?

নন্দ একটি ছোট পাথর নিয়ে উলটো দিকে ছুঁড়ে দেয়; ...ার মাথাটি টুপ করে ভিতরে ঢুকে যায়। আবার ...ছে আস্তে আস্তে ঝুঁকে এবারে, দেখছে কিন্তু উলটো ...কে। আবার একটি পাথর ছোঁড়া হ'ল, যেন কোন ...ক ঐ দিক্ থেকে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে আর ...র পায়ে লেগে পাথর পড়ছে গড়িয়ে।

নন্দ পিস্তলটি হাতে সোজা ধরে পা টিপে টিপে পাথ-রের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে যায়। লোকটি আবার গুহার ভিতরে লুকিয়ে পড়েছে আপনি। সে গুহার কিনারায় পৌঁছে এক ভীষণ চীৎকার করে ওঠে, যেন আলিবাবার ডাকাত এল একজন। মজা, ভীষণ মজা! এবারে বন্ধু পড়েছে ধরা।

এ কী! খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে সামলে নেবার আগেই নন্দ দেখে একজন অন্য লোক ভয়ানক চমকে উঠে পকেট থেকে পিস্তল নিয়ে তার দিকে গুলি ছুড়লে।

নন্দরও পিস্তলের গুলি যেন আপনি ছুটে বেরিয়ে গেল। দু'জনেই এক সংগে পিছন দিকে হেলে মাটিতে আছড়ে পড়লো।

পরে জানা গেল আসল ব্যাপারটি কি। ঐ তৃতীয় ব্যক্তি সরকারী গোয়েন্দা। এদের দুই বন্ধুর অনাবশ্যক খামখেয়ালী চলাফেরায় সন্দেহ করে পিছন নিয়েছিল। উদ্দেশ্য লক্ষ্য রাখা এরা করে কি। গোয়েন্দা মশাই নিছক সময় কাটাবার জন্যে যে এরা লুকোচুরি খেলছে সে খবর কিছুই জানতো না।

বন্দুকের গুলির আঘাতে কারুর মারাত্মক কিছু হয় নি। অবশ্য কয়েক দিন হাসপাতালে শুয়ে ভুগতে হ'ল। আদালতের বিচারে, তিনজনই বেকসুর খালাস পেয়ে গেল বটে তবে একটি সর্তে। নন্দ ও তার বন্ধুকে দার্জিলিঙ ছেড়ে চলে যেতে হবে, এবং তারা আর পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে না।

নন্দ আবার বাড়ি ফিরে এল।

(ক্রমশঃ)

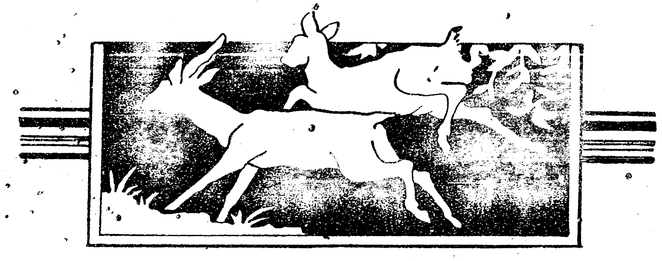

এবারকার বিজ্ঞান-কংগ্রেস

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

গত জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লী মহানগরীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১৪ সনে সর্ব্বপ্রথম কলকাতার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি ভবনে ভারতের বিভিন্ন স্থান হ'তে আগত ১০৫ জন মাত্র প্রতিনিধি নিয়ে যে সভার আরম্ভ হ'য়েছিল তারই অধিবেশনে আজ ভারতের এক হাজার বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি, কয়েক সহস্র দর্শক ও পৃথিবীর অন্যান্য সমৃদ্ধ দেশগুলি থেকে প্রায় ত্রিশ জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দেয় যে, ভারত আজ বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় বিশ্বের দরবারে সম্মান-

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি
স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

জনক আসন লাভ করেছে। ইউরোপীয় বণিকগুষ্ঠি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সোনার ভারতকে আজ কি অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে তা সবাই জানে, তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে ইউরোপীয় সভ্য সংস্পর্শে এসে ভারত আধুনিক বিজ্ঞানপদ্ধতির পরিচয় লাভ করেছে। তাই বিজ্ঞান কংগ্রেসের, ভারতের এই সাফল্যের কথা উল্লেখ করতে দু'জন বৃটিশ বৈজ্ঞানিকের কথা মনে পড়ে। প্রথম পি. এস. ম্যাক্‌মহান্, দ্বিতীয় জন জে. এল. সাইমেন ১৯১০ সনে এই দুই রাসায়নিক ভারতে এসেছি রসায়নের অধ্যাপক হিসাবে। এঁদেরই ঐকা আগ্রহ ও আপ্রাণ চেষ্টায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন ১৯১৪ সনে মহাপণ্ডিত স্যর আশুতোষ মু পাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন শা সভাপতিত্ব করেছিলেন—পি. এস্, ম্যাক্‌মহান—রসা শাস্ত্র; ভি. এইচ্, জ্যাকসন্,—পদার্থবিদ্যা; ডক্টর আর, হ্যাণ্ডারসন্—প্রাণিতত্ত্ব; সি, সি, কালডা উদ্ভিদ্-বিদ্যা; এল, কে, অনন্তকৃষ্ণ আয়ার—মানবজা তত্ত্ব। স্যর আশুতোষ তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণে বলেছিলেন—ভারতের মত এত বড় দেশে যদি বিজ্ঞ ক্ষেত্রে কৃতকার্য্যতা লাভ করতে হয় তবে বিজ্ঞা বিভিন্ন শাখায় কার্য্যরত বৈজ্ঞানিকদের সংঘবদ্ধ হ হবে। বৈজ্ঞানিকগণ হবেন একদল সৈনিক—দে প্রতি যাঁদের দায়িত্ব থাকবে অসীম। তাঁরা যদি বিচ্ছি থাকেন তবে তাঁদের শক্তি হবে অনেকাংশে খর্ব্ব। আশুতোষের সে আবেদন ব্যর্থ হয় নি। আজ ৫টী শা স্থলে ১৩টী বিভিন্ন শাখায় যে অধিবেশন সেদিন হ' গেল বিজ্ঞান-জগতে তার মূল্য যথেষ্ট।

এবারকার অধিবেশন নানা দিক্ দিয়ে বিশেষভা উল্লেখযোগ্য। ভারত আজ স্বাধীনতার তোরণ-দ উপস্থিত। এমন দিনে স্বাধীনতার নির্ভীক্ সেনাপতি প জহরলালকে মূল সভাপতির আসন প্রদান করে বিজ্ঞা কংগ্রেস যে শুধু জহরলালকে সম্মানিত করেছেন তা বিজ্ঞান-কংগ্রেসেরও মর্য্যাদা অনেকাংশে বর্দ্ধিত হ'য়েছে ভারতের এই বীর সন্তানের নূতন করে পরিচয় দে কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। বিজ্ঞা

জনা দিতে গিয়ে তিনি তাঁর অভিভাষণে বলেছেন—বিজ্ঞান হ'ল কতগুলি পদ্ধতির একত্রীকরণ—যার সাহায্যে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর প্রভুত্ব লাভ করে। বিজ্ঞান ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় নয় বা মানব-কৃষ্টিকে ধ্বংস করাও এর কাজ নয়। তিনি বলেছেন—"সমাজ সেবার ব্রত নিয়ে কার্য্যকরী হ'লে বিজ্ঞান অতি উন্নত স্থান লাভ করে। ভারতের নরনারী আজ ক্ষুধা ও অনশনের জ্বালায় দগ্ধ,...সুতরাং চল্লিশ কোটী ভারতবাসীর সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে আজ বিজ্ঞানকে।"

বিভিন্ন শাখার মধ্যে রসায়ন শাখার সভাপতিত্ব করে-ছেন রাঁচীর নিকটস্থ নামকোম লাক্ষা গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ডক্টর পি, কে, বসু। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯০১ সনে। ১৯২২ সনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্, এস-সি ডিগ্রী লাভ করে পরলোকগত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অধীনে জৈব রসায়নে গবেষণা কার্য্যে লিপ্ত হন এবং ১৯২৭ সনে ডি, এস্-সি হন। ১৯৩১ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে বৃত্তি লাভ করে তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য ইউরোপ যান। ১৯৪৪ সনে তিনি লাক্ষা গবেষণাগারের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হ'ন। তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল 'প্লাষ্টিক'।

পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি ছিলেন কলকাতার ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন ফর্ দি কাল্‌টিভেশন্ অব্ সায়েন্স-এর অধ্যাপক ডক্টর কেদারেশ্বর ব্যানার্জ্জী। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০০ সনে। প্রথমে ঢাকায় পরে কলকাতায় শিক্ষা লাভ করে ১৯২৯ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, এস-সি উপাধি লাভ করেন। ১৯৩১ সনে তিনি ইউরোপ যান। তার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক দিন অধ্যাপনা করে ১৯৪৩ সনে বর্ত্তমান পদে যোগদান করেন। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল—'পরমাণবিক গঠনের বিশৃঙ্খলতা'।

ভূতত্ত্ব ও ভূগোল বিভাগের সভাপতি হিসাবে বাঙ্গালোর ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর পি, এস, মাসমুথু 'মহীশূরের ভূতত্ত্বের কয়েক দিক্' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ, ডি এবং একজন নাম-করা ক্রিকেট-খেলোয়াড়।

এবারকার বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতি
পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

সংখ্যাতত্ত্ব শাখার সভাপতি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতত্ত্ব (ষ্ট্যাটিষ্টিক্স) বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক আর, সি, বসু। ইনি জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯০২ সনে। ১৯২৭ সনে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এম্, এ, উপাধি লাভ করে প্রথমে জ্যামিতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং ১৯৩০ সনে কলকাতার আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক হন। ইনি ভারতের নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘের সভ্য। ইনি শীঘ্রই কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকা যাচ্ছেন। ইনি আলোচনা করেছেন—'পরীক্ষার পরিকল্পনা' সম্বন্ধে।

গণিত শাখার সভাপতি রূপে বোম্বাইএর টাটা ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ-এর অধ্যাপক ডক্টর ডি, ডি, কোশাম্বি 'কার্য্যঘটিত ক্যালকুলাসের সম্ভাব্য প্রয়োগ' সম্বন্ধে অভিভাষণ দেন। লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজের উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ডক্টর এ, সি, যোশী উদ্ভিদ-বিদ্যা শাখার সভাপতি হিসাবে 'ফুলের স্ত্রী-কেশরের গঠন' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখার সভানেত্রীত্ব করেন ডক্টর মিসেস্ ইরাবতী কার্ভে। তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল 'ভারতীয় নৃতত্ত্বের কয়েকটী সমস্যা'। ইনি ডেকান কলেজের অধ্যাপিকা। ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০৫ সনে, পিতার নাম মিঃ জি, এইচ, কর্ম্মকার। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ ডিগ্রী লাভ করে ইনি ১৯২৮ সনে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য যান এবং ১৯৩০ সনে সেখান থেকে পি-এইচ, ডি ডিগ্রী পান। ফারগুসান কলেজের (পুনা) অধ্যক্ষ ডি, ডি, কার্ভেকে ইনি ১৯২৬ সনে বিবাহ করেন।

কলকাতা স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিনের অধ্যাপক ডক্টর গণপতি পাঁজা চিকিৎসা-বিদ্যা শাখার সভাপতিরূপে 'ভারতে চর্ম্মরোগ' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। বর্দ্ধমান জেলার এক গ্রামে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ডক্টর পাঁজা বাল্যকালে পড়াশুনার জন্যে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেছেন। কৃতিত্বের সাথে কলকাতা থেকে এম, বি পাশ করে তিনি ১৯২১ সনে স্কুল অব্ ট্রপিকাল মেডিসিনে অধ্যাপক হন। তারপর ১৯৩২ সনে রকফেলার বৃত্তি লাভ করে লণ্ডন গমন করেন। দেশে ফিরে পুনরায় তিনি তাঁর পূর্ব্ব চাকুরীতে যোগ দেন।

কৃষিবিদ্যা শাখার সভাপতি ছিলেন কোয়েম্বাটোরের ইম্পিরিয়াল্ সুগারকেন ষ্টেশনের ইক্ষু-বিশেষজ্ঞ মিঃ এন্, এল্, দত্ত। ইনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এস্-সি এবং ইম্পিরিয়াল্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটে শিক্ষা-প্রাপ্ত। এঁর অভিভাষণের বিষয় ছিল 'ভারতে ইক্ষুচাষ'।

জীববিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখার সভাপতি আইজৎনগরের ইম্পিরিয়াল্ ভেটারিনারী রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের ডক্টর জি, ভি, ভালেরাও 'ফল্পিত ক্রিমিবিদ্যা—ভারতে এর অতীত ও ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ইনি '১৯৪২ সনে চিকিৎসা-বিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন।

মনোবিদ্যা ও শিক্ষাবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মিঃ পি, এস, নাইডু, এম, এ। এঁর আলোচ্য বিষয় ছিল 'মনোবিদ্যা ও মানব-সমাজের পুনঃস্থাপন'।

এ ছাড়া শরীরতত্ত্ব শাখার সভাপতি ছিলেন হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়া মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক মিঃ এস, এ, রহমান, ও এঞ্জিনীয়ারিং ও মেটালার্জি বিভা সভাপতি ছিলেন ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার জেনারেল এইচ, পি, ভৌমিক, বি, এ; সি, য়্যাণ্ড ই, ই (লণ্ড ও, বি, ই; এম, আই, ই।

ইংল্যাণ্ড থেকে যে সব বৈজ্ঞানিক এই অধিবেশনে যো দিয়েছেন তার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নাম করা যেতে পারে চার্লস্ গলটন্ ডারুইনের। ইনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডা ইনের (যিনি বিবর্ত্তনবাদ আবিষ্কার করেছিলেন) পৌ ইনি ইংল্যাণ্ডের ন্যাশনাল ফিজিকাল লেবরেটরীর অধ্য ইনি জন্মগ্রহণ করেছেন ১৮৮৭ সনে। এর পর করা যেতে পারে স্যর হ্যারল্ড্ স্পেন্সার জোন্স-এর। গ্রীনউইচ্ মানমন্দিরের রাজ-জ্যোতির্বিদ্। পৃথিবী থে সূর্য্যের দূরত্ব নির্ণয়ই এঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। এ দ্বা এ দলে আছেন,—

প্যাট্রিক মেনার্ড ষ্টুয়ার্ট ব্লাকেট, এম, এ; এফ, আ এস্—(জন্ম ১৮৯৭)—ম্যান্‌চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের প বিদ্যার অধ্যাপক। ইনি 'ব্যোমরশ্মি' (কসমিক্ র সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে রয়াল সোসাইটীর রয়াল মে পেয়েছেন। 'পজিট্রন্' আবিষ্কারকদের একজন।

স্যর আর্থার পার্সি মরিস্ ফ্লিমিং, কে, বি; সি, বি, এম, এস-সি; এম, আই, ই, ই; ইত্যাদি—ইনি এক বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার। মেট্রোপলিটান্ ভিকার্স ইলেক্‌ট্রি কোম্পানীর ডিরেক্টর ও ম্যানেজার।

হ্যারল্ড ম্যানরো ফক্স, এম, এ; এফ, জেড্, এস; আর, এস—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপ

ফিলিপ্ ক্রস্ হোয়াইট্, এফ, আর, এস—ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ মেডিক্যাল রিসার্চ অধ্যাপক।

ডক্টর উইলিয়ম্ ব্রাউন, এম, এ; ডি, এস-সি; আর, এস—সাউথ ক্যান্সিংটন্ ইম্পিরিয়াল কলেজ সায়েন্স য়্যাণ্ড টেক্‌নোলজীর অধ্যাপক।

লুই জোয়েল মর্ডেল, এম, এস-সি, এফ, আর, এ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক।

স্যর ওয়েন্টওয়ার্থ টমসন, ডি, লিট্, ডি,, এস্-সি, আর, এস,—সেণ্ট য়্যানড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রা ইতিহাসের অধ্যাপক।

স্যর য়্যান্‌গাস্ গিলন—এম্পায়ার ডিভিসন অব্ দি র কাউন্সিলের ডিরেক্টর।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছেন জীবতত্ত্ববিদ্ র এডমণ্ড টমসন্ হারভে ও ডক্টর অস্কার রিডেল, াতিবিদ্ ডক্টর হার্লো শেপ্‌লি, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ ডক্টর বার্ট ব্রেক্সলি ও সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর উইলিয়াম ওয়ার্ড ডেমিং।

কানাডা থেকে এসেছেন পদার্থবিদ্যাবিদ্ ডক্টর রবার্ট ল, উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ্ রবার্ট বয়েল টমাস ও উইলিয়াম ং হানা এবং ভূতত্ত্ববিদ্ টমাস লেসলি টন্‌টন্।

রাশিয়া থেকে এসেছেন রাশিয়ার একাডেমী অব্ য়েন্সের সহকারী সভাপতি এম, ভি, পি, ভলজিন, ধবিদ্যাবিদ্ এম, এস, ইউ, উমারোভ ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ই, এস, প্যাভলভস্কি।

ফ্রান্স্ থেকে এসেছেন ফ্রান্সের একাডেমী অব্ য়েন্সের সভ্য অধ্যাপক হাদামার্দ্। চীন থেকে এসে-ন ডক্টর সিন্ সেং।

বিদেশী বৈজ্ঞানিকগণ ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন এবং এ দেশের বৈজ্ঞানিকদের সাথে নানা বিষয় আলোচনা করবেন। অধ্যাপক ব্লাকেট গত ১৩ই জানুয়ারী কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে 'ব্যোমরশ্মি' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করেছেন তা গভীর পাণ্ডিত্য ও তথ্যপূর্ণ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় একটী বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসবে বিদেশী বিজ্ঞানীদের ন' জনকে অনারারী ডি, এস্-সি, ডিগ্রী দিয়েছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ যখন ইংল্যাণ্ড ও যুক্ত-রাষ্ট্রে গিয়েছিলেন তখনই তিনি এই সব বৈজ্ঞানিকদের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। কাজেই বিজ্ঞান কংগ্রেস তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এবারকার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার স্যর মরিস গয়ার। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনে যে সব মাননীয় দর্শক ছিলেন তার মধ্যে সর্দার বলদেব সিং, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, স্যর আকবর হায়দারী, বার্ম্মার ইউ, আং, শান্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

তুষারকন্যার কাহিনী

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

মুশাংাই প্রদেশের এক গ্রামে মোশাকু ও মিনোকিহি য়ে দু'জন কাঠুরে বাস করত। মোশাকু ছিল থুত্থুড়ে ড়া আর তার শাগরেদ মিনোকিহি ছিল তরুণ যুবক। াহ তারা দু'জনে গ্রাম থেকে বহুদূরে এক জঙ্গলে কাঠ টতে যেত। ঐ পথে একটি চওড়া নদী নৌকো করে তে হ'ত তাদের। নদীর উপর কোন পুল ছিল না, ং কোন দিন সে নদীতে পুল বাঁধাও সম্ভব হয় নি; বারই পুল বাঁধা হ'ত তত বারই বন্যার প্রবল স্রোত ড় ঝাপ্‌টায় সমস্ত ধুয়ে-পুঁছে যেত—পুলের কোন বাস্পও থাকত না।

সে সময়টা ছিল শীতকাল। একদিন সন্ধ্যার দিকে ল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মোশাকু ও মিনোকিহি ঝড়ের মুখে পড়ল। হাড়ভাঙ্গা শীতের উপর প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তারা কোন রকমে পার-ঘাটার কাছে এসে দেখে, মাঝি তার নৌকা নিয়ে ঝড়ের আগে সেই যে ওপারে চলে গেছে, তারপর আর ফেরে নি। নদীর জল তখন ফুলে ফুলে ফেঁপে ফেঁপে উঠছে; স্রোতের তোড়ে গাছপালা, গরু-ভেড়া ভেসে চলেছে দুরন্ত বেগে। সে সময় সাঁতরে নদী পার হওয়ার কথা কল্পনা করাও অসম্ভব। সুতরাং তারা নিরুপায় হয়ে নদীর পাড়ে মাঝির একটি ছোট্ট কুঁড়েতে আশ্রয় নেওয়াই স্থির করলে। কুঁড়েটিতে একটি মাত্র দরজা ছাড়া জানালা বা আগুন জ্বালাবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। যাই হোক, এই দুর্য্যোগের মধ্যে এখানে মাথা গোঁজবার এই জায়গাটুকু পেয়ে মনে মনে ভগবান্‌কে তারা ধন্যবাদ দিতে লাগল।

এদিকে নদীর ভয়াবহ গর্জ্জনের সঙ্গে ঝড়ের বেগও ক্রমশঃ পাল্লা দিয়ে তীব্রতর হতে লাগল। বরফ-গলা হিম শীতল হাওয়া আরও ঠাণ্ডা হয়ে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল গায়ে এসে। তুষারের চাপড়া প্রবল ঝড়ে উড়ে উড়ে এসে পড়তে লাগল কুঁড়ের গায়ে। সারাদিনের ক্লান্তিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই বুড়ো মোশাকু ঘুমিয়ে পড়লেও মিনোকিহির চোখে তখনও ঘুম আসে নি। সর্ব্বাঙ্গে খড়ের বর্ষাতি মুড়ি দিয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিল সে। কিন্তু রাত্রি অধিক হলে তার চোখেও ঘুম জড়িয়ে এলো।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কেটে যাবার পর, হঠাৎ মুখে তুষারের প্রবল এক ঝাপটা লেগে ঘুম ভেঙে গেল মিনোকিহির। চোখ চেয়েই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। তুষারালোকে (উকিকারি) সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে গেছে, আর তার সামনে শ্বেতধবল, তুষারমণ্ডিত একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে, মোশাকুর মুখের উপর হুমড়ি খেয়ে কি যেন দেখছে! উজ্জ্বল শাদা ধোঁয়ার মত নিঃশ্বাস পড়ছে তার নাক দিয়ে! একবার মিনোকিহির মনে হ'ল, এ কি সে স্বপ্ন দেখছে! কিন্তু চোখটা ভালো ক'রে রগড়ে নিয়ে আর একবার দেখতে গিয়েই মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার। কি অপার্থিব—অদ্ভুত সে চোখের চাহনি! চীৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছা হ'ল মিনোকিহির; কিন্তু গলা যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে, কোন স্বরই বেরুল না।

মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মোশাকুর কাছ থেকে সে এগিয়ে এলো মিনোকিহির কাছে, এবং তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদু হাসল। তার পর অদ্ভুত স্বরে ফিস্ ফিস্ করে বল্লে: 'অপর লোকটির মতই তোমারও দশা হ'ত, কিন্তু তোমায় দেখে আমার মায়া হচ্ছে। তরুণ যুবক তুমি, এখনও তোমার মনে কোন কালিমা পড়ে নি; তার উপর সত্যিই তুমি সুন্দর!—ভয় পেও না, আজ আমার রাত; এ-রাতে কেউ পার পায় না আমার কাছ থেকে! এখন যদিও কিছু ক্ষতি করব না আমি তোমার, কিন্তু এ কথা যদি কখনও, কোন দিন, আর কারুর কাছে বলো,—এমন কি তোমার মা বা স্ত্রীর কাছেও, তা হ'লেই তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য!—জীবনে কখনো ভুল না এ কথা!' কথাগুলো বলেই সে দোরের দিকে মিলিয়ে গেল। এতক্ষণ পরে যেন চেতনা [illegible] এলো মিনোকিহির; একটু নড়তে-চড়তে পারল সে। উঠে ব'সে বাইরের দিকে তাকাল [illegible] ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে, বিদ্যুতের চমকানিতে, [illegible] ঝিকে তুষারপাত ছাড়া মেয়েটির আর কোন চিহ্নই [illegible] পড়ল না। মিনোকিহি ভালো করে কাঠ দিয়ে [illegible] বন্ধ করে দিল দরজাটা।

সমস্ত ব্যাপারটা তখনও স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল [illegible] এই যে পরীর মত বরফ-কোঁদা মেয়েটিকে সে দেখল, [illegible] এই যে তার সঙ্গে মেয়েটি এত কথা কইল, এ সব [illegible] সত্যি! কিন্তু নিজের চোখকে ত' আর অবিশ্বাস [illegible] যায় না! অথচ এ সম্ভব হ'ল কি ক'রে! এমনি [illegible] ভাবতে ভাবতে মোশাকুকে ডাক দিল মিনোকিহি। [illegible] হয়ে আসছে, আর কতক্ষণ ঘুমোবে বুড়ো! কিন্তু এ[illegible] মোশাকুর কোন সাড়া নেই যে! অন্ধকারের মধ্যে [illegible] মুখে হাত দিয়েই চমকে উঠল মিনোকিহি। বরফ[illegible] মত ঠাণ্ডা তার মুখ! শুধু তাই নয়, সমস্ত গা তার ঠা[illegible] হয়ে গেছে, প্রাণহীন অসাড় দেহটা শক্ত হয়ে পড়ে আ[illegible] কেবল।

ভোরের দিকে ঝড়-জলের প্রতাপ কমে, চারিদিক [illegible] হয়ে গেল। পারের মাঝি নৌকো নিয়ে ওপার থে[illegible] ফিরে এলো এ পারের ঘাটে মিনোকিহির সমস্ত শ[illegible] ঠাণ্ডায় ও ভয়ে তখনও কাঠ হয়ে আছে। মাঝি [illegible] কুঁড়েয় আসতেই, গত রাত্রের ভয়াবহ ঘটনার ক[illegible] একেবারে চেপে গিয়ে সে শুধু মাঝিকে জানাল যে ঠাণ্ডা[illegible] প্রকোপে বুড়োর মৃত্যু হয়েছে।

সূর্য্যোদয়ের পর, বেলা বেড়ে, রোদ একটু [illegible] হ'তেই তারা দু'জনে বুড়োর সৎকার করলে, তার [illegible] মিনোকিহি ফিরে গেল নদীর ওপারে তার বাড়িতে।

এর পর মিনোকিহি একা একাই জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেত, এবং সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসত নদী পেরিয়ে।

এই ভাবে কিছুদিন কেটে যাবার পর একদিন [illegible] থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা [illegible] গেল তার। মেয়েটির যেমন রঙ, তেমনি সুঠাম চেহা[illegible] আর তেমনি মানানসই চোখ-মুখ। এমন অপরূপ সু[illegible] [illegible]মেয়েকে একলা এ পথে যেতে দেখে প্রথমটা মিনোকিহি [illegible]আশ্চর্য্য হয়ে গেল, তার পর তার কাছে গিয়ে সে মেয়ে[illegible]র নাম ও গন্তব্য স্থান কোথায় জিজ্ঞাসা করলে। মিনোকিহির কথায় মেয়েটি সলজ্জ ভাবে মিষ্টি গলায় উত্তর [illegible]য়ে বললে, "আমার নাম ও-উকি; সম্প্রতি আমার [illegible]প-মা দুই মারা যাওয়ায় আমি ইডোতে দূরসম্পর্কীয় [illegible]ীব এক আত্মীয়দের বাড়ি যাচ্ছি, যদি তারা দয়া ক'রে [illegible]থাও আমাকে একটা ঝিয়ের কাজে লাগিয়ে দেয়, [illegible] আশাতে।"

[illegible] মিনোকিহির ভারী ভালো লাগল মেয়েটিকে; আর [illegible]ন মেয়েকে ভালো না লাগাই অস্বাভাবিক। যতই [illegible] দেখতে লাগল ততই মেয়েটির রূপ আর মধুর কথা[illegible]র্তা মুগ্ধ করে ফেলল তাকে। শেষ পর্য্যন্ত আর থাকতে [illegible] পেরে, কথায় কথায় সে ও-উকিকে জিজ্ঞাসা ক'রে [illegible]ল, সে বিবাহিত কিনা। উত্তরে হাসতে হাসতে সে [illegible], "না, আমি স্বাধীন, আমার বিবাহ হয় নি।" [illegible] পর ও-উকিও তাকে প্রশ্ন করলে, তার বিবাহ [illegible]েছে কিনা। উত্তরে মিনোকিহিও ঐ একই কথা [illegible]। এবং তার সঙ্গে সে আরও যোগ করলে যে বাড়িতে [illegible]র এক বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। মা বহুবার [illegible]য়ের কথা তুললেও প্রত্যেক বারই সে কথা সে [illegible]য়ে দিয়েছে অল্প বয়সের অজুহাতে। এই ভাবে [illegible]বার্ত্তার মধ্যে পরস্পরকে পরস্পরের খানিকটা জানা [illegible]য় গেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ পথ চল্ল তারা। কিন্তু [illegible]বার্ত্তা না হলেও, সেই যে বলে না:

'কি গো আরবা, মিমো কুহি হোডো
মি মিনো ও উ।'

'ইচ্ছা যখন প্রবল তখন,—
কথার চেয়ে চোখের চাওয়ায় ব্যক্ত যে হয় মন।'

[illegible] ক্রমশঃ তারা গ্রামে এসে পৌঁছল। মিনোকিহি [illegible]কিকে তাদের বাড়িতে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য [illegible]রোধ করল। প্রথমটা ইতস্ততঃ করলেও, শেষ পর্য্যন্ত [illegible]কি তাদের বাড়িতে যেতে রাজী হ'ল। মিনোকিহির [illegible]কে সাদরে ঘরে নিয়ে এলেন। এমন মেয়েকে কে [illegible]াদর করে! তাকে দেখলেই যে চোখ জুড়িয়ে যায়। [illegible] কাঠুরের ঘরে এমন মেয়ের শুভাগমন, এ যে কল্পনাতীত! সে রাতে মিনোকিহির মা তার-জন্য ভালো রান্নাবান্না করলেন; তার পর কয়েকদিন জোর করে, অনুনয়-বিনয় করে উকিকে রেখে দিলেন তাঁদের বাড়িতে। উকিও অল্প কয়েক দিনের মধ্যে গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম দেখিয়ে ও মিনোকিহির মার সেবাযত্ন ক'রে এমন ক'রে ফেল্লে যে, তিনি আর কিছুতেই তাকে ছাড়তে চাইলেন না, এবং শেষ পর্য্যন্ত ইডোতে আর উকির মোটেই যাওয়া হ'ল না—মিনোকিহির বাড়িতেই সে রয়ে গেল বৌ হয়ে।

ও-উকির আগমনে মিনোকিহির সংসারে ক্রমশঃ বাড়বাড়ন্ত দেখা দিল—জমি-জায়গা হ'ল, ঘর-বাড়ি হ'ল। ছোট ছোট যে-সব চেরি গাছ লাগান হয়েছিল, তা একদিন ফুলে ফুলে ভরে উঠল। তাদের ঘরে আট-দশটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলেমেয়ে হেসে-খেলে বেড়াতে লাগল। সুখ-ঐশ্বর্য্য উপচে উঠল চতুর্দ্দিকে। ঠিক এমনি সময় একদিন মিনোকিহির মা তাদের শেষ আশীর্ব্বাদ ক'রে চিরবিদায় নিলেন।

কিছুদিন থেকেই গ্রামের মেয়ে-পুরুষ সকলেই উকিকে কোন ক্ষণজন্মা অসাধারণ মেয়ে বলে মনে করত, এবং মিনোকিহির সৌভাগ্যে ভেতরে ভেতরে হিংসে করত। কাঠুরের ঘরে এমন বৌ তারা কেউ কখনো দেখেও নি, শোনেও নি। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে আশ্চর্য্য হচ্ছে, আট দশটি ছেলেমেয়ে হবার পরও উকিকে প্রথম যেমনটি তারা দেখেছিল, আজও সে-ঠিক তেমনিটিই রয়ে গেছে—একটুও বদলায় নি। এ কি ক'রে সম্ভব! এই নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হ'ত কিন্তু কেউই তার সামনে কোন দিন কোন কথা বলতে সাহস পেত না।

উকি ও মিনোকিহির সংসার এই ভাবে বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু একদিন এক অভাবনীয় ঘটনায় সব ওলট-পালট হয়ে গেল।

সেদিন রাত্রের দিকে ছেলেমেয়েরা সব সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিল। ও-উকি দোর-জানলা বন্ধ ক'রে ফানুসের আলোয় বসে কি একটা সেলাই করছিল।

দুরন্ত শীত পড়েছিল সেবার। ঠাণ্ডার প্রকোপে সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে মিনোকিহি ও-উকির কাছে এসে বসল। সন্ধ্যার দিক থেকেই এলোমেলো যে হাওয়া বইছিল, ক্রমশঃ রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ঝড়ের আকার ধারণ করল। প্রবল ভাবে তুষারপাত হচ্ছিল বাইরে, আর মধ্যে মধ্যে তার ছাট এসে পড়ছিল দরজার গায়ে, জানালায়। হঠাৎ বহুকাল আগেকার এক ভয়াবহ রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল মিনোকিহির। ফানুসের আলোর ধারে ও-উকিকে দেখাচ্ছিল যেন ঠিক তেমনি সুন্দর, অপরূপ, অলৌকিক মেয়েটির মত! মিনোকিহি আর থাকতে না পেরে বলে বসল, "দেখ, আজ তোমার মুখের দিকে চেয়ে বহুকাল আগের এক অদ্ভুত ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে,—তখন আমি মাত্র আঠারো বছরের ছেলে। আজ তোমায় যেমন দেখাচ্ছে, ঠিক তেমনি, সুন্দর আর ধবধবে তুষার-কোঁদা ছিল সেই মেয়েটি!"

কথাটা শুনে, ও-উকি তার সেলায়ের কাজ থেকে মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্ মেয়েটির কথা? বলো কি দেখেছিলে তুমি?—লক্ষ্মীটি, বলো সেই গল্প।"

মিনোকিহি উৎসাহিত হয়ে, মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে, একটার পর একটা—পারঘাটার কুঁড়ের সেই ভয়াবহ দুর্য্যোগপূর্ণ রাত্রির কথা, তুষার-ধবল মেয়ের কথা, তার গলার স্বর, হাসি আর কথা বলার কথা ও মোশাকুর মৃত্যুর কথা—সব ও-উকির কাছে বর্ণনা করলে। তার পরও সে বলে যেতে লাগল, 'জাগ্রত কি ঘুমন্ত অবস্থায় জানি না, জীবনে সেই একবারই তোমার মত রূপসী সুন্দরী একটি মেয়েকে আমি দেখেছিলুম। অবশ্য সে যে মানবী ছি না সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত, এবং সেই জন্যেই আ ভীষণ ভয় পেয়েছিলুম সে রাত্রে। কিন্তু কি অপূর্ব্ব দু ফেননিভ ছিল তার রূপ! আজও সে কথা মনে হ' আমার সন্দেহ জাগে যে, সেটা কি আমি স্বপ্ন দেখেছি না সত্যিই দেখেছিলুম কোন মায়াবিনী তুষা কন্যাকে!...'

মিনোকিহির মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই ও-উ আচমকা তার সেলাই ফেলে, মিনোকিহির মুখের কা হাঁটু গেড়ে বসে, অত্যন্ত রূঢ় স্বরে বল্লে:

"সে আমি—আমিই সেই উকি! মনে নেই আ কি বলেছিলুম?—বলেছিলুম না, এর একটা কথাও য কোন দিন কারুর কাছে প্রকাশ কর তা হ'লেই তো মৃত্যু!...সে প্রতিজ্ঞা তুমি ভঙ্গ করেছ, সে শপথ রাখ নি!...এই মুহূর্ত্তেই আমি তোমার জীবনান্ত ঘটা পারতুম কিন্তু কেবল এই ছেলেমেয়েদের জন্যে—ও জন্যেই তুমি বেঁচে গেলে!...এখন ওদের নিয়েই থাকো, ওদের মানুষ করাই হ'ল তোমার কাজ। কো দিন ওদের অনাদর যদি করেছ, আমি নিশ্চয়ই জান পারব, এবং তখন আর কিছুতেই তুমি রেহাই পাবে না আমার সঙ্গে তোমার এই শেষ!'...কথাগুলো বল বলতে শেষের দিকে উকির গলার চড়া স্বর ক্রমশঃ হাওয়ার করুণ কান্নার মত ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগ তারপর তার দেহ হঠাৎ শাদা কুয়াশার মত হয়ে জানা ফাঁক দিয়ে, ঘরের ধোঁয়া বেরুবার যে চোঙা ছিল তা ভেতর দিয়ে, চক্ষের নিমেষে মিশিয়ে গেল, মিলিয়ে গে বাইরের ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে।*

অন্তর ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। ডাক্তার বাবু এসে বল্লেন, 'ওকে ভাল ক'রে ঠাণ্ডা জলে নাইয়ে দাও'। অন্তর মা শুনে অবাক্ হয়ে বল্লেন, 'সে কি ডাক্তার বাবু, তা হ'লে তো রোগ, বলতে নেই, নিউমোনিয়ায় গিয়ে ঠেকবে!"

ডাক্তার বাবু হেসে বল্লেন, 'হোক্ না। আমিও তাই চাইছি। আমি যে নিউমোনিয়া রোগেরই বিশে অন্য ব্যারামের চিকিৎসা আমি বড় একটা না।'

শ্রীবীণাপাণি

*ল্যাফ্‌কাডিয়োর 'উকি-ওনা' নামক জাপানী গল্প হইতে।

বাদুড়-চরিত

শ্রীবেলা বসু, বি.এ

প্রায় সব নিয়মেরই মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম দেখা যায়। জীব-জগতেও এ রকম ব্যতিক্রমের অভাব নাই। স্তন্যপায়ী জীবেরা কখনও ডিম পাড়ে না, কিন্তু ডাক্‌মোল নামে এক প্রকার জীব আছে যাহারা স্তন্যপায়ী হইয়াও ডিম পাড়ে। স্তন্যপায়ী জীবেরা সাধারণতঃ জলে বাস করে না,—কিন্তু কুমির, শুশুক ইত্যাদিরা জলেই থাকে, নিঃশ্বাস লইবার জন্য মাঝে মাঝে জলের উপর দিয়া মুখ বাড়ায়। আবার স্তন্যপায়ী জীবেরা সাধারণতঃ ওড়ে না, কিন্তু বাদুড় স্তন্যপায়ী হইলেও আকাশে উড়িয়া বেড়ায়।

বাদুড় সম্বন্ধে একটি গল্প তোমরা অনেকেই হয়তো শুনিয়াছ। সেই যে এক বাদুড়,—না পাইল পশুদের দলে যোগ—না পাইল পাখীদের দলে। পশুরা বলিল, 'যা তুই পাখীদের কাছে,' পাখীরা বলিল, 'তুই তো পশু, সেখানেই তোর জায়গা।' শেষটায় বেচারা প্রাণিসমাজে একঘরে হইয়া রহিল।

কিন্তু উহা তো গেল গল্প, বাস্তবিক বাদুড় স্তন্যপায়ী হইয়াও উড়িতে শিখিল কেমন করিয়া! পণ্ডিতেরা বলেন, বাদুড়ের পূর্ব্বপুরুষেরা এককালে পা দিয়া ডাল বা গাছে চড়িত এবং পতঙ্গ ধরিত'। এই ভাবে চেষ্টা করিতে করিতে তাদের উড়িবার দিকে ঝোঁক চাপিল। এককাল যেমন এরোপ্লেন হইতে সৈন্যেরা ছাতার মত প্যারাসুটের সাহায্যে আকাশ হইতে নামে প্রথমে অনেকটা সেই ভাবেই তারা খানিকটা উঁচু হইতে নামিয়া আসিত। তার পর এইভাবে ক্রমাগত চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমশঃ তারা বেশ উড়িতে শিখিল। এখন তাহাদের ওড়াটাই দেখিতে সুন্দর, মাটির উপর চলাটা দেখিতে কদর্য্য। পাখীর মত কিন্তু তাহাদের ডানা নাই। এই ডানা পরিবর্ত্তে একটি চামড়া ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া বুড় আঙ্গুল বাদে পায়ের অপর চারিটি আঙ্গুল ঢাকিয়া হাঁ

বাদুড় মাথা নীচু করিয়া গাছে ঝুলিতেছে।

অবধি উঠিয়াছে। এই চামড়াটি তাহার বুকের পাশ দিয়াও গিয়াছে এবং আর একটি চামড়া হাঁটু হইতে আরম্ভ হইয়া তাহার দেহের নীচের দিক্ দিয়া গিয়া অপর

হাঁটুর সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই দুইটি চামড়ার সাহায্যে বাদুড় উড়িয়া বেড়ায়।

বাদুড়ের উড়িবার ধরণ এমন সুনিপুণ যে উহা একটা দেখিবার জিনিষ। ঘরের ভিতর আসিলে ঘরের কোন কিছুর সহিত উহাদের ধাক্কা লাগে না। ইহারা উড়িতে উড়িতে ডিগ্‌বাজী খাইতে পারে, নদী হইতে জল খাইতে পারে এবং পোকা-মাকড়ও ধরিতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে একটি ঘরে যদি আড়া-আড়ি ভাবে অনেকগুলি সুতা বাঁধা যায় এবং সেই ঘরে যদি একটি বাদুড়কে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সে সুতা না ছুঁইয়া ঘরময় উড়িয়া বেড়াইতে পারে। না ধাক্কা খাইয়া

'উড়ুক্কু শেয়াল' বা ফ্লাইং ফক্স
ইহারাও এক জাতের বাদুড়,—আকারে বেশ বড়। ভারতবর্ষ, মালয়, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ইহাদের দেখা যায়।

আঁকাবাঁকা পথ দিয়াও সে এইরূপে উড়িয়া বেড়াইতে পারে। ইহাদের বুক এবং ফুস্‌ফুস্ বড়, হৃৎপিণ্ড মজবুৎ—

এই তিনটি ইহাদের উড়িতে সাহায্য করে। ইহাদে[..] স্পর্শশক্তিও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এমন কি বায়ুর স্পর্শের সাহায্যে[..] তাহারা দূর হইতে বুঝিতে পারে কোথায়, কত দূরে কো[..] জিনিষ আছে। বাদুড়ের শরীরে নানা স্থানে অনেক[..] গুলি স্পর্শ-কেন্দ্র আছে। সেইগুলি চামড়ার উপর বিস্তৃ[..] থাকে। অবশ্য কোন কোন পণ্ডিত বলেন, ইহারা যখ[ন] উড়ে তখন একটি শব্দের সৃষ্টি হয়, এই শব্দটি বিভি[..] স্থানে বিভিন্ন রকমের হয়—মুক্ত বাতাসে এক রকম এব[ং] কোন কঠিন দ্রব্য নিকটে থাকিলে অন্য রকম। এ[ই] শব্দের সূক্ষ্ম তারতম্য তাহারা খুব সহজেই স্পর্শ-কেন্দ্রে[র] সাহায্যে অনুভব করিতে পারে। ইহাদের কানে[র] পাতায় এবং কোন কোন জাতীয় বাদুড়ের নাকের ডগার[..] খানিকটা চামড়া থলির মত থাকে। এই দুইটি চামড়[া] কীটেদের শুকের মত অনবরত নড়ে এবং তাহার দ্বা[রা] উহারা বায়ুর স্পন্দন ধরিতে পারে।

বাদুড়ের হাঁটু দুইটি পশ্চাৎ দিকে ফিরান, সে[ই] জন্য তাহাদের চলনভঙ্গী অতি কদর্য্য। ইহাদের পায়ে[র] জোরও কম, তাই প্রায় সব সময়ই আঙ্গুলের সাহায্যে গা[ছ] হইতে ঝুলিতে দেখা যায়। ইংরাজীতে একটি প্রবা[দ] আছে—'বাদুড়ের মত অন্ধ'। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাদে[র] দুইটি ছোট ছোট চোখ আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাদুড় যবদ্বীপে পাওয়া যায়। উহার[..] এক ডানা (?) হইতে অপর ডানা পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ ফু[ট] লম্বা হয়। বাদুড়েরা কেহ কেহ ফলভোজী, ইহাদে[র] প্রায় এসিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণমণ্ডলে দেখা যায়। কে[..] কেহ ফল ও পতঙ্গ উভয়ভোজী, কেহ কেহ মৎস্যভোজ[ী] এবং কেহ কেহ বা রক্তপায়ী। রক্তপায়ী বাদুড় দক্ষি[ণ] আমেরিকায় প্রচুর,—ঘোড়ার রক্ত ইহাদের অতি প্রি[য়] খাদ্য। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারউইন তাঁহার বই[..] লিখিয়াছেন, তিনি একবার একটি বাদুড়কে ঘোড়া[র] রক্ত খাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

শীতপ্রধান দেশে শীতকালে কোন কোন জাতীয় বাদু[ড়] কিছুই না খাইয়া গাছের কোটরে বা গির্জ্জার কো[..] বা ঐরূপ কোন নিভৃত স্থানে এক সঙ্গে অনেকগু[লি] জমা হইয়া শুইয়া থাকে। অপর বাদুড়েরা উড়িয়া গর[ম] দেশে চলিয়া যায়। বাদুড়ের সাধারণতঃ দুইটির বে[..]

[..]া হয় না। ধাড়ী পাখীরা এক একটি বাচ্চা লইয়া [অ]নেক সময় আকাশে উড়ে। একটি ভদ্রলোক একটি [বা]দুড়কে পোষ মানাইয়াছিলেন। এটি তাঁহার হাতে [উ]ড়িয়া আসিয়া বসিত, ঠোঁট হইতে মাংসখণ্ড লইত। কিন্তু বাদুড়েরা এত ভীরু ও বোকা যে তাহারা প্রায়ই পোষ মানে না। তা ছাড়া তাহাদের পায়ের লোম ও দুর্গন্ধের জন্য তাহাদিগকে আদর করাও তেমন আরাম-দায়ক নয়।

রাধামাধবের রত্নহার

শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দত্তজা ও চৌধুরী-সংবাদ

গঙ্গার জলস্রোতে পড়িয়াই ফকির জয়ন্তকে মুক্ত [কর]িয়া দিল। তার পর পা দিয়া জল কাটিতে কাটিতে [..]শলে নিজের বাঁধন খুলিয়া ফেলিতেও তার বেশী বেগ [পা]ইতে হইল না। হাত তো খোলাই ছিল, তা ছাড়া [..]ন্ত পাকা সাঁতারু সে। জয়ন্তও সাঁতারে কম পটু [..]। স্রোতের টানে গা ভাসাইয়া দিয়া অল্পক্ষণ পরেই [..]নে তীরে গিয়া উঠিল।

[..]খানিকটা সাদা বালি, এখানে-ওখানে কয়েকটা কাঁটা [..]গ, তার পরই বড় বড় ঝাউগাছের ঘন অরণ্য। [..]কাছি লোকালয় আছে বলিয়া মনে হইল না।

সেই ভিজা বালির উপর উভয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম [কর]ল। দীর্ঘ দিনের অত্যাচারে জয়ন্তের শরীর এমনিতেই [..]গ, তার উপর সাম্প্রতিক অভাবনীয় ঘটনার উত্তেজনায় [..]ও সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল—কি করিয়া সে এই দুঃসাহসিক পরীক্ষায় পার হইয়া আসিল তা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

আরও খানিকক্ষণ কাটিলে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ফকির মোটা গলায় প্রশ্ন করিল, "এখন শরীরটা একটু ভাল লাগছে? এবারে হাঁটতে পারবে তো ভাই?"

জয়ন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "দেখি, বোধ হয় পারব। কিন্তু এখন কোন্ দিকে যাবেন?"

"যেতে হবে তো অনেক দূর। তোমাকে বারদীঘিতে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে না দেওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি কই! কিন্তু এখনই তো আর সেদিকে রওনা হতে পারবে না। তা ছাড়া, এখন না হয় ফিরিঙ্গীরা ব্যাপারটা ধরতে পারে নি, রাত পোহালেই সমস্ত জানাজানি হয়ে যাবে। কয়েদখানা থেকে তুমি পালিয়েছ জানবার পর কি তাঁরা সহজে ক্ষান্ত হবে? চারদিক্ তোলপাড় ক'রে তোমাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে। কাজেই আমাদের ফিরতে হবে অনেক ঘোরা পথে—যেদিকে আমাদের যাবার কোন সম্ভাবনাই

তারা ভাবতে পারবে না। অবশ্যি তাতে সময় লাগবে বেশী, কিন্তু কি করা!"

"তা হলে এখন—"

"তাই ভাবছি। তুমি ক্রোশ দুই হাঁটতে পারবে তো? আমার কাঁধে ভর দিয়ে? ফিরিঙ্গীর চক্ থেকে আমরা খুব বেশী দূরে নেই, বারদীঘি যেতে হ'লে এখান থেকে উত্তর দিকে যেতে হয়, কিন্তু আমরা আপাততঃ যাব দক্ষিণে। শ্যামলাই নামে একটা ছোট গ্রামে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক থাকেন। ভারী ভাল লোক। আজ রাতটার মত তাঁরই ওখানে গিয়ে তো আশ্রয় নেওয়া যাক্, তারপর কাল সকালে ভেবে-চিন্তে যা হয় করা যাবে।"

দুই জন ধীরে ধীরে হাঁটিতে লাগিল। মাঝে কয়েক বার ফকির জয়ন্তকে কাঁধে লইয়া চলিবার প্রস্তাবও করিয়াছিল কিন্তু লাজুক জয়ন্ত তাহাতে রাজী হইল না।

শ্যামলাই পৌঁছিতে বেশ রাত হইয়া গেল। সমস্ত গাঁ তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। ফকির গিয়া একটি অনতিবৃহৎ অট্টালিকার সামনে দাঁড়াইয়া দ্বারে করাঘাত করিল। একটু পরেই ভিতরে পদশব্দ শোনা গেল এবং একজন বলিষ্ঠ লোক আলো লইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ফকিরকে দেখিয়াই কিন্তু তার মুখ বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল—"আপনি!"

ফকির হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, আমি,—ফকির সাহেব। দত্তজা জেগে আছেন? অনেক কথা আছে; চল, ভিতরে চল। এস জয়ন্ত!"

গৃহস্বামী দত্তজা মহাশয় তখনও শয্যা গ্রহণ করেন নাই। এত রাত্রে অপ্রত্যাশিত ভাবে সিক্তবেশ ফকির সাহেবকে দেখিয়া তিনিও কম বিস্মিত হন নাই। ফকির তাঁহাকে ইঙ্গিতে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইল। তারপর উভয়ে খানিকক্ষণ কি আলোচনা হইল।

তারপর সুরু হইল তোড়জোড় করিয়া রান্না। এবং বহুদিন পরে, জয়ন্ত তৃপ্তির সঙ্গে ভরপেট খাইয়া কোমল শয্যায় দেহ এলাইয়া দিল।

জয়ন্তের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেশ বেলা হইয়াছে। জানালার ফাঁক দিয়া এক ঝলক টাটকা রোদ তার মুখের উপর লুটোপুটি করিতেছে। এ রকম দৃশ্য বহুদিন তার চোখে পড়ে নাই। আরও খানিকক্ষণ শুইয়া সে এই মধুর আলস্যটুকু উপভোগ করিতে লাগিল।

একটু পরেই দরজা ঠেলিয়া, একজন বলিষ্ঠ ভদ্রলোক হাসিমুখে ঘরে ঢুকিলেন। "এই যে, ঘুম ভাঙ্গল বেশ বেশ। এইবার মুখটুখ ধুয়ে একটু জলটল খে নাও। তার পরই কিন্তু বেরোতে হবে। ঘোড়া-টো সব তৈরী। তোমার সঙ্গে আরও চার-পাঁচ জন যা যে! তাঁরাও সবাই তৈরী হয়ে আছেন।"

জয়ন্ত ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। প্রথমেই মুখ দিয়া প্রশ্ন বাহির হইল, "ফকির সাহেব?"

"ফকির সাহেব? তিনি তো ভোরে উঠেই চ গেলেন। অবশ্যি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার রকম ব্যবস্থাই তিনি ঠিক করে দিয়ে গেছেন। আ করি এবার আর কোন বিপদ হবে না। বল্লাম, ছে উঠুক, তার সঙ্গে দেখা ক'রে তার পরই না হয় যা তা তাঁর আর তর সইল না। আচ্ছা পাগলাটে লো যা হোক্!" বিমল হাসিতে ভদ্রলোকের মুখ ভ উঠিল।

চন্দনার জমিদার-বাড়ীর বিশ্রাম কক্ষ। আরও চৌধুরী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া চক্ষু বুজিয়া পরম আরা আলস্য-সুখ উপভোগ করিতেছে। পাশে হাতীর দাঁ নস্যদানী হইতে সুরভিত নস্য ক্ষণে ক্ষণে তার নাসার ঢুকিয়া আরামের আমেজটাকে যেন আরও দীর্ঘা করিয়া তুলিতেছে। অদূরে রাসবিহারী, শিবনাথ আরও দু'-একজন পারিষদ বসিয়া আছে, আর আছে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ব্যাকরণবাগীশ মহাশয়। চৌধুরী ও তার জ্ঞাতিগোত্রের কুশল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তিনি নিজ জ্ঞাতিগোত্রের কুশল-সমাচার সবে সুরু করিয়াছেন, রাসবিহারী অধৈর্য্য কণ্ঠে কহি "আরে থামাও তোমার বাজে বকুনি। তোমার আত্ম পরিজনের খবর জানবার জন্য চৌধুরী মশায়ের যেন ঘুম হচ্ছে না! কাজের কথা কিছু থাকলে বল।"

ব্যাকরণবাগীশ একটু ভড়কাইয়া গিয়া কহিলে "আমি আর কি বল্‌ব? চৌধুরী মশাই-ই তো আ ডেকে পাঠিয়েছেন।"

...নন্দ একবার হাই তুলিয়া একটু পাশ ফিরিল। চোখ ...য়া বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই খবর পাঠিয়েছিলাম ...। তা বাগীশ মশাই, আপনাকে তো আর একবার ...ঘি যেতে হচ্ছে।"

...রাসবিহারী বাধা দিয়া কহিল, "আবার! অত অপ-...র পরও?"

...নন্দ হাসিয়া কহিল, "আরে তুমি বড় রগ-চটা। ...মান আবার কিসের! মানী লোক কথার ঝোঁকে ...একটা কড়া কথা বলেছেন তো হয়েছে কি! গায়ে ...লেই অপমান—না মাখলেই নয়।"

..."কিন্তু—"

..."আর কিন্তু-ফিন্তু নেই। শুনুন বাগীশ মশাই! ...ক রায়ের ছেলেটাকে তো ফিরিঙ্গীরা ধরে নিয়ে গেছে। ...যে আর ছাড়ছে না। তাকে বাদের মধ্যেই ধরুন। ...এই ব্যাপারের পর রায় মশাইও যে বেশী দিন টিঁকে ...যেন—আর টিঁকে থাকলেও বিষয়-আশয় নিয়ে মাথা ...তে পারবেন তা মনে হয় না। শেষ পর্য্যন্ত ও জমি-...তাঁর মেয়ের কপালেই নাচছে। আপনি গিয়ে ...মশাইকে বুঝিয়ে বলবেন। এত বড় জমিদারীটা ...র পরে লুটে খাবে—তার চাইতে আমাদের কথাটা ...বে দেখুন। অত বড় আর একটা জমিদারী যারা ...য়ে আসছে তাদেরই হাতে ওঁরটারও ভার দেওয়াই ...বেচনার কাজ হবে না কি?"

..."কিন্তু ওঁর মেয়েটি,—শুনেছি বড্ড একরোখা আর ...নি মেজাজী। দেখলামও তাই। তার মত—"

..."আরে রেখে দিন। ছেলেমানুষ, তার আবার ...মত কি! বাপ-খুড়ো যা বলবে তাই সুড় সুড় করে ...নেবে। আপনি যান, আজই বেরিয়ে পড়ুন।"

..."না হলে—" রাসবিহারী যোগ করিল, "রায় ...কে এও বুঝিয়ে দিয়ে আসবে যে তিনি বড় শক্ত ...য়ায় ঘা দিয়েছেন—খোদ ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লাগতে ...ইন। তার ওপর যদি ঘরের শত্রু বাড়ান তা হ'লে—"

হ্যাঁ; তা হ'লে চন্দনাও তাঁর বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে হাত মেলাতে ইতস্ততঃ করবে না।"

"আঃ, রাসবিহারী!"—নন্দ মৃদু ভৎর্সনার সুরে কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া আবার কাৎ হইয়া শুইল।

ব্যাকরণবাগীশ ছাতা বগলে করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। খানিক ক্ষণের জন্য সকলেই চুপ; তার পর কথা কহিল শিবনাথ। কহিল, "ওদিকে চাঁদপালের খবর শুনেছেন? ইব্রাহিম খাঁকে তো ঘোল খাইয়ে ছাড়ছে!"

"কে ইব্রাহিম খাঁ?" তরুণ জমিদার প্রশ্ন করিল।

"সুবেদার;—এখন যিনি জাহাঙ্গীরনগরে নবাবের গদিতে বসেছেন। অবশ্যি বেশী দিন থাকবেন না, দিল্লী থেকে নতুন লোক এলেই গদি ছেড়ে দিতে হবে। তা যাই হোক্, চাঁদপাল এবার তাঁকে বড় ধাঁধায় ফেলেছে!" বলিয়া শিবনাথ চাঁদপাল-ঘটিত সমস্ত কাহিনী খুলিয়া বলিল।

"আরে, এ যে মস্ত খবর!"—রাসবিহারী সোৎসাহে চেঁচাইয়া উঠিল।

খবরটা বাস্তবিকই মস্ত, নন্দ চৌধুরী পর্য্যন্ত ঔৎসুক্য দেখাইয়া কহিল, "তাই নাকি! খুব বাহাদুর তো এই চাঁদপাল!"

রাসবিহারী কহিল, "আমার কথাটা উড়িয়ে দেবেন না চৌধুরী মশাই! আমাদের কাছে ও নবাবও যা ফিরিঙ্গীও তা। বরঞ্চ এই সুযোগে চাঁদপালের সঙ্গে খাতির জমিয়ে রাখতে পারলে সময়ে হয়তো বেশ কিছু গুছিয়ে নেওয়া যাবে। আপনি বললে চাঁদপালের কাছে —চাই কি আমি নিজেই গিয়ে কথাবার্ত্তা পাড়তে পারি। আর মৃগাঙ্ক রায়ের ওপর ফিরিঙ্গীরা যা খাপ্পা—তার বিরুদ্ধ দল জানলে ওদের কাছেও বেশ খাতির পাওয়া যাবে। কি বলুন?"

নন্দ চৌধুরীকে যেন আজ একটু চিন্তাগ্রস্ত মনে হইল। সে তখনই কোনও উত্তর না দিয়া এক টিপ নস্য নাকের মধ্যে গুঁজিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। (ক্রমশঃ)

তৃতীয় টেষ্ট্ ম্যাচ্

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম দুইটি ক্রিকেট্ টেষ্ট্ খেলার বিবরণ তোমাদের ইতিপূর্ব্বেই শুনাইয়াছি। এবার তৃতীয় টেষ্ট্ খেলার কথা শোন।

এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত মেল্‌বোর্ণ সহরে। এবারেও ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়কত্ব করেন হ্যামণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক হন ডন্ ব্র্যাডম্যান। উভয় দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের নাম নীচে দেওয়া হইল :

অষ্ট্রেলিয়া :—সহকারী অধিনায়ক—হ্যাসেট; ব্যাটস্‌ম্যান্—বার্ণেস, মরিস্, কিথ্, মিলার ও ম্যাক্‌কুল; বোলার—জন্‌সন্, লিণ্ডওয়াল্, ডুল্যাণ্ড ও টোসাক; উইকেট-রক্ষক—ট্যালন্।

ইংল্যাণ্ড :—সহকারী অধিনায়ক—ইয়ার্ড্‌লী; ব্যাটস্‌ম্যান—হাটন, ওয়াশ্‌ব্রুক্, ডেনিস্ কম্পটন্, এডরিচ্; বোলার—বেড্‌সার, রাইট্, ভোস্ ও ইকিন্; উইকেট-রক্ষক—ইভান্স।

ডন্ ব্র্যাড্‌ম্যান্ যখন ১লা জানুয়ারীর দ্বিপ্রহরে টসে জয়ী হইয়া ব্যাট্ করিতে নামিলেন তখন মেলবোর্ণের মাঠে ৮০,০০০ দর্শক অসীম আগ্রহের সহিত সে খেলা দেখিতে বসিয়া গিয়াছে।

প্রথম দিনের শেষে দেখা গেল, অষ্ট্রেলিয়ার ৬ জন সেরা সেরা ব্যাট্‌স্‌ম্যান্ মাত্র ২৫৫ রান্ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বার্ণেস ৪৫, মরিস্ ২১, ব্র্যাড্‌ম্যান্ ৭৯, হ্যাসেট্ ১২, জন্‌সন্ ০, ও মিলার ৩৩ রান্ করিয়া আউট হইয়াছেন। ইয়ার্ড্‌লী, বেড্‌সার ও রাইট্ প্রত্যেকে ২টি করিয়া উইকেট পাইয়াছেন।

দ্বিতীয় দিনে তরুণ খেলোয়াড় ম্যাক্‌কুল ১০৪ (নট আউট) করিয়া সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করি ম্যাক্‌কুলের টেষ্ট ম্যাচে ইহাই সর্ব্বপ্রথম শতাধিক রা দিনের শেষে দেখা গেল, অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস রানে শেষ হইয়াছে। পরবর্ত্তী খেলোয়াড়দের মধ্যে উঠিয়াছে—ট্যালনের ৩৫, লিণ্ডওয়ালের ৯, ডুল্যাণ্ডে এবং টোসাকের ৬। ইংল্যাণ্ডের ফিল্ডিং চম হইয়াছিল, কারণ, অতিরিক্ত রান্ হিসাবে অষ্ট্রেলিয়া ২ রান্ পাইয়াছে।

সেই দিনই শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় ইংল্যাণ্ড ব্যাটিং করি নামিল, এবং দিনের শেষে ১ উইকেটে ১৪৭ রান্ করি হাটন্ মাত্র ২ রান্ করিয়া লিণ্ডওয়ালের বলে আ হইয়া গেলেন।

তৃতীয় দিনে কিন্তু ইংল্যাণ্ড আশানুরূপ খেলি পারিল না, সকলে মিলিয়া ৩৫১ রানে আউট গেল। তার মধ্যে এড্‌রিচের ৮৯, ওয়াশ্‌ব্রুকের ইকিনের ৪৮, ইয়ার্ড্‌লীর ৬১ ও বেড্‌সারের নট্ আ থাকিয়া ২৭ রান্ লাভ উল্লেখযোগ্য। অধিনায়ক হ্যা মাত্র ৯ রান্ এবং ডেনিস্ কম্প্‌টন্ মাত্র ১১ রান করি দলকে নিরাশ করিলেন। ডুল্যাণ্ডের বোলিং হইয়াছিল, তিনি ৬৯ রান্ দিয়া চারটি উইকেট করেন। প্রথম ইনিংসে ইংল্যাণ্ড ১৪ রান্ পি পড়িল।

অষ্ট্রেলিয়া সেই দিনই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আ করিল ও দিনের শেষে কোনও উইকেট না হারাইয়া রান্ করিল। তার পর চতুর্থ ও পঞ্চম দিনেও

রাদিন ব্যাট্ করিয়া মোট ৫৩৬ রান্ তুলিয়া সকলে উট হইল। ইহার মধ্যে মরিসের ১৫৫, ফাষ্ট্ বোলার ণ্ডওয়ালের ১০০, উইকেট-রক্ষক ট্যালনের ৯২, অধি-য়ক ব্র্যাড্‌ম্যানের ৪৯, বার্ণেসের ৩২ ও ম্যাক্‌কুলের ৩ রান্ উল্লেখযোগ্য। হ্যাসেট্ ৯, জন্‌সন্ ০, ডুল্যাণ্ড ও টোসাক ২ রান্ করিয়া দলকে নিরাশ করিলেন। ার্ড্‌লি, রাইট্ ও বেড্‌সার—প্রত্যেকে তিনটি করিয়া কেট দখল করিলেন।

শেষ দিন। ইংল্যাণ্ডের হাতে তখনও ১০টি উইকেট্। ই দিন যদি তাহারা ৪৬০ রান্ তুলিতে পারে তাহা হই-ই তাহারা জয়ী হইতে পারিবে,—প্রথম ২টি পরাজয়ের ছুটা শোধ হইবে। এইরূপ অবস্থায় অপরূপ দৃঢ়তার হিত ইংল্যাণ্ড দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিল। বলা বহুল্য এই ইনিংসটি যে বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ বে তাহা তো সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু যখন হাটন্ রানে, এড্‌রিচ ১৩ রানে, ডেনিস্ কম্প্‌টন্ ১৪ রানে, কিন্ ৫ রানে এবং দলের অধিনায়ক হ্যামণ্ড মাত্র ২৬ নে আউট হইয়া গেলেন তখন সকলে এবারেও ইংল্যাণ্ডের পরাজয় এক রকম অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ধরিয়া লইল। কিন্তু ক্রিকেট খেলায় কিছুই বলা যায় না। ওয়াশ্‌ব্রুক্ ও ইয়ার্ড্‌লী সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যথাক্রমে ১১২ ও ৫৩ (নট আউট্) রান্ করিয়া ৭ উইকেটে ৩১০ রান্ তুলিয়া ফেলিলেন। এর পর ভাগ্য-দেবীও যেন ইংল্যাণ্ডের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পড়িলেন। শেষ সময়ে সুরু হইল বৃষ্টি এবং সেই বৃষ্টির জন্য ৪৬ মিনিট খেলা বন্ধ রাখিতে হইল। খেলা এই ভাবে খানিকক্ষণ বন্ধ না থাকিলে ইংল্যাণ্ড দল শেষ পর্য্যন্ত পরাজয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইত কিনা সন্দেহ। যাই হোক্, এবারে ইংল্যাণ্ডের মুখ কিছুটা রহিল। অমীমাংসিত ভাবেই তৃতীয় টেষ্ট শেষ হইল।

কিন্তু খেলার ফল অমীমাংসিত হইলেও এই ফলে এ বছরকার টেষ্ট্ ম্যাচের "রবার" বা সম্মান অষ্ট্রেলিয়া দলের দখলেই রহিয়া গেল। খেলার নিয়ম অনুসারে পরবর্ত্তী দুইটি টেষ্ট্ ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া দল পরাজিত হইলেও ইংল্যাণ্ড দল এবার আর "রবার" পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে না।

পট্‌লার পটুতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাঠায়েছে পট্‌লাকে পপোকাটিপেটেলে
জানিবারে কি করিয়া লুট করে পেটেলে।
পেনসেল্‌ভেনিয়ায় থাকি' এক পক্ষ
হবে পেনিসিলিনের ব্যবহারে দক্ষ।
সিনসি নাটিতে শিখে শূকরের চাষটা
যাবে চলে ধরে ফিলাডেল্‌ফিয়া বাস্‌টা
একেবারে টেক্‌সাস্ হয়ে ম্যারাকাইবো,
সহপাঠী সাথী রুজভেল্টের ভাইপো।

হবে তারে এই দেশে ফিরতে যে শীঘ্রি
হলিউডে সিনেমার লয়ে বড় ডিগ্রি।
সাইরেন সেস্টারে পড়ি সেরিকালচার,
সাস্‌কুহানায় হবে লাইসেন্সী সালসার।
আড্ডিস্ আব্বায় টাটুইং চর্চ্চা
করবে সে, যদি নাহি বেশী হয় খরচা।
যদি পরিকল্পনা নাহি যায় ভেস্তে
বড়দিন কাটাবে সে আসি বুডাপেস্তে।
প্রতিভাটা আছে তার, ছেলে খেলো নয় তো,
লণ্ডন লণ্ড্রির ফেলো হবে হয় তো।
বন্ধুর আবদার না রাখিলে ত্রাণ কি?

যেতে হবে তারে কিলিকেনী কিলিক্রাঙ্কি।
সেথা থেকে যদি পায় ইতালীয় সঙ্গী
রাত্রিটা কাটাবে সে গিয়ে মিসোলঙ্গী।
মেলবোর্ণ মেল ধরে খাসা হবে যাওয়া হে,
হংকং বামে রেখে হনলুলু হাওয়াইয়ে।
অলসেতে কাটাবে না একটাও দিন তো,
ম্যানিলার টোবাকোর হতে হবে ডীন্ তো।
সেথা থেকে আসবে সে ফিরে বুকে বাঙলার
রঞ্জন শিল্পের রঙ্গের র‍্যাঙলার।
আন্‌বে সে দেশ দেশ থেকে যশ জয় গো,
ব্যাবেলের লরিয়েট, নোবেলের নয়কো।

স্মৃতির পটে

আমি যখন ছোট ছিলাম

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মানুষ অনেক সময় বন্ধুজনের অনুরোধ এড়াতে না পেরে এমন সব কাজ করে ফেলে যে কাজটা তাধ নিজের মনের সঙ্গেও খাপ খায় না, কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে। তোমাদের 'রামধনু'-সম্পাদক ক্ষিতীন বাবুর একান্ত অনুরোধে আমার জীবনের সেই ষাট বছর আগেকার ছেলেবেলার কথা তোমাদের শোনাবার জন্য লিখছি। জানি না, সেকালের কথা তোমাদের একালের ছোটদের কেমন লাগবে! তোমরা আজকাল বায়স্কোপে ছবি দেখে থাক,—এও সে রকম স্মৃতির পর্দ্দার উপর একে একে এসে দেখা দিচ্ছে,—কত খেলাধূলা, দুষ্টুমি, সঙ্গী জনের কথা! মনে হয়ে আপনা আপনি হাসি পায়, শোকের করুণ স্মৃতি মনে পড়ে চোখ দু'টি হয় সজল।

আমার জন্ম হয়েছিল ষাট বছরেরও তিন চার বছর আগে। যে গ্রামে জন্মেছিলাম, আমার সেই জন্মভূমির নাম মূলচর, বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। আমাদের গ্রামের অবস্থানটি অতি সুন্দর। ছোট এক নদীর পারে,—নদীর প্রকৃত নাম ব্রহ্মপুত্র। পুরানো মানচি... লেখা আছে ব্রহ্মপুত্রের পুরানো খাত (ওল্ড বেড্ অ... ব্রহ্মপুত্র)। নদীটি উত্তর দক্ষিণে বয়ে চলে দক্ষিণে মিশেছে পদ্মার সঙ্গে, আর উত্তর দিকে গিয়ে মিশেছে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার কাছাকাছি ধলেশ্বরীর সঙ্গে।

আমার ছেলেবেলা সব চেয়ে আকর্ষণীয় ছিল রাজাবাড়ীর মঠ। এই মঠটি পদ্মা নদী হ'তে তখন তিন চার মাইল দূরে ছিল। কিশোর বয়সে যখন বিদে... থেকে আসতাম তখন দূর হ'তেই মঠের চূড়া আমাদে... আকর্ষণ করত। তার প্রতিচ্ছবি পদ্মার সাদা ঘোলা... জলে পড়ে নেচে বেড়াত। এ মঠটি কেদার রায়—বাংলা... স্বাধীন ভূঁইয়া—যিনি বার বার মোগলের সঙ্গে লড়াই করে... ছিলেন, তিনি তাঁর মায়ের চিতার উপর তৈরী করে... ছিলেন। এ ধরণের মঠ বাংলায় এখন আর দেখা যা... না। পদ্মা এ মঠটিকে তার বুকে টেনে নিয়েছে। ...র কথা এখন শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ই বেঁচে ...কবে।

এই রাজাবাড়ী গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটি প্রশস্ত খাল ...য়ে গিশেছিল দূরে পদ্মার বুকে। খালের পাড়ে ধনী ...সায়ীদের বড় বড় দালান কোঠা ও বাড়ী ছিল। দুই ...ড়ে ছিল বাঁশের ঝাড়, বড় বড় সব গাছ আর জনপূর্ণ ...র পর পল্লী। এই রাজাবাড়ী খালের পারে—থানার ...শে প্রকাণ্ড একটা বট গাছের নীচে বিজয়া দশমীর দিন ...া বসত। নানা গ্রাম থেকে ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা ...জিয়ে আসতেন জেলে ছাঁদি নৌকার উপর কিংবা ...লোয়ারী নৌকায়—দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি। কত ...না, কত লোকজন, পুরুষ, বালক ও নারীর কলরবে ...র তীর ও নদীর বুকে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ...ত। কোন নৌকাতে চল্‌ত কবির গান, কোন নৌকাতে ...ত জলসা। সে ছিল এক আশ্চর্য্য উৎসাহ ও আনন্দের ...। এখন সে সব কথা স্মরণ করলে স্বপ্ন মনে হয়। ...রা সব দল বেঁধে জেলে নৌকা ভাড়া করে গুরুজন ও ...া প্রতিবেশীদের সঙ্গে যেতাম সেই বিসর্জ্জন দেখতে। ...র পর বাড়ী এসে গুরুজনদের প্রণাম ও আলিঙ্গনের ...া পেতাম জীবনে এক নবীন প্রেরণা।

আমাদের বাড়ী ছিল নদী হতে অল্প দূরে—একটা ঘন-...লগ্ন আম-বাগানের কাছে পুকুর-পাড়ে। বৈশাখ ও ...ষ্ঠ মাসে 'ডুলি' (সুপারি গাছের খসে পড়া পাতার ...শ দিয়ে তৈরী থলের মত) নিয়ে আম কুড়াতে ...তাম। আম কুড়াবার প্রতিযোগিতা লেগে যেত, সেই ...ন্ ভোরে কাক-কোকিল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে ...তুম। আর দুপুরে—নূন ও ছুরি হাতে ক'রে, কাঁচা ...ম খেতুম লুকিয়ে। কি উৎসাহ ছিল ঐ সবে! তখন-...র দিনে লোকে নিজ নিজ বাগান থেকে ফল পেড়ে ...ন সুখীই হতেন। এ ভাবে পাড়ার বাগানে বাগানে ...ছি কালোজাম, গোলাপজাম, আম, কাঁঠাল, বেত ফল, ...ত কি!

...আমার বাবা-মা বিদেশে থাকতেন বলে আমার বড় ... আমি ও আমার এক মামা দিদিমার কাছে বাড়ী ...তাম। আমাদের গ্রামে ছিল একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুল। ...র প্রথম পড়া আরম্ভ হয় সেখানে। আমার দাদা ও মামা পড়তেন—পাশের গ্রাম কামারপাড়ার মধ্য ইংরেজী স্কুলে (M. E. School)। কামারপাড়া আমাদের গ্রাম হতে ছিল প্রায় এক মাইল দূর। কাজেই ছ'বছরের ছোট ছেলেকে দিদিমা অত দূরে যেতে দিতেন না।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

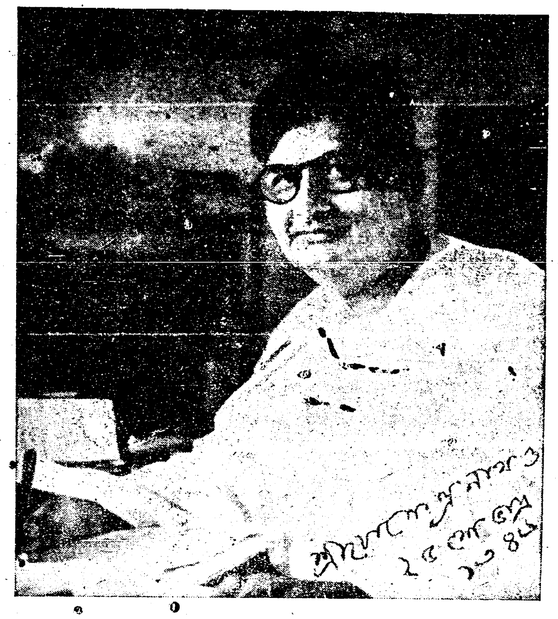

সেকালে শ্রীপঞ্চমীর দিন হাতে খড়ি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। আমারও হাতে খড়ি পাঁচ বছর বয়সের সময় দেওয়া হয়। আমাকে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন সেকালের বিক্রমপুরের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, আমার মাতামহ বংশের 'গুরু—পণ্ডিত কালীশচন্দ্র তর্কালঙ্কার। তাঁর বাড়ী ছিল বিক্রমপুর আকিয়াধল গ্রামে। ঐ গ্রামে অনেক ধনী সন্তানের বাস ছিল। একটী পঞ্চমুণ্ডীর উপর স্থাপিত শিবমন্দির ছিল। সেই শিবমন্দিরটি পদ্মার ভাঙ্গনে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়েছে। পণ্ডিত মশায় আমার হাতে খড়ি দিয়ে মাকে বলেছিলেন—তোমার ছেলে খুব খ্যাতিমান্ হবে। তাঁর ভবিষ্যৎ-বাণী যে কতটা সত্য হয়েছে তা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছো!

সকাল ও সন্ধ্যায় নদীর পাড়ে বেড়ানো ছিল আমার

অভ্যাস। দেখতে পেতাম নদীর পরপারের তেপান্তরের মাঠের পূর্ব্বপ্রান্ত—সামনের গ্রামের উপর দিয়ে সূর্য্য উঠছেন। কি বিরাট তার মূর্ত্তি! দেখতে দেখতে ক্ষেত, গ্রাম, নদীর জলে সোনা ছড়িয়ে পড়ত! দেখতে পেতাম মাঠে বাঁধা জেলে-ডিঙ্গিগুলি ঢেউয়ের সঙ্গে নাচছে; দেখতে পেতাম—জেলেরা নদীর বুকে বেড়া জাল ফেলে মাছ ধরছে! দেখতে পেতাম গহনার নৌকার মাঝিরা—'মুন্সীগঞ্জ! মুন্সীগঞ্জ!' বলে যাত্রীদের আহ্বান করছে! মহকুমায় যাঁরা মোকদ্দমা করতে যেতেন, ঢাকা সহরে যাঁরা পড়াশুনা করতে যেতেন—সেকালে এই দ্রুতগামী গহনার নৌকাগুলো ছিল তাঁদের যাওয়ার সম্বল।

রাজাবাড়ীর মঠ

সুপারি, নারিকেল, আম, বাঁশের ঝাড় প্রভৃতিতে ঘেরা ছিল আমাদের বাড়ীখানি। ঘরগুলি ছিল খড় বা ছনের ছাউনি, উঁচু ভিটা, মূলি বাঁশের নানা কারুকার্য্য-খচিত সুন্দর বেড়া। মনে পড়ে প্রতি দিন সন্ধ্যায় অক্লান্তকর্ম্মী দিদিমা যখন সন্ধ্যায় মাটির প্রদীপ জালিয়ে মৃগচর্ম্মের উপর জপের মালা নিয়ে বসতেন, প্রদী... চঞ্চল ছায়া নেচে বেড়াত; নাম মাত্র বই নিয়ে তি... জনে বসতাম। গ্রাম হয়ে যেত, সেই সন্ধ্যায়ই নি... শোনা যেত শুধু শিয়ালের হুক্কা হুয়া রব আর মাঝে মা... কুকুরের বিকট চীৎকার। তখন কত আশঙ্কা, কত কল্পনা... না মনে আসত! আমার দিদিমা মালা জপা শেষ ক... মালাখানি কপালে ছুঁইয়ে থলের ভিতর সযত্নে তা... বন্দী করে রেখে আমাদের বিছানার পাশে বসে বলা শু... করতেন অফুরন্ত রূপকথা, ছড়া ও হেঁয়ালি! সম... রামায়ণখানি—কাণ্ডের পর কাণ্ড, পদ্মপুরাণের সেই মনসা... গান, মহাভারতের নলদময়ন্তী, সাবিত্রীর উপাখ্যা... কত কি সব! কি মধুর সুরেই না গান করে যেতে... আমরা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম—তাঁর সুরে... গুঞ্জরণ নিস্তব্ধ ঘরের চারিদিকে নেচে ছুটে বেড়া... মনে পড়ে তাঁর মুখে শোনা অফুরন্ত রূপকথা। ... মধুর সুরে হাত নেড়ে মুখভঙ্গী করেই না বলে যেতে... তাঁর বলার মধ্যে ছিল একটা অপূর্ব্ব ভঙ্গী! চো... উপর ভেসে উঠত, 'সখী সোনার' কথা, পাষাণপুরী... কাহিনী, রাজপুত্র কোটালপুত্রের কথা! দিদিমার মু... সেই গল্পগুলির সঙ্গে এখন রূপকথায় বৈজ্ঞানিক ... আলোচনা করতে গিয়ে দেখতে পাই—ছেলেবেলাক... শোনা গল্পের সঙ্গে এই সবের রয়েছে একটা যোগসূ... ছেলে ভুলানো ছড়ার ছিলেন তিনি অপরূপ ভাণ্ডার... আজ মনে হয়, তখন যদি সে সকলের মূল্য বুঝতে পা... তাম, লিখে রাখবার মত বিদ্যেবুদ্ধি থাকত, তবে সে ... এক আশ্চর্য্য অবদান! কিন্তু তখন কতই বা বয়স ছি...

আমাদের গ্রামে রায়বাহাদুর অমিয়কুমার ... ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত ডেপুটি। তাঁর বা... নাটমন্দিরে, দুর্গামণ্ডপে আর বৈঠকখানায় বসত আমা... স্কুল। সবে নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আমা... গ্রামবাসী পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য্য এই ছাত্র... স্কুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমার জ্যেষ্ঠ মা... (মায়ের জ্যেঠতুত ভাই) বৈকুণ্ঠকুমার সেন ছিলেন দ্বি... শিক্ষক। তিনি ও তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় দু'জনে ছি... ছাত্রবৃত্তি পাশ। আমার মাতুল মহাশয় কোন প... উত্তর না দিতে পারলে যে রামচিমটি কাটতেন—...

...ড়ার উপরকার চামড়া টেনে এমন কৌশলে কিছুক্ষণ ...মোচড় দিয়ে ছেড়ে দিতেন যে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ...ড়ত। তিনি অঙ্ক কষাতেন। অঙ্কে ছিলাম মহাপণ্ডিত, ...র ভয়ে ভয়ে তাঁর পড়া না শিখে, পারতাম না ঐ রাম-...মটির ভয়ে। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় কথায় কথায় লাল ...লাকে সরু বেত চালাতেন সপাসপ পিঠে ও গায়ে। ... বেতখানা তিনি রোজ বাড়ী থেকে সঙ্গে করে ...আনতেন। এটি আমাদের শাসন করবার এবং তাঁর ...চলবার ছিল নিত্য সঙ্গী।

কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী স্বর্ণময়ীর দানে স্কুলের জন্য যে বোর্ডটি কেনা হয়েছিল সে বোর্ডটি ...নও আছে। এখনও বাড়ী গিয়ে দেখতে পাই সে ...বোর্ডটি আছে, কিন্তু কোথায় গেলেন সেকালের ছাত্রের ...ল আর শিক্ষকেরা সব! সেই ঘর-বাড়ী, সেই পরি-...ত মুখ এখন গ্রামে আর দেখতে পাই না।

... আমরা হিন্দু, মুসলমান ছেলেরা এক সঙ্গে লেখাপড়া ...তাম। শুভঙ্করীর আর্য্যা, ধারাপাত, নামতা সুর করে পড়া ...ত। কড়াকিয়া পড়ার ছিল ব্যবস্থা ছুটীর আগে। একজন ...দার পড়ুয়া সুর করে পড়ত আর আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার ...রের অনুকরণ করে বলে যেতাম। এ সর্দ্দারির ভারটা ...আমার উপরই পড়ত বেশীর ভাগ। মরেস্ স্পেলিং বুক ...ছিল ইংরেজী শিক্ষার প্রথম সোপান। মনে পড়ে নিম্ন ...প্রাথমিক শ্রেণীতে যখন উঠলাম, তখন আমার বয়স সাত ...বৎসরের বেশী হবে না। তখন আমাদের পাঠ্য বই ছিল ... 'কবিতামালা'—বিখ্যাত ৺দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ...লিত। গদ্য সাহিত্যের বই ছিল চারুপাঠ প্রথম ভাগ—...অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা। যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ...ল শরীরপালন ছিল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বই। অঙ্কের বই ...গণিতাঙ্কুর', এই সব। আমরা স্লেট, পেন্সিল নিয়ে ...লে যেতাম। বালি কাগজে লিখতাম। সে সময়ে ...লি কাগজেরই ছিল প্রচলন। সাদা ফুলস্কেপ কাগজ ...ল দুর্ঘট। একবার আমাদের পাশের গ্রামের এক ...লোক কলকাতা থেকে কয়েক রিম ফুলস্কেপ কাগজ ...এলেন। অনেক বলে কয়ে দিদিমার কাছ থেকে ...সা চেয়ে এক দিস্তা কাগজ কিনে নিয়ে এলাম। দেখে ... আনন্দ! কাগজ নাড়াচাড়া করে বললেন দিদিমা, "এংরাজের সব কাজই অদ্ভুত—দুধের মত সাদা কাগজ!" একজন বৃদ্ধা দেখে বললেন, "হবে না? দুধে ভিজিয়ে তবে তো কাগজ তৈরী করা হয়!"

আমাদের সময়ে বাড়ীতে লিখবার জন্য কালি তৈরী করতেন বৃদ্ধারা। তাম্রের পাত্রে। বলা হ'ত তাম্রকুণ্ড। তাম্রকুণ্ডে জল দিয়ে হরিতকি, বহেড়া আরও কি সব মিশিয়ে। কি চমৎকার হ'ত সে কালি। লিখলে পর চক্ চক্ করত! আমরা কিছু বালি ফেলে কালি শুকোতাম। ব্লটিং কাগজ ক্বচিৎ দেখতে পেয়েছি গ্রামে কারো কাছে। ব্লটিং কাগজ একবার বাবা-মা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাকে বলা হ'ত 'চোষ-কাগজ'।

স্কুলে আমার ভাল ছেলে বলে যেমন নাম ছিল তেমনি মিথ্যে কথা বলি নে বলে আমার একটা খুব সুনাম ছিল। পণ্ডিত মশায় আদর করে বলতেন ভৃগুরাম! ছেলেরা খেলতে গিয়ে ঝগড়া করে যখন মীমাংসার জন্য ব্যাকুল হ'ত তখন আমাকেই করতে হ'ত দু' পক্ষের মীমাংসা। তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে—কেউ কোন প্রতিবাদ না করে আমার মীমাংসা তারা বিনা দ্বিধায় মেনে নিত! আজ ভাবি, আমি সেই সত্য... বিশ্বাসকে কোথায়, কেমন করে হারিয়ে ফেললাম!

বলতে ভুলে গেছি—সেকালে আমাদের দু'খানি ইতিহাস পাঠ্য ছিল একখানার নাম ছিল—"শিশুরঞ্জন ভারত ইতিহাস"। বইখানা লিখেছিলেন সেকালের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়। সে ইতি-হাসের ভাষা ছিল অতি মিষ্টি। গল্পের মত করে তিনি ইতিহাস লিখেছিলেন। আমরা আর একখানি ইতিহাস পড়তাম—"বাঙ্গালার ইতিহাস"—রাজকৃষ্ণ মুখো-পাধ্যায়ের লেখা। চমৎকার বই। আমি ইতিহাস খুবই ভালবাসতাম। আমি যখন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে ইতিহাস থেকে মুখস্থ বলে যেতাম, পণ্ডিত মশায়েরা এবং ছাত্রেরা সকলে চুপ করে শুনত—এমনি নাকি ছিল আমার মধুর কণ্ঠ! এখন বাঙ্গালাদেশের স্কুলে কেন বাঙ্গালার ইতিহাস পড়ানো হয় না—সে কথা ভেবে আশ্চর্য্য হই।

আমার কয়েকটি মুসলমান সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। এক-জনের নাম ছিল আবদুল রহমান। আর একজনের

নাম ছিল জবর আলি। কিছু দিন হয় তাঁরা পরপারে চলে গিয়েছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বাড়ী গেলে রহমান ও জবর এসে ছেলেবেলার গল্প করত। কি যে আনন্দ পেতাম! ছেলেবেলা এই দুই বন্ধু আমার জন্য ক্ষেতের শশা, ফুটি, তরমুজ, শাকসব্জি, আম, কলা, কুল বড়ই (বদরিকা শব্দের অপভ্রংশ) নিয়ে এসে উপহার দিত। এখনও তাদের পুত্র ও পৌত্রেরা বাড়ী গেলে আমি এসেছি জানতে পারলে এসে দেখা করে,—ঘরের ও দেশের কথা বলে তৃপ্তি পায়। কত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে! হিন্দু-মুসলমান সে সময়ে ছিল পরস্পরের আত্মীয় ও বন্ধু।

সেকালে স্কুল পরিদর্শনে আসতেন সাব্‌-ইনস্‌পেকটার, কখনো ডেপুটি ইনস্‌পেক্টার বা ইনস্‌পেক্টার সাহেব। ইনস্‌পেক্টার সাহেব কদাচিৎ আসতেন। আমাদের ক্লাসে বাঙ্গালা সাহিত্য পড়াতেন তৃতীয় পণ্ডিত মশায়। তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছিলেন, সাহিত্যে সুপণ্ডিত বলে গৌরবও করতেন। একবার সেকালের দুর্দ্দান্ত সাব্‌-ইনস্‌পেক্টার বৈকুণ্ঠনাথ সেন এলেন আমাদের স্কুল দেখতে। হায়রে দুর্দ্দৈব! তিনি আমাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাখ্যা কর—

'যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর
নিশীথে প্রদীপ ভাতি।'

তৃতীয় পণ্ডিত মশায় একপাশে দাঁড়িয়ে আমার ব্যাখ্যা শুনছিলেন। আমি মাথা উঁচু করে বললাম—"যে জন দিবসে—দিনের বেলা, মনের হরষে মানে আনন্দে মোমের বাতি জ্বালায়—আশুগৃহে তার, রান্নাঘরে তার—পাকের ঘরে তার, দেখিবে না আর 'নিশীথে'—রাত্রিকালে, প্রদীপের আলোতে "ভাতি"—অর্থাৎ ভাত। কিনা—রাত্রিকালে প্রদীপের আলোতে সে ভাত খাইতে পারিবে না!"

ইনস্‌পেক্টার বললেন—"খোকা, তুমি এমন সুন্দর ব্যাখ্যা কার কাছে শিখলে?" আমি গৌরবের সঙ্গে বললাম, "কেন, আমাদের পণ্ডিত মশায়ের কাছে।" পণ্ডিত মহাশয় আনন্দে পরিদর্শকের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বৈকুণ্ঠ বাবু বললেন, "পণ্ডিত মশাই, এবার একটা বড় স্কুলে কাজের সন্ধান করুন। এখানে, এতটুকু স্কুলে আপনাকে মানায় না!"*

পণ্ডিত মশায় কি বুঝলেন জানি না। কিছুদিন পরে তাঁকে আর স্কুলের ত্রিসীমানায়ও দেখতে পেলাম না।

আমাদের প্রধান শিক্ষক কামাখ্যা পণ্ডিত মশায় ছিলেন কবি ও লেখক। তাঁর বক্তৃতা-শক্তিও ছিল বেশ। বাংলা সাহিত্যে ছিল অসাধারণ অধিকার। চমৎকার পড়াতেন। সংস্কৃত বেশ ভাল জানতেন। সঙ্গীত-নৈপুণ্যও ছিল তাঁর উত্তম। মনে পড়ে নদীর পাড়ে ঘাসের উপর বসে যখন গলা ছেড়ে গাইতেন—

'এই কিরে সে আর্য্যস্থান,
এ কি হল তার!'

তখন নদীর তীরে তীরে সুরের ঝঙ্কার খেলে যেত। নৌকারোহীরা ছইয়ের ভিতর থেকে বেধ হয়ে এসে একবার গায়কের দিকে চেয়ে দেখতেন। নদীর পরপারে প্রতিধ্বনিত হ'ত সে সুর! এই সেদিন নব্বই বৎসর বয়সে পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যু হয়েছে।

আজ এই পর্য্যন্তই থাক্, কেমন?

* এই কাহিনীটি আমি মৎপ্রণীত "পথে বিপথে" উপন্যাসে অশান্তের মুখ দিয়ে বলেছি।

ভুল

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

বহু বছর আগের কথা; অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজেরা যখন এ দেশে কায়েমী হইয়া বসিয়াছে। তখন দু'-এক জায়গায় সবে স্টীমারের চলন হইয়াছে, কিন্তু এখনকার মত এত সহজ হয় নাই।

প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার রাঘবেন্দ্রনারায়ণ অপরাহ্নে অন্দর-মহলে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "শ্যামলী!"

শ্যামলী তাঁহার একমাত্র আদরিণী কন্যা। "যাই বাবা", বলিয়া সে ছুটিয়া আসিল।

"এই দেখ্‌ চিঠি। বিজয় আসছে যে!"—বিজয় তাঁহার জামাই। বিবাহের পর এই তার দ্বিতীয় বার শ্বশুর-গৃহে আগমন।

শ্যামলী লজ্জা পাইয়া দৌড়াইয়া পালাইল। "পাগল!" বলিয়া রাঘবেন্দ্র হাসিতে হাসিতে পুনরায় বহির্বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রথমে তিনি কি সব আলাপ করিলেন প্রধান নায়েব রাজ্যেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে। তার পর সেখান হইতেই প্রধান সর্দ্দার আমেরালী মণ্ডলকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

পঞ্চাশের উপর বয়স হইয়াছে আমেরালীর। বেঁটে, পেশীযুক্ত চেহারায় এখনো যেন অতীত তারুণ্যের আভা দেয়। গায়ের রঙ্‌ আবলুষ কালো, কিন্তু বাব্‌রি চুলগুলা, পাকিয়া সব সাদা হইয়া গিয়াছে। গালে গালপাট্টা আর ঊর্দ্ধমুখী উঁচানো গোঁফে সর্দারীর মুরুব্বিয়ানা প্রকাশ পাইতেছে। মুখ দেখিয়া মনে হয়, লোকটি যে সে নয়। আমেরালী সেলামী চালে এক কুর্ণিশ করিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

রাঘবেন্দ্র কহিলেন: "কাল ত' নতুন জামাই বাবাজী আসছে খাঁ সাহেব,...হ্যাঁ, বলতে গেলে প্রথম বার, তা হলে অভ্যর্থনাটা কেমন হয় বল ত'?"

আমেরালী দ্বিতীয় বার কুর্ণিশ করিয়া একটু হাসিয়া কহিল: "কর্ত্তার হুকুমের চাকর আমরা,...যেমন আজ্ঞা হয়।"

"তা বটে, তা বটে," বলিয়া রাঘবেন্দ্র জমিদারোচিত হাস্য করিলেন। "যেমন আজ্ঞা হয়! বেশ, বেশ, সে ভার না-হয় আমিই নিলাম, কি বল? দেখো, কিছু ত্রুটী-টুটি হ'লে কর্ত্তাকে কিছু কিন্তু বলতে পারে না, সে আগেই জানিয়ে রাখছি, বুঝলে?"

"আমাদের কর্ত্তার ত্রুটী হয় না।" আমেরালী সবিনয়ে জানাইল।

"হয় হে, হয়।" রাঘবেন্দ্র কহিলেন: "মানুষ মাত্রেরই ত্রুটী হয়! ওটা স্বয়ং বিধাতার খেয়াল বলেই ধরে রাখ খাঁ সাহেব—। জান ত' মানুষ বড় দুর্ব্বল। থাক্‌, যা বলছিলাম শোন। বাবাজী আসবেন স্টীমারে। আজ-কালকার ছেলে ছোকরা, সেকেলে বজরা আর পছন্দ হয় না! কিন্তু সবটা তো আর স্টীমার আসবে না—কাজেই বাকি পথটা—"

"হুজুরের আদেশ পেলে বাবরা মাল্লায় পাল্‌সীখানা জামাইবাবুর জন্য যেতে পারে।" আমেরালী কহিল।

"তার চেয়ে হেঁটে আসাই ভাল নয় কি?" বলিয়া একটু হাসিয়া লইলেন রাঘবেন্দ্র: "বলি জামাইবাবুরা কি ধীরে ধীরে চলেন খাঁ সাহেব? ওঁদের দেহ-মন সবই চলে যে উড়ে,...বুঝলে না! এখন তোমার কি ওই পান্‌সি গাধা বোটের কর্ম্ম?..."

সুতরাং আমেরালী মণ্ডলকে আর কিছু বলিবার দরকার হইল না। পরদিন ভোর না হইতেই কুড়ি মাল্লার একখানা ছিপ দূরবর্ত্তী স্টীমার-ঘাটের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

এদিকে রাঘবেন্দ্রনারায়ণ এক বিরাট ফর্দ্দ করিলেন। তিনি বিপত্নীক। সুতরাং যাহা করিবার নিজের বুদ্ধিতেই করিতে হইবে। অবশ্য নায়েব রাজ্যেশ্বর চক্রবর্ত্তী আছেন দক্ষিণ হস্ত, এবং সর্ব্বদিকে বিচক্ষণ ব্যক্তি। কিছুটা বুদ্ধি তিনিও যোগাইয়া থাকেন।

নিমন্ত্রণ যাহাদের করিবার দরকার, হইয়া গেল। নূতন জামাইয়ের আসিতে আসিতে বড় জোর সন্ধ্যা। সুতরাং খাওয়া হইবে রাত্রিতে।

বিকালের দিকে স্টীমার-ঘাট হইতে ছিপখানা ফিরিয়া আসিল। বিজয় আসে নাই। স্টীমার ঠিক মতই

আসিয়াছে, এবং স্টীমারে জামাইবাবুর খোঁজও লওয়া হইয়াছে। কিন্তু না, বিজয় তাহার মধ্যে নাই। হয়তো কোন কারণে যাত্রা স্থগিত রাখিয়াছে; কিন্তু কেন?

শুনিয়া শ্যামলীর মনটা কিছু খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এমন হইবার ত' কথা নয়! কথা দিয়া কথার খেলাপ করিবার ছেলে ত' বিজয় নয়! অত্যন্ত একরোখা সে। তবে কি পথে কোন বিপদ্-আপদ্ ঘটিল? আর এদিকে যে এত সব আয়োজন, আমন্ত্রণ! লোকে বলিবে কি!

রাঘবেন্দ্রের মাল্লারা যখন স্টীমারে খোঁজ করে তখন বিজয় একটা কেবিনে অঘোরে ঘুমাইয়া। ঘুমের দোষ কিছু ছিল না, কারণ সমস্ত রাত্রি সেটি একেবারে হয় নাই। যেটুকু আসিয়াছে সে সকালের দিকে। অথচ এই সকালেই বিজয়ের গন্তব্য ষ্টেসনে নামবার কথা। নিজেও এ কথা সে জানে; তবে কেন যে সে ঘুমাইয়া পড়িল, এবং রাঘবেন্দ্রের মাঝি-মাল্লারাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না, সে কেবল ভগবান্ই জানেন।

একটা হৈ-হল্লাতে বিজয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখে, বেলা বেশ হইয়াছে, আর কি একটা ষ্টেসনে স্টীমার ভিড়িয়াছে। খোঁজ লইয়া জানিল তাহার গন্তব্য ষ্টেসন মাত্র ঘণ্টা খানেক হইল ছাড়িয়া আসিয়াছে। শুনিয়া প্রথমে সে বিস্মিত হইল, তার পর আর চিন্তা না করিয়া তাড়াতাড়ি সেই ষ্টেসনেই নামিয়া পড়িল। কিন্তু মুস্কিল হইল—কোন নৌকার মাঝি এত দূরের পথ যাইতে স্বীকার করে না। আর আজকাল এদিকে পথে যা চোর-ডাকাতের উপদ্রব!

বেশী টাকার চুক্তিতে শেষ পর্য্যন্ত একজন মাঝি রাজি হইয়া গেল। ইহারা তিন মাল্লা। বিজয় সময় নষ্ট না করিয়া তখনই নৌকা ছাড়িবার আদেশ দিল। সূর্য্য তখন অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে।

বেলা দেখিতে দেখিতে ঘুরিয়া গেল এবং প্রায় সন্ধ্যাও আসিয়া পড়িল। মাঝিরা বলিল, দেড় প্রহর রাতের কম গ্রামে পৌছানো যাইবে না।

শুনিয়া বিজয়ের মন বিরক্তিতে ভরিয়া যায়। ছ্যা,—এমন পচা অজ পাড়াগাঁয়েও মানুষ থাকে! যাইতে আসিতে জীবন বাহির হইবার যোগাড়! মনে মনে সে ঠিক করিয়া রাখিল, বাড়ীতে যাইয়া এই লইয়া একটু ঠাট্টা না করিয়া ছাড়িবে না।

কি একটা খাল দিয়া নৌকা চলিয়াছে। খা[illegible] অনেকটা নদীর মত। মাসটা ভাদ্রের শেষ, সুত[illegible] বর্ষার উজান ভাঁটি এখনো আছে। দাঁড়ের ছপ্[illegible] শব্দ উঠিতেছে অনবরত। খানিকটা রাত্রিও হইয়া[illegible] এপার ওপার হইতে শেয়াল আর কুকুরের ডাক [illegible] যায়। সারাদিন ভাল খাওয়া হয় নাই, তার উ[illegible] নানা রকমের চিন্তা। শ্রান্তিতে একটু তন্দ্রার [illegible] আসিয়াছিল বিজয়ের। হঠাৎ একটা প্রবল ঝাঁ[illegible] খাইয়া সে একেবারে উঠিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে পেছ[illegible] দিকে ঝপাং করিয়া কিসের শব্দ!

"হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার।" সামনের একজন [illegible] চীৎকার করিয়া উঠিল। নৌকাটা সহসা ডান[illegible] ভীষণ কাৎ হওয়াতে মনে হইল ইহাতে যেন একা[illegible] লোক উঠিয়াছে।

এ কি কাণ্ড! পরক্ষণেই বাহিরে যেন ঝ[illegible] মারামারির অভিনয়! কিছু পরেই ঝপাং ঝপাং ক[illegible] জলে লাফাইয়া পড়ার শব্দ!

নিমেষের মধ্যে বিজয় ব্যাপারটা বুঝিয়া লই[illegible] ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া থাকিবে হয় তো, [illegible] পর নিজেকে প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। শারীরিক [illegible] তাহার এমন কিছু কম নয়, যদিচ পথ ভ্রমণের শ্রা[illegible] দেহ-মন এখন কিছু অবসন্ন।

কিন্তু বাড়ার কাছাকাছি আসিয়া এ কি বিপদ্!

নৌকার আগে পিছে কাঠের দরজা বন্ধ ছিল। [illegible] হইবার পর বিজয় নিজেই বুদ্ধি করিয়া ইহা করিয়াছিল[illegible]

কিন্তু কাঠের দরজা—সুতরাং বাহিরে কা[illegible] উপর্য্যুপরি পদাঘাতে সেটা খুলিয়া যাইবার সঙ্গে [illegible] কে একজন একেবারে বিজয়ের উপর হুমাড় খা[illegible] পড়িল। বিজয় তৎক্ষণাৎ একটু সরিয়া আসিল। হা[illegible] কাছে একটি লাঠি ছিল, সেদিকে হাত বাড়াইতেই পি[illegible] হইতে কে যেন ভীমবেগে সে হাত নিঃশব্দে ধ[illegible] ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কালো লোমশ [illegible] বিজয়ের গলা চাপিয়া ধরিল। সে হাতের ফাঁসি [illegible] ধীরে কমিয়া আসিতে দেখিয়া বিজয় বুঝিল, আর নি[illegible]

[illegible]পাওয়া যাইবে না; সুতরাং সে মরিয়া হইয়া একবার [illegible]শেষ চেষ্টা করিল। ঐ তো সামনে লাঠি গাছা। বিজয়ের [illegible]বলিষ্ঠ হাতে পড়িয়া সেখানা প্রবল বেগে ঘুরিতে লাগিল। সামনের লোকটা আচমকা প্রবল এক ঘা খাইয়া [illegible]চীৎকার করিয়া উঠিতেই নৌকার উপর যেন অনেক [illegible]হুড় পড়িয়া গেল এবং চক্ষের নিমেষে তিন-চারিটি [illegible]লম ছুটিয়া আসিয়া বিজয়ের দেহের এ পাশ ও পাশ [illegible]ভেদ করিয়া গেল। একটা ভীষণ চীৎকার করিয়া বিজয় [illegible]পড়িয়া যাইবার আগে তাহার দীর্ঘ লাঠিটি অন্ধের মত [illegible]কদিকে ছুড়িয়া দিল। বোধ হয় ব্যর্থ হইল না তা—

সে ভীষণ রাত্রি প্রভাত হইল।

বেলা একটু বাড়িতেই রাঘবেন্দ্রনারায়ণ একবার [illegible]মেয়ের খোঁজ লইতে ভিতরে আসিলেন। আসিয়া [illegible]শুনিলেন, মেয়ে রাতে একেবারে ঘুমায় নাই। কি সব [illegible]দুশ্চিন্তাতে রাত ভোর করিয়াছে!

রাঘবেন্দ্র সব বুঝিলেন। একমাত্র মেয়ে, তাহার [illegible]মনের ব্যথা তিনি বুঝিবেন না ত' কে বুঝিবে? তা যাক্, [illegible]তিনি আজই বিজয়ের খোঁজ লইতেছেন। সে যদি [illegible]রওনা না হইয়া থাকে, তবে আজ কি কালের মধ্যে [illegible]তার একখানা চিঠি তাহার অবশ্যই পাওয়া যাইবে।

রাঘবেন্দ্র শ্যামলীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তারপর গুটি তিন-চার মখমলের চৌকা-বাক্স বাহির করিয়া শ্যামলীর সম্মুখে ধরিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন: "দেখ [illegible]তো মা, তোমার কোন্টা কোন্টা পছন্দ হয়? স্যাক্‌রাটা [illegible]এইমাত্র দিয়ে গেল।"

"আমার জন্য নতুন গড়াতে দিয়েছিলে বুঝি, বাবা! [illegible]দেখি দেখি?" মুহূর্ত্তে শ্যামলীর রাত্রি-জাগরণক্লিষ্ট মুখ [illegible]হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

বাক্সগুলি টেবিলের উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া শ্যামলী [illegible]একটি একটি করিয়া অলঙ্কার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে [illegible]লাগিল।

হঠাৎ একটি আংটি দেখিয়া তাহার মনে পড়িল, বাঃ, ঠিক এমনি একটি আংটি তো সে বিজয়ের হাতেও দেখিয়াছিল! আংটিটার মধ্যে মিনা করিয়া লেখা হইয়াছে 'ব'। স্যাকরাটা দেখিতেছি সেই একই জিনিষ গড়াইয়াছে! কিন্তু—কিন্তু আংটিটার মধ্যে এমন একটা লালচে দাগ কেন? খাঁটি গিনির রঙ্?—উঁহুঁ, ইহা যে অনেকটা রক্তের মত দাগ!

আংটিটা রাঘবেন্দ্রের হাতে দিল শ্যামলী। দেখিয়া রাঘবেন্দ্রেরও যেন স্মরণ হইল, হ্যাঁ, ঠিক এমনি একটা আংটি তিনি দিয়াছিলেন বটে শ্যামলীর বিবাহের সময়।

—তাই তো, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল!

দেখিতে দেখিতে রাঘবেন্দ্রের মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। তাঁর এমন মুখাকৃতি শ্যামলী পূর্ব্বে দেখে নাই। কিছু বলিবার আগেই রাঘবেন্দ্র হঠাৎ ভীমবেগে বাহির হইয়া গেলেন। আর একটা অজানিত ভয়ে, আশঙ্কায় শ্যামলীর সর্ব্বদেহ কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু রাঘবেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন না। কিছুক্ষণ বাদে পরিচারিকার হাত দিয়া শ্যামলী একটা চিঠি পাইল, সেটি এই রকম:

'লিখিতে বুক চৌচির হইয়া যাইতেছে যে, তোমার অধম পাপিষ্ঠ পিতা না জানিয়া তোমার স্বামী বিজয়কে হত্যা করিয়াছে! "ভুল, মারাত্মক ভুল হইয়া গিয়াছে!" এমনি ভুলের জন্য—হ্যাঁ, আপাত দৃষ্টিতে তোমার পিতাই দায়ী। কারণ, যাহারা এ কাজ করিয়াছে তাহারা সকলেই তোমার পিতার বেতনভোগী ভৃত্য। বলিতে গেলে, তাহারাই এই বিশাল জমিদারীর আয় বৃদ্ধির স্তম্ভ স্বরূপ, এ বোধ হয় তোমার অজানা নাই। এমনি আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনেই আজ এমনটা ঘটিয়াছে। অথবা বিজয়েরও নিয়তি বলিতে পার, না হইলে স্টীমার-ঘাট হইতে ছিপ নৌকা খালি ফিরিয়া আসে…'

এমনি আরো কিছু ছিল চিঠিতে, কিন্তু এতটা পড়িবার ধৈর্য্য ছিল না শ্যামলীর, তাহার পূর্ব্বেই সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

তাহার পর হইতে রাঘবেন্দ্রের মাথাটাও কেমন খারাপ হইয়া গেল।

আসিয়াছে, এবং স্টীমারে জামাইবাবুর খোঁজও লওয়া হইয়াছে। কিন্তু না, বিজয় তাহার মধ্যে নাই। হয়তো কোন কারণে যাত্রা স্থগিত রাখিয়াছে ; কিন্তু কেন ?

শুনিয়া শ্যামলীর মনটা কিছু খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এমন হইবার ত' কথা নয়! কথা দিয়া কথার খেলাপ করিবার ছেলে ত' বিজয় নয়! অত্যন্ত একরোখা সে। তবে কি পথে কোন বিপদ্-আপদ্ ঘটিল ? আর এদিকে যে এত সব আয়োজন, আমন্ত্রণ! লোকে বলিবে কি!

রাঘবেন্দ্রের মাল্লারা যখন স্টীমারে খোঁজ করে তখন বিজয় একটা কেবিনে অঘোরে ঘুমাইয়া। ঘুমের দোষ কিছু ছিল না, কারণ সমস্ত রাত্রি সেটি একেবারে হয় নাই। যেটুকু আসিয়াছে সে সকালের দিকে। অথচ এই সকালেই বিজয়ের গন্তব্য ষ্টেসনে নামবার কথা। নিজেও এ কথা সে জানে ; তবু কেন যে সে ঘুমাইয়া পড়িল, এবং রাঘবেন্দ্রের মাঝি-মাল্লারাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না, সে কেবল ভগবান্‌ই জানেন।

একটা হৈ-হল্লাতে বিজয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখে, বেলা বেশ হইয়াছে, আর কি একটা ষ্টেসনে স্টীমার ভিড়িয়াছে। খোঁজ লইয়া জানিল তাহার গন্তব্য ষ্টেসন মাত্র ঘণ্টা খানেক হইল ছাড়িয়া আসিয়াছে। শুনিয়া প্রথমে সে বিস্মিত হইল, তার পর আর চিন্তা না করিয়া তাড়াতাড়ি সেই ষ্টেসনেই নামিয়া পড়িল। কিন্তু মুস্কিল হইল—কোন নৌকার মাঝি এত দূরের পথ যাইতে স্বীকার করে না। আর আজকাল এদিকে পথে যা চোর-ডাকাতের উপদ্রব!

বেশী টাকার চুক্তিতে শেষ পর্য্যন্ত একজন মাঝি রাজি হইয়া গেল। ইহারা তিন মাল্লা। বিজয় সময় নষ্ট না করিয়া তখনই নৌকা ছাড়িবার আদেশ দিল। সূর্য্য তখন অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে।

বেলা দেখিতে দেখিতে ঘুরিয়া গেল এবং প্রায় সন্ধ্যাও আসিয়া পড়িল। মাঝিরা বলিল, দেড় প্রহর রাতের কম গ্রামে পৌঁছানো যাইবে না।

শুনিয়া বিজয়ের মন বিরক্তিতে ভরিয়া যায়। ছ্যা,—এমন পচা অজ পাড়াগাঁয়েও মানুষ থাকে! যাইতে আসিতে জীবন বাহির হইবার যোগাড়! মনে মনে সে ঠিক করিয়া রাখিল, বাড়ীতে যাইয়া এই লইয়া একটু ঠাট্টা না করিয়া ছাড়িবে না।

কি একটা খাল দিয়া নৌকা চলিয়াছে। খা... অনেকটা নদীর মত। মাসটা ভাদ্রের শেষ, সুত... বর্ষার উজান ভাঁটি এখনো আছে। দাঁড়ের ছপ্‌ ... শব্দ উঠিতেছে অনবরত। খানিকটা রাত্রিও হইয়া... এপার ওপার হইতে শেয়াল আর কুকুরের ডাক শো... যায়। সারাদিন ভাল খাওয়া হয় নাই, তার উ... নানা রকমের চিন্তা। শ্রান্তিতে একটু তন্দ্রার ... আসিয়াছিল বিজয়ের। হঠাৎ একটা প্রবল ঝাঁ... খাইয়া সে একেবারে উঠিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে পেছ... দিকে ঝপাং করিয়া কিসের শব্দ!

"হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার।" সামনের একজন ... চীৎকার করিয়া উঠিল। নৌকাটা সহসা ডান... ভীষণ কাৎ হওয়াতে মনে হইল ইহাতে যেন একা... লোক উঠিয়াছে।

এ কি কাণ্ড! পরক্ষণেই বাহিরে যেন ঝট... মারামারির অভিনয়! কিছু পরেই ঝপাং ঝপাং ক... জলে লাফাইয়া পড়ার শব্দ!

নিমেষের মধ্যে বিজয় ব্যাপারটা বুঝিয়া লই... ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া থাকিবে হয় তো, ... পর নিজেকে প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। শারীরিক ... তাহার এমন কিছু কম নয়, যদিচ পথ ভ্রমণের শ্রা... দেহ-মন এখন কিছু অবসন্ন।

কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া এ কি বিপদ্!

নৌকার আগে পিছে কাঠের দরজা বন্ধ ছিল। ... হইবার পর বিজয় নিজেই বুদ্ধি করিয়া ইহা করিয়াছিল...

কিন্তু কাঠের দরজা—সুতরাং বাহিরে কা... উপর্য্যুপরি পদাঘাতে সেটা খুলিয়া যাইবার সঙ্গে ... কে একজন একেবারে বিজয়ের উপর হুমড়ি খা... পড়িল। বিজয় তৎক্ষণাৎ একটু সরিয়া আসিল। হাতে... কাছে একটি লাঠি ছিল, সেদিকে হাত বাড়াইতেই পি... হইতে কে যেন ভীমবেগে সে হাত নিঃশব্দে ধরি... ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কালো লোমশ হ... বিজয়ের গলা চাপিয়া ধরিল। সে হাতের ফাঁসি ... ধীরে কমিয়া আসিতে দেখিয়া বিজয় বুঝিল, আর নি... ...পাওয়া যাইবে না ; সুতরাং সে মরিয়া হইয়া একবার ...শেষ চেষ্টা করিল। ঐ তো সামনে লাঠি গাছা। বিজয়ের ...বলিষ্ঠ হাতে পড়িয়া সেখানা প্রবল বেগে ঘুরিতে লাগিল। ... সামনের লোকটা আচমকা প্রবল এক ঘা খাইয়া ...চীৎকার করিয়া উঠিতেই নৌকার উপর যেন অনেক ...জড় পড়িয়া গেল এবং চক্ষের নিমেষে তিন-চারিটি ...রাম ছুটিয়া আসিয়া বিজয়ের দেহের এ পাশ ও পাশ ...চ্ছেদ করিয়া গেল। একটা ভীষণ চীৎকার করিয়া বিজয় ...পড়িয়া যাইবার আগে তাহার দীর্ঘ লাঠিটি অন্ধের মত ...একদিকে ছুড়িয়া দিল। বোধ হয় ব্যর্থ হইল না তা—

সে ভীষণ রাত্রি প্রভাত হইল।

বেলা একটু বাড়িতেই রাঘবেন্দ্রনারায়ণ একবার ...মেয়ের খোঁজ লইতে ভিতরে আসিলেন। আসিয়া ...শুনিলেন, মেয়ে রাতে একেবারে ঘুমায় নাই। কি সব ...দুশ্চিন্তাতে রাত ভোর করিয়াছে!

রাঘবেন্দ্র সব বুঝিলেন। একমাত্র মেয়ে, তাহার ...মনের ব্যথা তিনি বুঝিবেন না ত' কে বুঝিবে ? তা যাক্, ...তিনি আজই বিজয়ের খোঁজ লইতেছেন। সে যদি ...রওনা না হইয়া থাকে, তবে আজ কি কালের মধ্যে ...তার একখানা চিঠি তাহার অবশ্যই পাওয়া যাইবে।

রাঘবেন্দ্র শ্যামলীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তারপর গুটি তিন-চার মখমলের চৌকা-বাক্স বাহির করিয়া শ্যামলীর সম্মুখে ধরিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন : "দেখ, ...মা, তোমার কোন্‌টা কোন্‌টা পছন্দ হয় ? স্যাকরাটা ...এইমাত্র দিয়ে গেল।"

"আমার জন্য নতুন গড়াতে দিয়েছিলে বুঝি, বাবা! ...দেখি ?" মুহূর্ত্তে শ্যামলীর রাত্রি-জাগরণক্লিষ্ট মুখ ...হাতে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

বাক্সগুলি টেবিলের উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া শ্যামলী ...একটি একটি করিয়া অলঙ্কার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে ...লাগিল।

হঠাৎ একটি আংটি দেখিয়া তাহার মনে পড়িল,

বাঃ, ঠিক এমনি একটি আংটি তো সে বিজয়ের হাতেও দেখিয়াছিল! আংটিটার মধ্যে মিনা করিয়া লেখা হইয়াছে 'ব'। স্যাকরাটা দেখিতেছি সেই একই জিনিষ গড়াইয়াছে! কিন্তু—কিন্তু আংটিটার মধ্যে এমন একটা লালচে দাগ কেন ? খাঁটি গিনির রঙ্? —উঁহুঁ, ইহা যে অনেকটা রক্তের মত দাগ!

আংটিটা রাঘবেন্দ্রের হাতে দিল শ্যামলী। দেখিয়া রাঘবেন্দ্রেরও যেন স্মরণ হইল, হ্যাঁ, ঠিক এমনি একটা আংটি তিনি দিয়াছিলেন বটে শ্যামলীর বিবাহের সময়।

—তাই তো, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল!

দেখিতে দেখিতে রাঘবেন্দ্রের মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। তাঁর এমন মুখাকৃতি শ্যামলী পূর্ব্বে দেখে নাই। কিছু বলিবার আগেই রাঘবেন্দ্র হঠাৎ ভীমবেগে বাহির হইয়া গেলেন। আর একটা অজানিত ভয়ে, আশঙ্কায় শ্যামলীর সর্ব্বদেহ কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু রাঘবেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন না। কিছুক্ষণ বাদে পরিচারিকার হাত দিয়া শ্যামলী একটা চিঠি পাইল, সেটি এই রকম :

'লিখিতে বুক চৌচির হইয়া যাইতেছে যে, তোমার অধম পাপিষ্ঠ পিতা না জানিয়া তোমার স্বামী বিজয়কে হত্যা করিয়াছে! "ভুল, মারাত্মক ভুল হইয়া গিয়াছে। এমনি ভুলের জন্য—হ্যাঁ, আপাত দৃষ্টিতে তোমার পিতাই দায়ী। কারণ, যাহারা এ কাজ করিয়াছে তাহারা সকলেই তোমার পিতার বেতনভোগী ভৃত্য। বলিতে গেলে, তাহারাই এই বিশাল জমিদারীর আয় বৃদ্ধির স্তম্ভ স্বরূপ, এ বোধ হয় তোমার অজানা নাই। এমনি আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনেই আজ এমনটা ঘটিয়াছে। অথবা বিজয়েরও নিয়তি বলিতে পার, না হইলে স্টীমার-ঘাট হইতে ছিপ নৌকা খালি ফিরিয়া আসে…'

এমনি আরো কিছু ছিল চিঠিতে, কিন্তু এতটা পড়িবার ধৈর্য্য ছিল না শ্যামলীর, তাহার পূর্ব্বেই সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

তাহার পর হইতে রাঘবেন্দ্রের মাথাটাও কেমন খারাপ হইয়া গেল।

ইংল্যাণ্ড্ বনাম অষ্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেষ্ট্ ম্যাচের বিবরণ এই সংখ্যায় আগেই তোমরা পেয়েছ। তার পর সম্প্রতি ৪র্থ টেষ্ট্ ম্যাচ্ খেলাও হয়ে গেছে, এবং এটিও শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে—যদিও সময় থাকলে এবারেও ইংল্যাণ্ডের হারবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ইংল্যাণ্ড দল প্রথম ইনিংস্এ করে ৪৬০ রান্, ২য় ইনিংস্এ ৮ উইকেটে (ডিক্লেয়ার্ড) ৩৪০ রান্। অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংস্এ করে ৪৮৭ রান্, ২য় ইনিংসএ মাত্র ১ উইকেটে ২১৫ রান্। এবারকার খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যাড্ম্যানের ১ম ইনিংসএ রান্ এবং কম্প্টন্ ও মরিসের অপূর্ব্ব খেলা।

* * * *

কমল ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে বাংলা দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যুক্তপ্রদেশ দলকে হারিয়ে দিয়েছিল। ২য় রাউণ্ডে বাংলা দলকে খেলতে হ'ল হোলকার দলের সঙ্গে। এবারে কার্ত্তিক বসু বাংলা দলের অধিনায়ক হলেন। এই খেলায় কিন্তু বাংলা দল মোটেই কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি, হোলকারের কাছে তাদের ইনিংসএ পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

* * * *

এবারে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ ডেভিস্ কাপ্ টেনিস্ প্রতিযোগিতায় যোগ দেবেন :—গাউস মহম্মদ অধিনায়ক), সুমন্ত মিশ্র, দিলীপ বসু, ইফ্তিকার আমেদ, ইরসাদ হোসেন, প্রেম পান্ধী ও মানমোহন। এঁদের মধ্যে সুমন্ত মিশ্রের "ফর্ম্" এবারে খুব ভাল। তিনি পর পর চার বার ৪টি বড় প্রতি-যোগিতায় ভারতের ১নং খেলোয়াড় গাউস্ মহম্মদকে পরাজিত করেছেন।

* * * *

স্যর্ আকবর হায়দারী (আই.সি এস্) আসামের পরবর্ত্তী গভর্ণর হবেন ব'লে ঠিক হয়েছে। তোমাদের বোধ হ[য়] মনে আছে—উড়িষ্যার বর্ত্তমান গভর্ণরও একজন ভারতী[য়] —স্যর্ চণ্ডুলাল ত্রিবেদী।

* * * *

সম্প্রতি করাচীতে অনেক দিন পরে মুস্লিম লী[গ] ওয়ার্কিং কমিটির একটি বৈঠক হয়ে গেছে। কংগ্রে[স] দল মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব পুরোপূরি গ্রহণ করেছে ব'[লে] ঘোষণা করার পর এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ[।] মুসলিম লীগ্ দল এখনও গণপরিষদে যোগ দেন নি[;] কংগ্রেসের ঘোষণার পর তাঁরা মত বদলাবেন কি[না] সকলেই তা জানবার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু মুসলি[ম] লীগ্ দল তাঁদের পূর্ব্ব মত বদলান নি, অধিকন্তু গ[ণ] পরিষদকে অসিদ্ধ ধ'লে ঘোষণা ক'রে তা ভেঙ্গে দেব[ার] জন্য বৃটীশ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

* * * *

সম্প্রতি পাঞ্জাবে পাঞ্জাব সরকার ও মুসলিম্ লীগ্ দলে[র] মধ্যে বেশ গোলমাল চলেছে। অনেক নেতা ও ... গ্রেপ্তার হয়েছেন, মুক্তি পেয়েছেন, আবার গ্রেপ্[তার] হয়েছেন। আন্দোলন এখনও থামে নি।

* * * *

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশা[লী] পরলোক গমন করেছেন। তিনি ঢাকা মিউজিয়াম[ের] অধ্যক্ষ ছিলেন, সাহিত্য-জগতেও সুপরিচিত ছিলে[ন] এবং বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ গবে[ষণা] করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা একজন সত্যিকা[রের] পণ্ডিতকে হারাল।

* * * *

আমেরিকার য়্যাড্মিরাল্ বার্ড্ সম্প্রতি দক্ষিণ [মেরু] অভিযানে গেছেন। সেখানে মেরুর স্থলভাগের ...

...নি একটি বিরাট হ্রদের সন্ধান পেয়েছেন। তা ছাড়া ...ই অভিযানে ২০টি নতুন দ্বীপ, ৩টি উপদ্বীপ, ৪টি উপ-সাগর ও ৮টি গিরিশৃঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। গিরিশৃঙ্গগুলির সব ক'টিই উচ্চতায় ১০ হাজার ফুটের ওপর।

জমিদার-বাড়ীর চাকর

শ্রীঅজয়কুমার দত্ত

(কাজলদীঘির জমিদার মশাইএর সুসজ্জিত বস্বার [ঘর]। ঘরে প্রাচীন ও নতুন আভিজাত্যের মিলন। [জমি]দার মশাই মনে মনে সহুরে সভ্যতার অতি বড় ভক্ত [হ']লেও কাজে কলমে এখনও বিশেষ সুবিধা করতে পারেন [নি]। ঘরের এক কোণে সাজানো-গোছান চেয়ারগুলোর [এক]খানায় জমিদার মশাই বসে আছেন, মুখে একটু [দুশ্চি]ন্তার ছাপ—মোটা ফর্সা নিরীহ ভাল মানুষ গোছের [চে]হারা। একটু পরেই এক এক করে চারজন চাকর [এ]সে একটু দূরে দাঁড়াল। ভাবভঙ্গীতে বোঝা যায় [সক]লেই একেবারে আনাড়ী ও গেঁয়ো ধরণের। জমিদার [মশ]াই একটু নড়ে চড়ে বসলেন।)

জমিদার। হ্যাঁ, দেখ! তোমাদের কেন ডেকেছি [জা]ন না বোধ হয়? কলকাতা থেকে ক'জন ভদ্রলোক [আ]সছেন জান, ত' আমার মেয়েকে দেখতে? কলকাতার [লো]ক—ওঁদের চালচাল একদম আলাদা বললেই হয়। [সে]খায় কথায় তোমাদের ডাক পড়বে—এটা কর, ওটা [নি]য়ে এস, হেন-তেন—হাজার ফরমাস। তখন তোমরা [কা]জগুলো কি ভাবে করবে বল ত'? বাড়ীর কাজগুলো [যে] রকম ভাবে কর তা করলে তো আর চলবে না! [চা]করগুলো বোকার মত তাকাতে লাগল।) প্রথমেই [ধর]—এই কেষ্ট, ও রকম ভাবে হাত রাখা চলবে না ওঁদের [সা]মনে; বিশু, তোমার হাতটাও কোমর থেকে নামাও। [দেখ] না ভজা কি রকম সুন্দর ভাবে হাত ঝুলিয়ে রেখে [দা]ড়িয়েছে'!

ভজা। হুঁ, বাবা। আমি যখন ম্যাজিষ্ট্র সাহেবের [বা]ড়ী মালীর কাজ করতুম তখনই শিখেছি কি করে হাত [কা]য়দা করে রাখতে হয়। সহজ কাজটি নয় বাবা, [ম্যা]জিষ্ট্র সাহেব নিজে আমাকে বলতেন—

জমিদার। তুমি বড্ড বক্বক্ কর ভজু! বাইরের লোকের সঙ্গে যখন কথাবার্ত্তা বলব তখন তোমরা চুপ-চাপ শুনে যাবে, কথার মাঝখানে কিছু বলে বস না যেন!

ভজা। আজ্ঞে, সে কি করে হবে? কথাবার্ত্তা, গপ্প-সপ্প হলেও আমাদের চুপটি করে থাকতে হবে?

জমিদার। নিশ্চয়ই। ওঁদের সামনে কিছুই বলতে পারবে না তোমরা। ও সব আজকালকার সহরের লোকেরা পছন্দ করে না। হ্যাঁ, তারপর সবাই খেতে বসলে তোমরা পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে—কখন কার কি দরকার হয় সব জেনে নেবে।

বিশু। (মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে) আজ্ঞে, খাবার জায়গায় থাকলে আমারও খিদে পেয়ে যায় যে—

জমিদার। ওরে গাধা, ভদ্রলোকদের খেতে দেখে তোমার খিদে পেলে চলবে না; বুঝলে, হাঁদারাম?—তখন না হয় এই ভেবে খিদেটা চেপে রেখ যে আর একটু পরেই তোমরাও ভাল-মন্দ কিছু গিল্তে পাবে। বুঝলে বোকারাম?

বিশু। (বেশ খুসী হয়ে), হ্যাঁ, সে বেশ ভাল হবে।

জমিদার। তার পর আর একটা কথা,—খাবার সময় আমি যদি ভদ্রলোকদের কোন মজার গল্প বলি তা হ'লে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও যেন হো হো করে হেসে উঠ না।

ভজা। কিন্তু আপনি—হিহি—যদি সেই বাবুরাম বাবুর টাকা চুরির গপ্পটা সুরু করেন—হি হি হি—তা হলে আমি না হেসে পারব না। হি-হি-হি—উঃ—এত মজার গপ্পটা, আপনি রোজ বলেন একবার করে, তবু মনে হয় নতুন গপ্প শুনছি। (ভজার সঙ্গে সঙ্গে অন্য চাকরেরাও হি হি হো হো করে হাসতে সুরু করে দিল।)

জমিদার। (হাসিয়া) আচ্ছা, ও গল্পটা যদি বলি তা হলে না হয় তোমরা হাসতে পার। কিন্তু খুব চীৎকার

করে হেস না গেঁয়ো চাকরের মত। তার পর—হ্যাঁ, কে কি কাজ করবে সেটাও জেনে নাও আগে থেকে, নয়ত গণ্ডগোল হবে। কেউ একগ্লাস জল চাইলে চার জনেই যেন জল আনতে ছুটে যেয়ো না। একজন কেউ যাবে, বুঝলে ?

গণেশ। (তাড়াতাড়ি) আজ্ঞে, আমি জল আনতে যাবো ?

বিশু। আমি আনবো—

কেষ্টা। না না, ও কাজটা আমিই ভাল পারবো।

গণেশ। (মুখ ভার করে) বেশ যা হোক! আমার ব'লে পা-টা খোঁড়া, তাই ও কাজটা আমি করতে চাইলাম তা না তোমরা সবাই ঝগড়া লাগালে, আচ্ছা হিংসুটে সব!

কেষ্টা। এই গণশা, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। মুখ সামলে কথা বলিস।

বিশু। (গণেশকে) হিংসুটে বলবার তুই কে রে? নিজেই ত' এক নম্বর। সে দিন মাছের ঝোল নিয়ে কি কাণ্ডটা করল দেখলি ত কেষ্টা—

জমিদার। (ধমকে) চুপ কর সবাই! কাজ শিখবে, না নিজেদের মধ্যে ঝগড়াই করবে তোমরা! আমি যাকে যা বলছি শুনে রাখ। বাবুরা এসে পড়লেই ভজু ওদের ঘরে এনে বসাবার ভার নেবে—'আসুন, বসুন' ইত্যাদি বলে তুমি ওদের এনে এখানে বসাবে। তারপর কিছু কথাবার্ত্তার পর আমি একটু ইসারা জানালেই বিশু আর কেষ্টা, তোমরা দু'জনে খাবার-দাবারগুলো এনে হাজির করবে। গণশা, তোমার ওপর জল, পান-সিগারেটের ভার রইল, বুঝলে ত' ? আর শোন, ওখানে আমার গড়গড়াটা নিয়ে এসো না যেন। আমি যদি ভুলে বলেও ফেলি—'ওরে গড়গড়াটা নিয়ে আয়'—তবুও আনবে না। বুঝলে ? (গণেশ ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' জানাল) তা হ' সবাই বুঝতে পারলে ত' কার কি কাজ, কোথায় দাঁড়ি কি ভাবে কাজগুলো করতে হবে ? (সবাই ঘাড় নে 'হ্যাঁ' জানাল।) দেখ, এমন হয় না যেন যে চেঁ তোমাদের ডাকতে হবে। সবাই নিজের নিজের জায়গ দাঁড়িয়ে কাজগুলো করে যাবে। ঝগড়া-ঝাঁটি বা করা সব পরে করলেও চলবে। কাজে যদি খুসী করতে প তা হলে আজই সবাই পাঁচ টাকা করে বখশিস পাবে।

(বাইরে মোটরের শব্দ

ঐ ওঁরা এসে পড়লেন বোধ হয়—আমি যাচ্ছি ওঁ আনতে, তোমরা সব তৈরী হয়ে থাক। (জমিদার ম বাইরে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে চাকরেরা ভয় পেয়ে গেল

ভজা। ওরে, কত্তা আমায় কোথায় থাকতে ব যেন ?—

কেষ্টা। তার আমরা কি জানি ? আমার কেমন ভয় ভয় লাগছে ভাই!

বিশু। আমার কাজটা কি যেন—ভুলে গেছি এ বারে।

গণশা। আমি যাই বাবা, জল আনি গে (স প্রস্থান।)

ভজা। ও, ঠিক হয়েছে, আমাকে ত সব জা থাকতে বল্লেন কত্তা! যাই, ভেতরের কাজগুলো গে। (ভজারও বেগে প্রস্থান) বিশু আর কেষ্টা ভাবে একটু নড়া-চড়া করল, তার পর হঠাৎ দু'জনেই খাওয়া খরগোসের মত দ্রুত ছুটে পালাল। জমিদার ফিরে এসে কারও সন্ধান পেলেন না।)*

* গোল্ড স্মিথের কোন নাটকের একটি দৃশ্য অবলম্বনে।

শিশুসাহিত্য-পরিষদের প্রদর্শনী

শিশুসাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে প্রতি বছর ছোটদের শিল্পের ও তাদের শিক্ষনীয় নানা বিষয়ের যে একটি প্রদর্শনী হয় এবারেও তার আয়োজন হচ্ছে। এবারে দক্ষিণ কলিকাতায়—ভবানীপুর আশুতোষ কলেজের আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে এই প্রদর্শনী হবে—আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২রা মার্চ পর্য্যন্ত। রাম উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চই এতে যোগ দে প্রতিযোগিতার জিনিষপত্র আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারীর (বেলা ৩টে—৫টা) মধ্যে নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প হবে :—পূরবী পাবলিশার্স (১৩ শিবনারায়ণ দাস

কিশোর বাংলা কার্য্যালয় (২৫, বলরাম দে স্ট্রীট), মৌচাক কার্য্যালয় (১৪, কলেজ স্কোয়ার) বা রামধনু কার্য্যালয় (১৩, টাউনসেণ্ড রোড)। বিস্তৃত বিবরণ জানতে হলে প্রদর্শনী-সম্পাদক শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী—১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলকাতা (টেলিফোন: নং বড়বাজার ১৪৬৯)—এই ঠিকানায় খবর দিও।

চিঠিপত্র

রামধনুর প্রিয় বন্ধুরা,

দেখতে দেখতে বছর শেষ হয়ে এল। শীত চলে গেছে, কলকাতায় তো এরই মধ্যে বেশ গরম পড়ে গেছে। তবে ভারতের কোন কোন জায়গায় হয়তো আরও কিছু দিন ঠাণ্ডা চলবে। আমাদের একজন লণ্ডন-প্রবাসী বন্ধু লিখেছেন—এবারে সেখানে যা শীত পড়েছিল এতদিন নাকি তেমনটি দেখা যায় নি। থার্ম্মোমিটারে শূন্য ডিগ্রীরও বহু নীচে নেমে গিয়েছিল, টেম্‌স্ নদী জায়গায় জায়গায় ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে গিয়েছিল, রাস্তাঘাট বরফে ঢেকে, বিদ্যুৎ-সরবরাহ ও ট্রেন্ চলাচল বন্ধ হয়ে সে এক কাণ্ড! এ দিক দিয়ে আমরা ভালই আছি বলতে হবে, কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক আকাশ থেকে কুয়াসা কিছুতেই কমছে না!—বরং ইতিমধ্যে কিছুটা বেড়েছে।

এই শীতের শেষে নানা স্কুলে, কলেজে ও ছেলে-মেয়েদের প্রতিষ্ঠানে খেলাধূলার প্রতিযোগিতা—স্পোর্টস্ ইত্যাদি হচ্ছে,—প্রায়ই নিমন্ত্রণ চিঠি আসে। সেদিন বাংলার এক বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই রকম স্পোর্টস্ হয়ে গেল। এখানে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান আর এংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেরা পড়ে। এংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেদের সংখ্যা শতকরা ৫ কি বড় জোর ১০ জনের বেশী হবে না, কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম স্পোর্টস্‌এর প্রায় সবগুলি সেরা সেরা পুরস্কারগুলি তারাই নিয়ে গেল। খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় মুষ্টিমেয় এংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেদের তুলনায় বাঙ্গালী ছাত্রদের এই পরাজয়ের কারণ কি? ব্যাপারটা নিয়ে রাগ করলে চলবে না। তোমাদের বাঙ্গালী কিশোরদের এর কারণ খুঁজে বার করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ইতিমধ্যে তোমাদের অনেক চিঠি পেয়েছি। তা থেকে কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি :—

"অতীব আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি যে আমাদের স্কুলে এবার সরস্বতী পূজায় খিচুড়ী ও মিষ্টান্ন খাওয়ান হইয়াছে। আমরা শিশু সমিতির সভ্যগণ একদিন ধোপা, ভুঞ্জমালী ও নমঃশূদ্রদের সঙ্গে একত্র খাইয়াছি। আমাদের যে সেদিন কী আনন্দ হইয়াছে!"—ইতি মণ্টু, ঝুণ্টু, হারু, নারু, নাণ্টু, পুলিন (উলানিয়া শিশু সমিতি, —বরিশাল)।

"রামধনুতে দেখিলাম যে এক জন গ্রাহক 'হবি' বা সংগ্রহ বিভাগ খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবটি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি প্রস্তাব করি। ছেলেমেয়েদের হাতের কাজ—অর্থাৎ কাঠের কাজ, মডেলের কাজ, সেলাইএর কাজ ইত্যাদির জন্যও একটি বিভাগ থাকা উচিত। এ জন্য রামধনু পত্রিকাকেই চাপ দেওয়া দরকার, কারণ শিশু-পত্রিকার মধ্যে একমাত্র রামধনুই কিছুটা বিজ্ঞান ঘেঁষা।"

—শ্রীবিশ্বজিৎ বিশ্বাস (কলিকাতা)

(এই বিষয়ে আমরা আগেই ভেবেছি এবং কিছুদিন থেকে এ রকম একটি বিভাগ খোলার জল্পনা-কল্পনা চলছে, যাতে সেই বিভাগে ছোটদের ও-সব হাতে-কলমের কাজে নানাভাবে সাহায্য করা যায়।)

"বিলাতে গল্প-উপন্যাস লেখা শেখাবার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। আমাদের দেশে ও রকম কিছু আছে কিনা কেউ জানালে উপকৃত হব।"—শ্রীসুমিতা রায় (বালীগঞ্জ)।

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু (চুঁচুড়া) এবার টেষ্ট পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন এবং শ্রীঅমলকুমার মিত্র (গৌহাটী) কটন কলেজে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় রূপার মেডেল পেয়েছেন ব'লে জানিয়েছেন। সুখের কথা। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো।

—ইতি রাঃ সঃ।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

চিঠিখানা ঠিক মত খুঁড়লে এই রকম হবে :—

ভাই গোবিন্দ,
বড় বিপদে পড়িয়া এই চিঠিখানি তোমাকে লিখিতেছি। গত রাত্রে আমাদের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। যথা সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। মধু ও মদন বাধা দিতে গিয়া ডাকাতের হাতে গুরুতর জখম হইয়াছে। এখন এমন অবস্থা যে তোমাদের সাহায্য না পাইলে বোধ হয় পথে বসিতে হইবে। তোমাকে আর অধিক কি লিখিব? খোকাকে তোমার নিকট পাঠাইলাম। যাহা করিবার করিও।

ইতি তোমার বন্ধু শিবদাস।

উত্তরদাতাদের নাম :—উষসী সেনগুপ্তা (ঢাকা); শেষপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী, কল্পনা, কেকা, বুবু ও তেঁতুল (জলপাইগুড়ি); শক্তিকুমার চক্রবর্ত্তী (কৃষ্ণনগর); প্রতিভাকুমার কুণ্ডু (চুঁচুড়া); সরোজকুমার মল্লিক, সরস্বতী, বরুণ, শ্যামল (হাজারীবাগ); নবেন্দু সেন (কলিকাতা); দেবী বিশ্বাস ও বাণী বিশ্বাস (কলিকাতা); রঞ্জু মাসিমা, দিদি, কোকিলা, ভাইয়া, কিশোর, বড়দা' (পাটনা); অমলকুমার মিত্র, বাসনা হালদার, অগ্নিশিখা মণিমেলার মণি ভাইবোন (গৌহাটী); বিজলী ঘোষ (মহেশতলা); শান্তিরঞ্জন সেন, মুরারিদা', নেণ্টু, মিনা, সুভাষ (ময়মনসিংহ); বাবলু পাইন (ঘাটশীলা); পাইলট দাদা, বাপিদা', জ্যাঠাইমা, খোকুনা, ঘটী, বাটা, তুলতুল, মীরাদি, শান্তি চট্টোপাধ্যায় (মহেশতলা); দ্বিজেশচন্দ্র ভৌমিক (কলিকাতা); শিশিরকুমার নাগ (কলিকাতা); ছবি, ছায়া, মায়া ও সুশীল (নিউদিল্লী); অপূর্ব্বরঞ্জন পাল, রাখী, তিলক, (করিমগঞ্জ); ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান); শ্যামলকু মল্লিক (বালীগঞ্জ); বিজয়া ভাদুড়ী (বেলডাঙ্গা মণ্টু, ঝণ্টু, আরতি, হারু, নারু (উলানিয়া); "পাঁচ" ও বিভূতিভূষণ রায় (ঘাস তেলেণ্ডা); মুকুল বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য (মাদারীপুর); মায়া দেবী, ধীরা সুলক্ষণা দেবী (ফয়জোবাদ); সুশীল, ছবি, শম্ভু, গী বলাই, কমল (খালিয়া); দীপক, বসু (বালীগঞ্জ সত্য ও কানু (মানকাচর); সনীপ্রভা ও রেণু দে (দোয়ারা বাজার); অশেষচন্দ্র, তালুক (শিলিগুড়ি); রেখা মিত্র (কানপুর); প্র দেবী, কেশবদাস ও কালচাঁদ মুখোপাধ্যায়, (কালীঘাট)।

নূতন ধাঁধা

মাষ্টার মশাই বোর্ডের উপর অঙ্ক কষে রেখে গেছেন, টিফিনের ছুটীর পর এসে বোঝাবেন। টিফিনের ছুটীতে কয়েকটি ছেলে ছুটোছুটি করতে করতে পড়ল গিয়ে বোর্ডের উপরে। হুঁশ হ'লে দেখা গেল কষা ভাগ অঙ্কটি জায়গায় জায়গায় মুছে গেছে। এখন উপায়?" সবাই অমিতাভকে ধরল, "ভাই, তুমি না রক্ষা করলে উপায় নেই। অমিতাভর অঙ্কে বেশ মাথা। সে একটু ভেবে নিয়ে মোছা সংখ্যাগুলো আবার বসিয়ে দিল। আমরা বোর্ডের অঙ্কটি পাশে তুলে দিলাম। মোছা সংখ্যাগুলো × চিহ্ন দিয়ে বোঝান হয়েছে। অমিতাভ কোথায় কি বসিয়েছিল বলতে পার?

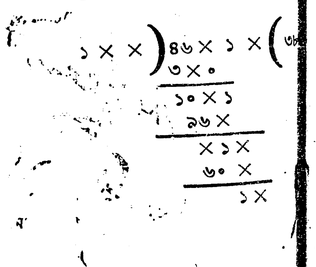

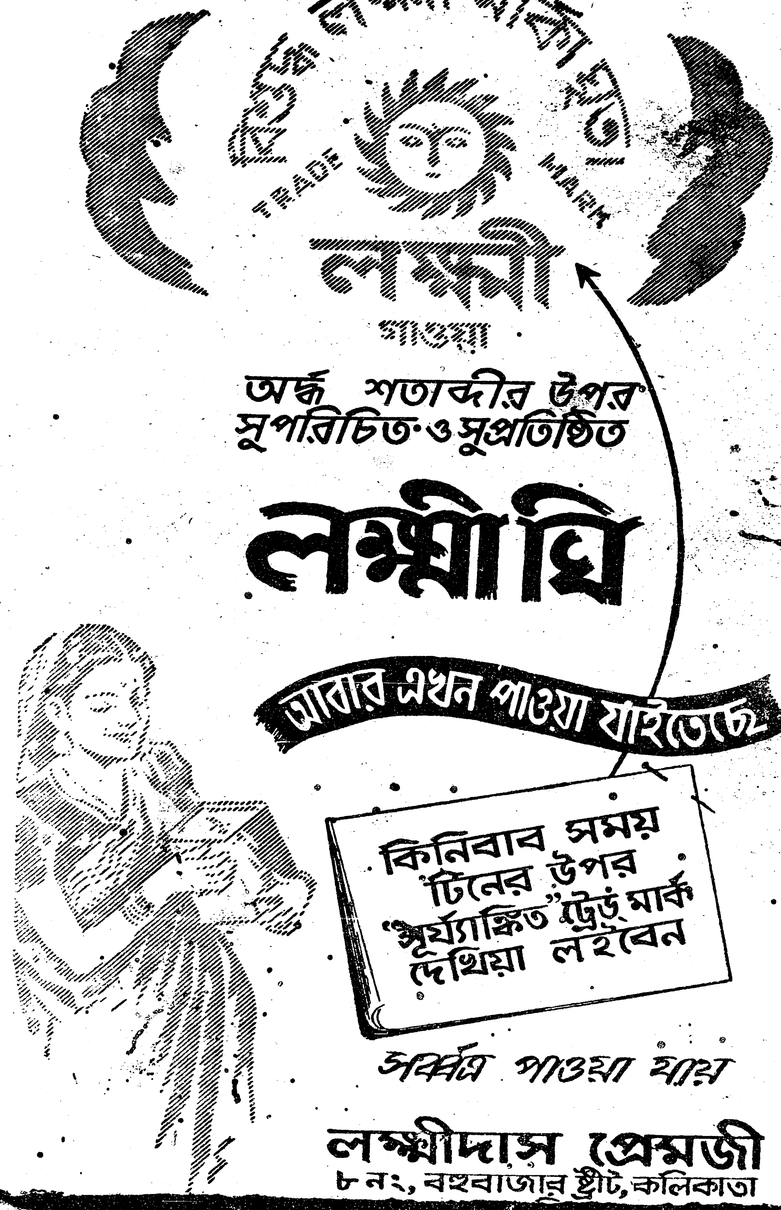

Regd, No. C-

কুণ্ডু জুয়েলারী ওয়ার্কস
প্রোঃ – জে, এল, কুণ্ডু
২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
SYMBOL OF PERFECTION
KJW
ফোন : বি,বি,৩৯৫৫
GRAMS: "KUNDJUEL"
গৃহলক্ষ্মী— রূপার কৌটা
এটী লক্ষ্মীর কৌটা, যাত্রার কৌটা কিংবা বরণকৌটা, যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করা চলে।
লক্ষ্মীশ্রী—সোনার মীনা করা টীপ।
রূপশ্রী—সোনার টিকলী
নবলক্ষ্মী—সোনার মীনা করা পাশা
প্রত্যেকটি বঙ্গ-ললনার অতি আদরের সামগ্রী, নিত্য প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য।
আধুনিক রুচিসম্মত উচ্চাঙ্গের বিবিধ স্বর্ণালঙ্কার ও বেনারসী ও সিল্কের শাড়ীর বিবিধ ও বিচিত্র সমাবেশ আমাদের বৈশিষ্ট্য।

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা
চৈত্র, ১৩৫৩
সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি
কার্য্যালয় : ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্ : সাউথ ১২৬

কুণ্ডু জুয়েলারী ওয়ার্কস

প্রোঃ - জে, এল, কুণ্ডু

২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

SYMBOL OF PERFECTION KJW

ফোন : বি,বি,৩৯৫৫

GRAMS: "KUNDJUEL"

গৃহলক্ষ্মী— রূপার কৌটা এটী লক্ষ্মীর কৌটা, আর কৌটা কিংবা বরণকৌটা, যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করুনচলে।

লক্ষ্মী শ্রী—সোনার মীনা করা টিপ।

রূপ শ্রী—সোনার টিকলী

নবলক্ষ্মী—সোনার মীনা করা পাশা

প্রত্যেকটি বঙ্গ-ললনার অতি আদরের সামগ্রী, নিত্য প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য।

আধুনিক রুচিসম্মত উচ্চাঙ্গের বিবিধ স্বর্ণালঙ্কার ও বেনারসী ও সিল্কের শাড়ীর বিবিধ ও বিচিত্র সমাবেশ আমাদের বৈশিষ্ট্য।

Regd. No. C-1

কার্য্যালয় : ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন্ : সাউথ ১২৬

COLOUR PAPER

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

—ছোটদের কয়েকটি নতুন বই—

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি

নূতন সংস্করণ—১।০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

অলিভার টুইষ্ট

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ—॥৵০

ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

দমাদম দামোদর

দাম ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

অয়েল পেণ্টিং

দাম ।০

আর একখানি যন্ত্রস্থ বই

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

কলকাতার হালচাল (নতুন সংস্করণ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ : : ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি নিবেদন

ঐই সংখ্যার সহিত রামধনুর ১৯শ বর্ষ শেষ হইল। আগামী বৈশাখ হইতে রামধনুর ২০শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া রামধনুর আগামী বর্ষের বার্ষিক (তিন টাকা) বা যান্মাসিক (১।৵০) চাঁদা আগামী ২২শে চৈত্রের মধ্যে মনি অর্ডারে আমাদের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়া সুখী করিবেন। স্থানীয় গ্রাহকেরা হাতে আমাদের কার্য্যালয়ে (১৬, টাউনসেণ্ড রোড) বা শাখা কার্য্যালয়ে (ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা) চাঁদা জমা দিতে পারেন। আমরা আশা করি এ বছর যাঁহারা গ্রাহক আছেন তাঁহারা সকলেই আগামী বছরও গ্রাহক থাকিবেন। কোন বিশেষ কারণে কেহ গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক থাকিলে আগামী ২২শে চৈত্রের মধ্যে একখানি পত্র দিয়া আমাদের জানাইলে অনুগৃহীত হইব। ঐ তারিখের মধ্যে কাহারও চাঁদা বা নিষেধসূচক পত্র না পাইলে আমরা, তাঁহাদের সম্মতি আছে বুঝিয়া, বৈশাখ সংখ্যা তাঁহাদিগকে ভি. পি. তে পাঠাইব। ইহাতে পত্রিকা পাইতে কয়েক দিন দেরী হইতে পারে এবং চাঁদার উপর আরও পাঁচ আনা অতিরিক্ত ভি পি. মাশুল দিতে হইবে। আশা করি সে ভি. পি. ফেরৎ দিয়া সহৃদয় গ্রাহকগণ এই দুর্দ্দিনে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করাইবেন না।

—নিঃ কার্য্যাধ্যক্ষ, রামধনু

১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫। ফোন্ঃ সাউথ ১২৬।

পাঠশালাতে ল সা গু ও গ সা গু এ দু' অঙ্ক
জল-সাগুরও অধম ছিল—প্রকাণ্ড আতঙ্ক।
অনেক দুখের কাহিনী যে জড়িত ওর সঙ্গে,
অঙ্কগুলা দাগ রেখেছে আমার সারা অঙ্গে।
বিশ্রী এবং কুশ্রী দু'টা হয়েই ছিল লুপ্ত,
উঠলো জেগে কুম্ভকর্ণ—ছিল তো বেশ সুপ্ত!
হিন্দু মুসলমানের কথা বলতে গেলেই নিত্য
কাগজে ওই দু'টোয় দেখে যায়—জ্বলে যায় পিত্ত।

[illegible] সুন্দরবর বলে ও সব পাত্রে।
শুনতে নহে নেহাৎ খারাপ, যায়—করা যায় সহ্য,
গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ ভাই একেবারেই ত্যজ্য।
দেশে কি কাল-রাত্রি এলো—ভাবতেও হয় কষ্ট,
হিন্দু এবং মুসলমানও যায় না বলা স্পষ্ট।
গোপন করে বলতে হবে কেবল শুধু নাম তো—
ছোট করে বলুক তারা হাম্‌দো এবং মাম্‌দো।
গলাগলি করে বলুক লাগেই যদি লজ্জা,
কে নিবি রে 'কবর'? নিবি কে বল্‌ 'চিত্যশয্যা'?

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি নিবেদন

এই সংখ্যার সহিত রামধনুর ১৯শ বর্ষ শেষ হইল। আগামী বৈশাখ হইতে রামধনুর ২০শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া রামধনুর আগামী বর্ষের বার্ষিক (তিন টাকা) বা ষান্মাসিক (১৷৶০) চাঁদা আগামী ২২শে চৈত্রের মধ্যে মনি অর্ডারে আমাদের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়া সুখী করিবেন। স্থানীয় গ্রাহকেরা হাতে আমাদের কার্য্যালয়ে (১৬, টাউনসেণ্ড রোড) বা শাখা কার্য্যালয়ে (ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা) চাঁদা জমা দিতে পারেন। আমরা আশা করি এ বছর যাঁহারা গ্রাহক আছেন তাঁহারা সকলেই আগামী বছরও গ্রাহক থাকিবেন! কোন বিশেষ কারণে কেহ গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক থাকিলে আগামী ২২শে চৈত্রের মধ্যে একখানি পত্র দিয়া আমাদের জানাইলে অনুগৃহীত হইব। ঐ তারিখের মধ্যে কাহারও চাঁদা বা নিষেধসূচক পত্র না পাইলে আমরা, তাঁহাদের সম্মতি আছে বুঝিয়া, বৈশাখ সংখ্যা তাঁহাদিগকে ভি. পি. তে পাঠাইব। ইহাতে পত্রিকা পাইতে কয়েক দিন দেরী হইতে পারে এবং চাঁদার উপর আরও পাঁচ আনা অতিরিক্ত ভি পি. মাশুল দিতে হইবে। আশা করি সে ভি. পি. ফেরৎ দিয়া সহৃদয় গ্রাহকগণ এই দুর্দ্দিনে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করাইবেন না।

—নিঃ কার্য্যাধ্যক্ষ, রামধনু

১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫। ফোন্ঃ সাউথ ১২৬।

Correction

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৯শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৫৩ | ১২শ সংখ্যা

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শব্দ দু'টা নোংরা বড় লঘিষ্ঠ আর গরিষ্ঠ,
মিষ্ট যেমন কবিরাজের পাচন এবং অরিষ্ট।
পাঠশালাতে ল সা গু ও গ সা গু এ দু' অঙ্ক
জল-সাগুরও অধম ছিল—প্রকাণ্ড আতঙ্ক।
অনেক দুখের কাহিনী যে জড়িত ওর সঙ্গে,
অঙ্কগুলা দাগ রেখেছে আমার সারা অঙ্গে।
বিশ্রী এবং কুশ্রী দু'টা হয়েই ছিল লুপ্ত,
উঠলো জেগে কুম্ভকর্ণ—ছিল তো বেশ সুপ্ত!
হিন্দু মুসলমানের কথা বলতে গেলেই নিত্য
কাগজে ওই দু'টোয় দেখে যায়—জ্বলে যায় পিত্ত।

বাঘ ও সাপের নাম করে না গ্রামবাসীরা রাত্রে,
'লতা', 'পোকা', 'সুন্দরবর' বলে ও সব পাত্রে।
শুনতে নহে নেহাৎ খারাপ, যায়—করা যায় সহ্য,
গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ ভাই একেবারেই ত্যজ্য।
দেশে কি কাল-রাত্রি এলো—ভাবতেও হয় কষ্ট,
হিন্দু এবং মুসলমানও যায় না বলা স্পষ্ট।
গোপন করে বলতে হবে কেবল শুধু নাম তো—
ছোট করে বলুক তারা হাম্‌দো এবং মাম্‌দো।
গলাগলি করে বলুক লাগেই যদি লজ্জা,
কে নিবি রে 'কবর'? নিবি কে বল্ 'চিত্যশয্যা'?

TIGHT BINDI

লড়াই ফেরত নন্দদুলাল

শ্রীশামুক

পাঁচ

—ধারাপাতের ধরাবাঁধা—

নন্দদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে এলেন ছোট পিসেমশাই। নন্দর সংগে একেবারে সামনা সামনি। পায়ের ধুলো মাথায় মুছে উঠে দাঁড়াতে প্রশ্ন করেন—

—কি কর্‌ছিস রে আজকাল ?

—আজ্ঞে অনেক কিছুই ত' করছি, আপনি কিসের কথা বলছেন ?

—তোদের অনেক কিছুর মানে আমি জানি, আমি কি আর আজকের মানুষ রে! বলি অর্থ উপার্জনের হচ্ছে কি, চাকরি করছিস কোথায় ?

—আজ্ঞে চাকরি ত' কোথাও করি না।

ও, বুঝে গেছি। অর্থ উপার্জন নয়, স্রেফ অর্থ বিসর্জন চলেছে। তা আমার কাছে ত' এসে একবার দেখা করবি। আজ কুড়ি বছর চাকরি করে বড়বাবু হয়ে গেলাম, কত আজে-বাজে লোককে চাকরি দিলাম, আর নিজের নিকট-আত্মীয়কে দেবো না—এ কি হয়!

—আমায় ওঁরা বড়বাবু করবেন কেন ?

—এই দেখ, মাথার ভেতর সমস্ত ওলোট-পালোট হয়ে গেছে দেখছি লড়াই করে করে। আরে, বড়বাবু কি সোজা কথা যে একদিনে হয়ে যায় ? তার জন্য অনেক দিন চাকরি করতে করতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। তা যাক বাজে কথা, আগামী পরশু লালদীঘির উত্তর-পূব কোণে—বুঝেছিস ত', লালবাজারের দিক্‌টায়—ঠিক দশটার সময় দাঁড়িয়ে থাকিস, তারপর আমি যা পারি ত করবো।

—আপিসে গেলেই চাকরি হয়ে যাবে পিসেমশাই ?

—সে সব আমার হাতে ছেড়ে দে না। তোদের আজকাল পোয়া বারো রে। সব লড়াই-ফেরত মানু তোরা যেন মক্কা ঘুরে এসেছিস। টপাটপ্ নিয়ে নিচ্ছে যাক গে বাজে কথা, ঠিক সময়ে দাঁড়িয়ে থাকিস, দেরি হয়। এবারে চলি আমি।

নন্দর মা রাজী হন না, বলেন,—কাজ নেই বা তোর চাকরি করতে গিয়ে। একটা খুনোখুনি রক্তারক্তি কাণ্ড যে নিশ্চয়ই হবে এ আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

মা রাজী হন না কিন্তু বাড়ির অন্যরা বুঝিয়ে বলেন, যাক না, দেখুক গিয়ে। পুরুষ মানুষ রোজগার পাতি করতেই হবে একদিন। আর এমন সুবিধা পাবে কোথ সকলের পিসেমশাই ত' আর আপিসের বড়বাবু হয়ে না!

মা রাজী হন না, কিন্তু নন্দ যেতে চায়। ভা মন্দ কি, দু'দিন গিয়ে দেখা যাক না চাকরি করার আস ব্যাপারটা একবার। আর এদিকে সময় কাটানো যে এ মহা মুশকিলের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে!

মাকে শেষ পর্য্যন্ত রাজী করিয়ে নন্দ সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে জামাজোড়া পরে লালদীঘির মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালো। আগে এ সময়টা কোন দিন এদিকে আসে নি। মনে হ'ল, হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে অনেক কিছু দেখবার এক যথাযোগ্য স্থান বটে।

কত লোক ছুটে চলেছে তাদের আপিসের দিকে, যাকে বলে একেবারে মরিয়া হন্যেমুখো হয়ে। আপিসে ঠিক সময়ে পৌঁছানোর ওপরে যেন ওদের জীবন-মরণ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। ভর্তি ট্রাম, বাস্ এসে এসে থামে, পিলপিল করে লোকেরা টুপটাপ্ পথে নেমে পড়ে, তার পর তাড়াতাড়ি ছিটকে নানা দিকে ছড়িয়ে যায়—দৌড়ে যায়। কেউ কারুর সংগে কথা বলে না, চেয়েও দেখে না একবার—সময় কোথা ? আর কত রকম বয়সের—কত রকম চেহারার সব মানুষ! পৃথিবীর সমস্ত লোকেদের প্রতিনিধির ঠিকানা যেন একটু খুঁজলেই মিলে যাবে।

নন্দর ভয় হয় মনে। এমন ব্যস্ত, এমন উত্তেজিত যখন লোকেরা আপিসে পৌঁছাবার জন্যে, তখন আপিসে না জানি কি রকম ভয়ানক সব কাজ হবে! ভাবছে, কাজ নেই, বাড়ি ফিরে যাওয়া যাক, ঠিক এমনি সময়ে একেবারে চোখের সামনে পিসেমশাই।

—কিরে, এসে গেছিস ? বেশ বেশ, আমার দশ মিনিট দেরি হয়ে গেল। কি করি সকালে মোসাহেবরা এসে আর ভ্যানোর ভ্যানোর করে, ঘাড় ধরে ত' বার বার করে দিতে পারি না! যাক বাজে কথা, বড় সাহেবের সংগে দেখা করিয়ে সব ঠিক করে ফেলি।

নন্দর কাজ হয়ে গেল। টেবিল চেয়ার দেখিয়ে দেওয়া বসবার জন্যে। আর কতকগুলি কাগজে হিসাব লিখিয়ে বলা হ'ল সেগুলি করে আনতে; যেন ভুলচুক না হয়।

সে তখুনি খুব মন দিয়ে কাজে লেগে গেল। মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখে অন্য কেরাণীরা তখনো খুব ধীরে ধীরে নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসছে। পৃথিবীর ওপর যেন যে ব্যস্ততা ছিল একটু আগে তা গেল কোথায় ? আপিসে পৌঁছেই সকলে প্রাণহীন, নির্জীব হয়ে পড়ে কি ? আর সে বসবার ভংগিই বা কত রকম! কতক্ষণ পর পর যায় আবার পাট করা, চাদরটি চেয়ারের পিছনে ঝুলিয়ে রাখতে, ধীরে সুস্থে বসতে, জামার আস্তিন গুটিয়ে নিতে, কলমটি তুলে নিয়ে বার বার নিবের দিকে দেখতে, দোয়াতের ঢাকনি খুলতে।

নন্দর হিসাব শেষ হয়ে গেছে। সে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ভুলে যায়। ভাবে, এদের কি গাঁটে গাঁটে বাত শরীরে, শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে রক্ত চলাচল হয় না ? এদের কি মনের সমস্ত উদ্বেগ, উত্তেজনা, ছটফটানি একেবারে শেষ হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে ?

মনে পড়ে গেল যে তার হিসাব করা শেষ হয়ে গেছে। চমকে লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি বড়বাবুর—মানে পিসেমশায়ের—টেবিলের কাছে গেল কাগজগুলি নিয়ে।

পিসেমশাই এমন মুখ করেন যেন পৃথিবীর এক অভিনব আশ্চর্য্য জিনিষ তিনি এই প্রথমে দেখছেন।—এর মধ্যে হয়ে গেল কিরে ? হিসেবের কাজ কি অত সোজা ভাবিস যে এক চোখ মটকাতেই শেষ হয়ে যায় ? ভুলচুক হয়ে গেলে তখন ? কার গলায় ফাঁসিটি পড়বে শুনি ?

নিজের বুকে আঙুল চেপে আবার বলেন,—এই শর্মার ত' তখন ? যাক বাজে কথা, আরেক বার ভাল করে ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে নিয়ে আয়, একটিও ভুল না থাকে।

পিসেমশাই হাতের পাট করা খবরের কাগজ আবার চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

নন্দ নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে খুব মন দিয়ে হিসাবে মেতে যায় আবার। কই, না, একটিও ত' ভুল নেই! আনা পাই পর্য্যন্ত একেবারে ঠিক ঠিক। তবে কি এখানের লোকেরা বড্ড বেশী ভুল করে, তাই এমন সন্তর্পণে, ধীরে ধীরে হাত-পা নাড়া ও কাজ করার নিয়ম ? দেখে, অন্যরা ততক্ষণে অতি কষ্টে কাগজগুলি সামনে টেনে নিয়েছে। যে ভাবে দোয়াতে কলম ডোবাচ্ছে তিন লাইনের যোগ করতে যে নির্ঘাৎ তেত্রিশ মিনিট লাগাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোন।

নন্দ আবার একবার নিজের হিসাবটুকু দেখে নেয়। ভয় হয় যদি কোথাও লুকানো ভুল ঘাপটি মেরে থেকে যায় ত' কেলেংকারি। পিসেমশাই বলবেন কি! অন্যরা অমন সাবধানে ভুল বাঁচিয়ে ধৈর্য ধরে কাজ করছে আর সে-ই কেবল ব্যস্তবাগীশ! না, ভুল নেই কোন। যত

রকমে দেখা যায় দেখা গেল ভুল একটিও নেই। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে বড় টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

কাগজ থেকে মুখ তুলে পিসেমশাই তাকালেন। সে মুখে ভাষা না থাকলেও স্পষ্ট বোঝা গেল যে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন ভয়ানক। নিজের আপন পিসেকে বড়বাবু পেয়ে যেন নন্দ তার ভুল সমেত হিসাবটি ফাঁকি দিয়ে চালিয়ে দিতে চায়। এ তারই জন্যে গভীর দুঃখ।

লজ্জা ও অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে সে অনুনয় করে বলে,—সত্যি বলছি একটাও ভুল নেই। আমি খুব ভাল করে হিসাব করেছি বার বার।

পিসেমশাই তেমনি ভাবেই চেয়ে থাকেন।

—আচ্ছা আচ্ছা, আমি আরেকবার এই আপনার টেবিলে বসেই হিসেব করে দেখছি।

নন্দ ঘাবড়ে গিয়ে এমন ব্যস্ত ভাবে এ কথা বলে বসে পড়ে যেন ঐ চোখের আশাভংগের দৃষ্টি স্বাভাবিক করবার জন্যে সে তখুনি প্রাণ পর্যন্ত দিতে তৈরি।

সে আবার হিসাব করে দেখলে কোন ভুল নেই। তবু পিসেমশায়ের মুখের দিকে চাইতে সাহস হয় না। মাথা নীচু করে বার বার যোগ বিয়োগ করে যায় একটানা। শেষে এমন হ'ল যে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, চোখের সামনে লাল কালো সংখ্যাগুলি দৌড়াদৌড়ি করে ছুটে বেড়ায়—সমস্ত ধারাপাতটাই যেন চোখের সামনে নাচে—আর কানের কাছে একটা আওয়াজ খালি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সে আওয়াজ বলছে, ভুল—ভুল—ভুল!

মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে বলে,—ঠিক আছে, ভুল নেই কোন।

হিসাবের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে, মিহি গলায় ক্লান্ত সুরে উত্তর আসে,—তুমি যখন বলছো তা হ'লে ঠিকই। তা ছাড়া আর উপায় কি? এই নাও আরো কতকগুলো কাগজ, টিফিনের আগে শেষ করে নিয়ে এসো না যেন, টিফিনের পরে আসবে।

নন্দ নিজের স্থানে ফিরে এসে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। দেখে, অন্যরা এর মধ্যেই এতটুকু কাজ করেই, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কেউ ঘন ঘন রুমালে মুখ মুছছে, কেউ দেশলাইএর কাঠি ভেঙ্গে দাঁত খুঁটছে, কেউ পায়রার পালক কানে ঢুকিয়ে ঘোরাচ্ছে, কেউ কেউ চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে আছে, যেন ঘুমিয়ে পড়েছে চোখ খুলেই। অবশ্য খাতাগুলি বা কাগজপত্র যেমন ছিল ঠিক তেমনি ভাবেই সামনে খোলা বা রাখা।

নন্দ চুপটি করে বসে থাকে। কাজ করবার তার আর ইচ্ছা হয় না, কোন উৎসাহ জাগে না মনে। কি হবে তাড়াতাড়ি নির্ভুল কাজ করে? আপিসের তা নিয়ম নয় যে! এখানে শুধু ছুটে এসে পৌছাতে হবে ঘড়ি দেখে, এক মিনিটও দেরি না হয়। তার পর চিমে তেতালায় ধীরে সুস্থে কাজ করতে করতে সময়টা কাটিয়ে দিতে হবে—যতক্ষণ না সেই পাঁচটা বাজে। তার ভাল লাগে না একটুও। ভয় হয় মনে সেও কিছুদিন এখানে কাজ করলে ঐ অন্যদের মতন নির্জীব, প্রাণহীন হয়ে যাবে নিশ্চয়। ভাবতে ভাবতে সময় কখন হুস করে কেটে গেল, টিফিনের ঘণ্টা গেল পড়ে।

টিফিনের পর আপিস যেন সজাগ হয়ে ওঠে এবারে। এখন কি বাড়ি ফেরবার কথা মনে পড়ে গেছে—ছুটির তাড়া? কেরাণীরা এক একজন কাজ নিয়ে বড়বাবুর কাছে যায় আর বকুনি খায়। মজা এই, একজন পাশ করে বকুনি খায় আর অন্যরা মুখ টিপে চোখ মটকে বেদম হাসি হাসে।

নন্দও হেসে ফেলে কত বার। পিসেমশায়ের যে এমন দুর্দান্ত মেজাজ ও এমন কিম্ভূতকিমাকার সব ভাষা তা এ প্রথমে জানলে। এ সব শুনলে মড়া মানুষও হেসে ফেলে ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে।

—কি হে রেবতীমোহন, এমন করে আর কত দিন চলবে,—এই কাজে ফাঁকি দিয়ে? তার চেয়ে যাও না লাটসাহেবের গদিটা খালি হয়েছে, গিয়ে বসে পড় গে। দূর করে দেবো আপিস থেকে, এই বলে রাখছি।

—বল বিষ্টুপদ, মাথার ভিতর কি গোবর ছাড়া আর কিছু নেই? এবারে মাইনে বাড়াবার কথা বলতে এস একবার, হুঁ।

—কি গো ভজগোবিন্দ বাবু, পাকা বৈষ্ণব নাকি মূর্দ্ধণ্য ষ-এর পেট কাটো নি কেন? অস্ত্রাঘাত করতে কষ্ট হয় বুঝি? লেখাপড়া শিখেছিলে কোন্ গোয়ালে?

এর পর একটা করে বানান ভুল হবে আর এক এক টাকা জরিমানা, মনে রেখো—যাও।

নন্দ আবার তার হাতের কাজটি শেষ করে দেখাতে নিয়ে গেল। এবারে বড় সাবধানে ভয়ে ভয়ে করেছে, ভুল না হয়ে যায়। পরম আশ্চর্য্য ব্যাপার! একটি ভুল—তা সামান্য হলেও ভুল—যোগ দিতে গিয়ে।

সে মুখ লাল করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। পিসেমশাই খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে বলেন—বলেছিলাম কিনা? বলেছিলাম ত' আপিসের কাজ বড় মারাত্মক হে, খুব হুঁসিয়ার হয়ে ধীরে ধীরে করে যেতে হয়। এ বন্দুক নিয়ে দুম্দাম্ গুলি ছুড়ে ফতে করার চেয়ে অনেক শক্ত। ভাবো একবার, কত কষ্ট করে তবে আজ বড়বাবু হতে পেরেছি। আচ্ছা যাক বাজে কথা, এটা ঠিক করে নিয়ে এস। তাড়াতাড়ি কোরো না, সেই ছুটির পাঁচ মিনিট আগে আনলেই হবে।

ছুটির পর সেদিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে নন্দ ঠিক করলে যে সে আর আপিসে চাকরি করতে আসবে না। এ সংকল্প কিন্তু রাখা গেল না শেষ পর্যন্ত। (ক্রমশঃ

বাংলা সাহিত্যের গল্প

উইলিয়াম্ কেরি

শ্রীসুনীল ঘোষ, এম্. এ,

বাংলা সাহিত্যের জন্ম হ'য়েছে ঠিক কবে তা বলা মুস্কিল; বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা যাঁরা করেন তাঁরা অনুমান করেন খৃষ্টীয় ৮৭৫ থেকে ১২০০সনের মাঝামাঝি কোনো সময়ে বাংলা সাহিত্যের জন্ম হ'য়েছিল। বাংলা ভাষায় কাব্য স্থান পেয়েছে সবার আগে—অনেক দিন ধরে সাহিত্যে একাধিপত্য বিস্তার করে এসেছে; তিব্বতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের মুখে যে গাথা বেরিয়েছিল তা এক মজার বাংলা। যেমন ধর—

'কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চিত্ত পৈঠো কাল॥'

অর্থাৎ কায়া (আমাদের দেহ) একটি তরুর মত, পাঁচটি ডাল আছে (আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে)। সেই তরুতে কাল প্রবেশ করে।

যাই হোক, এই রকম করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত কাব্যই বাংলা ভাষাকে অনেক দূর টেনে নিয়ে এল। এ প্রায় সাত শো বৎসরের। বাংলা গদ্যের জন্ম তখনও হয় নি বল্লেই হয়। হ'ল কখন জান? পলাশীর যুদ্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে ইংরেজ বণিকদের হাতে বাংলার স্বাধীনতা নষ্ট হয় তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সেই কোম্পানী দেখলে, এ দেশে শাসন-ব্যবসা চালাতে হ'লে এ দেশের ভাষা শিক্ষা একান্ত দরকার। তখনকার দিনে নীলকুঠির সাহেবরা যে বাংলা বলতো তা শুনলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে বাংলা ভাষা শিখবার তাদের আগ্রহ কত ছিল! কিন্তু তা হলেও ভাল করে শিখবার মত তখন বইও ছিল না বা শেখাবার লোকও ছিল না। কারণ বাংলা গদ্য বলতে তখন প্রায় কিছুই ছিল না। তাই কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বাংলা শেখাবার জন্যে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজ স্থাপিত হ'ল। তারপর শ্রীরামপুরের মিশনারিদের চেষ্টায় বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আরম্ভ হ'ল। ব্যাপারটা খুব মজার ঠেকছে, না? সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে ইংরেজরা কেবল যে বাংলা—তথা ভারতই জয় করে ফেল্লে তাই নয়—আবার আমাদের উপর টেক্কা দিয়ে আমাদেরই

ভাষার গতিটা ঘুরিয়ে দিলে! কিন্তু কথাটা সত্যি। যে সব মনীষীদের আপ্রাণ চেষ্টায় বাংলায় গদ্য স্থায়ী আসন দখল করলো তাঁদেরই কয়েক জনের সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলবো।

আজ শোন উইলিয়াম্ কেরির কথা। যাঁদের সহযোগিতার জন্য বাংলা গদ্য ঋণী তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম্ কেরি সর্ব্বপ্রধান। ইংলণ্ডের পলেসবারি সহরে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে কেরির জন্ম হয়। তাঁর বাবা জুতো তৈরী করতেন। সাংসারিক অবস্থা তাঁর অত্যন্ত খারাপ থাকায় মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে কেরিকে জুতোর ব্যবসাতে শিক্ষানবীশী করতে হয়। এখান থেকেই তিনি নানা দেশের লোকের সঙ্গে পরিচিত হ'তে থাকেন। দুঃখের নানা উৎপীড়নের মধ্যে দিয়েও তিনি মানুষ হবার চেষ্টা করেছিলেন; তখনকার দিনে পড়ার বই খুব বেশী ছিল না—অথচ তিনি নিজের পড়াশুনায় কোন দিন শৈথিল্য দেখান নি। সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে অন্যান্য

শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গীর্জ্জা।
বাংলা গদ্য-সাহিত্যে এখানকার পাদরিদের দান অসামান্য।

ছেলেমেয়েদের মত তিনি নাটক-নভেল পড়তেন না; যা তিনি ভালবাসতেন তা হ'চ্ছে ইতিহাস, ভূগোল আর ভ্রমণ বিষয়ক বই। আঠারো বছর বয়সে তিনি গীর্জ্জায় যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন আর পাদরিদের সঙ্গে মেশেন। তিনি একটি ধর্ম্মসভায় পৌরোহিত্যও করেন এই সময় তিনি বুঝতে পারেন যে বিদেশে প্রচার ছাড়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়। অবশ্য তাঁর আগে কয়েকটি মিশন ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যে বাইরে বেরো নি এমন নয়। তবুও কেরি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলে সংঘবদ্ধভাবে বিদেশে প্রচার কার্য্য চালাবার জন্য। অ শেষে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন কেরি ভারতে আসবা জন্য ইংলণ্ড পরিত্যাগ করলেন।

বাংলা দেশে এসে কেরিকে বেশ কিছুদিন কষ্ট ভো করতে হয়। তখনকার দিনে বাংলাদেশের লোক কেরিকে চিনতো না, আর কোম্পানীর লোকেরাও এ সুব পাদরিদের বিশেষ প্রশ্রয় তো দিতই না, ব সুযোগ পেলে তাদের অসুবিধে করতে পিছ্‌পাও হ না। তার উপর আর একটা বড় অসুবিধে কেরির হচ্ছিল তা হ'চ্ছে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। য

হোক, বেশ কিছুদিন অসুবিধে ভোগের পর মাল জেলার ত্রিশ মাইল দূরে মদনাবাটি কুঠি কেরির স্থান হ'ল। সেখান থেকেই তিনি বাং ভাষা শিখতে আরম্ভ করে দিলেন।

ভাষা শিখতে বসেই তিনি বুঝে নিলেন সংস্কৃত না শিখলে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করা স নয়। তাই সংস্কৃত ভাষা শেখাই হ'ল তাঁর প্র কাজ। শিক্ষা তাঁর এত দ্রুত চলতে লাগ যে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একখানি সংস্কৃত ব্যাক আর সংস্কৃত থেকে ইংরিজি অভিধানের অনে অংশ রচনা করে ফেল্লেন।

কিন্তু উত্তর বাংলাটাও তাঁর ধাতে সইলো তিনি দেখলেন এত ছোট জায়গায় ধর্ম্ম প্র প্রসারতা লাভ করতে পারে না। তাই অন্য জায়গায় যাবার চিন্তা করতে লাগলে তা ছাড়া একলাও তিনি বেশ ক্লান্ত পড়ছিলেন। ঠিক এমন সময় সংবাদ পেলেন আর চারজন পাদরি তাঁকে সাহায্য করতে সেখানে ছেন; এঁদের মধ্যে জোশুয়া মার্সম্যান ছিলেন অন্য

এঁর সম্বন্ধে পরে আমি আলোচনা করবো। যাই হোক, পথে আসবার সময় এঁদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যায়, এবং এঁরা সটান শ্রীরামপুরে আস্তানা করে ফেলেন। এইখানে অনেক দিক্ থেকেই সুবিধে থাকায় শ্রীরামপুরকেই তাঁরা তাঁদের প্রচার-কেন্দ্র করে তুল্লেন।

সত্যি কথা বলতে কি, এই শ্রীরামপুরই বাংলা গদ্যের মুখ ফিরিয়ে দিলে। কেরি এলেন এইখানে। পুরোদমে কাজ চলতে লাগলো। কেরি অনুবাদ করলেন বাইবেল। অবশ্য সে বাংলা পড়লে তোমাদের মধ্যে অনেকেই হাসবে; কিন্তু তবুও আমরা নিজেরাই যখন বাংলা গদ্যে অনভিজ্ঞ—তখন কেরির মত বিলিতি পাদরির পক্ষে অমন মোলায়েম করে বাংলা তর্জ্জমা করা সত্যিই কৃতিত্বের কথা। কেরির বাইবেলের একটু নমুনা দেখ। পৃথিবী সৃষ্টি হ'ল কি করে তাই বলতে গিয়ে কেরি বল্লেন:

"এবং ঈশ্বর বলিলেন আকাশ হউক জলের মধ্যস্থলে ও সে জল এ জল প্রথক্ করুক। অতএব ঈশ্বর সৃজন করিলেন আকাশ ও প্রথক করিলেন আকাশের উপরের জল নিচের জল হইতে।"

এক পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া অর্দ্ধচ্ছেদ বা অল্পচ্ছেদ বা অন্য কোন ছেদের বিশেষ স্থান নেই এখানে।

কিন্তু এই বাইবেল অনুবাদই কেরির শেষ কাজ নয়। লর্ড ওয়েলেস্‌লি ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজ স্থাপন করে কেরিকে অধ্যক্ষ হবার জন্যে ডেকে পাঠান। বাইবেল অনুবাদ করে তিনি সত্যিই তখনকার দিনে নাম করেছিলেন।

এই কলেজটিই বাংলা সাহিত্য চর্চার পীঠস্থান হ'য়ে উঠলো। কেরির পরিচালনায় বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন রকমে প্রেস, অর্থ, উৎসাহ প্রভৃতি নানা দিক্ দিয়ে কলেজটি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করতে লাগলো। কেরি তাঁকে সাহায্য করবার জন্য নিলেন: মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমাথ বাচস্পতি, গতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, শীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসুকে।

বাইবেলের অনুবাদ একলার নয়; তবে অনুবাদকদের ধ্যে কেরির স্থান সর্ব্বোচ্চে। এ ছাড়া কেরি বুঝেছিলেন ভাষার গাঁথনি হচ্ছে তার ব্যাকরণ; তাই তিনি মারাঠি াকরণ, মারাঠি অভিধান, সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন।

তা ছাড়াও তাঁর সহযোগিতায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত আর হিতোপদেশ বেরোয়।

কেরির নিজের নামে প্রকাশিত দু'খানা বাংলা বই আমাদের চোখে পড়ে: 'কথোপকথন' আর 'ইতিহাসমালা'। কিন্তু বই দু'টোর কোন্‌টা যে কেরির নিজস্ব—বা কোনটিও নিজস্ব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। মনে হয় 'কথোপকথন'টি নানা লেখকের; কেরি ছিলেন সম্পাদক। "ইতিহাসমালায়" স্থান পেয়েছে ১৪৮টি গল্প। কেরির কোনটিও নয় বলেই মনে হয়। কেরি ছিলেন প্রধানতঃ সংগ্রাহক।

সাহিত্যিক হিসাবে কেরির নাম যতটা তার চেয়ে ঢের বেশী তাঁর নাম এই জন্যে যে তাঁর সহযোগিতা না পেলে বাংলা গদ্য অত তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতো না। তাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হ'য়ে তখনকার বাংলা লেখকরা যে কয়খানা বই লিখেছিলেন তার নাম নীচে দেওয়া গেল। এই দেখেই তোমরা বুঝতে পারবে অতি অল্প-সময়ের মধ্যে বাংলা গদ্যের বাজার কি রকম সরগরম হ'য়ে পড়েছে। এর জন্যে আমরা কেরির কাছেই ঋণী।

বইগুলির নাম:

১৮০১ :— প্রতাপাদিত্য চরিত—রামরাম বসু
বাংলাভাষার ব্যাকরণ—কেরি
কথোপকথন— ঐ
হিতোপদেশ—অনুবাদক গোলকনাথ শর্ম্মা
১৮০২ :— লিপিমালা—রামরাম বসু
বত্রিশ সিংহাসন—অনুবাদক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
১৮০৩ :— ইসপের গল্প—অনুবাদক তারাচরণ মিত্র
১৮০৫ :— তোতা ইতিহাস—চণ্ডীচরণ মুন্সী
রাজকৃষ্ণ রায়ের চরিত্র—রাজীবলোচন
১৮০৮ :— রাজাবলী—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
হিতোপদেশ— ঐ
হিতোপদেশ—রামকিশোর তর্কালঙ্কার
১৮১২ :— ইতিহাসমালা—কেরি
১৮১৩ :— প্রবোধচন্দ্রিকা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
১৮১৫ :— পুরুষ পরীক্ষা—অনুবাদক হরপ্রসাদ রায়
১৮১৫—১৮২৫ :— বাংলাভাষার অভিধান—কেরি

তিমি ও তিমি-শিকার

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

জলচর জন্তুদের মধ্যে তিমি সবচেয়ে বড়। কোন কোন জাতের তিমি জন্মের সময় দৈর্ঘ্যে প্রায় পঁচিশ ফুট এবং পূর্ণ বয়সে প্রায় ১০০ ফুট হ'য়ে থাকে। গত মহা-সমরের আগে কয়েক বছর বিজ্ঞানীরা তিমি নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা কার্য্য চালিয়েছিলেন। তাতে কম করে কয়েক হাজার তিমি পর্য্যবেক্ষণ করা হ'য়েছিল। তার মধ্যে মাত্র একটি তিমির বয়স ছিল ত্রিশ বছর, বাকীগুলির বয়স ছিল পাঁচ থেকে ছ' বছরের মধ্যে। একটী স্ত্রী-তিমি সাধারণতঃ প্রতি দু' বছরে একটী ক'রে বাচ্চা প্রসব করে। জন্মের পর থেকে বাচ্চাগুলি অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হয়ে দু' বছরের মধ্যেই প্রায় ৭০ ফুট লম্বা হয়ে পড়ে।

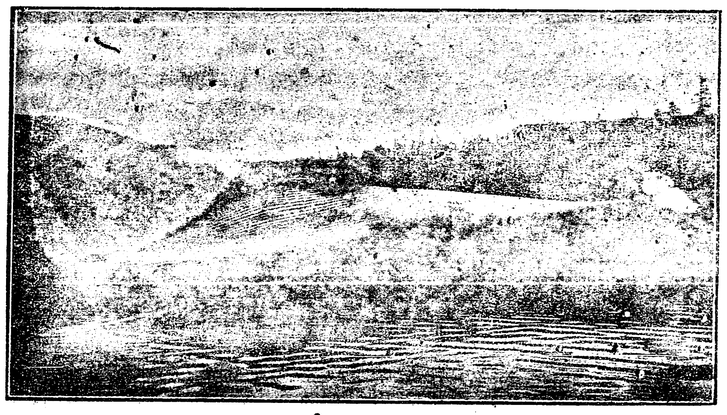

এ যুগের সবচেয়ে বড় জন্তু—তিমি

তিমি স্তন্যপায়ী জীব। স্তন্যপায়ী জীবদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এরা ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করে, এদের রক্ত গরম, এরা জীবন্ত বাচ্চা প্রসব করে এবং তাদেরকে স্তন্যদানে লালনপালন করে। পণ্ডিতেরা বলেন যে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে তিমির পূর্ব্বপুরুষেরা ছিল চতুষ্পদ জন্তু—যারা ডাঙ্গাতেই বিচরণ করত। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়ে দীর্ঘদিনের বিবর্ত্তনের ফলে এরা মাছের আকৃতি পেয়ে গেছে। সম্মুখের পা দু'টি পাখ্‌নার আকার ধারণ করেছে; পেছনের পা দু'টি একদম বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যদিও এদের চিহ্ন তিমির দেহে আজও দেখা যায়। স্তন্যপায়ী জন্তুদের দেহ সাধারণতঃ লোমে ঢাকা থাকে, কিন্তু অন্যান্য জলচর জন্তুদের মতই তিমির দেহ লোমে ঢাকা নয়। এ মুখের উর্দ্ধ ও নিম্ন অংশে কয়েকগাছা ক'রে লম্বা লোম আছে। তিমির চামড়ার ভিতরে একটী পাতলা আবরণ আছে, যা নাকি লোমের মতই ঠাণ্ডা সমুদ্র-জলে তাদের শরীর গরম রাখে।

বিভিন্ন প্রকারের তিমি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। জন্তু মোটামুটি ভাবে এদের দু'টী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথম হচ্ছে দাঁতওয়ালা তিমি, দ্বিতীয় দন্তহীন তিমি (হোয়েলবোন্-তিমি)। দাঁতওয়ালা তিমির দাঁতের সংখ্যা ও আকৃতি বিভিন্ন রকম। স্পার্ম হোয়েল নামে এক জাতের তিমির শুধু নীচের চোয়ালেই দাঁত থাকে। ক্ষুদ্র জাতের কোন কোন তিমির দু'টী মাত্র দাঁত থাকে। দাঁতওয়ালা তিমিরা দাঁতের সাহায্যে সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য ছোট ছোট প্রাণী ধরে খায়। দন্তহীন তিমির খাওয়ার ধরণটা সম্পূর্ণ আলাদা। এদের মুখে কোন দাঁত নেই বটে, কিন্তু উপরের চোয়াল থেকে ঝাঁঝরির আকারে কতগুলি ছোট ছোট হাড় ঝুলান থাকে। ইংরেজীতে তাকে বলা হয় 'হোয়েল-বোন্'। এরা এদের বিরাট মুখগহ্বরে অনেকখানি করে সমুদ্রের জল টেনে নিয়ে' তারপর ঐ হোয়েল-বোনের ভিতর দিয়ে তা ছেড়ে দেয়। এর ফলে জল বেরিয়ে যায় বটে কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ও জলজ উদ্ভিদ্ হোয়েল-বোনের ভিতরে আটকে যায়। এগুলিই হ'ল তিমির খাদ্য। 'ব্লু হোয়েল' হ'ল সর্ব্বাপেক্ষা অতিকায় জাতের তিমি।

হোয়েল-বোন্ তিমি সাধারণতঃ সমুদ্রে পাঁচ থেকে পনের মিনিট পর্য্যন্ত ডুবে থাকতে পারে; কিন্তু দাঁতওয়ালা তিমিরা পারে ত্রিশ থেকে ষাট মিনিট পর্য্যন্ত। তিমির শরীরের ভিতরকার গঠনপ্রণালী এমন যে তারা সমুদ্রতলে ৯০০ মিটার (আধ মাইলেরও বেশী) পর্য্যন্ত নেমে যেতে পারে।

হারপুনের ঘা খেয়ে তিমি সমুদ্র-জলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে।

সেকালের লোকেরা তিমির উপকারিতা যে উপলব্ধি করেছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সে যুগে তিমির মাংসের জন্যেই তিমি শিকার করা হ'ত। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যখন মানুষ অনেকাংশে সভ্য, শিক্ষিত হয়ে উঠল তখন থেকে তিমির চর্ব্বি থেকে উৎপন্ন তেলই হ'ল তার প্রধান আকর্ষণের বিষয়। এই তেল দিয়ে কৃত্রিম মাখন, সাবান প্রভৃতি তৈরী করা হয়। তেলচালিত যন্ত্রাদিতেও এ তেল ব্যবহার করা চলে। পাট, শণ প্রভৃতি থেকে সুতো তৈরী করতেও 'ব্যাচিং অয়েল' রূপে এ তেল ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া তিমির হাঁড় এবং মাংসও নানা প্রকার প্রয়োজনীয় কাজে লাগে। গ্রীণল্যাণ্ডের কাছে রাইট হোয়েল নামে এক রকম তিমি পাওয়া যায়, তারাই সবচেয়ে বেশী তেল দেয়।

উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগরেই বেশীর ভাগ তিমির বাস। এ ছাড়া আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশেও অনেক তিমি শিকার করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিমি শিকারের রেওয়াজটা খুব বেশী ছিল। ফলে উত্তর মহাসাগরে তিমির সংখ্যা খুব কমে যায়। ১৯০২-৩ সনে লারসেন্ নামে একজন অভিজ্ঞ কাপ্তেনের কর্ত্তৃত্বাধীনে সুইডেনের একখানি জাহাজ দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে অভিযান চালায়। তিমি শিকারের উপযুক্ত স্থান-নির্ব্বাচনই ছিল এদের প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ তিমির চর্ব্বি থেকে তেল নিষ্কাশন করা বেশ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। অনেক জাহাজের ডেকেই এর বন্দোবস্ত থাকে, আবার অনেক শিকারী

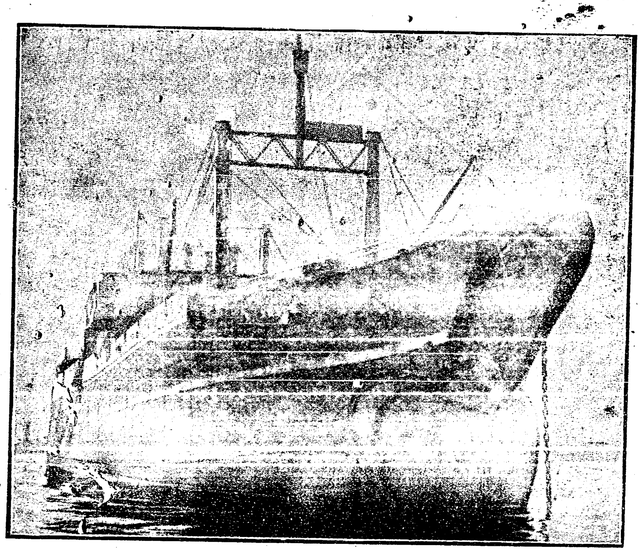

তিমি ধরার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী জাহাজ

তিমি শিকার ক'রে ভাসমান অবস্থায় বা মাংস কেটে উপযুক্ত স্থানে নিয়ে গিয়ে সেখানেই তেল নিষ্কাশন ক'রে

থাকেন। ১৯০৪ সনে উপরোক্ত দলই সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণ মহাসাগরে তিমি শিকার আরম্ভ করে। ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনী, ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপ, দক্ষিণ সেট্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানই হ'ল তিমি শিকারের কেন্দ্রস্থল। উত্তর মহাসমুদ্রে অধিক শিকারের ফলে যেমন তিমির সংখ্যা কমে গিয়েছিল এখানেও তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে জন্য ১৯২৫ সনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি নিয়ে 'ডিস্‌কভারী ইন্‌ভেষ্টি-গেশন্ কমিটি' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। এই কমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত গবেষণা বিজ্ঞান ও তিমি-শিকার দু'টির পক্ষেই সমান মূল্যবান্।

যুদ্ধ-পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরে গড়ে ২৪,০০০ থেকে ৪৪,০০০টী তিমি শিকার করা হ'য়েছে; তেল উৎপন্ন হ'য়েছিল ৪০০,০০০ থেকে ৫৪০,০০০ টন। যুদ্ধকালে তিমি শিকার একদম বন্ধ ছিল। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা সুরু হয়েছে।

আগেকার দিনে তিমি শিকারের আগে তাদের তাড়িয়ে সমুদ্রতীরে এনে তার পর শিকার করা হ'ত। পরবর্ত্তীকালে 'হারপুন্' নামে এক প্রকার সূক্ষ্মধার বিদ্ধ করে তাদেরকে নিস্তেজ করা হ'ত; তার পর ধারা অস্ত্রের সাহায্যে কাটা হ'ত। কিন্তু হারপুনের সাহায্যে বিরাটকায় তিমি শিকার করা সহজ নয়। কারণ এ আঘাত পেলে নৌকা আক্রমণ করতে পারে বা জলে ডু গেলে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাও নৌকার প বিশেষ বিপদজনক। কাজেই আজকাল খুব বড় আকারে হারপুন্ তৈরী করে কামানের সাহায্যে তা ছোঁড় হয়। হারপুনের আগায় যে 'প্রজ্বলনশীল' পদার্থ থা তা তিমির দেহের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে কয়েক সেকেণ্ড মধ্যেই কার্য্যকরী হয়। ফলে তিমি সহজেই নিস্তেজ হ' ডুবে যায়। কিন্তু মোটা লোহার শিকলের সাহা শীঘ্রই তাকে উপরে তোলা হয়। তার পর পাম্প্ দি তিমির শরীরের মধ্যে বাতাস ঢুকিয়ে দিলেই তা ফুলে ওঠে তখন তাকে সহজেই ভাসিয়ে আনা যায়। রাইট্ হোয়েল এর মৃতদেহ এমনিতেই জলে ভাসে, সুতরাং এদের আ শরীরে বায়ু ভর্ত্তি করার প্রয়োজন হয় না।

আমার দেশের মানুষ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

জেল থেকে বেরিয়েই সুধীর বাবু বিমলকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—বিনয় তোমার কথা বিশেষ করে আমাকে বলে দিয়েছে। কাল থেকে তুমি আমার এখানেই বেরুবে। প্রূফ দেখবে, ছোট ছোট ইংরাজী খবর অনুবাদ করবে। উপস্থিত টাকা পঞ্চাশ করে দেব, কাজকর্মগুলো শিখে নাও, তারপর বাড়িয়ে দেব 'খন।

ব্যাপারটা বিমলের কাছে অপ্রত্যাশিত। তার দাদা বিনয় রাজবন্দী হিসাবে পাঁচ বছর আটক আছে, মাসিক দেড়শো টাকা বেতনের চাকুরী ছিল, সে আয় বন্ধ হয়ে গেছে। দুটি-তিনটি টিউশানি মাত্র সম্বল করে বিমল কোন রকমে চালাচ্ছে। তাও দেশে সব মাসে টাকা পাঠানো সম্ভব হয় না। সেখানে মা-বাবার যে কি ভাবে চলছে তা ভাবা যায় না। চার বছরের মধ্যে একবারও সে সাহস করে দেশে যায় নি। বন্দীবাস থেকে বিনয় দু-একটী বন্ধুকে চিঠি দিয়েছিল কিন্তু ফল কিছু হয় নি। চা বছরের চেষ্টায় যা হয় নি, আজ সহসা তা পেয়ে, বিমলে আনন্দ হবারই কথা। মেসে ফিরে এসেই সে দুখা চিঠি লিখে ফেললো—একখানি দেশে মায়ের কা আর একখানি বন্দীবাসে ভাইয়ের ঠিকানায়।

প্রেসের ম্যানেজার খগেন বাবুর সঙ্গে পরিচয় হ' পরদিন। খগেন বাবু বললে—যাক্, তবু ভালো; কাজে চাপ যা পড়েছে, তিন মাস ধরে লোকের জন্য বলছি, ক কর্ত্তা শুনছেন না। পাঁচ-সাতজন লোকের দরকার থাক, তবু তো একজন হ'ল, মন্দের ভালো।

কথাটা ম্যানেজার মিথ্যা বলে নি; দশটা থেকে ছ' পর্য্যন্ত মাথা তোলার উপায় নেই, টিফিন খাবার ফুরস নেই। ছ'টার সময় মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে স্নান করে মেসের ঘরটীর মধ্যে চুপ করে পড়ে থাকে ঘণ্ট

খানেক, কোন কাজ করতে ইচ্ছা করে না। তবু টাকার দরকার খুব বেশী থাকায় রাত্রের টিউশানিটা বিমল ছাড়তে পারে না।

সুধীর বাবু নীচে বড়-একটা নামেন না, মাঝে মাঝে বিমলকে ডেকে পাঠান উপরে, জিজ্ঞেস করেন—কাজকর্ম কেমন হচ্ছে? কে কি করছে?

বিমল বলে—কাজের বড় চাপ, ছ'টা অবধি প্রূফ থেকে মাথা তুলতে পারি না।

সুধীর বাবু বললেন—তোমাকে নতুন লোক পেয়ে খুব খাটিয়ে নিচ্ছে, না? ওই ম্যানেজারটা মহা ফাঁকিবাজ; নিজে কিচ্ছু করে না, সব পরস্মৈপদী···

—না স্যর, উনিও তো যথেষ্ট খাটেন।

—ও সব লোক-দেখানো কাজ হে, তুমি ওখানে কিছু দিন থাক, তা হ'লেই সব বুঝতে পারবে।

বিমল কথাটা ঠিক বোঝে না, তবে সুধীর বাবুও তো কাজে কথা বলার মত মানুষ ন'ন। সামান্য অবস্থা থেকে তিনি আজ এত বড় প্রেস আর খবরের কাগজের মালিক হয়েছেন। কাগজে সত্য কথা লিখে জেলে যেতে তিনি কোন দিন ভয় পান নি, আর আজ একজন কর্মচারীর সম্পর্কে মিথ্যা বলার মত দুর্বলতা তাঁর হবে কেন? নিশ্চয়ই খগেন বাবু মানুষটী ভালো নয়।

খগেন বাবুকে ভালো করে জানবার জন্য বিমল খগেন বাবুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। লোকটি যতক্ষণ প্রেসে থাকে এক মিনিট নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পায় না। বলে—দেখছ তো ভাই, কত কাজ! এই ছাপাখানা সুরু থেকে আমি আছি। কাজ বেড়ে গেছে শতগুণ, অথচ, ভাই, আমাদের মাইনে বাড়লো না এক পয়সা, তখনও ষাট টাকা মাইনে পেতাম, আজও সেই ষাট টাকাই আছে। এই চড়াইয়ের বাজারে কি করে চালাই বল ত'? ছেলেটা দেড় মাস টাইফয়েডে ভুগছে, এরই মধ্যে সাড়ে তিনশো টাকা ধার হয়ে গেছে। কি করে যে সে টাকা শোধ করবো ভগবান্‌ই জানেন।

খগেন বাবুর সঙ্গে বিমল যতই ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে, মানুষটিকে তার ততই ভালো লাগে। এই মানুষটিকে সুধীর বাবু কেন যে ভালো চোখে দেখতে পারেন না, তা ক্রমশঃই বিমলের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে।

বিমল বললে—আপনি কিছু মাইনে বাড়াবার বলেন না কেন?

—অনেক বার বলেছি; তার উত্তরে কর্ত্তা বলেছেন 'অসুবিধা হয় চাকুরী ছেড়ে দাও!' 'ছেড়ে দাও' বল তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না! দশটা থেকে আটটা অ তো এখানেই আটকে থাকি, অন্যত্র চেষ্টা করি কখ এই ছাপাখানার সব কিছুই আমার হাতে গড়া, ছাড়তে মায়া হয়।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে খগেন বাবু দেয়ালের প তাকিয়ে থাকেন।

বিমলের কাছে সুধীর বাবু মানুষটী জটিল হয়ে ওঠে সভা-সমিতির মাঝে দেশ ও স্বাধীনতা ছাড়া তিনি কিছু বলেন না, গরীবের কথা বলতে গিয়ে ঝরঝর কেঁদে ফেলেন, ধনী ও জমিদারদের সম্পর্কে তিনি কঠিন কথা বলেন, অর্থের সম-বণ্টনের পক্ষপাতী নিজেকে প্রচার করেন। অথচ কাগজের লভ্যি হিস বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা তিনি নিজের পকেটে ফেলছে আর তাঁর প্রেসের ম্যানেজার মাসে ষাট টাকা মাত্র মাই পায়, ছেলের অসুখের চিকিৎসা করাতে হয় ধার ক'রে।

জেল থেকে বিমলের দাদা চিঠি লেখে সুধীর বাবুর কা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। সুধীর বাবু বিমলকে ডেকে দেখ তারপর বলেন—আমার ইচ্ছা তোমাকে একটী পা সাংবাদিক করে গড়ে তুলি। তুমি কাগজের রিপে লিখতে পার? চল দেখি তুমি আজ আমার সঙ্গে, দেশ পার্কে এক মিটিং আছে, সেই মিটিংয়ের রিপোর্ট আ তোমাকে লিখতে হবে।

বিমল সানন্দে রাজী হয়ে গেল।

কিন্তু সভার রিপোর্ট লিখতে বসে সে পড়লো বিপদে সুধীর বাবু সভার মাঝে যা কিছু বললেন, পিছনের সারি বসে থেকেও সে তার অর্দ্ধেকও শুনতে পায় নি। সামা যে সব কিশোরের দল জমায়েৎ হয়েছিল তাদের কা পর্য্যন্ত একটি শব্দও পৌঁছায় নি, সুধীর বাবু জোর গল কথাই বলতে পারেন না। ভালো করে সাজিয়ে-গুছি নতুন কথাও কিছু শোনাতে পারেন না। রিপোর্টে f লিখবে বিমল তো ভেবে পায় না। সুধীর বাবু তাগিদ দে বলেন—কই, কি রিপোর্ট লিখলে, দেখি?

তাড়াতাড়ি বিমল সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরী করে ফেললো, তারপর সুধীর বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, বললো—লিখেছি, একবার শুনে নিন।

সুধীর বাবু মন দিয়ে শোনেন, তারপর বললেন—দু'-একটা জায়গায় একটু-আধটু অদল-বদল করে দিতে হবে।

বিমল যেখানে লিখেছিল 'হাজার খানেক ছেলে জমায়েৎ হয়েছিল', সুধীরবাবু সেখানটা কেটে করলেন 'পাঁচ হাজার'। তারপর আগাগোড়া পড়ে বললেন—মন্দ হয় নি তবে আরো জোরালো করে লিখতে হবে। দু'-এক লাইন মাঝে মাঝে বসিয়ে দাও, যেমন—'স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া জাতির কোন কল্যাণ আসতে পারে না। কিশোর-বাহিনীকে আজ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন—ডু অর ডাই! নেতাজীর চরিত্র আজ সমগ্র বাংলার কিশোর-মনের আদর্শ চরিত্র বলে উপস্থাপিত হবে, আজ বাংলার কিশোরদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, একটী মানুষকেও আর তারা অনাহারে মরতে দেবে না…' ইত্যাদি।

ঘণ্টাখানেক ধরে বিমল লেখাটীকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করে সুধীর বাবুকে পড়ে শোনালো। সুধীর বাবু বললেন—এবার ঠিক হয়েছে। তুমি একেবারে কাঁচা কিনা, তোমাদেরকে হাতে ধরে না শেখালে তোমরা বুঝতে পার না।…

পরদিনকার কাগজে সম্পাদকীয়ের পাশেই একখানি ফটো দিয়ে সুধীর বাবুর সচিত্র ভাষণ প্রকাশিত হ'ল। সুধীর বাবু বিমলকে ডেকে বললে—দেখেছ, কত ভুল ছাপা হয়েছে?

বিমল সকালেই কাগজ দেখেছে, সুধীর বাবুর ভাষণের মধ্যে দু'-তিনটে ছাপার ভুল তাঁর নজরে পড়েছে বটে, তবে সেটা এমন কিছু মারাত্মক নয়। তখনই খগেন বাবুর তলব পড়লো, সুধীর বাবু বললেন—কাল ক'টায় তুমি এখান থেকে বাড়ী গেছ?

—সন্ধ্যা সাতটায়।

—কাল আরো কিছুক্ষণ থেকে লেখাটী তোমার দেখে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কত ছাপার ভুল হয়েছে দেখেছ?

—ছেলেটার টাইফয়েড হয়েছে, তার উপর রাত্রে একটা টিউশানি আছে, বেশীক্ষণ থাকার আমার উপায় নেই।

—দরকারের সময় তোমাকে কোন দিনই পাওয়া যায় না, একটা-না-একটা ওজর তোমার মুখে তৈরী আছে। তোমাকে নিয়ে আমার আর বেশীদিন চলবে না।

—আমরও আর ষাট টাকা মাইনেতে পোষাচ্ছে না,—

—ষাট টাকা নয়তো কি তোমাকে ছ' শো টাকা মাইনে দিতে হবে?

—বছরে আপনি ষাট হাজার টাকা মুনাফা-কর তুলে দিচ্ছেন গবর্ণমেণ্টের ঘরে, তারই কিছুটা যদি আমাদের মাঝে ভাগ করে দিতেন তা হ'লে আমরা খেয়ে-পরে বাঁচতুম।

—আমি কি করলে পারতাম সে কথা তোমার মুখ থেকে না শুনলেও চলবে। তবে আজ থেকে তোমাকে রাত আটটা অবধি থাকতে হবে।

—তা হ'লে আমার মাইনেও আপনাকে বাড়াতে হবে।

—সে কথা পরে দেখা যাবে।

—আপনি তা হ'লে নতুন লোক দেখুন, আমি আজ থেকেই চাকরী ছেড়ে দিচ্ছি।

সুধীর বাবু এতটা প্রত্যাশা করেন নি, বললেন—তুমি কি মনে কর, তুমি ছাড়া আমার প্রেস চলবে না?

—আপনার প্রেস চলবে কি চলবে না তা জানি না, তবে আমার যে চলছে না সেটুকু বুঝতে পারছি—ভালো করেই বুঝছি। আপনি এখুনি আমার মাইনে দিয়ে দিন, আমি চলে যাচ্ছি—

—মাইনে পেতে হ'লে এক মাসের নোটিশ চাই, তুমি এক মাস পরে এসে মাইনে নিয়ে যেও।

—কুড়ি দিন কাজ করেছি, চল্লিশ টাকা পাওনা হয়েছে। এ টাকাটা আপনি স্বচ্ছন্দে এখনি দিয়ে দিতে পারেন। তবে আমাকে যদি অনর্থক হায়রানি করার জন্য টাকাটা না দিতে চান, তা হলে আমিও তার শোধ নেব। আমি প্রত্যেকটি কর্ম্মচারীকে জানিয়ে যাব যে আমাদের নাম করে আপনি গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ২০৲ টাকা

দরে চাল কিনে আমাদেরকে না দিয়ে মাড়োয়ারীদের কাছে ত্রিশ টাকা দরে বিক্রি করেছেন…বিভিন্ন কাগজেও আমি এই খবর ছাপাবো, তা'তে আপনি কত বড় নেতা তা সাধারণ লোকে চিনে ফেলবে।

সুধীর বাবুর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো। চাপরাশীকে ডেকে বলে দিলেন—খগেন বাবুকে ক্যাশ-বাবুর কাছে নিয়ে যাও, ৪০৲ টাকা দিয়ে একটা রসিদ রাখতে বলবে, আজ থেকে ওকে ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

ব্যাপারটা বিমলের কাছে ভালো লাগলো না। সুধীর বাবু বোধ হয় বিমলের মুখ দেখে মনের ভাবটা খানিক আন্দাজ করে ফেললেন, বললেন—ব্যাটা মহা পাজী, দুনামের ভয় দেখিয়ে আমাকে ব্ল্যাক্ মেল্ করতে চায়…হুঁ, আজ আমার ঘাড় থেকে রাহু নাম্‌লো! কত দিন থেকে যে আমি ওকে তাড়াবার চেষ্টা করছি! এখন যদি আবার ফিরে না আসে তবেই তো।

বিমল ঠিক বোঝে না, বললে—আমার কিন্তু ওঁকে ভালো লোক বলেই তো মনে হয়েছিল।

—অমনি হয়। বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। ঠিক মুখে মধু বিষে ভরা কুম্ভের মতন।

পরদিন দুপুরে সুধীর বাবু নিজে এসে সব কাজকর্ম দেখাশুনা করেন। প্রুফ-রীডার হরিপদ পান কিনতে গিয়েছিল, সুধীর বাবু তার পাঁচ টাকা ফাইন করে দিলেন। কম্পোজিটার নিবারণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছিল, তার তখনি চাকরী গেল।

পরদিন সবাই সন্ত্রস্ত। সেদিন কিন্তু সুধীর বাবু আর প্রেসে এলেন না, বিমলকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—দেখ, আমি ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম, তুমিই আজ থেকে প্রেসের সব কাজকর্ম দেখাশুনা করবে; আমি তোমাকে আরো পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেব—

—কিন্তু আমি নতুন লোক, সব কাজ তো ঠিক বুঝি না!

—কিছুই নয়, দু'-একদিন দেখলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কিন্তু আমি একেবারে নতুন, এসে, এক মাস হতে-না-হতেই, সবাইকার উপরে গিয়ে বসবো?

—যদি কেউ কিছু বলে, বলবে সকলের চেয়ে বেশী বিদ্যে তোমার পেটে আছে, সেইটাই তোমার যোগ্যতা।

বিমলের কোন কথাই সুধীর বাবু শোনেন না, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই প্রেসের নোটিশ বোর্ডে সুধীর বাবুর নির্দেশ লটকে দেওয়া হয়—আজ থেকে বিমল সেনকে ম্যানেজার নিযুক্ত করা হ'ল এবং প্রেসের সর্ব প্রকারের কাজে তার অনুমতি প্রয়োজন…ইত্যাদি…

প্রথম চাকরী পেয়ে বিমল যেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল এই প্রমোশনটা পেয়ে কিন্তু তেমন খুসি হতে পারলো না। খগেন বাবুর কথাটা তার মনে পড়লো। খগেন বাবুর চাকরী চলে যাওয়া ও তার চাকরী হওয়ার মধ্যে যে সূক্ষ্ম একটা যোগাযোগ রয়েছে, সেইটাই তার মনে কাঁটার মত বিঁধতে লাগলো।

খগেন বাবুর সঙ্গে পথে দেখা, বললে—তুমিই নাকি এখন ম্যানেজারি করছ?

বিমল লজ্জা পায়, বলে—পাকাপাকি কিছু নয়, যতদিন না নতুন লোক আসে ততদিন আমাকে দেখাশুনা করতে বলেছেন।

—অত কম মাইনেতে এই লড়াইয়ের বাজারে নতুন লোক আর কেউ আসবে না ভাই!

—যাক্, আপনি এখন কি করছেন?

—পাকা কাজ এখনও কিছু পাই নি, তবে দু' তিনটে প্রেসের প্রুফ দেখে গড়ে রোজ দু'-তিন টাকা পাই।

—আপনার ছেলেটী কেমন আছে?

—ওই আছে এক রকম। ঠিক মত আর চিকিৎসা করাতে পারছি না। তিন-চারশো টাকা ধার হয়ে গেল, আর কত ধার করবো বল? এক একটা ইন্‌জেক্‌শান তিনগুণ চারগুণ দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে ব্ল্যাক্ মার্কেট থেকে। তার উপর মিছরী পাওয়া যায় না, সাগু পাওয়া যায় না, এই রোজগারে কি করে কোন্ দিক্ চালাই বল?

বিমল ভালো করে এবার লক্ষ্য করে, খগেন বাবুর জামার পিছন দিক্‌টা কয়েক স্থানে ফেটে গেছে, কাঁচা হাতে সেগুলো রিপু করার চেষ্টা হয়েছে। কাপড়খানি সাবান দিয়ে কাচা, লালচে ছোপ ধরেছে; জুতো জোড়ায় তালি পড়েছে অজস্র। বিমলের কি যেন মনে হয়, পকেটে

একখানি দশ টাকার নোট ছিল, বের করে খগেন বাবুর হাতে দিয়ে বলে—আপনার ছেলেকে ফল কিনে দেবেন।

—দান? দান আমি নিই নে বিমল বাবু!

—নিজেকে অত ছোট বলে মনে করছেন কেন? আমি এ টাকা আপনাকে ধার দিচ্ছি, যখন সুবিধা হবে শোধ দেবেন। নোটখানি খগেন বাবুর বুক-পকেটে ফেলে দিয়ে বিমল বিদায় নিল।

পরদিন দুপুরে সুধীর বাবু ডেকে বললেন—তুমি নাকি খগেনকে নিয়মিত টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য কর?

—কই, না তো!

—কাল সন্ধ্যাবেলা মাণিকতলার মোড়ে তুমি তাকে একখানি দশ টাকার নোট দিচ্ছিলে, হরিপদ দেখেছে—

—হ্যাঁ, সেটা ধার।

—ওকে টাকা ধার দিয়েছ? সে টাকা আর জীবনে শোধ হবে না। ব্যাটা মহা শয়তান, কত জনের কত টাকা যে মেরেছে! যার খায় তারি দাড়ি ওপড়ায়। আমার কাছে এদ্দিন খেয়ে পরে মানুষ হ'ল, এখন আমার সম্পর্কেই কাগজে কি সব লিখছে, দেখেছ?—

সামনে টেবিলের উপর থেকে একখানি বাংলা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে চিঠিপত্রের কলাম্ বের করে সুধীর বাবু বিমলের সামনে আগিয়ে দিলেন। খগেনের নামে একখানি চিঠি ছাপা হয়েছে। বিশ হাজার টাকার চাল গবর্ণমেণ্ট দিয়েছিল কর্মচারীদের দেবার জন্য, সুধীর বাবু জনৈক মাড়োয়ারীকে সেই চাল বেচে দশ হাজার টাকা লাভ করেছেন। ব্যাপারটা কেন যে এখনও কর্তৃপক্ষের নজরে আসে নি সেইটাই রহস্য!

—আপনি এর একটা প্রতিবাদ করুন।

—একখানা নগণ্য কাগজে কোথায় কি বেরুলো তাই নিয়ে আমার মত লোকের পক্ষে বাদ-প্রতিবাদে নামা চলে না। এই প্রতিবাদটা করতে হবে তোমাকে। তুমি লিখে দাও, এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা, তুমি নিজে আমার কাছ থেকে কুড়ি টাকা দরে চাল কিনেছ, এবং তুমি জানো তোমাদের প্রেসের আরো অনেক কর্মচারী ওই দরে চাল নিয়েছে।

বিমল সুধীর বাবুর মুখের পানে একবার তাকায়, তার পর শান্ত স্বরে বলে,—কিন্তু সে সবই তো মিথ্যা কথা লেখা হবে, আমি তো মাস খানেক মাত্র আপনার প্রেসে কাজ নিয়েছি, চালের ব্যাপার ঘটেছে তার অনেক আগে।

—বাইরের লোক কে কার অত খবর রাখে? তুমি এখন প্রেসের ম্যানেজার, তোমার কাছ থেকে প্রতিবাদটা বেরোনোই ভালো, সেই জন্যেই তোমাকে লিখতে বলছি। একখানা খসড়া লিখে আমাকে এখুনি দিয়ে যাও, কালকের কাগজে যাতে বেরোয় আমি তার ব্যবস্থা করবো।

বিমলের মাথার মধ্যে গোলযোগ বাধে। খগেন বাবুর চিঠি ছাপানো কাগজখানা হাতে নিয়ে নিজের টেবিলে এসে বসে। হরিপদ প্রুফ থেকে চোখ তুলে বলে,—কি খগেন বাবুর চিঠিখানা পড়তে দিল বুঝি? ঠিক লিখেছে খগেন বাবু। আমাদের নামে চাল এনে মাড়োয়ারীদের সঙ্গে ব্যবসা করলো, আর আমরা বত্রিশ টাকা দরে চাল কিনে মরলুম। ছেলে নেই, মেয়ে নেই, এত পয়সা খাবে কে বলুন তো?

—সত্যি কি তাই?

—বিশ্বাস না হয়, ক্ষুদিরাম বেয়ারাটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে নিন। ওর মা তখন মারা গেল, হবিষ্যি করার আতপ চালের জন্য কত বার ও বড়বাবুকে বলেছিল কিন্তু এক ছটাক চাল এখান থেকে পায় নি। তিরিশ টাকা দরে ও চাল কেনে।

ক্ষুদিরাম পাশেই দাঁড়িয়েছিল, বললে—শুধু আমি কেন বাবু, জীবনকে জিজ্ঞেস করুন। ষোল টাকা মাইনে আর পাঁচ টাকা এলাউন্স, কি করেই যে আমরা চালিয়েছি ভগবানই জানেন। জীবন তো শেষে এক কাবুলিওলার কাছ থেকে তিনশো টাকা ধার করে বসলো,—বল্ না জীবন, বল্ না—

বিমল বললো—আর কিছু বলতে হবে না, আমি বুঝেছি।

সন্ধ্যাবেলা সুধীর বাবু ডেকে পাঠালেন, বললেন—কই কি লিখলে, দেখি?—

—কিছুই লিখি নি।

—কেন?

—মিছে কথা লিখে লাভ কি? খগেন বাবু যা কিছু লিখেছেন সবই সত্যি।

—সব সত্যি?

—হ্যাঁ, আমি এনকোয়ারী করে জানলাম, সব সত্যি। আপনার চাকরী করি বলে আপনি অন্যায় করলেও তা সমর্থন করতে হবে, তা আমি পারবো না।

—তা হ'লে তো তুমি এখানে চাকরী করতে পারবে না।

—মাইনে চুকিয়ে দিন, চলে যাচ্ছি।

সেই দিনই মাইনে বুঝে নিয়ে বিমল বিদায় নিল। মেসে বসে বসে দাদার কাছে চিঠি লিখলো—একদল সুবিধাবাদী চোর আর জোচ্চোর কংগ্রেসের নীতিকে নষ্ট করছে, নাম ভাঙিয়ে পয়সা করছে, সুধীর বাবু তাদেরই একজন। সেই জন্যেই তাঁর কাছে কাজ করা আর চললো না। টুইশনি করেই আমাকে সারাটা জীবন কাটাতে হবে, বুঝতে পারছি—

আবার সুধীর বাবু সেদিন সাংবাদিকদের বৈঠকে ফলাও করে এক গল্প ফেঁদে বসেন: বিনয় জেলে বললে, 'ভাইটাকে একটা কিছু করে দিও সুধীরদা'!' ছোঁড়াকে ডেকে চাকরী দিলাম। এখন দেখি ছোকরা আমারি প্রেসে বসে কমিউনিজ্‌ম্ করছেন! আমাকে চোখ রাঙিয়ে বলে কিনা 'আপনি ক্যাপিটালিষ্ট্'। দেখলাম, আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক মাসের মাইনে আগাম দিয়ে সানন্দে বিদায় দিলাম। তাই ভাবি, অমন লোকের কি ভাই হ'ল! কমিউনিজ্‌মের আগাছায় দেশটা ছেয়ে গেল! কি পাপই এসে ঢুকেছিল আমাদের এই পুণ্যময় দেশে...

সুধীর বাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মুখাপেক্ষী সকলের মুখই মলিন ভাবের অভিনয় করলো।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সুশ্বেতা মুখ খুলিল

বেলা তখনও শেষ হয় নাই, সূর্য্য পশ্চিমের দিকে অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছে মাত্র। রাধামাধবের মন্দিরে সকালিক পূজার্চ্চনার আয়োজন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। মন্দিরের অনতিদূরে, উঠানেরই এক কোণে দু'খানি বেতের চেয়ারায় মৃগাঙ্ক রায় ও রসরাজ বসিয়া মৃদুস্বরে আলাপ করিতেছিলেন। রসরাজ মাত্র আজই সকালে জাহাঙ্গীরনগর হইতে ফিরিয়াছেন, এবং সে বিষয়েই এখন আলোচনা চলিতেছিল।

মৃগাঙ্ক রায়ের চেহারায় এ কয় দিনে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। একে জয়ন্তের চিন্তা, তার উপর রাধামাধবের

গলা হইতে রহস্যজনক ভাবে রত্নহারের অন্তর্ধান—তাঁর মনের উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। মনের সেই ভাব মুখে-চোখেও চাপা নাই।

রসরাজ এই রত্নহারের অন্তর্ধানের খবরটি জানিতেন না, এখানে আসিয়া শুনিলেন। 'ওদিকে জয়ন্তেরও কোন খবর নাই, জাহাঙ্গীরনগরের সফরও শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় শেষ হইয়াছে। কোন দিক্ দিয়াই যেন কোন কূল-কিনারা পাওয়া যাইতেছে না। রাধামাধব এ কি পরীক্ষায় ফেলিলেন!

দূরে একটি লোককে ছাতা বগলে আসিতে দেখা গেল। মন্দিরের সম্মুখে সকলেই যাতায়াত করিতে পারে; দেবস্থান,—কোন বাধা নাই; মৃগাঙ্ক রায় তাই সেদিকে তেমন খেয়াল করিলেন না। কিন্তু ছত্রধারী মন্দিরের দিকে না গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদেরই দিকে আগাইয়া আসিল। এবার চিনিতে কষ্ট হইল না—আর কেহই ন'ন, ঘটক হরিদাস বাকরণবাগীশ মহাশয়।

এই অসময়ে ব্যাকরণবাগীশকে দেখিয়া মৃগাঙ্ক রায়ের পিত্ত জলিয়া গেল; কিন্তু কিছুদিন যাবৎ সময় তাঁর বড় খারাপ যাইতেছে; ব্রাহ্মণকে অপমান করিয়া অনর্থক তার অভিশাপ কুড়াইয়া নতুন করিয়া আরও অমঙ্গল ডাকিয়া আনিবার সাহস তাঁর হইল না। শুষ্কমুখে একবার শুধু "আসুন" বলিয়া তিনি চাকরকে বসিবার আসন আনিয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন।

ব্যাকরণবাগীশ যথারীতি কুশল-সংবাদ লইয়া ও দিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে তাঁর আসিবার উদ্দেশ্য নিবেদন করিলেন।

"তার পর রায় মশাই, ছেলের তো বোধ হয় কোন খোঁজই পাওয়া গেল না? তা জমিদারীটাও তো দেখতে হয়! এ অঞ্চলের এমন ডাকসাইটে ঘর, রাজার রাজত্ব বললেই হয়; তা তো নষ্ট করা উচিত হবে না। আর মা-লক্ষ্মীও বেশ ডাগরটি হয়ে উঠেছেন।"

মৃগাঙ্ক রায় উদ্যত ক্রোধ দমন করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "হুঁ।"

"তাই বলছিলাম, চন্দনার চৌধুরী মশায়ের প্রস্তাবটা আর একবার ভেবে দেখলে হ'ত না? ঘরে-বরে সব দিক্ দিয়েই…"

"ঘটক মশাই, আপনাকে না বার বার বারণ করেছি, ও প্রসঙ্গ আমার কাছে আর তুলবেন না? মেয়ের বিয়ে আমি আর যেখানেই দেই ঐ অপদার্থের কাছে দেব না, এটা ঠিক। তা ছাড়া এখন আমার মনের যা গতি—"

"আজ্ঞে, সেই জন্যই তো বলছিলাম। ছেলেটির আশা তো এক রকম ছেড়ে দিতেই হয়েছে, আপনারও দেহ-মনের এই অবস্থা। এখনই তো এ বিষয়ে ভাববার সময়। আর চৌধুরী মশাইকে আপনি যতটা হেলাফেলা করছেন বাস্তবিক পক্ষে—

এবারে বাধা দিবার পালা রসরাজের। ব্যাকরণ-বাগীশকে থামাইয়া বেশ একটু উচ্চস্বরেই তিনি কহিলেন, "সে-ই বুঝি আবার আপনাকে ওকালতী করতে পাঠিয়েছে? হুঁ, যতটা বোকা ভেবেছিলাম তা তো নয়ই দেখছি। এত বড় জমিদারীটা যদি এই ফাঁকে হাত করা যায়! তা ছাড়া—আচ্ছা, ঘটক মশাই, আপনি তো অনেক খবরই রাখেন শুনেছি। বলতে পারেন, এই যে গুজব রটেছে—চাঁদপালের সঙ্গে আরও যে সব ছোটখাট জমিদার ফিরিঙ্গীদের হাতে হাত মিলিয়েছে তার মধ্যে চন্দনাও একটি—এ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন? বারদীঘির সঙ্গে চন্দনার শত্রুতা পুরুষানুক্রমের—কিন্তু তা কি এতই বড় যে এই ভাবে দু'দিক্ দিয়ে তাকে ফাঁদে ফেলে ধ্বংস করতে হবে?" রসরাজের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

ব্যাকরণবাগীশ এমনটা আশা করেন নাই; কোন্ খবরই কি ইহাদের কানে আসিতে বাকি নাই! আমতা আমতা করিয়া কি যেন বলিতে গেলেন, কিন্তু রসরাজের ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তা চাপা পড়িয়া গেল—"আপনার ঘটক-বিদায় টাই বড় হ'ল? জেনে-শুনে একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের এত বড় সর্ব্বনাশ করতে আপনার একটুও বাধছে না! কি আমি রায় মশাইএর মত খাঁটি বোষ্টম নই, একটু-আধটু মা কালীরও পূজো করি, আমি অত সহজে ছাড়তে দে না। বলবেন আপনার চৌধুরীকে,—যারা ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস রাখে তারা ঐ সব চুনোপুঁটির সঙ্গে কারবার করে না!"

রসরাজের বাক্যস্রোতে বাধা পড়িল। একজন পরিচারিকা অবগুণ্ঠন টানিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

ব্যাকরণবাগীশের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "দিদিমণি আপনাকে কি বলবেন, একটু এদিকে দাঁড়াতে বলছেন।"

"আমাকে!"—ব্যাকরণবাগীশ কাঁচুমাচু মুখে কহিলেন। জবাব দিলেন রসরাজ, "হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন না? যান, মা-লক্ষ্মীর নিজের মুখেই জবাবটা শুনে আসুন গিয়ে।"

মন্দিরের সিঁড়ির নীচে সুশ্বেতা দাঁড়াইয়া ছিল। মৃগাঙ্ক রায়ের মত তারও সুন্দর মুখখানি দুশ্চিন্তার ছাপে মলিন হইয়া গিয়াছে। ব্যাকরণবাগীশ কাছে যাইতেই সে মৃদু-স্বরে কহিল, "আপনি কেন রোজ রোজ বাবাকে বিরক্ত করতে আসেন বলুন তো? আমাদের মনের ভাব আপনারা ভাল মতই জানেন। চন্দনার ওঁদের আমরা চিরকাল শত্রু বলে জেনে এসেছি। এখনও এমন কোনও ঘটনা ঘটে নি যাতে সে ভাব বদলাবার কোন কারণ থাকতে পারে। আর—" সুশ্বেতা ক্ষণেক দ্বিধা করিয়া কহিল, "আর আপনাদের এই নতুন জমিদারের অপদার্থতার কথা দেশ-শুদ্ধ কে না জানে? কাপুরুষকে কেউ সম্মান করতে পারে না। এমন কী সৎ কাজটা তিনি আজ পর্য্যন্ত করেছেন যার জন্য এমন একটা প্রস্তাব পাঠাবার স্পর্দ্ধা তাঁর হতে পারে!"

মেয়েটার প্রগল্‌ভতা দেখিয়া ব্যাকরণবাগীশ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সুশ্বেতার যেন আজ খুন চাপিয়াছে, মুখে তার কিছুই আটকাইবে না। কহিল, "যান, বলবেন আপনাদের সেই জমিদারটিকে, এখন পর্য্যন্ত যে যোগ্যতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাতে তাঁকে এ বাড়ীতে বর হয়ে আসা দূরে থাক্ বরকন্দাজ হয়ে আসবার উপযুক্তও আমরা মনে করি না। হ্যাঁ, ঠিক এই কথাই বলবেন।" সুশ্বেতা বেণী দোলাইয়া ব্যাকরণ-বাগীশের দিকে আর মুহূর্ত্তও ফিরিয়া না চাহিয়া সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরের ভিতর চলিয়া গেল।

ব্যাকরণবাগীশ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্যাপারটা এমনই অভাবনীয় যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর মাথায় তা ভাল করিয়া প্রবেশ করিল না। তাঁর চমক ভাঙ্গিল সহসা অশ্ব-পদশব্দে। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন চার-পাঁচ জন অশ্বারোহী তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া মন্দিরের অনতিদূরে আসিয়া থামিল। তাদের অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছিল। ঘোড়াগুলিও ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে, মুখ দিয়া ঘন ঘন ফেনা বাহির হইতেছে।

অশ্বারোহীরা ঘোড়া হইতে নামিলে দেখা গেল মধ্যে একজন অল্পবয়স্ক বালক। পর মুহূর্ত্তে দেখা রসরাজ মৃগাঙ্ক রায়কে ধরিয়া এক রকম টানিতে টানি সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। মুখ দিয়া শুধু স্বরে শোনা যাইতেছে—"জয়ন্ত! জয়ন্ত! জয়ন্ত!"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ
ইব্রাহিম খাঁর উভয়সঙ্কট

সন্ধ্যা হয় হয়। জাহাঙ্গীরনগরের কেল্লার রাত্রির ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। সেই আধ-অন্ধ অলিন্দের উপর একটি ছায়ামূর্ত্তি অস্থির ভাবে পদ করিতেছিল। ছায়ামূর্ত্তিটি আর কাহারও নয়, ব সুবেদার স্বয়ং ইব্রাহিম খাঁর।

ইব্রাহিম খাঁ কয়েক দিন যাবৎ বড় দুর্ভাবনায় কাটাইতেছেন। চাঁদপালের চিঠির তিনি কড়া দিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন চাঁদপাল হয়তো মিথ্যা দিয়া তাঁহাকে বোকা বানাইবার চেষ্টা করিতেছে। চাঁদপালের দম্ভ যে অলীক নয় সে সংবাদ পাইতেও বেশী দেরী হয় নাই। সেই অদ্ভুত রোগের ব বলিতেছি। প্রায় প্রত্যহই কোন-না-কোন গ্রাম হ খুবর আসিতেছে—আজ অমুক লোকে এই ব্যা আক্রান্ত হইয়াছে, আজ অমুকে। হতভাগ্য প্র সুবেদারের কাছে প্রতিকারের জন্য কাতর আ জানাইতেছে; কিন্তু সুবেদার কি করিবেন! এই অ পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার পাইবার কোন পথই তিনি খুঁ পাইতেছেন না।

পরিচারক আসিয়া আলো জ্বালাইয়া দিল। কু করিয়া কহিল, "হোসেন সাহেব, কাজি সাহেব চৌধুরী মশাই বাইরে অপেক্ষা করছেন।"

"তাঁদের এখানেই নিয়ে এস।"—নবাব কহিলে ভৃত্য আবার কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেল।

হোসেন সাহেব নবাবের প্রধান নৌসেনাধ্যক্ষ। কা ও চৌধুরী উভয়েই নবাব সরকারের অতি উচ্চ কর্ম্মচা বয়সে প্রবীণ। নবাব মন্ত্রণা করিবার জন্য তাঁহাদের ডাকি পাঠাইয়াছিলেন।

একটু পরেই তাঁহারা আসিয়া অভিবাদন জানাইলেন। নবাব আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহাদেরও বসিতে বলিলেন। তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কি ঠিক করলেন তা হ'লে?"

"আজ্ঞে আমার তো মনে হয়, আর দেরী না ক'রে অবিলম্বে নিমপুকুর আক্রমণ করাই উচিত।" দেওয়ান হরিনারায়ণ চৌধুরী উত্তর দিলেন।

"আপনারও কি তাই মত?—" নবাব হোসেন সাহেবের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন।

"তাই তো ভাবছি! ওদিকে সাতগাঁয় একটা বড় ফৌজ পাঠাতে হয়েছে। হুগলিতে ফিরিঙ্গীরা নাকি খুবই তোড়জোড় করছে—সাতগাঁয় একটা বড় রকম আক্রমণ করবে। সাতগাঁ ওদের হাতে গেলে সুবে বাংলার আর রইল কি? এদিকে ধলেশ্বরী, করতোয়া, কর্ণফুলি থেকে সুরু করে মধুমতী, ভৈরব, জলাঙ্গী—সর্ব্বত্র বড় বড় ডাকাতির খবর আসছে। সরস্বতী বা গঙ্গার কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি। বড় বড় মোহানাগুলোয় সাধারণ পাহারাদার থাকা না থাকা সমান—সর্ব্বত্র সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন করা দরকার। এ অবস্থায়—"

"আপনার হাতে এখন কতগুলি ছিপ আছে?"

"সব তো নানা জায়গায় ছড়ান। গুছিয়ে একত্র করতে কিছু সময় লাগবে। অন্ততঃ দিন দশ-পনেরো।"

"বলেন কি! না, না, অত দিন সবুর করা যায় না। আচ্ছা, কোশা?"

"তারও তো ঐ অবস্থা।"

"তা হলে তো বড় জাহাজ নিয়েই তৈরী হ'তে হবে। অবশ্যি যদি এখনই আক্রমণ করা উচিত মনে করেন।"

এবারে কথা বলিলেন কাজি সাহেব। কহিলেন, "কিন্তু আমার মনে হয়, একটু ভেবে-চিন্তে ও-কাজ করা ভাল। চাঁদপাল তো একা নয়, দুর্দ্ধর্ষ ফিরিঙ্গী সৈন্যেরা আজ তার সহায়। তা ছাড়া নবাব সাহেবের নিশ্চয়ই কানে এসেছে, দলে দলে ছোট-বড় জমিদার চাঁদপালের সঙ্গে ভিড়ে এই সুযোগে কিছু গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছে। পূর্ব্ববঙ্গের আওলাৎগঞ্জ, শুকদ্বীপ, জনকপুর, শ্যামপুকুর—ওদিকে সুজাবাদ, কয়লাপটী, বেগুনতলি, সুবাসনগর, চন্দনা—কত নাম করব? এর সব ক'টির জমিদার, শুনতে পেলাম, নবাবের বিরুদ্ধে চাঁদপালের সঙ্গে ঘোঁট পাকাচ্ছে। সবাই স্বাধীন হতে চায়।"

এ খবর ইব্রাহিম খাঁরও কানে আসিয়াছিল। তিনি তাই অকস্মাৎ বড় গম্ভীর হইয়া গেলেন। কাজি সাহেব কহিলেন, "ও-দিকে, শুনেছেন বোধ হয়, সেবাইতগঞ্জের কাছে সে অঞ্চলের ফৌজদার চাঁদপালের লোকের সঙ্গে লড়তে গিয়ে কি নাকাল হয়েছে!"

এ খবরটিও সকলেই জানে, তাই চট্ করিয়া কেহ জবাব দিতে পারিল না। আবার খানিকক্ষণ ধরিয়া একটা ঘন নিস্তব্ধতা জায়গাটিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিল।

দূরে কেল্লার ফটকের কাছে ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। প্রহরী প্রহর জানাইতেছে বুঝি! ইব্রাহিম খাঁ যেন হঠাৎ সম্বিৎ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন।—"তা হলে কি শেষ পর্য্যন্ত চাঁদপালের কাছে 'আপোষ মীমাংসার জন্যই চিঠি দিতে হবে?"

কেহ জবাব দিল না। ইব্রাহিম খাঁ আবার কহিলেন, "তবে তাই হোক্। দেশ শুদ্ধ লোকের জীবন বিপন্ন ক'রে নবাব পক্ষের মুখ রক্ষা না হয় নাই হ'ল। ঐ অদ্ভুত রোগ আর ছড়ান চলে না, যে ভাবে হোক্ বন্ধ করতেই হবে নইলে দেশ যুড়ে বিদ্রোহ হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।"

পরদিন খুব ভোরেই নবাবের দূত পত্র লইয়া নিম পুকুরের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া গেল। অন্তরীক্ষে বিধাতা পুরুষ বোধ হয় একটু মুখ টিপিয়া হাসিলেন। কেন, তা পরে বলিতেছি।

(ক্রমশঃ

স্মৃতির পটে

পথে-বিপথে

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

চল্লিশ বছর পূর্ব্বের এক ভ্রমণ-কাহিনী আজ শুনাইব। স্মৃতির ঝুলি হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া লেখা, ডায়েরী ছিল না। এই সময়টার পূর্ব্বের লোকে নিজ নিজ জীবনের কাহিনী বিস্তৃত ভাবে ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিত। আমাদের ছাত্রজীবনে সে ফ্যাশানটা উঠিয়া গিয়াছিল, বোধ হয় প্রয়োজন বশেই। তখন বাংলায় বৈপ্লবিক যুগ। ডায়েরীতে অমুকের সঙ্গে আজ খাইয়াছি—বেড়াইয়াছি, ইত্যাদি লিখিয়া অনেকের অনেক দুর্ভোগ হইয়াছিল। সুদূরের কথা কল্পনায় আনায় যেমন লেখকের অসুবিধা—পাঠকের পক্ষে তেমনি সুবিধা। মনে থাকিবার মত ঘটনাগুলিই শুধু মনে পড়ে—খুঁটিনাটি বাদ পড়িয়া যায়। নূতন অধ্যাপকের শ্রমনির্শ্মিত তথ্যবহুল বক্তৃতা এই রূপেই ছাত্র-মহলে নিদ্রাধিক্য আবির্ভাবের কারণ হইয়া পড়ে।

আমরা ছিলাম চার জন। আমি, সতীশ মুখার্জী, প্রভাস দে ও ভুবনেশ্বর সেন। প্রথম তিন জন সবে মাত্র এম্. এ. পাশ করিয়া কলেজের বাহির হইয়াছি। বয়সায় আমি সব চেয়ে বড়, ওজনে প্রভাস, গায়ের জোরে ভুবনেশ্বর এবং কায়সংক্ষেপে ও পাণ্ডিত্যে সতীশ সব চেয়ে বড় ছিল।

ভুবনেশ্বর বড়লোকের ছেলে ছিল—ইংরাজী কায়দায় বলিলে বলা যায়—ভগবান্ তাহাকে 'রূপার চামচে মুখে দিয়া' সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। সে জাতিতে সুবর্ণ বণিক্ হইলেও দয়া, দাক্ষিণ্য ও সহৃদয়তায় অনেক ব্রাহ্মণের উপরে ছিল। তার তখনকার দুঃখ দু'টি ছিল। তার রংটা ছিল মহিষের মত কালো। আর পড়াশুনাতেও সে বেশী দূর আগাইতে পারে নাই। সে পর জীবনে দুঃখ পাইয়াছিল—আমরাও পাইয়াছি। আমাদের চার জনের জীবনের সুখদুঃখের হিসাব-নিকাশ করিলে কে বেশী বা কম পাইয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না। ভুবনেশ্বর কয়েক বছর হইল ওপারে গিয়াছে, সতীশও কয়েক দিন হইল গিয়াছে। সতীশ ও প্রভাস উভয়েই পরবর্ত্তী কালে অধ্যাপক হিসাবে নাম করিয়াছিল।

আমাদের প্রথম গন্তব্য স্থান ছিল অযোধ্যা। সেখানে কয়েক দিন ছিলাম। শুধু মনে পড়ে একটা বিষণ্ণ, নোংরা নগরী—অতীতের ভগ্নাবশেষ লইয়া যেন এখনও শোক করিতেছে। আর মনে পড়ে সেখানকার বানর ও কচ্ছপ। দোতালায় একটা ঘর পাইয়াছিলাম। বারান্দায় বসিয়া খাইবার যো নাই, সর্ব্বদাই বানরের উৎপাত। ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া খিচুড়ী খাইতে বসিয়াছি, জানালা ও কার্ণিশ বানরে ভরিয়া গেল। খাদ্যাবশেষ আমরা বানরদের ভাগ করিয়া দিতে গেলাম। ভাগ লইয়া উহাদের মধ্যে কলহ বাধিল। শেষে লাঠি লইয়া তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হইল। ফলে দুর্ব্বলেরাও কিছু কিছু পাইল। শুনিলাম, কাজটা ভাল হয় নাই; বাঁদরদের মারিলে অনেক সময় বহু সংখ্যক একত্র হইয়া আক্রমণ করে। বেশী মারিলে স্থানীয় লোকেরা আক্রমণ করে। তা ছাড়া এই বাঁদরেরা মাঝে মাঝে জিনিষপত্র লইয়া ছাদের উপরে উঠিয়া যায়। ফল বা খাদ্য লইয়া সাধ্য সাধনা করিলে তবে অপহৃত বস্তু ফিরাইয়া দেয়।

সরযূও যেন হতশ্রী। কলিকাতার ভাগীরথীর অর্দ্ধেক। স্নান করিবার প্রধান অসুবিধা—কচ্ছপ। সামান্য খাদ্য জলে ফেলিলেই দলে দলে কচ্ছপ ভাসিয়া উঠে। একটা কথা শুনিয়াছিলাম, আমাদের ভাগ্যে দেখিবার সুযোগ হয় নাই। সকালে লোকে নদীতটে শ্রাদ্ধাদি করিয়া জলে ভোজ্য নিক্ষেপ করিলে দলে দলে কচ্ছপ উহা খাইতে ভাসিয়া উঠে, আহারলুব্ধ বানরগণও কচ্ছপের পিঠে চড়িয়া ভাসমান খাদ্য খাইতে আরম্ভ করে। বানরের ভার অসহ্য

হইলে কচ্ছপ জলে ডুবিয়া যায়, বানর তখন আর একটি ভাসমান কচ্ছপের উপর লাফাইয়া পড়ে।

ইহার পর হরিদ্বার, পুরী ও দার্জিলিং সুন্দর, হরিদ্বারের সৌন্দর্য্য আরও বেশী। একদিকে নগরাজ হিমালয়, অপর দিকে পতিতপাবনী গঙ্গা। কি সুন্দর নদী! বরফ-গলা সুশীতল, সুন্দর, নির্ম্মল জলরাশি উপর হইতে বেগে নামিতেছে। নদীগর্ভে মাঝে মাঝে ছোট-বড় প্রস্তরখণ্ড। তাহাতে প্রতিহত জলরাশি ঝরণার সৃষ্টি করিয়াছে। সূর্য্যালোকের নিপাত পরিবর্ত্তনে জলকণা-গুলিরও বিচিত্র বর্ণ ও রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। জলের এত বেগ যে এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়াইতে রীতিমত কষ্ট লাগে—যেন ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে বোধ হয়। কাচের মত স্বচ্ছ জলরাশির ভিতর দিয়া নদীগর্ভের পাথর, শেওলা ও জলজ জীব দেখা যায়।

ব্রহ্মকুণ্ড নদীর সহিত সংযোগসম্পন্ন এক ছোট সরোবর মাত্র; শত-শত লোকে সেখানে নিত্য স্নান করে। অগণ্য মৎস্য মানুষগুলির গায়ের তেল খাইবার লোভে লোকের গায়ে ধাক্কা দিতে থাকে। এখানে জীবহিংসা করা নিষিদ্ধ, কাজেই মাছগুলিকে কেহ ধরে না বা মারে না। তাহারা নির্ভয়ে মানুষের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া ঘুরিতে থাকে।

একদিন গুরুকুল আশ্রমে গিয়াছিলাম। নদীর ওপারে। নৌকায় পার হইতে হয়। সামান্য চওড়া নদী এখানে। কিন্তু জলের এতই তোড় যে পার হইতে ঘণ্টাখানেকেরও বেশী লাগিয়াছিল। লালা মনসা রায় তখন আশ্রমে ছিলেন। ইনিই পরে সন্ন্যাস লইয়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নামে খ্যাত হন। কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ইহারই নামে। ইনিই গুরুকুলের প্রাণ ছিলেন। আমরা শিক্ষা-ব্যবসায়ী জানিয়া আমাদিগকে সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজেই দেখাইলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে স্থানটি প্রকৃতই অপরূপ। তবে শুনিলাম মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া হয়। পূর্ব্বে হরিদ্বারেও বর্ষার পর খুব ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল, এখন শুনিলাম কতকটা কমিয়াছে। কয়েকটি বাঙ্গালীর ছেলেও এখানে পড়ুয়া হিসাবে রহিয়াছে। ছেলেদের ঘোড়ায় চড়া ও অন্যান্য শারীরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদিগকে নিরামিষ খাইতে হয়। ছেলেদের শরীর কিন্তু বাঙ্গালী স্কুল-কলেজের ছেলেদের মতই—শিখ, জাঠ বা পাঠানের মত বলবান্ বা বীরবপুবিশিষ্ট নহে।

হরিদ্বার হইতে ট্রেনে হৃষীকেশ রোড ষ্টে পৌঁছিলাম। এইবার হাঁটিয়া হৃষীকেশ যাইতে হইবে।

সঙ্গে রাত্রি কাটাইবার উপযোগী শীতবস্ত্র ও বিছা ছিল। সেগুলি বহিবার জন্য একজন কুলি পাওয়া গে লোকটির বাড়ী রাজপুতানায়, জাতিতে রাজপুত। শীর্ণদে দীর্ঘাকার লোকটি। দেশের কথা তোলায় দেশভক্তি আপ্লুত হইয়া উঠিল। খুব স্বাস্থ্যকর দেশ। চমৎক হজমী জল। তবে শুধু যা অসুবিধা—অন্নবস্ত্রের। জন্যই এখানে আসা কাজ করিতে। এ অঞ্চলের ম্যা রিয়ায় আক্রান্ত হইয়া শরীরটা ক্লিষ্ট হইয়াছে। তা খাবার তৈরী হইতেছিল। বলিল, আহার শেষ করি আমাদের সঙ্গী হইবে। জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাত খায় কেন? সে উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই সঙ্গীকে দেখা বলিল—ভাত খাইলে বাঙ্গালী বাবুর মত নরম চে হয়।

পথে হ্যাট-কোট ও শর্ট পরা ছোট-খাট একটি লো সহিত দেখা হইল। পরিচয় হইল। লোকটি পুলি সাব্-ইন্‌স্‌পেক্‌টার। আমাদেরই মত হৃষীকে যাইতেছে। পথ প্রায় ৬।৭ মাইল, হাঁটিয়া যা হইবে। লোকটি মথুরার এক চোবে-ব্রাহ্মণ। বলি আমরা ত' মথুরার চোবে বলিলে আধমণ খায়, পাঁচ ওজন হয়, লম্বায় সাত ফুট—এইরূপ জানি; তবে এ সং সংস্করণ চোবে কি প্রকারে হইল! লোকটি হাসিয়া বলি লেখাপড়া শেখা চোবেরা বাঙ্গালীদের মতই হইতেছে।

লোকটি বেশ মিশুক। আমাদেরই বয়সী। আমা বেশ কাজে লাগিয়াছিল। তাহার সাহায্য না পা ফুর্ত্তি একটু বেশী মাত্রায়ই হইত। সে যাইতেছে এ উদ্ভ্রান্ত করিতে। এক সাধু গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবার চে করিয়াছিল, নিকটের স্নানার্থীরা রক্ষা করে। আ হত্যার চেষ্টায় পুলিশ কেস্। এ রকম প্রায়ই হয়। হি শাস্ত্রে কয়েকবিধ আত্মহত্যার বিধান আছে। শরীর য অপটু হয় বা অসহ্য হয় সাধুরা তখন চার উপায়ে আত্মহ করিতে পারে। গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ, পর্ব্বতশৃঙ্গ হই উৎপতন, প্রায়োপবেশন (উপবাস) ও অগ্নি-প্রবেশ।

মাইল দেড়েক যাওয়ার পর আমাদের মোটবাহক রাজপুত বীর কোঁ কোঁ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বলিল, আর সে যাইতে পারিবে না; বোখার (জ্বর) আসিতেছে। অগত্যা তাহাকে রেহাই দিয়া নিজ নিজ মোট ঘাড়ে করিয়া চলিতে হইল। ইন্‌স্পেক্‌টারও মাঝে মাঝে সাহায্য করিল। সামনে একটি ছোট নদী। জল সামান্য,—এক ফুট মাত্র। উপরে একটা পোল (সেতু) রহিয়াছে; কতক-গুলি বাঁশ মোটা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া এই সেতু তৈরী হইয়াছে। বাঁশের পর বাঁশের উপর দিয়া সন্তর্পণে যাইতে হয়। সেতু এমন দুলিতে থাকে যে মনে হয় এখনই পড়িয়া যাইব। কেহ কেহ এরূপ সেতু দিয়া পার হওয়া অপেক্ষা জুতা খুলিয়া হাঁটিয়া নদী পার হইল। পাহাড়ে নদী, এই অল্প জল রহিয়াছে, একটা বড় বৃষ্টি হইলে এখনই আবার ৭।৮ ফুট জল হইয়া যাইবে। আর জলের কি প্রচণ্ড বেগ!

নদী পার হইয়া খানিক যাইবার পর একটি লোককে দেখিলাম। অমন চমৎকার দেহ কমই দেখিয়াছি। প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, বিশাল বক্ষ, সুগঠিত মাংসপেশী-সমূহ। কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য রঘুবংশের 'দিলীপে'র ভূমিকায় ইহাকে নামাইলে তবেই "যেন মানায়—সেই ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।" ইন্‌স্পেক্টার তাহার সহিত আলাপ জমাইয়া লইল; মাঝে মাঝে আমাদের বুঝাইয়া দিল। লোকটির বাড়ী পাহাড়ের উপর। জাতিতে গজ্জর (গোয়ালা) মুসলমান। হিন্দু গজ্জরও আছে। গজ্জররা চিরকালই বীর জাতি।

আর খানিক পরেই আর একটি ছোট নদী। জল এক হাঁটু বা একটু বেশী। স্বচ্ছশীতল বরফ-গলা যত জল প্রচণ্ড বেগে চলিয়াছে। ছ' ইঞ্চি গভীর জলে নামিলেও মন-পা রাখিতে কষ্ট হয়—এমনই জলের তোড়! ইন্‌স্-পেক্টার গোয়ালার সঙ্গে বেশ ভাব জমাইয়া লইয়াছিল। তাহাকে মিষ্ট ভাষায় গোয়ালাকে বলিল, বাবুরা কলিকাতার লোক, পাহাড়ে নদী পার হইতে অনভ্যস্ত। সে মেহের-বানি (করুণা) করিয়া তাহাদের পার করিয়া দিতে পারে কিনা? মিষ্ট কথায় ফল হইল। লোকটির অতিথি-সেবা জাগিয়া উঠিল, বাবুদের সে দু' হাতে করিয়া পিঠে (দু'টি বাবুর দু' মণেরও বেশী ওজন) নদী পার করাইয়া দিল। ইন্‌স্পেক্টারও এ 'মেহেরবানি' হইতে বঞ্চিত হইল না। তার পর আমাদের বিস্ময়! লোকটিকে যখ বক্‌শিস্ দিতে গেলাম সে কিছুতেই লইল না। এই সামা কাজের জন্য সে বকশিস্ লইবে কি! এইরূপ ভদ্রতা অ একটি তথাকথিত "ছোটলোকের" কাছ হইতে পাইয় ছিলাম, কলিকাতায়। জুতায় একটা কাঁটা উঠিয়াছি পায়ে লাগিতেছিল। এক মুচি কাজ করিতেছিল, তাহা সাহায্য চাহিলাম। সে জুতাটি লইয়া তাহার হাতুড়ি দি পেরেকটিকে ঠিক করিয়া দিল। যখন একটি আ তাহাকে পারিশ্রমিক দিতে গেলাম সে তাহা কিছুতে লইল না।

নদী পার হইয়া খানিক চলিয়া একটা ছোট ধর্ম্মশালা পৌঁছিলাম। কালী কম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালা। সাধু নামে ধর্ম্মশালা। গল্পটি এই: সাধু বদরিকাশ্রম ভ্রমণে সময় পথে খুব কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাই ফিরিয়া আসি যাত্রীদের এই কষ্ট দূর করিবার জন্য তিনি কৃতসংক হইলেন, এবং অনেক বছরের চেষ্টায় ধনীদিগকে দিয়া নিজে উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করাইতে পারিলেন। তাই বদরিকা-শ্রমের সমস্ত পথের মাঝে মাঝে সুবিধাকৃত দূরে একটি করিয়া ধর্ম্মশালা সংস্থাপিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মশালাটি রাত্রিবাসের জন্য নহে। এখানে অল্প কয়েকজন লোক থাকে, আর কতকগুলি গরু ও মহিষ থাকে। জঙ্গলে তাহারা চরিয়া খায়। যা দুধ দেয় তাহা হইতে ঘোল তৈয়ারী করা হয়। বড় বড় জালায় এই ঘোল রাখিয়া দেওয়া হয়। পান্থ মাত্রেই বিনা পয়সায় ইহার এক লোটা পায়। রৌদ্রে ভ্রমণের পর এই ঘোল আমাদের কাছে অমৃতবৎ লাগিল। হৃষীকেশের ধর্ম্মশালা প্রকাণ্ড। এখানে ২।৩ শত লোকের থাকিবার ও খাইবার ব্যবস্থা আছে। ইন্‌স্পেক্টারের খাতিরে আমরা ভাল ঘর পাইলাম। বেলা ৩টা-৪টার সময় ধর্ম্মশালার খাবার পাইলাম। দুই তিন-খানা মোটা রুটি ও খানিকটা ঘন ডাল। সকলই বিনামূল্যে। যাত্রী ও সাধুরা ইহা পাইয়া থাকে। রাত্রে কিছু পায় না। তিনখানা রুটিতেই প্রায় আধ সেরের উপর আটা থাকে। উহা হজম করিতে পুরা একদিনই লাগে। হৃষীকেশ স্থানটি হরিদ্বার হইতেও সুন্দর—তপস্যার স্থান। শুনিলাম এখানে অনেক সাধু তপস্যার জন্য জঙ্গলে বাস করেন। খাবারের ভাবনা ভাবিতে হয় না। শুধু একটা থাকিবার কুটীর বা

গুহা যোগাড় করিলেই হইল। শীতের সময় সাধুদের কম্বলও দেওয়া হয়। সময়ে সময়ে কাপড়ও দেওয়া হয়।

লছমন-ঝোলা

লছমন ঝোলা হৃষীকেশ হইতে অল্প দূরে। নদী ও পাহাড়ের সৌন্দর্য্য আরও বেশী। দু'ধারের পাহাড়ের গভীর তল দিয়া নদী প্রবল বেগে বহিতেছে। একদিকে নদী, তারপরই পথ—পর্ব্বতের গা বহিয়া চলিয়াছে। পথের ধারে পর্ব্বতের গাত্র নানা জাতীয় গাছপালা দিয়া ছবির মত সাজান। নদীর ওপারের পর্ব্বতগাত্রের ছোট-বড় গাছগুলিও সুন্দর দেখায়। নদীর উপর স্থাপিত পর্ব্বতগাত্র-সংলগ্ন মন্দির কয়টিও সুন্দর। একটি শান্তিময় ভাব বিদ্যমান। স্নান করিতে গেলে দোতালা-সমান সিঁড়ি নামিয়া তবে জল পাওয়া যায়।

সেতুর নাম হইতেই লছমন-ঝোলা নাম হইয়াছে। ঝোলা—অর্থ সেতু। পূর্ব্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রজ্জু দিয়া নদীর এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত বাঁধিয়া দেওয়া হইত। রজ্জুর সহিত বাঁশ বাধিয়া সেতু নির্ম্মাণ করা হইত। অনেক দিন হইল কোন পর্ব্বোপলক্ষে বহু লোক সেতুতে উঠায় সেতু ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে পড়ে, অনেকে মারা যায়। আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন সুদৃঢ় লৌহ রজ্জু দিয়া নব্য সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। চলাচলের খুবই সুবিধা।

হৃষীকেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় কুলির পরিবর্ত্তে অশ্ব মিলিল। পাহাড়ে ঘোড়া। গাধা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎকায়। ঘোড়ার উপর আমাদের বিছানা ও শীতবস্ত্র দিয়া আসন করিয়া আমরা তদুপরি আসীন হইয়া যাত্রা করিলাম। ঘোড়াগুলি খুব সাবধানী, প্রত্যেকটি পা বেশ বিচার করিয়া ফেলিতে লাগিল। যাত্রার বেগ হাঁটার অপেক্ষাও ধীর হইল। কোনও রকমেই অশ্বদিগকে উত্তেজিত করা গেল না। এমন কি কশাঘাতেও না। কশা অবশ্য যদৃচ্ছা-সংগৃহীত পাশের জঙ্গুলে গাছের ছোট ডাল মাত্র। নদীর ধারে অশ্ব-রক্ষকগণ আসিয়া ঘোড়ার মুখ ধরিয়া পার করিয়া দিল।

ট্রেনের দেরী আছে। বিশ্রামের জন্য হৃষীকেশ রোড ষ্টেশনের ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। দেখিলাম একটি মাদ্রাজী যুবক সিক্ত কলেবরে কাঁপিতেছে। অনেক লোক তাহার চারিধারে। সে-দেশী লোকের হিন্দি আমরা যা-ও বুঝি সে তাহাও বুঝে না। কেহই তাহার কথা বুঝে না। আমরা আসায় তার বিপদ্ ঘুচিল। তাড়াতাড়ি তাহার বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করাইয়া ও শীত নিবারণ করিয়া আমরা তার কাহিনী শুনিলাম তাহা এই :—লোকটি আমাদেরই মত এক অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিতেছিল। একটা ডালের সাহায্যে সে অশ্বকে তাড়াতাড়ি হাঁটাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াও বিফল হয়। শুধু তাই নয়, অশ্ব চলিতে চলিতে হঠাৎ এক শ্যামল তৃণক্ষেত্র দেখিয়া সেখানে নামিয়া ঘাস খাইতে সুরু করে। তাহাকে সরাইবার অভিপ্রায়ে সে বেশ কয়েক ঘা প্রহার দেয়। তখন অশ্বও উত্তেজিত হইয়া লম্ফ ঝম্প করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেয়, পদাঘাত করিতেও ইতস্ততঃ করে না। তারপর সে আবার ঘাস খাইতে মনোনিবেশ করে। মাদ্রাজীটি উহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলে এবার সেও তাহাকে কামড়াইবার চেষ্টা করে। অগত্যা বেচারা অশ্ব-সুখের আশা ত্যাগ করিয়া নিজে বোঝা মাথায় করিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু নদী পার হইবার সময় সে পড়িয়া যায় এবং বেশ চোট লাগে। সৌভাগ্যক্রমে ভাসমান বিছানা নিকটেই একটা জঙ্গলে আটকাইয়া গিয়াছিল। পরে তাহা সংগ্রহ করিয়া অনেক কষ্টে নদী পার হইয়া এখানে আসিয়াছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

মাছি-সমস্যা

লিভারপুলের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে বলেছেন, মাছিরা নীল আর সবুজ রং খুব পছন্দ করে, বেগুণী রংও নেহাৎ মন্দ লাগে না তাদের কাছে, কিন্তু লাল, হলদে বা কমলা লেবু রং তারা মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। একটা মাছি-ভর্ত্তি ঘরে লাল আর সবুজ পর্দ্দা টাঙ্গিয়ে দেখা গেছে ঘরের সমস্ত মাছি সবুজ পর্দ্দার ওপর গিয়েই বসে, লাল পর্দ্দায় একটিও যায় না। হলদে পর্দ্দার বেলাও ঐ কথা খাটে। তোমরা সবাই জান, মাছি হচ্ছে নানা রকম বীজাণুর বাহক। মাছি তাড়াতে পারলে সেই সঙ্গে অনেক রোগের হাত থেকেও কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়। এই বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন,—রান্নাঘর, রোগীর ঘর ইত্যাদির দেয়াল লাল, হলদে বা কমলা রং দিয়ে 'ডিস্‌টেম্পার' করে নাও এবং জানলা-দরজায় ঐ সব রংএর পর্দ্দা টাঙ্গিয়ে দাও, মাছি এবং সেই সঙ্গে মাছি-থেকে-আসা রোগের জীবাণু আপনি পালাবে।

দীর্ঘায়ু হবে কেমন ক'রে

তোমরা জোরো আগার নাম অনেকেই হয়তো শুনেছ। বছর কয়েক হ'ল ইনি মারা গেছেন। মৃত্যুকালে এঁর বয়স ১৫০ বছর ছাড়িয়ে গিয়েছিল—১৭৭৪ সনে নাকি ইনি জন্মেছিলেন! বছর পনেরো আগে জোরো আগাকে নিয়ে সংবাদপত্র-মহলে খুব হৈচৈ পড়ে। ঐ সময় তিনি ১৫৬ বছর বয়সে নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন এবং বিবাহের জন্য একটি তরুণী পাত্রীর খোঁজ করছিলেন। তাঁর আগে অবশ্য তিনি পর পর ১২টি বিয়ে করেন। সে স্ত্রীরা কেউই তখন বেঁচে ছিলেন না। জোরো আগার বাড়ী ছিল তুরস্কে। জাতিতে তিনি ছিলেন মুসলমান।

জোরো আগা বলতেন, তাঁর দীর্ঘায়ু হবার একটি প্রধান কারণ মাদক দ্রব্য ব্যবহার না করা। জীবনে তিনি মদ বা তামাক খান নি। অবশ্যি মদ-তামাক খান না এমন লোক পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ আছে; তাদের সবাই ও বেশী দীর্ঘায়ু হয় নি।

ঠিক ঐ সময়, অর্থাৎ বছর পনেরো আগে, ব্রেজিলে রোজা ডি-কোষ্টা নামে একটি মহিলার মৃত্যুসংবাদ কাগজে বেরিয়েছিল। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ১৬০ বছর। মরবার আগে তিনি যে সব বংশধর দেখে যান তার একটি ফর্দ্দ শোন :—১৪টি ছেলে, ৩টি মেয়ে (এদের মধ্যে অনেকে ১০০ বছরের বেশী বেঁচে ছিলেন), নাতি-নাতনী—ছেলে ঘরের এবং মেয়ের ঘরের মিলে ১২৪টি, প্রপৌত্র-প্রপৌত্রী, প্রদৌহিত্র-প্রদৌহিত্রী মিলে ২৩০ জন, এবং তাদেরও ১৪টি ছেলে-মেয়ে। ইনি স্বাভাবিক লোকের মতই জীবন কাটাতেন, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তেমন বাছ-বিচারের কথা শোনা যায় নি।

বিখ্যাত সাহিত্যিক বার্ণার্ড্ শ'র বয়স প্রায় নব্বই তিনি এখনও বেশ শক্ত আছেন। তাঁর ধারণা নিরামিষ খাওয়ার দরুণই তাঁর এই দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য।

ডাঃ রাউচাকফ্ নামে একজন বৈজ্ঞানিক কিছুদিন আগে খাদ্যতত্ত্ব নিয়ে পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটে গবেষণা করতেন নানা রকম পরীক্ষা ক'রে তিনি জানান—দীর্ঘায়ু হবার একটি সহজ উপায় হচ্ছে সব জিনিষ কাঁচা খাওয়া। তাঁর মতে রান্না করা খাবার থেকেই যত রাজ্যের অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের আবির্ভাব হয়, রক্তে সাদা কোষ বাড়ে—যা নাকি দীর্ঘায়ু হবার পক্ষে মস্ত বাধা। তিনি সবাইকে জন্তু-জানোয়ারদের মত সমস্ত খাবার কাঁচা খেতে পরামর্শ দিয়েছেন।

মরণ-ডাকা পরীক্ষা

বৈজ্ঞানিকেরা সত্য আবিষ্কারের জন্য অনেক সময়

জীবন তুচ্ছ ক'রে নানা রকম পরীক্ষা চালান সে খবর তোমরা অনেকে শুনেছ। অবশ্য কোন কোন আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক মন-গড়া গল্পও প্রচলিত আছে যা নাকি সত্যি ব'লে চালান হলেও একেবারেই ভুয়ো। পটাসিয়াম্ সায়ানাইড্ একটি মারাত্মক বিষ। এই বিষ সামান্য পরিমাণ খেলে বা রক্তের সঙ্গে মিশলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। এই বিষের স্বাদ কি রকম সেই কৌতূহল মেটাতে পর পর দু'জন বৈজ্ঞানিক প্রাণ দিয়েছিলেন ব'লে একটা গল্প প্রচলিত আছে। প্রথম জন জিভে দিয়ে লিখলেন S—। বাকিটা লেখা শেষ না ক'রেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। S বলতে Sweet (মিষ্ট) না Sour (টক্) তা ঠিক করা গেল না; তাই আর একজন তা খেয়ে S এর পর W কথাটি বসিয়ে মৃত্যু-বরণ করলেন। দু'জনের প্রাণের বিনিময়ে জানা গেল—জিনিষটার স্বাদ মিষ্টি। গল্প শুনেই বুঝতে পার এটি একেবারেই গাঁজাখুরি। এ রকম ধরণের পরীক্ষা করতে যাবেন এমন বোকা, আর যেই হোন, বিজ্ঞানীরা ন'ন।

কিন্তু নীচে যে ডাক্তারটির কাহিনী বলছি তাঁর সম্বন্ধে গল্পটি সত্য বলেই শোনা গেছে। এই ডাক্তারটির নাম ডাঃ হাণ্ড্স্, বাড়ী ইংল্যাণ্ডে। ৬৩ বছর বয়সের সময় একদিন তাঁর খেয়াল হ'ল মৃত্যুকালে মানুষের মানসিক অবস্থা কেমন হয় তাই নিয়ে তিনি পরীক্ষা করবেন। একদিন রাত্রে খানিকটা বিষ মুখে পূরে তিনি টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন এবং ধীরে ধীরে, মৃত্যু যত এগিয়ে আসতে লাগল, নিজের মনের অবস্থার বর্ণনা কাগজে লিখে যেতে লাগলেন। সকালে দেখা গেল, ডাক্তারের প্রাণহীন দেহ লিখবার টেবিলের উপর পড়ে আছে। টেবিলের উপরকার লেখা দেখে আসল ব্যাপারটা জানা গেল।

বিশেষজ্ঞেরা কিন্তু ডাক্তারের লেখা সত্ত্বেও ব্যাপারটা বিশ্বাস করেন নি। ডাঃ হাণ্ড্স্ পৃষ্ঠব্রণে বহুদিন থেকে ভুগছিলেন এবং তার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠতেন—বহু চেষ্টা ক'রেও তা সারাতে পারেন নি। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, ঐ থেকেই ক্রমে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায় এবং মস্তিষ্কের সেই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তিনি ঐ ভাবে আত্ম-হত্যা করেছিলেন।

ছোট্ট দ্বীপের ছোট্ট কাহিনী

অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে থার্স্‌ডে আইল্যাণ্ড্ (বৃহস্পতিবারের দ্বীপ) ব'লে একটি ছোট্ট দ্বীপ আছে। দ্বীপটির নামকরণ কেন অমন হয়েছিল বলা যায় না—সম্ভবতঃ কোন ভ্রমণকারী বৃহস্পতিবার ঐ দ্বীপটি আবিষ্কার ক'রে পরের দিন আর একটি দ্বীপের সন্ধান পান। কারণ তার পাশেই আর একটি দ্বীপের নাম ফ্রাইডে আইল্যাণ্ড্ বা শুক্রবারের দ্বীপ। যাই হোক্, থার্স্‌ডে দ্বীপ খুবই ছোট—এত ছোট যে ম্যাপে ওর নাম প্রায়ই থাকে না—কাছাকাছি না গেলে ওর কথা জানাই মুশ্‌কিল।

দ্বীপটির লোকসংখ্যা মাত্র দু' হাজার—অর্থাৎ ছোট-খাট একটি গ্রামের মত। কিন্তু অত কম লোক হ'লেও সেই লোকেরা নেহাৎ গরীব নয়। তারা বেশীর ভাগই মুক্তা-ব্যবসায়ী এবং ঐ ছোট্ট দ্বীপটি ও-অঞ্চলের মুক্তা ব্যবসার একটি ভাল আড্ডা।

স্থানীয় লোকেদের জীবনযাত্রাও নেহাৎ সেকেলে নয়। ঐ ছোট্ট দ্বীপের একটি ছোট্ট নিজস্ব দৈনিক খবরের কাগজও আছে,—কাগজটির নাম "ডেলি পাইলট্"। একজন মহিলা এই কাগজখানি চালান।

ছোট্ট দ্বীপের কথা বলতে স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমে অবস্থিত আর একটি ছোট্ট দ্বীপের কথা মনে পড়ল। এটির নাম সেণ্ট ফিল্ডা। এই দ্বীপটি কিন্তু থার্স্‌ডে দ্বীপের মত সমৃদ্ধি-শালী নয়। অবশ্য আগে এখানে অনেক লোক থাকত,—চাষবাস, পশুপালন ইত্যাদির সাহায্যে জীবিকা অর্জ্জন করত তারা। কিন্তু দ্বীপটি ক্রমে অনুর্ব্বর হ'তে হ'তে শেষে মনুষ্যবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। শেষ যখন তার খবর পাওয়া যায় তখন সেখানকার লোকসংখ্যা ছিল ৩৬। সামান্য কয়েকটি গরু-ভেড়া সম্বল ক'রে কোন রকমে তারা দিন গুজরান করত। শেষে যখন তাও সম্ভব হ'ল না তখন সেই ৩৬ জন অধিবাসীও দ্বীপটি ত্যাগ ক'রে অন্যত্র আস্তানা গাড়ল।

কিছুদিন আগে এফ্ ভ্রমণকারী সেণ্ট ফিল্ডা বেড়াতে গিয়ে সেখানে একটিও মানুষ দেখতে পান নি; এমন কি অন্য কোন বড় প্রাণীও তাঁর চোখে পড়ে নি। এখন নাকি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইঁদুরের রাজত্ব!

ম্যাজিক দেখানো সহজ নয়!

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

আমাদের আড্ডার ঢালাও ফরাসের এক কোণে কাৎ হয়ে একটা গল্পের বইয়ের থই পাবার চেষ্টায় আছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তি (যাদুকর পি-সি-সোরকার মশায়ের সগোত্র কিনা বলতে পারি নে) এক জোড়া তাস হাতে আমাকে আক্রমণ করলো।

"আসুন, আপনাকে একটা ম্যাজিক দেখাই।" তাস ভাঁজতে ভাঁজতে তিনি বল্লেন।

"ম্যাজিক দেখাবেন?" দেখবার আগেই আমি অবাক্।

"হ্যাঁ; এর থেকে একখানা তাস টানুন দেখি?" ময়ূরের পেখমের মত তাসগুলি আমার সামনে তিনি সুবিস্তৃত করলেন।

"তাস টানব? কেন বলুন তো?" আমার বিস্ময় বাড়ে।

"টানুন না। টানলেই দেখতে পাবেন।"

"কী হবে টেনে? তাসের আমার কোনো দরকার নেই।" আমি জানালাম।—"তা ছাড়া, একখানা তাস নিয়ে আমি কী করবো!"

"কী আবার করবেন! তাসখানা আপনাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি নাকি? আপনি শুধু টেনে রাখুন। আমি আপনাকে বলে দেব যে কী তাস।"

"বটে? আপনি বলে দেবেন?" আমাকে উঠে পড়তে হ'ল এবার: "তা, কোন্ তাসখানা টানবো বলুন তো?"

"আহা, আমি বলব কেন? তা আমি বলে দেব না। আপনি নিজের ইচ্ছেমত টানবেন, আমি কেবল বলে দেব যে কোন্‌খানা আপনি টেনেছেন।···এই সহজ কথাটা আপনার মাথায় ঢুকছে না? কী আশ্চর্য্য!" এবার তাকেই একটু অবাক্ দেখা যায়।

"আমার যেখানা খুসি টানতে পারি?" জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ।"

"যে রঙের ইচ্ছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"গোলাম, সাহেব, টেক্কা—যা প্রাণ চায়?"

"যা খুসি—টানুন্ মশাই।"

"আমার পছন্দ মতো বেছে নিতে বলছেন? বেশ, তা হ'লে হরতনের বিবিকেই আমার পছন্দ।" আমি বল্লাম: "রঙটাও ফরসা, আর দেখতেও খুব খারাপ নয়।"

"আহা, আমি এই জোড়ার ভেতর থেকে পছন্দ ক'রে টানতে বলছি না?" তাঁকে একটু বিরক্তই দেখা গেল।

"ও! এর ভেতর থেকে খুঁজে বের করে নিতে হবে? তাই বলুন! বেশ, তা হ'লে তাসগুলোকে ভালো ক'রে চিতিয়ে ধরুন—খুঁজে দেখি। হ্যাঁ, হয়েছে—" ছত্রাকারে বিস্তারিত রঙ-বেরঙের নানান্ তাসের ভেতর থেকে টেনে নিলাম একখানা—কি করব?

"হ্যাঁ, হয়েছে। টেনেছি একখানা।"

আমার এই টানাটানির সময়ে, কেন জানি না, লোকটা চোখ বুজে বসেছিল। সঙ্কোচ বশতঃই বোধ হয়। যাই হোক্, এবার সে চোখ খুলে বল্ল: "টেনেছেন?"

"হ্যাঁ। হরতনের বিবি।···আপনি জানতেন নাকি?"

"কী মুস্কিল!···আপনি কেন বল্লেন? বল্‌তে গেলেন কেন? ও তো আমি ব'লে দেব।"

"ও, আপনি বলতে চান? তা বলুন না, কে বারণ করছে?" আমি বলি।

"ও কিচ্ছু হয় নি। আবার টানতে হবে।" আরেক-বার তিনি তাসের প্রদর্শনী মেলে ধরলেন: "টানুন আবার।"

"একখানাই টানবো তো? নাকি, এবার বেশী?"

"না, একখানা টানুন।"

"আচ্ছা, টেনেছি।"

"জোড়ার মধ্যে রেখে দিন। আর সব তাসের মধ্যে মিলিয়ে যেখানে আপনার খুসি। রেখে দিন।"

হুকুম তামিল করলাম। তিনি ফটাফট্ তাসগুলোতে পিটোতে লাগলেন—পিটে দুরস্ত ক'রে তার পরে তাদের

একটাকে টেনে এনে সগর্ব্বে আমার হাতে তুলে দিলেন—"এই নিন আপনার তাস। কেমন, এই তাস তো?"

"তা তো জানি নে। তাসখানা টেনেছিলাম, কিন্তু দেখা হয় নি। দেখতে ভুলে গেছি।"

"দেখেন নি একদম্? কী আপদ!" তাঁকে বেশ রাগত দেখি।

"কই আর দেখতে পেলাম! জোড়ার মধ্যে জুড়ে দেবার জন্যে যা আপনি তাড়া লাগালেন—তাকাবার ফুরসৎ পেলাম না।"

"ছ্যা। তাসখানা দেখে রাখবার দরকার ছিল যে! আপনার এই সামান্য কর্ত্তব্যজ্ঞান নেই? কী আপনি! ছিঃ!" বারম্বার আমাকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বল্লেন—"দেখে-টেখে তার পরে আপনার রেখে দেয়া উচিত ছিল—এটুকুও আপনি জানেন না?"

"কি ক'রে জানব? তা—আপনি কি তাসখানা আমাকে দেখে রাখতে বলেন?"

"আল্‌বৎ। নিন, টানুন আবার।"

"হয়েছে, টেনেছি।"

ফটাফট্—ফটাফট্—ফটাফট্—তাস ফাঁটানো চল্‌লো তাঁর।

"কী সর্ব্বনাশ! কোথায় গেল তাসখানা? এর মধ্যে রেখেছিলেন তো?"

"আজ্ঞে না। দেখে রেখে দিয়েছি। আপনি তো তাই বল্লেন—" সুরক্ষিত তাকিয়ার তলদেশ থেকে বের ক'রে তাসখানা তাঁর হাতে তুলে দিলাম। উনি তাস-টাকে না দেখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"আপনার মুণ্ডু! আপনার মতো আনাড়ি লোক আমি জন্মে দেখি নি। বল্‌ছি কি—একখানা তাস টানুন—মাত্র একখানা—একাধিক নয়। একাধিক বোঝেন? মানে, একখানার বেশি নয়। 'তার পর দেখুন সেটা কোন্ তাস—ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখুন—বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?"

"আজ্ঞে না। আপনি নিবিড় ভাবে নিরীক্ষণ করতে বল্‌ছেন।"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই। নিরীক্ষণ—পর্য্যবেক্ষণ যা করবার সব করুন। এমন ভাবে দেখুন যাতে সেটা আপনার স্মৃতিপটে গাঁথা হয়ে যায়—তার পরে সেই তাসটাকে—তাকিয়ার তলায় না, কোথাও না—আমার হাতের এই তাস জোড়ার মধ্যে রেখে দিন—আপনার খুসিমতো যে কোনো জায়গায়। এবার বুঝলেন? পরিষ্কার হ'লো?"

"ভোর বেলার মতো পরিষ্কার। আচ্ছা, টানি তা হ'লে? টানব?" বল্‌তে কি, এতক্ষণে আমার বেশ কৌতূহল হয়েছিল।

"বল্‌ছি তো। টানুন না!" ব'লেই তিনি ফের চোখ বুজলেন।

তাঁর অনুমতি লাভের পর আর আমি দেরি করি না। —"নিন, টেনেছি। টেনেছি এবং দেখেছি। দেখে-শুনে, —না, আপনার ভয় নেই, তাকিয়ার তলায় কি নিজের পকেটে রাখি নি—আপনার হাতের আর সব তাসের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছি। তাই তো আপনি চাইছিলেন —না? এবার দয়া ক'রে তাসখানাকে বার করুন তা হলে—"

সপাসপ্—সপাসপ্—সপাসপ্—! চাবুকের আওয়াজের মত পিঠে পিঠে বিভক্ত তাসের ওপর পুনঃ পুনঃ করাঘাত চল্ল।

আমি থ হয়ে দেখতে লাগলাম।—"অবাক্ আপনার ক্ষমতা মশাই! কি ক'রে যে আপনি বার করবেন আমি তো তা ভেবে পাচ্ছি নে। নিশ্চয় আপনি অন্তর্যামী তা না হলে—" না ব'লে আমি পারি না।

মৃদুমধুর হাসিতে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি কিছু বলেন না। নীরবে তাস ফেটে চলেন।

তার পরে সেই চরম মুহূর্ত্ত আসে—যা প্রত্যেক তাসের ম্যাজিকওলার জীবনেই দেখা দেয়—এক-আধবার নয় বারে বারে উঁকি মারে।

"এই নিন আপনার তাস।" উক্ত মুহূর্ত্তে তিনি আমাকে উপহার দেন।

"না, এ আমার তাস নয়।" আমি বল্লাম।

আমার এই মিথ্যাবাদিতার জন্য বিধাতা আমাকে মাপ করবেন আমি আশা করি। মহামতি যীশুকে অকারণে যারা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল তাদের পাপ এ ভদ্রলোকের চেয়ে কিছু বেশি ছিল না। ইনিও জানেন না যে ইনি কী করছেন! এতক্ষণ ধরে কী জ্বালাতনই না করছেন আমায়!

'য়্যাঁ, এ তাস আপনার নয়?—!!!—তা কি ক'রে হবে? কক্ষণো আমার ভুল হ'তে পারে না।···আচ্ছা, আর এক বার নিন। নিন তো···কি ক'রে এ হয়! এই ম্যাজিক আমি বাবাকে দেখিয়েছি, মাকে দেখিয়েছি, দিদিমাকে দেখিয়েছি, আমার ভাইবোনদের দেখিয়েছি··· পাড়ার কোলো-ভুলো, ইতু-ভুতুকে দেখিয়েছি···এমন কি আমার তিন বছরের ছেলে মণ্টু—বেশি কী বলব—আমার ছ'মাসের মেয়ে আন্নাকালীও দেখেছে—কারো বেলায় ভুল হয় নি—কখনো হয়নি—আর এখন হবে! হ'তেই পারে না। আচ্ছা, টানুন আপনি আর একবার। (পুনশ্চ সপাসপ্—সপাসপ্—সপাৎ!) এই—এই আপনার তাস।"

"না মশাই, মাপ করবেন, এ তাস আমার নয়। কার তাস আমি জানি নে। আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? তবু আপনি বলবেন এ তাস আমার! বলুন, আপনার যা খুসী বল্‌তে পারেন, আমি কি করব? আমি নাচার, কিন্তু তা হ'লেও আমি বলছি এ তাস আমার নয়। এ কথা আমি হলফ ক'রে বলতে পারি—দিব্যি গেলে বলতে পারি—বাজি রেখে বল্‌তেও পিছপা নই। রাখবেন বাজি? রাখবেন না? না রাখুন, কিন্তু এ কি, চল্লেন কোথায়? বাড়ী যাচ্ছেন? আপনার মাথা ধরে গেছে বলছেন? তা হ'লে, আর একবার ম্যাজিকটা দেখাবেন না? আর একবার টানি না কেন? গাঁজা তো নয়, টানতে কী দোষ? তাস টানায় তো কোনো বাধা নেই! টানব আবার?···নাকি, বাড়ী গিয়ে খেলাটা ভালো ক'রে রপ্ত ক'রে আসবেন? সে কথা মন্দ নয়, কিন্তু যাই বলুন, আপনার ম্যাজিকটা খুব চমৎকার! এ রকম খাসা জিনিষ আমি আর কখনো দেখি নি। আচ্ছা, নমস্কার!"

বালুচর

শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায়চৌধুরী

নদীর বুকেতে দেখি একখানি বালুচর,
বালু ছাড়া আর কিছু নেইকো সেথা,
কোন্ সে সুদূর হ'তে স্রোতজলে ভেসে এসে
ক্লান্ত কচুরীপানা থামে না সেথা।
দু'পারে নদীর কূলে সোনালী ধানের ভারে
গাছগুলি নুয়ে প'ড়ে বাতাসে দোলে,
আরই কিনারে সদা দল বেঁধে পারাবত
লুটোপুটি করে সেই ক্ষেতের কোলে।
হয়ত এ বালুচর ভারী খুসী হ'ত মনে—
পাখীদের কাছ হ'তে ও ধান পেলে,
ঐ দূর ক্ষেত হ'তে শুধু একছড়া ধান
হঠাৎ পাখীরা কেন দেয় না ফেলে!

চারিদিক্ ঘিরি তার শুধু জল আর জল—
কেউ ত' যায় না ঐ বালির দেশে!
আকাশের কোল ঘেঁষে একখানি ছেঁড়া মেঘ
নদীজলে ফেলে ছায়া যায় সে ভেসে।
দিন নেই, রাত নেই, সাথীহারা বালুচর
একাকী নদীর বুকে রয়েছে জাগি'
পাখীদের মুখ হ'তে খসে-পড়া এক মুঠি
সোনালী ধানের মৃদু পরশ লাগি'।
হ'ত তবে তারি বুকে সবুজ ধানের ক্ষেত—
রাঙা হ'ত বালুচর সোনালী ধানে,
শুধু ব্যালি বুকে নিয়ে অসহায় বালুচর
নির্জনে চেয়ে থাকে আকাশ পানে।

রামধনুর প্রিয় বন্ধুরা,

এই সংখ্যার সঙ্গে রামধনুর বয়স ১৯ বছর পূর্ণ হ'ল। আগামী বৈশাখে রামধনু কুড়ি বছরে পড়বে। বাংলা দেশের সাময়িক পত্র—বিশেষ ক'রে শিশুমাসিক সম্বন্ধে যারা একটু-আধটু খবর রাখ তারা নিশ্চয়ই জান যে খুব কম পত্রিকার পক্ষেই এত দীর্ঘায়ু লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে—সব শুদ্ধ বোধ হয় দু'খানির বেশী হবে না। তোমরা, রামধনুর পাঠকপাঠিকারা, যে তাকে কি স্নেহের চোখে দেখ এ থেকেই তার প্রমাণ পাচ্ছি। 'রামধনু'ও এ স্নেহের মর্য্যাদা রাখতে কুণ্ঠিত হবে না—এ ভরসা তোমাদের দিচ্ছি।

রামধনুর কাগজ ও পৃষ্ঠাসংখ্যা সম্বন্ধে অনেক বার তোমাদের বলেছি। শোনা যাচ্ছে, শীগ্‌গিরই সম্ভবতঃ সরকারী কাগজ-নিয়ন্ত্রণ আদেশ কিছুটা শিথিল হ'তে পারে। যদি সত্যিই তা হয় তবে রামধনুও শীগ্‌গিরই তদনুযায়ী বর্দ্ধিত কলেবর নিয়ে দেখা দেবে। তা না হওয়া পর্য্যন্ত রামধনুর মূল্য আমরা এখন বাড়াব না—যদিও পত্রিকা প্রকাশের খরচ পূর্ব্বের তুলনায় এখন অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে—এবং 'রামধনুর' দাম এখন প্রায় সমস্ত চলতি শিশুমাসিকের চাইতেই কম। রামধনুর আকার বাড়লে তখন হয়তো দামও খানিকটা বাড়াতে হবে, এবং তোমরাও তা অনুমোদন করবে এ ভরসা আমরা রাখি। রামধনুকে সকল দিক্ দিয়ে তোমাদের মনের মত করবার চেষ্টা আমরা করছি। "রাধামাধবের রত্নহার" শীঘ্রই শেষ হবে, এবং তার পরই একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখা নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস তোমাদের উপহার দেব। শ্রীযুক্ত শামুকের লেখা উপন্যাসখানি তো আছেই।

ইতিমধ্যে তোমাদের অনেক চিঠি পেয়েছি। আজ আর তার সব ক'খানির উল্লেখ করবার জায়গা নেই, বারান্তরে করব। শ্রীআরতিরাণী রায় ধাঁধার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে লিখেছেন। ঠিক ধাঁধার জন্য পুরস্কার দিতে হ'লে সে পুরস্কার অনেক ভাগে ভাগ হয়ে যাবে—কারণ অনেক কঠিন ধাঁধারও নির্ভুল উত্তর অনেকেই দিয়ে থাকেন। তবে আগামী বারে মাঝে মাঝে 'শব্দ সন্ধান' (ইংরেজীতে যাকে বলে 'ক্রস্ ওয়ার্ড পাজ্‌ল্') প্রকাশের ও তাতে পুরস্কার দেবার চেষ্টা করব। তা ছাড়া সাধারণ পুরস্কার-প্রতিযোগিতাও থাকবে।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রামধনুর দাম আরও কিছু বাড়িয়ে সেই সঙ্গে পৃষ্ঠা বাড়াবার অনুরোধ করেছেন। এ বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কুমারী জেবউন্নেসা ও ফজলুর রহমান্ প্রতি মাসে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ 'ছোটদের বইএর একটি তালিকা প্রকাশের অনুরোধ করেছেন। 'শিশুসাহিত্য-পরিষদ্' থেকে এ রকম একটি আয়োজন হচ্ছে—তার পরিচয় রামধনু মারফৎ তোমরা পাবে।

গ্রাহকদের মধ্যে শ্রীজয়ন্তকুমার দাশ, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেব, শ্রীমলিনা মুখোপাধ্যায়, শ্রীনন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসঞ্জয় রায়চৌধুরী এবার স্কুলের পরীক্ষায় ও স্পোর্ট্‌সএ নানা ভাবে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শুনে খুব খুসি হ'লাম। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন।

—রাঃ সঃ

ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এটলী সাহেব ঘোষণা করেছেন—১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যে তাঁরা ভারতের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করবেন। এই ব্যবস্থা ত্রিক মত কাজে পরিণত করবার জন্য বৃটীশ সরকার লর্ড ওয়াভেলের জায়গায় লর্ড মাউণ্টবেটেনকে ভারতের বড়লাট ক'রে পাঠাচ্ছেন। লর্ড মাউণ্টবেটেন এবারকার যুদ্ধে নৌসেনাধ্যক্ষ রূপে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং রাজ পরিবারের সঙ্গেও নাকি তাঁর আত্মীয়তা আছে। বর্ত্তমানে তাঁর বয়স ৪৭ বছর।

* * *

পাঞ্জাবে ঘটনাপ্রবাহ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। লীগ্ দলের সঙ্গে পাঞ্জাবের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার যে গোলমাল চলছিল তার একটা আপোষ মীমাংসা হয়। তার পরই হঠাৎ একদিন পাঞ্জাবের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন—যাতে লীগ্ দল মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন। তার পরই পাঞ্জাবের নানা স্থানে প্রবল দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু হয়—এবং এখনও তা সম্পূর্ণ শান্ত হয় নি। বর্ত্তমানে পাঞ্জাবের গভর্ণর নিজেই সেখানকার শাসনভার হাতে নিয়েছেন।

* * *

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি থেকে সম্প্রতি বিহারে গেছেন সেখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে চাক্ষুষ ভাবে পরিচিত হ'তে এবং হিন্দু মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে 'সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য। সেখানকার পল্লী পরিক্রমণ শেষ ক'রে আবার তিনি সম্ভবতঃ নোয়াখালি ফিরে আসবেন—কারণ নোয়াখালির আরব্ধ কাজ তিনি শেষ ক'রে যেতে পারেন নি।

* * *

কিছুদিন যাবৎ মাদ্রাজের কংগ্রেস দলের মধ্যে আভ্যন্তরিক মনোমালিন্য চলছিল। তার ফলে সম্প্রতি মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী প্রকাশম্ তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগ পত্র পেশ করেছেন। এর পর তিনিই প্রধান মন্ত্রী থেকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন না আর কেউ তাঁর জায়গায় প্রধান হবেন তা জানা যায় নি।

* * *

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী সমাবর্ত্তন উৎ মহাত্মা গান্ধীকে সমাবর্ত্তন-বক্তৃতা দেবার জন্য আ করা হয়েছে। গান্ধীজি এখনও এ বিষয়ে কোন প্রতিশ্র দিতে পারেন নি। স্মরণ থাকতে পারে যে মহা রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতি মনীষিগণ ইতিপূ এই উৎসবে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন।

* * *

সম্প্রতি কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিযুক্ত হয়েছে আপাততঃ এক মাসের জন্য হ'লেও তিনিই সম্ভবতঃ স্থ ভাবে এই পদে প্রতিষ্ঠিত হবেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ম শয়ের কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে সুনাম আছে। তিনি দেশপূ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র এবং দেশবন্ধু চিত্তর দাশের জামাতা।

* * *

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মাননীয় শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রনাথ মিত্র অস্থায়ী ভাবে নিযু হয়েছেন।

* * *

সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতা আশুতোষ কলেজ ভব শিশুসাহিত্য-পরিষদের ৩য় বার্ষিক শিশুশিল্প প্রদর্শ সমারোহের সঙ্গে হয়ে গেছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও শিশুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগে নাথ গুপ্ত। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযু ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী কৃতী শিল্পীদের পুরস্কার বিতরণ করেন এবারকার প্রদর্শনী নানা দিক্ দিয়ে খুবই উচ্চাঙ্গে হয়েছিল। শিশুশিল্প ছাড়াও শিশুসাহিত্য ও শিশুশিক্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। বাংল

শিশুসাহিত্যের প্রথম যুগ থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত শিশু-সাময়িক পত্রগুলির ধারাবাহিক পরিচয় এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীতে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও শিশু-পত্রিকা দেখানো হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ড্ বনাম অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে পঞ্চম বা শেষ টেষ্ট্ ম্যাচ্ হয়ে গেছে। অষ্ট্রেলিয়া দল এবারেও ইংল্যাণ্ড্ দলকে পরাজিত করেছে ৫ উইকেটে। ইংল্যাণ্ড দলের প্রথম ইনিংস্এ হয় ২৮০ রান্, ২য় ইনিংস্এ ১৮৬ রান্। অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংস্এ করে ২৫৩ রান্, ২য় ইনিংস্এ ৫ উইকেটে ২১৪ রান্ ক'রে ইংল্যাণ্ডের রান্ সংখ্যা অতিক্রম করলে খেলা শেষ হয়। এবারকার খেলা বৃষ্টির জন্য পুরো একদিন বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তাই অনেকেই ভেবেছিলেন এবারকার খেলাটিও বোধ হয় অমীমাংসিত রয়ে যাবে; কিন্তু ব্র্যাড্ম্যানের নেতৃত্বে দুর্দ্ধর্ষ অষ্ট্রেলিয়া দল আর একবার তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে।

ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক হ্যামণ্ড এবারে অসুস্থতার জন্য খেলতে পারেন নি, দলের অধিনায়কত্ব করেছিলেন ইয়ার্ড্লি। হাটন্ও প্রথম ইনিংস্এ ১২২ রান্ ক'রে অসুস্থতার জন্য অবসর নিতে বাধ্য হন। ২য় ইনিংস্এ তিনি আর খেলতে পারেন নি। ২য় ইনিংস্এ ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ডেনিস্ কম্পটন্ অপূর্ব্ব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৭৬ রান্ ক'রে নট্ আউট্ থাকেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাতে কোন ফল হ'ল না।

এবাকার ৫টি টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া দল তিনবার জয়ী হ'ল—তার মধ্যে দু' বারই ইনিংস্এ বিজয়ী। বাকি দু' বার খেলা অমীমাংসিত থাকে—অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড দল একটি খেলাতেও বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করতে পারে নি।

* * * *

ইংল্যাণ্ড দলের হ্যামণ্ড এবার ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছেন। নিউজিল্যাণ্ড ভ্রমণের পর আর তিনি ক্রিকেট খেলবেন না। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড় হয়েছেন হ্যামণ্ড তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছেন। ইংল্যাণ্ডের হয়ে ইনি ৮৪ বার টেষ্ট ম্যাচ্ খেলেছেন। ইংল্যাণ্ডের আর কোন খেলোয়াড়ের ভাগ্যেই এত বেশী বার টেষ্ট খেলার সম্মান জোটে নি। এই সব খেলায় তিনি মোট ৭০০০ রান্ করেছেন। ব্যাটিং ছাড়া বোলার হিসাবেও তিনি টেষ্টে খেলে মোট ৮৩টি উইকেট পেয়েছেন। ১৯৩৮ থেকে হ্যামণ্ড টেষ্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়কত্ব ক'রে আসছেন। তাঁর বয়স এখন ৪৪ বছর।

* * * *

ভারতে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শেষ হ'ল। ফাইনালে বরোদা দল হোলকার দলকে এক ইনিংস্ ও ৪০৯ রানে পরাজিত করেছে। এই খেলায় বিশেষত্ব হচ্ছে—গুল মহম্মদ ও হাজারী বরোদার হয়ে ৪র্থ উইকেটে পৃথিবীর নতুন রেকর্ড ৫৭৭ রান্ করেছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন খেলায়ই কোন উইকেটে এত রান্ ওঠে নি। ১৯৪৩ সনে বারবেডস্ বনাম ত্রিনিদাদ্ খেলায় ৪র্থ উইকেটে ৫৭৪ রান্ উঠেছিল (ইংল্যাণ্ডের রেকর্ড হচ্ছে সারে বনাম ইয়র্কশায়ারের খেলায় ৪৪৮ রান্—১৮৯৯ সনে)। গুল মহম্মদ রণজি প্রতিযোগিতায় হাজারীর রেকর্ড ভেঙ্গে ৩১৯ রান্ করেছেন, হাজারি এবারে করেছেন ২৮৮ রান্। বরোদার প্রথম ইনিংস্এ রান্ হয়েছে ৭৮৪ (রণজির রেকর্ড—মহারাষ্ট্র দলের ৭৯৮ রান্—১৯৪১ সনে)। হোলকার দল ১ম ইনিংস্এ করেন ২০২ রান্, ২য় ইনিংস্এ ১৭৩ রান্।

(গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা)

পথভোলা

শ্রীজয়ন্তকুমার দাশ

পথখানি মোর হারিয়ে গেছে সুদূর মাঠের শেষে,—
সূর্য্যকিরণ ধানের ক্ষেতে খড়ছে যেথায় এসে;
শারদ প্রাতে বাতাস এসে বাজায় ধানে বীণ,
পাখীর গানে আমোদ জাগে সদাই নিশিদিন;
ছোট্ট নদী গ্রামের শেষে চলছে যেথায় বেঁকে,
সেইখানেতে পথ হারাল একলা আমায় রেখে।
নদীর বুকে পাল তুলিয়া চলতে থাকে তরী,
গ্রামের বধূ জল নিয়ে যায় শূন্য কলস ভরি';
যেইখানেতে সন্ধ্যা হ'লে চলে রঙের খেলা,
নীল আকাশে ভাসতে থাকে সাদা মেঘের ভেলা,
সেথায় হঠাৎ কে যেন রে বললে মোরে ডেকে—
পথিক, তুমি পথ ভুলেছ ফের এখান থেকে।

প্রশ্ন ও উত্তর

(সংগ্রহ)

শ্রীবিজলী ঘোষ

প্রশ্ন—লণ্ডন সহরকে লণ্ডন বলা হয় কেন?

উত্তর—ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসীরা ইহাকে Lundun বলিত। যখন রোম্যান্রা ইংলণ্ড জয় করিয়া সেখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল তখন তাহারা ইহার নাম রাখিল Londinium। উহাই ভাষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে London (লণ্ডন) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রশ্ন—কোন্ দেশে রাত্রিতে রামধনু দেখা যায়?

উত্তর—হাওয়াই দ্বীপে।

প্রশ্ন—কোন্ দ্বীপের এক দিকে বৃষ্টি হইলে আর এ দিকে হয় না?

উত্তর—পোর্ট রিকো। মধ্যে এক বিশাল পর্ব্বত শ্রেণী থাকায় একদিক্ হইতে অপর দিকে মেঘ যাইতে পারে না বলিয়া সেখানে বৃষ্টি হয় না।

মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

১৩৫৩ সালের রামধনুতে যে সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে তোমার মতে সব চেয়ে ভাল ৫টি গল্প, ৫টি প্রবন্ধ, ৫টি কবিতা ও ৫টি 'ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকের লেখার' নাম উল্লেখ ক'রে পাঠাবে। সব ভোট মিলিয়ে আমরা একটা তালিকা প্রস্তুত করব। যা তালিকা ঐ তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি হবে তাকে প্রথম পুরস্কার ও তার পরের দু' জনকে যথাক্রমে ২য় ও ৩য় পুরস্কার দেওয়া হবে। লেখা ১৫ই বৈশাখ বেলা ৫টার

মধ্যে আমাদের কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। নাম, ঠিকানা ও "নিজের" গ্রাহক নং দিতে যেন ভুল না হয়। কেবল মাত্র গ্রাহক-গ্রাহিকারাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন। রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতির জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১২০) ৪৬২১১ (৩৮৫
৩৬০
১০২১
৯৬০
৬১১
৬০০
১১

উত্তরদাতাদের নাম

শক্তিকুমার চক্রবর্ত্তী (কৃষ্ণনগর) ; সুধীন্দ্রনাথ ও দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর) ; দিলীপকুমার চন্দ্র ; ঘোর প্যাঁচ, বিভূতি, মথুরেশ (খাস তেলেঙ্গা) ; রুণু বসু (দেওঘর) ; উষসী সেনগুপ্তা (ঢাকা) ; অমলা ও রামেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁকুড়া) ; অশোক, পল্লব ও বীথি দত্ত (বকুলবাগান) ; বাবলু পাইন (ঘাটশীলা) ; নমিতা, সবিতা, মমতা, মাষ্টার মহাশয়, সমীর, পূর্ণিমা (কলিকাতা) ; দেবী, তুলু, পুপু ও চাটু (কলিকাতা) ; কল্যাণী কাঞ্জিলাল (ডোমার) ; শান্তি মুখোপাধ্যায়, কানু, টোগো, খুকু, গণু, বাচ্চু (করিমগঞ্জ) ; বাণীপদ কর (মৌলবীবাজার) ; সরোজকুমার ভট্টাচার্য্য (বহরমপুর) ; ছবি, ছায়া, মাখা ও সুনীল রায় (নিউদিল্লী) ; রামা, ছোটকো, মঞ্জু, বাপ্পা, গৌতম, শিপ্রা, হাসু, রায়ট (করিমগঞ্জ) ; রেখা মিত্র (কানপুর) ; অমল, অরুণ ও অগ্নিশিখা মণিমেলার মণি ভাইবোন (গৌহাটী) ; মামা, গণ্ডুলে, ধীরা, সুলক্ষণা (ফয়জাবাদ) ; শশিশেখর কবিরাজ (কাশী) ; ননীগোপাল সাহা (কুলপদ্দী) ; অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কটক) ; দিলীপ দাশগুপ্ত (কোচবিহার) ; ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান) ; অমিয়, অমূল্য, পরাণ, শচীন্দ্র (উলানিয়া) ; জ্যাঠাইমা, দাদা, বাপিদা, বঙ্কা, মীরা, অঞ্জু ও শান্তি চট্টোপাধ্যায় (মহেশতলা) ; কেশবদাস ও কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা দেবী, মণ্ট, মঞ্জু, পুতুলদি (কালীঘাট) ; শেষপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী, বাকুম, কুহু, কেকা, শামিল, কল্পনা বাগ্‌চি (জলপাইগুড়ি) ; সুধীরচন্দ্র সাহা (মাদারীপুর) ; মৃণাল, ফণীন্দ্র, নৃপেন্দ্র, আরতি (উলানিয়া) ; রঞ্জু, কোকিলা, কিশোর, ভাইয়া, যমুনা, ডালি (পাটনা) ; শিশিরকুমার নাগ (কলিকাতা) ; অপূর্ব্ব, সেবাদি, ছবিদি, সীমা, দীনেশ, অনুজ (করিমগঞ্জ), ননীপ্রভা ও রেণুপ্রভা দে (দোয়ারাবাজার) ; অমিতাভ মিত্র (ভবানীপুর) ; চৈতন্য, বুদ্ধ, শুকু, গীতা, রমা, সহদেব (দক্ষিণেশ্বর) ; গোরাচাঁদ গুপ্ত, প্রসেনজিৎ সিং (গিরিডি) ; দিলীপ বসু (এলাহাবাদ) ; গৌতম সিংহ (কালীঘাট) ; গৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা) ; স্বপন, টুনু, বাবু, ভানু (বৈতলপুর) ; পার্থ ও গীতালি বসু (কলিকাতা) ; বরুণ, মুচু, বিলা, খোকন, বেলারাণী সরকার (মাধিপুরা) ; রমেন চক্রবর্ত্তী (জব্বলপুর) ; আশুতোষ ঘোষ (হবিগঞ্জ)।

নূতন ধাঁধা

নীচের ব্র্যাকেটের ভিতরকার অংশগুলির জায়গায় তাদের প্রতিশব্দ বা ভাবার্থ বসালেই এই সাঙ্কেতিক চিঠিখানি পড়া যাবে! পড়ে শোনাও তো!—

স্নে (দেখ) (গোড়া) ত্য,

ব (পল্লী-বৃদ্ধের প্রিয় জিনিষ) ল (লাঙ্গল) তোমা (পদবী বিশেষ) (তরল পদার্থ বিশেষ) বা (f) থে (একটি ইংরেজী অক্ষর) (ইংরেজীওয়ালার সাগরতীর (ছেঁড়া) (বন্ধুত্বে) (সমান) য় (কর্ত্তিত) চ্ছি। (কুড়াল) এক (সপ্তাহের একটি অংশ) (পিরান) ই বাবুর দে (কোষে) য়ে (ধনুর অংশ) ম। আর (শিল্প) র কো (প্রত্যঙ্গ বিশেষ) (স্বামী) অঙ্গ বিশেষ) (একটি সম্মানসূচক সর্ব্বনাম)। (কৃষ্ণ) (লোহিত) নাকি (রূপকথার জীব) ক্ষায় (দড়ি) (ঘোড়া) নি! বে (ছোটগাছ)! ও (শব্দ) (রাত্রি) ব (ধ্বনি) রই এ (মানস)। (মেয়েদের নিকট আত্মীয়া) (বল) কথা। খ (শূয়োর) খ (শ্রেষ্ঠ) দিও।
—ইতি (লাল) (মা জননী)।